বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

৩য় খণ্ড] বৈশাখ, ১৩১১ সন। [১ম সংখ্যা।

"জয় জগদীশ হরে।"

মঙ্গলময় অনন্তদেবের আরাধনায় সান্ধ্য আরতির মধুর-গম্ভীর মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিতেছে; এবং নিকটস্থ গ্রাম ও পল্লীনিচয়ের বহুসংখ্য নর-নারী, আরতিমণ্ডপের অদূরে দাঁড়াইয়া, উৎসবের ঘটা দেখিতেছে, আর কান পাতিয়া বাদ্য শুনিতেছে।

যাঁহারা আরতির উৎসবে ব্যাপৃত, তাঁহারা অনিকেত-সন্ন্যাসী। এই পৃথিবীতে পশু-পক্ষীরও, নিশা-যাপনের জন্য, নির্দ্দিষ্ট 'বাসা' আছে; অনিকেত-সন্ন্যাসিদিগের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। তাঁহারা, আতিথ্যের অনুরোধেও, গ্রামে কিংবা গৃহস্থের আশ্রমে রাত্রি যাপন করেন না। ভগবানের নাম-প্রচার তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত-ধর্ম্ম। এই প্রচার-ব্রত উপলক্ষে, দেশভ্রমণ-প্রসঙ্গে, সে দিন সেখানে দিবাবস
সে দিন সেই খানেই, গ্রামের বহিঃ
স্থানে, বৃক্ষের তলায়, তাঁহারা আ
করিয়া, সঙ্গীয় * বাঁশি-পেটারি-প
চন্দনাদি সুরভি কাষ্ঠের সামগ্রীতে
ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর, সুচিক্কণ-কারু
বিগ্রহমন্দির রচনা করেন;
হইতে না হইতেই, সকলে সে ম
দেশে দণ্ডায়মান হইয়া, গীত-বাদে

* সংস্কৃত ভাষায়
যোগ এক প্রকার অবাধ
বাঙ্গালার পক্ষে সুবিধাজনক
ও বৃষভ প্রভৃতি কতিপয়
প্রায় সংস্কৃত শব্দের উত্তরী
ঈয় প্রত্যয়ের যোগ হই

আমরা যতগুলি লোক ওখানে একতান-মনে দাঁড়াইয়া আছি, আমাদিগের সকলেরই তখন এই অবস্থা। আমরা কেমন এক অজ্ঞাত শক্তির আনন্দময় অন্তঃসঞ্চারে—Magnotized—ভাবাবেশিতবৎ। আমরা কি যেন দেখিতেছি,—কি যেন শুনিতেছি; এবং সকলেই, দেশ ভুলিয়া, গ্রাম ভুলিয়া—নিজ নিজ জীবনের নিত্যকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া,—কার কিরূপ আকর্ষণে—কোথায় যেন চলিয়া যাইতেছি।

সন্ন্যাসি-গুরু এই সময়ে ধীরে ধীরে গাইতে লাগিলেন,—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব! ধৃতমীনশরীর!
জয় জগদীশ হরে!"

গাইতে গাইতে, লহরীর পর লহরী পার হইয়া, আবার গাইলেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব! ধৃত বুদ্ধশরীর!
জয় জগদীশ হরে!" *

গীতের প্রত্যেক অক্ষর যেন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। আমার মন ও প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল; অথচ মনে পুনঃ পুনঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল যে, যিনি শাক্যসিংহের পবিত্র তনুতে বুদ্ধ-শক্তি-রূপে আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত জীব-হিংসার নিন্দা করিয়াছিলেন, তিনিই কি, "প্রলয়পয়োধিজলে" লীলাময় মীনরূপে বিলসিত হইয়া, বিশ্ববিবর্ত্তের বৈচিত্র্য ও মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন? জগদাদিভূত অনন্তদেব, জীবের পরমারাধ্য হইয়াও, অনধিগম্য। তিনি আপনিই আবার, মীন-কূর্ম্ম-নৃসিংহ-বামন প্রভৃতি নানাবিধ জীব-তনুতে প্রকট হইয়া, পরিশেষে রাম-মূর্ত্তিতে আদর্শ চরিত্র, এবং বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে দয়ার চরমচিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাও কি সম্ভবে? গীতে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই গীতায় অধিকতর সম্প্রসারিত রহিয়াছে। যথা,—

"অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ;
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।"
"উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধিমামমৃতোদ্ভবং;

তাঁহাদিগের একবার উহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের সারসিদ্ধান্ত এই,—"যাহা আমরা চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখি, তাহার সমস্তই ক্ষণস্থায়ি,—যাহা চক্ষে দেখি না, তাহাই নিত্য স্থায়ি,—চিরন্তন।"

* (ভাবানুবাদ—)।

প্রলয়-পয়োধি জলে,
…তরণী প্রতিম তুমি,
মীনদেহ করিয়া ধারণ,
ক'রেছিলে বিশ্ববেদ-তত্ত্ব-উদ্ধারণ;
জয় জগদীশ হরে!
সেই তুমি দয়াময়!
বুদ্ধদেহে অবতরি,
বেদযজ্ঞ নিন্দি অনুক্ষণ,
দয়াধর্ম্মে পশুঘাত ক'রেছ বারণ।
জয় জগদীশ হরে!

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং।"
"প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্,
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং।"*

আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গীতার প্রকৃত তত্ত্বরহস্য যতটুকু পরিগ্রহ করিতে পাইয়াছি, তাহার সহিত গীতের অর্থ ও অবতারবাদের মর্ম্মকথা মিলাইয়া বুঝিবার জন্য যত্ন পাইতেছি, মনের এইরূপ আকুল অবস্থাসময়ে অধুনাতন বিজ্ঞানের একটি উজ্জ্বলতম সিদ্ধান্ত, অত্যুজ্জ্বল একটি আলোক-রেখার ন্যায়, সহসা আমার চিত্তক্ষেত্রে প্রতিভাত হইল; এবং যে জগৎকে ক্ষণ পূর্ব্বে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ পদার্থ,—পিতৃ-সান্নিধ্য-বঞ্চিত শিশু অথবা কাণ্ডারীহীন তরণী মনে করিয়া নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিতে ছিলাম, সেই জগৎই, অণুতে অণুতে, তন্তুতে তন্তুতে, ঈশ্বরাবিষ্টরূপে আভাসিত হইয়া, আমার প্রাণে প্রেমানন্দের সমুদ্র ঢালিয়া দিল। বিজ্ঞানের বিচারে ইহা সার-সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে,—

"The final outcome of that speculation commenced by the primitive man is that the Power manifested through out the universe distinguished as material is the same Power which in ourselves wells up under the form of consciousness." (Religion : A Retrospect and Prospect.)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যে শক্তি এই অনন্ত জড়জগতের সমস্ত পদার্থে অনন্ত মূর্ত্তিতে দীপ্যমান, সেই শক্তিই আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মায় আত্মচৈতন্যরূপে বিরাজমান। সুতরাং, কিবা মীনের মীনত্ব,—মকরের মকরত্ব, কিবা সাধারণ মনুষ্যের সুখ-দুঃখময় সাধারণ মনুষ্যত্ব, অথবা অসাধারণ বোধিসত্ত্বের জগদুজ্জ্বল-তত্ত্বব্যাপি অসাধারণ অর্থাৎ অলৌকিক বুদ্ধত্ব, সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয় বিশ্বময় শক্তির ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-বিলাস।

* আমি বৃক্ষদিগের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ, দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, এবং সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি। ১০ম অঃ, ২৭শ শ্লোক।

আমি অশ্বদিগের মধ্যে অমৃতার্থ-সমুদ্র-মন্থন-সমুদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রদিগের মধ্যে ঐরাবত, এবং নরসমূহের মধ্যে নরাধিপ। ১০ম অঃ, ২৮শ শ্লোক।

আমি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ,—কলনশীল অর্থাৎ গণনপরায়ণদিগের মধ্যে কাল, মৃগসমূহের মধ্যে মৃগেন্দ্র, এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়। ১০ম অঃ, ৩০শ শ্লোক।

উপরিধৃত শ্লোকত্রয়ের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ যে, ভগবান্ অনন্তদেব এ বিশ্বসৃষ্টির স্থাবর জঙ্গম এবং চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্তর্নিবিষ্ট; অপিচ, যে বস্তুতে আদর্শোন্মুখ উৎকর্ষের যাহা কিছু প্রকাশ, তাহা তাঁহারই বিবর্ত্ত-বিলাসিনী সর্ব্বভূতময়ী শক্তির উচ্চতর বিকাশ।

আমি যখন এইরূপে বিজ্ঞানের বিমল আলোকে গীতার অর্থ, এবং গীতার প্রদর্শিত পথে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা সুযোগ পাইলাম, তখন আমার এই তাপিত প্রাণটা, স্বর-মাধুর্য্য-সঞ্জীবিত ভগবৎ-স্তুতিগীতের গভীর ভাবে যেন একবারে দ্রবীভূত হইয়া, বহিঃস্থ জগতে মিশিয়া গেল; এবং সমস্ত সংসারই আমার নিকট তখন ঐ মহাসঙ্গীতের মহিমময় প্রতিধ্বনির মত প্রতীয়মান হইল। আমার মনে লইল যে, আকাশের অনন্তকোটি নক্ষত্র, যেন নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তিতে, একে অন্যের আকর্ষণ করিতেছে; এবং একই আলোকে পুলকিত হইয়া,—একে অন্যের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া, এক স্বরে গাইতেছে,—

"জয় জগদীশ হরে।"

আমার মনে হইল যে, বুধ-মঙ্গল-বৃহস্পতি ও চারু-চন্দ্রহার-বেষ্টিত শনৈশ্চর প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহনিচয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রবর্ণিত ক্ষুদ্র গ্রহ ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপগ্রহনিচয়কে সঙ্গে লইয়া, সকলের মধ্যবর্ত্তী বিগ্রহস্বরূপ গ্রহরাজ সূর্য্যকে তদ্গত ভক্তিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে; এবং সকলেই, এক-ভাবে, এক-প্রাণে, একই স্বরে গাইতেছে,—

"জয় জগদীশ হরে।"

আমার মনে লইল যে, আমাদিগের এই আকীট-কোটীশ্বরাদি শত-সহস্র-কোটি জীবের আশ্রয়রূপিণী অন্নপূর্ণা অবনীও; উহার সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে, আবর্ত্তের পর আবর্ত্তে, এবং বিবর্ত্তের পর বিবর্ত্তে,—"প্রলয়পয়োধি জলের" ভয়াবহ প্লাবনে, এবং আর্য্য ও অনার্য্য—অথবা মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরস্পর শক্তিসংঘর্ষণে, আত্মবিকাশ-পুরাবৃত্তের প্রত্যেক স্তরে, ঘন-নির্ঘোষ স্বরে নিরন্তর গাইতেছে,—

"জয় জগদীশ হরে;"

এবং কিবা নিশীথ-সমীরণের শোক-ভয়াবহ শোঁ শোঁ নিঃস্বন, কিবা মৃদুবাহিনী স্রোতস্বিনীর মৃদুমন্দ মৃদুনিক্বণ, সকলেরই অভ্যন্তর হইতে ঐ একই ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে—

"জয় জগদীশ হরে।"

আমি আরতি করিতে জানি না,—আরাধনার উচ্চতত্ত্বেও দীক্ষিত নহি। কাঙ্গালের প্রাণে, সময়ে সময়ে, বিশ্বপ্রকাশ ঈশ্বরের নিকট সামান্যতঃ প্রার্থনা করিয়া থাকি। আমি সে সময়ে, আমার হৃদয়ানুভূত বিশ্বদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলাম,—

হা প্রভো! হা প্রাণাশ্রয়, হা পরাৎপর জগদীশ্বর। তোমার এই নিখিল সৃষ্টির অতি ক্ষুদ্র পরমাণু এবং অতি নিকৃষ্ট কীটপতঙ্গও, নিয়ত তোমারই নিয়ম পালন করিয়া, অজ্ঞাতসারে তোমার নামগীত, গাইয়া থাকে। আমি কেন তোমার নাম গাইতে পারিলাম না? আমি কেন, বাহিরের এত বৃথা কথা জানিয়াও, তোমায় জানিতে চাহিলাম না,—তোমায় ভালবাসিলাম না,—তোমার ভালবাসায় জীবমাত্রকে ভালবাসিতে ইচ্ছুক হইলাম না,—ভাল চক্ষে দেখিতে শিখিলাম না। তুমি কৃপা কর, প্রভো। তুমি

কৃপা কর। তোমার কৃপায় আমার এই দুরিত-পিপাসান্বিত দগ্ধচিত্ত মনুষ্যোচিত চৈতন্য লাভ করুক;—আমার এই তাপিত প্রাণ শীতল হউক,—এবং আমার অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবসন্ন হৃদয়, তোমাকে হৃদয়াধীন প্রত্যক্ষ দেববৎ অনুভব করিয়া, জগদ্দিবর্ত্তের জয় জয়-দেব-সঙ্গীতের সহিত স্বরমিশ্রণে, সতত এই একই পদ গান করুক,—

জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে।

দার্শনিক মতের সমন্বয়।

[৩]

বৌদ্ধদর্শনে বাহ্য ও আন্তর পরিবর্ত্তন প্রবাহের অন্তরালে কোন নিত্যসত্তার আদৌ আভাষ আছে কি না, অদ্য আমরা তাহারই বিচার উত্থাপন করিব। আমরা বৌদ্ধদর্শন ও বুদ্ধের উক্তি বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিয়া যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদের দৃঢ়রূপে মনে হয় যে, বৌদ্ধদর্শনে স্পষ্টতঃ আত্মা ও পরকালের কথা না থাকিলেও, বৌদ্ধদর্শন নিত্যসত্তার বিরোধী নহে; এবং আত্মা ও পরকালের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশ না থাকিবার বিশিষ্ট হেতু আছে।

বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক দর্শন, আত্মাকে কেবলমাত্র পর-পর-জাত (Successive) কতকগুলি ভাবলহরীর সমষ্টিরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। কার্য্যকারণ সম্বন্ধে ও গুণ-গুণী সম্বন্ধে ধৃত ভাব সমষ্টিই আত্মা। এই যে মনের ভাবগুলি (Mental states), এ গুলি কি? জড়রাজ্যে যেমন শক্তি বা গতি, মনোরাজ্যে তদ্রূপ এই (Faculties) বা ভাবনিবহ। পণ্ডিত (Maxmuller) তাঁহার (Hibbert Lectures নামক গ্রন্থে বলেন যে, "Faculties are inherent in substances, quite as much as forces or powers are. We generally speak of the *faculties* of conscious and of *forces* of unconscious. We know that there is no force without substance and no substance without force." অতএব states বা ভাব বা বৃত্তি স্বীকার করিলেই, তাহারা যে একটা কিছুর ভাব বা বৃত্তি, তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিলেও, উহাতে তাহা নিহিত থাকিয়া যায়। জড়রাজ্যে অণুব্যতিরেকে যেমন শক্তির ধারণা হয় না, মনোরাজ্যেও আত্মাব্যতীত বৃত্তির ধারণা হয় না। যে

মুহূর্ত্তে বৌদ্ধদর্শন মানসিক ভাব বা বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আসিয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর কথা আছে। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ-মত সমালোচনা প্রসঙ্গে আপত্তি করিয়াছিলেন যে, সমস্তই যদি কেবল পরম্পরজাত ভাবলহরী মাত্রই হয়, তবে দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যে দেখিয়াছিল, দুই ঘণ্টা পরে সেই-ই এখন তাহা স্পর্শ করিতেছে,—এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টা ও স্পর্শকর্ত্তা যে একই তাহা, ভাবলহরী মাত্র বলিলে, কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? কথাটা এই যে ক্রিয়া দ্বয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলা বা connecting link থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পাঠক জানেন, বুদ্ধ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। এই জন্মান্তরবাদ হইতেই শঙ্করেব আপত্তির উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করাতেই প্রকারান্তরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত না হইয়া পারে না। বৌদ্ধ বলেন যে, জীব একজন্ম হইতে অন্য জন্ম লাভ করে। এখন প্রশ্ন এই, সমস্তই যদি সম্বন্ধমাত্র হয়,তবে পূর্ব্ব ও পরজন্ম এই উভয়ের মধ্যে connecting link কে হইবে? কেবল কর্ম্ম স্বীকার করিলেই সেই link পাওয়া যায় না। কর্ম্ম ত সম্বন্ধাত্মক মাত্র; তাহা ত পূর্ব্বজন্মেই ফুরাইয়া গিয়াছে। পরজন্মেও যে সেই কর্ম্ম আসিবে, তাহার নিয়ামক কে হইবে? কে এই কর্ম্মকে ধরিয়া রাখে? বিখ্যাত বৌদ্ধসূত্রানুবাদক পণ্ডিত Rhys Davids তাঁহার Budhism নামক গ্রন্থে এই জন্যই বলিয়াছেন যে—"As Budhism does not acknowledge a soul, it has to find a *link of connection*, the bridge between one life and another, somewhere else. In order to do this, it resorts to the doctrine of কর্ম্ম। But this very keystone itself (i. e. this কর্ম্ম),—the link between one life and another—is a mere word."

এই জন্যই নিত্য আত্মা স্বীকার না করিলে, জন্মান্তরবাদ কথার কথা মাত্র হইয়া পড়ে। সুতরাং, এ কথা আমরা দৃঢ়তররূপে বলিতে পারি যে, বৌদ্ধ যখন জন্মান্তর স্বীকার করেন, তখন ইহা বুঝাই যাইতেছে যে, তাঁহারা নিত্য আত্মা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া যাইতেছেন। তার পর, বৌদ্ধের নির্ব্বাণাবস্থা লাভ হইতেও নিত্য আত্মা স্বীকৃত না হইয়া পারে না। বৌদ্ধদর্শনের মতে,সমস্তই ইন্দ্রিয়িকজ্ঞানমাত্রই—এ জগৎই—সাংবৃতিক (illusory) মাত্র। নির্ব্বাণাবস্থাই পারমার্থিক অবস্থা। নির্ব্বাণাবস্থায় এ জগৎ থাকিবে না; সমস্ত সম্বন্ধজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইবে। সাংখ্যের ব্যক্ত ও অব্যক্তাবস্থা এবং বেদান্তের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক অবস্থার সহিত এ উক্তির বিশেষ মিল আছে। বৌদ্ধদর্শনে দুই প্রকারের সত্যতার কথা আছে। এক, বাস্তবিক সত্যতা (Really real); ইহাই বৌদ্ধের নির্ব্বাণ বা শূন্যাবস্থা। অপর, Phenome-

nally real বা প্রতীয়মানসত্যতা, যেমন জাগতিকজ্ঞান। নতুবা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান থাকিবে না, ইহা অনিত্য, ইহা নির্ব্বাণাবস্থায় বিলুপ্ত হইবে,—বৌদ্ধদিগের এ সকল কথার অর্থ কি? এখন পাঠক দেখুন, যাঁহারা জগৎকে phenomenally real বলেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে Neomena স্বীকার না করিয়া পারেন কি? মহাপুরুষ Kant বলিয়াছেন যে, "If we were to maintain that because we do not know what the *noumenau* is therefore we do not know that it *is*? Otherwise we should arrive at the irrational conclusion that there is appearance without *something* that appears" (Translated by Max Muller). সুতরাং এ জগৎ "সাংবৃতিক" স্বীকার করাতেই, এ জগতের অন্তরালে যে এক নিত্যসত্তা আছে, সেই "পারমার্থিক" সত্যতা কাজেই স্বীকৃত হইয়া পড়িতেছে।

বৌদ্ধদর্শনের "নির্ব্বাণাবস্থার" বর্ণন negative হইলেও, উহা যে, Positive (সৎ) পদার্থ, তাহা বুঝিতে অতি অল্প আয়াসই স্বীকার করিতে হয়। উত্তমরূপে বুঝিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নির্ব্বাণাবস্থা শূন্যাবস্থা নহে। ইহা হিন্দুদর্শনের মুক্তাবস্থা মাত্র। সে অবস্থায় ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞান মোটেই থাকে না, সমস্ত সম্বন্ধজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, ইহা প্রদর্শন করাই বুদ্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্যই negative side দিয়া তিনি এই নির্ব্বাণাবস্থা বুঝাইয়াছেন। আর একটি বিশেষ কথা এস্থলে আমাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে। বৌদ্ধদর্শন কেবল যে মৃত্যুর পরই নির্ব্বাণাবস্থা লাভ ঘটিতে পারে বলেন, তাহা নহে; জীব এই বর্ত্তমান জীবনেও তাহা লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধের এই কথা হইতেই আত্মার অস্তিত্ব আসিয়া পড়িতেছে। এ কথাটিও পাঠকের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যদি সমস্তই কেবলমাত্র সম্বন্ধজ্ঞানই হয় এবং এই সম্বন্ধজ্ঞানও যদি ইহজীবনেই ধ্বংস করিতে পারা যায়, তবেত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ভিন্ন তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আত্মা যদি কেবল মাত্র কতকগুলি সম্বন্ধের সমষ্টিমাত্রই হয়, সম্বন্ধসমষ্টি বা ভাবসমষ্টি ব্যতীত যদি আত্মার আর পৃথক্ অস্তিত্বই না থাকে, তবে নির্ব্বাণাবস্থায় যখন সে সম্বন্ধ বিন্দুমাত্রও থাকিবে না, তখনত কিছুই থাকিবে না, তখন আর তাহাকে পরমানন্দ লাভ কেমন করিয়া বলিতে পার? অতএব আত্মা আছে। * পণ্ডিত Max Muller তাঁহার Hindu Philosophy গ্রন্থেও ইহাই বলিতেছেন—"It is the same question which meets us with regard to the Budhist *nirvan*. This also was in the beginning the result and reward of moral virtue, of the restraint of passions and of perfect tranquillity of soul, such as is described in ধর্ম্মপদে, but it soon assumed a different

character, as representing freedom from all bondage and illusion, amounting to a denial of all reality in the subjective and the objective world." অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্পষ্টতঃ না বলিলেও, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারেন না। তবে যে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে তাহার উল্লেখ করেন নাই এবং জিজ্ঞাসা করিলে মৌন ভাব অবলম্বন করিতেন, তাহার অর্থ এই যে, মানুষ এই ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞান লইয়া তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে; জ্ঞানমাত্রই Related বা conditional জ্ঞান মাত্র। মনুষ্যজ্ঞান Absolute এর ধারেও যাইতে পারে না। সে অবস্থা যখন আসিবে, তখন মানুষ নিজেই তাহা বুঝিতে পারিবে। বুদ্ধের ইহাই অভিপ্রায়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্ এ।

জাপান সম্বন্ধে কএকটি কথা।

প্রথম প্রস্তাব।

আসিয়ার মানচিত্র অবলোকন করিলে, সুবিশাল চীনসাম্রাজ্যের পূর্ব্বদিকে যে ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ নয়নগোচর হয়, তাহাই জাপান-সাম্রাজ্য নামে আখ্যাত। ঐ দ্বীপ সমূহ মধ্যে কিংস্থ, শিক্কু, নিফন এবং ইজো দ্বীপ সর্ব্বপ্রধান। জাপানসাম্রাজ্যের রাজধানী টোকিয়ো নগর নিফন দ্বীপে অবস্থিত।

অনেকের সংস্কার ছিল যে, জাপানের অধিবাসিগণ অতি অল্পকাল যাবৎ অসভ্য ও বর্ব্বরের অবস্থা হইতে উন্নীত হইয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছে। বহুদিন অতীত হয় নাই, কবিবর হেমচন্দ্র গাইয়াছিলেন।

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান।
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান॥"

দুঃখের বিষয় কবিবর এই নশ্বর পৃথিবীর মমতা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র এক্ষণে জীবিত থাকিলে, তাঁহার সুমধুর বীণায় জাপান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তান ঝঙ্কারিত হইয়া, আমাদের কর্ণকুহরে অমৃতকণা সেচন করিত। পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত শিক্ষা-প্রণালী যে অল্প দিন যাবৎ জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সময় সুসভ্য ইংরেজ জাতি সভ্যতার পবিত্র আলোক হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিলেন, তৎকালেও জাপানবাসিগণ প্রাচ্য-প্রণালী-অনুসারে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ছিল।

প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল, জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই অল্প সময় মধ্যে ঐ দেশে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। প্রবল পরাক্রান্ত রুশ সাম্রাজ্যের সহিত জাপানের এক্ষণে যে সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহাতে সমগ্র সভ্যজগৎ উৎসুকনেত্রে এই ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ইতি মধ্যেই জাপানবাসিগণ অন্তেবাসীর আসন হইতে উন্নীত হইয়া, লোকসমাজে শিক্ষকের আসন পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মিলনে উজ্জলে ও মধুরে মিশ্রণের ন্যায় যে অপূর্ব্ব শোভা উৎপন্ন হয়, জাপান তাহারই জলন্ত উদাহরণ। যাঁহারা মনে করেন, একমাত্র প্রাচ্য সভ্যতা দ্বারা অথবা একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাঁহারা জাপানের দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া, স্বীয় মত পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। কিরূপে নগণ্য জাপানাধিপতি পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য নৃপতি সমাজে গণনীয় আসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই আলোচ্য।

জাপানের ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা অতি প্রাচীন সাম্রাজ্য। পূর্ব্বে এই দেশে "আইনো" নামে এক অসভ্য জাতি বাস করিত এবং এক্ষণেও ঐ জাতীয় স্বল্পসংখ্যক লোক জাপানে বিদ্যমান রহিয়াছে। কালে বর্ত্তমান জাপানিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ আদিম অধিবাসিগণকে পরাভূত করিয়া, জাপান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন। ঐ বিজেতৃগণের উত্তর পুরুষেরাই, এক্ষণে জাপানে সমধিক ক্ষমতাপন্ন। জাপানীরা কোন্ জাতীয় লোক, তাহা অদ্যাপি নিঃসন্দেহরূপে মীমাংসিত হয় নাই। কেহ বলেন, যাঁহারা জাপানে অভিযান করিয়া "আইনো" দিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারা মঙ্গোলীয়। কাহারও মতে যে সমস্ত ইসরায়েল বংশীয় জেহোবার অভিশাপে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্য্যটকের অবস্থায় পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ "আইনো" দিগকে পরাভূত করিয়া জাপানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ জাপানের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের যেরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে যে, বর্ত্তমান জাপানিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষ হইতে গিয়া ঐ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

যিনি জাপানসাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা, তাঁহার উপাধি "মিকাডো"। অতি প্রাচীন কালে রাজ্য শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে মিকাডোই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অর্থাৎ সম্রাট্ তোঞ্জর রাজত্বকালে "কামাটকী" নামক "ফুজিয়ারা" বংশীয় জনৈক লোক ঐ সম্রাটের মন্ত্রি-পদ লাভ করেন। জাপানে "ফুজিয়ারা" অতি সম্ভ্রান্ত বংশ। এই বংশোদ্ভবা মহিলাগণই সম্রাটের অঙ্কশায়িনীপদে বরিতা হইয়া থাকেন। সম্রাট্ তোঞ্জরের সময় হইতে খৃষ্টীয়

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান রাজপদসমূহ ফুজিয়ারা বংশের এক চেটিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই বংশীয়েরা যুদ্ধকার্য্যে তাদৃশ নিপুণ ছিলেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাব সময়ে যুদ্ধবিভাগ "তৈরা" ও "মিনামত" বংশীয় লোকের হস্তগত হইয়াছিল।

যিনি "তৈরা" বংশের আদিপুরুষ, তিনি সম্রাট্ কেয়ামুর ঔরসে এবং তদীয় জনৈক নিম্নশ্রেণীস্থ পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্রাট্ ৭৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। "মিনামত" বংশ সম্রাট্ সিওয়া (শিব) হইতে সমুদ্ভূত। এই নরপতির রাজত্বকাল ৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

ফুজিয়া বংশের প্রাধান্যকালে আইনোজাতি এবং কিংস্যুদ্বীপের অধিবাসিগণ বিদ্রোহভাব অবলম্বন করিয়া, সাম্রাজ্য মধ্যে অশান্তি উৎপাদন করিতেছিল। এই অন্তর্বিপ্লবের সময়, জাপান সমাজে যুদ্ধব্যবসায়ী "তৈরা" ও "মিনামত" বংশীয়দিগের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইল। তৎকালে ঐ সমাজ কৃষক, শিল্পী, বণিক্ ও যোদ্ধা এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তৈরাবংশীয়েরা ক্রমে ফুজিয়ারাদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া, তাঁহাদিগের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিলে তৈরা ও মিনামতদিগের মধ্যে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রাধান্য লাভ উপলক্ষে পরস্পর সংঘর্ষ চলিতে থাকে। অবশেষে তৈরাগণকে পরাভূত করিয়া মিনামতেরাই স্বীয় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই সময় "অরিতম" নামক এক ব্যক্তি মিনামত বংশের নেতা ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের প্রধানতম সেনানীপদে বরিত হইয়া "সোগান" উপাধি লাভ করেন। প্রথম অবস্থায় সম্রাটের মনোনীত ব্যক্তিই এইপদ লাভ করিতে সক্ষম ছিলেন; মধ্যে একমাত্র তৈরা কিংবা মিনামত বংশীয় প্রধান লোকদিগের কেহকে এই পদে নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; অবশেষে ঐ পদ উত্তরাধিকারক্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সোগান পদ এই শেষোক্ত অবস্থায় পরিণত হইলে, "মিকাডো" সাক্ষীগোপালের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন এবং "সোগান" অপ্রতিহত প্রভাবে সাম্রাজ্য মধ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রোমক সম্প্রদায় ভুক্ত খৃষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মগুরু পোপের অবস্থার সহিত মিকাডোর তৎকালীন অবস্থার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তরালে কতিপয় সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক এবং বিদ্বজ্জন পরিবেষ্টিত হইয়া কেইটো নগরের সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইল; এবং প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে অনধিগম্য মনে করিয়া তৎপ্রতি দেবভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পার্থিব মিকাডো এইরূপে অপার্থিবে পরিণত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ জেডোনগর সোগানের

অবস্থানের নিমিত্ত কৃতনির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি সৈন্যসামন্ত দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া, রাজকীয় সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সোগানের এত অপ্রতিহত প্রভাব হইয়াছিল যে,পাশ্চাত্যগণ প্রথম প্রথম "সোগানকেই দেশের প্রকৃত রাজা মনে করিত, এবং "মিকাডোর" অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিল।

অরিতম শাসন-কার্য্যে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শাসন-বিভাগের অনেক সংস্কার সাধন করেন। তাঁহার শাসনকালে সমগ্র জাপানসাম্রাজ্য পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল ; এবং প্রত্যেক প্রদেশের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত এক এক জন মিনামত বংশীয় শাসনকর্ত্তা ও আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক শাসনকর্ত্তার অধীনরূপে এক এক জন অভিজ্ঞ সেনানী ও উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। সোগান পদের উত্তরাধিকারক্রমের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত শাসনকর্ত্তৃগণের পদও উত্তরাধিকারক্রমে পরিণত হইল। এক্ষণে ঐ পাঁচ প্রদেশ পাঁচটি স্বতন্ত্র সামন্ত রাজ্য হইয়া দাঁড়াইল ; এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ সামন্তরাজের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সোগাননামক রাজাধিরাজের পর্য্যবেক্ষণে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক সামন্ত রাজা বা শাসনকর্ত্তার অধীনরূপে যে সমস্ত সেনা নিযুক্ত ছিল, তাহারা বেতনের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎপরিমাণ ভূমি নিষ্কর উপভোগ করিত। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন-সময়ে যে জায়গীর-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং মধ্যযুগে ইউরোপে যেরূপ (Feudal system) প্রচলিত ছিল, এক্ষণে জাপানেও ঐরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। ভারতবর্ষীয় জায়গীরদার এবং ইউরোপীয় (Feudal) প্রভুদিগের ন্যায় এই সমস্ত সৈনিকগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিকারস্থ প্রকৃতিপুঞ্জের ধন, মান ও জীবন সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের কৃপার উপর নির্ভর করিত। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইয়েস্থ নামক এক ব্যক্তি সোগানের পদলাভ করেন। তাঁহার শাসনকালে এক রাজবিধি প্রচার দ্বারা কৃষকপ্রমুখ সম্প্রদায় চতুষ্টয় মধ্যে যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয় এবং এই সময় হইতে, তাঁহারা জাপান-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

যুদ্ধব্যবসায়িগণ "সেমুরী" নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। "সেমুরী" শব্দ "সামরিক" শব্দের অপভ্রংশ কি না, তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন। এই সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়জাতির রূপান্তর মাত্র। জগতের অন্য কোন যুদ্ধব্যবসায়ি জাতি নৈতিক চরিত্রে সেমুরীদিগের সমকক্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে কি না,সন্দেহ। প্রত্যেক সেমুরী সন্তানকে কঠোর মিতাচার ও ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষা করিতে হইত; এবং তাঁহারা কোনরূপ বিলাস-সামগ্রী স্পর্শ করিতে পারিতেন না। স্বদেশ, স্বধর্ম্ম এবং

আত্মসম্মানের নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন করা, সেমুরীগণ অত্যাবশ্যক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। রাজভক্তি, মিতাচার এবং সমুন্নত ধর্ম্মভাব তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেকেই নিয়মিতরূপে পাঠাভ্যাস করিতেন, কিন্তু কেহই নৃত্যগীত প্রভৃতি উত্তেজনা সূচক তরল আমোদে যোগদান করিতেন না। যুদ্ধকার্য্যে তাঁহাদের একাগ্রতা বিদ্যমান ছিল। সমুন্নত বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল আলোক লাভ করিয়া, সেমুরীগণ পার্থিব সুখ সম্পদ অপেক্ষা পরমাত্মার শান্তির প্রতি অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করিতেন। পৃথিবীতে এমন কোন প্রিয় বস্তুই ছিল না, যাহা তাঁহারা স্বদেশ ও সম্রাটের জন্য অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। প্রত্যেক সেমুরী সন্তান আভিজাত্যের নিদর্শনস্বরূপ যুগল তরবারি ধারণ করিতেন। কৃষক, শিল্পী এবং বণিক্ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সমক্ষে কোন সেমুরীসন্তান উপস্থিত হইলে, তাহারা নতজানু হইয়া তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত; এবং কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অমনি তাহার শিরশ্ছেদন করা হইত।

পাশ্চাত্যজাতি সমূহের উদ্যমশীলতা জগদ্বিখ্যাত। আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি যে মহাদেশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে যে, ইউরোপীয়গণ প্রথমতঃ কিরূপ সন্তর্পণের সহিত ঐ সমস্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, অবশেষে তথায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন, ইংরেজ, ফরাশিগণ, দিনেমার ওলন্দাজ ও পর্টুগিজগণ বাণিজ্যে ব্যপদেশে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়া, আধিপত্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ইংরেজেরা অন্য ইউরোপীয় জাতিকে বিতাড়িত করিয়া তথায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমুদ্রবেষ্টিত জাপানসাম্রাজ্যও এই পাশ্চাত্য উদ্যমশীলতার আক্রমণ হইতে নিস্তার লাভ করে নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যজাতির অভিযান জাপানের পক্ষে অশুভের পরিবর্ত্তে শুভ ফল প্রসব করিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্টুগাল দেশীয় কতিপয় বণিক্ জাপান-সাম্রাজ্যে পদার্পণ করেন। তৎকালে বিদেশীয়দিগের পক্ষে জাপানে প্রবেশ করিবার বিষয়ে কোন নিষেধ বিধি প্রচলিত ছিল না। সুতরাং পর্টুগিজগণ অনায়াসে জাপানে অবস্থান করিয়া বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে, জাপানের অধিবাসিগণ পাশ্চাত্য পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল; এবং তাহারা ঐ সমস্ত পণ্যদ্রব্যের বাহ্যিক চাকচক্যে বিমোহিত হইয়া, তাহা প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে জাপানপ্রবাসী পর্টুগিজ বণিক্ সম্প্রদায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই দ্রুত উন্নতিই অবশেষে তাঁহাদের কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। পর্টুগিজ বণিক্গণ ধনমদে মত্ত হইয়া দেশীয়দিগের প্রতি নানারূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগের চেষ্টায় জাপানে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবেশলাভ করিয়াছিল এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় কতিপয় ব্যক্তি পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া,ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পর্টুগিজগণ রোমক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টীয়ান। অচিরে ঐ নবদীক্ষিত জাপানিগণ ধর্ম্মগুরু পোপের সমীপে ভক্তিযুক্ত উপহার প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর পর্টুগাল দেশীয় সৈন্যের সাহায্যে জাপানসম্রাট্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া এই সাম্রাজ্যে খৃষ্টীয় শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের সহিত পর্টুগিজ বণিক্‌ সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। জাপান সম্রাট্‌ এই আসন্ন বিপ্লবের আভাস পাইয়া ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পর্টুগিজদিগকে সাম্রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

পর্টুগিজ দিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগের অব্যবহিত পরে স্পেন, হলণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়াবাসী বণিক্‌ সম্প্রদায় জাপানে আগমন করিয়াছিলেন। স্পেন দেশীয় বণিক্‌গণ অন্য বিদেশী বণিক্‌গণকে জাপান হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিলেন এবং অবশেষে সম্রাট্‌কে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, ঐ সমস্ত বণিক্‌গণকে বিতাড়িত না করিলে, তাঁহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। সম্রাট্‌ স্পেন দেশীয় বণিকের স্পর্দ্ধা সহ্য করিলেন না এবং অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সৈন্যের সাহায্যে জাপান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে একমাত্র ওলন্দাজেরা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ফিরেণ্ডো নামক দ্বীপে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল, এবং অন্য কোন পাশ্চাত্য জাতি ঐ সাম্রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে রাজবিধি প্রচারিত হইল।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে কতিপয় বাষ্পচালিত রণপোত সহ এক দৌত্য সম্প্রদায় জাপান-সাম্রাজ্যে উপস্থিত হন। ইতিপূর্ব্বে জাপানবাসিগণ আর কোন বাষ্পচালিত পোত অবলোকন করে নাই; সুতরাং তাহারা এই অভিনব দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল। আমেরিকা হইতে যে সমস্ত বাণিজ্য পোত প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যদিয়া চীন প্রভৃতি দেশে আগমন করিত, উপযুক্ত পরিমাণ কয়লার অভাবে ঐ সমস্ত বাণিজ্য পোতের স্বচ্ছন্দ গমনাগমন সম্বন্ধে সবিশেষ অসুবিধা সংঘটিত হইত। জাপান সাম্রাজ্যের কোন স্থানে এই সমস্ত পোত বিশ্রাম করিতে পারিলে তথা হইতে কয়লা সংগৃহীত এবং ঐ অসুবিধা বিদূরিত হইতে পারে, সুতরাং তাদৃশ অনুজ্ঞা লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ দৌত্য সম্প্রদায় জাপানে আগমন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ জাপানবাসিগণ আমেরিকার রাজদূতকে তীরে অবতরণ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে আমেরিক সৈন্যের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোদ্ভাবিত যুদ্ধাস্ত্রের নিকট পরাভূত হইয়া জাপান সেনা তথা হইতে প্রস্থান করে, এবং তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে তীরে অবতীর্ণ হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের

৩১শে মার্চ্চ তারিখে এই দৌত্য সম্প্রদায়ের চেষ্টায় যুক্তরাজ্যের সহিত জাপানের যে সন্ধি সংস্থাপন হয়, তাহাতে ঐ সাম্রাজ্যের মধ্যগত সিমোডা ও হাকোদাদী নামক দুই বন্দরের দ্বার আমেরিকদিগের নিমিত্ত উন্মুক্ত হইল। অবিলম্বে ইংলণ্ড ও রুশিয়াবাসিগণ বাণিজ্য সম্বন্ধে ঐরূপ অনুকূল ক্ষমতা লাভ করিয়া জাপানে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্য জাতি সমূহের সংশ্রবে আসিয়া ইতিপূর্ব্বেই জাপানবাসিগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিজ্ঞানের বিষয় অবগত হইয়াছিল, জাপানী রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে অনেকে ইংরেজী ও ওলন্দাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উহা লিখিতে ও পাঠ করিতে সক্ষম ছিলেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে ইউরোপে যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে, জাপানবাসীরা তাহা সমস্তই অবগত ছিল এবং তাহারা অভিনব প্রণালীতে একপ্রকার তাড়িত-বার্ত্তাবহ ও বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড ও রুশিয়ার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, পাশ্চাত্য দেশ সমূহের আচার ব্যবহার দেখিবার নিমিত্ত, কতিপয় জাপানী যুবক ইউরোপে প্রেরিত হইলেন। যুবকগণ ক্রমে লণ্ডন নগরে, হেগ ও বার্লিন নগরে আগমন করিয়া তত্তৎস্থলের শাসন-প্রণালী, রীতি নীতি, কল কারখানা ও প্রধান প্রধান কার্য্যালয়ের বিষয়ে সুক্ষ্ম তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সোগান শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে জাপানসাম্রাজ্যে বহুসংখ্যক প্রভুপদবাচ্য ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রভুপদবাচ্য-ব্যক্তিগণ পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। পক্ষান্তরে সোগান তাঁহাদিগের উপর যথেচ্ছ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে কদাচ ত্রুটি করিতেন না। একের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক প্রভুর মনোরঞ্জন সাধন করিতে গিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে পদে পদে অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। সাম্রাজ্য মধ্যে এই অশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, পাশ্চাত্য জাতীয় লোকেরা তথায় ক্রমশঃ আপন আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত বিদেশীয়-গণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে পারে, একতার অভাবে জাপানে এমন কোন দেশীয় শক্তি বিদ্যমান ছিল না। ক্রমে সমগ্র সাম্রাজ্য পাশ্চাত্যগণের কবলগত হইবার উপক্রম হইল। এই বিপদের সময়, ইউরোপ-প্রবাসী যুবকগণ জাপানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট তাঁহাদের সংগৃহীত তত্ত্ব প্রচার করিলেন। এই সমস্ত যুবকগণের অধিকাংশ সেমুরী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ইংরেজ জাতির শাসন-প্রণালীর প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জাপানবাসিগণ তাঁহাদের নিকট অবগত হইলেন যে, ইংলণ্ডের অনুরূপ রাজতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত না হইলে, কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। ঐরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, সোগান শাসনের এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সেমুরী সম্প্রদায়ের ক্ষমতার উ-

চ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক মিকাডোর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। তৎকালে সেমুরীগণ আভিজাত গৌরবে গরীয়ান্ ছিলেন। এবং সোগান শাসন-প্রণালীর উপর তাঁহাদিগের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রস্তাবিত সংস্কার সাধিত হইলে, সেমুরীগণের এই গৌরব চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইবে এবং কৃষক-প্রমুখ যে সম্প্রদায়ত্রয়কে তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত লোকের সম অবস্থাপন্ন হইতে হইবে। কিন্তু স্বদেশপ্রেম ব্যক্তিগত স্বার্থকে পরাভূত করিল। বহু সংখ্যক সেমুরীসন্তান দেশের কল্যাণ উদ্দেশ্যে মিকাডোর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। একদা তাঁহারা স্বয়ং মিকাডোর নিকট গিয়া এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ মেট্‌সুইডো এই ঘটনার অতি অল্পপূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যেরূপ দুই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তিনিও ঐরূপ প্রণালীতে জাপানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে সম্মত হইলেন। অভিনব শাসন-প্রণালীর সমর্থনে প্রবন্ধ বিরচিত হইয়া অচিরে সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইল; এবং প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকাংশ এই নববিধানের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এই সংস্কারকগণ সোগানের অত্যাচার কাহিনী ও দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া মিকাডোর দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সোগান তৎকালে জেডোনগরের সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। অবিলম্বে সম্রাট্ দরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহার উপর আদেশ প্রচারিত হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঐ আদেশ প্রতিপালন সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এ দিকে তাঁহার বিপক্ষ দল ইউরোপ হইতে বাষ্পীয় রণপোত ও কামান প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সোগানের বিশ্বস্ত সেনানী ঐ সমস্ত লোকের পক্ষাবলম্বন করিয়া জেডোনগরের সুরক্ষিত দুর্গ তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিল। অগত্যা সোগান পলায়মান হইয়া জেডোনগর ও রাজকীয় শাসন-ক্ষমতা পরিত্যাগ করিলেন। কেইটোনগরের কারাগারস্বরূপ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া মিকাডো অবিলম্বে সোগানের রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় হস্তে জাপান-সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। সেমুরীগণের আত্মোৎসর্গ দ্বারা জাপানে এই নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইল। যিনি এই সংস্কারক দলের প্রবর্ত্তয়িতা তাঁহার নাম "আইটো"। তিনি এক্ষণে "মারকুইস" উপাধি লাভ করিয়া জাপান-সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদে সমাসীন আছেন। (ক্রমশঃ।)

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত বি, এল।

যৌবন-সঙ্গীত।

জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র এত পরিসর যে
কে জানিত হায়।
কুসুম তরঙ্গ-ময় অনন্ত সাগর-সম
পূর্ণ সুষমায়!!
আদিহীন অন্তহীন, কেবলি সরস ধরা
ফুল্লকুসুমিত,
নবীন উষার চারু— হাসিমাখা তপনের
কিরণ-চুম্বিত!
অনন্তকর্ম্মের বীজ সাজানো র'য়েছে এথা,
মানস-মোহন,
সময়ে বরষে মেঘ, অচিরে অঙ্কুরে বীজ
করিলে বপন।
এমন আনন্দভূমি র'য়েছে আমার তরে
কে জানিত হায়!
কৈশোরের প্রান্তভাগে, যৌবনের আগমনে,
প্রদীপ্ত আশায়!

ভাবি নাই একদিন এমন আসিবে দিন
কাঁদিব রে হায়,
সম্মুখে অনন্তরত্ন— একা নিতে শক্তি নাই
ভিখারীর প্রায়!
উপরে অনন্ত নভঃ খচিত তারার মালা
শশাঙ্ক-উজ্জ্বল,
নীচে তার অম্বুরাশি দ্বিতীয় অনন্তনভঃ
তরঙ্গ চঞ্চল!
কোথা যাই, কারে দেখি? সকলি ত মনোহর
সকলি সমান,
আকুল ভাবনাভরে কবে ক্ষুদ্র জীবনের
হবে অবসান!
ক্ষুদ্র জীবনের তরে এত কর্ম্ম, এত পথ
কে জানিত হায়!
জীবনের এত লক্ষ্য?—কিছুই ত হ'ল না রে
বুক্ ফেটে যায়।!

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ।

ডাকাতি।

কোথা যে'তে চলেছিল, ছায়া পেয়ে দাঁড়াইল,
কথায় কথায় হেথা বসেছিল দণ্ড চারি।
দেখিতে সুন্দর বেস, নেত্র দুটি নির্নিমেষ
সরল প্রতিভা তার, দিব্যকান্তি ব্রহ্মচারী,
হেলায়ে গাছের মাথা, কাঁপায়ে বাঁশের পাতা
প্রবাসী স্বজন যেন দখিনা মারুত ছলে,
নাচা'য়ে কুন্তল তার, মুছাইয়া স্বেদ-ধার
ঘুচাইয়া পথ-ক্লান্তি, ধীরে ধীরে গেল চলে;
কিছু দূরে কালোপাখী, বকুলের ডালে থাকি,
কলকণ্ঠে কুহুরবে ডেকেছিল প্রাণ খুলে,
দাঁড়ায়ে আঙ্গিনা ধারে, আমি যেন কেন তারে
আনমনে দেখেছিনু, দেখেছিনু ভুলে ভুলে।
অলস নয়নে মোর, এসেছিল ঘুমঘোর,
চমকি চাহিয়া দেখি হয়েছে কি সর্ব্বনাশ।
ঘরেতে হ'য়েছে চুরি, বুকেতে প'ড়েছে ছুরি,
গিয়াছে সর্ব্বস্ব, শুধু র'য়ে গেছে হা হুতাশ।
কোথা চোর কোথা চোর? কোথায় সর্ব্বস্ব মোর
উধাও হইয়া প্রাণ, কেঁদে ফিরে দিবারাতি।
যেথা যাই, যেথা চাই, কিছু নাই কিছু নাই,
পলকে প্রলয় হায়! হয়ে গেছে কি ডাকাতি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

একটি প্রশ্ন।

প্রশ্নের বিষয় জগজ্জননীর 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব'। ইহা বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যিনি এই জগৎ-সংসারের প্রত্যেক পরমাণুতে সচেতন শক্তি অথবা চৈতন্যময়ী দেবতারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি সত্য সত্যই আমাদিগের মাতা। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জননী মাকে যেমন স্নেহমমতার আধারস্বরূপ এক নির্দ্দিষ্ট 'জন' কিংবা 'ব্যক্তি' বলিয়া মনে করি, আমাদিগের সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বময়ী জগন্মাতায়ও কি সেইরূপ কিছু 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' আছে? তিনি কি শুধুই প্রীতিস্নেহ অথবা দয়া ও করুণার একটি সর্ব্বব্যাপি অতল, অপার, অমেয় সমুদ্র, না স্নেহচৈতন্যবিশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি? *

যাহাদিগের প্রাণটা শিশুর মত কোমল, অথচ ভক্তির আনন্দরসে উচ্ছল, তাহাদিগের মনে কখনও এই প্রকার প্রশ্নের অভ্যুদয় হয় না। তাহারা যখন ঊর্দ্ধনয়নে, অনন্ত শূন্যের পানে চাহিয়া, হৃদয়ের দুঃখজ্বালা জ্ঞাপন করে, তখন ঐ শূন্যকেই তাহারা স্নেহকরুণায় পরিপূর্ণ মনে করিয়া থাকে। তাহারা, বিনা উপদেশেও, আপনা হইতেই এতটুকু বোঝে যে, ঐ দিগন্তবিস্তারিত শূন্য শুধুই শূন্য নহে,—যিনি ঐ শূন্যকে ব্যাপিয়া পূর্ণস্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনি তাহাদিগের দুঃখের কথা শুনিতেছেন; এবং সততই সে দুঃখের প্রতিবিধান করিতেছেন।

কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরে ভক্তিমান্, অথচ ভক্তির সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্,—যাঁহাদিগের হৃদয়-নিহিত ভক্তি, সময়ে সময়ে, অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াও, জ্ঞানের নানারূপ কূট-কঠোর-প্রস্তর-ঘাতে গতিপথে বিঘ্নিত হয়, এবং যাহাদিগের জ্ঞান, "শ্রেয়ঃস্থতি ভক্তির" অমৃতস্পর্শে বঞ্চিত হইয়া, অভিমানের সম্মুক্ষণে, উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণে প্রীতিলাভ করে, তাহাদিগের চিত্ত নিরন্তরই এই প্রশ্নের দ্বারা আলোড়িত হইয়া থাকে। তাহাদিগের অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়,—যাঁহাকে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি বলিয়া জানিলাম, তিনি কি শক্তিমাত্র পদার্থ, না শক্তির আশ্রয়রূপিণী পরমা 'ব্যক্তি'?

প্রশ্ন স্বভাবতঃ কঠিন,—মানুষী ভাষার অপূর্ণতা হেতু আরও বেশী কঠিন। মানুষের ভাষা, 'হস্তামলক'বৎ, নিত্যস্পৃষ্ট বস্তু,

* এই প্রশ্ন বান্ধবের "মা না মহাশক্তি?" নামক প্রবন্ধে উত্থাপিতমাত্র হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ উপযুক্তরূপে আলোচিত হয় নাই।

অথবা নিত্যপ্রত্যক্ষ মনুষ্যজগতের কোন ভাব ও কোন পদার্থকেই যখন শব্দের দ্বারা সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারে না; তখন উহা অপ্রত্যক্ষ ও অনন্তব্যাপিনী ঐশী শক্তিকে কিরূপ শব্দে পরিব্যক্ত করিবে? ইহার প্রমাণ—ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা কার্য্য সম্বন্ধে মনুষ্যব্যবহৃত শব্দ নিচয়ের সঙ্কুলার্থতা। মনুষ্য আপনি যাহা জানে না, তৎসম্পর্কে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে—"ঈশ্বর জানেন।" মনুষ্য যখন সবল-সমূহের নিপীড়নে ব্যথিত, অথবা সুহৃৎ স্বজনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় বিপন্ন হয়, তখন সে এই এক কথাই আর্ত্তনাদ-সহকারে পুনঃ পুনঃ বলে,—"ঈশ্বর দেখিতেছেন,—ঈশ্বর প্রতিবিধান করিবেন।"

কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মসম্পাদন, কি আমাদিগের দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মসম্পাদনের মত? আমরা চক্ষের সাহায্য ভিন্ন দেখিতে পাই না, কর্ণের সাহায্য ভিন্ন কিছুই শুনি না; এবং চক্ষুর দৃষ্টি ও কর্ণের শ্রুতি এত অসংখ্য সূক্ষ্মসূত্রিত প্রক্রিয়ায় জড়িত যে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইলেও, আমরা কিছুই দেখি না, কিছুই শুনি না। অথচ, ঈশ্বর এ জগতের সমস্তই সর্ব্বদা সম্পূর্ণ ভাবে ও সমানরূপে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, এবং যাহা শত সহস্র বৎসর পরে ঘটিবে, তাহাও আজি তিনি সম্মুখস্থবৎ দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। এইরূপ আবার জ্ঞানের কথা। আমাদিগের সামান্য জ্ঞান, স্মৃতি, ধৃতি, অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা ও অবান্তর প্রক্রিয়ার অধীন। * ঈশ্বরের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, সর্ব্বময় এবং অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ও এক-ভাবাপন্ন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনই একবৎ, এবং জানিতেন—জানিতেছেন ও জানিবেন প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াপদেরই এক অর্থ।

ঈশ্বর অথবা ঐশী শক্তি সম্বন্ধে দর্শন ও শ্রবণাদি শব্দ যেমন অপূর্ণ, 'জনত্ব' ও 'ব্যক্তিত্ব' শব্দও, ভাষার অপূর্ণতা-নিবন্ধনই, সেই প্রকার অপূর্ণ। আমরা সকলেই আপনাকে আপনি 'এক জন' বলিয়া জানি। এই জ্ঞান, কিবা শিশু, কিবা বৃদ্ধ, মনুষ্য মাত্রেরই স্বাভাবিক। ইহার অল্প মাত্র ব্যত্যয় হইলেই মনুষ্য উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি পার্শ্বে বসিয়া আছেন, তাঁহাকেও আমরা, উক্তবিধ জ্ঞান অথবা সংস্কারের শাসনে, আর 'এক জন' বলিয়া মানি; এবং যাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছি,—যাঁহাকে এস বলিয়া হৃদ-

* জ্ঞানের সহিত অনুমিতি ও উপমিতির কিরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা নৈয়ায়িকদিগের প্রসাদাৎ বঙ্গীয় ভদ্রলোকমাত্রেই কতকটা অবগত আছেন। স্মৃতি প্রভৃতি মনোবৃত্তির সহিত জ্ঞানের অধিকতর নিকট সম্পর্ক। কারণ, পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান স্মৃতিতে সঞ্চিত না থাকিলে, নূতন জ্ঞান উপার্জ্জিত হইতে পারে না; এবং সামান্য মাত্রায় উপার্জ্জিত হইলেও ক্রিয়ান্বিত হয় না।

য়ের সহিত আদর করিতেছি, অথবা যাও বলিয়া, অনাদরের ভাষায়, সান্নিধ্য হইতে দূর করিয়া দিতেছি, তাহাকেও তৃতীয় 'এক জন' বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু, যিনি সমস্ত জগতের জীবনশক্তিরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত, তাঁহাকে এই ভাবে এবং শব্দের এইরূপ অর্থে কেমন করিয়া 'এক জন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিব? তাঁহার কখনও জন্ম হয় নাই, সুতরাং সে অর্থে তিনি 'জন' নহেন। তিনি সকল সময়েই, আমাদিগের অন্তরে বাহিরে,—দক্ষিণে ও বামে,—পুরোভাগে ও পৃষ্ঠ দেশে, আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত; এবং এস অথবা যাও এইরূপ "আবাহন ও বিসর্জ্জনের" অতীত। সুতরাং এ সকল লক্ষণেও, তাঁহাকে আর 'এক জন' বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

পক্ষান্তরে, ঈশ্বর অথবা ঐশী শক্তিরূপিণী জগন্মাতা যদি 'এক জন' না হইলেন, তবে এ জগতে আর 'এক জন' আবার কে? আর আমিই বা কি? যদিও ইহা বুঝি যে, তাঁহাকে আমাদিগের মত আর 'এক জন' বলিলে, তাঁহার অনন্ত ভাব, অনন্ত বৈভব ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য অপরিব্যক্ত রহে, অথবা যার-পর-নাই সঙ্কুচিত হয়, তথাপি আমরা সকল সময়েই ত তাঁহাকে আমাদিগের সাকল্য হইতে একটুকু পৃথক্,—সর্ব্বপ্রকার আশা ও আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় স্থান,—আমাদিগের জীবনের অবলম্ব,—'জনত্বের' মূল ভিত্তি,—আমাদিগের প্রাণের ধন ও প্রাণের 'জন' বলিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করি। ভাবের এইরূপ বিরোধ-স্থলে মানুষের ভাষা কিরূপ শব্দের দ্বারা তাঁহার 'জনত্ব' ব্যাখ্যা করিতে যত্ন পাইবে?

'জন' শব্দ যদি এই সকল কারণে, জগন্মাতার সম্পর্কে অযুক্ত ও অপ্রযুজ্য, তাহা হইলে, 'ব্যক্তি' শব্দ আরও অযুক্ত এবং অধিকতর অপ্রযুজ্য। কারণ, যিনি কখনও মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং মনোবুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট স্বরূপতঃ ব্যক্ত হন নাই,—যাঁহাকে অত্যুচ্চতম জ্ঞানীরাও "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্" বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাতে 'ব্যক্তিত্ব' আরোপণ করিব কি প্রকারে? 'জন' শব্দে জন্য ও জনক উভয়কেই বুঝাইতে পারে, * কিন্তু ব্যক্তি শব্দে যখন ব্যক্ত ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না, তখন সেই অব্যক্তকে কিরূপে 'ব্যক্তি' বলিয়া বর্ণনা করিব? এক অর্থে তিনি এই বিশ্ব সংসারের সমস্ত বস্তুতেই সমানরূপে ব্যক্ত। আকাশের চন্দ্র তারা, অবনীর তরুলতা, জীবদেহের গঠন, এবং জীবনের ক্রম-বিকাশ সমস্তই তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহারই প্রেমের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থস্বরূপ। জগতের সৌন্দর্য্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য, এবং জগন্নিহিত শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্যে তাঁহার শক্তিমত্তা ব্যক্ত রহিয়াছে বটে। কিন্তু মানুষ গ্রন্থ লইয়াই ব্যাপৃত রহে, গ্রন্থকারের পরিচয় পায় কোথায়? সে জগদ্ব্যক্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত এবং শক্তিসান্নিধ্যে বিস্মিত অথবা অভিভূত রহে; সুন্দর অথবা শক্তি-

* জনয়তীতি জনঃ; কর্ত্তরি অচ্।

স্বরূপার ধ্যান ও মননে সাহায্য পায় কৈ? সুতরা, এইরূপ ব্যক্ত ভাব হইতে 'ব্যক্তিত্ব' পরিগ্রহ সহজ কথা নহে।

বাঙ্গালায় 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' বলিলে যাহা বুঝায়, ইয়ুরোপীয় ভাষায় তাহার প্রতিরূপ শব্দ—'Personality',—পার্সন্যালিটি। * ইয়ুরোপের তাত্ত্বিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ, ঐশী শক্তির সর্ব্বময় অস্তিত্বে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়া, এবং সে বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের প্রমাণ সহকারে পরের হৃদয়ে সঞ্চারণ করিবার জন্যও বিশেষরূপে যত্নপর হইয়া ঐ (Personality) পার্সন্যালিটি শব্দে অতি প্রবল আপত্তির ভাব পোষণ করেন। আপত্তিকারিরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন—"God is a *Principle, not a Person*"—ঈশ্বর একটি শক্তিস্বরূপ, তিনি কোন অংশেও নির্দ্দিষ্ট জন কিংবা ব্যক্তিস্বরূপ নহেন। উল্লিখিত (Principle) প্রিন্সিপ্‌ল্ শব্দে কি বুঝায় তাহা বুঝিবার জন্য, বহুকাল হইতে, বহুপ্রকার গ্রন্থপত্রের সাহায্যে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন প্রকারেই কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। ইংরেজি আভিধানিকদিগের ব্যাখ্যা অনুসারে * প্রিন্সিপ্‌ল্ বলিলে কখনও বুঝায় শক্তি, কখনও বুঝায় সত্য, কখনও বুঝায় নিয়ম এবং কখনও বুঝায় বস্তুর উপাদান পদার্থ। তবে এই এক কথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রিন্সিপ্‌ল্ শব্দ কোনরূপেও জনত্ব কিংবা ব্যক্তিত্ব অর্থের দ্যোতক নহে। জল, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ অথবা তাহাদিগের উপাদানভূত অম্লজান ও জলজান প্রভৃতি সূক্ষ্মতর পদার্থসমূহের প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্ পৃথক্ প্রিন্সিপ্‌ল্। মাধ্যাকর্ষণের বিধি, এবং আলোকের গতি ও উত্তাপের সম্প্রসারণী বৃত্তি সমস্তই স্বতন্ত্র প্রিন্সিপ্‌ল্। প্রিন্সিপ্‌ল্ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া একটি সুপরিচিত তাত্ত্বিক নির্ভয়ে লিখিয়াছেন,—

"জীবনের নিয়ম (*Law of Life*) বলিলে কি বুঝিব? উহাই সেই বিশ্বময় সজীবতা অথবা ক্রমবৃদ্ধির বিধিসূত্র। উহার নাম, বৈজ্ঞানিকের ভাষায়,—আকর্ষণশক্তি, এবং ভক্তের ভাষায়—ঈশ্বর।" §

আকর্ষণশক্তি ঐশী শক্তিরই এক মূর্ত্তি ইহা আমরা জানি, এবং যিনি মনুষ্যের

---

* Monier Williams নামক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতে Personality শব্দের অর্থ—Individuality—"ব্যক্তিত্ব"—পৃথগাত্মিকা সত্তা ইত্যাদি। সুতরাং Person শব্দের অর্থ "A living self-conscious being" অর্থাৎ আত্মচৈতন্য-বিশিষ্ট সজীব 'জন'।

* ওয়েবেষ্টার ও অগিলভি প্রভৃতি সকলের অভিধানেই principle শব্দের এক অর্থ, এবং সে অর্থ 'জনত্ব' ও 'ব্যক্তিত্বে'র বিরুদ্ধ।

§ "It is that principle of Universal vitality—that spirit of growth—which scientific men call the law of attraction, and religious people call "God."—H. Willmans.

চিত্তে জগদীশ্বর অথবা জগজ্জননীরূপে চিন্তিত হইয়া থাকেন, তিনিই যে জীবনের জীবন, ইহাও সহজেই বুদ্ধিগম্য হইতে পারে। কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ আকর্ষণশক্তি মাত্র, অথবা আকর্ষণশক্তি তাঁহারই আর এক নাম, এরূপ কথা মনোবুদ্ধির অগম্য। যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই প্রকার জটিল ভাষার আশ্রয় লন, তাঁহারা ঐশী শক্তিতে জ্ঞান, চৈতন্য ও প্রেম প্রভৃতি সকল গুণই স্বীকার করিতে প্রস্তুত; কেবল ঐ পার্শন্যালিটি অর্থাৎ 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' স্বীকার করিতেই একবারে অসম্মত। তাঁহাদিগের এই এক ধারণা যে ঐশী শক্তিতে 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপি ব্রহ্মত্ব একবারে বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু উল্লিখিত লেখকদিগের এইরূপ কথা ভক্তের প্রাণে কিরূপ বজ্রখণ্ডের ন্যায় আপতিত ও অনুভূত হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কারণ, ভক্তের জিজ্ঞাসা ও ভাষা উভয়ই অন্যরূপ। ভক্ত মাত্রই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহার 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' নাই,—যিনি কোন অর্থেও আত্মচৈতন্যবিশিষ্ট 'একজন' নহেন, বুদ্ধি তাঁহাকে বুঝিবার জন্য নিরন্তর চিন্তা করিতে পারে,—কল্পনাও তাঁহার ভাব পরিগ্রহের জন্য, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিগ্‌দিগন্তরে বিহগীর ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে পারে; এবং দর্শন ও কাব্যও পৃথক্ ভাবে অথবা মিলিত প্রাণে, ভাষার বিবিধ লীলাবিলাসে, তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ বিচিত্র কথা কহিয়া মনুষ্যের বিস্ময় জন্মাইতে পারে। কিন্তু হৃদয় তাঁহাকে কি রূপে ভালবাসিবে? ভক্তি কি প্রকারে তাঁহার নাম গাইতে গাইতে নয়নজলে ভাসিবে? আত্মা, তাঁহার মনন-চিন্তনে আকুল হইয়া, কাহার আকর্ষণে, আপনার অভ্যন্তর-স্থিত অন্ধকূপ হইতে উছলিয়া পড়িবে?

মানুষের শরীর যেমন জল না খাইলে রক্ষা পায় না; মানুষের হৃদয়, মন এবং প্রাণও, সেইরূপ, কৃপানিধি অথবা করুণাময়ীর করুণামৃত পান বিনা, মুহূর্ত্তকাল শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই যে সংসারের সকল স্থানেই অহোরাত্র একটা হাহাকার-ভাব, সুখী ও দুঃখী, সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধিহীন, এবং বিলাসী ও সন্ন্যাসী, সকলকেই অতৃপ্তির অঙ্কুশ-তাড়নে, কার যেন অন্বেষণে ব্যাপৃত রাখিতেছে, ইহার কি কিছুই অর্থ নাই? ইহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞানীর চক্ষে অতি গভীর। এ অঙ্কুশ-তাড়না মনুষ্যপ্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠবৃত্তিস্বরূপা ভক্তিরই অপ্রতিহত প্রবর্ত্তনা। তৃষ্ণা যেমন কহিতেছে,—"আমায় জল আনিয়া দাও," ক্ষুধা যেমন কহিতেছে,—"আমায় উপযুক্ত খাদ্য দানে প্রাণে বাঁচাও"; ভক্তিও সেইরূপ, কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে গলিয়া, নিরন্তর কহিতেছে,—"আমায় ভক্তবৎসলার স্নেহময় সান্নিধ্যে লইয়া যাও।" ভক্তির এই জ্বালাময়ী পিপাসা কি কখনও 'জনত্ব'শূন্য জগদ্ব্যাপি বিধি, জাগতিক নিয়ম,—"Principle"—

নিয়ম-সূত্র, অথবা বিধানসূত্রের নীরস-চিন্তনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে?

ভারতবর্ষের ইহা বিশেষ গৌরবের কথা যে, এ দেশের জ্ঞানগুরু ঋষিমনীষী ও জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত ভক্ত উপাসকেরা কখনও জগন্মাতার 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' সংক্রান্ত কূটপ্রশ্ন লইয়া কোন দিনও চিত্তে এই প্রকার বিক্ষিপ্ত হন নাই। তাঁহারা, জ্ঞানের আনন্দস্নিগ্ধ উষালোকেও, এ কঠিন সমস্যার দুই কূল রক্ষা করিয়া,—দুই দিকের অতি সুন্দর সামঞ্জস্যে হৃদয়ে পর্ব্বতের মত দৃঢ় হইয়া, দৃঢ়তার সহিত বলিয়া আসিয়াছেন যে,—"মা এক হইয়াও অনেক, নিগুর্ণা হইয়াও সগুণা, নির্লিপ্তা হইয়াও ইচ্ছাময়ী; একই আধারে জগন্মাতা, জগৎপিতা,—'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্বের' অতীতা,—অথচ সর্ব্বজনে জননী ও সকল গুণের আশ্রয়রূপিণী ভাবে নিত্যসংস্থিতা!" মায়ের এই সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ ভাবের কথা অতি পুরাতন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কিরূপ সরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সকলেই প্রীত হইবেন। উপনিষৎ-প্রবক্তা অন্তর্দর্শী আচার্য্য কহিতেছেন;—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ;
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ,
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি।"*

ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে,—

"সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎসর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।"
"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।"
"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।"
"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।"*

* তিনি দিব্যজ্যোতির্ম্ময় তত্ত্ব এবং সর্ব্বভূতে অতি গূঢ়রূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা—সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অধিনায়ক, এবং সকল জীবের আশ্রয়স্থান। তিনি কর্ম্মের সাক্ষী ও চৈতন্যময়, তাঁহার দ্বিতীয় নাই,—তিনি নির্গুণ।

* সকল স্থানেই তাঁহার হস্ত পদ, সকল স্থানেই তাঁহার মুখ ও চক্ষু, এবং সকল স্থানেই তাঁহার কর্ণ। তিনি এই ভাবে জগতের সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সর্ব্ববিধ গুণকেই আভাসিত করেন; তাঁহার কিছুতেই সঙ্গ নাই এবং কোনরূপ সঙ্গীও নাই। অথচ তিনি বিশ্বম্ভরভাবে সকলের আধারভূত। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে সতত বিদ্যমান, স্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত-স্বরূপ, অথচ সূক্ষ্মত্ব হেতু জ্ঞানের অগম্য, এবং নিকটস্থ হইয়াও দূরস্থ। তিনি ভূতসমূহের কারণরূপে অভিন্ন, অথচ যেন ভিন্নরূপে অবস্থিত। তিনি 'ভূতভৃৎ' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর ভর্ত্তা ও পরিপোষক। তিনিই আবার প্রলয়ে সমস্ত

পুনশ্চ,—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেবচ।"
"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।"*

এই কথাই মার্কণ্ডেয় পুরাণে অধিকতর প্রস্ফুটিত ও সম্প্রসারিত হইয়া এমন একটি হৃদয়হারি স্তোত্রে পরিণত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ সময়ে, বুদ্ধি যেমন তত্ত্বজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ লাভে চমকিয়া উঠে; ভক্তি সেইরূপ পাষাণ-চক্ষু হইতেও দর দর ধারা আকর্ষণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। যথা,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।"
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।"
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।"
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।*"

ঋষিদিগের এইরূপ বর্ণনা যাঁহাদিগের নিকট উদ্দাম ও উচ্ছ্বসিত ভক্তির অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হয়, তাঁহারা নব্য-তান্ত্রিকদিগের অন্যতম-গুরু, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ড্রেসারের লেখা পড়িয়া নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবেন। কারণ, ড্রেসার জগন্মাতার 'জনত্ব' ও জগন্ময়ত্ব এই উভয় সত্যের সামঞ্জস্য উপলক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঋষিবাক্যেরই অনুবাদের মত। যে তত্ত্ব মার্কণ্ডেয় পুরাণে, পৌরাণিক লেখার চিরপরিচিত প্রণালীতে, বহু কথায় ব্যক্ত হইয়াছে, ড্রেসার তাহাই অল্প কথায় কহিতেছেন। যথা,—

"আমাদিগের প্রত্যেকের যে 'জনত্ব' আছে, ঈশ্বরই সেই জনত্বের 'ব্যাপক-জন', অথবা 'দেবাত্মজন'। সুতরাং, তিনি মনোনিহিত চিন্তা, কিংবা চিন্তা যাহা কল্পনা

গ্রাস করেন এবং সৃষ্টির সময়ে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন। তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞান-গম্য; এবং সকলেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

* তিনি এ জগতের পিতা, তিনি মাতা, তিনি বিধাতা, তিনি পিতামহ। তাঁহাকেই জানিতে হইবে এবং তাঁহার সংস্পর্শেই সকলে পবিত্রতা লাভ করিবে। তিনি ওঁকার-প্রতিপাদ্য, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আশ্রয়; তিনিই ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদের উপদিষ্ট আরাধ্য বস্তু। তিনি সকলের গতি, সর্ব্বজন-পালক, প্রভু ও কর্ম্মসাক্ষী। তাঁহার ক্রোড়ে সকলের নিবাস, তিনি শরণ্য, তিনি সুহৃৎ;—তাঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি—তাঁহাতেই লয় ও নিধন, এবং তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অক্ষয় বীজ।

* যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা বলিয়া অভিহিত,—বুদ্ধি ও শক্তিরূপে সংস্থাপিত, এবং মাতৃরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি,—তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি।

করিতে পারে, তাহা হইতেও আমাদিগের অধিকতর সন্নিহিত। আমাদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এই নিমিত্তই চিরকাল অতিমাত্র অন্তর্ঘনিষ্ঠ রহিবে। কেন না, তাঁহার সহিত আমাদিগের পার্থক্য কিংবা প্রভেদ ঘটাইতে পারে, এমন কোন শক্তি নাই।—এমন কোন পদার্থ নাই,—এমন কোনরূপ ব্যবধানও চিন্তিত হইতে পারে না। আমরা এই হেতু, কোন অর্থেই, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহি। *

ড্রেসারের কথা মধুর ও হৃদয়হারি। উহার প্রত্যেক অক্ষর পাঠেই তত্ত্বপিপাসুর মন ও প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু বিখ্যাতনামা ভিক্টর কুসে (Victor Cousin) এতৎ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত জগদীশ্বরের ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ, এবং সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্বময়তা ও সর্ব্বাতীত 'জনক' অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা এখানে কুসের কথার ভাবার্থ সঙ্কলনে যত্নপর হইব। কুসে, তাঁহার স্বাভাবিক উদ্দীপনার তরল তরঙ্গে, বিশ্ববৈভব বর্ণনা করিয়া, পরিশেষে কহিতেছেন,—

"এই বিশাল বিশ্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা ঐশী শক্তির সমস্ত ঐশ্বর্য্য, শুষিয়া শেষ করিতে পারে না। ঈশ্বরের অনেক গুণ বহির্জ্জগতে অতি দুর্ভেদ্য অন্ধকার আচ্ছন্ন রহিয়াছে, অথচ সে সকল গুণ মনুষ্য-প্রকৃতিতে আভাষিত হইয়াছে। ঈশ্বর একই আধারে বস্তু ও বস্তুর কারণ,—সত্তার উর্দ্ধতম ও অধঃস্তন উভয় সোপানে সমান অবস্থিত,—অর্থাৎ একই সময়ে অনন্ত ও সান্ত, এবং আপনাতে আপনি ত্রিবিধ-স্বরূপান্বিত। সুতরাং তিনিই ঈশ্বর, তিনিই পরমা প্রকৃতি, এবং তিনিই সমষ্টিরূপা মানবজাতি। যদি জগতের সমষ্টিকে ঈশ্বর বল, তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বুঝিলে না,—ঈশ্বর মানিলে না। কারণ, এই বহিঃস্থ জগৎ যত বড় হউক না কেন, উহার সীমা আছে, ঈশ্বরের সীমা নাই। জগৎ সসীম, ঈশ্বর অসীম—অনন্ত; এবং আপনার অক্ষয্য অনন্ত বৈভব হইতে আরও অসংখ্য জগৎ, অসংখ্য জীব এবং অসংখ্য প্রকার নূতন বিকাশ উৎপাদন করিবার উপযুক্ত সামর্থ্যে সমর্থ। তিনি এই ভাবে অদৃশ্য অথচ সাক্ষাৎসন্নিহিত,—ব্যক্ত অথচ আত্মনিহিত,—জগদবস্থিত অথচ জগদ্বহির্ভূত,—নিরন্তর প্রকাশমান অথচ

* God is our larger, our diviner self, nearer to us than thought, closer than thought can imagine. His relation to us must ever be intimate, since there is no power, no substance, no space, to seporate us. Therefore we are not, in any sense, apart from Him. We exist with Him in a relationship typified by that of a child in its mother's arms.——Horatio. W. Dresser of America.

অপ্রকাশিত,—ক্রিয়ান্বিত ও ব্যক্তস্বরূপ অথচ অব্যক্ত।*

ভিক্টর কুসের উপরিধৃত সমস্ত কথাই ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভাবানুসারিণী নয় কি ? কিন্তু ভিক্টর কুসে বড় পণ্ডিত হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদৃত নহেন। বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকেরা যাঁহার কথা লইয়া বিশেষ আলোচনা করেন, এবং যাঁহার লেখনীনিঃসৃত প্রত্যেক শব্দকে দেববাক্যের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, সেই ধীরবুদ্ধি হর্ব্বার্ট স্পেন্সার, ধীরে ধীরে,—অর্দ্ধ শতাব্দীর অতি কঠোর চিন্তাশ্রমের পরে, এ প্রসঙ্গে যে শেষ সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছেন, তাহা, ডে্রপারের মত কবিসমুচিত ও কুসের উদ্দীপনাময়ী ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়া না থাকিলেও, অর্থে অতি বিশদ ও গভীর, এবং সত্যের সারল্যে ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সর্ব্ববাদিসম্মত। স্পেন্সার, 'অনন্ত' ও 'জগন্ময়ত্ব' এই উভয় শব্দের অর্থ সম্পর্কে অশেষপ্রকারে বিচার করিয়া, বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—

"The choice is rather between Personality and something that may be Higher." *

স্পেন্সারের কথার অনুবাদ করিলে চলিবে না। তাঁহার এই সারগ্রাহি সিদ্ধান্তের প্রকৃত অর্থ একটুকু প্রশান্তচিত্তে পরিগ্রহ করিতে হইবে। স্পেন্সারের মতে, খনিজ-ধাতব পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুচ্চ মানসিক-শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য পর্য্যন্ত, দৃশ্য জগতের সমস্ত পদার্থই অনাদ্যা পরমার আবির্ভাব অথবা বিকাশের এক একটি স্তর। কিন্তু এই স্তরে স্তরে, যৌগিক সম্পর্কে, কিছু-

* "The Universe itself is so far from exhausting God, that many of the attributes of God are there covered with an obscurity almost impenetrable, and are discovered only in the soul of man.—God is at once substance and cause, at the summit of being, and at its humblest degree, infinite and finite together, triple, in fine; that is, at once God, Nature, and hummanity. To say that the world is God, is to admit only the world, and to deny God. However immense it may be, this world is finite, compared to God, who is infinite; and from his inexhaustible infinitude He is able to draw, without limit, new worlds, new beings, new manifestations. Invisible and present, revealed and withdrawn in himself, in the world and out of the world, communicating himself without cessation, and remaining incommunicable, He is at once the living God and the God concealed."—Victor Cousin.

* হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের আদিসূত্র অর্থাৎ—"First Principles" নামক গ্রন্থের শেষ সংস্করণ।

মাত্র পার্থক্য না থাকিলেও, বাহিরে বড় পার্থক্য। যথা, ধাতব-পদার্থে যেমন জীবনী শক্তির বিকাশ আছে, উদ্ভিদেরও সেইরূপ জীবন আছে। কিন্তু উদ্ভিদের জীবন উচ্চতর, এবং পশুপক্ষীর সজীবতা তাহা হইতেও উচ্চতর। এইরূপ আবার পশুপক্ষীর চৈতন্য আছে, মনুষ্যেরও চৈতন্য আছে। কিন্তু মনুষ্যের চৈতন্য 'জনত্ব'-ধর্ম্মান্বিত এবং সুতরাং শ্রেষ্ঠতর; এবং যিনি ধাতব, ঔদ্ভিদ, জান্তব ও মানব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া জীবনলীলায় বিলসিত রহিয়াছেন, তাহারও জনত্ব অথবা ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু সে জনত্ব ও ব্যক্তিত্ব মানবজাতির প্রতিজন-নিষ্ঠ 'জনত্ব' ও 'ব্যক্তিত্ব' হইতে উচ্চতর—জ্ঞানের অগম্য ও অগম্যায়। সুতরাং জগন্ময়ী অনন্তা, 'একজন' হইয়াও, অনন্তকোটি জনের পৃথক্ পৃথক্ জনত্বরূপ বিচিত্র ভাবের পৃষ্ঠদেশে "পরাৎপর-জন" অথবা পরমাশ্রয়রূপে প্রতিষ্ঠিত; এবং—যেন জন না হইয়াও অসংখ্য প্রকার 'জনত্বে' বিকশিত। এই বাক্যের সহিত ঋষিদিগের সেই,—

"সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা"

—এই মহাবাক্যের কিরূপ আশ্চর্য্য একতা, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠককে বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক। কারণ, ঐ 'সর্ব্বস্বরূপা' শব্দে যদি Pantheism অর্থাৎ অভেদাদ্বৈতবাদ একটুকু অতিরিক্ত মাত্রায় দ্যোতিত হয়, তাহা হইলে 'সর্ব্বেশা' এই শব্দের দ্বারা ভক্তির উপযোগি ভেদ-জ্ঞান অর্থাৎ রামানুজ ও শ্রীগৌরাঙ্গের চিরসমাদৃত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব পরিষ্কাররূপে পোষিত হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত জ্ঞানীর জন্য বিশুদ্ধতম জ্ঞান, এবং ভক্তের জন্য অমৃতের অক্ষয় নির্ঝরস্বরূপ। ইহা যাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হইবে, তাঁহারা বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তিকে জ্ঞানযোগে নিরন্তর চিন্তা করিতে পারিবেন, অথচ তাঁহাকে ভক্তের আকুল হৃদয়ে অহোরাত্র মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণে পরমা শান্তি লাভ করিবেন।

লীলা।

(ক্ষুদ্র উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লীলা, লীলা, মুখ তুলিয়া চাও।

মুক্ত-বাতায়ন-পথে ম্লান জ্যোৎস্নারাশি আসিয়া লীলার শ্বেতশতদলসদৃশ মুখখানা প্লাবিত করিতেছিল। মৃদুমলয়-হিল্লোলে লীলার অবিন্যস্ত কুন্তলপাশ মৃদু দুলিতেছে; সুচিক্কণ ভ্রূযুগ ভাবাবসাদে নিস্পন্দবৎ,

দৃষ্টি স্তিমিত ও প্রশান্ত। পার্শ্বোপবিষ্ট সুনীলকুমার নিমেষশূন্য হইয়া তাহাই দেখিতেছিলেন।

আবেগ-পূরিত গদ্‌গদ কণ্ঠে যুবক ডাকিলেন—

"লীলা, লীলা, মুখ তুলিয়া চাও"

লীলা আনত মস্তক ঈষৎ তুলিয়া স্বামীর পানে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিতেই আবার নুইয়া পড়িল;—লজ্জায় তাহার নির্ম্মল গণ্ড-দেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে ত্রস্ত হস্তে অবগুণ্ঠন আকর্ষণ করিল। যুবক ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন,—

"এ কি স্বভাব তোমার? আজ আমি কোথায় সুদূর প্রবাসে চলিয়া যাইতেছি, তুমি আজও নির্ম্মমতায় আমার ভগ্ন প্রায় হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া দিবে?"

লীলার কপোল বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল; যুবক সাদরে পত্নীর কম্পিত ওষ্ঠে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। আদরে বিহ্বলা স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। সুনীলকুমার বড় আশা করিয়াছিলেন এ চুম্বনের প্রতিদানে বুঝি একটি মোহকর উন্মাদন-চুম্বন লাভ করিবেন; লীলাবতীর এরূপ আচরণ তাহার অসহ্য। বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে যুবক কহিলেন,—

"লীলা! তোমার হৃদয় এত নীরস? এত কঠিন? যেখানে প্রেমের উন্মত্ততা, সেখানে কি লজ্জার বন্ধন এরূপে একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া রাখিতে পারে?"

লীলার প্রাণের ভিতর বড় যাতনা। সে ভগ্ন প্রাণে স্বামীর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল, ক্ষুব্ধ ব্যথিত সুনীল বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া হুতাশের নিশ্বাস ফেলিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যায়, ঘড়ি খুলিয়া সুনীলকুমার দেখিলেন, যাত্রার সময় উপস্থিত। মর্ম্মপীড়িত যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন।

"লীলা! আমার যাত্রার সময় হইয়াছে" লীলা নীরব, নিদ্রিতা। পুনরায় পত্নীর শয্যা-পার্শ্বে ডাকিলেন, "লীলা"—কোন উত্তর নাই; নৈরাশ্যমথিত স্বামী প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন বালিকার অশ্রুজলে বুক মুখ ভিজিয়া শয্যাতল সিক্ত করিতেছে। বিস্মিত সুনীল কহিলেন,—"কাঁদিতেছ কেন?" লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আজ তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, কাঁদিতেছি কেন? আমাদের দাম্পত্যজীবনে তোমায় একটী দিনের তরেও সুখী করিতে পারিলাম না। এ দুঃখ শেলের মত মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত থাকিবে, এ ছার জীবন লইয়া কি করিব।"

"চেষ্টা করিলে পারিতে লীলা। চেষ্টা করিয়াছ কি? তুমি সযত্নে তোমার হৃদয় আমা হইতে দূরে রাখিয়াছ, তোমার নিকট যে প্রশান্ত শান্তির আশা করিয়াছিলাম, তাহার তিল পরিমাণ পাইলেও আজি হৃদয় এ মরুভূমিতে পরিণত হইত না। জীবনে অনেকে অনেক ভুল করিয়া থাকে, আমিও ভুলিয়া এ সর্ব্বগ্রাসি দুঃখে আকণ্ঠ ডুবিয়া

আছি।"—ব্যথাবিকম্পিত স্বরে লীলা কহিল,—

"আমার সংস্পর্শে এত ব্যথা? কেন এ যাতনায় জ্বলিতেছ?

"আর জ্বলিব না লীলা, আর জ্বালাইব না। আমা হইতে দূরে থাকিলে তুমি সুখী হইতে পার, আমার গৃহ এবং অরণ্যে প্রভেদ নাই। আজ চলিলাম, ফিরিব কি না জানি না। পরমকারুণিক জগদীশ্বর তোমায় সুখী করুন।" * * *

মুটের মাথায় ট্রাঙ্ক তুলিয়া দিয়া সুনীলকুমার ষ্টেশনাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুনীলকুমার পাত্রী দেখিয়া বড় আহ্লাদে বিবাহ করিয়াছিলেন। লীলা সুন্দরী, লীলার অমন ভাসা ভাসা সরলতাপূর্ণচক্ষু,—সমস্ত মুখটি ব্যাপিয়া একটি পবিত্র শান্তির ছায়া বিরাজমান,—সুনীলের নিকট বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল। লীলার সমগ্র দেহ লজ্জাজড়িত। লীলার সলজ্জ চরণ বিন্যাস, সেই অতি ধীরে ধীরে কথা কওয়া, দশ জনে বড়ই প্রশংসা করিত। লীলার আরও অনেক গুণ ছিল। কিন্তু লীলা যে ভালবাসিতে জানে না, সুনীলের তাহা স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল। লীলা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সে জানিত স্বামিসেবা—স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, এবং সে ইহা প্রাণপণে পালন করিত। দাস দাসী থাকা স্বত্বেও লীলা, স্বহস্তে স্বামীর পা ধোয়ার জল, তোয়ালেখানা, সাবানটি, যথাস্থানে রাখিয়া দিত,—স্বহস্তে স্বামীর জন্য অন্নব্যঞ্জন তৈয়ার করিয়া সযত্নে আহার করাইয়া, তৃপ্তি পূর্ব্বক প্রসাদ পাইত। এই বালিকা বয়সেই সে দেবদেবীর নিকট স্বামীর মঙ্গলকামনায় মাথা খুঁড়িতে শিখিয়াছিল,—প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় সে স্বামীর রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া দিবা রাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীর শুশ্রূষা করিত। স্বামী কোন আদরের কথা বলিলে, সে লজ্জায় ছুটিয়া পলাইত। প্রভাতে নিদ্রিত স্বামীর প্রশান্ত মুখ প্রতি চাহিয়া, আপনার ক্ষুদ্রতায় সে যেন মরিয়া যাইত। ভক্তসেবক যেরূপে দেবতার চরণে প্রণত হইবার সময় শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসার উচ্ছ্বাসে অধীর হয়, লীলা সেরূপ স্বামীকে প্রণাম করিতে গিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসায় বিভোর হইয়া উঠিত। সে জানিত স্বামী ভিন্ন এ পৃথিবীতে, তাহার আর পূজ্য এবং ভালবাসিবার কেহ নাই। তাই সে সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। সে জানিত না যে, এরূপ স্বামিসেবা করা ব্যতীত আর কোনরূপে স্বামীর হৃদয়ে সন্তোষ জন্মাইতে পারে; স্বামীর আদরের, প্রেমের, প্রতিদানে তাহাকে বাহুবেষ্টিত করিয়া সোহাগে চুম্বন করিতে সে জানিত না। সযত্নে তাম্বুল রচনা করিয়া সে শয্যা পার্শ্বে রাখিয়া দিত,—কথনও ভাবিত না তাহা স্বামীর মুখে তুলিয়া দেই। কিন্তু সুনীলকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ নব্য শিক্ষিত যুবক। সে কত শ্রেষ্ঠ

লেখকের নভেল পাঠ করিয়াছে! এক একটি স্ত্রীচরিত্র কত সুন্দর। সেই নভেলের নায়িকামূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে এমনি একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, সুনীল কিছুতেই লীলাকে লইয়া সুখী হইতে পারিল না। "লীলাকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই প্রেমের উচ্ছ্বাস কই? লীলা ত সেরূপ প্রেম-মদিরাময় আঁখিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকে না, লীলা ত আবেগে উচ্ছ্বাসে ভাবালস অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দেয় না? সেই প্রেম-সম্বোধন কোথায়? লীলা আমার হৃদয়ের গভীরতা, আমার এ প্রাণভরা প্রেম, এই পিয়াসাপূর্ণিত অধীর ভালবাসা বুঝিতে পারে না। নতুবা যদি আমি তাহাকে আদর করি সে প্রতিদান না করিয়া ছুটিয়া পলায় কেন? তাহাকে বক্ষে ধরিয়া রাখিতে চাই, সে দূরে সরিয়া যায় কেন? মানিলাম সে বড় লজ্জাশীলা; প্রথম জীবনে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গে নাই, আজ একবৎসর দূর-স্বপ্নের মত চলিয়া গেল, এখনও কি ছাই লজ্জা দূর হইল না? অথবা যেখানে গভীর ভালবাসা সেখানে ও কি লাজের বন্ধন, এমন একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া রাখিতে পারে? যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, ভালবাসা নাই, সে ভালবাসিবে কিরূপে? কেন সুন্দর দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম? আজ এতদিন সাধিয়া কাঁদিয়া লীলার মন পাইলাম না, ছার এই সৌন্দর্য্য লইয়া কি করিব।"

এইরূপ শত চিন্তায় সুনীলকুমার এই তরুণ যৌবনে হৃদয়ে শতবৃশ্চিক দংশন যাতনা অনুভব করিতেন। অনেক সময় লীলার সম্মুখে এরূপ দুই একটি কথা বলিলে, লীলা নীরবে কাঁদিত, নির্জ্জনে ভাবিত, "আমি কেন ওঁর যোগ্য হইলাম না, আমি তাঁহাকে আর কি দিয়া সুখী করিব, আমার বলিতে যাহা ছিল সকলই ত দিয়াছি। বিধাতা আমার হৃদয় এত ক্ষুদ্র করিয়া গড়িয়াছিলে কেন? বুঝি তিনি যাহা চাহেন, তাহা আমার হৃদয়ে নাই, নতুবা আমি দিতে পারিব না কেন? তিনি দেবতা, আমি দাসী; আমার যোগ্যতা নাই বলিয়া, কেন আর একটি সেবিকা গ্রহণ করুন না, তাহা হইলেও তো তাহার শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল দেখিতাম। আমি তাঁহার সহাস্যমুখ দেখিলে আপনাকে জগতের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী মনে করিতে পারি, সে সুখ আমার ভাগ্যে ঘটিল কই"? ইত্যাদি আরও কত কথা লীলার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর পরতে পরতে জাগিয়া উঠিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে স্বামীকে কিছুই বলিতে পারিত না। সুনীল লীলার নিকট এরূপ একটি কথা শুনিলেও বোধ হয় দুই জনে সুখী হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বড় অশুভ ক্ষণে সুনীলকুমার ও লীলার শুভদৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। এরূপে এক বৎসর আরও এক দুই করিয়া সপ্তম মাস অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গেল। সুনীলের হৃদয় ক্রমেই গৃহের প্রতি বড়ই বিদ্বেষভাবাপন্ন ও বীতস্পৃহ হইল।

দেশ-ভ্রমণ-চ্ছলে গৃহ পরিত্যাগের সংকল্প স্থির হইল। লীলা এ সংবাদ শুনিয়া প্রাণের ভিতর কাঁপিতে ছিল। কি এক অশুভ আশঙ্কায় তাহার হৃদয় পূর্ণিত হইতে লাগিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। কত দেবতার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া ভাবিল, তিনি কিছু দিন বিদেশে থাকিলে যদি শরীর সুস্থ হয়। ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হৃদয়ের সেই কাল মেঘ টুকু কিছুতেই যাইতে চায় না। তাহার সুনীলকে ছাড়িয়া দিতেও প্রাণ চাহে না, ভাবিল "আমিও সঙ্গে যাই, এখানে বাড়ীর প্রাচীনা ঝি অমলা থাকিলে আর কোনও অসুবিধার কারণ থাকিবে না।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া লীলা স্বামীকে একথা বলিতে পারিল না। সুনীলও এবার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিবে স্থির; লীলাকে সঙ্গে লইতে কোন আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। মিথ্যা আশায় সকলকে প্রলুব্ধ করিয়া যাত্রার উদ্যোগ হইল, সেই রাত্রে লীলাকে কাঁদাইয়া মর্ম্মপীড়িত দুঃখক্লিষ্ট যুবক গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ ভ্রমণে চলিয়া গেলেন।

* * *

নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় নিরাশ যুবতী ভগ্ন হৃদয় লইয়া কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লীলার রুদ্ধ দুয়ার ঠেলিয়া বাড়ীর প্রাচীনা ঝি অমলা ডাকিল।

"মা, মা, উঠ মা।"

"এই যাই মা।"

"একি মা! অমন করিয়া ধুলি মাটিতে শুইয়া আছ কেন?" বাছা সুনীল কাল চলিয়া গেল, আজ মা তুমি একটু সিঁদুর পর, একখানা ভাল কাপড় পর, একি অমঙ্গলের চিহ্ন? কাঁদিতেছ কেন মা? এই কয়দিন ঘুড়িয়া ফিরিয়া শরীর একটু সারিলেই সুনীল ঘরে ফিরিয়া আসিবে। কত বলিলাম সঙ্গেও নিলে না। এস মা এস, ঘরের লক্ষ্মী কি অমন করিয়া ধুলায় লুটায়? বৃদ্ধা লীলার হাত ধরিয়া তুলিয়া নিল, সযত্নে সেই আলুলায়িত ঘন নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলের রাশি লইয়াসুন্দর কবরী রচনা করিয়া সিঁন্দুরে সীমন্ত রঞ্জিত করিয়া দিল।

* * *

লীলা কলের পুতুলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রাণ যেন কি চায়, পায় না, কি যেন শান্তি ছিল, এখন আর নাই; কি যেন প্রেমের জগতে আজ লীলার জন্য মহাবিপ্লব উপস্থিত। সুনীল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী সকলই যেন আজি ম্লান দৃষ্টিতে লীলার পানে তাকাইয়া আছে। সুনীলের শয়ন গৃহ, যাহা লীলার নিকট প্রত্যক্ষ দেবতার আবাসভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইত, আজি তাহা অত শূন্য অত নীরব কেন? লীলা তাহার পানে চাহিয়া চোখের জল রুদ্ধ করিতে পারে না। প্রাণের ভিতর কি যেন হু হু করিয়া উঠে। হৃদয়ের ব্যথায় লীলা সেই কক্ষতলে লুটাইয়া থাকে। তাহার প্রাণ রহিয়াছে,

প্রাণের সঞ্জীবতা চলিয়া গিয়াছে; দেহ রহিয়াছে, সুষমা ঝরিয়াছে; আলাপি তার অর্দ্ধ পথে শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; দিনে দিনে, পলে পলে, জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হইতেছে। একে একে দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল, তিনি ত আসিলেন না। কি অপরাধে এ স্ফুটিত বয়সে হৃদয়ে উন্মত্ত বাসনার স্রোত লইয়া, আমাকে বিষাদিনী সাজিতে হইল। সেই বিজন-বিদেশে তিনি কেমন আছেন? স্বামিন্, তুমি আমার হৃদয় বুঝিতে চাহিলে না; অনাদরে হেলায় দলিয়া চলিয়া গেলে; আমি যে তোমা বই আর কিছু জানি না। এই নবীন ফুল্ল জীবনে নির্ব্বাসন দণ্ড স্বইচ্ছায় মস্তকে তুলিয়া লইলে। জগতে সেবিকার অভাব কি নাথ। তুমি মনোমত কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া ফিরিয়া এস, তোমার পদস্পর্শে আমার এ মলিন গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক; তোমার দর্শনে আমার মরুসদৃশ হৃদয় রসসিক্ত হইবে। জানি না তোমার প্রাণে কি যাতনা দিয়াছি। অজ্ঞানকৃত অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই? দেবতা কি এতই নিষ্ঠুর? তোমার লীলা শুধু তোমারই পথ চাহিয়া এ দুর্ব্বহ জ্বালাপূর্ণ ভগ্নহৃদয়, আজও কত যত্নে তুলিয়া রাখিতেছে। আমার সঙ্গীতে বিশ্ববীণা বাজিয়া উঠিত না; আমার কুসুমে তীব্রজ্যোতিঃ খেলিত না, আজি আমার সঙ্গীত-গন্ধ ফুলরাশি ঝরিয়া পড়িতেছে, দুর্ব্বল হৃদয় বুঝি অত সহিতে পারিবে না। হায়! লীলাময় বিধাতঃ, তোমার নিয়তি আমি ক্ষুদ্র অবলা কিরূপে বুঝিব? তুমি তাঁহার মনে শান্তি দাও, তাঁহাকে সুখী কর।"

লীলা শয্যায় বিলুণ্ঠিতা হইয়া অশ্রুজলে শয্যা সিক্ত করিতে লাগিল।

"সই, ও সই, আমার কথা শুনিবি না, দিন রাত কত কাঁদিবি? শরীরের পানে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি?"

বোসেদের বধূ সুভালতা লীলার বাল্যসখী।

"কি দেখিব সই, এ ছাই শরীরের বোঝা আর কত দিন বহিব?"

"ছিঃ ও কথা বলিতে নাই, করুণাময় তোর ন্যায় সতী লক্ষ্মীর প্রাণে ব্যথা দিবেন না, এখন আমার কথা শুনিবি না?"

সুভা দুই হাতে লীলার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ধরিল, লীলা সুভার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল, অজ্ঞাতে সুভার গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

"আর কাঁদিও না সখি, একখানা চিঠি লিখিয়া দাও।" লজ্জায় লীলা অধর দংশন করিল, চিঠি লিখিবে কেমন করিয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে লীলা ইহার অসম্ভবতা অনুভব করিতে লাগিল। ছিঃ তিনি কি ভাবিবেন? তাড়াতাড়ি জিভ্ কাটিয়া লীলা কহিল, "চিঠি লিখিয়া কি হইবে সই? আর সে তো পারিব না, বোন্।"

সুভা লীলার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল।

"কাঁদিতেই শিখিয়াছিলি, আর কিছু পারিবি না, তবে এখন উপায় কি? এরূপে আর ক'দিন বাঁচিবি বোন? তোর কথা

ভাবিয়া ভাবিয়া আমি যে অধীর হইয়া যাই।"

মৃদুহাস্যে লীলা কহিল,

"সইএর বড় কোমল প্রাণ, আমার জন্য আবার ভাবনা কিলো?"—

"বউমা, কোথায় গেলে?"

"এই যাই মা।"

উভয়ে উভয়কে দৃঢ় আলিঙ্গন করিল। সুভা লীলার গণ্ডে একটি চুম্বন করিয়া চলিয়া গেল।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এক দিন দুই দিন করিয়া ক্রমে বর্ষ চলিয়া গেল। সুনীলকুমার ভাবিতে লাগিলেন, "আশা ছিল, প্রবাসে শান্তি পাইব, কিন্তু সে সুখশান্তির আভাস বুঝি এ জীবনে পাইব না। আজ এত দিন লীলাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু লীলার বিহনে সুখী হইতে পারিলাম কই? সেই মিলন-সুধাবেশ-বিহ্বলা রজনীতে প্রাণের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া এই সুদূর জনহীন প্রবাসে চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু লীলার ন্যায় কল-কল্লোল-বিহীন সরল প্রাণস্পর্শী স্নিগ্ধ ভালবাসা ত আর কোথায়ও পাইলাম না। কি মোহে বিজড়িত হইয়া সোণার কুসুম লীলাকে পায়ে দলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। এখন সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু একান্ত পতি-প্রেম-নিরতা বিশ্বস্ত হৃদয়া লীলা আমার আজি কোথায়? এত দিন আমার বিহনে বিরহে বিরাগে আজ ও কি আমার প্রতীক্ষা করিতেছে? বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই, একবার চাহিয়া দেখি নাই, সে অন্তঃসলিলা ফল্গু একস্রোতে নীরবে আমাকে ধ্রুবলক্ষ্য করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, আমা হেন নির্ম্ম-মের করে সে রত্নের আদর হইল না।" এই-রূপ নানা চিন্তায় সুনীলকুমারের প্রবাস-জীবন বড়ই তিক্ত হইতেছিল। সুনীলের বাল্যবন্ধু ললিতকুমার ব্যতীত এই খুলনা প্রবাসে শান্তির স্থান আর কোথায়ও ছিল না। দুই বন্ধুতে গল্প করিয়া ভ্রমণ করিয়া সুনীল অনেকটা প্রকৃতিস্থ থাকিত। এখন সুনীল বুঝিয়াছে, লীলা তাহার স্ত্রী, লীলা তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে, লীলার ভালবাসা অসীম, অনন্ত, সেই অনাবিল প্রেমের সম্মুখে বুঝি সুনীল অতি ক্ষুদ্র। এক বর্ষ শত ঘাত প্রতিঘাতে সুনীল লীলার এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছে, লীলা হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি শতমূর্ত্তিতে তাহার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুতাপ আত্ম-গ্লানিতে আজি এক বর্ষ পরে, সুনীলের হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। "কিন্তু এই এক বর্ষ পর লীলাকে কি লিখিব, লীলা যদি জগতের মোহ ছিন্ন করিয়া সেই অমরধামে মহাপ্রয়াণ করিয়া থাকে? তবে কাহার হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া এ দগ্ধ বক্ষ জুড়াইব? সে অভাগিনী বালিকা এক দিনের তরেও আমার হৃদয়ের প্রেম ভালবাসা লাভ করিতে পারে নাই। নীরবে ফুল ফুটিয়াছিল, নীরবে আমার তীক্ষ্ণ আঘাতে বুঝি অকালেই ঝরিয়া পড়িল।" সুনীল ট্রাঙ্ক খুলিয়া অতি জীর্ণ পুরা-

তন ফটোচিত্র তুলিয়া লইল। সেখানি লীলার বহুদিনের অস্পষ্ট চিত্র। আজি যেন জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া সুনীলের নেত্র সম্মুখে উদিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুনীলকুমার আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। লীলা সুন্দরী; কিন্তু কখনও ত তাহাতে এমন প্রাণস্পর্শি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় নাই। বসন্ত মুখরিত, পিক কুহরিত, শুভ্র চাঁদিনীর রাত্রে যখন সুনীল সোহাগে পত্নীর কবরীতে পুষ্পস্তবক গুঁজিয়া দিয়াছিলেন, সেই চন্দ্রালোকিত নিশায় যখন প্রেমোন্মত্ত সুনীল লীলার গণ্ডে চুম্বন করিয়াছিলেন, লীলার সেই লজ্জা-রাগ-রঞ্জিত মুখের জ্যোৎস্নাভাসিত সৌন্দর্য্যও সুনীলের মনে জাগিয়া উঠিল। সে কতদিনের স্মৃতি; দিন পুরাতন হয়, স্মৃতি পুরাতন হয় না। সে দিনও সেই যৌবনের প্রথম বিকাশে তাহার লীলাকে এত সুন্দর দেখায় নাই। আজি সুনীলের বোধ হইতে লাগিল, যদি জগতে সুন্দর নির্ম্মল পবিত্র কিছু থাকে, তবে সে লীলা; যদি জগতে দেখিবারও আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকে, তবে সে লীলা। লীলা যেন বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কোকিল কূজনে লীলার কণ্ঠস্বর, পর্ব্বতের উচ্চতায় ও মহৎ ভাবের সঙ্গে লীলার প্রেমের শ্রেষ্ঠভাব বিজড়িত হইয়া আছে। কিন্তু, হায়, তাহার সেই প্রেম-রূপিণী লীলাকে কি আর একটিবার দেখিতে পাইবে না? এ নশ্বর জগতে কি কিছুই চিরস্থায়ী হইতে পারে না? চিরস্থায়িত্বের সম্বন্ধে মরজগতের সকল জিনিসে এ দারুণ অভিশাপ লাগিয়া আছে কেন? সুনীল আর ভাবিতে পারিল না। মর্ম্মযাতনায় কক্ষমধ্যে অস্থির পদচারণা করিতে লাগিল।

ইতি মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুনীল ব্যস্ততাসহ ললিতের হাত ধরিয়া বসাইলে, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিত সুনীলের হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিলেন। সুনীল দ্রুতহস্তে তাহার ভাজ খুলিয়া দেখিলেন,—

শ্রীচরণেষু—

অতি শৈশবে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আপনি গ্রামসম্পর্কে আমার ভ্রাতা। শুনিলাম আমাদের এ পাড়ায় সুনীলকুমারের সহিত আপনার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। তাঁহার গৃহ পরিত্যাগের পর আমরা কোনও সংবাদ পাই নাই। সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী লীলাবতী সংক্রামক রোগে শয্যাগতা। আপনি বোধ হয় সুনীলকুমারের সংবাদ পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে জানাইবেন,—যদি পত্নীকে দেখিতে ইচ্ছুক থাকেন, অবিলম্বে এখানে আইসেন। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। ইতি

সুভালতা।

চিঠি পড়িতে পড়িতে সুনীলের মুখে যাতনা-পূরিত জ্বালাময়ী বেদনা প্রতিভাত হইয়া উঠিতেছিল।

ললিত বলিল,—

"সুভা আমার ভগিনী এবং তোমার পত্নীর সহিত সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এখন কি স্থির করিলে? অদ্যই গৃহাভিমুখে চলিয়া যাও"।—

সুনীল ভগ্নস্বরে কহিল,

"ভাই, আর কি লীলাকে দেখিতে পাইব? হা জগদীশ্বর!" ললিতকুমার প্রবোধ বাক্যে সুনীলকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল।—

* * *

সেই দিন রাত্রিতে উৎকণ্ঠিত হৃদয় লইয়া সুনীলকুমার ট্রেনে আরোহণ করিল।

৫ম পরিচ্ছেদ।

"হে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত চিরদয়িত এস, তৃষিত বক্ষ, হৃদয় পিপাসিত।"

অন্তিম নিশ্বাসে লীলা তাহার আরাধনার সর্ব্বস্ব ধনকে আকুল স্বরে ডাকিতেছে।

ক্ষীণ, ক্লিষ্ট স্বরে লীলা পুনরায় কহিল,—"দিদি, ইহজীবনে তাঁহাকে আর একবার দেখিতে পাইলাম না। বড় সাধ ছিল দেবতা চরণে এ দেহ-হৃদয় অর্ঘ্যরূপে ঢালিয়া দিব, কিন্তু আর বুঝি সে আশা পুরিল না।"

লীলার বিশীর্ণ গণ্ডে বর্ষার ধারা গড়াইয়া পড়িল। নবীনবসন্তে আশাভরা প্রাণ লইয়া মুকুল ঝরিয়া পড়িতেছিল, কে জানিত এই নবীন যৌবনে লীলার এই শোচনীয় পরিণাম হইবে। উথলিত শোকাশ্রু অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া সুভা অঞ্চলে লীলার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া কহিল,—"আজ এ কথা কেন সখি, জগদীশ্বর করুণাময়, তুমি আরোগ্য লাভ করিয়া স্বামীর স্নেহাদরে আবার তেমনি হাসিয়া উঠিবে।"

"না সখি, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এ জগতে আর থাকিতে পারিব না। বিশ্বপিতা আমায় ডাকিতেছেন। আজি বুঝি শেষ দিন। সখী আমার বিছানায় ফুলের রাশি ঢালিয়া দাও। কুসুমে কুসুমে গৃহ সুরভিত হইয়া উঠুক। আজি আমার দেবপূজার নিশি প্রভাত হইতেছে। হে দয়াময় বিধাতা, ইহ জন্মের শেষ একটিবার যেন দেখা পাই।"

ক্লান্ত হইয়া লীলা ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। সুভা আকুল হইয়া লীলার পার্শ্বে ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিল।

সেই মুহূর্ত্তে পাগলের ন্যায় রুক্ষকেশ, মলিনবদন সুনীলকুমার বেগে গৃহপ্রবেশ করিলেন।—

"কোথায় লীলা, প্রাণের লীলা, আমি আসিয়াছি।" সে স্বর সে আহ্বান চকিতে লীলার প্রাণে প্রবেশ করিল। শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া চলিল। লীলা ক্ষীণহস্ত আবেগ ভরে প্রসারিত করিয়া দিল। সুনীল উন্মত্তের ন্যায় দুই বাহু বাড়াইয়া লীলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বক্ষে বক্ষ স্পর্শ হইল। লীলার দেহ শিহরিত ও বিকম্পিত হইতেছিল। সে মোহ ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই অনন্ত নিদ্রালসে নয়ন মুদ্রিত হইল।

* * *

লীলার সেই নিষ্প্রভ চক্ষু তখনও যেন আবেগভরে ডাকিতেছে ——

"হে আমার চির আকাঙ্খিত, চির-দয়িত এস।"

শৈলজা সুন্দরী দত্ত।

চাতক আর চকোর।

এ দেশের গীতিসাহিত্যে, চকোর ও ভ্রমরের নাম, গীতের একই চরণে, অতি সুচারু ভঙ্গীতে গাঁথা আছে। যথা, ব্রজ-বিলাসিনী শ্রীরাধিকার চন্দ্রমুখ অথবা মুখারবিন্দ দর্শনে, চকোর ও ভ্রমরের বিসংবাদ-প্রসঙ্গে—

"চকোরে ভ্রমরে লাগিল দ্বন্দ্ব,
কেউ বলে কমল, কেউ বলে চন্দ"

বিসংবাদের কথা বটে। কেন না, সে ভাব-ঢল-ঢল ভুবনমোহন মুখ-খানিরে কমল না বলিলে, উহাতে ভ্রমরের কোনরূপ অধিকার পঁহুচে না ; আর, চন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, চকোরের প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না।

কিন্তু, যদিও চকোর আর ভ্রমর, এইরূপ প্রণয়স্তুতির বাদ-বিবাদ-প্রসঙ্গ-রঙ্গে, একই গীতে, এক সঙ্গে, উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি উহারা, এক এজলাসে, এক মজলিসে, একত্র বসিবার যোগ্য লোক নহে। কেন না, উহারা চারিত্রসম্পদে পরস্পর অতি বড় পৃথক্। যদি চরিত্রের উৎকর্ষ ও উচ্চতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, এক শ্বাসে, রস-স্ফুরণের একই উদ্দেশ্যে, নাম উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে, পতঙ্গ ও বিহঙ্গের মধ্যে, এক মাত্র চাতকের নামই চকোরের সহিত উল্লেখ-যোগ্য।

পতঙ্গ ও বিহঙ্গজাতির অনেকেই কবি-কল্পনার উদ্দাম-বিলাসে, কাব্যসাহিত্যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। রামজানকী, রাধা-কৃষ্ণ, বৎসরাজ ও সাগরিকা, এবং দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কথা ছাড়াও কাব্য হইতে পারে। কিন্তু পতঙ্গের মধ্যে নিবিড়-কৃষ্ণ ও নয়ন-শ্রুতিমোহন ভ্রমর, এবং বিহঙ্গের মধ্যে "মনস্বিনী-মান-বিঘাত-দক্ষ," চুত-মুকুল-ভক্ষ, কষায়কণ্ঠ কোকিলের কথা ছাড়া কাব্য হইতে পারে কি না, তাহা বড় গভীর সংশয়ের বিষয়।

কালিদাস, সীতা-শোক-বিহ্বল শ্রীরাম-চন্দ্রের মারুতিদৌত্য মনে রাখিয়া, ভুবন-বিখ্যাত মেঘদূত কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মেঘদূতে, রাম-নাম উচ্চারণ সময়ে তাহার জিহ্বায় যত না জল আসিয়াছে, তাহা হইতে বেশী জল আসিয়াছে, ভ্রমরের নাম উচ্চারণ, এবং ভ্রূলতা-বিভ্রম-বিনোদিনী "দশপুর-কামিনীর" কুটিল-কটাক্ষমালার সহিত মৃদুসমীর-সঞ্চালিত কুন্দ-কুসুম-সৌম্য-লোভিত শ্যামল ভ্রমর-পংক্তির সাদৃশ্য প্রদর্শনে। * ভ্রমর, কুমার-সম্ভবের

* তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণশারপ্রভাণাং
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতুহলানাম্॥

অলৌকিক চিত্রেও, এক জন গণ্য মান্য ব্যক্তি। কিন্তু সেখানে, গভীর-যোগমগ্ন ব্যোমকেশের যোগভঙ্গরূপ জগত্তয়াবহ ব্যাপারে, কোকিল যতটা সহায়তা করিয়াছে, ভ্রমর তত সহায়তা করিয়াছে কি না, তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না।

ভ্রমর আর কোকিল এইরূপ মহাপুরুষ অথবা মহাকবিদিগের দ্বারা সাহিত্যে এত সম্মানিত হইয়াও, চকোরের সহিত একাসনে বসিবার অযোগ্য, এ কথার অর্থ কি? যাহারা কাব্যশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের কঠোর চক্ষে পরীক্ষা করিতে ভালবাসেন, আমার উল্লিখিত কথার প্রকৃত অর্থ তাঁহারাই ভালরূপে পরিগ্রহ করিতে পারিবেন।

ভ্রমরের একগুণ উহার বর্ণের চিক্কণ কালিমা, আর এক গুণ উহার গুণ-গুণ গুঞ্জন। কিন্তু আকারে ও কণ্ঠস্বরে এত গুণ থাকা সত্বেও ভ্রমর কবিসমাজে চির-নিন্দিত, —ভদ্রতার বিচারে চিরকালই একান্ত ধিক্কৃত। কারণ, ভ্রমর চিত্তে চপল, চরিত্রে ছলনাপরায়ণ ও দুর্ব্বল; এবং অনুরাগে, পবিত্রতা ও একাগ্রতার অভাবে, আত্মপরভেদ-শূন্যতা-হেতু, যার-পর-নাই চঞ্চল। ভ্রমরের ভালবাসা ভালবাসার জঘন্য বিড়ম্বনা। উহার ভালবাসায় কোন দিনও স্থিরতা নাই,—ভাল-মন্দ-বিচার নাই; এবং যদিও সময়, সুবিধা ও সুযোগ মতে সে চন্দ্রপ্রতিম দুর্ল্লভ বস্তুকেও স্ফুট-কমল বলিয়া দাবি করিতে প্রস্তুত, তথাপি কণ্টকাকীর্ণা কেতকীতেও তাহার পরিণামচিন্তাজনিত বিরতি অথবা ভদ্রোচিত ভীতি নাই।

বস্তুতঃ, ভ্রমর কবিতায় যে মাত্রায় আদর পাইয়াছে, তাহা হইতে অনেক বেশী নিগ্রহ, লাঞ্ছনা ও ন্যাকার ভোগ করিয়াছে। ইহার নিদর্শন ভ্রমরাষ্টক প্রভৃতি বিবিধ নিকৃষ্ট কাব্য। আমি ভ্রমরাষ্টকের দুই তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক ইহা পড়িলেই বুঝিতে পাইবেন যে, ভ্রমরকে কালিদাস প্রভৃতি বড় কবিরা, সৌখীন বড় মানুষের মত, সমাদর করিয়া থাকিলেও, নিম্নশ্রেণির কবিবৃন্দ উহার উপর গালি-মন্দ উৎসর্গ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যথা—

"গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা,
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত,
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈশ্ছিন্নপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ।"

"গন্ধাঢ্যাং নবমল্লিকাং
মধুকরস্ত্যক্তা গতো যূথিকাং,
দৈবাত্তাঞ্চ বিহায় চম্পকবনং পশ্চাৎ সরোজঙ্গতঃ
বদ্ধস্তত্র নিশাকরেণ বিধিনা ক্রন্দত্যসৌ মূঢ়ধীঃ,
সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদং
প্রাপ্নোতি মূঢ়ো জনঃ।"

"পলাশকুসুমভ্রান্ত্যা শুকতুণ্ডে মধুব্রতঃ
পতত্যেষ শুকোঽপ্যেনং জম্বুভ্রান্ত্যা জিঘাংসতি।"

অর্থাৎ,—গন্ধে আমোদিত, ভুবনবিদিত কেতকী, আপনার সোনার বর্ণে বনভূমি উজ্জ্বল করিয়া, ফুটিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ স্ফুটিতপুষ্প কেতকী, না কমল, তাহা একবারও তাকাইয়া না দেখিয়া, মধুলুব্ধ ভ্রমর ফুলের মধ্যে যাইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে।

ভ্রমরের এখন বড় বিপত্তি। কারণ, বন-শোভিনী কেতকীর কাছে মধু অপেক্ষা ক-ণ্টক এবং কঙ্করচূর্ণ-প্রতিম কুসুমরেণুরই সঞ্চয় একটুকু বেসী। ভ্রমর, সেই কুসুম-রেণুতে অন্ধীভূত এবং কণ্টকে ছিন্ন-পক্ষ হইয়া, কেত-কীর পদপ্রান্তে পড়িয়া আছে। সে না পারে উড়িতে, না পারে চক্ষের ক্লেশযন্ত্রণায় মুহূর্ত্তকাল সেখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে। ভ্রম-রের এ বিড়ম্বনা দেখিয়া কবি একটুকু হাসিবে না কি?

আর একদিন ভ্রমর, নবমল্লিকার সুরভি-নিকুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া, যূথিকার কাছে যাইয়া ক্ষণকাল গুণ্ গুণ্ করিল। কিন্তু সেখানে তাহার ভাল লাগিল না। তাই প্রথমতঃ চাঁপার কাছে, তার পর পদ্মের সান্নিধ্যে যাইয়া, পুনরায় গুণ্ গুণ্ আরম্ভ করিল। পদ্ম সমৃদ্ধপরিজন। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই পদ্মের প্রমোদ-নিকেতনে পাহা-রার ঘড়ি বাজে। ভ্রমর পদ্মের নিকট গুণ গুণ গুঞ্জন আরম্ভ মাত্র করিয়াছে; এমন সময়ই নিশাকরের আদেশে বাহিরের কপাট বন্ধ হইল। ভ্রমর "ফাটকে-আটক" হইয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যা-হার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, এমন গণ্ডমূর্খকে কবি দুটো কথা বলিয়া উপদেশ দিবে না কি?

ভ্রমর, সেখান হইতে প্রভাত-সময়ে কষ্টে সৃষ্টে মুক্তি পাইয়াও, বুদ্ধির দোষে শান্তি লাভ করিল না। পদ্মবনের একপ্রান্তে রক্ত-তুণ্ড শুক, নীরবে বসিয়া, শাস্ত্র চিন্তা করিতেছিল। হিতাহিত-জ্ঞান-রহিত ভ্রমর, শুকের ঐ লাল টুক্ টুক্ ঠোঁট খানিরে পলাশ পুষ্প মনে করিয়া, যেই উড়িয়া যাইয়া স্পর্শ করিল; দুর্ব্বাসার দ্বিতীয় মূর্ত্তিস্বরূপ রুষিত শুকও, অমনিই, জম্বুফল জ্ঞানে উহার শ্যাম মুণ্ডে পুনঃপুনঃ তুণ্ডাঘাত করিয়া, রসিকতার দক্ষিণা দিল। ভ্রমর এত মন্দ যে, উহার এই মহা-বিপদ্ দর্শনেও কবির চক্ষে জল ঝরিল না।

কোকিল কাব্যসাহিত্যে ভ্রমর হইতে উচ্চতর-পদবীরূঢ়। ভ্রমর নিম্নশ্রেণির রসিক, —ঐ একই পুরাতন গুণ-গুণ মাত্র উহার বিশেষ গুণ। কোকিল তানসেন ও বিথো-ভেন ক্লাশের বড় গায়ক। ভ্রমর আদ্ধা তা-লের অতি কোমল টপ্পা লইয়াই সকল সময় ব্যাপৃত; কোকিল খেয়াল ও ধ্রুপদের পঞ্চমে উঠিতে না পারিলে চিত্তে অতৃপ্ত। অপিচ, কোকিল চরিত্রতত্ত্বের বিশেষ ব্যব-চ্ছেদে,—দোষের কোন বিশেষ প্রকারে; ভ্রমর-জাতীয় নহে। ভ্রমরের প্রেম যেমন নিন্দাবাচক ও হাস্যজনক শব্দ, কোকিলের প্রেম তেমন নিন্দাবাচক ও হাস্যরসের উদ্দীপক নহে। কিন্তু তথাপি কোকিল সাহিত্যিক অর্চ্চনায় ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিতে বঞ্চিত। কোকিলকে কবিসম্প্রদায় "আসুতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া আদর করেন; কিন্তু অন্তর্গত চিত্তে সম্মান করেন না।

কোকিলের এক প্রধান কলঙ্ক পর-পুষ্টতা। এ পৃথিবীতে প্রায় সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে পরপুষ্ট। যে-বিশাল বট, অথবা বিসারী অশ্বত্থ, আজি আপনার শরীরের উপর শতসহস্র জীবের বোঝা

বহিয়া,—এবং শতসহস্র সন্তাপিত জীবকে শত্রুমিত্র-নির্ব্বিশেষে ছায়া দান করিয়া, সংসারে দেবতার মত সিন্দুর-চন্দনে পূজা পাইতেছে, সেও এক সময়ে পরপুষ্ট ছিল। কিন্তু যাহারা পরপুষ্ট, তাহারা স্বভাবতঃই প্রীতিস্নেহ ও কৃতজ্ঞতার মাধুর্য্যে পর-প্রিয়। কোকিলের না আছে প্রীতি স্নেহ, না আছে কৃতজ্ঞতা। এ অংশে কোকিলের নিন্দার আর অবধি নাই,—কলঙ্কের সীমা নাই।

অপিচ কোকিল, ভ্রমরের মত প্রেমের ছলনায় পণ্ডিত না হইলেও, ছলনাপরায়ণ প্রতিবেশী। তা ছাড়া, কোকিল সকল সময়েই কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য। শকুন্তলা, মালিনীর শীকরসিক্ত মৃদুপবনসেবিত তপোবনে, দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনে, হৃদয়ে ফুলিয়া উঠিতেছে, কোকিলের সেখানে যে গীত,—যে কথা; সুন্দরী, শোকাকুলা কন্দর্প-পত্নীর ন্যায়, দুঃসহ বিপত্তির প্রথম অভিঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া, ধুলায় লুঠিত হইতেছে, কোকিলের সেখানেও সেই গীত, সেই কথা। যে পরের সুখ বোঝে না, দুঃখ বোঝে না,—কেবল বোঝে আপনার গুণপনা; আর, যোগ ও ভোগ, বিরাগ ও অনুরাগ, অথবা জীবনের চরম-তপস্যা, এবং 'প্রেম রাখি না কুল রাখি' এইরূপ কঠিন সমস্যার সময়েও আপনার গুণের গান ছাড়া আর কিছু গাইতে জানে না, সে হউক যেন কোকিল, চকোরের সহিত তাহার কোনরূপেও সমান সামাজিকতা সম্ভবে না।

চকোর, নিতান্ত নির্গুণ স্থলেও, নীচাশয় চাটুকার অথবা নির্লজ্জ ভ্রমরের মত দিবারাত্র গুণ্ গুণ্ করিয়া মানুষের বিরক্তি জন্মায় না; এবং কোকিলের মত ভাল মন্দ সকল কথায়ই কু-ডাক ডাকিয়া, অথবা পঞ্চমে কুহরিয়া, বিরহিণীর ঝাঁটা খায় না। কিন্তু সে ভক্ত, ভাবুক, প্রেমিক ও প্রেমোপাসক কবির আদর্শ-স্থানে পঁহুছিয়া,—যেন ইহাদিগের প্রত্যেকেরই প্রাণে আপনার প্রাণ মিশাইয়া, রূপ-সুধা পান করে; এবং সুধাকরের রূপ-সুধা যে বিশ্বব্যাপি রূপসাগরেরই কণিকামাত্র, ইহা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া, মনুষ্যের চিত্তে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উচ্ছ্বাস জন্মায়। জীবের পক্ষে ইহার উপর উচ্চতা অথবা মহত্ত্ব আর কি হইতে পারে?

মনুষ্যের মধ্যে যাহারা প্রধান মনুষ্য,—যাঁহারা মানবজাতির আভরণস্বরূপ, তাঁহাদিগের প্রকৃতিনিহিত গুণরাশির মধ্যে প্রধান এক গুণ লালসাশূন্য রূপানুরাগ। রূপানুরাগ যেখানে লালসায় প্রণোদিত এবং লালসার পরিতর্পণেই পর্য্যবসিত হয়, সেখানে উহা কখনও প্রকৃত রূপানুরাগ বলিয়া পূজা পায় না। তাদৃশ রূপানুরাগ কবি ও দার্শনিক প্রভৃতি সকলের নিকটই ঘৃণিত বস্তু বলিয়া উপেক্ষিত হয়। কিন্তু রূপানুরাগ যখন, লালসার সহিত সর্ব্বপ্রকারের সম্পর্কশূন্য হইয়া, উধাও গতিতে উড্ডীন হয়, তখন উহা মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভক্তির সন্ধুক্ষণ করে।

কবিকুল-তিলক দান্তে তাঁহার গভীর ও মধুর কবিতানিচয়ের জন্য যত না প্রসিদ্ধ,

উল্লিখিত-প্রকার নির্ব্বিকার রূপানুরাগের জন্য ততোধিক প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁহার আদর্শ-রূপ-নায়িকা অমল-স্বভাবা বিরাজি-নীকে না দেখিলে চিত্তে কখনও কবিত্বের স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতেন না। বাল্মীকি, ভব-ভূতি, শেক্ষপীর, কালিদাস, এবং কাউপার, টম্‌সন্ ও টেনিসন প্রভৃতি সমস্ত কবিই এই প্রকার রূপানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ। অনন্ত-লীলাময়ী প্রকৃতি, আপনার রূপের অনন্ত বৈভব লইয়া, জলে স্থলে ও নভস্তলে, কখনও জটাজুট-মণ্ডিত মহাভৈরবীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে, কখনও বা মৃদুহসিত মোহিনীর বেশে, বিরাজিত রহিয়াছেন। কবি, ভাব-গদ্‌গদ হৃদয়ে, অহোরাত্র সে রূপের উপাসনা করিয়া নিকৃষ্টচিন্তাময় অধস্তন জনের ঊর্দ্ধে উঠিতে-ছেন।

প্রেমিক প্রভৃতিরও পরমা গতি ও চরমা-নন্দ রূপের উপাসনায়। প্রেমের গুরু শ্রীরাধিকা এবং প্রেমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ পরস্প-রের রূপসম্পর্কে চকোর বলিয়া বর্ণিত হই-য়াছেন। ব্রজভক্ত ও শ্রীগৌরভক্তদিগের মধ্যে যাঁহারা আরাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভক্তিরসের কাব্যসাহিত্যে চকোরের উপমা-স্পদ হইয়া সম্মানের পরা কাষ্ঠা মনে করি-য়াছেন। রূপের উপাসনারূপ তাদৃশ পবিত্র তপস্যায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র চকোর যখন তাঁহা-দিগের সকলেরই তুলনাস্থল, তখন উহার সহিত একই সময়ে ভ্রমর ও কোকিলের নাম উচ্চারণেও পাপস্পর্শ হয়।

হায়! আমি কেন চকোরের চিত্ত ও চকোরের চক্ষু লইয়া, ক্ষণমুহূর্ত্তের তরেও, এই জগদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলাম না; এবং কেনই বা চকোরের প্রাণে জগন্ময়ীর রূপ-সুধা পান করিয়া জীবনে কিঞ্চিন্মাত্রও কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলাম না! আমি অতি নীচাশয় বণিক্,—ক্ষতিলাভগণ-নায়ই নিত্য তৎপর। আমার বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, বন্ধুতা, এবং সারস্বত-ব্রত, সমস্তই ঐ বণিগ্‌বৃত্তি ও বাণিজ্যব্যবসায়ের বিবিধ লক্ষণে লাঞ্ছিত। উহার কিছুতেই চকোরের চক্ষু নাই,—চকোরের চিত্ত নাই; এবং চকোরের সেই উদার, উচ্ছ্রিত, 'ঔদাস্যময়' প্রেমের সৌরভ কিংবা সম্পর্ক নাই। ধিক্ আমার এই গণন-ধর্ম্মান্বিত কাকিনীক-জ্ঞানে!—ধিক্ আমার মোহমুগ্ধ ও তাপদগ্ধ মনুষ্যত্বের বৃথা অভিমানে!

চকোরের সহিত কাব্যকীর্ত্তিত আর কোন বিহঙ্গের যদি তুলনা সম্ভবে, সে তুলনার আস্পদ একমাত্র চাতক। কবি-বর্ণিত চাতক চকোরের মত রূপের উপা-সক কি না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। সে, নীল-নভস্তলবিহারিণী নিবিড় কাদম্বি-নীর বিদ্যুদ্‌বিলসিত রূপ দেখিয়া মোহিত হয়, না কাদম্বিনীর প্রীতিবিন্দু স্বরূপ বারি-বিন্দু লাভের জন্যই প্রেমাকুলপ্রাণে ঊর্দ্ধচক্ষু হইয়া তাকাইয়া রহে, কবিরা সে কথা লইয়া সূক্ষ্ম বিচার করেন নাই। কিন্তু চাতক অতি সামান্য পক্ষী হইয়াও, প্রকৃত প্রেমিক—প্রেমের পূত-পার্থক্যে অভিমান-

স্ফীত, এবং যেন একটুকু কুল-গৌরবে গর্ব্বান্বিত। সে মেঘের জল ছাড়া আর কোনরূপ জল-কণা ঠোঁঠে তুলিয়া লয় না,—নিদাঘদগ্ধ জগতে, তৃষ্ণার নিষ্ঠুর-দাহে, প্রাণে পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্ম হইলেও, সে আর কাহারও পানে ফিরিয়া চাহে না,—আর কাহারও উপাসনা করে না। চাতকের এই ভাবকে, কবি সম্প্রদায়স্থ কুলাচার্য্যেরা, বড়ই মহানুভবের লক্ষণ মনে করিয়া, দেবীবরের ধরণে, কুল-কীর্ত্তির গৌরব বর্দ্ধনে, কবিতারূপিণী কারিকায় গাইয়াছেন। যথা,—

"নদেভ্যোপি হ্রদেভ্যোপি পিবন্ত্যন্যেমুদা পয়ঃ,
চাতকস্য তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনম্।"

অর্থাৎ—অন্যেরা নদ, নদী, হ্রদ, সরোবর, বিল্ল, ঝিল ও বদ্ধকূপ প্রভৃতি সকল প্রকার জলাশয় হইতেই হৃদয়ের আনন্দে জলপান করে; কিন্তু চাতকের একমাত্র অবলম্ব আকাশের মেঘ। পুনশ্চ, যথা—

"পয়োদ হে বারি দদাসি বা ন বা
তদেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ;
বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া,
তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনাং।"

অর্থাৎ—আকাশের মেঘ বারিবিন্দু দান করুক, বা না করুক, চাতকের চিত্ত তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না,—চাতকের হৃদয় আর কাহারও জন্য লালায়িত হয় না। চাতক ভয়ঙ্কর পিপাসায় প্রাণে মরে, তথাপি পরের উপাসনা করে না।

চাতক এ অংশে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, জনক-গুরু যাজ্ঞবল্ক্য গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য কোন জল স্পর্শ করিতেন না। চাতকও বিহঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য নয় কি? এক অর্থে চাতক যাজ্ঞবল্ক্য হইতেও উচ্চতর। অসংখ্যশিষ্যসেবিত যাজ্ঞবল্ক্য সততই গঙ্গাজল পানে শীতল রহিতেন। তাঁহার অদৃষ্টে কোন সময়েও গঙ্গাজল-বিরহে, উপবাস ঘটিয়াছে, এমন কথা শুনা যায় না। কিন্তু শিষ্য-সেবক-সুহৃৎ-শূন্য অচিতপুণ্য অসহায় চাতক, অনেক সময়ে, নিরভ্র নভঃস্থলীতে, নবজলধরের মধুর-গম্ভীর প্রণয়সম্ভাষণও কানে না শুনিয়া, প্রাণের পিপাসায় ঠোঁট পাতিয়া উড্ডীন রহে; তথাবিধ দুঃখের অবস্থায়ও সে আপনার প্রেমধর্ম্মের পবিত্রতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পঙ্কিল পয়ঃস্বরূপ নিরয়ে ডুবে না। যথা চাতকাষ্টকে,—

নভসি নিরবলম্বে সীদতা দীর্ঘকালং
ত্বদভিমুখনিবিষ্টোত্তানচঞ্চুপুটেন।
জলধর জলধারা দূরতস্তাবদাস্তাম্,
ধ্বনিরপি মধুরস্তে ন শ্রুতশ্চাতকেন।

ধন্য তুমি চাতক, আর ধন্য তুমি চকোর! তুমি চকোর, মনুষ্যজাতিকে পিপাসা-পরিহীন রূপের উপাসনায় শিক্ষা দিয়া অনন্তস্থায়িনী প্রেমভক্তির আদর্শপটে উচ্চতম স্থান লাভ করিয়াছ! আর, তুমি চাতক, একনিষ্ঠ—একাগ্রভাবাপন্ন তন্ময় প্রেমের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া, জীব-জগৎকে পবিত্রতাধর্ম্মে নিরন্তর শিক্ষাদান করিতেছ! তোমাদিগের নাম কাব্যে, সাহিত্যে,—গীতে,

ও প্রীতির রস-মধুরা গাথায়, চিরকালের তরে, একসূত্রে গ্রথিত রহুক; এবং মনুষ্য মাত্রই, তোমাদিগের জীবন-ব্রত, নিজ নিজ জীবনে, অল্প বা অধিক পরিমাণে, প্রতি-বিম্বিত করিয়া, পরত্রগম্য দেবজীবনের স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যময় পবিত্র ছায়া লাভ করুক।

ছায়া-দর্শন।

(সপ্তদশ অধ্যায়)

উপক্রম।

কাব্য-সাহিত্যের অনুশীলনে চিত্ত নিশ্চয়ই ক্ষণকাল আনন্দে আপ্লুত রহে। সে আনন্দ অনেক সময়ে উপকারজনক। ইতিহাস-শাস্ত্র, প্রসঙ্গ-বিশেষে, উপন্যাসের ন্যায় ঔৎসুক্য-উদ্দীপক। ইতিহাসের যে সকল অধ্যায়-পাঠে ঔৎসুক্যের তৃপ্তি না জন্মে, সে সকল অধ্যায়েও অভিজ্ঞতা লাভের অশেষ উপকরণ থাকে। এই নিমিত্তই সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে, যাহারা ইতিহাসে অশিক্ষিত, তাহারা অৰ্দ্ধেক অন্ধ। জড়-বিজ্ঞান জ্ঞান ও শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার। উহা এক অর্থে কামধেনুর মত। মনুষ্য উহাকে যত দোহন করিবে, এই জল-স্থল-বহ্নি-বিদ্যুন্ময় পার্থিব-জগতের উপর তাহার প্রভুত্ব ও আধিপত্য তত বেশী বৃদ্ধি পাইবে।

ছায়া-দর্শন-তত্ত্বে, সাধারণতঃ, এ সকল সুখ-সম্পদের কিছুই থাকে না। উহাতে নব-রস-রুচিরা কল্পনার লীলা নাই,—ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার উপকরণ নাই; এবং স্থূল দৃষ্টিতে জড়বিজ্ঞান-শিক্ষাজনিত যান্ত্রিক শক্তি লাভেরও কোন সামগ্রী নাই। কিন্তু তথাপি, উহার অভ্যন্তরে যে অমূল্য সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার সহিত প্রাণের প্রগাঢ় পরিচয় না জন্মিলে, পার্থিব-জীবনের কিছুই অর্থ নাই।

পার্থিব-জীবনের পরিমাণ পঞ্চাশ, ষাট, সত্তোর কিংবা আশি বৎসর। মনুষ্য, এই পরিমিত কালটুকু, সুখে দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, পৃথিবীতে বাস করিয়া,—এই কালের মধ্যে, পরের চিত্ত দাহনে, ধন-মান-প্রভুত্বে প্রবৰ্দ্ধিত হইয়া, অথবা পরকীয় নিপীড়নে প্রাণে জর্জ্জরিত রহিয়া,—কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া, অথবা জ্ঞান ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, অপার ও অতল কাল-সমুদ্রের তরঙ্গরাশির মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যাইতেছে; এবং সে ছিল কি নাই,—এই পৃথিবীতে কোন কালে তাদৃশ কোন ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল কি না, এ কথাও মানব-স্মৃতির অন্ধকারময় গভীর কুক্ষিতে বিলয় পাইতেছে! এই ত পার্থিব জীবনের আদি ও অন্ত!—এই ত উহার আরম্ভ ও পরিণাম! এমন ক্ষণস্থায়ি বস্তু যে মনুষ্যের হৃদয়কে উন্মাদগ্রস্তবৎ মুগ্ধ

করিয়া রাখে, ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতির মহিমা।

কিন্তু ছায়াদর্শন যে শাস্ত্রের একটি পরিচ্ছেদ মাত্র, সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান, কাব্য-সাহিত্য, ইতিহাস ও জড়বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের অনেক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, উর্দ্ধতন ধাম-নিবাসী দেবপুরুষের মত, মধুর-গম্ভীর পবিত্র কণ্ঠে উপদেশ করিতেছে,—"মনুষ্য, তুমি পৃথিবীর মুহূর্ত্তস্থায়ি সুখ-সম্পদে মোহিত কিংবা প্রতারিত হইও না; পৃথিবীর দুঃখ দুর্গতিতেও অবসন্ন হইয়া পড়িও না। পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ সমস্তই তোমার শিক্ষার জন্য; এবং এই সুখ-দুঃখাত্মক পার্থিব-জীবন তোমার অনন্তস্থায়ি অমৃতজীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র।"

অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিজ্ঞানে ইহাও একটি সত্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, নর-নারী, এই ধরণীধামে, প্রাসাদে কিংবা পর্ণকুটীরে, যেখানে কোন বিশেষ পাপ অনুষ্ঠান করে, অথবা পরকীয় পাপে দূষিত হয়, সে সেখানে, তাহার সেই অনুষ্ঠিত দুষ্কৃতির আকর্ষণে, সময়ে সময়ে, ছায়ামূর্ত্তিতে আগমন করে; এবং আপনার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনুতাপ, অশ্রুপাত ও প্রার্থনাদি কার্য্যের দ্বারা ক্রমে ক্রমে শান্তিলাভ করিয়া, জীবনের উর্দ্ধতর স্তরে উত্থিত হয়। এ কথা সত্য কি? প্রশান্তবুদ্ধি পাঠকবর্গ, নিম্নলিখিত তিনটি কাহিনী ধীরচিত্তে পাঠ করিয়া, এবং কাহিনীর প্রমাণ ও অর্থ উভয় সম্পর্কেই যথোচিত আলোচনা করিয়া, এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

প্রথম কাহিনী।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশালা রাজধানী লণ্ডন-নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে,—লণ্ডন হইতে পনর মাইল দূরে, টেমস্ নদীর তটে, হাম্টন্ নামে একটি সুরম্য গ্রাম আছে। গ্রামটি বহু সংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাসাদ-প্রতিম সমৃদ্ধভবনে সুশোভিত। উহার মধ্যপ্রদেশ হাম্টন্-কোর্ট-প্যালেস (Hampton-Court-Palace) নামক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ-প্রাসাদে অলঙ্কৃত।

হাম্টন্ প্রাসাদ প্রায় চারি শত বৎসরের পুরাতন নিকেতন। কার্ডিনাল্ উল্সে তাঁহার অতুল অর্থভাণ্ডার ক্ষয় করিয়া উহা নির্ম্মাণ করেন; এবং উদ্ধত-বিলাসী অষ্টম হেন্‌রিকে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উহা উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়া ক্ষণকালের জন্য কৃতার্থম্মন্য হন। এই প্রাসাদে দুঃখিনী আনাবুলিন প্রভৃতি সুন্দরী রাজমহিষীরা, বহ্নিমুগ্ধ পতঙ্গীর ন্যায়, ক্ষণকাল লালসার মোহময় বিলাসে আত্মবিস্মৃত রহিয়া, পরিশেষে দুঃখের দুঃসহ তুষানলে দগ্ধ হইয়াছেন; এবং এই প্রাসাদেরই অনেক প্রকোষ্ঠকে কারা-রুদ্ধ রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে দীর্ঘশ্বাসে সন্তাপিত অথবা অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া, ইতিহাসের অধ্যায় বাড়াইয়াছেন।

রাজ্যভ্রষ্ট চার্লস-দি-ফার্ষ্ট (Charles I) এই হাম্টন্ প্রাসাদে সুদীর্ঘকাল বন্দিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার হতবুদ্ধি পুত্র (Charles II) চার্লস-দি-সেকেণ্ড, অধিকতর মূর্খ প্রজাবর্গের দ্বারা রাজপূজায়

সংবর্দ্ধিত হইয়া, ভোগমত্ততার উদ্বেল সমুদ্রে কুম্ভীরের মত ভাসিয়াছিলেন। প্রাসাদের একটি ঘর, এখনও, তদীয় বিলাস-সঙ্গিনী রূপসীদিগের বিষাদ-মলিন প্রতিকৃতিনিচয়ে সুসজ্জিত আছে। এই প্রাসাদ, চার্লসের পরেও, বহুকালপর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় রাজাদিগের অন্যতম বাসভবন ছিল। এইক্ষণ উহা রাজানুগৃহীত সম্ভ্রান্ত সামাজিকদিগের আশ্রয় স্থান। উহার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রসিদ্ধবংশসম্ভূত অথচ অসমৃদ্ধ লর্ড ও লেডীরা অবস্থান করেন; এবং প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান, উপবন, বৃক্ষবাটিকা ও মৃগবাটিকায় বিচরণ করিয়া, প্রাকৃত ও শিল্প-সৌন্দর্য্যের নানারূপ দৃশ্য দর্শনে চরিতার্থ রহেন। এই প্রাসাদের বৃহৎ ইতিহাস আছে। তাহা তিন ভালুমে সমাপ্ত। * প্রসিদ্ধনামা আরনেষ্ট ল, সে ইতিহাস রচনা করিয়া, পণ্ডিতসমাজে সম্মানের আসন পাইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাঁহারা হাম্‌টন্ কোর্টে এখনও বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এই প্রাসাদের অনেক ঘর মনুষ্য-বাসের অযোগ্য। কোন কোন ঘরে, গভীর রাত্রিতে, এমন করুণ-বিলাপধ্বনি কর্ণগোচর হয় যে, তাহাতে সকলেরই প্রাণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে। কোন ঘরে ছায়াময়ী রমণী মূর্ত্তি,—কোন ঘরে বা তাদৃশ পুরুষের আকৃতি অকস্মাৎ কাহারও চক্ষে পড়ে; এবং যে দেখে, সে ভয় পাইয়া দীর্ঘকাল অবসন্নবৎ রহে। আরনেষ্ট্ ল-প্রণীত ইতিহাসেও উল্লিখিতরূপ মূর্ত্তিদর্শন ও বিলাপ-শ্রুতির বিবিধ ভয়াবহ কাহিনী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে; এবং ঐরূপ নানাবিধ বর্ণনা ইংলণ্ডের অনেক মাসিকপত্রেও স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু, এ দেশে যেমন অনেকে ছায়া-দর্শনের সমস্ত কথাকেই চক্ষের ধাঁধাঁ অথবা চিত্তের ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেন; ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও অনেকে ছায়া-দর্শনকে ভ্রান্তিমূলক দর্শন জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ উপেক্ষাকারিদিগের মধ্যে পাণ্ডিত্যাভিমানিনী মিস্ ফ্রিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। মিস্ ফ্রিয়ার (A. Goodrich Freer) বড় ঘরের মেয়ে। বড় লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় ও যাতায়াত। তিনি বহুশাস্ত্রে শিক্ষিতা ও বহুমানাস্পদ লেখিকা। তাঁহার লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধ সমগ্র লণ্ডনে যার-পর-নাই ঔৎসুক্যের সহিত পঠিত ও আলোচিত হয়; এবং তিনি কোন সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিলে, দেশের প্রধান-পদবীরূঢ় পণ্ডিতেরাও তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করেন। প্রথিতনামা ষ্টেড (W. T. Stead) ফ্রিয়ারের গুণমুগ্ধ স্তাবক; এবং ওয়ালেস্ ও ক্রুকস্ প্রভৃতি মহামতিরাও তাঁহার পরিচিত সুহৃৎ ও পৃষ্ঠপোষক।

ফ্রিয়ার জ্ঞানার্জ্জন-লালসায় অদ্যাপি অকৃত-পতিকা। বোধ হয় কখনও বিবাহ করিবেন না। কেন না, তাঁহার বয়স এইক্ষণ চল্লিশের সন্নিহিত; এবং তিনি গাঢ় অ-

*Ernest Law's "Hampton Court"

ধ্যয়ন, গ্রন্থরচনা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান লইয়াই অহোরাত্র ব্যাপৃত। এই গুণরাশির মধ্যে ফ্রিয়ারের মুখ্য দোষ অন্যের দর্শন ও শ্রবণাদি-জনিত অভিজ্ঞতায় অবিশ্বাস; এবং প্রায় সকল কথায়ই উপহাস। হাম্—টন্ কোর্টের বিবিধ আশ্চর্য্য কাহিনী যখন ফ্রিয়ারের কাছে পঁহুছিল, তখন তিনি প্রথমতঃ সমস্ত কথায়ই আপনার স্বভাবসিদ্ধ অভিমানের ভাবে উপেক্ষা দেখাইলেন; তার পর, এক রাত্রির জন্য, সে প্রাসাদের আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন।

মিস্ ফ্রিয়ার যাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তিনি সম্ভবতঃ রাজপরিজন। ফ্রিয়ার স্বপ্রণীত গ্রন্থে * তাঁহার উচ্চ সম্মানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নাম-পরিচয়টুকু যে ভাবে গোপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে রাজপরিজন ভিন্ন আর কিছুই অনুমান করা যায় না। ফ্রিয়ার অপরাহ্নে প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন; এবং প্রাসাদের সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও ঘরগুলি দিবার প্রখর আলোকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। যখন বাড়ীর সকলে তাঁহার সঙ্গে সান্ধ্যভোজে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তিনি সকলকেই অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গে আলাপ করিতে বিশেষ বিনয়ের সহিত নিষেধ করিলেন। নিষেধের এই উদ্দেশ্য যে, তাঁহার মন যেন, কোনরূপ কাহিনী শুনিয়া, সেই কাহিনীর বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বাস-প্রবণ হইয়া না রহে।

সান্ধ্যভোজ অর্থাৎ ডিনারের পর, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত গান বাদ্য ও গল্প গুজব হইল। ফ্রিয়ারের সম্মানার্থ বাহিরের অনেক ভদ্রলোকও সে দিন সে প্রাসাদে অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলেই গান-বাদ্য ও গল্পকৌতুকে যোগ দান করিলেন। এইরূপ আমোদ আহ্লাদে রাত্রি যখন এগারটা বাজিল, তখন বাহিরের অতিথিরা চলিয়া গেলেন; গৃহস্বামিনী বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত ফ্রিয়ারকে তাঁহার শয়নের ঘরে রাখিয়া আসিলেন। ফ্রিয়ার দিবসের আলোক থাকা সময়েই সে ঘরটি বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঘরের দুই দিকে বারিন্দা। তৃতীয় দিক্ প্রাচীরে রুদ্ধ। চতুর্থ দিকে একটি শূন্য ও শঙ্কিত ঘর। কিন্তু তাহার প্রবেশ দ্বার দুইধারে দৃঢ়বদ্ধ; এবং গতায়তের সুদূর সম্ভাবনাও একটা দুর্ব্বহ টেবিলের দ্বারা নিরুদ্ধ।

ফ্রিয়ারের শয়ন-ঘরের একপার্শ্বে একটি মশারিশূন্য ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্ক। পর্য্যঙ্কের সম্মুখে দীপ ও সাধারণ দ্রব্য সামগ্রী রাখিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র টেবিল। ফ্রিয়ার সেই জন-মানব-বর্জ্জিত শয়নগৃহে এগারটা হইতে রাত্রি দেড়টা পর্য্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে একখানি মাসিকপত্র পাঠ করিলেন; এবং তাহার পর, দীপ দুইটি নির্ব্বাণ করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বে মনে মনে কহিলেন—আমার এখন আর কোন দোষ কিংবা দায়িতা রহিল না। আমি আড়াই ঘণ্টাকাল এখানে একা উৎসুক

* Essays in Psychical Research.

নয়নে বসিয়া রহিলাম। ইহার অধিক আর কি করিতে পারি।"

ফ্রিয়ার অবিশ্বাসের অন্ধতায় নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। সুতরা সহজেই তাঁহার গভীর নিদ্রা হইল। কিন্তু রাত্রি চারিটার সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার সে নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। তাঁহার মনে লইল যে, তাঁহার পার্শ্বস্থ কোঠার কপাটটা যেন ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া গিয়াছে, এবং কেহ তাঁহার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। কপাট দুই দিকেই তালা চাবিতে রুদ্ধ। উহা আপনা হইতে খুলিবে কেন? আর আসে পাশে কোন কোঠায় মানুষ নাই, কপাট খুলিবে কে?

পাঠকের মনে আছে ফ্রিয়ারের পর্য্যঙ্কে মশারি নাই। ফ্রিয়ার, মনে মনে পাঁচ রকম চিন্তা করিয়া, পর্য্যঙ্ক-সন্নিহিত টেবিল হইতে ম্যাচবাক্স আনিবার জন্য এক হাত বাড়াইলেন। তখন কে যেন তাঁহার হাতখানি হাতে ধরিয়া তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইল। তিনি অতি দ্রুত আপনার হাত টানিয়া লইলেন; এবং আলো জ্বালিতে না পারিয়া, সেই অন্ধকারের মধ্যেই, তীব্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ও নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে ইহলোক ও পরলোক যেন পরস্পর সন্নিহিত। কারণ, ঘরে আর একজন উপস্থিত আছেন, ফ্রিয়ারের মনে সে বিষয়ে আর অনুমাত্রও সংশয় নাই।

ফ্রিয়ার তখন মৃদু মৃদু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই ঘরে কেহ আছেন কি? আমি আপনার কোন প্রিয় কার্য্য করিতে পারি কি?" প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না। ফ্রিয়ার, অগত্যা শয্যা হইতে নামিয়া, এক হাতে তাঁহার পর্য্যঙ্ক ধরিয়া, এবং আর এক হাত শূন্যে সঞ্চালন করিয়া, শয্যার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন এই ধারণা যে, যিনি ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, তদীয় সূক্ষ্মদেহ স্পর্শযোগ্য হইলে, অবশ্যই তাহা তাঁহার হস্তে স্পৃষ্ট হইবে।

এইরূপ সাহস সাধারণ লোকের মনে কখনও সম্ভবে না। কিন্তু ফ্রিয়ার অসাধারণ মনঃশক্তিসম্পন্ন ইয়ুরোপীয় মেয়ে। ফ্রিয়ার মনে এই সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, তিনি একটু বেশী সাহসিকতা দেখাইবেন, এবং তদ্দ্বারাই আগন্তুক সূক্ষ্মদেহীকে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য করিবেন।

কিন্তু ফ্রিয়ার, যে কারণে ম্যাচ্ বাক্স হাতে লইয়াও আলো জ্বালিতে পারেন নাই, এইক্ষণও সেই কারণে, মনঃসঙ্কল্পের অনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের কথা মুখে ফুটিতে না ফুটিতেই, তাঁহার নয়নের সান্নিধ্যে, অথচ একটুকু দূরে,—ধীরে ধীরে,—অতি ধীরে,—একটি স্নিগ্ধ আলো ফুটিল; এবং সে আলো, মুহূর্ত্তের মধ্যেই, উহার কেন্দ্রবিন্দু হইতে উজ্জ্বলতায় ও বিস্তারে বৃদ্ধি পাইয়া, একটি আলোক-স্তম্ভরূপে গঠিত হইল। তিনি এ অপরূপ দৃশ্য স্তিমিতনয়নে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই দেখিলেন, আলোক-স্তম্ভ একটি দীর্ঘাকৃতি কৃশাঙ্গী রমণীমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে; এবং রমণী, শূন্য গৃহের দ্বারদেশ হইতে ধীর-পদে অগ্রসর হইয়া, শয়নগৃহের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

রমণী পরমা সুন্দরী। কিন্তু ফ্রিয়ার দেখিলেন সে সৌন্দর্য্য বিষাদে মলিন ও স্ফূর্ত্তিহীন। রমণীর বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি যে প্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে রাজসম্পদেরই

পরিচায়ক। কিন্তু পরিচ্ছদ উজ্জ্বল হইয়াও, রমণীর অপ্রতিম রূপের ন্যায়, বিষাদের ছায়ায় আচ্ছাদিত। ক্রিয়ার বহুক্ষণ তাকাইয়া, আবারও সাহস করিয়া বলিলেন—"আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারি কি?" রমণী, সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া, কাতর-হৃদয়া কাঙ্গালিনীর মত, উর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার তৎকালের সে শোক-সন্তাপ-ব্যঞ্জক বিষণ্ণ মূর্ত্তি দর্শনে ক্রিয়ারের মনেও গভীর দুঃখের সঞ্চার হইল। রমণী, আপনার মুখখানি অঞ্জলিপুটে আচ্ছাদন করিয়া, প্রার্থিনীর মত জানুপাত-সহকারে প্রণত হইলেন; এবং যেন জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া, দীর্ঘশ্বাস মোচনের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রমণী কতক্ষণ প্রার্থনা করিলেন, ক্রিয়ার তাহা অবধারণ করিতে পারেন নাই। কেন না, তখন তিনি চিত্তে একটু বিচলিত; সুতরাং সময় গণনায় অসমর্থ। কিন্তু যেই প্রার্থনা পরিসমাপ্ত হইল, অমনিই ঐ অদ্ভুত ও অলৌকিক আলো, যেন কাহারও মন্ত্রশক্তিতে, নিবিয়া গেল।

ক্রিয়ার তাঁহার এই চিরস্মরণীয় রাত্রির শয়ন-গৃহসংক্রান্ত অতীত ইতিবৃত্ত জ্ঞাত আছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কোন দাম্ভিক-চিত্ত দুর্ব্বৃত্ত রাজপুরুষ, সময়বিশেষে, বিশেষ কোন গর্হিত উদ্দেশ্যে, ঐ গৃহে নিশা যাপন করিতেন; এবং তৎকালের কোন প্রসিদ্ধবংশীয়া সদাশয়া সুন্দরী, লোভে ও ভয়ে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া, পার্শ্বস্থিত শূন্যগৃহের গুপ্ত পথে, রাত্রিতে তাঁহার বিলাসসঙ্গিনী হইতেন। সুন্দরী অনুতাপের পথ পাইয়াছেন; তাই ওখানে আসিয়া, বিলাপ, পরিতাপ ও প্রার্থনাদ্বারা, তাপিত প্রাণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শীতল হন। কিন্তু, যে রাজপুরুষ তাদৃশী বহু অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তিনি এখনও অনুতাপের পথ পান নাই বলিয়া, সম্ভবতঃ, কোন ঘোর-গভীর-তমসাচ্ছন্ন দুঃখময় স্থানে অবস্থিত রহিয়া, আপনার নিয়তিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল ভোগ করেন।

ছায়াদর্শনের এই প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত সত্য সর্ব্বতোভাবেই ঋষিবাক্যমূলক পুরাতন সিদ্ধান্তের অনুমোদিত নয় কি? ক্রিয়ারের দ্বিতীয় কাহিনী অধিকতর রোমাঞ্চজনক। তাহা আগামি বারে প্রকাশিত হইবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "কুসুম-স্তবকঃ। (কাব্যম্) শ্রীতারাসুন্দর-ব্যাকরণতীর্থেন বিরচিতঃ,—প্রকাশিতশ্চ। এই সুচারুমুদ্রিত ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তকে প্রভাত, শিবস্তোত্র ও কালিকাস্তোত্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে কএকটি সংস্কৃত কবিতা আছে। কবিতাগুলি প্রকৃতই সুন্দর, সুললিত ও সুখপাঠ্য। গ্রন্থকার তারাসুন্দর ভট্টাচার্য্য, ব্যাকরণতীর্থ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া, কাব্যতীর্থ উপাধি গ্রহণ করিলেই উপাধির সার্থকতা হয়। কারণ, তিনি হৃদয়িক যুবা; তাঁহার হৃদয় কবিহৃদয়ের মত কোমল, এবং কবিতাও এই হেতু রসোচ্ছল।

কিশোর-গৌরাঙ্গ।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বসন্ স ইত্থং নিজমন্দিরে প্রভু মুমোদ লক্ষ্ম্যা সহ কান্তয়া তয়া,
সদা জনন্যা পরিচিন্তিতক্রিয়ো গৃহস্থধর্ম্মং সহৃদারমাবহন্।
কান্তাঙ্গসঙ্গামৃতধারয়া তয়া- ভিষেচয়ন্তী হৃদয়েশয়ক্রমং—
মনোভিলাষস্তবকোচ্চয়ং সুখ- প্রসূনবৃন্দং বিররাজ সা ভৃশং॥

*　　*　　*　　*

তদঙ্গসংসর্গসুখাম্বুরাশেঃ প্রবাহসংগাহনশীতলস্য।
লাবণ্যমত্যন্তনিতান্তকান্তং বভূব গৌরাঙ্গমহাপ্রভোস্ততঃ॥

(কবিকর্ণপূরঃ)

সুখ, এ সংসারে, কাহারও জন্য অমৃত, কাহারও জন্য বিষ। যাহারা নিতান্ত নিম্ন-শ্রেণীর লোক, সুখ তাহাদিগের পক্ষে, অতিমাত্র ভয়ানক কাল-কূট-সদৃশ। কারণ, সুখ-স্পর্শে তাহারা, অনেক স্থলে, একবারেই আত্মবিস্মৃত হইয়া, অধঃপাতের অন্ধকারে গড়াইয়া পড়ে; এবং সর্প যেমন, সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিয়াও, শুধুই দেহপ্রাণ-বিনাশি বিষ-রাশি উদ্গিরণ করে, তাহারাও সেইরূপ, সুখের পীযূষ-ধারা পানে প্রবর্দ্ধিত হইয়া, চক্ষের দৃষ্টি, মুখের কথা ও জীবনের প্রত্যেক পদ-ক্রমে, নিরন্তরই মনুষ্যের প্রাণে, অভিমানের জ্বালাময় বিষ ঢালিয়া দিতে ভালবাসে। তাহাদিগের দৈন্যনম্রতা তখন দুর্ব্বিষহ ঔদ্ধত্যে, প্রীতিস্নেহ পাষাণ-কঠোর অকৃতজ্ঞতায় ও কর্ম্মানুরাগ কুৎসিত ভোগালস্যে পরিণত হয়; এবং তাহারা, সে মোহ-মদিরান্বিত সুখসম্পদের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, হৃদয়ের সমস্ত স্পৃহণীয় সম্পদই ক্রমে ক্রমে হারাইয়া, পরিশেষে পুরাতন সুহৃৎ-স্বজনের নিকটও একবারে অপরিচিত-পর হইয়া উঠে।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা মহাত্মা অথবা মহাপুরুষ, সুখের সুশীতল স্পর্শ তাঁহাদিগের জন্য প্রকৃতই অমৃতস্বরূপ। তাঁহারা, সে অমৃত-সেকে, অশ্বত্থপ্রতিম ছায়াপাদপের ন্যায়, অনিন্দ্য শোভায় সংবর্দ্ধিত হন; এবং আপনার সুখ-সিক্ত সুধাময় প্রাণটি শত সহস্র প্রাণে বিলাইয়া দিয়া, সন্তাপদগ্ধ পৃথিবীকে শীতল করিবার নিমিত্ত, চিত্তে সতত আকুল রহেন। শচীর অঞ্চলের ধন, সর্ব্বজন-হৃদয়-রঞ্জন, শ্রীগৌরাঙ্গও, সুখ-সৌন্দর্য্যের প্রস্রবৎ-

রূপিণী মধুর-স্বভাবা লক্ষ্মীর প্রেমস্পর্শে, ধীরে ধীরে জ্ঞান-গুণ-দয়াধর্ম্মময় কল্পতরুর মত বাড়িতে লাগিলেন; এবং কিরূপে পাপ-তাপ-দগ্ধ মনুষ্যজাতিকে, আপনার প্রেম-রসার্দ্র প্রাণের ছায়ায়, প্রীতি ও শান্তি দানে কৃতার্থ করিবেন, এখনি হইতে সেই ভাবনায়ই বৃদ্ধের মত ধীর-গম্ভীর হইলেন। গৌরাঙ্গ, শিশুকাল হইতেই, রূপের অতুল-সম্পদে, সোনার পুতুল। তাঁহার সে রূপ যেন এখন রূপ-সরোবরে স্নাত হইয়া, দ্বিগুণতর * রমণীয় হইল; তাঁহার স্নেহ, মাধুর্য্য, মাতৃভক্তি, মুগ্ধসৌজন্য ও সুহৃদ্বৎসলতা প্রভৃতি সমস্ত গুণই, নূতন-বৃষ্টির ধারাভিষিক্ত কুসুম-কাননের ন্যায়, ফুলের হাসিতে হাসিয়া উঠিল। যাহারা তাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ জন,—প্রীতিবদ্ধ পাঠ-সঙ্গী অথবা প্রাণপ্রিয় ক্রীড়াসহচর, তাহারাও তাঁহার মধুমাখা প্রকৃতিতে মাধুরীর এইরূপ অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস,—তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহকোমলতায় স্নেহমমতার এই নূতন লহরী দেখিয়া, আনন্দে ভাসিল।

* লালসাময়ী প্রীতি, কালিদাস-প্রমুখ কবি-সম্প্রদায়ের চিত্রকৌশলে, কাব্যসাহিত্যে অত্যধিক আদৃত হইয়া থাকিলেও, প্রকৃত-প্রস্তাবে উচ্চশ্রেণীর বস্তু নহে। কিন্তু উহা, শ্বেত-চন্দনালিঙ্গিত শাখোট-বিটপীর ন্যায়, গৌরাঙ্গের স্বর্গসুলভ দেব-হৃদয়ে, ভোগ-বিলাসের প্রথমোল্লাস-সময়েও, ধীরে ধীরে কিরূপ পরিবর্ত্ত ঘটাইল, এবং আপনিও কিরূপ সুরভি বস্তুতে পরিবর্তিত হইয়া, স্বকীয় অস্তিত্বের সার্থকতা জন্মাইল, পাঠক সে দিকে দৃষ্টি রাখিলে মহাপুরুষ-চিত্তরহস্যের * অনেক মহার্হ গূঢ়তত্ত্ব পাঠ করিবার সুযোগ পাইবেন।

গৌরাঙ্গ যখন দ্বাদশ বৎসরের উদ্দাম্ত, উচ্ছৃঙ্খল, আমোদমত্ত অথচ কর্ত্তব্যনিরত অলৌকিক বালক, তখন হইতেই তিনি হরিনামে ভক্ত, এবং ভক্তির বিবিধ অনুষ্ঠানে হৃদয়ের সহিত অনুরক্ত। এখন হইতে, উথানে ও উপবেশনে, সকল সময়েই তাঁহার মুখে মধুর হরিনাম,—নয়নে সময়ে সময়ে নামানন্দের নির্ম্মল অশ্রুপ্রবাহ। মাতা শচীর উপর তিনি অতি সামান্য কারণেও সোহাগের আখুটি করিতে ভালবাসিতেন; এবং মাতা পুত্র উভয়েই আখুটির অত্যাচারে অনন্যলভ্য আনন্দ অনুভব করিতেন। সে আখুটি, আবদার ও স্নেহের অত্যাচার সমস্তই এইক্ষণ অতি বড় গাঢ় মাতৃভক্তিতে

* "যদাচ প্রকর্ষবতাং পুনঃপ্রকর্ষো বিবক্ষ্যতে, তদাতিশায়িকান্তাদপরঃ প্রত্যয়ো ভবত্যেব। যথা—যুধিষ্ঠিরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ কুরূণামিতি কাশিকায়াং।" সুতরাং বাঙ্গালায় দ্বিগুণতর, শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ বড়ই সুবিধাজনক।

* মহাপুরুষ প্রভৃতি শব্দের অর্থ নব্য-বাঙ্গালায় বড়ই নীচে নামিয়া পড়িয়াছে। পুরাতন ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবিরা এ সকল শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইলে, পাঠক কবিরাজ-গোস্বামীর লেখায় একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিবেন।

পরিণত হইয়াছে; এবং ভক্তিই উহার নানারূপ নয়নানন্দ মূর্ত্তিতে গৌরহৃদয়ের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। বাহিরের লোকে কিছুই বুঝিতে পাইতেছে না। তাঁহার সেই পরিহাস-প্রিয় প্রেমোজ্জ্বল প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়া কেহই কিছু ঠাউরিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু, ভাবিভূকম্পের কারণস্বরূপ দ্রববহ্নি এখন হইতেই অভ্যন্তরে প্রধূমিত হইতেছে; বঙ্গবিপ্লাবিনী নয়নজলের বন্যা, এখন হইতেই অন্তস্তলে প্রস্তুত হইয়া, আপনার ভাবি কার্য্যের পূর্ব্বসূচনা করিতেছে। প্রীতির অনাঘ্রাত কুসুমস্বাদে উচ্চতর ভাবের এইরূপ দ্রুতবিকাশ পাত্রবিশেষে অপ্রাকৃত নহে; কিন্তু বিস্ময়াবহ।

গৌরাঙ্গ চিরদিনই বিদ্যারসে কিরূপ বিভোর, তাহা পাঠক জ্ঞাত আছেন। তিনি তাঁহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাব্রতে, বিবাহের পর হইতে, আরও বেশী ডুবিয়া গেলেন; এবং এক দিকে গুরু গঙ্গাদাস, আর এক দিকে সহৃদয় সুহৃৎ মুকুন্দ সঞ্জয়ের আনন্দ জন্মাইয়া, টোলের কার্য্যে অত্যধিক উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদাস এখন আর ভুলিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না। তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাঁহার শৈশব-বন্ধু জগন্নাথ মিশ্রের বালকটিকে পুত্রনির্ব্বিশেষে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। সেই বালক, এক্ষণ বিবিধ বিদ্যায়, 'বিদ্যার সাগর' * স্বরূপ হইয়া, তাঁহার বহুসংখ্য ছাত্রকে অবিরত বিদ্যা দানে চরিতার্থ করিতেছে; এবং দেশে বিদেশে, গুরুর গৌরব-বিস্তারের জন্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব গুণস্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গঙ্গাদাস তাই এখন হইতে একবারে নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত। কেন না, তাঁহার পুরাতন ও নূতন উভয় টোলই গৌরাঙ্গের হাতে। যথা চৈতন্যভাগবতে।

"মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে,
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডী মণ্ডপ-ভিতরে।"
"গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবান্,
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে তান।"
"চতুর্দ্দিগে মহাপুণ্যবন্ত শিষ্যগণ,
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগৎ-জীবন।"
"পড়াইয়া প্রভু, দুই প্রহর হইলে,
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে।
গঙ্গা জলে বিহার করিয়া কতক্ষণ,
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি,
ভোজনে বসয়ে গিয়া বলি হরি হরি।"

গৌরাঙ্গের এক টোল মুকুন্দ সঞ্জয়ের

* কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে এবং বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবতে গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক কোন উপাধি লাভের উল্লেখ নাই। কিন্তু অদ্বৈতপ্রকাশ নামক একখানি নব্যপ্রকাশিত অপ্রচলিত বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, গৌরাঙ্গ অদ্বৈতগোস্বামীর শান্তিপুরের টোলে পাঠ সমাপন করিয়া সেখানে বিদ্যাসাগর উপাধিতে অলঙ্কৃত হন। কথাটা একবারে অসম্ভব বোধ হয় না। এ দেশে 'বিদ্যাসাগরী' নামে কলাপব্যাকরণের একটি টীকা কিছুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ সে টীকা গৌরাঙ্গেরই প্রথম বয়সের রচনা।

রাড়ী; তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত কথা। কেন, না মুকুন্দের পুত্র পুরুষোত্তম সঞ্জয় গৌরচন্দ্রের প্রসিদ্ধ ছাত্র, এবং তাহার শিক্ষার্থই সে টোলের প্রথম প্রতিষ্ঠা। ইদানীং গৌরাঙ্গের আর এক টোল গঙ্গার তটে, এবং তৃতীয় টোল নবদ্বীপের রাজ-পথে। প্রীতি-বিহ্বল ও প্রকৃতিচঞ্চল তরুণ পাঠকবর্গের নিকট শেষোক্ত টোলের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। নবদ্বীপবিলাসিনী গঙ্গা গৌরাঙ্গের শৈশবসঙ্গিনী, এবং এইক্ষণ নবযৌবনের প্রমোদময় জীবনেও চিত্তরঞ্জিনী। গৌরাঙ্গ তাঁহার পিতৃগৃহের পাঠশালায় অথবা গঙ্গাদাসের টোলে বসিয়া, যত না বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন, বোধ হয়, স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার তটে বসিয়া তাহা অপেক্ষা শত গুণ বেশী শিখিয়াছেন। তাঁহার জীবন-লীলাময় কাব্যনিচয় পাঠে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, তাঁহার প্রাণটা বুঝি সর্ব্বদাই গঙ্গার উচ্ছল জলের ন্যায় টল-টল রহিত; এবং অনেক সময়েই গঙ্গার তটে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসিত। শ্বেত-পুলিন-শোভিনী তরঙ্গবিলাসিনী গঙ্গা, কথনও বায়ুনিঃস্বনে,—কথনও বিলোল তরঙ্গ গর্জ্জনে, কথনও বা পুলিন-বিহারি বিহঙ্গকূজনে, বিশ্বরহস্যের কতই কি কহিত। গৌরাঙ্গ তটে বসিয়া কর্ণ পাতিয়া তাহা শুনিতেন।

গঙ্গা সে সময়ে নবদ্বীপের পশ্চিমে। সূর্য্য যখন পশ্চিমের মেঘমালায় সায়ন্তন কিরণের অনন্ত ছটায় বিলসিত হইয়া অস্ত যাইত, নবদ্বীপের গঙ্গা প্রকৃতই সে সময়ে কবিকল্পিত-সুর-গঙ্গার আকৃতি ধারণে দর্শকের হৃদয়ে নানাপ্রকার গভীর ও মধুর ভাবের আনন্দ জন্মাইত। গৌরাঙ্গ, বৃক্ষের শীতল ছায়ায়, তটে বসিয়া, সেই শোভা নিরীক্ষণ করিতেন; এবং যখন অবগাহনের জন্য গঙ্গাজলে নামিতেন, তখন আপনিও একটি প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমলের মত ভাসিয়া ভাসিয়া, তরঙ্গময়ী গঙ্গার শোভা বাড়াইতেন। ইদানীং, তিনি, প্রতিদিনই, অপরাহ্নে গঙ্গার তটে, শ্যামল দূর্ব্বাসনে, অতি সুন্দর সভা রচনা করিয়া উপবিষ্ট হন; এবং তাঁহার অসংখ্য ছাত্রবর্গকে সেখানে বসিয়া শিক্ষা দান করেন।

"বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে;
গঙ্গাতীরে আসিয়া বসেন মহা রঙ্গে।
সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর,
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ,
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন।"

কোন কোন দিন সূর্য্য একবারে অস্ত যাইত, গৌরচন্দ্র তখনও গঙ্গার তটে আসীন রহিতেন। চন্দ্রমঃশালিনী শুভ্র যামিনী সেই রমণীয় প্রদেশে, যেন যোগ-ভক্তির গভীর মাধুর্য্যে, আকাশে যোগিনীর ন্যায় বিরাজিত হইত; এবং গৌরচন্দ্র, উহার নির্ম্মুক্ত চন্দ্রাতপের নীচে বহুক্ষণ বসিয়া রহিয়া, সেই ঔদাস্যময় সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত হইতেন। গঙ্গার সেই এক সুখের দিন তিরোহিত হইয়াছে। তেমন দিন আর কখনও ফিরিয়া আসিবে কি?

আমরা বলিয়াছি যে, গৌরাঙ্গের তৃতীয় টোল নবদ্বীপের রাজপথে। পাঠককে এ কথার অর্থ বুঝাইতে হইবে। নবদ্বীপবাসীরা গৌরাঙ্গকে 'নবদ্বীপচন্দ্র' বলিয়া পূজা করিয়াছেন। এ নাম ভক্তির অর্থে যেমন মধুর, লৌকিক অর্থেও তেমনই মনোহর। নবদ্বীপের সকল পথেই সকলে গৌরাঙ্গকে দেখিতে পাইত; এবং যে নিতান্ত দীন-হীন কাঙ্গাল, সেও আপনার কুটীরের দুয়ারে, গৌরাঙ্গের আনন্দময় মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইয়া, আপনাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিত। গৌরাঙ্গ চিরদিনই প্রণয়-কলহ-প্রিয়। এক্ষণ সমস্ত নবদ্বীপই তাঁহার সেই কলহময়ী* প্রীতির প্রমোদ-ক্ষেত্র। তিনি বিরলে যেমনই কেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন না রহুন, লোকের মধ্যে তিনি প্রায় সকল সময়েই প্রমোদ-বিলাসী, প্রেম-বিহ্বল ও পরিহাস-রসিক। তাঁহার এ বয়সেও, নবদ্বীপের এখানে সেখানে, মাঝে মাঝেই লোকের সহিত তাঁহার প্রণয়ের বিবাদ ঘটিত; এবং লোকেও, যেন সেই মধুময় হৃদয়ের স্বাদ পাইয়া, তাঁহার সঙ্গে দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া কাড়াকাড়ি ও বাড়াবাড়ির রঙ্গ করিতে ভালবাসিত। তন্তুবায় তাহার কাপড়ের দোকান খুলিয়া, ক্রেতাদিগের সহিত মূল্যের কথা প্রসঙ্গে কচায়ন করিতেছে; সেখানে মধ্যস্থ গৌরাঙ্গ। গোয়ালা, গন্ধবণিক্, শাঁখারী, কাঁসারী, ও তাম্বুলী, প্রভৃতি অসংখ্য ব্যবসায়ী সে সময়ে নবদ্বীপে বাস করিত। তাহাদিগের সকলের সঙ্গেই গৌরাঙ্গের পরিচয়, প্রণয়, প্রণয়-কলহ এবং যেখানে কলহ, সেখানেই তাঁহার মধুর-কণ্ঠ মধ্যস্থতা।

"এই মতে নবদ্বীপে যত নগরিয়া,
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া।"(ভা)

কিন্তু, নগরবাসীরা গৌরাঙ্গের এইরূপ নগর-বিহারকে কখনও অত্যাচার মনে করিত কি? তাহারা গৌরাঙ্গকে পাইয়া যেরূপ সুখসাগরে ভাসিয়াছিল, তাহাদিগের জীবনে কস্মিন্ কালেও তেমন সুখ আর ঘটে নাই। এই সংসারে ধনী, মানী ও সুখ-সৌভাগ্যশালীর অনেক ঠাকুর আছে। কিন্তু কাঙ্গালের ঠাকুর বড় কম। গৌরাঙ্গ চিরদিনই কাঙ্গালের ঠাকুর। তিনি নবদ্বীপের নগর-পথে বেড়িয়া বেড়াইতেন; এবং ঐ ভ্রমণ উপলক্ষেই, প্রকৃত কাঙ্গালের প্রাণটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে আপনার প্রাণের একটুকু অমৃতবিন্দু দান করিয়া আসিতেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। গোয়ালা একটুকু দুধ কি দধি দিলে, তাহা আদর করিয়া হাতে লইতেন; এবং অমনিই তাহা অন্য কাহাকেও দিয়া ফেলিতেন। তাম্বুলী একটি পান দিলে, হাসিয়া ঢলিয়া, আনন্দে গলিয়া, ঐ সামান্য বস্তুতেই অসামান্য অনুরাগ দেখাইতেন। এইপ্রকারের দীন-দুঃখীরা তাঁহাকে প্রীতির সহিত যাহা কিছু উপহার দিত, তাহাই তিনি অকৃত্রিম প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতেন। গ্রামস্থ মুসলমানেরাও, তাঁহার স্নেহ-পূর্ণ ব্যবহারে প্রীত রহিত।

"যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত,
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা প্রভুর চরিত।" (ভা)

নবদ্বীপের এক প্রান্তে তখন শ্রীধর নামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি থোর, মোচা ও খোলা বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে "খোলাবেচা শ্রীধর" বলিত। গৌরাঙ্গ সেই খোলাবেচা শ্রীধরেরও খবর লইতেন; এবং মাঝে মাঝে তাঁহার কুটীরে বসিয়া তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস ও রসিকতা দ্বারা প্রফুল্ল করিতে যত্ন পাইতেন।

"খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস,
যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস।
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোর মোচা ফল,
যাঁর ফুটা লৌহ পাত্রে প্রভু পিল জল।"

কিন্তু গৌরাঙ্গের এই নগর-ভ্রমণ শুধুই কৌতূহলের পরিতৃপ্তিতে পর্য্যবসিত হইত না। তিনি এইরূপ পথভ্রমণের মধ্যেও নানা কৌশলে দুঃখসন্তপ্তের উপকার করিতেন; এবং যখন একটুকু সুযোগ পাইতেন, তখনই ছাত্রদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া, সুখ-সন্তোষের আর এক তরঙ্গ তুলিতেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্র। ছাত্রেরা এইরূপ এক অলোক-সাধারণ প্রতিভাশালী অথচ আমোদমগ্ন যুবাকে আপনাদিগের গুরুস্থানে পাইয়া, অভিমানে স্ফীত রহিত; যাহারা একটুকু রসগ্রাহী, তাহারা ছায়ার ন্যায়, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তিনিও তাহাদিগের কাছে মাঝে মাঝে তাঁহার বিশাল হৃদয়ের দুই একটি বিশেষ ভাব একটু একটু খুলিয়া বলিতেন।

এই সময়ে নবদ্বীপে মুকুন্দ দত্ত এবং গদাধর মিশ্র নামক দুইটি ছাত্র, লোকের কাছে নানা গুণে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। মুকুন্দ ও গদাধর গৌরাঙ্গের ছাত্র কিংবা সহাধ্যায়ী নহেন। তাঁহারা উভয়েই গৌরাঙ্গের সমবয়স্ক ও সমসাময়িক পণ্ডিত। উভয়েই তখন পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মুকুন্দ বয়সে ঈষৎ একটুকু বড় হইতে পারেন, কিন্তু গদাধর গৌরাঙ্গ হইতে দুই চারি মাসের ছোট। মুকুন্দের পূর্ব্ব নিবাস চট্টগ্রাম। তিনি, নবদ্বীপে থাকিয়া, নানা শাস্ত্র পড়িয়া, বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। গদাধর নবদ্বীপবাসী মাধব মিশ্রের একমাত্র পুত্র। তিনি তখন ন্যায়ের টোলে পাঠ সমাপন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রের স্বাদ লইতেছেন। এই উভয় যুবাই প্রেমভক্তির পবিত্রপথে পথিক। উভয়েই, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-ভাবানুরাগী ভদ্রলোকদিগের সহিত, প্রতি দিন অপরাহ্নে, পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত অদ্বৈত আচার্য্যের ভক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাইয়া উপবিষ্ট হন; এবং সেখানে শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তগণের সহিত একত্র মিশিয়া, ভাগবত পাঠ অথবা কীর্ত্তনের আনন্দে কৃতার্থ হন।

মুকুন্দ ও গদাধর এই দুইয়ের দুইটি বিশেষ গুণ ছিল। মুকুন্দ বড় সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। তিনি যখন কথকতার প্রণালীতে সুর করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন সক-

লের চক্ষেই অশ্রু ঝরিত। অপিচ, তিনি যখন আনন্দের আবেশে কীর্ত্তনের সঙ্গীত গাইতেন, তখন শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকে অবশ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া, হয় তাঁহার গায়ে, না হয় তাঁহার পায়ে, যাইয়া লুটাইয়া পড়িত। তিনি জাতিতে বৈদ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অনেকে সেরূপ রসাবেশের সময়ে সে কথা ভুলিয়া যাইত।

"সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত,
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত।
বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ,
অদ্বৈত-সভায় আসি করেন মিলন।
যেই মাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণ গীত,
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ভিত।
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে,
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে।
হুহুঙ্কার করে কেহ মালসাট মারে,
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পায় ধরে।"(ভা)

গদাধর মুকুন্দের মত সুগায়ক নহেন। কিন্তু তিনি ভক্তিরসে অধিকতর গভীর, এবং বড়ই সুরূপ। নবদ্বীপবাসী যুবাদিগের মধ্যে বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভরের পর, তিনিই রূপের জন্য বিখ্যাত। পরন্তু, গদাধর ভক্তিধর্ম্মের অনুরোধে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক চির-কৌমার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথায়ও তাহার প্রতি তখন বহু লোকের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট।

গৌরাঙ্গ, এ সময়ে, তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভক্তির উচ্চতর ভাবে ক্রমে কিরূপ আবিষ্ট হইতেছেন, তাহা পাঠককে পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি মুকুন্দ ও গদাধর উভয়ের প্রতিই তখন অন্তরে অতিমাত্র অনুরক্ত। কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহার প্রতি প্রীত কিংবা অনুরক্ত নহেন। মুকুন্দের সহিত পথে দেখা হইলেই, গৌরাঙ্গ আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাতে ধরিতেন, অথবা তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে চাহিতেন।

"প্রভুও মুকুন্দ প্রতি বড় সুখী মনে,
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে।"(ভা)

গৌরাঙ্গ এইরূপে যাইয়া মুকুন্দকে আদর করিয়া ধরিতেন; কিন্তু মুকুন্দ তাহাতে প্রীত না হইয়া, একটা কিছু কথা কহিয়া, চলিয়া যাইতেন।

গদাধরেরও এইরূপ ব্যবহার। পাছে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে পথে ধরিয়া শাস্ত্রের বিচার উপলক্ষে বৃথা বিবাদ ঘটায়, এই ভয়ে তিনি সতত সঙ্কুচিত রহিতেন; এবং তিনি গৌরাঙ্গকে একদিকে দেখিলে, প্রায়শঃই আর একদিক্ দিয়া অন্য পথে যাইতেন। কিন্তু মনুষ্য কি অন্ধ! ইঁহারা যে পথের পথিক, গৌরাঙ্গ সেই পথের পরিচালক। ইঁহারা যে নদীর নাবিক, গৌরাঙ্গ সেই নদীর কাণ্ডারী। ইঁহারা যে জগতের অধিবাসী, গৌরাঙ্গ সেই জগতের আলোকময় প্রফুল্ল চন্দ্র। ইঁহারা গৌরাঙ্গকে বুঝিতেন না; কিন্তু গৌরাঙ্গ ইহাদিগকে বিশিষ্টরূপে বুঝিতেন; এবং বুঝিতেন বলিয়াই হৃদয়ে ভালবাসিতেন। গৌরাঙ্গের বিচারমল্লতা যে শুধুই প্রণয়ের একটা আকুঁষী এবং পরিচয়ের একটা কৌশলময় উপায় মাত্র, তাহা ইঁহা-

দিগের হৃদয়ঙ্গম হইতনা। এই জন্য, ইঁহারা গৌরাঙ্গকে এড়াইয়া চলিতে চাহিতেন। পক্ষান্তরে, গৌরাঙ্গ সেই আকুঁষী এবং সেই উপায়েই ইঁহাদিগকে টানিয়া আনিতে যত্ন পাইতেন।

এক দিন মধ্যাহ্নে, মুকুন্দ গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এমন সময়ে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে পথে দেখিয়া, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। মুকুন্দ, গৌরাঙ্গকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে আর এক পথ দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গোবিন্দ নামে একটি ছাত্র গৌরাঙ্গের সঙ্গে ছিল। গৌরাঙ্গ গোবিন্দকে বলিলেন,—

"মুকুন্দ আমায় দেখিয়া পলাইয়া যায় কেন, তাহা জান? আমি টীকা, পঞ্জী, বৃত্তি লইয়া বিচার করি; সে ভাগবতাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভক্তির রসাস্বাদ করে। তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি বহির্মুখ ব্যক্তি। সুতরাং আমার সহিত বৃথা আলাপে সময় ক্ষেপ করা তাহার বিবেচনায় অসঙ্গত। কিন্তু মুকুন্দ এ ভাবে কত দিন আমাকে এড়াইয়া চলিবে? আমি এক সময়ে এমন বৈষ্ণব হইব যে, দেবতারাও আমার দুয়ারে দেখা দিবেন।"

গৌরাঙ্গের গভীর হৃদয় তখন কোন্ দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে, এই কথায় তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। এ সময়ে ক্ষণে ক্ষণেই তাঁহার ভাবি জীবনের পূর্ব্বাভাস কথায় ও কার্য্যে প্রতিবিম্বিত হইত। তিনি মুকুন্দ ও গদাধর প্রভৃতি সমানবয়স্ক ও সহৃদয় যুবার সহিত আলাপে, শাস্ত্রীয় বিচারের একটা ফাঁদ পাতিয়া লওয়া ভালবাসিলেও, সরল-প্রকৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবদিগকে পথে দেখিতে পাইলে, ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেন; এবং তাঁহারা কোন উপদেশ করিলে, তাহাতে কোন রূপ বাদ প্রতিবাদ না করিয়া, যত দূর সম্ভব নম্রতা দেখাইতেন। যথা,—

"শুনিয়া হাসয়ে প্রভু সেবকের বাক্য
প্রভু বলে তোমরা শিখাও মোর ভাগ্য।"

একই ব্যক্তি কাহারও কাছে উদ্ধত, কাহারও কাছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় অবনত,— কাহারও কাছে প্রণয়-প্রমোদে যার-পর-নাই চঞ্চল, কাহারও কাছে ভক্তিপিপাসু সাধকের ন্যায় ভাব-বিহ্বল ও সরল। এই দৃশ্য কবি ও দার্শনিক উভয়েরই আলোচনার বিষয়। এ সময়ে মাঝে মাঝেই যে এরূপ হইত, তাহা পাঠক দেখিতে পাইবেন।

যে দিন গোবিন্দের সঙ্গে গৌরাঙ্গের ঐরূপ আলাপ হইল, তাহার দিন কতক পরে, মুকুন্দ এক দিন গৌরাঙ্গের হাতে পড়িয়া গেলেন। মুকুন্দ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, গৌরাঙ্গ যাইয়া বড়ই আদরের সহিত তাঁহার হাতে ধরিলেন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, —"তুমি আমায় দেখিয়া এরূপ পালাইয়া যাও কেন? আজি আমায় প্রবোধ না দিলে যাইতে দিব না।"

"দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন,
হস্তে ধরি প্রভু তাঁরে বলেন বচন।
আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পালাও
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও।'

মুকুন্দ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ অদ্ভুত যুবাকে শাস্ত্রার্থের বিচারে পরাভূত করিতে না পারিলে, ইহার হাতে অব্যাহতি নাই।

"মনে ভাবে মুকুন্দ জিনিব কেমনে,
ইহার অভ্যাস মাত্র সবে ব্যাকরণে।
ঠেকাইব আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার,
মোর সঙ্গে যেন গর্ব্ব না করেন আর।"(ভা)

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, গৌরাঙ্গ গুরুর নিকট শুধু ব্যাকরণ শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছেন। "ইহার অভ্যাস মাত্র সবে ব্যাকরণে"—ইহা সমসাময়িক সহাধ্যায়ী পণ্ডিত মুকুন্দের কথা, এবং ইহাই তদানীন্তন সমস্ত বৈষ্ণবগ্রন্থের কথা। কিন্তু সকলেরই একটা কথায় অপ্রণিধান ছিল। গৌরাঙ্গের সর্ব্বগ্রাসিনী প্রতিভা, ব্যাকরণ শাস্ত্রের দৃঢ়ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই যে, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায়াদি সমস্ত শাস্ত্রকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে বিষয়ে সকলেরই সংশয় ছিল। মুকুন্দ দত্ত এইরূপ সংশয়ের উপর নির্ভর করিয়াই গৌরাঙ্গকে অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে পূর্ব্বপক্ষ করিলেন ; এবং যখন দেখিতে পাইলেন যে, গৌরাঙ্গ অলঙ্কারে তাঁহার গুরুস্থানীয়, তখন লজ্জায় একবারে জড়-সড় হইলেন।

"মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন,
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলেন বচন।
আজি ঘরে গিয়া ভাল মতে পুঁথি চাহ,
কালি বুঝা যাবে ঝাট আসিবার চাহ।"(ভা)

মুকুন্দ গৌরাঙ্গের চরণধূলি মাথায় লইয়া চলিয়া গেলেন, এবং বিচারে পরাভূত হইলেও, চিত্তে প্রগাঢ় প্রীতিলাভ করিলেন। মুকুন্দের মনে তখন এইরূপ প্রতীতি হইল যে, মনুষ্যের মধ্যে এমন প্রতিভাশালী পুরুষ বড়ই দুর্লভ। কিন্তু তিনি যেমন প্রীত হইলেন, তেমন একটুকু ক্লেশ অনুভব করিলেন। এমন সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি কেন ভক্তির পথে প্রধাবিত হয় না, ইহাই তাঁহার চিত্তের ক্লেশ। তিনি ভাবিলেন,—

"এমন সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে,
তিলেক ইহার সঙ্গ না ছাড়িযে তবে।"
(চৈতন্যভাগবত)

কিন্তু, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্য মহামনীষী দুরধিগম্য পুরুষদিগের সম্পর্কে চিরকালই অন্ধ। পর্ব্বতের একদিকে দাব-দাহ, আর একদিকে শত নির্ঝরিণীর সুখ-শীতল-প্রবাহ। পর্ব্বতপ্রমাণ প্রধান পুরুষদিগের দুরারোহ জীবন-চিত্রেও এই বৈচিত্র।

মুকুন্দের সহিত যেমন দৈব-যোগে পথে দেখা, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন পণ্ডিত গদাধরের সহিতও গৌরাঙ্গের সেইরূপ দৈব-যোগে সাক্ষাৎকার। গদাধর চলিয়া যাইতেছিলেন। গৌরাঙ্গ যাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ; এবং ন্যায়শাস্ত্রের বিচারের ভাণে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"হাসি দুই হাতে প্রভু রাখিলা ধরিয়া,
ন্যায় পড় তুমি,আমা যাও প্রবোধিয়া।"(ভা)

গৌরাঙ্গ মুকুন্দের সহিত অলঙ্কারের কথা তুলিয়া আলাপ করিয়াছিলেন; গদা-

ধরের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের * অন্তর্গত মুক্তি-বাদের কথাপ্রসঙ্গে আলাপ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই শাস্ত্রালাপ প্রাণাকর্ষণী প্রীতির প্রচ্ছন্ন আলাপ মাত্র। গদাধরও, এই হইতেই, তাঁহার প্রাণের মধ্যে, প্রেমময় গৌরাঙ্গের প্রবল টান অনুভব করিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন।

এই ত মুকুন্দ ও গদাধর প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবহার। কিন্তু শ্রীবাস প্রভৃতি পিতৃবন্ধু ও প্রাচীন ভক্তদিগের কাছে, সে ঔদ্ধত্য ও সে চাঞ্চল্যের অণুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। গৌরাঙ্গ সে সকল স্থানে নবনীতবৎ কোমল, এবং নম্রতার চিত্রিত-মূর্ত্তি।—"শ্রীবাস আদি দেখিলেই করে নমস্কার"—ইহা কেন? শ্রীবাস এবং তাঁহার সমানধর্ম্মা ভক্ত পণ্ডিতেরা, গৌরাঙ্গকে ভক্তিবিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হইলে, গৌরাঙ্গ তাহাদিগের কাছে প্রণতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রীতির সহিত বলিতেন,——

"আপনারা যে দয়া করিয়া আমায় উপদেশ দান করেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। যখন আপনাদিগের মত ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষেরা আমার শুভানুসন্ধান করেন, তখন অবশ্যই আমার সুমতি হইবে। আমার ইচ্ছা আছে, আমি কিছুকাল এই ভাবে অধ্যাপনা করিব। তার পর, ভাল একটি বৈষ্ণবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, জীবনের পথ লইব।

"কত দিন পড়াইব মোর চিত্তে আছে,
চলিব বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে।" (ভা)

আজি চারি শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি অনেকে গৌরাঙ্গের অতল হৃদয়কে তোলাইয়া দেখিতে সমর্থ হইতেছেন না;—গৌর-চরিত্রের সমস্ত অধ্যায়,—সমস্ত অনুষ্ঠান যে নিয়তির নির্দ্দিষ্ট সংবিধানে এক অচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত, ইহা অনেকেই পরিগ্রহ করিতেছেন না। যদি কোন সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সে সময়ে আপাত-সংসারমুগ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্গূঢ় হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই দেখিতেন যে, সমুদ্র যেমন মহাপ্লাবনের পূর্ব্বে কিছুকালের তরে স্তম্ভিত হয়, গৌরাঙ্গের হৃদয়ও তখন সেইরূপ স্তম্ভিত। গৌরাঙ্গ সেই স্তম্ভিত হৃদয় লইয়া শচীর কাছে সংসারের কথা কহেন,—স্বর্ণলতাসদৃশী সৌম্যদর্শনা লক্ষ্মীকে প্রেমালাপে পুলকিত রাখেন,—নবদ্বীপবাসী সাধারণ লোকের সহিত সাধারণ কথা লইয়া কৌতুক করেন, এবং শাস্ত্রব্যবসায়ীকে বিচারমল্লতায় আকর্ষণ করিয়া সৌহার্দ্দের সূত্রে গলায় গাঁথিতে যত্নপর

---

* গদাধর ও গৌরাঙ্গ ন্যায়শাস্ত্রের যে সকল কথা লইয়া বিচার করিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই রঘুনাথ-প্রবর্ত্তিত নব্য ন্যায়ের কথা নহে। অনুসন্ধানে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদিগের এই প্রতীতি হয় যে, গৌরাঙ্গ যে সময়ে নবদ্বীপে ফুটিতেছেন, তখন প্রতিভার অন্যবিধ বিগ্রহ নব্যন্যায়-প্রতিষ্ঠাতা—রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের টোলে মনে মনে পুরাতন ভাঙিয়া নূতন গড়িতেছেন।

হন। কিন্তু তিনি যে মহাভাবের দুর্ব্বহ ভার লইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা মহাসাগরের অন্তস্তলস্থিত অমূল্য মণিরত্নের মত তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রচ্ছন্ননিহিত। সে ভাবের দুই একটা কথা কুত্রচিৎ কখনও অকস্মাৎ ফুটিয়া পড়ে; কিন্তু শ্বেত-মেঘের অলক্ষিত দেহে আকস্মিক বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় মনুষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। হায়! সে ভাব সকলের কাছে লুক্কায়িত থাকিয়াও, তাঁহার চিত্তে সেই সময় হইতে অহোরাত্র কিরূপ বিলোড়িত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বুদ্ধি অবশ ও আড়ষ্ট হয়। পর্ব্বতের নাম পর্ব্বত, এবং সমুদ্রের নাম সমুদ্র হইলেও, তিল তিল করিয়াই পর্ব্বতের বিশালতনু, এবং ফোটা ফোটা লইয়াই সমুদ্রের জল-সঞ্চয়।

আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ।

(৩)

তৃতীয় লক্ষণ রক্ষণপরতা। সংস্কারক বিনাশপর অপেক্ষা রক্ষণপর হইবেন। যাঁহারা সমাজ বা কোন একটা সামাজিক কুরীতির শোধন করিতে গিয়া পদে পদে বিধ্বংসিনী নীতির অনুসরণ করিয়া চলেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে সংস্কারক বলা যাইতে পারে না। যাহা আছে, তাহা রক্ষা করিলে যদি মঙ্গল হয়, তবে সংস্কারক তাহা রক্ষা করিবেন। যাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সংস্কারক তাহার শ্রী সম্পাদন করিয়া তুলিবেন। যাহা প্লুতিত বা পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহা যদি একবারেই অকর্ম্মণ্য না হয়, তাহা হইলে তাহাতে নূতন শক্তির সংযোজনা পূর্ব্বক সংস্কারক তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন। এই হেতু সংস্কারককে যেমন নূতনত্ব অপেক্ষা প্রাচীনত্বের পক্ষপাতী হইতে হইবে, তাঁহার গতিকেও তেমনই প্রখরা না করিয়া মন্থরা করিতে হইবে। বিদ্যুতের বেগ অথবা প্রভঞ্জনের গতি লইয়া পৃথিবীর কোথাও কোন সংস্কার কার্য্য সাধিত হয় নাই। গতি মন্থরা না করিলে বিচারশীল হওয়া যায় না, বিচারশীল হইতে না পারিলে রক্ষণপর হওয়া যায় না, এবং রক্ষণপর হইতে না পারিলে সংস্কার ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে পারে না।

চতুর্থ লক্ষণ সত্যনিষ্ঠা। সত্যকে অবিচলিত ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকার নাম সত্যনিষ্ঠা। জর্ম্মণির প্রখ্যাতনামা সংস্কারক মার্টিন লুথার যখন পোপদিগের প্রতিকূলে তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তখন একদা ওয়ার্মশ নগরের মহাসভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় পক্ষ সমর্থনার্থ তিনি আহূত হয়েন। ওয়ার্মশের সেই মহা-

সভাতে ইয়োরোপের প্রায় যাবতীয় শক্তি এবং সম্পদের সমাবেশ হইয়াছিল। সেই সভাগত সম্রাট্ হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই লুথারের ঘোরতর শত্রু। মহাশত্রুগণের সেই মহাসভাতে লুথার যাহাতে উপস্থিত না হয়েন, তন্নিমিত্ত তাঁহার বন্ধুবর্গ বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লুথার তাঁহাদিগের নিষেধ বাণী না শুনিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন;—"এই নগরে যতগুলি অট্টালিকা আছে, এবং সেই অট্টালিকাগুলির ছাদে ছাদে যত ইষ্টক আছে, আমার শত্রুসংখ্যা যদি ততও হয়, তাহা হইলেও আমি ওয়ার্মসে গমন করিব।" লুথারের এই বীরোচিত কথা শুনিয়া বন্ধুবর্গ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। লুথার তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে ওয়ার্মসে গমন করিলেন, এবং সত্যের জয়ঘোষণা করিতে করিতে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাকেই বলে সত্যনিষ্ঠা।

এখন একটা প্রশ্ন এই যে, সংস্কারককে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে কেন? যেহেতু সংস্কারকের পক্ষে নির্ভীকচিত্ততা এবং অমিতবলশালিতার প্রয়োজন। নির্ভীকচিত্ততা বা অমিতবলশালিতা লইয়া সংস্কারক কি করিবেন? যে ভ্রান্তি কত কাল ধরিয়া কত কোটি লোকের প্রীতি এবং শ্রদ্ধায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, যে কুরীতি শত সহস্র বৎসর ধরিয়া অযুত কোটি লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা উন্মূলিত করিয়া ফেলা কি সাধারণ বলের কর্ম্ম? শত জন লোকের শক্তি এবং পরিশ্রমে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ এক দিনের মধ্যেই ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে। সহস্র জনের সম্মিলিত বলে একটা গহন-গভীর মহারণ্য সমভূমিতে পরিণত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বল দেখি, শত জন চেষ্টা করিয়া বা সহস্র মনুষ্য সম্মিলিত হইয়া কি একটা বদ্ধমূল কুরীতিরও উন্মূলন করিতে পারিবে? শত জনের যাহা অসাধ্য,—সহস্র মনুষ্যের শক্তিরও যাহা অতীত, সংস্কারক কিন্তু একাকীই তাহা সাধন করিতে পারেন। কারণ সংস্কারক সত্যনিষ্ঠ;—সত্যের অজেয় এবং অমিত বলে, সংস্কারক বলীয়ান্। সত্যের অনন্ত আশ্বাসে সংস্কারক সর্ব্বত্রই নির্ভীক। পৃথিবীতে সত্য ভিন্ন এমত বস্তু আর কি আছে যাহা মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবেই নির্ভীক করিয়া তুলিতে পারে? সত্য ভিন্ন পৃথিবীতে এমত মুকুট নাই, এমত মণি নাই,—এমত রাজদণ্ড নাই,—এমত রাজচ্ছত্রও নাই, যাহা ধারণ বা গ্রহণ করিলে মানুষ সকল স্থানে ও সকলের নিকটে শঙ্কাশূন্য ও সঙ্কোচশূন্য হইয়া বিচরণ করিতে পারে? এই নিমিত্ত সংস্কারক কাহারও ভয়ে ভীত হয়েন না, কাহারও ভ্রুকুটিতে বিচলিত হয়েন না, স্তবস্তুতির বংশীধ্বনি শুনিয়াও বিগলিত হইয়া পড়েন না এবং তাঁহার সম্মুখে প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্ প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেও তাঁহার গতি একক্ষণের জন্যও রুদ্ধ হয় না।

পঞ্চমতঃ, সত্যের বিজয়িনী শক্তিতে

বিশ্বাসী হওয়া চাই। সত্যের বিজয় এক দিন না এক দিন হইবেই হইবে, এই বিশ্বাসে অটল হইতে না পারিলে সংস্কারক এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবেন না। সংস্কারকের পক্ষে নিরাশা এবং সন্দেহ সর্ব্বদাই পরিহার্য্য। যিনি নিরাশার দংশনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছেন, কিংবা যিনি সন্দেহের দোলায় আন্দোলিত হইয়া ঘুরিতেছেন, তিনি বিদ্যায় বৃহস্পতিকে জয় করিতে পারিলেও সংস্কারকের ব্রতসাধনায় সম্পূর্ণই অনুপযুক্ত।

সংস্কারক, নিরাশার পরিবর্ত্তে আশার অভয়বাণী শুনিতে শুনিতে, এবং সন্দেহের পরিবর্ত্তে সুনিশ্চয়তার সুস্পষ্ট আলোকে পুরোবর্ত্তী পথ দেখিতে দেখিতে, সমরভূমির মধ্যে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার চতুর্দ্দিক বিপদের মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন করিলেও, অত্যাচারের মহাবাত্যা উঠিয়া চতুর্দ্দিক ধূলিময় করিয়া তুলিলেও, দারিদ্র্যের দুরন্ত হিমে তাঁহাকে অসার এবং অবসন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেও, তিনি এক-ক্ষণের জন্যও নিরাশ হইবেন না। কেন না, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার সমক্ষে শাণিত অসি নিয়ত লম্বমান থাকিলেও, কঠোর কারাযন্ত্রণায় নিশার পর নিশা ঘোরতর অশান্তিতে অতিবাহিত হইলেও, এবং লৌহনিগড়ের গুরুভার বহন করিতে করিতে তাঁহার স্কন্ধে ও করদেশে কালিমার গাঢ় রেখা অঙ্কিত হইলেও, তিনি এক দিনের জন্যও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িবেন না। কারণ সত্যের জয় হইবেই হইবে। তিনি সম্মুখবর্ত্তি বস্তুকে যেমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সত্যের ভাবী বিজয়কেও তেমনই স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিবেন। সংস্কারক সর্ব্বদাই এই আশায় আশান্বিত হইয়া রহিবেন যে, আজি তিনি সর্ব্বপ্রকার অপমান এবং উপেক্ষার কণ্টকমালা গলায় দোলাইয়া পৃথিবীর একপ্রান্তে একাকী দাঁড়াইয়া যে কথার প্রচার করিয়া যাইতেছেন, আজি হউক, কালি হউক, দুই বৎসর পরে হউক কিংবা দুই শত বৎসর পরেইহউক, তাঁহার সে কথা লোকে গ্রহণ করিবেই করিবে। এই হেতু সংস্কারককে সত্যনিষ্ঠের মত,জয়নিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হইবে। অথবা সত্যনিষ্ঠ হইলে জয়নিষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সত্যের অপর নাম জয়।

ষষ্ঠ লক্ষণ আত্মবিলোপ। আত্মাভিমান পরিহারের নাম আত্মবিলোপ। পরিহার আংশিক হইলে চলিবে না—সর্ব্বতোভাবেই করিতে হইবে। আত্মাভিমান সংস্কারকের পথে ঘোরতর অন্তরায়। আত্মাভিমান আত্মপ্রভুত্বের উদ্দীপনা করে, আত্মাভিমান আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যও মনুষ্যকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। আত্মপ্রভুত্বের প্রেরণাবলে সংস্কারক সত্যপ্রচার করিতে পারেন না। অধিকন্তু তিনি সত্যপ্রচার করিতে গিয়া আত্মপ্রচার করিয়া বসেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচালনাবলে সংস্কারক স্বীয় ব্রত পরিসমাপ্ত করিয়াই তৃপ্ত হয়েন না। অধিকন্তু তিনি সেই সংস্কার-বেদিকার পশ্চাতে স্বা

পার্শ্বভূমিতে আপনার নিমিত্তও একটি স্বতন্ত্র বেদিকা রচনা করিয়া তাহারই মহিমা শত প্রকারে বিঘোষিত করিতে থাকেন।

উপস্থিত প্রসঙ্গে এই কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, সংস্কারক আর সংস্থাপক এক বস্তু নহে। সংস্কারক, সংস্থাপক বা উদ্ভাবক হইতে চাহিলে, তিনি আর সংস্কারক রহিলেন না। সুতরাং যদি কেহ সংস্কারককে সংস্থাপকের আসনে বসাইতে চাহেন, অথবা কোন নবীন পন্থার উদ্ভাবক বলিয়া তাঁহাকে লোক সমাজে প্রচারিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আত্ম-প্রভুত্ব বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগে এক-ক্ষণের জন্যও পরিচালিত না হইয়া, সেই আরোপকে সর্ব্বথাই অযথা এবং অসঙ্গত বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিবেন। ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক রামমোহন রায় যখন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারকল্পে বঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে বিপুল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তখন "তিনি কি কোন নূতন ধর্ম্মস্থাপনা করিতে-ছেন ?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার অভি-প্রায়ে কোন কোন ব্যক্তি কথঞ্চিৎ বিস্ময়া-বিষ্টচিত্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামমোহন রায়, তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—"আমি কোন লিখিত গ্রন্থে বা কথিত প্রসঙ্গে আপ-নাকে ব্রহ্মবাদের সংস্কারক বা উদ্ভাবক বলিয়া পরিচিত করি নাই। অধিক কি, এমত ইচ্ছাও আমার অন্তরে কখনও উদিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ব্রহ্মবাদই যে হিন্দু-জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে এই ধর্ম্মেরই যাজনা করিতেন, আমি এই বিষয়টিই প্রতি গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।"* এই কথাগুলি রামমোহন রায়ের মত সংস্কারকের পক্ষে সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত। তিনি আত্মাভিমা-নকে এতই বিপজ্জনক বস্তু মনে করিতেন এবং তাহা হইতে এতই দূরে দূরে থাকি-বার চেষ্টা করিতেন যে, আপনাকে সংস্কারক বলিয়া স্বীকার করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া-ছেন। কি আত্মাভিমানশূন্যতা! কি আত্ম-বিলোপ!

হিন্দু সংস্কারকের লক্ষণ কি ?

সাধারণতঃ সংস্কারকের লক্ষণের কথাই এতক্ষণ বলা হইল। এইবারে হিন্দু সংস্কা-রকের লক্ষণের কথা বলিব। হিন্দু সংস্কা-রকের আরও কি কিছু লক্ষণ আছে ? হিন্দু সংস্কারকের দুইটি লক্ষণ অতি প্রসিদ্ধ। সে দুইটির একটি শাস্ত্রাপেক্ষিতা, অপরটি সন্ন্যাস।

শাস্ত্রাপেক্ষিতার অর্থ কি ? ইহা বিচার করিবার পূর্ব্বে, হিন্দু শাস্ত্র বলিতে কি বুঝিয়া থাকে, তাহা দেখা উচিত।

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি রাশি রাশি গ্রন্থ হিন্দুর সাহিত্য ভাণ্ডারে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রুতি অর্থাৎ বেদই হিন্দুর শাস্ত্র। হিন্দু আবহমানকাল

* Raja Ram Mohan Roy's English works Vol I. P 106.

বেদকেই শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া আসিতেছে। শাস্ত্র কি? শাসন বাক্য। নীতির শাসন, কর্ত্তব্যের শাসন এবং বিধি নিষেধের শাসন লইয়াই শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই সকল শাসনের মধ্যে ধর্ম্মের শাসন সর্ব্বোপরি। সুতরাং মুখ্যতঃ ধর্ম্মের শাসন লইয়াই শাস্ত্রের উৎপত্তি। ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্দ্দেশ করাই যদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় হইল, আর শাস্ত্র বলিতে হিন্দু যদি বেদকেই স্বীকার করিল, তাহা হইলে যাহা বেদানুমোদিত, হিন্দু কি তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকে? থাকে বই কি। কেন না, মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন,—"যাহা বেদ প্রণিহিত, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা বেদ বিপরীত, তাহাই অধর্ম্ম।"

কিন্তু একটা কথা এই যে, যদি বেদই হিন্দুর শাস্ত্র হইল, তাহা হইলে পুরাণাদি গ্রন্থের অভ্যুদয় হয় কেন? এবং পুরাণাদিকে শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত করিয়াই বা লওয়া হয় কেন? উপস্থিত প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ কিছু না বলিয়া এইটুকুই বলিতে চাহি যে, পুরাণ দর্শনাদি গ্রন্থ বেদকে অবলম্বন করিয়াই অভ্যুদিত হইয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্রীয় গ্রন্থখানা একটু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একমাত্র তন্ত্র ভিন্ন প্রায় যাবতীয় গ্রন্থই বেদ-পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, এবং যে যতটুকু অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, সে ততটুকুই শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই হেতুই,—বেদের আনুগত্য একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই ষড়দর্শন শিরোত্তোলন করিতে পারিয়াছে, বিংশতি স্মৃতি স্মৃতির সম্মানে সম্মানিত হইয়াছে। বিংশতি স্মৃতির মধ্যে মনু আবার সকলের উচ্চে উঠিয়াছে। যেহেতু মনু সকলের অপেক্ষাই বেদের নিকট নতশীর হইয়াছে। পুরাণ এবং উপপুরাণগুলি পর্য্যন্ত প্রধানতঃ বৈদিক আখ্যানসমূহকেই নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, এবং গল্পের বৈচিত্র্যমালায় গাঁথিয়া গুছাইয়া সাধারণ মনুষ্য শ্রেণির মধ্যে প্রচারিত করিতেছে। আর শ্রীমদ্ভাগবত সকল পুরাণের মধ্যে "পুরাণ চক্রবর্ত্তী" বলিয়াই পরিগণিত, অধিকন্তু যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রাচীন এবং আধুনিক সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকটেই অদ্বিতীয় ভক্তিশাস্ত্র বোধে সম্পূজিত, সেই শ্রীমদ্ভাগবতও আপনাকে নিগম অর্থাৎ বেদরূপ কল্পবৃক্ষের গলিত ফলমাত্র বলিয়াই স্বীকার করিতেছে। * ফলতঃ, বেদই শাস্ত্র, বেদই হিন্দুর নিকট শাস্ত্র মূল বা শাস্ত্র-প্রাণ বলিয়া পরিগণিত। প্রাণ ছাড়িয়া দেহের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, প্রাণ ছাড়িয়া হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির সচলতা এবং সবলতাও যেমন অসম্ভব, বেদকে ছাড়িয়া বা কোনও প্রকারে বেদের আশ্রয় না লইয়া এই আর্য্যভূমিতে কোন শাস্ত্রের শাস্ত্র বলিয়া পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়াও তেমনই অসম্ভব। বেদ হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে যে কি অসীম প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই

* নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্ ইত্যাদি।

হিন্দুভূমি হইতে যদি কখন হিমাচলও অন্তর্হিত হইয়া যায়, তথাপি এই হিন্দুভূমি হইতে—হিন্দুর হৃদয় হইতে বেদ-বিশ্বাস কখনও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এ প্রকার বোধ হয় না। বৌদ্ধবিপ্লবের প্রবল অভিঘাতে হিন্দুর শাস্ত্রকানন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল বটে, মুসলমান সম্রাটদিগের কঠোরতর পীড়নে হিন্দুর শাস্ত্র-বিশ্বাস বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, এবং আজিকার এই ঐহিকতা-সর্ব্বস্ব ইয়োরোপীয় সভ্যতার খরতর প্রবাহে হিন্দুর বিশ্বাসভূমি দিন দিনই ক্ষীণ এবং শিথিল হইয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু তথাপি হিন্দু বেদ-বিশ্বাসে কোন দিনই জলাঞ্জলি দেয় নাই, এবং কখনও দিবে বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, বেদমূলকত্ব লইয়াই যখন শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব, তখন যে শাস্ত্র যতটুকু বেদমূলক, সে শাস্ত্র ততটুকুই শাস্ত্র বলিয়া আদৃত বা পরিগণিত হইবে। আর যে শাস্ত্র যতটুকু বেদমূলক নয়, সে শাস্ত্র ততটুকুই অশাস্ত্র বলিয়া অগ্রাহ্য এবং অপরিগণিত হইয়া রহিবে। শাস্ত্রের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য দুই-ই যখন বেদমূলকত্বের উপরে নির্ভর করিতেছে, তখন শাস্ত্রের সহিত শাস্ত্রের বিরোধস্থলে বেদমূলকত্বই যে একমাত্র অবলম্ব্য হইয়া রহিবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? এই হেতুই মহর্ষি ব্যাস বলিতেছেন, —"শ্রুতি স্মৃতির পরস্পর বিরোধে শ্রুতিরই প্রামাণ্য, এবং স্মৃতি পুরাণের পরস্পর বিরোধে স্মৃতিরই প্রামাণ্য।" পুরাণের উপরে যখন স্মৃতির প্রামাণ্য, এবং স্মৃতির উপরে যখন শ্রুতি অর্থাৎ বেদেরই প্রামাণ্য, তখন বেদের প্রামাণ্যই যে সর্ব্বোপরি তাহাই কি সিদ্ধ হইতেছে না ? অতএব ইহাই এখন প্রতিপন্ন হইল যে, বেদই হিন্দুর শাস্ত্র। সুতরাং হিন্দুর নিকটে শাস্ত্রাপেক্ষিতা আর বেদাপেক্ষিতা একই কথা।

শাস্ত্রাপেক্ষিতা কি ? কোন বিষয়ের বৈধতা অবৈধতা বা কর্ত্তব্যতা অকর্ত্তব্যতা সম্পর্কে শাস্ত্রাভিপ্রায় অপেক্ষা করার নামই শাস্ত্রাপেক্ষিতা। কি পারিবারিক কি সামাজিক কোন একটা কার্য্য কিংবা কোন একটা প্রথা যদি যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গতও হয়, তথাপি যতক্ষণ তাহা শাস্ত্রাভিপ্রায়ের অনুকূল বা অনুমোদিত না হইতেছে, ততক্ষণ হিন্দুর নিকটে তাহা অগ্রাহ্য এবং অনাদৃত। এই জন্যই কোন সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন বা প্রচলনে, কোন সামাজিক বিধির প্রবর্ত্তন বা উন্মূলনে সহস্র যৌক্তিকতার অবতারণা করিলেও হিন্দু শাস্ত্রাপেক্ষী হইয়া রহে। শাস্ত্রাপেক্ষিতা হিন্দু প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক লক্ষণ।

এই শাস্ত্রাপেক্ষিতা বা বেদাপেক্ষিতার নিদর্শন ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইবে। এতদ্দেশীয় সংস্কারক বা আচার্য্যমণ্ডলীর প্রায় সকলেই শাস্ত্রাপেক্ষিতার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন,—অন্ততঃ অনুসরণের ভাণ করিয়াও চলিয়াছেন। ভারতভূমি হইতে যখন বেদের পঠন পাঠনা উঠিয়া যাইতে লাগিল,

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র যখন বেদান্ত নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক বেদের শূন্য আসনে অধিরূঢ় হইল,—সুতরাং বেদের সম্মান এবং প্রতিষ্ঠায় যখন বেদান্তও সম্মানিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল, তখন ভারতীয় সংস্কারকগণ বেদের পরিবর্ত্তে বেদান্তের আশ্রয় লইতে লাগিলেন। অধিকন্তু, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত এবং সংস্কার প্রণালীই যে বেদান্তমূলক, এই কথাটি প্রতিপাদনের জন্য তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই বেদান্তের সূত্রমালাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আপন আপন মতের অনুকূলে আনিতে লাগিলেন। সুতরাং, তখন বেদান্তের নানা ভাষ্য বাহির হইতে লাগিল। বেদান্তের নামে নানা মত প্রচারিত হইয়া পড়িল। শঙ্কর বেদান্তকে লইয়া অদ্বৈতবাদের স্থাপনা করিলেন, রামানুজ বেদান্ত অবলম্বন করিয়াই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সূচনা করিলেন, এবং মধ্বাচার্য্যাদি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ বেদান্তের নাম লইয়াই নিজ নিজ পন্থার প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, শঙ্কর সারস্বতী শক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি হইলেও, পাণ্ডিত্যের প্রচুরতায় রামানুজকে একজন অসাধারণ বলিয়া পরিগণিত করিলেও, কি শঙ্কর, কি রামানুজ, কেহই কিন্তু শাস্ত্রাপেক্ষী না হইয়া একটি কথা বলিতেও সাহসী হইলেন না। ভারতের ভূমি বড়ই বিচিত্র। হিন্দুর প্রকৃতি বড়ই রহস্যময়। বল দেখি, এই আর্য্যভূমিতে শাস্ত্রাপেক্ষিতার নিশান স্কন্ধে না লইয়া,—বেদ বেদান্তাদির নাম মাত্রও না লইয়া কোন আচার্য্য বা কোন সংস্কারক কখন কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? বল দেখি, অশোক এবং শিলাদিত্যের মত চক্রবর্ত্তি-রাজগণের প্রাসাদমালায় পরিপুষ্ট এবং মুকুটচ্ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াও বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতভূমি হইতে উৎখাত হইয়া গেল কেন? বল দেখি, ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক রামমোহন রায় ইয়োরোপীয় বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও শাস্ত্রাপেক্ষিতার আশ্রয় লইলেন কেন? রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের সিদ্ধান্তকে সহজজ্ঞান বা স্বেচ্ছাবাদের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেও, রামমোহন রায় উত্তমরূপেই বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল সহজ জ্ঞানের ভিত্তি নিরাপদ নহে। তিনি জানিয়াছিলেন যে, এক মাত্র সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে এতদ্দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কথাই স্থান পাইতে পারে না। তিনি উজ্জ্বল রূপেই এই কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কেবল যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের কি বিকৃত ধর্ম্ম, কি বিপন্ন সমাজ কিছুরই সংস্কার করা যাইতে পারে না। এই হেতু তিনি শাস্ত্রাপেক্ষিতার নিশান স্কন্ধে লইয়া বঙ্গভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং উপনিষদাদির প্রচাররূপ শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপরে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্রাপে-

ক্ষিতা হিন্দু সংস্কারকের একটি অপরিহার্য্য লক্ষণ।

অতঃপর সন্ন্যাসের কথা। সন্ন্যাস শব্দের ধাত্বর্থ লইয়া শাব্দিকগণ যতই গোলযোগ করুন, আমি কিন্তু সন্ন্যাস বলিতে সত্যে তন্নিষ্ঠ হওয়াই বুঝিয়া থাকি। ব্রহ্ম সত্য, আর জগৎ মিথ্যা, ইহা যদি এক সত্য হয়; তাহা হইলে সন্ন্যাসীকে যেমন জাগতিক সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে, তেমনই ব্রহ্ম সত্তায় তদ্গত হইয়া রহিতে হইবে। মনুষ্য মনুষ্যের ভাই, ইহা যদি এক সত্য হয়; তাহা হইলে সন্ন্যাসী মনুষ্য মাত্রকেই ভ্রাতৃ বোধে আলিঙ্গন করিবেন। আর কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী, কি চেতন, কি অচেতন, কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমস্ত বস্তুই—সমস্ত পৃথিবীই,—এমত শত শত পৃথিবীসমন্বিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই সেই এক অনন্ত এবং অবিচ্ছিন্ন শক্তিযোগে গ্রথিত, সঞ্চালিত এবং সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, ইহাও যদি এক সত্য হয় তাহা হইলে সন্ন্যাসী এই সত্যেও তন্নিষ্ঠ থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকেই এক এবং অভিন্ন দৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন। এইরূপ সত্য যাহা কিছু—মূলই হউক আর অবান্তরিকই হউক,—সন্ন্যাসী তাহাতেই তন্নিষ্ঠ হইয়া রহিবেন।

সত্যে তন্নিষ্ঠার নামই যখন সন্ন্যাস, তখন সন্ন্যাস বিনা যে জীবন সত্যের সাক্ষিস্থল হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। জীবন সত্যের সাক্ষিস্থল না হইলে, তদ্দ্বারা সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয় না। জিজ্ঞাসা করি, সংস্কার কথাটার প্রকৃত অভিপ্রায় কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ধর্ম্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি সংস্কার প্রভৃতি নানা সংস্কারের কথা লইয়া মনুষ্যজাতি যে যুগযুগান্তকাল হইতে কোলাহল তুলিয়া আসিতেছে, জিজ্ঞাসা করি, সংস্কার ব্যাপারটা মূলতঃ কি? তাহা কি কেহ কখন চিন্তা করিয়াছেন? সত্যই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সেতু,—সত্যই যে মনুষ্য সমাজের বন্ধনী,—সত্যই যে মনুষ্য জীবনের বিকাশ এবং উন্নতির একমাত্র ভিত্তি, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার বিশেষ করিয়া না বলিলেও, পাঠক বুঝিয়া লইবেন বলিয়া ভরসা করি। বলাবাহুল্য যে, এই বন্ধনী যখন শিথিল হইয়া যায়, তখনই সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। এই ভিত্তি যখন বিচলিত হইতে আরম্ভ হয়, তখনই জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। সেই বিশৃঙ্খলা এবং বিপর্য্যয়ের সম্মিলনে, অথবা সেই বিশৃঙ্খল সমাজ এবং বিপর্য্যস্ত জীবনের পারস্পরিক সংঘাতে ক্রমে এক ঘোর বিকার—এক ঘোরতর বিপ্লবের অভ্যুদয় হয়। তখন মনুষ্যসমাজ হইতে শান্তির অন্তর্দ্ধান হয়, মনুষ্য হিতাহিত বিবেচনায় বঞ্চিত হইয়া ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টের আশ্রয় লয়, এবং কি গৃহ, কি পরিবার, কি সমাজ, কি জীবন সমস্তই তখন বাত্যাবিলোড়িত নৌকার মত টল্‌মল্ করিতে করিতে বিনাশের অভিমুখেই ভাসিয়া যায়। তখন সেই ঘোর বিকার হইতে মনুষ্যকে কে রক্ষা করিবে? তখন কি

উপায় অবলম্বিত হইলে মনুষ্য সেই ঘোরতর বিপ্লব হইতে আপনার সমাজ এবং জীবনকে নিরাপদ করিয়া তুলিতে পারিবে? বলিতে পার, সে উপায় কি? সে উপায় সত্যের পুনঃস্থাপনা বা সংস্কার। সংস্কার সত্যের পুনঃস্থাপনা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই কারণ সংস্কারক সেই বিপ্লাবিত, সমাজের বক্ষে—সেই বিকৃত এবং দুর্গন্ধিত জীবনরাশির মধ্যে সত্যের স্বর্ণদণ্ড হস্তে লইয়া আবির্ভূত হয়েন, এবং আপনার জীবনকে সর্ব্বাংশেই সত্যের সাক্ষিরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সত্যের পুনঃস্থাপনা দ্বারা সেই বিকৃত ও বিপন্ন সমাজের সংস্কারকল্পে অগ্রসর হয়েন।

এতদ্দেশের কোথাও কোথাও এমত দুই চারি জন মনুষ্য দৃষ্ট হইবে যে, যাঁহারা সৎশিক্ষার প্রসাদে কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী, অথবা আপন আপন জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে কতকটা ঊর্দ্ধাভিমুখী, এবং এই জন্যই যাঁহারা অপরাপর দশটা কার্য্যের মধ্যে সমাজের হিতসংকল্পে একটু কিছু করাকেও একটা কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা হিন্দুর সংস্কারক পদবাচ্য নহেন। কদাচিৎ এমত শক্তিশালী দুই একটি হিন্দু সন্তানও দৃষ্ট হইবে যে, যাঁহারা আপনাদিগের মেধা প্রতিভা বা মনস্বিতা সম্পর্কে কিছু না কিছু অসাধারণ হইয়াই জন্মিয়াছেন, যাঁহারা কর্ত্তব্য সম্পাদনের সময়ে বীরোচিত শক্তি এবং সামর্থ্যের সঙ্গেই অগ্রসর হয়েন, এবং যাঁহারা স্বদেশের দুর্গতি বা সমাজের কোনও একটা কুরীতির উন্মূলন করিবার পক্ষে আপনাদিগের শক্তি সামর্থ্য এবং সঞ্চিত ধনও অকাতরে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারাও হিন্দুর সংস্কারক নহেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রতিভার উজ্জ্বলতা, মানসিক শক্তির প্রবলতা, স্বজাতির প্রতি মমতা, এবং সেই মমতা হেতু স্বার্থ বিসর্জ্জনে কতকটা উন্মুখতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি হিন্দু সংস্কারকের পক্ষে আবশ্যক হইলেও অত্যাবশ্যক নহে। যেহেতু ভারতের ভূমি এই কথারই সাক্ষ্যদান করিতেছে, ভারতের বায়ুমণ্ডল চতুর্দ্দিকে এই কথাই প্রচারিত করিতেছে, এবং ভারতের অঙ্গাভরণরূপিণী ঐ গঙ্গা ও যমুনার যুগযুগবাহিনী তরঙ্গমালা এই কথাই প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছে যে, বিনা সন্ন্যাসে—বিনা বৈরাগ্যে আর্য্যাবর্ত্তের সংস্কারক পদবী অধিকার করা যায় না। এই জন্যই ভারতের শঙ্কর সন্ন্যাসী, ভারতের রামানুজও সন্ন্যাসী, এবং এই জন্যই নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়াই ভারতের সংস্কারপ্রার্থী। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রাপেক্ষিতার মত সন্ন্যাসও হিন্দু সংস্কারকের একটি অপরিহার্য্য সম্পত্তি।

শ্রীদেঃ—

জাপান সম্বন্ধে কএকটি কথা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই নবযুগ প্রবর্ত্তনার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সম্রাট্ তৎকালে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে, নবীন সম্রাট্ এই বিপ্লবপূর্ণ সময়ের উপযুক্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন না। সম্রাটের প্রধানা মহিষীর নাম হারুকো। তিনি সম্রাট্ অপেক্ষা দুইবৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা। সম্রাট্ এই বুদ্ধিমতী রমণী ও অভিজ্ঞ মন্ত্রিগণের পরামর্শে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শীঘ্রই সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত প্রধান নরপতি বিদ্যমান আছেন, সম্রাট্ মেটসুইডো তাহাদের অন্যতম। রাজকার্য্যে তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন তাহা অনেক পাশ্চাত্য নৃপতির অনুকরণীয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জাপানে পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় এই সভা রাজকার্য্য বিষয়ে সম্রাট্‌কে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকে। প্রতিবর্ষে জাপানী যুবকবৃন্দ রাজব্যয়ে ইয়ুরোপে গমন করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছে এবং জাপানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বদেশীয়দিগকে ঐ সমস্ত তত্ত্বে সুশিক্ষিত করিতেছে। শিক্ষালাভে জাপানবাসিগণের অদম্য উৎসাহ। যে জাতির নিকট যাহা শিক্ষণীয় তাহারা অভিমান ত্যাগ করিয়া ঐ জাতির নিকট তাহাই শিক্ষা করিতেছে। "সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়" এই তত্ত্ব জাপান সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। পূর্ব্বে জাপানীদিগকে শিল্প শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত চীন দেশীয় ও পাশ্চাত্য কারিকর নিযুক্ত ছিল। তৎকালে ঐ সমস্ত শিক্ষকগণ জাপানী অন্তেবাসীর প্রতি নিরতিশয় কঠোর ব্যবহার করিত। কিন্তু জাপানীরা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নম্রতার সহিত পাঠ গ্রহণ করিত। এক্ষণে ঐ সমস্ত ছাত্রগণ শিক্ষক অপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বোধ হয় যেন এক সম্পূর্ণ নূতন রাজ্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে। যে টোকিয়ো নগরে পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তথায় সুবিশাল পার্লিয়ামেণ্টগৃহ, বহুসংখ্যক সুরম্য রাজকার্য্যালয় এবং বিস্তৃত প্রাসাদ সমুত্থিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ টোকিয়ো দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

টোকিয়োর দুর্গ অতি প্রাচীন এবং বহুস্থান লইয়া বিস্তৃত। তিনটি সুপ্রশস্ত পরিখা এবং তিনটি সুদৃঢ় প্রাচীর এই দুর্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে। নগরের মধ্যস্থ শিব ও উয়েনা নামক দেবমন্দিরের উদ্যানবাটিকা যশিয়ারার প্রমোদভবন এবং আশাকেশা নামক মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ সুবিশাল প্রান্তর অতি সহজে আগন্তুকের চিত্ত আকর্ষণ করে। "শিব" মন্দিরের লোহিতবর্ণ তোরণদ্বার অবলম্বনে তথায় প্রবেশ করিলে বোধহয় যেন এক অপ্সরা রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি। দ্বার অতিক্রম করিলেই অসংখ্য মন্দির দর্শকের নয়নপথে সমুপস্থিত হয়, এবং ঐ সমস্ত মন্দিরের উজ্জ্বল ও বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত প্রাচীর সমূহ স্বতঃই তাহার চিত্ত বিভ্রম উৎপাদন করে।

জাপান বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে, জাতীয় মহত্ব রক্ষা করিতে অর্থ ও শক্তির প্রয়োজন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া জাপানবাসিগণ বাণিজ্য বিষয়ে সমধিক উদ্যোগী হইয়াছেন। শক্তিসঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে সমরকৌশল শিক্ষা করিতেছেন।

ইংলণ্ড ও যুক্তরাজ্য হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া জাপানবাসিগণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কল কারখানা সংস্থাপন করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সুইজরলাণ্ড দেশে যে ম্যাচ প্রস্তুত হইত তাহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি জাপানে যে ম্যাচ প্রস্তুত হইতেছে তাহা ঐ পাশ্চাত্য ম্যাচকে পরাভূত করিয়া দিয়াছে। জাপানী ম্যাচ সুইজারলণ্ড দেশীয় ম্যাচের সমগুণবিশিষ্ট, অথচ অধিকতর সুলভ। সুতরাং, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে জাপানী ম্যাচই আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে পসম সংগ্রহ করিয়া জাপানীরা এক্ষণে তদ্দ্বারা লুই কম্বল প্রভৃতি পসমনির্ম্মিত শীতবস্ত্র বয়ন করিতেছে। ঐ স্থান হইতে যে চর্ম্মের আমদানি হয় তদ্দ্বারা জাপানে উৎকৃষ্ট পাদুকা নির্ম্মিত হইতেছে। ইংলণ্ডে যে পাদুকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে তদপেক্ষা এই পাদুকা সুলভ বলিয়া এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ তাহা সাতিশয় আগ্রহের সহিত ক্রয় করে। জাপানে বহু সংখ্যক পাথুরে কয়লা ও কেরাসিনের খনি বিদ্যমান আছে। এক্ষণে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সমস্ত খনি হইতে কয়লা ও তৈল উত্তোলন করা হইতেছে। আসিয়ার প্রায় অধিকাংশ বন্দরে জাপানী কয়লা প্রেরিত হয়। জাপানের চা ও তৈল কোরিয়া, চীন, রুষিয়া এবং আমেরিকা প্রভৃতি নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। জাপানী শিল্পী এক্ষণে স্বাধীনভাবে ঘড়ী, দ্বিচক্রযান, ত্রিচক্রযান, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এবং গার্হস্থ্য আস্‌বাব প্রস্তুত করিতেছে। সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে, প্রধান প্রধান নগর সমূহ বৈদ্যুতিক আলোকে সমুদ্ভাসিত হইতেছে এবং সৌদামিনী অনুগত

পরিচারিকার ন্যায় একস্থান হইতে স্থানান্তরে আবশ্যক সংবাদ বহন করিতেছে। জাপানের কারখানায় যে পেন্সিল ও সাবান প্রস্তুত হয় তাহা এক্ষণে ভারতবর্ষে ক্রমেই অধিকতর আদরণীয় হইতেছে। জাপানীরা যৌথ কারবার সংস্থাপন করিয়া স্বদেশে বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে। এই সাম্রাজ্যে ওশাকা নামে এক নগর বিদ্যমান আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তথায় মাত্র একটি বস্ত্র বয়নের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ স্থলে তিন শতেরও কিঞ্চিদধিক সংখ্যক কল সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত কলে টুইল ফ্লানেল, ছিট প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া চীন ও কোরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশীয় ম্যান্‌চেষ্টার নগর বস্ত্র বয়নের নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ওশাকানগর ম্যান্‌চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সমর-বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া জাপান প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। সেমুরী সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন দ্বারা জাপানী জনসাধারণ এক্ষণে সেমুরী জাতিতে পরিণত হইয়াছে। জাপানবাসিগণ আকারে তাদৃশ বৃহদায়তন না হইলেও সাহস ও শ্রম সহিষ্ণুতায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সেমুরী সম্প্রদায়ের ন্যায় জাপানের সমগ্র জনসাধারণ স্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। অসীম শক্তি ও সাহস সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয় রাজপুত, পাঠান ও শিখ বীরগণ পাশ্চাত্য জাতির নিকট সমরে পরাজিত হইয়াছে। জাপানও প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্যজাতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অভাবে অপদস্থ হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে জাপান দেশীয় সামরিক বিভাগে পাশ্চাত্য প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। সমর-কৌশল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ জর্ম্মণ দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে জাপানবাসিরা এই বিষয়ে এত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে যে, তথায় আর পাশ্চাত্য শিক্ষকের প্রয়োজনিয়তা বিদ্যমান নাই। জাপানের নানাস্থানে যুদ্ধোপযোগি উপকরণ নির্ম্মাণের কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং ঐ সমস্ত কারখানায় যে বন্দুক, কামান ও বারুদ প্রস্তুত হয়, তাহা ইয়ুরোপীয় কারখানায় নির্ম্মিত বন্দুক প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। জাপান দেশীয় সিমোজ নামক এক ব্যক্তি যে এক প্রকার বারুদ আবিষ্কার করিয়াছেন, অদ্যাপি ইউরোপীয় কোন জাতি তাহার রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই। জাপানের পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নৌসৈন্যবিভাগই জাপানের সবিশেষ গৌরবের নিদান স্বরূপ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যুক্ত-রাজ্যের বাষ্পচালিত জলযান অবলোকন করিয়া জাপানবাসিগণ বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা অ-

ন্যের সাহায্য ব্যতীত উৎকৃষ্ট ও সুবৃহৎ বাষ্প-চালিত জলযান নির্ম্মাণ করিতেছে। ইংলণ্ড সর্ব্বপ্রথম জাপানকে নৌযুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। প্রথম প্রথম জাপানকে বিদেশ হইতে জাহাজ আমদানি করিতে হইত। সম্প্রতি সাম্রাজ্যের দ্বাদশ বিভিন্ন অংশে রণপোত নির্ম্মাণের কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে। স্বয়ং সম্রাট্ জাহাজ নির্ম্মাণ বিষয়ে শিল্পিগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য শিল্পীর তত্ত্বাবধানে দেশীয় কারিকরগণ এই সমস্ত কারখানায় যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত করিতেছে। যে নৌযুদ্ধ বিদ্যায় ইংলণ্ড জাপানের শিক্ষাগুরু, এক্ষণে এই বিভাগেও প্রতিভাসমন্বিত জাপানী সেনা কোন কোন রণ কৌশলে ইংলণ্ডকে পশ্চাৎপদ করিয়া দিয়াছে।

জাপানবাসিগণের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল ও মৎস্য। অতি সামান্য আহারেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং সপ্তাহকাল অনশনে থাকিলেও জাপানীরা তাদৃশ কষ্ট অনুভব করে না। ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের ন্যায় ইহারা সর্ব্বদা স্নান করিয়া থাকেন। স্নানে জাপানীরা সাতিশয় উত্তপ্ত জল ব্যবহার করেন। কেহ বলেন, এই উষ্ণজল ব্যবহারের ফলে তাঁহারা প্রৌঢ়ে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন। কাহার মতে এ নিমিত্ত তাঁহারা বাত রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সুস্থ ও সবলকায় হইয়াছেন। পাশ্চাত্য মাংসাশী জাতি সাধারণতঃ দীর্ঘায়তন ও শক্তিসম্পন্ন, মাংসাহারের প্রবর্ত্তনা দ্বারা শারীরিক আয়তন ও শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে কি না তদ্বিষয় অনুসন্ধান জন্য অল্পদিন হয় জাপানে এক সভা আহূত হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর সভা হইতে মীমাংসা হইল যে, মাংসাহার প্রচলিত না থাকার নিমিত্তই জাপানবাসিগণ পাশ্চাত্য জাতিসমূহ হইতে অধিকতর শ্রমসহিষ্ণু ও শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে মাংসাহার প্রচলন করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা এ বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন। অনেকের মতে প্রাচীন আর্য্যসমাজে বাহুল্যরূপে মাংসাহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান নিরামিশ প্রথা দ্বারা এই অনুমান হয় যে, মাংসাহারের অপকারিতা অনুভব করিয়াই আর্য্য সন্তানগণ ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও নিরামিশ আহারেরর ব্যবস্থা করিতেছেন। জাতীয় জীবন গঠন বিষয়ে আহার যে অতি আবশ্যক উপাদান তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। জাপানীরা প্রায়ই দুগ্ধ পান করেন না, তাঁহারা অতি অল্প পরিমাণে চাও সুরা পান এবং তামাখু সেবন করেন। জাপানবাসীর গৃহের দ্বার ও বাতায়ন দিবারাত্র উন্মুক্ত থাকে এবং সর্ব্বদা তন্মধ্য দিয়া নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত হয়। ব্যায়াম ক্রিয়া তাহাদের নিত্য সহচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ জাপানীই সুস্থ, সবলকায় এবং শ্রমসহিষ্ণু।

জাতীয় রহস্য বুঝিতে হইলে বালক ও

রমণী সমাজের প্রতি বস্তুতই দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। বালক মাতৃক্রোড়ে ও গৃহের অভ্যন্তরে যে শিক্ষা লাভ করে তাহার সমস্ত জীবন প্রায় ঐ শিক্ষা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আজ প্রাচীন বয়সেও বাল্যস্মৃতি এবং সংস্কার সহজে বিলুপ্ত হয় না। জাপানী জাতীয় জীবনের রহস্য অনুধাবন করিতে হইলে জাপানী বালকগণের চরিত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক। জগতে জাপানী বালকের তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল জাতীয় বালকেরাই মাতৃক্রোড়ে অবস্থান কালে ক্রন্দন করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাপানী শিশু ঐ সময়ও নীরবে অবস্থান করিয়া গৃহের শান্তি রক্ষা করে। যখন শৈশব অতিক্রম করিয়া বাল্যে পদার্পণ পূর্ব্বক তাহারা সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রিড়া-কৌতুকে প্রবৃত্ত হয়, তৎকালে কোন ক্রীড়া সহচরই অপরের সহিত কলহ করে না। অশ্লীলতা কাহাকে বলে তাহা কোন জাপানী বালক পরিজ্ঞাত নহে। বাল্যে পদার্পণ করিয়াই ইহারা নির্ভীকতা শিক্ষা করে। প্রত্যেক জনক জননী স্বীয় বালককে তমসাচ্ছন্ন রজনীতে একাকী শ্মশান ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে বিভীষিকা বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। জাপানী লোকেরা সাধারণতঃ শিষ্টাচারের নিমিত্ত বিখ্যাত। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষাও জাপানী বালক অধিকতর শিষ্টাচার প্রদর্শন করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাল্যাবস্থায় যেরূপ শাসন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, জাপানে ঐরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত নাই। আমরা গৃহদেবতাগণকে যেরূপ যত্নের সহিত পরিচর্য্যা করি, জাপানী জনক জননী স্বীয় শিশু সন্তানকে ঐরূপ যত্নসহকারে লালন পালন করেন। সন্তানের প্রতি কঠোর ব্যবহার করা জাপানের প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ। এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর শিশু সন্তানকে অতীব প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পাঠ্য পুস্তকে জাতীয় গৌরব ও স্বদেশপ্রেমসূচক প্রতিকৃতি চিত্রিত থাকে এবং জাপানী বালকের সুকোমল অন্তঃকরণে ঐ সমস্ত উন্নতভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া তাহাদের ভাবিজীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিফলিত হয়। জাপানের রমণীসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় পুত্র কলত্র প্রভৃতি স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহধর্ম্ম আচরণ করেন। অপর সম্প্রদায় কলাবিদ্যার আলোচনা করিয়া জনসাধারণের মনস্তুষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায় "গেইসা" নামে অভিহিত। সম্ভব "গেইসা" শব্দ "গায়িকা" শব্দ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের নর্ত্তকী, গ্রীশদেশের হিটেয়া এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের অভিনেত্রীগণের অবস্থার সহিত "গেইসা" দিগের অবস্থার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কি নর্ত্তকী, কি হিটেয়া কি অভিনেত্রী ইহারা কেহই বারবনিতা নহে। প্রাচীন গ্রীক সমাজে হিটেয়াদিগের সবিশেষ আধি-

পত্য ছিল। এমন কি, সক্রেটিশ্ প্রমুখ দার্শনিকগণও হিটেয়া রমণীর সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতেন। "গেইসা" রমণীগণের অধিকাংশই ব্যভিচার দোষ হইতে নির্ম্মুক্তা। সমাজের নিম্নস্তর হইতে বালিকা সংগৃহীত হইয়া এই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে এই রমণীগণকে কলাবিদ্যার আলোচনা করিতে হয়। কঠোর সাধনা ব্যতীত কোন রমণীই পূর্ণতা লাভ করিয়া "গেইসার" আসনে উন্নীত হইতে পারে না। যাহারা এই গায়িকা সম্প্রদায়ের পরিচালক, তাহারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক বালিকার শারীরিক ও নৈতিক উৎকর্ষসাধন বিষয়ে সমধিক যত্ন নিয়া থাকে। দেশীয় কাব্য ও সাহিত্যে প্রত্যেক "গেইসাকে" পারদর্শিতা লাভ করিতে হয়। "গেইসার" চরিত্র অতি মনোরম। সহিষ্ণুতা এবং নম্রতায় ইহারা আদর্শ স্থানীয়া। জাপানী পুরুষ "গেইসার" নামে উন্মত্ত হয়। একমাত্র "গেইসার" অভাবে সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উৎসব ও অনুষ্ঠান অঙ্গহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। জাপানবাসিগণ মিতব্যয়িতার নিমিত্ত সুবিখ্যাত। কিন্তু "গেইসা" নিয়োগবিষয়ে তাহারা কদাচ ব্যয়কুণ্ঠ হয় না। কি রাজা, কি প্রজা সকলেরই নিকট "গেইসা" রমণীর অবারিত দ্বার। বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া "গেইসা" রমণী যখন কিঙ্করী ও সেমিসেন্-বাহক সহ নর্ত্তন সভায় পদার্পণ করে, শ্রোতৃবর্গ তৎকালে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সভায় উপস্থিত হইয়াই গায়িকা গললগ্নীকৃতবাসে ও অবনতমস্তকে সভাসদ্গণকে অভিবাদন করে, এবং সভাস্থলে উপবেশন করিয়া নানারূপ সরল আলাপনে প্রবৃত্ত হয়। বাক্‌চাতুরী, রসিকতা এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রত্যেক "গেইসা"ই সিদ্ধস্বভাবা। বাক্‌যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা অঙ্গুলী ও হস্ত সঞ্চালন দ্বারা এবং কাগজ ও সূত্রখণ্ড লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া কৌশল অভিনয় করে। অতঃপর সুমধুর রবে সেমিসেন বাজিতে থাকে এবং গায়িকা সরস, বিষাদ ও প্রেমপূর্ণ গান গাহিয়া আবেশভরে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে দর্শকবৃন্দের মন ও প্রাণ হরণ করিয়া গভীর রজনীতে "গেইসা" স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ করে এবং পুনরায় রীতিমত অভিবাদন করিয়া সভাস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। টোকিয়ো নগরের যে অংশ "গেইসা" ষ্ট্রীট্ নামে আখ্যাত, ঐ স্থলই এই গায়িকা সম্প্রদায়ের অবস্থানের নিমিত্ত রুতনির্দ্দিষ্ট আছে। যাহারা এই সম্প্রদায়ের পরিচালক তাহারা অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া এই বালিকাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত করে। কোন গায়িকা কোন দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলে ঐ প্রেমিক তাহার স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া তৎসহ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলে ইহারা কখন কখন সম্রাটের ধর্ম্মপত্নীরূপেও পরিগৃহীতা হইয়া থাকে।

জাপানবাসিনী যে সমস্ত মহিলা গৃহধর্ম্ম আচরণ করেন তাঁহারা ভারতীয় আর্য্য-

ললনাগণের সহিত প্রায় সম অবস্থাপন্না। ভারতবর্ষীয়া রমণীগণের ন্যায় ইহারা সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। মুসলমান সমাজে যেরূপ কঠোর অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে জাপানে তদ্রূপ অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য রমণীসমাজ যেরূপ নিঃসঙ্কোচে পরপুরুষের সহিত মিলিত হন, জাপানে তাহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। জাপান রমণী স্বামীপুত্রসহ রাজপথে বহির্গমন করে; কিন্তু বিদেশীয় কোন লোকের সমক্ষে তাহারা কখনও উপস্থিত হয় না। সামাজিক নিয়মানুসারে প্রত্যেক রমণীকেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়। স্বামিগৃহে আগমন করিয়া প্রত্যেক নববধূ শ্বশ্রূর তত্ত্বাবধানে অবস্থান করেন। যত দিন স্বামীর জননী জীবিত থাকেন, তত দিন জাপান রমণী তদীয় আদেশানুসারে গার্হস্থ্য যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ধৈর্য্য, নম্রতা এবং বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণের অভাব হইলে কোন রমণীই সমাজে সুখ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হন না। যাবজ্জীবন জাপান মহিলা স্বামীর মনোরঞ্জনে নিযুক্ত থাকেন। পত্নী অপ্রিয়বাদিনী, মুখরা এবং অবাধ্য হইলে স্বামী তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ। এক পত্নীর বিদ্যমানে দারান্তর পরিগ্রহবিষয়ে জাপানে কোন নিষেধ বিধি প্রচলিত নাই। বিবাহের পর হইতে প্রত্যেক রমণীর অস্তিত্ব স্বামীতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তদবধি তিনি আত্মভোগ-লালসা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। পাশ্চাত্য রমণীগণের ন্যায় তাঁহারা কখনও স্বামীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া আহারে প্রবৃত্ত হন না। তিনি স্বহস্তে স্বামীকে পরিতৃপ্তির সহিত পরিবেশন করিয়া পশ্চাৎ ভুক্তাবশিষ্ট আহার করেন। গৃহে কোন নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান হইলে জাপানরমণী তাহাতে যোগ দান করিতে পারেন না। জাপান সমাজে গৃহধর্ম্মচারিণী রমণী অতি পবিত্র পদার্থ। তাঁহারা সর্ব্বদা শুদ্ধচারিণী হইয়া নিষ্কাম ব্রতের উদ্‌যাপন করিতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই শান্তিপূর্ণ রমণী সমাজও কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত হইয়াছে। নব্য শিক্ষিতা কোন কোন মহিলা এক্ষণে বিবীয়ানা চলনের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু এই ভাব যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে তাহা কদাচ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। ইতিমধ্যেই শিক্ষিতা রমণীগণের বিরুদ্ধে নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। জাপানমহিলাদিগকে সামাজিক নিয়মানুসারে স্থিরভাবে নতজানু হইয়া উপবেশন করিতে হয়। নব্য শিক্ষিতা কোন মহিলা ঐ ভাবে উপবেশন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার জননী কিম্বা পিতামহী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বিদ্যালয়ের রীতি নীতির উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। জাপানে প্রত্যেক মহিলাকে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিতে হয়। নব্য শিক্ষিতা কোন বালিকা দ্রুত পাদবিক্ষেপ করিলে অমনি তদীয়া জননী ভ্রূকু-

ক্ষিত করিয়া বলিবেন, "বৎসে, এরূপ পাদ-বিক্ষেপ বালকের পক্ষে শোভা পায়, বালিকার পক্ষে নহে"। প্রাচীনা জাপানরমণী সূচী ও রন্ধন কার্য্যে সিদ্ধহস্তা। নব্য শিক্ষিতা মহিলা এই সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলে তিনি নানারূপ অপ্রীতিকর সমালোচনার বিষয়ীভূতা হইয়া থাকেন। ফলতঃ, জাপান-মহিলা-সমাজ যে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে না। বহু-পত্নী-গ্রহণ-প্রথা এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যথেচ্ছ ব্যবহার দূরীভূত না হইলে এই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে না। যিনি এই রমণী সমাজের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত তাঁহার নাম মহিমান্বিতা সাম্রাজ্ঞী হারুকো। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঊনবিংশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলে এই মহিলা সম্রাট্ মেটসুহিডোর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সাম্রাজ্ঞীর গর্ভে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। অন্য পত্নীর গর্ভে সম্রাটের যে সমস্ত পুত্র সন্তানের জন্ম হইয়াছে তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠকে এই সাম্রাজ্ঞী পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই যুবরাজই জাপানসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। সাম্রাজ্ঞী যে পরিচ্ছদ ধারণ করেন তাহা পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে প্যারি নগরীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঁহার বহিরাবরণ পাশ্চাত্য হইলেও, তিনি সর্ব্বদা প্রাচ্যভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। যে সমস্ত সৈনিক রণক্ষেত্রে আহত হয় তাহাদিগের শুশ্রূষার নিমিত্ত জাপানে এক সেবকের দল বিদ্যমান আছে। ইহারা Red Cross সম্প্রদায় নামে আখ্যাত এবং স্বয়ং সাম্রাজ্ঞী তাহাদের অধিনায়িকা।

সোগান শাসন প্রণালী উচ্ছিন্ন হওয়ার পর জাপানে যে অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, ঐ উপলক্ষে আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত এই সেবকের দল সংগঠিত হইয়াছিল। তৎকালে এই সম্প্রদায় "হাকা-ইসা" নামে খ্যাত ছিল। ইতিপূর্ব্বে চীনের সহিত জাপানের যে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল তৎকালে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় ১৫৮৭ সংখ্যক লোক এই সমিতির সংস্রবে সেবকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছে। জাপানী সৈনিকগণ লোহিতবর্ণের এবং এই সেবকের দল সবুজবর্ণের টুপী ধারণ করিয়া থাকেন। চীনযুদ্ধে এই সেবক সম্প্রদায় আহত চীনসৈন্যদিগের যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিয়াছিল এবং এই নিমিত্ত তাহারা অদ্যাপি বলিয়া থাকে, "লাল টুপী দর্শন করিলে আমাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কিন্তু সবুজবর্ণের টুপী আমাদিগকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে"। সেবক সম্প্রদায়ের কার্য্য একমাত্র আহত সৈনিকের শুশ্রূষায় নিবদ্ধ নহে। অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প কিম্বা অন্য কোন প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহারা অযাচিতভাবে আর্ত্তের দুঃখ বিমোচনে যত্নবান্ হয়। যাহারা শুশ্রূষার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহাদিগের সুশিক্ষার নিমিত্ত জাপানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শুশ্রূষাকারিণী ও পরিচারিকাগণ ঐ সমস্ত বিদ্যা-

লয়ে রীতিমতে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে এই সমাজে ২৭৯ জন চিকিৎসক ১৫৫৮ জন শুশ্রূষাকারিণী এবং ৬৪০ জন পরিচারিকা নিযুক্ত আছেন।

জাপানবাসিগণ প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঐ ধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র আলোক প্রাপ্ত হইয়াই জাপানী জাতীয় জীবন এতাদৃশ উন্নত হইয়াছে। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক ধর্ম্মযাজক জাপানে অবস্থান করিতেছেন সত্য; কিন্তু তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম যে কখনও ঐ স্থলে বদ্ধমূল হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। জাপানের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic)। তাঁহারা মনে করেন খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। কুমারী মেরীর গর্ভে যিশুখৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত বুদ্ধদেবের জন্মবৃত্তান্ত হইতে অনুকরণ করা হইয়াছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করেন। অটল রাজভক্তি এবং অকপট স্বদেশপ্রেমই জাপানবাসিগণের সর্ব্ব প্রধান বল। স্বদেশ ও সম্রাটের নিমিত্ত ইহারা স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না।

জাপানের জাতীয় পতকার নাম "উদীয়মান সূর্য্য"। যেরূপ দ্রুত গতিতে জাপান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে এই নাম অন্বর্থ বলিয়াই বোধ হয়। আত্মোৎসর্গ, স্বাবলম্বন এবং আত্মপোষণের ক্ষমতাই জাপানের এই উন্নতির মূলীভূত কারণ। সম্প্রতি জাপান পরাক্রান্ত রুষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জাপান এই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সমগ্র আসিয়ার গৌরব রক্ষিত হইবে, অন্যথা প্রাচ্যদেশের সৌভাগ্যসূর্য্য "উদীয়মান সূর্য্যের" সহিত চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারে বিলীন হইবে।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত বি এল্।

সুন্দর।

শিশুর বিমলহাসি প্রফুল্ল কুসুমরাশি
বিমল গগনে শশী বড়ই সুন্দর!
খুলিয়া রূপের ডালা হাসে তারকার মালা
স্বভাবের নব শোভা বড়ই সুন্দর!

শারদ জোছনা নিশি অযুত চন্দ্রমা হাসি
মৃদু নীর লহরীতে বড়ই সুন্দর!

জড়িত, লতারকরে বসন্তের তরুবরে
নবপত্র পুষ্প শোভা বড়ই সুন্দর!

শরতের শস্যাধরে নিশার তুষার নীরে
নবীন রবির বিম্ব বড়ই সুন্দর!
বসন্তের মন্দবায়ে ফুলের সৌরভ ল'য়ে
হৃদয়ের প্রফুল্লতা বড়ই সুন্দর!

বরষার ভরা নদে মৃদু "কুলুকুলু" নাদে
মৃদুল তরঙ্গলীলা বড়ই সুন্দর!
ঊষার অমল গায়ে অরুণ আলোক ল'য়ে
নবীন রবির খেলা বড়ই সুন্দর।

সুনীল আকাশ তলে নিবিড় জলদ কোলে
চপলার লোল'হাসি বড়ই সুন্দর!

প্রেমিকের প্রেমগীতি প্রণয়ীর প্রতিকৃতি
প্রণয়ের অভিমান বড়ই সুন্দর।

পরের কারণে যার বহে সদা অশ্রুধার
বিশ্বপ্রেমিকের চিত্ত বড়ই সুন্দর।
ভাবের অঞ্জন মাখি যেদিকে ফিরাই আঁখি
জগৎ ঘুড়িয়া দেখি সকলি সুন্দর।।

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

পদার্থের অবনতি।

পৃথিবীর সভ্যতা বাড়িতেছে। মানুষের জ্ঞান বাড়িতেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষমতাও বাড়িতেছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চায় মানুষের কি লাভ হইয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। তড়িৎ, বাষ্প ও প্রবাহ এক্ষণে মানুষের আজ্ঞাকারী; ধূলি মুষ্টিও এক্ষণে মানুষের ক্ষমতায় স্বর্ণমুষ্টি হইতেছে। এসকল বড়ই শুভসূচক। কএক শতাব্দীমাত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চায় মানুষ গগন টালিয়াছে, ইহাতেই এই। আর কিছুকাল পরে কি হইবে কে জানে? পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ শীঘ্রই বৃহস্পতিলোকস্থ জীবগণের সহিত কথোপকথনের ব্যবস্থা হইবার আশা করিতেছেন। রাসায়নিক বলিতেছেন "দাঁড়াও, আর কয়েকদিন অপেক্ষা কর, পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সকলই আমরা দূরীভূত করিয়া দিতেছি। খাবার জন্যই পৃথিবীর অধিকাংশ পাপ। আমরা সব লোকের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। আর মানুষকে প্রকৃতির খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করিতে হইবে না। মানুষের খাবার জন্য চাই নাইট্রোজেন (Nitrogen), অক্সিজেন (Oxygen), হাইড্রোজেন (Hydrogen), কার্ব্বণ (Carbon) আদি কয়েকটি মূল পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ। বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট নাইট্রোজেন, কার্ব্বন ও অক্সিজেন আছে; জলে হাইড্রোজেন আছে। এই সকল উপাদান হইতে শীঘ্র আমরা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারিব। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।" ওই দেখ Synthetic Chemistry এর কি দ্রুত বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আগে লোকে ভাবিত, জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মানুষে প্রস্তুত করিতে পারে না। ১৮১৮ সালে উলার সংশ্লেষণের উপায়ে (synthetically) 'ইউরিয়া' (urea) প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর অন্যান্য

রাসায়নিক পণ্ডিত কত জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জীববিদ্যা বলিতেছে, "দেখ, একশত বৎসরের কিছু অধিক সময় মাত্র আমার বয়ঃক্রম; ইহারই মধ্যে আমি কত নূতন কাণ্ড করিয়াছি। আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, জীবন কি, মানুষ মরে কেন, এসব তথ্য আমি বাহির করিয়া দিতেছি। ভবিষ্যতে এমন উপায় বাহির হইতে পারে, যদ্দারা মৃত্যু বা অকালমৃত্যুর গতিরোধ হইবে।"

এ সব আশার মধ্যে একটু হতাশার ছায়াও আছে। মানুষের সভ্যতা যে চিরদিন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না; মানবজাতির জীবন যে অনন্তকাল স্থায়ি হইবে না, তাহা এক প্রকার অবধারিত হইয়াছে। লর্ড কেল্‌ভিন দেখিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে অবিশ্রান্ত শক্তির অপচয় হইতেছে। শক্তি (energy) যে নষ্ট হইতেছে তাহা নহে, কারণ শক্তির বিনাশ নাই, তবে উহা যে অবস্থায় জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে উপযোগী সে অবস্থা হইতে অনুপযোগি অবস্থায় যাইতেছে। ইহাই শক্তির অপচয়। পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকেই Degradation of Energy এই নামে উল্লিখিত করেন। এই মত অনুসারে সুদূর ভবিষ্যতে এই পৃথিবী জীববাসের অনুপযুক্ত হইবে। পৃথিবী থাকিবে, তবে ইহার যে অবস্থা হইবে, তাহাতে বর্ত্তমান কালের কোনও জীব ইহাতে জীবিত থাকিতে পারিবে না। কাজেই পৃথিবীর এই অবস্থায় মানবজাতিরও ধ্বংস হইবে। পণ্ডিতগণ এই প্রলয়ের কথা স্বীকার করিয়া লইলেও কেহই উহার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত নহেন। এই প্রলয়কাল আসিতে এখনও এত বিলম্ব যে তাহার পূর্ব্বে মানবসভ্যতা ও মানবসমৃদ্ধি কত উচ্চে উঠিবে তাহা কে নির্ণয় করিবে—এবং সে প্রলয় ব্যাপার রহিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে ভবিষ্যতের মানব যে একবারেই অসমর্থ হইবে তাহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। কাজেই সে বিষয়ের ভাবনা এখন কম।

তবে মানবের সভ্যতাস্রোত প্রতিরুদ্ধ হইবার আর একটা আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কার কথা পণ্ডিতমণ্ডলী এখনও সবিশেষ চর্চ্চা করেন নাই, এবং আংশিক ভাবে হইলেও সম্পূর্ণ ভাবে এ কথা কেহ বলিয়াছেন কি না আমি তাহা অবগত নহি। এই নূতন মত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিপন্ন করিবার উপযোগী উপাদান এক্ষণে আমার নিকট নাই, এবং তাহা সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই নূতন মত পণ্ডিতমণ্ডলীর চিন্তার জন্য বিবৃত করা যাইতেছে। সভ্যতাস্রোত প্রতিরোধের যে বাধার কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা "দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ" এই নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। পৃথিবীর বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অবিশ্রান্ত দ্রব্যের অপচয় হইতেছে। এই পদার্থ অপচয়ের ফলে লর্ড

কেল্‌ভিনকথিত মহাপ্রলয়ের বহু পূর্ব্বে পৃথিবীতে দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতা স্রোত সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত করিবে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নূতন ব্যবহৃত কথার অর্থ দেওয়া আবশ্যক। পদার্থের অবনতি বা Degradation of Matter, ইহার অর্থ এই,—পৃথিবীতে মানবের ব্যবহার্য্য পদার্থসমূহ যে অবস্থায় সহজেই মানবের ব্যবহারে আসিতে পারে সে অবস্থা হইতে উহা এরূপ অবস্থাপন্ন হইতেছে যে, উহা সেই অবস্থা হইতে সহজে মানবের ব্যবহারে আসিতে পারিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ লৌহ, red haematite, magnetic iron ore, ইত্যাদি বিবিধ খনিজ দ্রব্যে স্বভাবতঃ পাওয়া যায়; পরে মানুষের বিজ্ঞান কৌশলে উহা বিশুদ্ধ লৌহে পরিণত হইয়া নানারূপ ব্যবহারে আসে। এই ব্যবহৃত লৌহ যন্ত্রাদি বায়ু ও জলের সংস্পর্শে এবং ঘর্ষণে অবিশ্রান্ত মরিচাযুক্ত ও ক্ষয়িত হইয়া যাইতেছে। ক্ষয়িত লৌহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইতেছে। লৌহের শেষোক্ত অবস্থার নাম নষ্ট অবস্থা, বা degraded state। লৌহ যে পদার্থ তাহার কিছুই নষ্ট হয় নাই, খনিতে যে লৌহ ছিল মাটীতেও সেই লৌহই রহিল। কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে উহাকে লৌহ ধাতুতে পরিণত করা যাইত, শেষোক্ত অবস্থা হইতে নহে। কাজেই শেষের অবস্থা বিকৃত অবস্থা বা degraded state of iron।

এক কৃপণের বহু সম্পত্তি ছিল। লোকটা কিন্তু কৃপণ বলিয়া অতি সামান্য অবস্থায় থাকিত। সে নিজের বাটীর ভিতর মাটীর নীচে, অট্টালিকার দেওয়ালে, বিবিধ রত্নালঙ্কার ও অর্থ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র জানিল যে পিতা নানা স্থানে অর্থাদি লুকাইয়া রাখিয়াছে। অন্বেষণ করিতে করিতে সে এক স্থলে কিছু অর্থ পাইল। অর্থান্বেষণের আর অন্য চেষ্টা না করিয়া সে সেই অর্থে সাধারণ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিল। তাহার পরে তাহার পুত্র বা কৃপণের পৌত্রের পালা আসিল। সে পিতামহের লুক্কায়িত অর্থের কথা জানিয়া বাড়ী ঘর সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেখানে যে টাকাকড়ি পাইল তাহা বাহির করিয়া লইয়া খরচ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কৃপণের কদর্য্য বাটীর পরিবর্ত্তে দিব্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, উহা বিবিধ রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হইল। গাড়ী, ঘোড়া, বিচিত্র আলোক আদি যতবিধ সমৃদ্ধির উপাদান আছে কৃপণের পৌত্র তাহা উপভোগ করিতে লাগিল। অমিতব্যয়িতায় অর্থও শীঘ্র শেষ হইল। কৃপণের প্রপৌত্রকে পথের ভিখারী হইতে হইল। আমার বোধ হয় মানুষের বর্ত্তমান সভ্যতা যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে তাহার পরিণামও ঐরূপ হইবে। কয়েক পুরুষ ধরিয়া মানুষে খুব সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ মানুষের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়

না, তাহার অবস্থা কৃপণের প্রপৌত্রের সহিত তুলনীয়।

পদার্থ ও শক্তির কয়েকটি ধর্ম্ম পরস্পরের অনুরূপ। পদার্থের ধ্বংস নাই, শক্তিরও ধ্বংস নাই। জগতে পদার্থ ও শক্তি উভয়েরই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার বেশীও হয় না কমও হয় না। পদার্থ বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু উহার বিনাশ নাই। একবিধ শক্তি অন্যবিধ শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু উহারও বিনাশ নাই। এ পর্য্যন্ত পদার্থ ও শক্তি পরস্পরের সহিত মিলে। কিন্তু ক্রমাগত শক্তির অপচয় হইতেছে। মানবের কার্য্যোপযোগি শক্তি কার্য্যের অনুপযোগি আকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পদার্থ সম্বন্ধেও এরূপ নিয়ম সম্ভব কি না? দুই বস্তুর যদি কতকগুলি গুণ একরূপ হয় তবে একের অন্য গুণের সহিত অপরের তৎসদৃশ আর একটি গুণ থাকা সম্ভব। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক তথ্য এইরূপ সদৃশত্ব (analogy) হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে। শব্দ প্রবাহের সদৃশত্ব হইতে তড়িৎ ও আলোকপ্রবাহের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে, ও পরে তাহার যাথার্থ্য অন্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। সদৃশত্ব সত্য আবিষ্কারের পক্ষে সহায়তা করে; কিন্তু তাই বলিয়া উহা নিজেই প্রমাণ নহে। কোন তথ্য সত্য বলিয়া স্থাপিত করিতে হইলে অন্য প্রমাণ আবশ্যক। পৃথিবীতে দ্রব্যের বিকৃতাবস্থা কি রকম ভাবে ঘটিতেছে? ঐরূপ ভাবে চলিলে কত দিনে দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতা পর্য্যুদস্ত হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে একটা জমাখরচের হিসাব তৈয়ারি করিতে হইবে। জমার ঘরে পৃথিবীর সদবস্থায় অবস্থিত (raw material) দ্রব্যের মাত্রা রাখিতে হইবে; এবং খরচের ঘরে গড়ে বাৎসরিক কত দ্রব্য বিকৃতাবস্থাপন্ন হইতেছে তাহা ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। এই দুইটি হিসাব (data) যোগাড় হইলে তাহা হইতে বর্ত্তমান সভ্যতার স্থিতিকাল নির্দ্ধারণ করা সহজ। বলা বাহুল্য ঐ দুটি হিসাব (data) যোগাড় করাই কঠিন এবং বর্ত্তমানকালে অসম্ভব। কারণ পৃথিবীর গর্ভে কোথায় কত লুক্কায়িত দ্রব্য আছে তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। লুক্কায়িত দ্রব্যের (raw material) মাত্রা যে সসীম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ পৃথিবী স্বয়ং সসীমা। অনুমান করিয়া লওয়া যাউক পৃথিবীর দ্রব্যের (raw material) সমষ্টির পরিমাণ (ক) এবং বার্ষিক যে দ্রব্যের বিকৃতাবস্থা ঘটিতেছে তাহার পরিমাণ (খ)। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গণনানুসারে বর্ত্তমান সভ্যতার আয়ুষ্কাল ক/খ বৎসর অর্থাৎ ঐ সময়ের পর পৃথিবীতে দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার আয়ুষ্কাল যে নিশ্চয়ই ক/খ বৎসর তাহা বলা যায় না, উহার কম হওয়াই সম্ভব। কৃপণের উদাহরণ এ বিষয় বুঝিতেও সহায়তা করিবে। মনে করা

যাউক, কৃপণের পৌত্র যেরূপ অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লুকায়িত অর্থাদি পাইয়াছিল, কৃপণের প্রপৌত্রও তদপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ ও শ্রমসহকারে সেই সকল স্থান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। অথচ মৃত্তিকার খুব নীচে কৃপণ এক কলস রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছিল। প্রপৌত্র তাহা পাইল না ও তাহার ফলে তাহাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। হয় ত দুই হাজার বর্ষের পরের মানুষ বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বর্ত্তমান কালের মানুষের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইবে; তাহা বলিয়া তাহারা যে তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অধিক আবিষ্কার করিতে পারিবে, তাহা বলা যায় না। কাজেই ভূমণ্ডলে পদার্থ থাকিলেও উহা অনাবিষ্কৃত ও অব্যবহার্য্য হইয়া লোকের কোনও উপকার করিতে পারিবে না। কাজেই সদবস্থাপন্ন অবস্থার দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও তাহার অপ্রাপ্তি নিবন্ধন বর্ত্তমান সভ্যতা স্রোত সেইখানেই প্রতিহত হইবে।

এক্ষণে কোন্ পদার্থ কিরূপভাবে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্তি হইতেছে, তাহার একটি তালিকা দেওয়া যাউক।

(১) কয়লা:—এই পদার্থের উপর বর্ত্তমান সভ্যতা কিরূপ ঋণী তাহা সকলেই অবগত আছেন। সভ্যতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কয়লাকে একটা পা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। রেল ষ্টীমার, বিবিধ কল কারখানা কয়লার প্রভাবেই চলিতেছে। খণিজ দ্রব্য হইতে লৌহাদি ধাতুকে বাহির করিতে কয়লা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সকলেই অবগত আছেন সুপ্রসিদ্ধ তাতা ভারতবর্ষে লৌহের কারখানা খুলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম কয়লার সুবিধাই খুঁজিতে ছিলেন। কয়লার অভাবে ঐ সকল কলকারখানা শিল্পাদি যে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সম্ভবতঃ বহু শিল্প একবারেই বিনষ্ট হইবে। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে কয়লার শুধু খরচ হইতেছে, উৎপত্তি হইতেছে না। পণ্ডিতগণের মতে অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীতে কোনও জীব ছিল না কেবল উদ্ভিদ্‌ই ছিল, তখন বড় বড় বন ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া এবং বহু বর্ষকাল তথায় থাকিয়া কয়লা সৃষ্টি করিয়াছে বর্ত্তমান কালে সেরূপভাবে কয়লা সৃষ্টি হইতেছে না, অথচ প্রচুর খরচ হইতেছে; কাজেই পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লা যে শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমেরিকান পণ্ডিতগণ অনুমান করেন পাঁচ শত বৎসর পরে পৃথিবীতে কয়লার দুর্ভিক্ষ হইবে।

(২) কাষ্ঠ,—ইহাও এক পরম প্রয়োজনীয় পদার্থ; বাড়ী ঘর, নৌকা, জাহাজ, সেতু, রেলগাড়ী, কড়িবরগা ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে ইহার ব্যবহার হয়। গড়ন কাষ্ঠের প্রয়োজন বর্ত্তমান কালে এত অধিক বাড়িয়াছে যে, তাহার ফলে কএক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর বহুকাল-সৃষ্ট অরণ্যনিচয়

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বন সকল যত শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তত শীঘ্র প্রস্তুত হয় না।

(৩) লৌহ ঃ—এই পরম প্রয়োজনীয় পদার্থকে সভ্যতার দ্বিতীয় পাদস্বরূপ কহা যাইতে পারে। ইহা অবিশ্রান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। লৌহদ্রব্যাদি বায়ু ও জলের প্রভাবে মরিচাযুক্ত হইয়া কিয়ৎকাল মধ্যেই ক্ষয়িত হইয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত হয়। সেরূপ অবস্থায় লৌহকে পুনরায় ধাতুতে পরিণত করা যায় না। বর্ত্তমান সভ্যতায় লৌহের ব্যবহার অতি বিস্তীর্ণ। লৌহদ্বারা রেলরোড, রণতরী, অস্ত্রশস্ত্র, কড়ি বরগা, বিবিধ যন্ত্র, কামান বন্দুক, টিনের ও ষ্টীলের বাক্সের পাত, ছাদের জন্য corrugated rion sheet, সেতু, ইনামেলের দ্রব্য ইত্যাদি অগণ্য পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। ঈদৃশ পরম প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাবে মানবসমাজের কিরূপ ক্ষতি হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(৪) গন্ধকঃ—ইহা সভ্যতার তৃতীয় পাদ বলা যাইতে পারে। গন্ধক ও তাহা হইতে প্রস্তুত সালফিউরিক এসিডের অভাবে বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ শিল্পাগারই (industry) বন্ধ হইয়া যাইবে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে দেশে বৎসরে যত অধিক সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয় সে দেশের সভ্যতাও তত অধিক। বিবিধ বারুদ ও বাজির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রচুর গন্ধক ব্যবহৃত ও নষ্ট হইতেছে। পরিষ্করণ আদি কার্য্যে ব্যবহৃত সালফিউরিক এসিডও যথেষ্ট নষ্ট হয়।

(৫) তাম্রঃ—এই পদার্থ এক্ষণে বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্পর্কে আসিয়াও মুদ্রার জন্য যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে। তাম্রের অভাবে তড়িৎবাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অধুনা তড়িৎ-রেলওয়েতে প্রচুর তাম্র ব্যবহৃত হইতেছে। তাম্র এবং তাম্র ও অন্যান্য ধাতুসহযোগে প্রস্তুত পিত্তল ও কাঁসার বাসনাদি কত শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই হিসাবে ধরিলে সমগ্র পৃথিবীতে ইহা কত নষ্ট হইতেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(৬) রৌপ্যঃ—অলঙ্কার ও মুদ্রার জন্য এই পদার্থ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ পরিচালনের ইহা সুবিধাজনক হইলেও অধিক দাম বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। গহনাদি ক্ষয়িত হইয়া কিছুকাল পরে ওজনে কম পড়ে। ক্ষয়িত রৌপ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সকল মাটির সহিত মিশিয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে সিলভার, নাইট্রেট অব্ সিলভার ব্রোমাইড ইত্যাদি পদার্থে রৌপ্য ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল দ্রব্য চুলের কলপ, মার্কিংইঙ্ক, ও ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হইয়া নষ্ট হয়। এতদ্দ্বারাও অনেক রৌপ্য নষ্ট হয়।

(৭) স্বর্ণঃ—ইহাও মুদ্রা ও অলঙ্কারার্থ ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণের গহনা ও মুদ্রা ব্যবহারে ক্ষয়িত হইয়া যায়। গহনার রং করিতে ও গিল্‌টি করিতে অনেক স্বর্ণ লোকসান হয়। অধ্যাপক রায় তাঁহার হিন্দুরসায়ন গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, শুদ্ধ কলিকাতা সহরেই

প্রতি বৎসর রং করিবার সময় বহু টাকার স্বর্ণ লোকসান হয়।

(৮) টীন, সীসা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু সম্বন্ধেও ঐসকল নিয়ম খাটে। corrugated iron sheet করিতে দস্তারই যথেষ্ট ব্যবহার হয়। দস্তা না থাকিলে উহার লৌহ শীঘ্র শীঘ্র ক্ষরিত হইয়া যাইবে। টীনের বাক্সাদিতে টীনের প্রয়োজন। প্রতিবৎসর কত টিনের বাক্স ও কৌটা লোকসান হয় তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। condensed milk, বিস্কুটাদির কৌটা কিছুকাল মধ্যে ভাঙ্গিয়া ও মরিচাযুক্ত হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া যাইতেছে। গুলিগোলাদি প্রস্তুত করিতে সীসার প্রধান প্রয়োজন। প্রতিবৎসর সমর ব্যাপারে অজস্র সীসা নষ্ট হইয়া থাকে।

(৯) সার ঃ—ইহা সভ্যতার চতুর্থ পাদ। নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ঘটিত পদার্থ সকলই উদ্ভিজ্জ জীবন রক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদন। ঐ সকল পদার্থের অপচয় অর্থে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অপচয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ অপচয় অত্যধিক পরিমাণে হইতেছে। বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ সমূহে প্রচুর পরিমাণে বারুদ ব্যবহৃত হয়। ধুম বিহীন বারুদই হউক আর নাইট্রোগ্লিসিরিনই (Nitroglycerin) হউক উহা প্রস্তুত করিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রেট (Nitrate) লাগে। বারুদ পুড়িলে ঐসকল পদার্থের নাইট্রোজেন বায়বীয় মূলপদার্থ নাইট্রোজেনে পরিণত হইয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হয়। এই অবস্থা হইতে উহাকে পুনরায় সারের নাইট্রেটে পরিণত করা সহজ নহে। আর একবিধ উপায়ে সারের অপচয় হইতেছে। আদিম অবস্থায় মানুষ বনে জঙ্গলে, ও পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে। সভ্যাবস্থায় তাহারা বড় বড় নগরে বাস করে। মোট হিসাবে ধরিলে মানুষ উদ্ভিজ্জ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং উদ্ভিজ্জগণ মাটী হইতে আপনাদের খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া প্রাণধারণ করে। পল্লীবাসী বা জঙ্গলবাসী মানবের বিষ্ঠামূত্রাদি জমির উপর ত্যক্ত হয়; মানুষ মরিয়া গেলে তাহার দেহ কোন স্থলে ফেলিয়া দেয় বা পুঁতিয়া ফেলে। বিষ্ঠামূত্রাদি ও মৃতদেহ পশু, কীট এবং বায়ু ও জলের সাহায্যে পরিণামে পুনরায় মাটীর সহিত মিশ্রিত হয়। কাজেই মোটের উপর মাটীর কোন বিশেষ লোকসান হয় না, উহা যাহা দিয়াছিল, তাহাই ফিরিয়া পায়। এই কারণে অসভ্যদেশে জমির উর্ব্বরতাশক্তি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু সভ্যাবস্থায় যখন মানুষ নগরে বাস করে তখন বহু সংখ্যক লোকের বিষ্ঠামূত্র ও আবর্জ্জনা দূরীভূত করিবার বন্দোবস্ত করা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া উঠে। এই আবর্জ্জনা দূর করাই মিউনিসিপালিটি সৃষ্টির প্রধান কারণ। কলিকাতার লোকে বাখরগঞ্জের খাবার খাইয়া জীবিত থাকে। যদি কলিকাতার লোকের বিষ্ঠামূত্রাদি বাখরগঞ্জের যে সমস্ত জমি হইতে শস্য

লওয়া হইয়াছিল তাহাতে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং কলিকাতার লোক মরিলে তাহাদের মৃতদেহ সেই সকল জমিতে দেওয়া হয়, তবে বাখরগঞ্জের জমির উর্ব্বরতার বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ঘটে না। সাধারণ স্বাস্থ্যের ও ধর্ম্মের অনুরোধে লোকের মৃতদেহ হয় পোড়ান হয়, নয় গভীর গর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুতিয়া ফেলা হয়। সমগ্র সহরের বিশাল আবর্জ্জনারাশির অতি অল্প ভাগের অধিক ব্যবহার করা যায় না। অধিকাংশ ভাগ নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। নদী তাহা সাগরে লইয়া গিয়া সাগরের জলের সহিত মিশাইয়া দেয়। এরূপ ব্যবস্থায় ঐ সকল নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ সারের হিসাবে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কারণ আবার জল হইতে নাইট্রেট উদ্ধার করা সহজ ব্যাপার নহে।

উপরে আমি আমার বিষয়ের অতি সংক্ষিপ্ত সার মাত্র দিয়াছি। এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আরও বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। উপসংহারে আমি একটি অবান্তর কথার উল্লেখ করিবার লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। অনেকের বিশ্বাস ভারতবর্ষের উর্ব্বরতাশক্তি অনন্তকালস্থায়িনী, কিন্তু তাহা নহে। নিম্নলিখিত কারণ সমূহের ফলে ভারতের জমির উর্ব্বরতাশক্তি দিন দিন নষ্ট হইতেছে।—

(ক) ধান্য গোধুম পাট প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য ও শস্য এ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। প্রকৃতিকে মানুষ কখনই ঠকাইতে পারে না। প্রকৃতি যাহা পায় তাহাই মানুষকে প্রত্যর্পণ করে। যে সকল শস্যাদি বিদেশে যাইতেছে তাহার সহিত ভারতের প্রচুর নাইট্রোজেন ও ফসফরাস আদি পদার্থ যাইতেছে ; তাহা আর এ দেশে ফিরিয়া আসিতেছে না।

(খ) এ দেশ হইতে প্রচুর সার প্রতি বৎসর বিদেশে যায়। সোরা এক অতি উৎকৃষ্ট সার। এ দেশের মাটি হইতে উহা উৎপন্ন হয়। প্রচুর সোরা প্রতিবৎসর বারুদাদি প্রস্তুত করিবার জন্য বিদেশে যায়। সেইরূপ আজকাল হাড়ও বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। হাড়ের সঙ্গে অনেক ফসফরাসঘটিত প্রয়োজনীয় সার বিদেশে যাইতেছে। এ সব আর ফিরিয়া আসিতেছে না এবং এসব ক্ষতি দেশের পক্ষে চিরস্থায়ি ক্ষতি। প্রাচীন কালের চাষা এইসব সারের ব্যবহার না জানিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। কারণ দেশের জিনিশ দেশেই থাকিত। উহা নানা উপায়ে পশ্বাদির দ্বারা দেশেই ছড়াইয়া পড়িত। কুকুর শৃগালে হাড় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া ফেলিত, সেখানে তাহা ক্রমশঃ পচিয়া সার হইত।

(গ) অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশের বড় বড় নগরীর বিষ্ঠামূত্রাদি সারও সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না। ইহাতেও বার্ষিক যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পারস্যদেশীয় কবি হাফেজের প্রথম গজল্।

উপক্রমণিকা।

প্রসিদ্ধনামা হাফেজ ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর কবিতাগুলি অনেক ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংরেজীতেও হাফেজের কবিতার মেজর ক্লার্ক (Major Wilberforce clarke) কর্তৃক বিরচিত একটা গদ্যানুবাদ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সে অনুবাদ অনেকস্থলে অশুদ্ধ, এবং মূল হইতে অস্পষ্টতর। জর্ম্মণ ভাষায় দেওয়ান হাফেজের এক পদ্যানুবাদ আছে। অনুবাদকের নাম Baron Rosenzweig-Schannau. এই অনুবাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পদ্যানুবাদ আজ পর্য্যন্তও কোন ইয়ুরোপীয় ভাষায় দেখি নাই। এই বঙ্গানুবাদে অনুবাদক হাফেজের Sudi—সুদী নামক—বসনীয় (Bosnian) টীকাকারের মত অনুসরণ করিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষীয় টীকাকারদিগের ন্যায় ইনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় লিপ্ত হন নাই। বলাবাহুল্য যে, হাফেজ মদিরা উপাসনার অর্থে, পান্থগৃহস্বামী অর্থাৎ—ভাঁটীওয়ালা—ধর্ম্মগুরুর অর্থে—এবং প্রেমিকা ঈশ্বরের অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

অনুবাদ।

১

মদিরা-পূর্ণ পেয়ালা সত্বরে *
দাও পাত্রবাহি ঘুরায়ে আমারে
প্রেমভার লঘু আছিল ধারণা,
পরিণামে তার পেয়েছি যাতনা।

* এই গজলের প্রথম ছত্র আরবী ভাষায়। উহার প্রকৃত লেখক মোয়া উইয়ার পুত্র খালিফা ইয়াজিদ; ইহাঁর রাজত্বকালে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মহম্মদের দৌহিত্র হুসেন কারবলাতে নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হন। ইশলামধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ পারস্যদেশে, ইয়াজিদের নাম অপেক্ষা কোন নাম ঘৃণিততর নহে। 'ইয়াজিদ' বলা অপেক্ষা পারস্যদেশবাসিদিগের মধ্যে কোন গুরুতর ভর্ৎসনা নাই। অতএব, অনেকে কবিবর হাফেজের উপর এই দোষারোপ করিয়াছেন যে, তাঁহার মত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইয়াজিদের ন্যায় কাফেরের কবিতা হইতে নিজ কাব্য গ্রন্থের সর্ব্ব প্রথম ছত্র অপহরণ করিয়াছেন। আহ্লীনামক সিরাজের জনৈক কবি লিখিয়াছেন ;—

"কোন রাত্রে আমি খাজা হাফেজকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার মত ধার্ম্মিকপ্রবর কবি-কুল-চূড়ামণি এই হতভাগা ইয়াজিদের কবিতা হইতে

২

কস্তুরী কদাপি বেণী হ'তে তার,
প্রভাত-অনিল করিবে বিস্তার—
—এই আশা ধ'রে কত রক্তময়
তার কেশ তরে হ'য়েছে হৃদয়।

৩

পান্থগৃহস্বামী হইলে সম্মত,
কর পূজাসন মদিরা-রঞ্জিত,

নিজ কাব্য গ্রন্থের প্রথম ছত্র কি কারণে গ্রহণ করিলেন?" হাফেজ উত্তর দিলেন,—"তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, জান না কি মুসলমানের পক্ষে কাফের হইতে অপহৃত দ্রব্য 'হালাল' অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত।"

ইয়াজিদ আরব দেশীয় প্রধান কবিদিগের মধ্যে গণ্য। তাঁহার কবিতার কেবল কতকগুলি ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। পাঠ্যাবস্থায় তাহার মধ্যে একটির নিম্নোদ্ধৃত ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলাম।

"Like the moon her veil was gleaming
With the light that thence was streaming.
When she came, her thin waist swinging
Swinging like a branch unbent.
With one hand she 'gan bestowing
Wine on me that bright was glowing
Glowing like her cheek's vermilion—
—Hue that modesty had lent.
Then a few steps she retreating
Said in accents soft entreating
While the sun of wine was shining
And she knew what her speech meant:—
"Leave me not for thou hast reft me
Of my peace, nor strength hast left me
Strength to take leave of one parting,
Lo! my firmness is all spent."
Dooming me to be forsaken
E'en by dreams my sleep thou hast taken
Nor hast left me tears for weeping
O'er the traces of thy tent."

তার—অর্থাৎ যে ব্যক্তির উপর প্রণয় আছে। ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে। 'কস্তুরী' এই স্থলে সৌরভ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কেশ' এবং 'বেণী' ঐশ্বরিক মহিমার প্রসারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

রক্তময় হৃদয় ইত্যাদি—'হৃদয়' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তির হৃদয়। টীকাকারদিগের মতে 'রক্তময়' শব্দের দ্বারা পারস্যদেশীয় মৃগনাভির উৎপত্তির বিষয় একটি পুরাতন জন-সংস্কারের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ যে মৃগনাভি মৃগের হৃদয়ে ঘনীভূত রক্তের 'ঢেলা' ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

পান্থগৃহস্বামী এই শব্দ "pèr-i-mug-hàn" এর প্রকৃত অনুবাদ; এই পার্শি শব্দ দ্বয়ের আক্ষরিক অর্থ "বৃদ্ধ অগ্নি উপাসক"

পথের বিষয় অজ্ঞাত সে নয়,
বিরাম আগার জানা আছে তার।

৪

বঁধু গৃহে গিয়া কি সুখ পরাণে
পেতে পারি আমি থাকিয়া সেথানে ?
শঙ্কা যে কারণে ডাকে ক্ষণে ক্ষণে
"মোট বাঁধ্ আর হয়েছে সময়।"

৫

তামসী রজনী তরঙ্গ ভীষণ
ঘূর্ণিজল হেরি ভীত হয় মন
লঘুভার পর থাকি সিন্ধু তীরে
অবস্থা আমার বুঝিবে কি করে ?

৬

নিজ ইচ্ছা মত সদা কাজ করি
লভেছি দুর্নাম অপবাদে মরি
যার আন্দোলনে মত্ত সভাজনে
সে কথা কেমনে থাকিবে গোপনে ?

৭

শান্তিলাভ যদি তোমার বাসনা,
একথা হাফেজ ! কখন ভুল না
"ভালবাস যারে, পাও যদি তারে,
এ ছার সংসার কর পরিহার।"

শ্রীহরিনাথ দেব।

(Old Magian)। পারস্য দেশ যখন ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন পান্থগৃহাদি (যে স্থানে মদ্য এবং অপরাপর মাদক দ্রব্য বিক্রয় হইত) অগ্নি উপাসকদিগের তত্ত্বাবধানে ছিল, কারণ ইসলামধর্ম্মে মদ্য সম্পর্কীয় সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ ছিল। কোরাণশরিফে অনেক স্থলে বিশেষরূপে "মদিরা অদেয়া, অপেয়া, অগ্রাহ্যা" লিখিত আছে। পান্থগৃহস্বামীর আধ্যাত্মিক অর্থ "ধর্ম্ম-গুরু।" "পূজাসন"—Sajjâda অর্থাৎ Prayer-carpet এর অনুবাদ।

পথের বিষয় ইত্যাদি—পথ অর্থাৎ ধর্ম্ম-পথ।

অজ্ঞাত সে নয়—অর্থাৎ ধর্ম্মগুরু ধর্ম্ম-পথের বিষয় সবই জানেন। পারশী মূলে Salik অর্থাৎ পথিক কথাটি আছে, যাহা তুরস্ক টীকাকার "সেই পথিক" অর্থাৎ পান্থগৃহস্বামীর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই পংক্তির আক্ষরিক অনুবাদ "কেন না সেই পথিক পথ এবং পথের আড্ডা সকলের বিষয় অজ্ঞাত নহে।" [ভারতবর্ষীয় টীকাকারেরা ইহার নিম্নলিখিত অশুদ্ধ অর্থ করেন "কোন পথিকের পথ এবং আড্ডার বিষয় অজ্ঞাত থাকা উচিত নয়"]।

বঁধু গৃহ অর্থাৎ সংসারের সুখ ও ঐশ্বর্য্য

শঙ্কা ইত্যাদি, মূলে "ঘণ্টা" আছে, অর্থাৎ মৃত্যুর ডাক।

তামসী রজনী ইত্যাদি—এখানে ভক্ত নিজ চিত্তের অবসন্ন অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

লঘুভার ইত্যাদি—যাহারা অজ্ঞান সাংসারিক অবস্থায় থাকিয়া পরলোকের কোন চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না।

নিজ ইচ্ছা—ভক্ত যৌবনকালে অবিবেকতার বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কাজ করিয়াছিল, তাহাদিগের জন্য আক্ষেপ করিতেছে।

যবে আন্দোলনে—অর্থাৎ যে সকল কথা আমোদের জন্য বন্ধুরা একত্র মিলিয়া আলোচনা করে।

সভাজন—মূল পারশীতে "mahfil-ha" যাহার ইংরেজী অনুবাদ "clubs."

অযোধ্যার মন্থরা।

যেমন গোলাপ, গন্ধরাজ, কুন্দ, কমল, কেসর, কামিনী, এবং যূথিকা ও বেলী প্রভৃতি সুরভি-সুন্দর সুখ-শীতল কুসুমের বিলাস-উদ্যানে বিষাক্ত বিছুটী লতা; অথবা যেমন কপোত, কোকিল, শ্যামা ও দয়েল প্রভৃতি কল-কণ্ঠ-বিহঙ্গ-কুজিত বিনোদ-বিপিনে বিষধর-কল্প বাজপক্ষী, তেমনই অযোধ্যার রাজভবনরূপ আনন্দময় দেব-নিবাসে বিষের হাঁড়ী মন্থরা। বিছুটীর দ্বারা এই বিশাল বিশ্বসৃষ্টির কি বিশেষকার্য্য সংসাধিত হয়, তাহা জানি না, এবং উদ্ভিদ্‌বৈজ্ঞানিকেরা সে নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহাও অবগত নহি। বিষ-ভয়ঙ্কর বিকট-নেত্র বাজ, নিরীহ নিরুপদ্রব কোকিল ও কপোত প্রভৃতির কণ্ঠরক্ত শোষণ করিয়া, বিশ্বরহস্যের কোন্ কল্যাণকর উদ্দেশ্য সম্পাদন করে, তাহাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু শতবিছুটী-বাজাত্মিকা, সাক্ষাৎ বিভীষিকা মন্থরার দ্বারা রামায়ণরূপ বিশ্বদুর্লভ মহাকাব্যের সৃষ্টি অথবা বিকাশ বিষয়ে, বিশেষ কি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, বাল্মীকি তাহা মনুষ্যজাতিকে প্রকারতঃ বুঝাইতে ত্রুটি করেন নাই। অতএব মন্থরার চিত্রতত্ত্ব অথবা চারিত্রিক ইতিবৃত্ত, কবি ও দার্শনিক উভয়েরই আলোচ্য বস্তু।

কিন্তু, মন্থরাকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে, বাল্মীকির রামায়ণ সংক্রান্ত দুই একটি কথা সংক্ষেপে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। বাল্মীকির রামায়ণকে এই মাত্র আমি মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু উহা এক দিকে যেমন মহাকাব্য, আর একদিকে সেইরূপ মহামূল্য জাতীয় ইতিহাস। এ পৃথিবীতে হোমর তাঁহার ইলিয়দ্ ও ওদিসি, মিলটন্ তাঁহার স্বর্গভ্রংশ ও স্বর্গোদ্ধার, এবং আরও অনেকে, অনেকপ্রকার মনোহর নামে, মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু, বাল্মীকির অপূর্ব্বকথাময় রামায়ণ-কাব্য যে অর্থে মহাকাব্য, সে অর্থে, কোন দেশে,

শান্তিলাভ ইত্যাদি—মূল পারশীতে;—"huzúri gar hami khwáhí azú ghá-yab ma shav Háfiz"—অর্থাৎ "যদি শান্তি অভিলাষ কর, হাফেজ তুমি একথা হইতে বিস্মৃত হইও না।"—সুদির মতে huzúri কথার অর্থ 'istaráhat অর্থাৎ "শান্তির ইচ্ছা" ("Safar" অর্থাৎ "পরিভ্রমণ" এর বিপরীত) Ghayáb এর অর্থ "ghâfil" বিস্মৃত। azúর অর্থ "তাহা হইতে অর্থাৎ" নিম্নলিখিত কথা হইতে—"ভালবাস যারে" ইত্যাদি।" সুদি লিখিয়াছেন "azú" শব্দটা ঈশ্বরের প্রতি নির্দ্দেশ করা অমার্জ্জনীয় ভ্রান্তি। (ভারতবর্ষীয় টীকাকারগণ অন্যরূপ অর্থ করেন; কিন্তু তাঁহাদের মত শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

কোন কালে, তেমনই আর একখানি মহাকাব্য সৃষ্ট হয় নাই ; এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে, এমনও সম্ভাবনা নাই। কারণ, মহাকাব্যের মূল মাহাত্ম্য মানবজাতির আদর্শ-চরিত্র প্রদর্শন। বাল্মীকি এ অংশে যেরূপ কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন,এবং যেরূপ আদর্শ-চরিত্র প্রদর্শন করিয়া মানব-জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই।

পরন্তু, যদি প্রকৃত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামায়ণী কথাকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলেও পৃথিবীতে এই ইতিহাসের উপমাস্থল নাই। গ্রীক্, মিশর, বাবিলন, ইহুদী, এবং কার্থেজ ও রোম প্রভৃতি পুরাতন রাজ্যনিচয় ; আর রুষ, প্রুস্, ফরাসী, স্পেন, ইংলণ্ড ও ইটালি প্রভৃতি নূতন রাজ্যসমূহেরও ইতিহাস আছে। কিন্তু কোন রাজ্যের কোন সময়ের ইতিহাসে, কখনও কোনপ্রকারে, রামায়ণীর ইতিহাসের ছায়াপাত হয় নাই; —পৃথিবীর ইতিহাসে, কোন কালেও, কোন দেশে, দশরথের মত পিতা, কৌশল্যার মত মাতা, রামের মত পিতৃভক্ত পুত্র ও প্রজারঞ্জন রাজা, ভরত ও লক্ষ্মণের মত ভক্তিমান্ ভ্রাতা, আর জানকীর মত পতিপ্রাণা সতী জন্মগ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রামায়ণকে কাব্য বলিলে, উহার কাব্যত্বের কুঞ্চী কঠোরস্বভাবা মন্থরার হাতে ; আর উহাকে ইতিহাস বলিলে, সে ইতিহাসেরও আরম্ভ মন্থরার আবির্ভাব-সময় হইতে। যদি মন্থরা না থাকিত,—যদি রামায়ণী আখ্যায়িকায় মন্থরার কার্য্যসম্পর্ক না রহিত, তাহা হইলে কি ফুটিত ?—কি হইত ?—রাম-চরিত্ররূপ বিশাল ইতিহাসেই বা জাগতিক ইতিহাসের বিশেষ কি ঘটিত ? রাজা দশরথের প্রাণাধিক পুত্র পুরুষ-প্রবীর রামচন্দ্র, জনক-নিকেতনে, ধনুর্ভঙ্গপণে, জানকী-হেন রমণীরত্নকে লাভ করিয়া, যশোমাল্যে বিভূষিত হইতেন,—পিতার শ্রদ্ধা ও স্নেহে অযোধ্যার অধিরাজপদ লাভ করিয়া, প্রজাদিগকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালনের দ্বারা, পৃথ্বীপাল-সমাজে প্রশংসা পাইতেন ; এবং পরিশেষে,—জীবনের অবসান সময়ে,পুত্রপৌত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া, পুণ্যময় দেবধামে চলিয়া যাইতেন।

এই কয়টি ক্ষুদ্র কথায় একটা মহাকাব্য হয় না, সামান্য এক খানি উপাখ্যান হয়। ইহার দ্বারা বৃহৎ একটা ইতিহাসেরও সৃষ্টি হয় না, ইতিহাসের উপাদানভূত এক খানি চরিতাখ্যান মাত্র সঙ্কলিত হয়। কিন্তু যেই রামায়ণীর ঘটনাস্রোতের এক প্রান্তে, কুপিত কেতুগ্রহের দৃষ্টির মত, মন্থরার দৃষ্টি পড়িল, অমনি উহা কাব্যে পরিণত হইল ;—উহার ঐতিহাসিক প্রবাহ, অদৃষ্টপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া, তর-তর বেগে—তরঙ্গক্ষোভে বহিতে আরম্ভ করিল। যেখানে সকলে, পরস্পরের প্রীতিস্নেহে ও প্রাণভরা ভালবাসায়, যার-পর-নাই সুখ-শান্তিতে দিনপাত করিতেছিল, সেখানে অকস্মাৎ একটা লোক-ভয়ঙ্কর ও অদৃষ্টচর দাবদাহবৎ অগ্নি সমুদ্ভূত হইয়া, অযোধ্যার সমস্ত সুখ-সমৃদ্ধি

মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল;—যে অযোধ্যা প্রাতঃসময়ে শতসহস্র লোকের হসিতচ্ছবিতে কুসুম-হাস্যবিলসিত সুরম্য উদ্যানের মত শোভা পাইতেছিল, সেই অযোধ্যাই, সন্ধ্যা হইতে না হইতে, শ্মশানের মূর্ত্তি ধারণ করিল;—অযোধ্যার শত-সহস্র কণ্ঠ নিঃসৃত সকরুণ হাহাকার-ধ্বনি ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্থিত হইয়া, তরুবিবরবাসী বিহঙ্গদিগকেও বিদ্রাবিত করিল।

পাঠকের মনে এখনে অবশ্যই এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনুষ্যজগতে মুহূর্ত্তের মধ্যেই এরূপ মনোবিপ্লব সম্ভবপর হয় কি? এরূপ অসম্ভব ঘটনাও, দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষের বিচিত্র সংযোগে, কিরূপে সুসম্ভব হয়, বাল্মীকি তাহা তাঁহার দেবতূলীতে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। বারুদের ম্যাগেজিন্ যেমন, বহ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শ মাত্রেই, হু হুঃ শব্দে জ্বলিয়া উঠে, মনুষ্যবিশেষের হৃদয়ও, সেইরূপ, মন্দ কথার স্ফুলিঙ্গমাত্রক্ষেপেই, কি প্রকারে, মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, বাল্মীকি তাহা বুঝাইতে বিশেষরূপ যত্ন পাইয়াছেন। হৃদয়বিজ্ঞানের এই নিগূঢ় তত্ত্বই বাল্মীকীয় রামায়ণের প্রাথমিক ভিত্তি। বাল্মীকি কিরূপ সূক্ষ্মসূত্রে মন্থরাকে কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়া কাব্যে গাঁথিয়াছেন, এবং তাহার বিষ-ক্রিয়ার বিষম শক্তি প্রদর্শন করিয়া, মানব-হৃদয়েব তত্ত্বজ্ঞতা সম্বন্ধে, সেই পুরাতন ঋষিযুগেও কলির কবি শেক্ষপীরের সমান সূক্ষ্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠক স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করুন।

বাল্মীকির প্রাণপ্রিয়-প্রেমাবতার, পরহিতৈষী ও পুণ্যব্রত রাম কল্য প্রভাত সময়ে রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন শুনিয়া, অযোধ্যায় আনন্দের তুফান উঠিয়াছে। লোকে অযোধ্যানগরীর সমস্ত রাজপথে জলসেচন করিতেছে, এবং নগরের সমস্ত স্থানকে শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্মের সহস্র সহস্র মালায় অলঙ্কৃত করিয়া, কল-কল-কোলাহল-ময় লোকালয়েও, কমল-কাননের শোভা ফলাইয়াছে। নগরের কোন স্থানে ব্রাহ্মণগণ মাল্য ও মোদক হস্তে উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি-পাঠে নিরত,—কোন স্থান মধুর-গম্ভীর বাদ্য-ধ্বনিতে নিনাদিত;—দেবালয়সমূহের দ্বারদেশ ধবল শোভায় উজ্জ্বলিত, এবং নগরের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকই ধ্বজ-পতাকায় অলঙ্কৃত। কেহ হাসিতেছে, কেহ নাচিতেছে—কেহ গাইতেছে, কেহ বাজাইতেছে;—কেহ কেহ, গীত-বাদ্যের তালে তালে, করতালি দিয়া, মনের আনন্দে বেড়াইতেছে। নগরের সর্ব্বত্রই বেদধ্বনি—সর্ব্বত্রই সমীর-সন্দোলিত ধ্বজ-পতাকার পত-পত-শব্দ,—সকল স্থানেই পৌর ও জানপদ-বর্গের আমোদ-হলাহলা।* অযোধ্যার এই মহাসুখকর মহোৎসব, কৈকেয়ীর পিতৃগৃহের দাসী, কুব্জভার-ক্লিষ্টা ক্রোধাবিষ্টা মন্থরার প্রাণে সহিল না।

"হৃষ্টপ্রমুদিতৈঃপৌরৈরুচ্ছ্রিত-ধ্বজমালিনীং,
অযোধ্যাং মন্থরা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতা।"*

উচ্ছ্রিত-ধ্বজমালিনী অযোধ্যার এই

* বাল্মীকির অযোধ্যাকাণ্ড।—ভাবানুবাদ।

অভিনব-সমৃদ্ধি মন্থরার চক্ষে বিষাক্ত শলাকার ন্যায় বিঁধিল। মন্থরা অযোধ্যার সকলকেই সুখ-প্রফুল্ল দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিল। অদূরে আর এক প্রাসাদের উপরে, শ্রীরামচন্দ্রের শৈশবধাত্রী দণ্ডায়মানা ছিল। তাহার পরিধানে শুভ্র-সমুজ্জ্বল ক্ষৌম বস্ত্র, মুখে সারল্যময় হর্ষোচ্ছ্বাস। মন্থরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"রামের মা কৌসল্যা, আজি বড়ই আহ্লাদে উন্মাদিত হইয়া, এত লোককে ধন দান করিতেছেন কেন, বলিতে পার? লোকেরাও দেখিতেছি আহ্লাদে যেন আর বাঁচে না। মহারাজ-মহীপতি কি তবে কৌসল্যা দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য করাইবেন?" *

সাধুস্বভাবা রামধাত্রী মন্থরার মনের কথা বুঝিল না। সে মন্থরাকে রামাভিষেকের সমস্ত কথা সরল হৃদয়ে খুলিয়া বলিল। মন্থরা, প্রত্যুত্তরে একটি কথাও না কহিয়া, এবং ক্ষণমাত্রও আর বিলম্ব না করিয়া, একবারে কৈকেয়ীর শয়ন-গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল।

রাজ্ঞী কৈকেয়ী বড় মানুষের মেয়ে,—সুন্দরী, সুশিক্ষিতা,—সুখ-সম্পদ-লালিতা,—স্বামিসোহাগিনী। তিনি চিরকালই ভোগলালসার লীলাময় সরোবরে, ফুল্লহসিত শতদলের মত, ভাসিয়া ভাসিয়া, পতির হৃদয়ে প্রীতির সুধা ঢালিয়াছেন; কখনও সংসারের কুট-কোলাহলে কর্ণপাত করেন নাই। মন্থরা যে সময় কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত, তখন তিনি একখানা কৌচের উপরে অর্দ্ধশয়ানা।

মন্থরা, কৈকেয়ীর সন্নিহিত হইয়া, এক ভয়ঙ্কর ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—"হা অবোধিনি! তুমি এখনও সুপ্ত রহিয়াছ?" কৈকেয়ী মন্থরাকে তাদৃশ বিষণ্ণ ও 'ব্যস্তসমস্ত' দেখিয়া একটু চমকিত হইলেন, এবং চকিতবৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মন্থরা কি হইয়াছে? তোমায় এমন দুঃখিত ও বিষাদিত দেখিতেছি কেন? আমার ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?" যথা বাল্মীকীয়ে—

"কৈকেয়ীত্বব্রবীৎ কুব্জাং কচ্চিৎ ক্ষেমং ন মন্থরে।
বিষণ্ণবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ে ভৃশদুঃখিতাম্।
মন্থরা তু বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যা মধুরাক্ষরং,
উবাচ ক্রোধসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিশারদা।
সা বিষণ্ণতরা ভূত্বা কুব্জা তস্যাং হিতৈষিণী,
বিষাদয়ন্তী প্রোবাচ ভেদয়ন্তী চ রাঘবম্।"

কৈকেয়ীর সে মধুরাক্ষরা কথা মন্থরার প্রাণে সহিল না। যে কথায় মনুষ্যের মঙ্গল হয়,—মনুষ্যসমাজে সুখ-শান্তি ও সুপ্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদৃশী কথার পূর্ব্ব সূচনা অথবা তদুপযোগী প্রশান্ত-ব্যবহারও মন্থরা-শ্রেণিস্থ লোকের প্রাণে সহ্য হয় না। মন্থরা বাক্যবিশারদা, অথচ বুদ্ধিমতী। সে ক্রোধে দ্বিগুণ জ্বলিয়া—দ্বিগুণতর বিষণ্ণ হইয়া, এবং যেন সে-ই সংসারে কৈকেয়ীর একমাত্র হিতৈষিণী, এমনই একটা ভাবের অভিনয় করিয়া, লোকাভিরাম রাম

* বাল্মীকির অযোধ্যাকাণ্ড।—ভাবানুবাদ।

চক্রের সর্ব্বনাশকামনায় গভীর-কণ্ঠে বলিতে লাগিল,——

"হা অভাগিনি, তোমার কি কিছুই জ্ঞান নাই? তুমি সুখসোহাগিনীর মত সুখের শয্যায় শুইয়া আছ। তোমার চারিদিকে কি হইতেছে,—কি ঘটিতেছে, তাহার কিছুই কি তুমি জানিতে পাও নাই?—তুমি কি ঘুণাক্ষরেও শুন নাই যে, মহারাজের অনুগ্রহে শ্রীরামচন্দ্র কল্য অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতে যাইতেছেন; এবং তাঁহার অভিষেক উপলক্ষে নগরের সমস্ত স্থানে উৎসব হইতেছে। রামের এ অভিষেকে তোমারই আতঙ্ক,—তোমারই আপদ্;—ইহা প্রকারতঃ তোমারই সর্ব্বনাশ। তোমার দুঃখ আমাকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতেছে। তুমি কি ইহা বুঝ না যে, শুধু তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ, তোমার বৃদ্ধিতেই আমার বৃদ্ধি, এবং তোমার সুখেই আমার সুখ? তুমি শ্রেষ্ঠ রাজকুলে জন্মিয়াছ,—রাজাধিরাজের মহিষী হইয়াছ; অথচ রাজধর্ম্মের উগ্রত্ব কিছুই বুঝিতেছ না। তুমি তোমার স্বামীকে ধার্ম্মিক ও মধুরভাষী বলিয়া জান; কিন্তু তিনি, বাহিরে তোমার কাছে নিতান্ত ধর্ম্মশীল হইয়াও, হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিতান্ত শঠ। তিনি তোমাকে প্রিয় কথায় পরিতর্পণ করিতেছেন, অথচ প্রকারতঃ কৌসল্যাকেই রাজ্যসম্পদ্ প্রদান করিতে যাইতেছেন। তিনি অতি দুষ্টাত্মা। তিনি, তোমার পুত্র ভরতকে কৌশলক্রমে তাঁহার মাতামহগৃহে প্রেরণ করিয়া, রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছেন; এবং এইক্ষণ অধিকতর কৌশলের সহিত সে কণ্টকশূন্য রাজ্য কৌসল্যার পুত্রকে প্রদান করিয়া, তোমাকে একবারে পুত্রের সহিত উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। হা কৈকেয়ি! তুমি এখনও বালিকা। তুমি বালিকা বলিয়াই সর্পসদৃশ ক্রূর-স্বভাব শত্রুকে স্বামিজ্ঞানে অঙ্কে ধারণ করিয়াছ; এবং শত্রু ও সর্প উপেক্ষিত হইলে মানুষের যে বিপদ ঘটে, তুমি বুদ্ধির দোষে, আপনা হইতে সেই দুর্ব্বহ বিপদের বোঝা মাথায় লইতেছ। কৈকেয়ি সাবধান! সাবধান! এখনও সময় আছে। অতএব বলিতেছি, সাবধান! সাবধান! যদি আপনার মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এখনই উঠ,—এখন হইতেই কার্য্য আরম্ভ কর; এবং আপনাকে ও ভরতকে রক্ষা করিয়া আমাকে রক্ষা কর।" *

রামায়ণের ইতিহাসে, কর্ম্মচক্রদোষে, কৈকেয়ী কলঙ্কিনী। কত যুগ-যুগান্তর পার হইয়া গিয়াছে, তথাপি কৈকেয়ীর কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইতেছে না। ইহাতে সকলেই হয় ত মনে করিবেন যে, কৈকেয়ী স্বভাবতঃ নিতান্ত ক্রূর-হৃদয়া ও নীচাশয়া; তাই মন্থরার মত পিশাচী তাঁহার প্রিয়সঙ্গিনী। সুতরাং মন্থরা যে সকল পাপকথা বলিল, তাহাতে অবশ্যই তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি জন্মিল; এবং তিনি তৎক্ষণাৎ রামের প্রতিকূলে কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে।

* বাল্মীকির অযোধ্যাকাণ্ড।—ভাবানুবাদ।

কৈকেয়ী প্রকৃতপ্রস্তাবে দেব-হৃদয়া—দেবাঙ্গনা; এবং দশরথের মত দয়াধর্ম্মময় পুরুষের হৃদয়সঙ্গিনী হইবার যোগ্য ললনা। অপিচ, কৈকেয়ী ভরতের মা। পুত্রপ্রসবিনী রমণীর পক্ষে ইহা বড় বেশী কথা—অতি গুরুতর গৌরবের কথা। যিনি ভরত হেন, সর্ব্ব-গুণ-ভূষণ ও জগজ্জন-ভক্তিভাজন মহাপুরুষকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের ছাঁচ স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত। সুতরাং, মন্থরার কথায় কৈকেয়ীর মন সহজে জ্বলিবে এমন সম্ভাবনা নহে। যখন মন্থরার কথা সমাপ্ত হইল, তখন কৈকেয়ী, চিত্তের অকপট হর্ষোচ্ছ্বাসে, শারদীয় নিরভ্র গগনের চন্দ্রলেখার মত, অতিমাত্র প্রফুল্লমূর্ত্তিতে, শয্যা হইতে একটুকু উঠিয়া, মন্থরাকে আপনার অঙ্গমুক্ত অমূল্য আভরণ উপহার দিলেন; এবং হর্ষ-বিস্ময়-স্ফুরিত গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন,—

"মন্থরা লো! তুই আমায় প্রাণে বাঁচালি। রাম আমার রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন, ইহার উপর আর আমার আহ্লাদের কথা কি আছে? আমার যেমন রাম, তেমন ভরত। আমি এ দুইয়ের মধ্যে কখনও পার্থক্য বোধ করি না। তুই সেই রামের অভিষেক-সংবাদ প্রদান করিয়া, সত্যই আমাকে যার-পর-নাই সুখী করিলি। রামের অভিষেক-কথা আমার কাছে অমৃতের মত বোধ হয়। তুই যখন আমাকে সেই অমৃততুল্য সংবাদ শুনালি, তখন তুই যা চাহিবি, তাহা দিয়াই আমি তোকে পরিতুষ্ট করিব। তুই আর কি বর চাহিতেছিস্, বল্? যথা বাল্মীকীয়ে,—

"মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা শয়নাৎ সা শুভাননা,
উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী।
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা;
দিব্যমাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্।
দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা,
কৈকেয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্।
ইদন্তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্,
এতন্মেপ্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে।
রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে,
তস্মাত্তুষ্টাস্মিযদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।
　ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
　প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্॥
　তথাহ্যবোচস্তমতঃ প্রিয়োত্তরং
　বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু।

মন্থরা এমন নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে নাই যে, সে এক কথায়ই পরাভব পাইবে, অথবা এক বারের পরাভবেই দূরীভূত হইয়া, আপনার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিবে। সে কৈকেয়ীর প্রসাদ-প্রদত্ত আভরণগুলি ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল; এবং গর্জ্জিয়া—তর্জ্জিয়া,—বাহু নাড়া দিয়া, রামের বিরুদ্ধে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিল। রাম রাজা হইলে ভরত ও ভরতের স্ত্রী কত প্রকারে অভিভূত হইবেন,—জানকী ও কৌসল্যার গৌরব কত বাড়িবে, এবং কৈকেয়ীরই বা কতপ্রকার অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা একে একে—এক কথায় এক শত কথার সৃষ্টি করিয়া, কৈকেয়ীকে বুঝাইল। কিন্তু দশ-

রথের প্রিয় মহিষী কৈকেয়ী শেক্ষপীর চিত্রিত সিম্বিলিনের মহিষীর * মত বিমাতা নহেন। তিনি গুণানুরাগিণী, তাই রামগুণে মুগ্ধ,—এবং গর্ভধারিণী মাতার মত রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত। কেহ রামের কোনরূপ নিন্দা করিলে, তাহা তাঁহার প্রাণে কণ্টকের মত বিঁধে। অথচ এইক্ষণ যে নিন্দা করিতেছে, তাহাকে তিনি শিশুকাল হইতে ভালবাসেন। তিনি এইহেতু, চক্ষের লজ্জায় বেসী কটু বলিতে না পারিয়া, রামের অশেষপ্রকার প্রশংসা করিলেন, এবং মন্থরাকে পুনরপি মৃদুভাষায় কহিলেন,—

"মন্থরে, তুই রামের অভ্যুদয় দর্শনে এইরূপ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিস্ কেন? রাম আমার ধর্ম্মজ্ঞ, শান্তচরিত্র, কৃতজ্ঞ, সত্যবান্ ও শুচিব্রত। রাম মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং রামই এক্ষণ যুবরাজের পদ পাইবার যোগ্য। গুণনিধান রাম যুবরাজের পদে অভিষিক্ত হইলে, আপনার ভাই ক'টি ও ভৃত্যবর্গকে নিশ্চয়ই পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন; এবং নিজের চারিত্রগৌরবে রাজ্যের সকলকেই সুখে রাখিবেন।"

কৈকেয়ী মন্থরাকে এইরূপ বহু কথার দ্বারা প্রবোধ দিয়া পরিশেষে বলিলেন,—

"যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু।
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৄংশ্চ রাঘবঃ।"

অর্থাৎ—আমি ভরতকে যেমন জানি, রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে তাহা হইতেও বেসী জানি,—বেসী মানি। রামও এইহেতু তাহার গর্ভধারিণী কৌসল্যা অপেক্ষা আমাকে অধিকতর শুশ্রূষা ও সম্মান করিয়া থাকে। রাম আমার রাজ্য লাভ করিলে, এ রাজ্য একপ্রকার ভরতেরই অধীন হইবে। কারণ, রাম তাঁহার ভ্রাতাদিগকে প্রকৃতই আপনার প্রাণের সমান মনে করে।

আমি ইতঃপূর্ব্বে কৈকেয়ীকে দেবাঙ্গনা ও দেবহৃদয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কৈকেয়ীর এই বাৎসল্যস্নেহপূর্ণ, অকৃত্রিম মাধুর্য্যসম্পন্ন, অমৃততুল্য কথাগুলি দেবতার জিহ্বা হইতেও সকল সময়ে নিঃসৃত হয় কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু মন্থরা, এ সকল কথায়ও কোনরূপে শান্তি কিংবা সান্ত্বনা লাভ না করিয়া, কৈকেয়ীর পরমুখাপেক্ষি কোমল হৃদয়ের উপর এক সঙ্গে সহস্র বাক্যবান বর্ষণ করিল। সেই সহস্র কথার মধ্যে স্বামিসোহাগিনী কৈকেয়ীর প্রাণে একটা কথা অকস্মাৎ বিষদিগ্ধ শৈল্যের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। মন্থরা কৈকেয়ীকে পুনঃপুনঃই এই একটা কথা বুঝাইয়া বলিল,—

"দর্পান্নিরাকৃতা পূর্ব্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া।
রামমাতা সপত্নী তে কথংবৈরংন যাপয়েৎ।"

অর্থাৎ,—তুমি এত দিন স্বামিসোহাগের দর্পভরে, তোমার সপত্নী, রামজননী কৌসল্যাকে খাট করিয়া রাখিয়াছিলে; এখন সে তাহার প্রতিশোধ লইবে,—তোমাকে তাহার কাছে খাট হইতে হইবে।

* ইংলণ্ডের রাজা সিম্বিলিনের রাজমহিষী,—ইমোজিনের বিমাতা।

মন্থরার এই শেষ কথাটায় সরলহৃদয়ে গরল প্রবেশ করিল ;—কলসী ভরা বিশুদ্ধ দুগ্ধরাশির মধ্যে দুরিত বস্তু স্থান পাইল। যিনি রামকে প্রাণের সমান জানিতেন, তিনি রমণী-জন-সুলভ সপত্নীবিদ্বেষে, কালান্তক যমের মত হইয়া, একই কার্য্যের দ্বারা পতি, পুত্র ও পরমপবিত্র রঘুকুলের সর্ব্বনাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কৈকেয়ী, আর হিতাহিত চিন্তা না করিয়া,—তাঁহার অভীষ্টসঙ্কল্প পরিণামে কোথায় যাইয়া গড়াইতে পারে, তাহা মুহূর্ত্তের তরেও না ভাবিয়া, একবারে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

"অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহং,
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয়ে।"

অর্থাৎ,—অদ্য আমি এখনই রামকে বনবাসী করিব, এবং রামের পরিবর্ত্তে ভরতকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করাইয়া, সকলকে আমার প্রভাব ও প্রতাপ দেখাইব।

মনুষ্যদেহের যে অঙ্গ যত বেশী কোমল, সেই অঙ্গই তত বেশী রোগ-প্রবণ। এইরূপ আবার, মনুষ্যহৃদয়ের যে বৃত্তি যত বেশী ভাব-তরল, সেই বৃত্তিই মন্দের দিকে তত বেশী আবেগ বিহ্বল। পাঠক দেখিয়াছেন, কৈকেয়ীর হৃদয়, সকল সময়েই, ভাবের উচ্ছ্বাসে টল-টল। কৌশল্যা প্রভৃতি বৃদ্ধ মহিষীরা যে কালে জপ তপ, যাগ যজ্ঞ ও শান্তি স্বস্ত্যয়নের মঙ্গল্য অনুষ্ঠান লইয়া নিরত, কৈকেয়ী সেই কালেও বৃদ্ধ স্বামীর 'ভোগ-রাগে,'—নিত্য নূতন লালসার কুসুমিত অনুরাগে, আমোদ উৎসব লইয়াই ব্যাপৃত। বিশেষতঃ, কৈকেয়ী তখনও দশরথের চক্ষে দলচ্ছৎফুল্ল তরুণী।* কৈকেয়ীর তাদৃশ তরুণ-তরল রস-বিহ্বল হৃদয় যখন রাজনৈতিক প্রভুত্ববাসনার সর্ব্বভক্ষ সংহারমূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন স্নেহমমতা, পতিভক্তি ও পুত্রবাৎসল্য প্রভৃতি সমস্ত সুকুমার ভাবই সে জ্বলিত বহ্নিশিখার ধূমরাশিতে আবৃত হইয়া পড়িল ; এবং নিরয়ানুরাগিণী রাজনীতি, প্রীতিকে সর্ব্বতোভাবে পরাভব করিয়া, উদারহৃদয়া কৈকেয়ীরে পাগল করিয়া তুলিল।

"Ambition hath one heel
nail'd in hell,
Though She stretch her fingers
to touch the heavens."

কৈকেয়ী রামের বনবাসবিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন বটে। কিন্তু বনবাস বলিলে কি বুঝায়, বোধ হয়, অবোধ কৈকেয়ী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেন না;—বোধ হয় অযোধ্যার আনন্দ-কানন-সংবর্দ্ধিত আত্মগৌরব-বিস্মৃত রাজ্যেশ্বরী,—রাজকুল-বরেণ্য দশরথের প্রমোদ-সহচরী বনবাস-দুঃখের কোন কথাই বুঝিবার অবকাশ পাইতেন না। বুঝুন আর না বুঝুন, কৈকেয়ী যে সময়ে রামের বনবাসবিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, মন্দ প্রয়োজনের অপরিহার্য্য শাসনে, মন্থরাই সেই সময় হইতে, কএক দিনের জন্য,

* বাল্মীকির বর্ণনা অনুসারে কৈকেয়ী সে সময়েও কতকটা যুবতী। যথা,—
"স বৃদ্ধস্তরুণীংভার্য্যাংপ্রাণেভ্যোঽপিগরীয়সীং।"

তাঁহার মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইল; এবং বিধিলিপির অনুল্লঙ্ঘনীয় গতি,—বিধাতার অচিন্তনীয় বিধান-ব্যবস্থাপিত বিবিধ বিস্ময়াবহ ঘটনাবলী, তদানীন্তন মানবজগতের হৃদয়ের উপর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ভাব উৎপাদন করিয়া, পাপলঙ্কার প্রভুত্ববিনাশের দিকে ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল।

জ্ঞানবৃদ্ধ তাত্ত্বিকেরা বলিয়া থাকেন যে, স্বর্গে যাহার নাম অমৃত, মর্ত্ত্যধামে তাহারই নাম অশ্রুবিন্দু। এক কোটি মুক্তাবিন্দু বর্ষণে মনুষ্যজাতির যত না উপকার হয়, এক ফোটা অশ্রুবর্ষণে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উপকার হইয়া থাকে; এবং অবনী যখন স্নেহ করুণা, প্রীতি, ভক্তি, অথবা অনুতাপ ও অনুরাগের অশ্রুজলে আর্দ্র হয়, তখন সে অশ্রুসিক্ত মৃত্তিকা স্পর্শে অতি বড় পাপিষ্ঠের প্রাণও হরিচন্দন-লেপের স্পর্শসুখবৎ অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

এ কথা যদি সত্য হয়,তাহা হইলে মন্থরার মন্ত্রণা জগতের কতই মঙ্গলসাধন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া শেষ করা যায় না। মন্থরার প্রসাদাৎ, মানুষের চক্ষু হইতে, দরবিগলিত প্রবাহে, শত সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যত অশ্রু ঝরিয়াছে, তাহাতে বৃহৎ একটা সমুদ্রের খাত কুলে কুলে পূরিত হইতে পারে। রাজা দশরথ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তনু ত্যাগ করিয়াছেন। কৌশল্যা সেই যে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নিরন্তরই কাঁদিয়াছেন। অযোধ্যার পশুপক্ষীও, শত সহস্র লোককে কাঁদিতে দেখিয়া, পশু পক্ষীর মত কাঁদিয়াছে; এবং এই শৈল-সমুদ্রবেষ্টিত ভারতভূমির শত লক্ষ চক্ষু, রাম-জানকীর কথা প্রসঙ্গে, অদ্যাপি অশ্রুজলে ভাসিতেছে। মন্থরার মরুরূক্ষ দগ্ধ চক্ষেও অশ্রু ঝরিয়াছে কি? অশ্রু না ঝরিয়াছে, এমন নহে। বরং একটু বেসীই ঝরিয়াছে। কিন্তু তাহা মন্থরার নিজগুণে নহে। বাল্মীকি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সে অশ্রুর কারণ অন্যরূপ ও অপ্রতিবিধেয়।

কৈকেয়ী যখন, ভরতের লোকোত্তর ভ্রাতৃভক্তি দর্শনে,—হৃদয়ে ও মনে, চৈতন্য লাভের পর, তাঁহার প্রাণের পুরাতন ও প্রকৃতিনিহিত আকর্ষণে, প্রাণপ্রতিম রামচন্দ্রের মুখখানি দেখিবার জন্য, কৌশল্যা প্রভৃতির সহিত, দীন-হীনা কাঙ্গালিনীর বেশে, চিত্রকূট প্রদেশে যাত্রা করেন, তখন হইতেই মন্থরা তিরোহিত। কৈকেয়ীর প্রাণ পুনরায় রাম-দর্শনে শীতল হইয়াছে,—কাব্যসৃষ্টির নিদানস্বরূপ মন্থরা, উহার কলঙ্ককীর্ত্তি লইয়া, কালের সমুদ্রে বিলয় পাইয়াছে। অথেলোর উপদেষ্টা ইয়াগো প্রভৃতি অজগরপুরুষেরাও মন্থরা স্বভাবেরই নূতন অবতার। কিন্তু, কালধর্ম্মে,—স্থানমাহাত্ম্যে ও অবস্থার পার্থক্যে, পৃথগ্‌ভূত।

কালো-রূপ।

"বৃন্দাবনে কিবা ক্ষণে কালোশশী ফুটে'ছে।
ব্রজবালা উন্মাদিত, ব্রজভূমি উচ্ছ্বাসিত,
কালোরূপে অপরূপ, জগৎ আলো ক'রেছে।"

কালোরূপ ভারতীয় কাব্যসাহিত্যেরই অনন্যসাধারণ আনন্দসম্পদ্। যেন এ দেশের কবিতাও, এ দেশের ইতিহাস-কীর্ত্তিতা অলোক-সামান্যা কামিনীদিগের ন্যায়, কালোরূপে অনুরাগিনী। গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী ও ফরাশি কাব্য-উপন্যাসে কালোরূপের নাম-গন্ধও লক্ষিত হয় না। পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ কবিদিগের মধ্যে একমাত্র শেক্ষপীর, দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টপটে অধিকতর শোচনীয় রেখাপাতের জন্য, অথেলোকে কালো বর্ণে চিত্র করিয়া থাকিলেও, সে চিত্রের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। সেখানে চিত্রগত বিরূপতা ও চিত্তগত মহত্ত্বের দূরতা প্রদর্শন, কবির বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং, অথেলোর কালোরূপ নায়িকার রূপে উপেক্ষা ও গুণমাত্রে অনুরাগ-বিহ্বলতার নিদর্শন স্বরূপ। কবি যখনই অথেলোর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই তাহার সে বিসদৃশ কালোরূপে একটুকু বিরাগের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; এবং দেস্‌দিমনার মত নয়ন-বিনোদিনী সুন্দরী যুবতী যে, রূপের দিকে না চাহিয়া, শুধু গুণ দর্শনেই পরের হাতে আপনার দেহপ্রাণ সঁপিয়া দিয়াছিল, পাঠককে এইটি বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের বড় ছোট সমস্ত কবিই, কালোরূপের বর্ণনায়, হৃদয়ের আনন্দে ঢলঢল হইয়াছেন। তাঁহারা, কালো রূপে বিরূপতার চিহ্নমাত্রও না দেখিয়া, শুধুই রূপের উচ্চতর বিলাস-দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়াছেন; এবং বঙ্গের মহাজন কবি হইতে কবিওয়ালা ও কীর্ত্তনাঙ্গ-কবি পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর কবিরাই কালোরূপের নানারূপ রসপূর্ণ বর্ণনার দ্বারা অসংখ্য নরনারীকে নয়নজলে ভাসাইয়াছেন। কালোরূপের অনন্যসাধারণ কান্তিতে তবে বিশেষ কিছু কমনীয় গুণ অথবা নয়ন-মোহন রমণীয়তা আছে কি?

ভারতের আদিকবি বাল্মীকি কালোরূপে মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি কাব্যতরুর উচ্চতম শাখায় আরূঢ় হইয়া, * রাম রাম বলিয়া, যে মধুরাক্ষর নাম কোকিলের মধুর কণ্ঠে নিরন্তর গাইয়াছিলেন,—যে রামের চারিত্রকীর্ত্তি বর্ণনাসময়ে তাঁহার হৃদয়রূপ অমৃতনির্ঝর হইতে, লেখনীমুখে, অজস্র রস-ধারা উছলিয়া পড়িয়াছে, সে রঘুকুলধুরন্ধর লোকাভিরাম রামচন্দ্র কখনও

* "কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্,
আরূঢ়কবিতাশাখম্ বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্।

দূর্ব্বাদল-শ্যাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কখনও বা দলহৃৎফুল্ল নীলোৎপলের উপমাস্থল হইয়া শ্যামল রূপের উৎকর্ষসম্পদে আর একটুকু উপরে উঠিয়াছেন। কিন্তু, কিবা দূর্ব্বাদল, কিবা নীলোৎপল, উভয়ই কালো-রূপের ভিন্ন ভিন্ন স্তর-লক্ষিত বিকাশ মাত্র।

রামায়ণ মহাকাব্যে প্রধান-পুরুষ-গণনায় রামের পর ভরত। ভরত বীরের মধ্যে বীর;—স্বার্থত্যাগ, সৌজন্য, সাধুজনোচিত সরলতা, সর্ব্বসুখানুসারিনী প্রীতি ও পরার্থ-সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম সম্পর্কে সাক্ষাৎ দেব-পুরুষ। রাম-চন্দ্রের রূপ-বর্ণনায় যে কথা, ভরতের রূপ-বর্ণনায়ও সেই কথা। বাল্মীকি কোন স্থলেও কালিদাস প্রভৃতি নব্য কবিদিগের প্রণালীতে কাব্যোক্ত নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে যখন যাঁহার রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতই রূপনিধান বলিয়া বোধ হইয়াছে; এবং তাঁহার অনুপম রূপ হৃদয়ে ধ্যান করিবার জন্য মনুষ্যের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। বাল্মীকির চক্ষে রাম যেমন শ্যামবর্ণ বলিয়াই যার-পর-নাই সুন্দর, ভরতও সেই-রূপ শ্যামবর্ণতাহেতু, রূপে মনোহর। যথা অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তমঙ্কে ভ্রাতরং কৃত্বা রামোবচনমব্রবীৎ,
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসস্বরঃ স্বয়ম্।

অর্থাৎ কল-হংসকণ্ঠ রামচন্দ্র শ্যামল-মনোহর ও সুনীল-পদ্মপত্রাক্ষ ভ্রাতা ভরতকে কোলে তুলিয়া লইয়া উপদেশ দিলেন।

মানুষের চক্ষু যদি পদ্মপত্রের মত সুস্নিগ্ধ শ্যামকান্তিতে টল-টল করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রূপের একটু বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়। আর, সে চক্ষের মধ্যমণি যদি নিবিড়-কৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায় কালো হয়, তাহা হইলে রূপের আভা আরও বেশী হৃদয়হারিণী হইয়া থাকে। ইয়ুরোপীয় কবিরা যত প্রকার প্ররোচক-ভঙ্গীতেই কেন বর্ণনা না করুন, ভারতবর্ষের যুবক-যুবতী কখনও তাঁহা-দিগের অত আদরের মার্জ্জার-নয়না ও কাঞ্চন-কুন্তলা কামিনীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে না। রমণী তাদৃশ বিকট-চক্ষে কটাক্ষ করিলে, ভারতের মন্বত্রিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র অম-নিই বিবাহের প্রস্তাবে বাধা দিবে, এবং সে পিঙ্গল-নেত্রা রমণীর পীত-বহুল অথবা স্বর্ণোজ্জ্বল কেশ-রাশিতেও বিশেষ আপত্তি করিবে। বস্তুতঃ, ভারতবাসীর চক্ষে, নয়ন-তারা, নয়ন-পিচ্ছ, নয়নবেষ্টিনী ভ্রূলতা ও কেশ-কলাপে কালোবর্ণেরই অপার মহিমা। কিন্তু নয়ন ও কুন্তল কালো রূপে আলো করে বলিয়া, সে কালোবর্ণ কি সমস্ত শরীরের পক্ষেও সৌন্দর্য্যের উৎপাদক হয়?

বাল্মীকি যেমন কালোরূপে মোহিত হইয়া রামনামকে হৃদয়ের জপমন্ত্র করিয়াছিলেন, বাল্মীকির পরবর্ত্তি-মহাকবি মহা-মনীষী ব্যাসদেবও, কালো রূপে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া, চিরজীবন কৃষ্ণনাম গাইয়াছিলেন। বাল্মীকি আপনি কালো ছিলেন কি না, বুঝিতে পাই নাই,—রামায়ণের কোন স্থলেও বাল্মীকির রূপের পরিচয় নাই। উত্তরাকাণ্ডের একটি কবিতায় তাঁহার আত্ম-

রূপসম্পর্কে ইঙ্গিত মাত্র আছে। তিনি, শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞীয় সভায়, বেদগুরু ব্রহ্মার ন্যায়, আগে আগে যাইতেছেন; এবং জনকনন্দিনী সীতা, মূর্তিমতী শ্রুতির মত, তাঁহার পিছে পিছে পদক্রম করিয়া, সভাসীন সাধুসজ্জনের হৃদয়োত্থিত ধন্যবাদ লাভ করিতেছেন। যথা,—

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীং।
বাল্মীকেঃপৃষ্ঠতঃসীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ।

এই সামান্য বর্ণনায় এই মাত্র বুঝা যায় যে, বাল্মীকি রূপের অমলতায় ব্রহ্মার অনুরূপ ছিলেন। সুতরাং, ব্রহ্মা যেমন রক্তোৎপল-সদৃশ উজ্জ্বল বর্ণ, বাল্মীকিও সেইরূপ রক্তোজ্জ্বল কাঞ্চন বর্ণ। কিন্তু ব্যাসের আত্মরূপ হইতে আরাধ্য-দেব পর্য্যন্ত প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই নবনীল-নীরদের ন্যায় অতি গাঢ় কালো বর্ণ। কালো বর্ণ, মনুষ্যের হৃদয়ে, সে সময়ে এত বেশী আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, ব্যাসের মহাভারতীয় যুগকে কালোরূপের যুগ বলিলেও কোন অংশে দোষ হয় না। কারণ, যাঁহারা সে যুগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নূতন গড়িয়াছেন,—সে যুগের ইতিহাস-স্রোতে তর-তর ভাটায় উজানের টান, এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজ-সংস্থিতিতে নবোদ্ভাবিত পরিবর্ত্তের বিধান ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা কালো রূপের কএকটি বিখ্যাত বিগ্রহ। ব্যাস আপনি অতি ভয়ঙ্কর কালো,—কালো রূপের প্রসাদাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়া কীর্ত্তিত। তাহার নায়ক-পুরুষ অর্জ্জুন নিবিড়কৃষ্ণ। নায়িকা দ্রুপদ-দুহিতা কৃষ্ণা নামেই বিশেষ রূপে পরিচিতা। অতি বড় কৃষ্ণরূপা হইয়াও, কৃষ্ণা দ্রৌপদী কিরূপ জগন্মোহিনী সুন্দরী ছিলেন, মহাভারতের স্থানে স্থানে তাহার উল্লেখ ও আনন্দময় বর্ণনা আছে। যথা কাশীদাসের মহাভারতে,—

"নীল সুকোমল, শরীর অমল,
কমলে গঠিত অঙ্গ,
ভাবের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ।"

কাশীরাম দাসের এ বর্ণনা ব্যাসকৃত বর্ণনার ভাবানুরূপা। কেন না, কৃষ্ণা যখন দ্রুপদগৃহে সহস্র রাজ-সমলঙ্কৃত স্বয়ম্বর সভায় দণ্ডায়মানা হইয়াছিলেন, তখন সমাগত রাজন্যবর্গের মধ্যে সকলেই তাঁহার সে ঝলমল কালো-রূপ দেখিয়া পাগলের মত হইয়াছিল। অপিচ, দ্রৌপদী যখন বর্ষীয়সী,—বনবাস-দুঃখে ক্লিষ্টা, এবং বিরাটগৃহে, পরিচারিকার বেশে, পর-পরিচর্য্যায় নিরতা, তখনও তাঁহার তাদৃশ কালোরূপের আলোকময় ছটায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া, বিরাট-সেনাপতি বীরবর, আলোকমুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায়, আপনার প্রাণটা আহুতি দিয়াছিল। সে দ্রৌপদীকে দেখিয়াই বলিয়াছিল,—

"এবংরূপাময়া নারী কাচিদন্যা মহীতলে,
ন দৃষ্টপূর্ব্বা সুশ্রোণি যাদৃশী ত্বমনিন্দিতে।"

অর্থাৎ,—এই পৃথিবীতে অনেক রূপসী দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত অনিন্দিতরূপা কামিনী ইহজীবনে আর কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই।

বিরাট-সেনাপতি যেমন দ্রৌপদীর কৃষ্ণকান্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল, কৃষ্ণানুজা সুভদ্রাও সেইরূপ, অর্জ্জুনের কালোরূপে কামিনীজন-মনোমোহিনী আলোকচ্ছটা দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। সুভদ্রার বিবাহকাহিনী সম্পর্কে ব্যাসের মহাভারত আর কাশীরামের ভাবানুবাদে বিস্তর পার্থক্য। কাশীরামের কাহিনীতে কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামাই বিবাহের মূলীভূত, এবং কৃষ্ণ যেন কতকটা অগত্যা সম্মত। ব্যাসের কাহিনী অনুসারে কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনই বিবাহের মন্ত্রণায় বিশেষরূপে লিপ্ত। কিন্তু কথাবিন্যাসের এই পার্থক্য সত্ত্বেও সুভদ্রার প্রচ্ছন্নপ্রণয়-বিহ্বলতা এবং অর্জ্জুনের শ্যামরূপ-সমৃদ্ধিশালিতা বিষয়ে মত-ভেদ নাই। কাশীরাম দাস অর্জ্জুনের রূপ-বর্ণনায় নীলপদ্মের সহিত তাঁহার বর্ণের তুলনা করিয়াছেন। যথা—

"অনুপম তনু শ্যাম
নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি
করিয়াছে শোভা।"

এখানে, কাহারও মনে, এরূপ কথা উঠিতে পারে যে দ্রৌপদী দর্শনে বিরাটসেনাপতির এবং অর্জ্জুন দর্শনে সুভদ্রার তাদৃক্ আকস্মিক অনুরাগস্ফুরণে অতনুর একটুকু বেশী উদ্যোগ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু, যেখানে অতনুর অণুমাত্রও সঞ্চারসম্ভাবনা নাই, অথচ প্রীতিবিচ্ছেদের বিবিধ উদ্দীপক ঘটনা একত্র সমবেত, সেখানেও যে যুবক ও জরদ্বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল বয়সের নরনারীই কালোরূপে কেমন এক অলোকসামান্য অদৃষ্টপূর্ব্ব আভা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন, ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে তাহারও বিস্তর বর্ণনা আছে।

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র বনবাসী লবের সহিত লক্ষ্মণাত্মজ চন্দ্রকেতুর যখন প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনি তাঁহার মেঘের মত নীলকান্তি দর্শনে একান্ত বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলেন; এবং কৌসল্যা, অরুন্ধতী ও রাজর্ষি জনকও লবের সে "নীলোৎপল-শ্যামলোজ্জ্বল" লাবণ্য দর্শনে, আকুল প্রাণে, আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তার পর, শ্রীরামচন্দ্র যখন লব হইতেও গাঢ়তর কৃষ্ণ, কুমার কুশকে প্রথম সন্দর্শন করেন, তখন তিনি, তাঁহার 'ইন্দ্রমণি'-প্রতিম শ্যামচ্ছবি দর্শনে চমকিত হইয়া, নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছিলেন। শ্রীমান্ লবের অপ্রতিম রূপের ছটা নিরীক্ষণ করিয়া সংসার-সম্পর্কশূন্য যোগমগ্ন জনক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা রূপ-দর্শন-জন্য মোহের ভাষা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। যথা উত্তরচরিতে, জনকের উক্তিতে,—

"কুবলয়দলস্নিগ্ধশ্যামঃ
শিখণ্ডকমণ্ডনো
বটুপরিষদং পুণ্যশ্রীকঃ
শ্রিয়েব সভাজয়ন্।
পুনরিব শিশুর্ভূতো বৎসঃ
স মে রঘুনন্দনো

ঝটিতি কুরুতে দৃষ্টঃ কোঽয়ং
দৃশোরমৃতাঞ্জনম্।"

আহা এ কি দেখিলাম! এ বালকটি কে? বর্ণ নীলোৎপলপত্রবৎ কোমল ও শ্যামল,—মাথায় কাক-পক্ষ মনোহর আভরণের মত,—শরীরের কান্তি এমনই নির্ম্মল যে, যেন এই সমস্ত শিশুসমাজ তদ্দ্বারা অলঙ্কৃত। ইহার দিকে চাহিলে মনে লয় যে, যেন বাছা রঘুনন্দন রাম আমার, পুনরায় শিশুমূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইয়া, অমৃতাঞ্জনের ন্যায় অনুভূত হইতেছেন।

শ্রীমান্ কুশের রূপ-দর্শনেও রামচন্দ্রের এমনই মোহের ধাঁ ধাঁ লাগিয়াছিল। রামচন্দ্র চিত্তে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছিলেন,—

"অথ কোঽয়মিন্দ্রমণিমেচকচ্ছবি
ধ্বনিনৈব দত্তপুলকং করোতি মাম্।
নবনীল-নীরধরধীর-গর্জ্জিত-
ক্ষণবদ্ধকুড্মলকদম্বডম্বরম্।"

ইন্দ্রমণির ন্যায় নীলচ্ছবি এই অপূর্ব্ব বালকটি কে? নবনীর-নীরদের গভীর গর্জ্জন-সুখে কদম্বতরু যেমন মুকুল-বিকাশে কণ্টকিত হয়, আমার শরীরও সেইরূপ ইহার কণ্ঠস্বর শ্রবণেই পুলকে কণ্টকিত হইতেছে। এ নয়ন-মনোহর বালকটি কে?

রূপ-দর্শনজনিত মোহের এ সকল কথা আলোচনা করিলে, মনে আবারও সেই কৌতুহলময় জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়,—তবে কালোরূপের প্রকৃতই কিছু মাহাত্ম্য আছে কি? কালোরূপের এত কথা কহিলাম; কিন্তু যিনি ভারতের কাব্যসাহিত্যে ও ভারতীয় নরনারীর কোটিকণ্ঠ প্রেম-ভক্তির গীতে কালোরূপ নামেই বিখ্যাত,—অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ, এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ যাঁহার অনির্ব্বচনীয় কালোরূপের আশ্চর্য্য প্রভাব বর্ণনায় উদ্ভাসিত, সেই কালোরূপের আলোময়, কান্তকলেবর শ্রীকৃষ্ণের কথা এতক্ষণ কহি নাই। তাঁহার সে অদ্বিতীয় ও অমলচিক্কণ কালোরূপে বিশেষ কি ছিল, তাহা এত কালের পর, শুধু গ্রন্থপত্র পাঠে, আমাদিগের বুদ্ধির অধিগম্য হইতে পারে না। কিন্তু আমরা তথাপি এতটুকু বুঝি, এবং ইহা খাটি সত্য যে, এই ভারতভূমির অসংখ্য চক্ষু ও অসংখ্য চিত্ত, এক সময়ে যে ভুবন-মোহন কালোরূপের আকর্ষণে অভিভূত হইয়া, যেখানে যাহা কালো সেখানেই তাঁহার ছায়া দেখিত; এবং কিবা ধ্যানে, কিবা জ্ঞানে, যে কালো-রূপের সুখ-সুধাময় উদ্বেল-তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতেই ভালবাসিত, সে কালো-রূপ কখনও সামান্য বস্তু নহে।

কম-পুলিন-বিলাসিনী, কল-কল-বাহিনী কালিন্দীর জল-রাশি কালো; অতএব সকলের মনে লইত যে, উহাতে সে কালোরূপের ছায়া পড়িয়াছে। তমাল-পিয়াল-বকুল-কদম্ব প্রভৃতি বন-পাদপনিবহ পত্রাচ্ছাদনে নিতান্ত কালো; উহারা সকলেই সে কালোরূপের কিছু কিছু আভা পাইয়াছে। আর, আকাশের ঐ নবোদ্গত মেঘমালা, উহার নয়ন-মনোমোহন কালোবর্ণে, অত

যে শোভা পাইয়াছে, উহা নিশ্চয়ই সে কালো-রূপের দ্রবীভূত কান্তি অঙ্গে মাখিয়াছে। কালো-মেঘের মাথার উপরে ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব দেখিয়া কবি কালিদাস বলিয়াছিলেন,—

"রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাৎ
বল্মীকাগ্রাৎপ্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।"
যেনশ্যামংবপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যাতে তে,
বর্হেণৈবস্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।"

অর্থাৎ,—

"সাতপ মেঘের গায়, আমরি কি শোভা পায়,
দেখ! দেখ! ইন্দ্রশরাসন।
যেন রতনের পাঁতি, হ'তে আভা নানাজাতি,
উঠি হয় একত্র মিলন।
তোমার শ্যামল অঙ্গ, লভিলে উহাঁর সঙ্গ,
হবে রূপে অতি মনোহর।
যেমন ময়ুর পাখে, বাঁধি চূড়া থাকে থাকে,
শোভিতেন শ্যাম নটবর।"
(হৃষীকেশ)।

আর, ব্রজবিনোদিনী রাধিকা, কালো-রূপের সজীব বিগ্রহ দর্শনে, মেঘের ঘনীভূত কৃষ্ণপ্রভা স্মরণে, উদ্বেল-হৃদয়ে কহিয়াছিলেন,—

"জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
• • নিমিখে নিমিখ নাহি হয়
সখি দেখিনু শ্যামের রূপ।" (চঃ)।

অপিচ, মিথিলার কবি মহাপণ্ডিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে,—

"কি কহব রে সখি কানুক রূপ,
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ।
অভিনব-জলধর-সুন্দর দেহ,
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ।"

অথবা অপরিচিত ও আধুনিক বঙ্গীয় কবির গীতিলহরীতে,—

"আমার—ঐ না কালোরূপ!
তমাল ছায়ায় অই দেখা যায়—
উজল—উছল ভুবনে অনুপ!
সখি—ঐ না কালোরূপ।"

ভারতীয় কবিতার স্রোতে সেই যে ভাগবতী কথার প্রথম অবতারণা হইতে কালো-রূপের স্তুতিলহরী প্রবাহিত হইয়াছে, উহার এখনও নিবৃত্তি হয় নাই; এবং হিন্দুজাতির রুচি, মতি, প্রবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির মর্ম্ম তন্তুসমূহ উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। এ দেশের কবিতা এখনও অশ্রুজলে তুলী ভিজাইয়া "নয়ন-কজ্জলে" চিত্র রচনা করে,—"দলিতাঞ্জন-পুঞ্জগঞ্জন" তমাল অথবা ময়ুর-পুচ্ছ ও ময়ুর-ময়ুরীর কণ্ঠকান্তি নিরীক্ষণে, কি যেন দেখিনু ভাবিয়া, নাচিয়া উঠে; এবং যদি দৈবাৎ সে সুচিকণ কালো-রূপে, "থির বিজলী"-রেথার মত, কনক-রেখার আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে, উহা ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া, ভাবার্দ্রহৃদয়ের দরিত-ধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। মহাদেবের তুষার-ধবল তপোমগ্ন তনুতে কালোরূপের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ভারতীয় কবিতা, সে সর্ব্বশুক্ল-শোভাময় রূপেও এক-

টুকু কালো রেখা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে; এবং তাহার সহিত তড়িল্লেখার মিশ্রণ ঘটাইয়া, আপনার কালো-রূপ-ব্যাকুল মোহময় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। যথা পুরাতন শব্দশিল্পী শূদ্রকের রচনায়,—

"পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ
গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে।"

"কণ্ঠের বরণ যার
শ্যাম-জলোধরোপম,
গৌরী ভুজলতা যাঁহে
রাজে বিদ্যুল্লতা সম,
নীলকণ্ঠ-প্রভু সেই
করুন সবে রক্ষণ।"

(জ্যোতিরিন্দ্র নাথ)

এই নিখিল-জগন্ময়ী প্রকৃতি, উহার প্রথম অবস্থায়,—সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্ব্বে,—আলোক-প্রকাশের প্রাক্কালীন অচিন্তনীয় কালে, নিবিড়-ঘন তমোজালে আবৃত ছিলেন বলিয়াই কি রূপের চরমোৎকর্ষস্বরূপ ভগবৎ-প্রতিকৃতিতে ঐরূপ ভাবোদ্দীপক কালোরূপের আরোপ? কথাটা সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের চিন্তনীয়।

ব্রহ্মদেশ কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমোদ প্রমোদ;—ভবের ক্রীড়াঙ্গনে সকলেই ক্রীড়নক। ক্রীড়া ভিন্ন জীবজগৎ কখনও সুস্থির থাকিতে পারে না। মানবগণ জননী গর্ভে, সুতিকাগৃহে, মৃত্যুমুখে, কর্ম্মক্ষেত্রে, অন্তরে বাহিরে, নিরন্তর কত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক খেলাই খেলিতেছে, তবুও খেলার সাধ মিটে না; আবার দিন দিন নানাবিধ কৃত্রিম খেলার উপায় উদ্ভব করিয়া এই সংকীর্ণ জীবন আরো সংকীর্ণ ভাবে কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, যাহারা কখন অসার আমোদ প্রমোদে যোগ না দিয়াছে; সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত সভ্য অসভ্য সকল দেশেই কৃত্রিম আমোদ লইয়া সকলে মহাব্যস্ত, এই দেশেও ইহা ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য; কিন্তু শাস্ত্রের প্রতিশেধ বাক্য উপেক্ষা করিয়া জীবনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও রঙ্গালয়ে অভিনেতা রূপে না দাঁড়াইয়াছেন, এরূপ লোক অতি বিরল। জন্ম, নামাকরণ, বালকের সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ ও প্রত্যাগমন, বিবাহ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, মন্দির উৎসর্গ, স্বামী, কি স্ত্রী প্রত্যাখ্যান সময়, সুখাবহ কি দুঃখাবহ সকল সময়-ও সকল কার্য্যেই ইহারা অভিনয় উৎসবে উন্মত্ত হয়। আমরা আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু সন্দর্শনে কান্দিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়ি, কিন্তু

এ দেশবাসিরা মনে করে ইহা হইতে সুখকর বিষয় এ ভৌতিক রাজ্যে আর কিছুই নাই; সুতরাং কাহারও মৃত্যু হইলে পল্লীশুদ্ধ লোক একত্রিত হইয়া আনন্দে "পুয়া" অভিনয় আরম্ভ করে। এ প্রদেশে দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ের নাম "পুয়া।" অভিনয় স্থান এক বিস্তীর্ণ ময়দান, সুতরাং দেখিবার সুযোগ সকলেরই হইয়া থাকে, পুয়াদর্শনে কাহাকেও পয়সা ব্যয় করিতে হয় না, কিন্তু ইংরেজ-মহল রেঙ্গুন আজি কালি সভ্যতার আলোক পাইয়াছে, সুতরাং এই স্থানে পুয়া দেখিতে দর্শনী লাগে। যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন, সভ্যতার অনুরোধে নিমন্ত্রণ পত্র,—"চা, মোড়ক" প্রাপ্তির পর তাঁহাদিগকে দর্শনী ফিস দুই টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

এই দেশে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নৃত্য গীতে সুপটু। "ওয়াকচারনাচ" বলিলে প্রবাসী বাঙ্গালীরাও ক্ষুৎপিপাসা ভুলিয়া যান। পুয়া অভিনয়ের পূর্ব্বে বাদ্যকর বাদ্যভাণ্ড লইয়া রঙ্গালয়ে উপস্থিত হয়। এই সময় হইতেই জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অভিনেতৃ দল ভৃত্য সমভিব্যাহারিণী। ইহারা নায়িকাদিগের বসন ভূষণ রক্ষা করে ও তাহাদিগের কেশ বিন্যাস করিয়া দেয়। অভিনেতৃদিগকে পান ও চুরুট যোগাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তাম্বুল-করঙ্কবাহিনীরা সুন্দর পরিচ্ছেদে দেখা দেয়। অভিনেতা ও অভিনেতৃগণের বেশভূষা ও পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন সভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষেই হইয়া থাকে। ইহাতে তাহারা কিছু মাত্র লজ্জা বা সংকোচ বোধ করে না। দর্শকদিগের মুখনিঃসৃত চুরুটের ধূমে রঙ্গালয় প্রধূমিত হয়, এবং ব্যক্তি-সাধারণ হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেরই ওষ্ঠাধর তাম্বুলের রক্তরাগে রঞ্জিত। নাটক ও প্রহসনের প্রসঙ্গগুলি সাধারণতঃ মহর্ষি গৌতমের জীবন-চরিত ও ভারতীয় পুরাতন আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত।

এই দেশে আর একটি প্রধান আমোদ পুতুলের নাচ। পুতুলগুলি পরিপাটীরূপে সজ্জিত ও আকারে বৃহৎ; উচ্চতায় ২।৩ ফিটের কম নয়। লোকের অবসর সময় রজনী; এ নিমিত্ত সমস্ত আমোদ-প্রমোদ রাত্রিতেই হইয়া থাকে। গোধূলি হইতে সূর্য্যের পুনরুত্থান পর্য্যন্ত অবিরাম খেলা, নৃত্য, গীত ও অভিনয় ইত্যাদি চলিয়া থাকে। রাত্রি জাগরণের কষ্ট অপনোদনার্থ মধ্যে মধ্যে সকলেই 'চা' পান করে।

কৃষাণ বালকের ক্রীড়া,—ব্যায়াম। ইহা একটি অদ্ভুত প্রদর্শনী; দেখিলেই বোধহয় যেন তাহাদের শরীরে হাড় মাত্র নাই, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া পুনঃ পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে। আবার শরীরের পশ্চাদ্ভাগে ভূমি হইতে মুদ্রা উত্তোলন করিয়া যথাস্থানে সংস্থাপন করে। ইহাভিন্ন ফুটবল, মোড়গের লড়াই, পালোয়ান দিগের মল্লযুদ্ধ, নৌকাখেলা, মহিষের যুদ্ধ প্রভৃতি আরোও অনেক রকম কৌতুকাবহ খেলা আছে। লোক সকল দল বান্ধিয়া এই সকল খেলায় প্রবিষ্ট হয়, এবং যে দল জয় লাভ করে, লোকে সেই

দলের খেলোয়ারকে জয়ঢাক বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে লইয়া যায়।

জুয়াখেলা, এ দেশের আর একটি প্রধান আমোদজনক ক্রীড়া; কিন্তু ইহার দ্বারা অনেক পরিবার একবারে উৎসন্ন গিয়াছে। ইহার প্রতিরোধের নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

অবলা মহলে বল বিক্রম দেখাইবার প্রয়োজন নাই; রমণীদিগের বিশেষ আমোদজনক ক্রীড়া,—জলকেলী। নূতন বৎসরের প্রারম্ভে রমণীগণ রমণীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ক্রীড়াঙ্গণে উপস্থিত হয়। ক্রীড়ারম্ভের দুইদিবস পূর্ব্ব হইতে আয়োজনের আরম্ভ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ও বৃহৎ বৃহৎ জলপূর্ণ কুম্ভ স্থানে স্থানে রক্ষিত হয়। ক্রীড়ারম্ভের সময় সমাগত হইলে তাহারা উচ্চহাস্য করিয়া উন্মত্তবেশে রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয় এবং জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের গাত্রে সজোরে জল নিক্ষেপ করিতে থাকে। সেই সময় যদি কেহ তাহাদের এই আমোদের ব্যাঘাত করিবার চেষ্টা করে, তাহাকে "[illegible]" করিয়া ছাড়িয়া দেয় [illegible] অবলা অঙ্গে যে বল [illegible] গুলি পুরুষের একত্রিত [illegible] সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পা[illegible] নিমিত্ত কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিগণ [illegible]প প্রতিবাদের চেষ্টা না করিয়া এই অ[illegible]ধ কার্য্যের প্রতিশোধ সজোরে জল নিক্ষিপ করিয়া সকুন্তল রমণীদেহ শিক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতে তাহারা বিরক্তি বা অসন্তোষের চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া বরং অধিকতর পুলকিত হয়।

মগ শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্য,—ব্রহ্মরা সুকুমার বিদ্যায় সুনিপুণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি দেবালয়, বিদ্যালয়, বাসগৃহ প্রভৃতির কারুকার্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মৃণ্ময় ও স্বর্ণ রৌপ্যের কার্য্যেও ইহাদের বিশেষ পটুতা আছে। গৌতম মুনির প্রতিরূপ ইহাদের শিল্পচাতুর্য্যের চুরান্ত দৃষ্টান্ত। শিল্পীর আদর আছে বলিয়াই ব্রহ্মে শিল্প-কার্য্যের এত উন্নতি। ইহাদের সুন্দর গৃহগুলি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা এ স্থলে তিনটির মাত্র উল্লেখ করিব।

(১) কেয়াঙ বা ধর্ম্মমন্দির,—এই গৃহে ধর্ম্মযাজকের বসতি। গৃহগুলি প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইষ্টকালয়ও আছে; কিন্তু সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। ভূমি-কম্পাদির ভয় আছে বলিয়া কেহ ইষ্টকালয় করিতে চাহে না। গৃহগুলি একতলা, দীর্ঘাকারে নির্ম্মিত, এবং সমভূমি হইতে ৮। ১০ ফিট উচ্চ। প্রস্তর বা কাঠের সোপানাবলী গৃহের মেজে হইতে নিম্নতল পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সর্ব্বত্রেই পবিত্রতার ভাব আছে। এইস্থলে রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সকলকে সমভাবে সসম্ভ্রমে পাদুকাশূন্য পদব্রজে প্রবেশ করিতে হয়। যানারোহী রাজা বহুদূরে যান হইতে অবতরণ করিয়া অতি বিনীত ভাবে ও অবনত মস্তকে মন্দির মধ্যে

প্রবিষ্ঠ হইয়া থাকেন। কেয়াঙ্গ গৃহের মধ্যদেশে অনেকগুলি স্তম্ভ। বাহ্য দৃষ্টিতে বোধহয় গৃহগুলি যেন বহু-প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট বহুতল, বাস্তবিক সবগুলিই একতলা। এইরূপ গৃহ কেবল ধর্ম্মমন্দির ও রাজপ্রাসাদ ভিন্ন সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কখন কখন রাজাদিগের অতি প্রিয় প্রধান কর্ম্মচারিরাও এরূপ গৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি পাইয়া থাকেন; কিন্তু তাহা অতি বিরল। গৃহকোণের স্তম্ভগুলি ক্রমে ক্রমে সূচ্যাগ্রবৎ সরু হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া থাকে। ইহার মস্তকোপরি কাষ্ঠকেতন; তদুপরি রাজছত্র ও একটি অত্যুজ্জ্বল ঘণ্টা। মান্দালা সহর ভিন্ন এরূপ সজ্জিত কেয়াঙ্গ আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। যে মঠে রাজপুরোহিত বাস করেন, পৃথিবীর মধ্যে তাহা অতীব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বস্তু বলিয়া পরিচিত। প্রায় সকল প্রকোষ্ঠের মেজে নানাবর্ণের প্রস্তর দ্বারা চিত্রিত। টিনের ছাদ সূর্য্যালোকে রজত ছত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। গৃহের মধ্যস্থলে একটি বৃহদাকার ঘণ্টা; মারুত হিল্লোলে সুদূরাগত ঘণ্টাধ্বনি যার-পর-নাই প্রীতিকর বোধ হয়, সাধারণতঃ ছাত্রবৃন্দেরাই কেয়াঙ্গ গৃহে বাস করে।

২য় গৃহ,—পেগোডা বা দেবতীর্থ। পেগোডা অর্থে পবিত্র তীর্থকে বুঝায়; ইহার পরিশুদ্ধ নাম দাগাবা বা সংস্কৃত গাববা। যে স্থানে বুদ্ধদেবের শরীরাংশ বা তাঁহার ব্যবহৃত কোন দ্রব্য পতিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, সে স্থানে এরূপ দেবগৃহ বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ইহার অপরনাম জাদী। জাদী কোন্ আকারে প্রস্তুত করিতে হইবে শাস্ত্রের কোন উপদেশ নাই। সহাশক্তি ভগবতী দাক্ষায়ণীর যে স্থানে যে অঙ্গ নিপাতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে পীঠমালার সৃষ্টি হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাড় (অস্থির কণা মাত্র) যে স্থলে পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, সেই স্থানে তাহার সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শিষ্যমণ্ডলীকে এইমাত্র বলিয়াছিলেন, যে স্থানে আমার দেহাস্থি পতিত বা নীত হইবে, সেই স্থানে স্তূপীকৃত তণ্ডুলের ন্যায় ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা ভক্তিপ্রাণ বৌদ্ধদিগের অতি আদরের বস্তু; এবং ইহার স্বর্ণ, রৌপ্য, ও প্রস্তর নির্ম্মিত নানারূপ প্রতিরূপ উচ্চ মূল্যে ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। মান্দালা সহরে ইহার প্রচলন আরো অধিক। পেগোডার উপরিভাগে বুদ্ধদেবের এক ক্ষুদ্র স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাহার মস্তকে ফণিভূষণ। রেঙ্গুনের সুবৃহৎ পেগোডা বৌদ্ধমণ্ডলীর মহাতীর্থ। উহা দর্শনার্থ শ্যাম, রোম, কোরিয়া প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। উহা উচ্চতায় ৩৭০ ফিট।

পেগোডা ভোজ;—আমোদপ্রিয় ব্রহ্মাদিগের এই পর্ব্বটি বড়ই প্রীতিজনক। বৎসরে ইহা দুই দিন মাত্র হইয়া থাকে। এই উৎসবে সকলে সমপ্রাণতার পরিচয়

দেয়। বালিকা ও যুবকবৃন্দ মন-প্রাণ খুলিয়া আমোদ আহ্লাদ করে, তাহারা ময়দানে অভিনয় দেখে এবং উদর পূরিয়া খাইতে পায়। ইহারা দল বান্ধিয়া মন্দিরের চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ায়, এবং হাসির উর্ম্মি উত্থিত করিয়া প্রকৃতিকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে। স্থবির ও প্রৌঢ়াগণও অতি আগ্রহের সহিত এই ধর্ম্মভোজে (Pagoda feast) যোগদান করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালসুহৃদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া সুখের শৈশব-স্মৃতিকে জাগাইবার ইহাই এক প্রধান সুযোগ; এবং এই আনন্দ উৎসবের সময় সুহৃদ্‌সম্মিলন হইলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় ও হৃদয় পবিত্রভাবে বলীয়ান্ হয়, ইহাই তাহাদের ধারণা।

৩য় মন্দির বা উপাসনা গৃহ।—পেগোডা ও মন্দিরে অতি সামান্য প্রভেদ। এ স্থলেও বুদ্ধমূর্ত্তি ও ধর্ম্ম পুস্তকাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। মান্দালা নগরীর আরাকান মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে উহা আকিয়াব হইতে নীত হয়। সেই হইতে উহা আরাকান পেগোডা বা মন্দির নামেই অভিহিত। উহার মধ্যস্থলে ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের প্রতিরূপ বিরাজমান। তাঁহার চারিদিকে ভক্তবৃন্দ ভূপৃষ্ঠে উপবিষ্ট, উহাদের ভক্তি উদ্দীপক স্তুতি গানের উচ্চধ্বনিতে এ হেন ২৫২ ফিট স্তম্ভবিশিষ্ট বৃহৎ দেব-মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়া থাকে; এবং ধূপ, ধুনার অপূর্ব্ব সৌরভে চিত্ত প্রফুল্লিত ও সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত বাতির উজ্জ্বল আলোকে যেন দিগ্‌মণ্ডল সর্ব্বক্ষণ আলোকিত। বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ তিন আকারে আকারিত। দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং অর্দ্ধশায়িত ও অর্দ্ধ উপবিষ্ট। এই স্থানের সকল মূর্ত্তিগুলি মূল্যবান্ মরমর প্রস্তরে নির্ম্মিত।

এক একটি বৃহৎ পেগোডা বা মন্দিরে অনেকগুলি ঘণ্টা থাকে। মধ্যস্থলে অতি বৃহৎ দেব-ঘণ্টা। মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উহাও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অপর ঘণ্টাগুলি পরে পরে ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। খৃষ্টযাজকগণ যেরূপ ঘণ্টাধ্বনি করিয়া উপাসকগণকে ভজনালয়ে আহূত করেন, বৌদ্ধ পুরোহিতেরা সেরূপ করে না। তাঁহাদের ঘণ্টাধ্বনির উদ্দেশ্য দেবতার স্তুতিগানের প্রতি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা। উপাসনা কার্য্য শেষ করিয়া উপাসকগণও তিন বার ঘণ্টাধ্বনি করিয়া চলিয়া যান। ইহার উদ্দেশ্য দেবতা ও ভুবন চতুষ্টয়কে জাগ্রত করিয়া পুণ্যকার্য্যের সাক্ষী করা। কিন্তু কোন পুণ্য কার্য্য করিলে তাহার সাক্ষী রাখা উচিৎ কি না, সহৃদয় পাঠক বিচার করিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

সেখানে।

নীরব রজনী নিথর অম্বর
আলোক বসনে ঢাকিয়া কায়,
জ্যোছনা আননে তরলা তটিনী
হাসিয়া গাহিয়া চলিয়া যায়।
খেলিছে আনন্দে মধুর মলয়
ছড়াছে কুসুম সুবাস রাশি,
হাসিছে জগতে প্রকৃতি রমণী,—
হাসিছে যামিনী সুহাস হাসি।
সুনীল সলিলে রজত তরঙ্গে
গলায় পরিয়া তারকা মালা,
ভাসিছে কাঁপিছে নীল চন্দ্রাতপ
হাসিছে অদূরে সরোজ-বালা।
দেখিয়া তখন সুরম্য কানন
স্বভাবের রাজ্য স্নেহ-প্রীতিময়,
ভাবিলাম মনে এই ত সংসার
সুখ শান্তিপূর্ণ প্রমোদালয়।
আনন্দ লহরী ছুটিল অন্তরে
উছলি উঠিল হৃদয় মন,
ভাবিনু আবার এই ত সংসার
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত ভুবন।
এমনি সময়ে পশিল সহসা
শ্রবণ বিবরে বিষাদ গান,
উঠিয়া নাচিয়া দূর দূরান্তরে
মিশে গেল সেই নিশীথ তান।

এহেন নিশীথে স্ফুট চন্দ্রালোকে
নীরবে গভীরে কে তুমি ভাই,
মরম-বেদনা গেয়ে চলে যাও
এ জগতে তোমার কেহ কি নাই?
সোনার সংসার, বিপুল ধরণী,
অনন্ত তারকা প্রহরীচয়,
কেহ কি তোমার হৃদয়ের জ্বালা
বুঝিতে পারে না বিষাদময়?
আপনার ব'লে ভাল কি বাসে না
তরণী বাহিয়া চলেছ তাই,
দুখের সাগর পার হবে বলে,
যে'তে কি পারিবে শুধাতে চাই?
পার যদি কভু বলিবে কি তবে
সে দেশে কেমন প্রসূন রাশি,
ফুটে কি তথায় পদ্ম শত দল
ফুটে কি তথায় মধুর হাসি?
শান্তির আগার আছে কি সেথায়
বহে কি তথা বসন্ত বায়,
এথাকার যত দীর্ণ হাহাকার
সেখানে কি কভু শুনিতে পায়?
সংসারের খেলা দূরে ফেলে রাখি
আমিও তখন চলিব ধীরে,
তোমার সহিত এক হয়ে যাব
অতল গহ্বর বিস্মৃতি নীরে।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

মোগলের অধঃপতন।

মোহাম্মদশাহ।

রফিদ্দৌলার মৃত্যুর পর সৈয়দযুগল জাহান শাহের (জাহান্দর শাহের) পুত্র রোসান আক্তরকে রাজপদ প্রদান করিলেন। নব নির্ব্বাচিত সম্রাট্ রূপবান, বুদ্ধিমান ও গুণবান ছিলেন। সৈয়দযুগল তাঁহাকেও পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহগণের ন্যায় ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদ স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা পরিপূর্ণ রাখিলেন। রোসন আক্তর মোহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া শাসন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া সৈয়দযুগল অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বভাব স্বাধীনতা প্রয়াসী ও তিনি রাজনামের জন্য কাহারও হস্তে ক্রীড়াপুত্তল হইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বাদশাহের প্রত্যেক কার্য্য সুক্ষ্মাসুক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। একারণ তিনি তাঁহাদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য সহজে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাদৃশ সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম বন্দোবস্ত অধিক দিন স্থির রাখা অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হইল না। এই সময় চিন্‌কিলিচ খাঁ মালব দেশের শাসন কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একজন রণকুশল বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা।

অনেক পদচ্যুত ও অসন্তুষ্ট সেনাপতি তাঁহার দলভুক্ত ছিলেন। মোহাম্মদ শাহ সৈয়দযুগলের ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য চিনকিলিচ খাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সৈয়দযুগল এই অভিনব বিপদের বিষয় অনবগত ছিলেন না। তাঁহারা হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনাদের বল বৃদ্ধির প্রয়াসী হইলেন।

ভ্রাতৃযুগল যথোপযুক্তরূপে বল সঞ্চয় করিয়া চিনকিলিচ খাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে মালব দেশের পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থানের শাসন ভার প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। সৈয়দযুগল তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া রাজস্বাক্ষরযুক্ত আদেশলিপি প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে এই সুযোগে সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে গোপনে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া বিপুল বাহিনীসহ রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

এই সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছিলে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রাজপক্ষের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অনবরত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। আবদুল্লা খাঁ এবং তদীয় ভ্রাতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; এবং আত্ম প্রাধান্য রক্ষার উপায় সহসা উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। বহু মন্ত্রণার পর আবদুল্লা খাঁ আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন, এবং হোসেনআলী খাঁ বাদশাহকে সঙ্গে লইয়া চিনকিলিচ খাঁর গতিরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। হোসেনআলী খাঁ পথমধ্যে বাদশাহের ষড়যন্ত্রে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে রাজপক্ষের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। কিন্তু শেষোক্ত দলের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন অবিলম্বে সমস্ত গোলযোগ নিরাকৃত হইল; এবং বাদশাহ স্বাধীনভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উজীর আবদুল্লা খাঁকে পদচ্যুত করা হল; মোহাম্মদ আমিন তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

আবদুল্লা খাঁ পূর্ব্বোক্ত সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া রফিদ্দৌলার পুত্র মোহাম্মদ এব্রাহিমকে রাজপদে বরণ করিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন। তাহার পর তিনি জাঠ ও অন্যান্য হিন্দু সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া মোহাম্মদশাহ ও তদীয় পক্ষাবলম্বীদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহাম্মদশাহ রোহিলা প্রভৃতি মোসলমান সৈন্যের সহায়তা লাভ করিয়া বলশালী হইয়া উঠিলেন। মথুরার নিকট উভয়পক্ষে তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুইদিন ব্যাপী যুদ্ধের পর মোহাম্মদ এব্রাহিম ও আবদুল্লা খাঁ শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন এবং তাঁহাদের অনুচরেরা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ইহার কিয়দ্দিবস পরেই আবদুল্লা খাঁ শত্রুর ষড়যন্ত্রে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার করধৃত মোহাম্মদ এব্রাহিমও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় প্রাপ্ত হইল।

এইসময় মোহাম্মদশাহ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; এবং মোগল সাম্রাজ্যের নষ্ট গৌরবোদ্ধারের আশা সকলের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। চিনকিলিচ খাঁ দক্ষিণাপথের নিজামের পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই নবনিয়োজিত উজীর মোহাম্মদ আমিন পরলোক গমন করিলেন, এবং চিনকিলিচ খাঁ উজীরের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দক্ষিণাপথে মুবারিজ খাঁকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন; এবং তার পর স্বয়ং রাজধানীতে আগমন করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। সাদত খাঁ অযোধ্যার শাসন কর্ত্তৃপদ লাভ করিলেন। একজন হিন্দু মালব দেশের নিজামতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রেরিত হইলেন। ঘৃণ্য জিজিয়া কর রহিত করিয়া হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করা হইল। যোধপুরাধিপতি অজিতসিংহ আগ্রার সুবাদারের পদ লাভ করিলেন।

চিনকিলিচ খাঁ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনীতি

বিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার স্বভাব কিয়ৎ পরিমাণে পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ-দুষ্ট ও কঠোর ছিল। তিনি জিজিয়া কর রহিতের বিপক্ষ ছিলেন। আওরঙ্গজেব দরবারের জন্য যে সকল রীতি-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী বিলাসপটু বাদশাহগণের প্রীতিকর না হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে অভিনব রীতিনীতি অনুসৃত হয়। নব নিয়োজিত উজীর নব্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাচীন রীতিনীতি প্রবর্ত্তন জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি নব্য পারিষদগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইলেন। তিনি দরবারে উপনীত হইয়া প্রাচীন প্রথামত অভিবাদন করিলে তাহারা বলিত, "দেখ, দক্ষিণাপথের বানর কি ভাবে নৃত্য করে।" উজীর তাদৃশ দুর্ব্বাক্যের বিষয় অনবগত রহিলেন না। কিন্তু পারিষদগণের সকলেই বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিলেন না, এজন্য ক্ষুণ্ণচিত্তে রহিলেন। তিনি স্বকার্য্যসাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে অনেকের স্বার্থহানি হইয়াছিল। এই স্বার্থপর দল তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিল। ইহাদের অনেকেই বাদশাহের পার্শ্বচর ছিল। সুতরাং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। এই সব কারণে তাঁহার নিকট মন্ত্রীপদ অস্পৃহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি মৃগয়া ব্যপদেশে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন; এবং তার-পর দক্ষিণাপথে গমন করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় সমস্ত দক্ষিণাপথে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। চিনকিলিচ খাঁর প্রবল প্রতাপে এবং সুশাসনে দেশ মধ্যে পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপিত হইল; এবং প্রকৃতিপুঞ্জ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। তৎকালে ভারতবর্ষে দুই জন শাসনপতির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। নিজাম চিনকিলিচ খাঁ এবং পেশোয়া বাজিরাও। বাজিরাওর উৎকট সাধনায় নবজাত মহারাষ্ট্র শক্তির গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন আকাশে সমুপস্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিতে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধির পথ নিরঙ্কুশ ছিল। একমাত্র নিজাম বাহাদুর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। এজন্য মহারাষ্ট্র নায়ক বাজিরাও তাঁহাকে দগ্ধ করিবার জন্য সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন। এই যুদ্ধানল একাদিক্রমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রহিল। তার পর নিজাম বাহাদুর রণক্ষেত্র হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য মহারাষ্ট্র শক্তির তেজোপ্রবাহ মোগল শাসনাধীন দেশাভিমুখে সঞ্চালিত করিয়া দিলেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হইল; তদনুসারে পেশোয়া

নিজামের শাসনাধীন প্রদেশ আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন; এবং মহারাষ্ট্রা সৈন্য মোগল শাসনাধীন উত্তর পার্শ্বের দেশসমূহে তরবারি হস্তে উপস্থিত হইলে তিনিও কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

সাফি খাঁ নিজাম বাহাদুরের রাজভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি কদাচ রাজভক্তির পথ হইতে এক তিলও বিচলিত হইতেন না। নিজাম বাহাদুর গোঁড়া মুসলমান ছিলেন; হিন্দুর প্রতিপত্তি কখনও তাঁহার নিকট বাঞ্ছনীয় ছিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি যে স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রা সৈন্যকে উত্তেজিত করিয়া হিন্দুর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন তাহাতে অনেকের বিস্ময় জন্মিতে পারে। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন কালে মুসলমান রাজপুরুষগণের কর্ম্মনীতি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র ছিল। এই সময় তাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান কতদূর সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ নিজাম বাহাদুরের দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা বুঝিতে পারি।

পূর্ব্বোক্ত সন্ধি অনুসারে মহারাষ্ট্রীয় অধিনায়কগণ প্রথমতঃ মালবদেশ আক্রমণ করিলেন। মালবদেশের শাসনকর্ত্তা শত্রু সৈন্যের গতিরোধ জন্য বিপুল বিক্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু রণক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিতে পারিলেন না। মালবদেশ মহারাষ্ট্রা সৈন্যের করতলগত হইল। ইহার পর তাহাদের অন্যতম অধিনায়ক মালহররাও হোলকার আগ্রার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশে উপনীত হইয়া দোয়াব লুণ্ঠন করিলেন। দিল্লীর রাজপুরুষগণ মহারাষ্ট্রা সৈন্যের আগমনে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়াতে বাদশাহ নিরুপায় হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সাদত খাঁকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তিনি সসৈন্যে আগমন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা প্রবল বন্যার ন্যায় পুনরায় মোগল শাসনাধীন দেশে পতিত হইল। বাদশাহ তাহাদের গতি প্রতিরোধ জন্য নিজাম বাহাদুরকে আহ্বান করিলেন। তিনিও এখন আপন অনুসৃত নীতির ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইল যে দিল্লীর রাজশক্তি সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণই ভারতবর্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবে; এবং তাহার ফল তাহার নিজের অস্তিত্বের পক্ষেও শুভকর হইবে না। এজন্য তিনি রাজ আহ্বানানুসারে রাজধানীতে গমন করিলেন। কিন্তু এই সময় বাদশাহের ক্ষমতা এতদূর সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, নিজাম বাহাদুর বহু যত্নেও চতুঃত্রিংশ সহস্রাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই তিনি দোয়াব প্রদেশে শান্তি সংস্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্রা সৈন্যের গতিরোধ জন্য ভূপালে গমন করিলেন। দিল্লীর দরবারের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন এই স্থানে শত্রু সৈন্য-

তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিল। তিনি দ্বাবিংশ অহোরাত্র অবরুদ্ধ থাকায় মালব-দেশ এবং চাম্বল ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বিজয়াবসান।

[দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যন্ত বাঙ্গালা—তন্মধ্যস্থ গড়ময়না—শেষাবস্থায় মোগল প্রভাবে উক্ত গড়াধিপের বিষাদ—মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ে আশার সঞ্চার, তজ্জন্য গড়ে বার্ষিকোৎসব—তৎকালে গড়দ্বারে কবির প্রবেশ—বারণ—সমাদর—সভায় গ্রহণ—কবিপূজা—কালিদাস ভবভূতি বাণভট্ট জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও ভারত প্রশংসা ছলে কবির সমাদর—তদ্দেশীয় প্রাচীন হিন্দু বীর বিশেষাশ্রিত লক্ষণান্বিত কাব্যগানের প্রার্থনা। কবি কর্ত্তৃক তাদৃশ কাব্যগানে অঙ্গীকার—ইষ্ট-দেবতা স্মরণপূর্ব্বক কবিকর্ত্তৃক ব্যাস ও বাল্মীকি ধ্যান—কাব্যারম্ভ। ইতি কাব্যোপক্রমোনাম প্রথমঃ সর্গঃ।]

দক্ষিণ-সাগরে অরণ্য-বহুল
দুর্গম বন্ধুর দেশ,
গৌড় * নৈঋতে বীর-নিকেতন
* দুর্গ-ভীষণ-বেশ।

কূটগুল্ম কোটি সিংহাবাস সম
নিগূঢ় গহন মাঝে
শঙ্কিত পাঠান কঠিন হৃদয়
না সঞ্চারে কভু কাছে।

উদীচী প্রতীচী ব্যাপি মল্ল-ভূমি
তাহে বসে মল্লবীর,
যষ্টি-ভল্ল-যোধী অটুট-বিক্রম
সংশপ্তক রণে ধীর।

যার * পার্শ্বে বসে আভীর-সন্ততি
দৈতেয়-সোদর-বল,
হরি যদু-নারী উপেখি গাণ্ডীবী
অর্জ্জিল যশ বিমল।

দক্ষিণ পূরবে জলধির তটে
শোভে দুর্গ বলাধার,
হিজ্‌লী জলেশ্বর তাম্রলিপ্ত গড়
কত বা পাষাণ-সার।

* ছন্দস্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঈদৃশ স্থলে এক একটি বর্ণের ন্যূনতা দর্শনে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

* যে মল্লদেশের পার্শ্বে অর্থাৎ লগ্ন উত্তরে গোপভূমি বা বীরভূম প্রদেশে।

সে দুর্গম দেশে দুর্গ-মধ্য-মণি
ময়নাগড় যার নাম,
ভয়ে কণ্টকিত সতত অরাতি
স্মরিয়া সে বীর্য্যধাম।

ইন্দ্র-প্রখ্য-বীর কোটি-বাহুবলে
বাহুবলীন্দ্রের কুল,
জিনি নৃপকুল প্রতিষ্ঠিত যাহে
বিক্রম-গর্ব্বে অতুল।

নিস্তল-আকৃতি দ্বীপ-গর্ভ দ্বীপ
গোপুরাট্ট-সৌধময়,
বলয়-স্বরূপে বিশাল-পরিখা
বৈতরিণী বেরি রয়।

অগাধ-গভীরা স্ফটিক-নির্ম্মলা
পঙ্কজ-কহ্লারে হাসে,
মগ-নক্র ব্যূহা যেন বিষ-কন্যা
বিধু-মুখী স্পর্শে নাশে।

সপঙ্কজ বক্ষঃ সলিল-লাবণ্যে
ডুবি স্নিগ্ধ সমীরণ,
উঠি তটোপরি বীর-ঘর্ম্ম নাশে
করিয়া মন্দ বীজন।

গিরি-তট-তুঙ্গ পরিখা-প্রপাত
আরোহিতে ক্লান্ত অতি,
সমক্ষে ভ্রমরে পঙ্কজে আলাপ
বহিতে না সরে মতি।

ভানুকর স্পর্শে বিবশা নলিনী
বিভাতে ত্যজিল মান

হেরি জাগরূক রক্ষী বীরযুবা
ব্রীড়া সম্মিত বয়ান।

পরিখা প্রাকারে নগরী নিতম্বে
বৃষস্কন্ধ যোধ-গণ,
অংসে গদা-গুরু করেতে কৃপাণ
গুরু করে নিরীক্ষণ।

শতঘ্নী-সঙ্কুল দ্বারে দ্বারে মঞ্চে
যামতূর্য্য ঘোষে যদা,
শতারক্ষ-পতি শতরা নিরখি
অশ্বে, মোহ ভাঙ্গে তদা।

শতারক্ষ পতি হাঁকি সিংহনাদে
দপটে নিরখি যায়;
মৃগেন্দ্র-নিনাদে তরক্ষু যেমন
আরক্ষ কম্পিত-কায়।

সহস্রী হাজারা গর্ব্বী ভালে রেখা
অশ্বে রঙ্গে উড়ি যায়;
বিংশতি পতাকী তর তর বেগে
ঘেরি দ্বারে দ্বারে ধায়।

লহ লহ উড়ে শমন-রসনা
লোহিত-পতাকা-ছলে,
দশনের পংক্তি আয়ুধ-সংহতি
বৈতরিণী ছলে জলে।

হেন দুর্গ মাঝে দ্বিতীয় পরিখা
লঙ্ঘি হের আভ্যন্তর,
দুর্গ আয়তন ভূপতি-প্রাসাদ
দৃশ্য কৈলাস-সুন্দর।

চৈত্ররথ বন বেষ্টিয়া ত্রিদিবে
স্বর্গ গঙ্গা যদি বয়,
দ্বিতীয় বলয়ে স্বর্ণ-নদী বেষ্টিতা
অলকা যদ্যপি রয়।

তবে ত তুলনা হ'ত এক দিন
কোবিদ মণ্ডল কহে,
এবে পাণ্ডু-মুখ বিধু যথা ম্লান
বিধুন্তুদ-স্পর্শ বহে।

সে ধাম-মণ্ডলে সুর-সুত-সম
ভূপ কৃপানন্দ ধীর
উদার গম্ভীর পণ্ডিত সেবক
সমরে অধৃষ্য বীর।

অলীক-নির্জ্জিত রাজন্য-মণ্ডল
স্মরি পিতামহগণ,
যবন দুর্দ্দিন অন্ধতমস
হেরি ক্ষুণ্ণ অনুক্ষণ।

পাঠান মোগল উৎপাতি কখন
ছাইয়াছে নভস্তল,
রবি-চন্দ্র-কুল অস্তাচল-গত
শ্রৌত ধর্ম্মে নাহি বল।

বহ্বৃচী ঋক্ কহিতে কণ্ঠ
নিরুদ্ধ কি অত্যাহিত,
উদ্গাতা সভয়ে গহনে গাহয়ে
কোথা সাম উদ্গীথ।

যমুনা জাহ্নবী বহে না তেমন
হীনাচার-স্পর্শ-ভয়ে
আছে সরস্বতী পশি ম্লেচ্ছ দেশ
যথা ধরালীন হ'য়ে।

ক্ষোভে ভূপরায় যাপি কতকাল
নিরখে মারাথা দিশা,
দুর্দ্দিন-তমসী অন্ধ-তমস
লীন যেন ভোরনিশা।

উৎসাহে ভূপতি কুলধর্ম্ম স্মরি
জানি পৌষ-পৌর্ণমাসী,
বার্ষিকাভিষেকে কৈলা অনুমতি
পুলকিত দুর্গবাসী।

তূর্য্য নিনাদ বহে দ্বারে দ্বারে
গগন পতাকাময়,
ইন্দ্র রথ আসি উদিল ভূতলে
দুর্গ হেরি জ্ঞান হয়।

পান-ভোজন নৃত্য-গীতাকুল
নিখিল নগর-বল।
সহর্ষ-গর্জ্জন দন্ত-পদভরে
কাঁপে সর্ব্বধরাতল।

মৃণাল-শুণ্ড্‌ শালী শিরেতে কামান
ভীম অজগর কায়,
উগারি সধূম অনল-পুঞ্জ
গর্জ্জি ধরণী কাঁপায়।

ব্যূহে ব্যূহে সেনা দুর্গ-বপ্রোপরি
শিখে অরিব্যূহ ভেদ;
খড়্গ-প্রাস-গদা নিশিত ভল্ল
বর্ম্মিত বহে অখেদ।

কামান-গর্জ্জন অন্তরে শুনহ
সোল্লাস তূর্য্য-নিনাদ ;
সানাই টিকারা শাঁ শাঁ ত্রেধিগিটি
ঘোষে ধ্বনি অবিষাদ।

গর্ব্বী স্ফীতবক্ষা বক্ষী খড়্গ-পাণি
নীরবে রক্ষয়ে দ্বার ;
ঈষৎ হাসিয়া বন্ধু বক্ষি-সহ
ভাষে কিছু কোন বার।

নৃপকুল্য যত বীরগোতজন
বিচিত্র-ভূষণ বেশ,
দ্বারে মঞ্চে পুরে বিহরে আনন্দে
নাহি চিত্তে দুঃখলেশ।

হেনকালে দ্বারে আসি উপনীত
স্বৈর-গতি উদাসীন,
সাবমিত বাক্ সাশ্রু ত্রিতন্ত্রিক
রসভাবে মহালীন।

আনন্দের নীরে ভাসে কনীণিকা
কভু কান্দে কভু হাসে,
যেন শুকদেব দৈবে মর্ত্ত্যে আসি
উপনীত দ্বারপাশে।

রস-সূত্র-বৃত্তি ছন্দঃ-অলঙ্কার
গুণ-রীতিময়-বপুঃ।
রস-ধর্ম্মে যেন ব্রহ্মানন্দে লীন
হেরি নাই হেন কভু।

আগুল্ফ-লম্বিত কৃষ্ণ-অঙ্গরাখা
অন্তরে আয়স-বর্ম্ম,
দৃঢ়-বদ্ধ-কটি শিরেতে উষ্ণীষ
বল্লমী না বুঝে মর্ম্ম।

মহাশূলশালী বল্গিত-সৈন্ধব
তর্জ্জিল আরক্ষ যোধ।
সহস্রী হাজারা হেরি দূর হ'তে
গর্জ্জি করয়ে প্রবোধ।

শুনিয়া প্রবোধ পূজে কবি বরে
আরক্ষ সৈনিকগণ,
উপচারে তবু নৈল বাহ্যজ্ঞান
হাসে কবি স্বৈরমন।

বন্দি কবিবরে প্রণতি বচনে
ল'য়ে চলে রাজ-দূত,
আবাল বৃদ্ধ জনেতে বেষ্টিত
সদানন্দ অবধূত।

মুগ্ধ উপচারে রাজার সভায়
উপনীত কবিবর,
সিংহাসন ত্যজি বাহুবলীন্দ্র
উঠে কৃতাঞ্জলিকর।

ভূপ কহে ;—এস এস, বাণীপুত্র
লহ এই স্বর্ণাসন,
দৈবে অভাজন রাজন্য সন্মানি
দেব তব আগমন।

বিক্রম আদিত্য প্রমর কুলেন্দ্র
উজ্জয়িনী-পতি বীর,
শুনি, কবিপূজা জানিতেন কিছু
শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞানে ধীর।

ত্রিদশ-বাঞ্ছিত   পূজি কালিদাস
দেবলোকে তাঁর বাস ;
যাঁর যশোগান   ভূলোকে দ্যুলোকে
চিরতরে পরকাশ।

সে যে ভাগ্যবান্   জননী জঠরে
সার্থক করিল বাস,
নানা রস পঙ্ক   পূরিত গর্ভেতে
ক্লেশে যাবে দশমাস।

জনমি থেদিল   অশেষ বিশেষে
জননী সাক্ষাৎ দয়া,
সকলি সার্থক   পূজি কালিদাস
বাণী যাঁর বরাভয়া।

যাঁর শব্দ অর্থ   মহিমা চিন্তিয়া
মনে লয় পশি বন,
দেবতা বাঞ্ছিত   পদের নিনাদ
মায়া ভ্রমর গুঞ্জন।

পদ্মাসন যথা   শব্দ বিদ্যা দেবী
কৈল যিনি আত্মবশ।
বাগর্থ শাখায়   যাঁব কাব্যফলে
ঝরয়ে আনন্দ রস।

কাব্যের বিলাসী   মায়াবী মন্মথ
মিশিয়া নিশ্বাসে বয়,
বসন্ত-চন্দ্রমা   মলয়জ-বায়ু
পদ্ম-প্রীতি-সুধাময়।

যাঁর ধ্বনি-কাব্য   গুণ-ভূষাময়
নেতৃ-গুণ-সমুজ্জ্বল,
শাস্ত্র-শিষ্টাচার   তট-রুদ্ধ-পূর
রস-নদী সুনির্ম্মল।

যাবৎ বহয়ে   কর্ণে কাব্য নাদ
তাবৎ নন্দনে বাস ;
থামিলে প্রবাহ   স্বশক্তি প্রভাবে
করে উদাস উদাস।

যাঁর মুখচন্দ্র   হ'লে ঘর্ম্মাচিত
অঞ্চলে মুছয়ে বাণী,
বিক্রম-সংসদ্   বাসিনী চামব
পবন-ছলনে মানি।

বিক্রম-সংসদ্   হর্ম্ম্য-বাতায়নে
হেরে যাঁরে তৃষ্ণাতুর।
মুগ্ধ সুর কন্যা   পুর-নারী-ছলে
পিয়ে কাব্য-রস-পুর।

মহাকাল-পাশে   গায় যাঁর কাব্য
নিত্য বিদ্যাধরগণ।
কভু চন্দ্র-কলা   -স্যন্দ-বিন্দু পিয়ি
কভু কাব্য-সন্দোহন।

দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত   বাণীবর পুত্র
অতুল কবিত্ব যাঁর,
ধন্য রে বিক্রম   পরিয়াছ তুমি
হেন রত্ন কণ্ঠহার।

ধন্য সে ভূপাল   পূজিয়াছ যেই
কবি জাতুকর্ণীসুত,
যাঁর কণ্ঠে বহে   কবিতা স্রবন্তী
ঘন রস সুধাপূত,

মহাবর্ত্তময়ী কল্লোল বন্ধুর
প্রভঞ্জন সমাকুল,
বিস্ময় কারুণ্য সবিরহ প্রেম
সমুৎসাহ ফেণাকুল।

ভ্রুকুটি যাঁহার শ্মশান অরণ্য
গুহাময় শৈলচয়,
অশ্রু যে কারুণ্য বাসনা শৃঙ্গার
রস রূপে সদা বয়।

পূজে যে সে ধন্য সাক্ষাৎ মদন
দিব্য বাণভট্ট কবি,
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার কবি জয়দেব
গৌড় পঙ্কজ রবি।

রসময় বপুঃ কবি চণ্ডীদাস
কবিরাজ বিদ্যাপতি,
কৃষ্ণচন্দ্র সভা -বিভূষণ-মণি
ভারত রসিক-গতি।

বিনা কবি-স্পর্শ ভূপতি-সংসদ
বটে শ্মশান-ভীষণ,
মানি ভাগ্য আজি দৈবে মম গৃহে
দেব তব আগমন।

এত শুনি কবি প্রৌঢ় ভট্টরায়
হাসি আশীর্ব্বাদ করি;
আসনে বসিয়া নেহারে সভায়
পুলকে গোবিন্দ স্মরি।

ঋত্বিক মণ্ডল উৎকল-ভূয়িষ্ঠ
দ্রাবিড় মৈথিল দ্বিজ,
ত্রয়ী বা ত্রয্যন্ত আদি দরশন
শাস্ত্র সাধি কৈল নিজ।

*

অপসব্য বেড়ি যেমন ভাস্কর
দুর্নিরীক্ষ্য পরিবেশ,
বসি বাম ভাগে তথা রাজকুল
নীতিবিৎ উগ্রবেশ।

চারণ মাগধ কলকণ্ঠ বুধ
অনর্গল করে স্তব,
যতি ব্রহ্মচারী বিষ্টর-বিশেষে
ধীর বসিয়া নীরব।

চন্দ্রাতপ তলে বেষ্টিয়া ভূপাল
সদস্য প্রফুল্ল মন,
নির্ম্মল আকাশে বেড়ি চন্দ্র, যথা
স্ফুট গ্রহ তারাগণ।

সুধর্ম্ম-সমান * পরম সুন্দর
হেরি ভূপ-সভা-স্থল,—
আনন্দে পরশে বীণার তন্ত্র
সভা ত স্বেদ-বিকল।

ত্রিতন্ত্রী ঝঙ্কারি কহে কবিবর
কি কথা শুনিতে মন,
কোন রসাশ্রয় ঐতিবৃত্ত কথা
কিম্বা আশ্রিত সজ্জন?

ভূপের ইঙ্গিতে কৃতাঞ্জলি ধীর
মন্ত্রিমুখ্য গুরুসম,

* সুধর্ম্মা—দেবসভা। সুধর্ম্ম-সমান, সমাসে।

কহে, জ্ঞান দেব, নব্য পূর্ব্ব কথা
জ্ঞাত-বীর্য্য-পরাক্রম।

আশা-আলম্বন সজ্জন-আশ্রয়
মঙ্গলাবসান যার,
গৌড় নৈঋতে এ বীর্য্য ভূমিতে
যদি কথা থাকে কার।

শৃঙ্গার অদ্ভুত হাস্য রৌদ্র বীর
অঙ্গ-অঙ্গী আছে যার,
সন্ধি শবলতা ভাবে বিজড়িত
তরঙ্গে নাহিক পার।

নানা-রস-ঘন যথা-শাস্ত্রপূত
সুবদ্ধ প্রাগল্‌ভ্য হীন,
গাহ হেন কাব্য যাতে ধীরো দাত্ত
নেতা প্রবীর অদীন।

ক্রমশঃ—

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্, এ, বি, এল্।

আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ।

(৪)

দয়ানন্দ সংস্কারক কি না?

এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে একটি কথার আলোচনা করা উচিত যে, দয়ানন্দ হিন্দুকে ঠিক বুঝিয়াছিলেন কি না? লক্ষ্যাভিমুখিতা এবং লক্ষ্যানুসারিতা লইয়া যে হিন্দু-প্রকৃতি, তিনি সেই হিন্দু-প্রকৃতির মর্ম্মপ্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন কি না? এই কথার উত্তরে ইহা বলিব যে দয়ানন্দের কি বিচার, কি ব্যাখ্যা, কি ভাষণ, কি শাস্ত্রালোচন সমস্তই এক বাক্যে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তিনি যেমন হিন্দুপ্রকৃতির সহিত সুপরিচিত, তেমনই হিন্দুজীবন এবং হিন্দুসমাজের যথার্থ মর্ম্মেও সুপ্রবিষ্ট। অধিকন্তু, তিনি এই অধঃপতিত জাতির উদ্ধারকল্পে যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সকল প্রণালী হিন্দুপ্রকৃতির অনুবর্ত্তিনী বলিয়াই যে তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা একটু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে যে, হিন্দু কি? এই তত্ত্বটা সর্ব্বতোভাবে অধিগত করিতে দয়ানন্দের কিছুই বাকি ছিল না। তবে এখন দেখা যাউক, ইতঃপূর্ব্বে সংস্কারকের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, এই প্রস্তাবিত মহাপুরুষ সেই সেই লক্ষণের বিষয়ীভূত কি না?

প্রথমতঃ স্বজাতিজ্ঞতা। দয়ানন্দ সরস্বতীর তুল্য স্বজাতিজ্ঞ ব্যক্তি অতীব বিরল। তিনি হিন্দু জাতি এবং হিন্দুপ্রকৃতির সহিত সাতিশয় ঘনিষ্ট সম্পর্কে সম্পৃক্ত ছিলেন।

হিন্দুসমাজের সর্ব্বোচ্চস্তর হইতে সর্ব্বনিম্নস্তর পর্য্যন্ত,—সর্ব্বত্রই তাঁহার গতি অব্যাহত ছিল। এই জন্য দেখিয়াছি যে তিনি যেমন মিবার এবং মাড়োয়ারের অধীশ্বরগণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইতেন, তেমনই দরিদ্র জনের পর্ণশালায় যাইয়াও ধর্ম্মালাপ করিতেন। যদিও তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন, তথাপি আজি কালিকার সন্ন্যাসীদিগের মত তাঁহার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ বা একদেশদর্শী ছিল না। পক্ষান্তরে, হিন্দুজীবনের সকল বিভাগের উপরেই তিনি আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদিও তিনি কখন কোন নগরে বা লোকবহুল স্থানে অবস্থিতি করিতেন না,* কিংবা যদিও তিনি লোক সঙ্গ করিতে বড় একটা ভালবাসিতেন না, তথাপি, লোকচরিত্র পরিজ্ঞানের পক্ষে তাঁহার কোনই প্রতিবন্ধক ছিল না। যে হেতু, যে স্থলেই তিনি অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থলই জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি যখন নগরোপকণ্ঠে আসিয়া আশ্রয় লইতেন, তখন নগরের লোক নগর ছাড়িয়া উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি যখন নির্জ্জন-প্রায় প্রান্তরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন, তখন সেই প্রান্তরভূমিই কোলাহলময় হইয়া উঠিত। তিনি যখন গঙ্গার তটে তটেই বিচরণ করিতেন, তখন সময়ে সময়ে, গঙ্গার তটদেশেও লোকসংঘট্ট উপস্থিত হইত। কি জানি, তাঁহার চরিত্রে এমনই কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তাঁহার সমাগম শুনিবা মাত্র কি শত্রু মিত্র, কি পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই তাঁহার উদ্দেশে ছুটিতে থাকিত।† এই স্থলে এ কথা নিঃসংশয় হইয়াই বলা যাইতে পারে যে, যে দিন হইতে দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতের সংস্কারকরূপে ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে অন্তিম দিন পর্য্যন্ত, এমত একটি দিনও তাঁহার জীবনে উপস্থিত হয় নাই,—যে দিন অন্ততঃ শত লোকও তাঁহার নিকটে সমাগত না হইয়াছে, এবং সমাগত লোকদিগের শঙ্কা-সমাধানে তাঁহাকে প্রতি দিন অভীষ্ট পক্ষে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কালও ক্ষেপণ করিতে না হইয়াছে। সুতরাং স্বজাতীয় লোকদিগের রীতি প্রকৃতি উত্তম-

* দয়ানন্দ স্বামীর এই রীতি ছিল যে তিনি কখন কোন নগরে বা জনতাময় পল্লির মধ্যে যাইয়া বাস করিতেন না। তিনি যখনই কোন নগরে যাইয়া উপস্থিত হইতেন, তখনই, হয় উপকণ্ঠস্থিত কোন শান্ত পবিত্র নিকেতন, না হয় প্রান্তবর্ত্তী কোন নির্জ্জন বৃক্ষবাটিকা, তাঁহার অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইত।

† বেরেলির জনৈক শিক্ষিত বাঙ্গালি লেখককে একবার বলিয়াছিলেন যে, একদা পণ্ডিত অঙ্গদরাম শাস্ত্রীর সহিত দয়ানন্দ শাস্ত্রার্থ করিবেন, এই সংবাদ শুনিয়া স্থানীয় এত লোক সহর হইতে যাইয়া সেই শাস্ত্রার্থের স্থলে উপস্থিত হইয়াছিল যে, দোকানদারেরা দ্রব্যাদি বিক্রয়ের অভিপ্রায়ে তথায় যাইয়া আপনার আপনার দোকান পাতিয়া বসিয়াছিল।

রূপে বুঝিবার পক্ষে তাঁহার সমক্ষে যে সহস্র সুযোগই বিদ্যমান ছিল, তাহাই এক্ষণে বুঝা যাইতেছে।

গৃহস্থদিগের মত দয়ানন্দ ভারতের বিরক্তদিগকেও বিশেষ করিয়া চিনিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিরক্ত ছিলেন বলিয়া কি দণ্ডী পরম হংস, কি বৈরাগী ব্রহ্মচারী, কি অবধূত উদাসী, সকলের অবস্থা ত উত্তমরূপে জানিতেনই, এবং তাঁহাদিগের রীতিনীতি ও সাধন-পদ্ধতি সম্পর্কেও সবিশেষ অভিজ্ঞ ত ছিলেনই; তদ্ভিন্ন তিনি যখন গৃহনিষ্ক্রান্ত হইয়া যোগসিদ্ধ তাপসের অন্বেষণে এক একটি করিয়া চৌদ্দটি বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, যখন সিদ্ধ পুরুষের উদ্দেশে নর্ম্মদাতট হইতে আরম্ভ করিয়া অলকনন্দার চির তুষারাবৃত তটভূমি পর্য্যন্তও অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তিনি যে কত শ্রেণির সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গেই ঘুরিয়াছিলেন এবং সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কীয় কি প্রচুর অভিজ্ঞতাই তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ভারতের সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতাও দয়ানন্দের সাধারণ নহে। তিনি এতদ্দেশের প্রাচীন এবং নবীন সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনি শাক্ত, শৈব, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান এবং আস্তিক ও নাস্তিক সকলের সিদ্ধান্তই সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং কি রামানুজীয়, কি বল্লভীয়, কি দাদুপন্থী, কি নানকপন্থী সকলের সমক্ষেই দণ্ডায়মান হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের জয়ধ্বজা উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রী সমাজের অবস্থাও তিনি বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। কত স্থানের কত শাস্ত্রীর নিকটই তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি নিজেই এক জন শাস্ত্রবীর। তাঁহার সময়ে কি বঙ্গে, কি পঞ্জাবে, কি মহারাষ্ট্রে, কি মধ্যদেশে এমত প্রথিতনামা শাস্ত্রী বা পণ্ডিত অতি অল্পই ছিলেন, যাঁহাকে তিনি কখন না কখন সম্মুখ-সংগ্রামে আহ্বান না করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি শাস্ত্রার্থের সমর-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এতই বিভিন্ন শ্রেণির পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত এতই দীর্ঘকালব্যাপী বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, একমাত্র শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন ভারতের অপর কোন আচার্য্যকেই সেরূপ বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এতদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অবস্থা এবং প্রকৃতি সম্পর্কেও দয়ানন্দের ভূয়োদর্শিতা যার-পর-নাই ছিল। ফলতঃ, এইরূপে যিনি এই বিশাল হিন্দু জাতির সকল বিভাগই পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, যিনি ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র এবং গৃহস্থ বিরক্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণিস্থ হিন্দুরই যথাযথ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, অধিকন্তু যে সংস্কৃত সাহিত্য হিন্দু জাতির জাতীয় সাহিত্য বলিয়াই পরিগণিত, সেই সংস্কৃত সাহিত্যের আদ্যোপান্তে অসাধারণ অধিকার স্থাপনা পূর্ব্বক যিনি হিন্দু-প্রকৃতির আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশের কথা অক্ষরে অক্ষরে

পাঠ করিয়াছিলেন, তিনি যে স্বজাতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে অগ্রণী হইবারই উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দয়ানন্দের স্বজাতিজ্ঞান যেমন গভীর, তেমনই বিশাল।

দ্বিতীয়তঃ, স্বজাতিপ্রিয়তা। স্বজাতিজ্ঞতার মত দয়ানন্দের স্বজাতিপ্রিয়তাও বড় গভীর। কেবল স্বজাতিপ্রিয় বলিলে দয়ানন্দের কথা ঠিক বলা হয় না। পরন্তু স্বজাতিপ্রাণ বলিলে যাহা বুঝায়, দয়ানন্দ ঠিক তাহাই ছিলেন। তিনি হিন্দুপ্রাণ ছিলেন বলিয়াই, হিন্দু শব্দ ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন। তিনি নিজে হিন্দু শব্দ কিছুতেই ব্যবহার করিতেন না, এবং অপরে করিলেও তাহার অনুমোদন করিতেন না। কেন না, হিন্দু নাম আমাদিগের গ্লানিকর এবং মর্য্যাদানাশক। মুসলমান বিজেতৃগণ তাঁহাদিগের হৃদয়পোষিত অতি গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব প্রকাশের জন্যই আমাদিগকে ঐ নামে অভিহিত করিতেন।* তন্নিমিত্ত কি বিচারে, কি ব্যাখ্যানে, কি গ্রন্থে,—কোন স্থলেই তিনি আর্য্য ভিন্ন হিন্দু শব্দ ব্যবহার করেন নাই। হিন্দুর কলঙ্কের কথায় দয়ানন্দ শিহরিয়া উঠিতেন। হিন্দুর দুর্গতি দুর্দ্দশায় তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন। এই সম্পর্কে আজমীরস্থ রাজস্থান সমাচারপত্রিকার সম্পাদক লেখককে বলিয়াছেন,—"আমি দয়ানন্দের মত হিন্দুবৎসল ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। হিন্দু জাতির কোনরূপ বিপদ বা কলঙ্কের সংবাদে তিনি প্রাণে এতই ক্লেশ অনুভব করিতেন, এবং সেই সংঘটিত বিপদ বা কলঙ্কের কোন প্রতিকার হইতে পারে কি না। এই বিষয়ে এতই চিন্তাযুক্ত হইয়া উঠিতেন যে, বোধ হইত তিনি যেন নিজেই কোন গুরুতর বিপদে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।"

দয়ানন্দের স্বজাতিপ্রীতি হিন্দুর কেবল দুই একটি বিভাগের মধ্যেই পর্য্যবসিত ছিল না। পক্ষান্তরে কি শিক্ষা সভ্যতা, কি শিল্প সাহিত্য, কি কৃষি বাণিজ্য,—হিন্দুর যাহা কিছু, তাহারই রক্ষণ এবং তাহারই উন্নতিসাধনের নিমিত্ত তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতিপ্রবাহ প্রবাহিত রহিত। উপস্থিত প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ নিতান্তই আবশ্যক মনে করিতেছি। দয়ানন্দ যে একজন অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকরূপে ভারতভূমিতে অভ্যুদিত হইয়া এই রোগম্লান এবং মুমূর্ষুদশাপন্ন জাতির চিকিৎসাকল্পে আপনার দেহ-মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা ত সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কি সেই চিকিৎসা কার্য্যে কখন কোন বিদেশীয়ের নিকট হইতে কোন ঔষধাদি লইয়া আসিয়াছিলেন? তিনি হিন্দুজাতির

* পার্শি ভাষাতে হিন্দু শব্দ চোর, বা চোর সদৃশ কোন ঘৃণিত ব্যক্তির বোধক। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও হিন্দু শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

উপধর্ম্মের দুর্গ অধিকার করিবার উদ্দেশে রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষের মত সমরসজ্জা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সমরসজ্জার নিমিত্ত তিনি কি কোন বিদেশীয়ের নিকট হইতে কখন কোন অস্ত্রশস্ত্র লইয়াছিলেন? পাঠক! এই কথাটি একটু ভাবিবা দেখিবেন। বাঙ্গালার একজন চিন্তাশীল এবং প্রাচীন লেখক যথার্থই বলিয়াছেন;—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোন প্রদেশে আর্য্যধর্ম্মের জয়পতাকা অনুদ্ধৃত রাখেন নাই— অথচ তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র ও যতকিছু সম্বল সমস্তই পুরাতন ভারতবর্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতে সংগৃহীত;—তেজস্বী ব্রাহ্মণ কোন একটি বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও পরজাতির নিকটে ঋণী নহেন। না বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে, না প্রচার পদ্ধতি বিষয়ে, না চরিত্র সংগঠন বিষয়ে— তিনি ভারতের নির্ভীক আর্য্যসন্তান ছাড়া আর কিছু!" * ইহাও কি তাঁহার স্বজাতিপ্রাণতার একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন নহে?

তৃতীয়তঃ,—রক্ষণপরতাই দয়ানন্দের সংস্কার প্রণালীর প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। এই হেতু তিনি কোন বিষয়েরই আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া একটা কিছু নূতন করিতে চাহিতেন না। তিনি নিশ্চয়রূপেই জানিতেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারে রাশি রাশি জঞ্জাল ঢুকিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি সমস্ত শাস্ত্র উড়াইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উজ্জ্বলরূপেই বুঝিতেন যে, অশেষবিধ কদাচার এবং কলঙ্কে হিন্দুর আশ্রমধর্ম্ম যার-পর-নাই কলুষিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি বর্ণাশ্রম প্রথাকে একবারে উন্মূলিত করিতে চাহিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, যে গুলি জঞ্জাল সেই গুলিই ফেলিয়া দিবে, যে টুকু কলঙ্ক, সেই টুকুই ধৌত করিয়া ফেলিবে,—আর যে গুলি কদাচার, সেই গুলিরই পরিবর্জ্জন করিয়া হিন্দু আপনার শাস্ত্র এবং সমাজের রক্ষণ ও উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইবে। দয়ানন্দ ব্রহ্মোপাসনার যার-পর-নাই পক্ষপাতী হইলেও, অভিনব ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার ততটা পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহার কারণ সম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রায়ই বলিতেন;—"ভারতের নানা স্থলে যে সকল শিবমন্দির এবং অন্যান্য দেবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সকল মন্দির হইতে কেবল মূর্ত্তিগুলি সরাইয়া ফেল, এবং সেই মূর্ত্তিশূন্য মন্দির গুলির মধ্যেই ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা কর।" এতদ্দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারক দল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে পারে, সে পক্ষে দয়ানন্দের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি একবারে নূতন লোক আনিয়া প্রচারক দল পরিপুষ্ট করিতে চাহিতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন,—"প্রচার কার্য্যের জন্য ভাবতে আবার লোকের অভাব কি?

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৮৮৮ শকাব্দ।

যে সকল অশিক্ষিত এবং উদর-সর্ব্বস্ব সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আইস, এবং যথোচিত রূপে শিক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগকেই প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত কর।" অধিক কি, দয়ানন্দ প্রথমে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠারও পক্ষে ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় যতদূর আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াই বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ যদি বেদের অস্তিত্ব মানিয়া লইতেন,—অন্ততঃ বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও চলিতেন, তাহা হইলে স্বামী দয়ানন্দ সম্ভবতঃ আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতেন না। তিনি এই বিষয় লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষদিগের সহিত বিচার এবং আলোচনা করিতে কিছুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে যখন তিনি বোম্বাই হইতে আমন্ত্রিত হইয়া আহম্মদাবাদে উপস্থিত হয়েন, এবং স্থানীয় প্রার্থনা সমাজের কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রার্থনা সমাজের বেদী হইতে কএকটি ব্যাখ্যান প্রদান করেন, তখনও তিনি উল্লিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। রাও বাহাদুর ভোলানাথ সারা ভাই, এবং রাও সাহেব মহিপতি রামরূপ রাম, এই দুইটিই তখন আহম্মদাবাদ প্রার্থনা সমাজের দুইটি স্তম্ভ স্বরূপ। সুতরাং দয়ানন্দ এই দুই জনের নিকটেই প্রার্থনা-সমাজকে * আর্য্যসমাজ নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ভোলানাথ এই প্রস্তাবটি লইয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বহু চিন্তা ও আলোচনার পর, পরিশেষে স্বামিজীর নিকটে আসিয়া বলিলেন ;—"প্রার্থনাসমাজ বেদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, এবং বেদের প্রাধান্য মানিতেও সম্মত হইবেন না।" সুতরাং আহম্মদাবাদ প্রার্থনা সমাজের নিকটে দয়ানন্দের উল্লিখিত প্রস্তাব অপরিগৃহীত হইল। * দয়ানন্দ কএক দিবস পরে আহম্মদাবাদ হইতে রাজকোটে চলিয়া আসিলেন, এবং রাজকোট প্রার্থনা-সমাজের নিকটেও উল্লিখিত প্রস্তাব তুলিয়া বসিলেন। রাজকোটস্থ প্রার্থনা সমাজের কর্তৃপক্ষেরাও উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বিচার ও চিন্তার পর, অবশেষে ইহাকে সঙ্গত এবং সর্ব্বাংশেই শুভদায়ক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তখন দয়ানন্দ আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রার্থনা সমাজের উপাদানাদি লইয়াই রাজকোটের রমণীয় ক্ষেত্রে আর্য্য সমাজের ভিত্তি নিখাত করিলেন। †

* বাঙ্গালায় যাহার নাম ব্রাহ্মসমাজ, বম্বে প্রদেশে তাহারই নাম প্রার্থনা সমাজ। তবে বিশেষত্ব এই যে প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মত ততটা বৈপ্লবিক নহেন।

* Life of Rao Bahadur Bholanah Sarabhai.

† অনেক লোকের,—এমন কি আর্য্য-সমাজ-সংসৃষ্ট অনেক বিশিষ্ট লোকের ধারণা

চতুর্থতঃ, সত্যনিষ্ঠা। সত্যনিষ্ঠায় দয়ানন্দ অলোক-সাধারণ। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে দয়ানন্দ যখন কাশীর আনন্দবাগে উপস্থিত,—তাঁহার কথা লইয়া যখন কাশীতে ঘোরতর আন্দোলন,—তাঁহাকে বিমর্দ্দিত করিবার অভিপ্রায়ে যখন কাশীর চতুর্দ্দিকে আয়োজন,—এবং তজ্জন্যই কাশীনরেশের বাটীতে যখন পণ্ডিত মণ্ডলীর বারংবারঅধিবেশন; তখন কাশীস্থ প্রথিতনামা কএকটি পণ্ডিত একদিন নিভৃতে আসিয়া দয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন;—"স্বামিজি! যাহা কিছু বলিতেছেন সবই সত্য; তবে আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে আপনি মূর্ত্তি পূজার কথাটা ছাড়িয়া দেন,—তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনাকে শঙ্করাচার্য্যের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লই।" ইহা শুনিয়া দয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আমি অবতার হইবার জন্য আসি নাই, আমি সত্যের প্রার্থী,—ভারতভূমিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।" তখন পণ্ডিতগণ আর বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া উঠিয়া গেলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে দয়ানন্দ যখন দিল্লীর দরবার হইতে লাহোরে যাইয়া উপস্থিত হয়েন, এবং উপর্য্যুপরি বিচার ও ব্যাখ্যান দ্বারা যখন পঞ্চনদের অধিবাসীদিগকে বৈদিক ধর্ম্মের অনুকূলে উত্তেজিত করিয়া তুলেন, তখন তথাকার একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহচরদিগের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন;—"মূর্ত্তিপূজার কথাটা ছাড়িয়া দিবার জন্য আপনারা সকলে স্বামিজীকে অনুরোধ করুন। মূর্ত্তিপূজার কথা ছাড়িয়া দিলে জয়পুর মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এবং তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিবেন।" বলা বাহুল্য যে এই কথাটা দয়ানন্দের কর্ণে যখন কোনরূপে উত্থাপিত করা হইল, তখন তিনি ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—"আমি জয়পুর মহারাজাকে তুষ্ট করিব? না বেদ প্রতিপাদিত ব্রহ্মকে তুষ্ট করিব? তোমরা এরূপ কথা আর আমার নিকটে তুলিও না।" এইস্থলে ইহা কি অসঙ্কুচিতচিত্তে বলা যাইতে পারে না যে, দয়ানন্দ সরস্বতী যদি মূর্ত্তিপূজার ঘোরতর বৈরী হইয়া না দাঁড়াইতেন, অন্ততঃ, অপরাপর সমস্ত কথা রাখিয়া কেবল মূর্ত্তিপূজার কথাটাই কোনরূপে চাপিয়া চলিতে পারিতেন; তাহা হইলে কেবল জয়পুর মহারাজা কেন,—ভারতের অনেক রাজা মহারাজাই তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন; এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের, উত্তর ও দক্ষিণের সমস্ত হিন্দুই একতানবদ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রচুর পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে অন্যতম অবতাররূপে স্বীকার করিয়া লইয়া, সম্ভবতঃ, শঙ্করাচার্য্যের পার্শ্ববর্ত্তী, না হয় পরবর্ত্তী, আসনেই আরূঢ় করাইতেন। কিন্তু, তিনি মূর্ত্তি-

যে বোম্বাই নগরেই প্রথম আর্য্যসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু, তাঁহাদিগের এই ধারণা ঠিক নহে। কেননা, প্রথম আর্য্যসমাজ রাজকোটেই স্থাপিত হয়।

পূজার পরিপন্থী না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কেন না, মূর্ত্তিপূজা সত্যের বিরুদ্ধ, এবং দয়ানন্দ সত্যে অবিচলিত।

পঞ্চমতঃ, সত্যের বিজয়িনী শক্তিতে দয়ানন্দের অটল বিশ্বাস। এই বিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া একটি কথাই বলিব। দয়ানন্দ যখন নিদারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া যোধপুর হইতে আবু পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পীড়ার সাংঘাতিকতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া তাঁহার অনুচর বর্গের সকলেই যখন হতাশ হইয়া উঠিলেন, আর্য্যজাতির আশাজ্যোতি অকালে নির্ব্বাণ হইতে চলিল দেখিয়া,—আর্য্যাবর্ত্তের উজ্জ্বল দিবাকর সান্ধ্যগগনে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই অস্তাচলের অভিমুখী হইতেছেন বুঝিয়া, তাঁহার সহচরদিগের সকলেই যখন শোকদগ্ধ চিত্তে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; তখন বোম্বাই হইতে আগত একটি শিক্ষিত এবং উৎসাহী পুরুষ একদা স্বামিজীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সাতিশয় ক্ষোভ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"মহারাজ! আপনি ত চলিলেন, এখন আর্য্যাবর্ত্তের দশা কি হইবে বলুন?" এই প্রশ্নের উত্তরে দয়ানন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"নিরাশ হইবেন না,—বৈদিক ধর্ম্মের যে আগুণ জ্বালাইয়া যাইতেছি, তাহা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবে না জানিবেন।" এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি যেন স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছিলেন যে, ভবিষ্যতের সুদূর গর্ভে বৈদিক ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী বিজয় নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তজ্জন্যই তিনি ঘোরতর রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও উল্লিখিত প্রশ্নের ঐরূপ উত্তর প্রদানে একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না।

ষষ্ঠ লক্ষণ, আত্মবিলোপ। আত্মবিলোপে দয়ানন্দকে অদ্বিতীয় বলিলেই হয়। যেহেতু তাঁহার মত অপূর্ব্ব আত্মবিলোপ ভারতীয় অপর কোন আচার্য্যই দেখাইতে পারেন নাই। পাঠক, এই কথাটি একটু ভাবিয়া দেখিবেন যে, যে দেশে মানুষ কথায় কথায় পরমেশ্বর হইয়া বসে, কাম ক্রোধের ক্রীতকিঙ্কর হইয়াও মনুষ্য যে দেশে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরমেশ্বরের সহিত আপনাকে তুলিত করিতে পারে, যে দেশে বিকট-কণ্ঠ বায়সেরা কোকিলের সমাদর গ্রহণ করে, এবং যে দেশে শৃগালেরা যাইয়া অক্লেশেই সিংহের আসন অধিকার করিয়া থাকে, সে দেশে দয়ানন্দ সরস্বতীর মত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই কি একটা প্রকাণ্ড ঈশ্বরাবতার হইয়া বসিতে পারিতেন না? কে বলে যে, তাঁহার মত পণ্ডিত, তাঁহার মত সন্ন্যাসী, তাঁহার মত নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচারী, তাঁহার মত ত্যাগী এবং তাঁহার মত অসাধারণ তার্কিক পুরুষ একটু ইঙ্গিত করিলেই আপনাকে একটা অংশাবতারের মধ্যেও প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া যাইতে পারিতেন না? যে দেশে দুই একখানা গৈরিকবস্ত্র, কএক গাছা জটা আর দুই চারিটা অভ্যস্ত সংস্কৃত শ্লোকমাত্র সম্বল লইয়াই একটা নূতন পন্থার প্রবর্ত্তনা করিতে পারা যায়, সে দেশে স্বামী দয়ানন্দের মত দিগ্বিজয়ী পুরুষ একটু চেষ্টা করিলেই

কি একটা অভিনব পন্থার প্রবর্ত্তক হইয়াও বসিতে পারিতেন না? পূর্ণাবতার হওয়া দূরে থাকুক, অংশাবতার হওয়া দূরে থাকুক, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হওয়া দূরে থাকুক; আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি আপনাকে আর্য্যসমাজের অধিনায়ক বলিয়া পরিচিত করিতেও সম্মত ছিলেন না। বোম্বাই নগরে যখন আর্য্যসমাজ স্থাপিত হইল, তখন তথাকার কতকগুলি কৃতবিদ্য সভাসদ্ সমাজের অধিনায়কের পদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দয়ানন্দকে সাতিশয় অনুরোধ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন;—"আমি অধিনায়ক পদের উপযুক্ত নহি।" তখন তাঁহারা পুনরায় অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"তবে সমাজের সভাপতি হউন।" তাহাতেও তিনি অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"যদি একান্তই অনুরোধ কর, তাহা হইলে আমি কেবল সমাজের একজন সভ্যমাত্র হইতে পারি।" তখন দয়ানন্দ অপরাপর দশজনের মত এক জন সভ্য মাত্রই হইয়া বোম্বাই আর্য্যসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেন। * আর্য্যসমাজের অধিনায়ক বা অভিভাবক হওয়া দূরে থাকুক, দয়ানন্দ ত ইচ্ছা করিলেই আর্য্য সমাজের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া বসিতে পারিতেন। তিনি ত ইচ্ছা করিলেই আর্য্যসমাজকে একাধিপত্যের লীলাস্থল করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কি তাহা করিয়াছিলেন? আর একটি কথা একটু নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ভাবিতে হইবে। আর্য্যসমাজ স্থাপিত করিয়া,—বেদভাষ্যাদির প্রচার করিয়া, এবং ভারতের সংস্কার সম্বন্ধীয় অপরাপর সহস্র কার্য্যে আপনার শরীর মনের সমস্ত শক্তি উৎসর্গীত করিয়া দয়ানন্দ কি কোন অভিনব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন? তিনি কি কোন একটি নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন? ইহার উত্তরে বলিব,—না। বস্তুতই দয়ানন্দ যেমন কোন নূতন মতের উদ্ভাবক নহেন, তেমনই কোন নূতন পন্থারও প্রবর্ত্তক নহেন। তিনি কি বিচারে, কি ব্যাকরণে, কি বেদভাষ্যে, কি অপর কোন গ্রন্থে, কি কোন সিদ্ধান্তের খণ্ডনমণ্ডনে, কোথাও আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই;—কোন স্থলেই আত্মপ্রভুত্বের আবেগে পরিচালিত হইয়া কোন কথাই বলিয়া যান নাই। তিনি বেদভাষ্যভূমিকার একস্থলে বলিয়াছেন;—"এই ভাষ্যে স্বকপোল কল্পিত কোন কথাই লিখিত হইবে না। পক্ষান্তরে ব্রহ্মা হইতে ব্যাসদেব পর্য্যন্ত

* বোম্বাই আর্য্যসমাজের অন্যতম সভ্য এবং ট্রষ্টি সুন্দর দাস ধরমসা লেখককে বলিয়াছিলেন যে—"স্বামী দয়ানন্দ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন অপরাপর সভ্যদিগের মত নিয়মিতরূপ বোম্বাই সমাজে চাঁদা দিতেন।" আমি শুনিয়াছি যে বোম্বাইএর মত লাহোরেও, আর্য্যসমাজ স্থাপনাকালে উল্লিখিতরূপ অনুরোধ করিলে, স্বামিজী উল্লিখিতরূপে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া শেষে লাহোর আর্য্যসমাজেরও একজন সভ্য মাত্র হইয়াছিলেন।

মহর্ষিগণ যে প্রণালীতে বেদার্থ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, আমি এই ভাষ্যে সেই প্রণালীরই অনুবর্ত্তন করিয়াছি মাত্র।" * ফলতঃ, দয়ানন্দের সমগ্র জীবনের সমস্ত কার্য্যই যে বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন, কিংবা বৈদিক ঋষিদিগের পদাঙ্কানুসরণ মাত্র, তাহাই এখন প্রমাণিত হইল। যাহাহউক উল্লিখিত ছয়টি লক্ষণেই যখন দয়ানন্দ লক্ষণান্বিত হইতেছেন, তখন দয়ানন্দও যে একজন সংস্কারক, তাহাও এখন প্রতিপন্ন হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেঃ——

আশার সান্ত্বনা।

সবে কহে তুমি নাই—তুমি নাকি গেছ মরে,
আশা কহে—"আছ তুমি মরণের পর পারে,
নশ্বর মানব দেহ শ্মশানে তাহার স্থান,
অমর মানব প্রাণ নাহি তার অবসান।
এ জীবন স্বপ্ন নহে, নহে ইহা বিধাতার
ক্ষণস্থায়ী জলবিম্ব শুধু জলে মিশিবার;
এ সংসার নাট্যশালে করি শেষ অভিনয়
প্রবেশিব যবে সেই ভবিষ্যত রঙ্গালয়,
আবার হেরিব তোমা, মিলনের সুখ-বাসে
অভিশপ্ত এ জীবন দাঁড়াবে তোমার পাশে;
এ ধরার দুঃখ ক্লেশ এখানেই পাবে লয়
অনন্ত মঙ্গল তথা নাহি অমঙ্গল-ভয়,
যবনিকা অন্তরালে—চেয়ে আছ দীর্ঘ পথ
এ জীবন অবসানে পূর্ণ হবে মনোরথ।"
মিলনের মন্দাকিনী কত দিনে পুনরায়
প্লাবিয়া বিরহ-বেলা প্রবাহিত হবে হায়!

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

পর-পার-বাসিনী।

মরি নাই, মরণ এ জীবনের একটি অধ্যায়।
তোমার প্রতপ্ত শ্বাস—তপ্ত অশ্রুজল
প্রিয়তম, প্রাণাধিক, দেখিতে তোমায়
মরণের এ পারেও করিছে পাগল।

স্নেহ-প্রীতি-মমতার মধুর বন্ধন
ছিন্ন কভু নাহি হয় দেহের সহিত;
ফোটে নভে, নীল সন্ধ্যা ঢাকিলে গগন,
তারার তৃষিত আঁখি করুণ-লোহিত।

ডোবে সন্ধ্যা, ফোটে ঊষা, রূপের গরবে,
ঝরে ফুল শোভে ফল তরু-বীজ ল'য়ে,
তাই মরণের নাম জীবন, এ ভবে,
প্রকৃতির এই গতি অনন্ত নিলয়ে।
তোমরা ওপারে বৃথা কর হাহাকার,
জীবন মরণ এক জেনে রে'খ সার।

শ্রীঃ—

* ঋগ্বেদাদি ভাষ্য-ভূমিকা, ২ পৃঃ।

ছায়াদর্শন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

[২]

গুণাভিমানিনী (Miss Goodrich Freer) গুড্‌রিচ ফ্রিয়ার, হাম্‌টনকোর্ট নামক প্রাসাদে, কেমন এক খানি বিষাদ-মেঘাবৃতা জ্যোৎস্নামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকের মনে আছে। লোকান্তরিতা বিলাসিনী, দুঃসহ দুঃখ-পরিতাপে হৃদয়ে দগ্ধ হইয়া, যেন প্রায়শ্চিত্ত কামনায়ই পৃথিবীতে আসিয়াছেন; এবং পৃথিবীতে আসিয়া, আপনার পুরাতন প্রমোদ-নিকেতনে কাঙ্গালিনীর মত প্রণত হইয়া, কাতর-নয়নে প্রার্থনা করিতেছেন, এ শোকাবহ বৃত্তান্ত একবার মনোযোগের সহিত পড়িলে, মনুষ্য কখনও ইহা ভুলিতে পারে না। কিন্তু গুড়-রিচ ফ্রিয়ার, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, লণ্ডনের একটি পুরাতন নিকেতনে এবং তৎসন্নিহিত উপাসনা-ভবনে, চক্ষু কর্ণ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভ্রান্ত সাক্ষ্যে, যে তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে, হৃদয় ভয়ে ও দুঃখে থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। ভয় ও দুঃখের বিশেষ কারণ আছে। অনন্তস্থায়ি কাল মনুষ্যের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোন কর্ম্মই যে কখনও বিস্মৃত হয় না, এবং মনুষ্য গোপনে কিংবা প্রকাশ্য স্থানে, —যেখানে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহার কিছুই যে উপযুক্ত কর্ম্মফলে পরিণত না হইয়া কালের অগাধ-গভীর অন্ধকার-কুক্ষিতে বিলয় পায় না, সে বিষয়ে মনুষ্য-মাত্রেরই হৃদয়ে অতি বড় কঠোর বিশ্বাস জন্মে। এ বিশ্বাস অবশ্যই উপকারজনক, তথাপি ভয়বর্দ্ধক।

হাম্‌টন্‌কোর্ট যেমন আত্মিক নর-নারীর নৈশ-বিচরণে এবং নানারূপ বিলাপ-নিঃস্বনে উপদ্রুত বলিয়া সকলের কাছে পরিচিত, লণ্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তস্থিত একটি ভদ্রজনোচিত বাস্তগৃহও, গৃহস্বামিনী ও তাঁহার সুহৃৎস্বজনের নিকট ঐরূপ উপদ্রুত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। গৃহস্বামিনী সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। কিন্তু তিনি, বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থবৈভবের উপযোগিতা সত্বেও, আপনার অভিনব-অধিকৃত বাস্তগৃহে আপনি মনের সুখ-শান্তিতে অবস্থান করিতে পারিতেন না। মানুষ কিংবা ছায়ামূর্ত্তি কিছুই তিনি চক্ষে দেখিতেন না; অথচ কে যেন তাঁহার সম্মুখ দিয়া, কিবা দিনে, কিবা রাত্রিতে, ধপ্ ধপ্ করিয়া চলিয়া যাইত। সম্মুখস্থ টেবিল, গ্রন্থপত্র ও নিত্যব্যবহারের দ্রব্যসামগ্রীনিচয়ে, সুসজ্জিত রহিয়াছে; কে যেন টেবিলের সমস্ত বস্তুর উপর অকস্মাৎ

আসিয়া যার-পর-নাই উপদ্রব করিত, এবং যাহা কিছু হাতে পাইত, তাহাই বিরক্তির সহিত একদিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইত। সে অদৃশ্য ব্যক্তি, কথনও কথনও, ঘরের রুদ্ধ দ্বার গুলি ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া ফেলিত; কথনও বা প্রাচীরের গায়ে চপেটাঘাত করিয়া, সেস্থানে আপনার কর-রেখা মুদ্রিত করিত। গৃহস্বামিনী এই পর্য্যন্ত বুঝিতেন যে, অদৃশ্য ব্যক্তির কি যেন বিশেষ কথা আছে, সে সেই কথা ভালমতে বুঝাইবার সুযোগ না পাইয়া ক্রোধ ও বিরক্তি দেখাইতেছে।

গৃহস্বামিনী, সবিশেষ না জানিয়া, বাড়ীটি কিনিয়াছিলেন। উহা দীর্ঘকাল ছাড়া বাড়ীর মত ছিল। তিনি ইহা জানিতেন না। এইক্ষণ জানিয়া শুনিয়া ও প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া, উহা অন্যের কাছে ক্ষতিস্বীকারে বিক্রয় করিলেন। যে দিন বিক্রয়কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়, সেইদিন মিষ্টার ডোনাল্ড * নামক লণ্ডনের একটি শিক্ষিত ও সত্যজিজ্ঞাসু ভদ্রলোক, উপদ্রবের মূল কারণ জানিবার উদ্দেশ্যে, গুড্‌রিচ ফ্রিয়ারকে ঐ বাড়ীতে লইয়া যান; এবং পিকাডিলির এক হোটেলে সান্ধ্যভোজ সমাপন করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সকলে উল্লিখিত বাড়ীর হল-ঘরে যাইয়া উপবিষ্ট হন।

যাঁহারা পরীক্ষার্থ উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহারা সংখ্যায় চারি জন। (১) গৃহস্বামিনী অর্থাৎ যিনি কএকটি বৎসর মাত্র ঐ বাড়ীটিতে অবস্থান করিয়া সে দিন উহা বিক্রয় করিয়াছেন। (২) তাঁহার একটি বুদ্ধিমতী প্রতিবেশিনী। (৩) মিষ্টার ডোনাল্ড। (৪) পণ্ডিত-বর্য্যা মিস্ গুড্‌রিচ ফ্রিয়ার।

পরীক্ষার্থীরা উল্লিখিতরূপ উৎসুক-হৃদয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল উপবিষ্ট রহিলেন। কিন্তু, এই সময়ের মধ্যে, কোন অদ্ভুত শব্দ তাঁহাদিগের শ্রুতিগোচর হইল না। ইহার পর, রাত্রি যথন বারটা বাজিল, তথন ঐ ঘরেরই এক প্রান্তে বিষাদ-ধ্বনির অনুরূপ, কেমন একপ্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ হইতে লাগিল। মিস্ ফ্রিয়ার, সেই শব্দ শ্রবণে চমকিত হইয়া, উয়িজা বোর্ড নামক কাষ্ঠযন্ত্রের এক প্রান্তের উপর যথারীতি কাগজ ও পেন্‌সিল রাখিলেন; এবং আর এক প্রান্তের উপর আত্মিক-লেখার নিয়মানুসারে আপনার একটি অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া, অদৃশ্য মূর্ত্তিকে তাহার মনের কথা লিখিয়া জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

উয়িজা বোর্ড (Ouija Board) একপ্রকার অতি লঘু ত্রিপদ কাষ্ঠফলক। এ দেশের লোকেরা যেরূপ কাষ্ঠময় লঘু যন্ত্রকে প্লাঞ্চেট্ (Planchette) নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন, উয়িজা বোর্ড তাহারই উৎকৃষ্টতর সংস্করণ। উহার উপর এক খানি কাগজ রাখিয়া, সেই কাগজের উপর একটি পেন্‌সিল দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। আর, উহার আর এক প্রান্তে, উপস্থিত ব্যক্তি-

* ফ্রিয়ারের গ্রন্থে মেঃ ডি এই মাত্র পরিচয় আছে।

দিগের মধ্যে এক জনের বাঁ হাতের একটি কি দুইটি অঙ্গুলি, "ছোঁয় না ছোঁয়" এমনই ভাবে ঈষৎ সংস্পৃষ্ট রহে। যিনি ঐরূপে উয়িজাকে স্পর্শ করেন, তাঁহার শরীরে যদি মাধ্যমিক শক্তি থাকে, তাহা হইলে অলক্ষিত আত্মিক-ব্যক্তিরা অনায়াসে ঐ পেন্‌সিলের ব্যবহারের দ্বারা মনের কথা লিখিতে পারেন। পেন্‌সিলটিকে কোন মনুষ্য স্পর্শ করিতেছে না, অথবা উহার গতিক্রিয়ার উপরেও, কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে না; তথাপি, প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে, বিবিধ অর্থযুক্ত কথা লিখিত হইতেছে। এইরূপ লেখাই ইদানীং আত্মিক লেখা অর্থাৎ Spirit Writing নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাঠককে বৈশাখের ছায়াদর্শন-প্রবন্ধে জানাইয়াছি যে, মিস্ ক্রিয়ারের শরীরে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মাধ্যমিক শক্তি অর্থাৎ Mediumistic Element আছে। মাধ্যমিক শক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে কিপ্রকার বস্তু, বৈজ্ঞানিকেরা অদ্যাপি তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু, তাঁহারা ইহা বহু পরীক্ষার দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন যে, কোন কোন লোক অন্যের অপরিলক্ষিত ছায়ামূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান; এবং তাঁহারা যেখানে উপবিষ্ট থাকেন, লোকান্তরবাসী আত্মিক-নরনারীরা, সেখানে, যেন কি অপরিজ্ঞাত শক্তির সাহায্য অবলম্বনে, উপস্থিত হইয়া, জল-স্থল-দারু-লৌহময় জড়জগতের উপর কার্য্য করিতে সমর্থ হন। এই শ্রেণীর লোকেরাই ইদানীং মিডিয়ম অথবা মাধ্যমিক নামে পরিচিত; এবং ইহাঁদিগের শরীরে সেই যে কি এক অপরিজ্ঞাত শক্তি আছে, তাহারই নাম মিডিয়ামিষ্টিক প্রভাব অথবা মাধ্যমিক শক্তি।

ক্রিয়ার তাঁহার মাধ্যমিক শক্তি সম্পর্কে বড়ই লজ্জিত। অনেক অনক্ষর মূর্খের শরীরেও এই শক্তি থাকা দৃষ্ট হয়। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণির পণ্ডিত হইয়াও যে, এই বিচিত্র শক্তির অধিকার সম্পর্কে, তাহাদিগের সহিত এক শ্রেণিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই চিত্তে তাদৃশ সংকুচিত। কিন্তু, সর্ব্বসমানা, সর্ব্বজন-কল্যাণী জগন্ময়ী প্রকৃতি তাঁহার অভিমান ও লজ্জার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে কেন? তিনি যখনই তাঁহার দক্ষিণ কিংবা বাম হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা উয়িজে অথবা প্লাঞ্চেটের এক প্রান্ত স্পর্শ করেন। তখনই উহার উপরিধৃত পেন্‌সিলটি নড়িয়া উঠে; এবং পেন্‌সিলের অধঃস্থিত কাগজে, কিছুক্ষণ, আঁকা বাঁকা রেখাপাতের পর, শেষে পরিষ্কার অক্ষর ফোটে।

আজিও তাহাই হইল। পেন্‌সিলটি আগে কাঁপিয়া উঠিল, তার পর উহাতে লেখা ফুটিতে লাগিল। ক্রিয়ার প্রীতি ও বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এ ঘরে কে আছ? তোমার যদি কোন দুঃখের কথা থাকে, তাহা আমাদিগকে নিঃসঙ্কোচে লিখিয়া জানাও।"

তখন সেই মনুষ্যস্পর্শশূন্য,—অথচ যেন সচৈতন্য—পেন্‌সিলে লিখিত হইল,—

"আমার নাম মড ক্লেয়ার—Maud Clare —আমি বড় দুঃখিনী। আমি পঞ্চাশ বৎসর কাল, এই পাপপুরীতে, পাপানলে দগ্ধ হইয়া, কারারুদ্ধবৎ অবস্থান করিতেছি; কিরূপে বাহির হইব,—বাহির হইয়াই বা কোথায় যাইব, তাহার পথ পাইতেছি না। যদি ক্ষণকালের জন্য বাহির হই, তাহা হইলেও, আমার কর্ম্মস্মৃতির আকর্ষণে, যেন কেমন এক দুশ্ছেদ্য রজ্জুর দৃঢ়বন্ধনে, পুনরায় এখানেই আসিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হই।"

ক্লিয়ার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি কর্ম্ম করিয়াছ?—তোমার এ দশা কেন হইল?" পেন্‌সিল এবার কিছুক্ষণ নিশ্চল রহিল; তার পর, ধীরে—ধীরে—তেনাং,—যেন অতি কষ্টে, অতি বড় অসহ্য প্রকৃতাপে, উহাতে লিখিত হইল,—"আমি কাতভাগিনী বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। সে কথা মুখে আনিতে অথবা পেন্‌সিলে লিখিতেও আমার হৃদয় এখন বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি আর আমার কনিষ্ঠা ভগিনী এই বাড়ীতে বসতি করিতাম। সে কনিষ্ঠাকে আমি পাপীয়সী রাক্ষসী, আকস্মিক ক্রোধে, স্বহস্তে হত্যা করিয়াছি। কেন হত্যা করিয়াছি, তাহা বলিব না। কিন্তু আমা হইতেও অধিকতর দুঃখিনী, ভগিনীটি আমার, অদ্যাপি এই বাড়ীতেই আছে;—এবং আমিও আত্মকর্ম্মবিপাকে এই বাড়ীতেই আবদ্ধ আছি। আমাদিগকে কেহ ধরিয়া কিংবা রাখে না,—কেহ দেখা দেয় না,—কেহ কথা কহিয়াও ভাল মন্দ কিছু বলে না, এবং লোকান্তরবাসী কাহারও সহিত আমাদিগের কোনরূপ সাক্ষাৎকার ঘটে না। কিন্তু তথাপি আমরা, যেন আমাদিগের স্বকৃত কর্ম্মের সূত্রে জড়িত হইয়া, এখানে, এই পুরীতেই, কারাবাসের অন্ধকারে পড়িয়া আছি। আমার যন্ত্রণার শেষ নাই। আমি অহোরাত্র যে আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতেছি, তাহা মনুষ্যকে বুঝাইতে পারি না। আমার এইক্ষণ সামান্য একটুকু বহিশ্চরণের শক্তি জন্মিয়াছে; কিন্তু আমার ছোট বোনটির তাহাও হয় নাই, এবং তাহাকে একা ফেলিয়া আমি এক পাও দূরে যাইতে পারি না।"

প্রশ্নকর্ত্রী ক্লিয়ার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাছা, আমরা তোমার কি উপকার করিতে পারি?" অলক্ষিতা ইহার উত্তরে আকুল-প্রাণে লিখিল,—"আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করুন,—করুণাময় জগদীশ্বরের নিকটে করুণার্দ্রহৃদয়ে প্রার্থনা করুন, তাহাতে নিশ্চয়ই আমার উপকার হইবে।" ক্লিয়ার, তাহার তথাবিধ কাতর উক্তিতে হৃদয়ে একটুকু স্পৃষ্ট হইয়া, প্রতিশ্রুতি দানের ভাবে বলিলেন,—"আমরা কল্য, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, এখানকার ভজনাগৃহে নিশ্চয়ই সকলে মিলিয়া তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিব।"

অলক্ষিতা, ইহার পর, পেন্‌সিলের লেখা দ্বারা, উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট তাহার আত্মপরিচয় দিল,—তাহার আকৃতি,

প্রকৃতি, তাহার সম-সাময়িক অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন পরিচ্ছদ-রীতি, এবং পারিবারিক জীবনের বহু কথা জানাইল। কিন্তু ফ্রিয়ার, শিষ্টাচারের অনুরোধে সে সকল কথার সমস্তই গোপন করিয়াছেন; এবং শুধু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রচারপ্রয়োজনে যতটুকু প্রকাশ করা একান্ত অপরিহার্য্য, আপনার প্রবন্ধে ততটুকু মাত্র লিখিয়াছেন। উয়িজা বোর্ড লইয়া এই রাত্রিতে এই পর্য্যন্তই হইল; এবং অলক্ষিতা কিরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে তাহার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিয়াছে, সে কথাটা ফ্রিয়ার ও তদীয় সুহৃদ্বর্গের চিত্তে যেন জলদক্ষরে লিখিত রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। ফ্রিয়ার প্রভৃতি সকলেই, নিকটস্থ এক হোটেলে, প্রাতর্ভোজ সমাপন করিয়া, মধ্যাহ্নসময়ে ঐ মহল্লার এক গৃজায় উপাসনার জন্য গমন করিলেন। তাঁহারা শনিবার রাত্রিতে গড ক্লেয়ারের দুঃখের কাহিনী অবগত হইয়াছিলেন। আজি রবিবার। রবিবার গৃজায় বহু ভদ্র লোকের সমাগম হয়। তাঁহারা এই হেতু, গৃজার পশ্চিম প্রান্তে, একটুকু নিভৃত স্থানে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ফ্রিয়ার যেখানে বসিলেন, তাহার পিছনেই গৃজার পশ্চিম দ্বার। সে দ্বার অবরুদ্ধ।

গৃজায় যথাবিহিত উপাসনা আরব্ধ হইল। উপাসনার মধ্যভাগে ফ্রিয়ার প্রভৃতি সকলেই, নিজ নিজ চেয়ার হইতে নামিয়া, ভূতলে জানুপাত করিয়া, যুক্তকরে, প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে কে যেন সহসা, ফ্রিয়ারের পিছনের দ্বারটি ধীরে ধীরে খুলিয়া, আবার ঐরূপ ধীরে ধীরে উহা বন্ধ করিল, এবং নিতান্ত মৃদু-পদ-সঞ্চারে ফ্রিয়ারের দক্ষিণ পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফ্রিয়ারের চক্ষু তখন নিমীলিত। তিনি চক্ষু বুজিয়া উপাসনা করিতেছিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহার অব্যবহিত পৃষ্ঠবর্ত্তি দ্বারটি খুলিল, এবং সেই দ্বার আবার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, এ সকল শব্দ তিনি তাঁহার কানে স্পষ্ট শুনিয়া মনে একটুকু বিরক্ত হইলেন। মনে ভাবিলেন, কোন রমণী এই পথ দিয়া যাইতে চাহিতেছেন, এবং তিনিই আমার উপাসনার বিঘ্ন জন্মাইতেছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে বড় অসঙ্গত। তিনি মনে এইরূপ ভাবিয়া পুনরায় নিয়মিত উপাসনায় নিবিষ্ট হইলেন। কে তাঁহার বিঘ্ন জন্মাইয়াছেন, তাহা চাহিয়া দেখিলেন না।

ইহার মুহূর্ত্তপরই, পার্শ্ববর্ত্তিনী ফ্রিয়ারের একখানি হাত অতি কোমলভাবে স্পর্শ করিল। তাঁহার হাতে দস্তানা ছিল না। সুতরাং স্পর্শমাত্রই তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি তখন বিস্ময় ও বিরক্তির সহিত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি দীর্ঘাকৃতি কৃশাঙ্গী রমণী দণ্ডায়মানা।* রমণীর 'মুখ-

* "I saw a figure, tall, slight, with a bonnet large enough to conceal the profile, a long-waisted dress, a gan-

খানিতে একটুকু লাবণ্য আছে। কিন্তু সে লাবণ্য অনুতাপ-কাতরতার গভীর ছায়ায় আচ্ছাদিত; এবং তাহার চক্ষু দুটি অশ্রু-সিক্ত। রমণী ফ্রিয়ারের দিকে বড়ই দীন-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"আমি অভাগিনী মড ক্লেয়ার। আমার জন্য আর আমার দুঃখদগ্ধ ভগিনীটির জন্য প্রার্থনা করিতে ভুলিবেন না।" কিন্তু ঐ সময়েই গৃজার ঘড়িতে টং টং করিয়া বারটা বাজিল। প্রার্থনার জন্য প্রতিশ্রুত-সময় ফ্রিয়ারের মনে পড়িল।

ফ্রিয়ার খানিককাল চমকিত চিত্তে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি দিবা দুই প্রহরের সময়, সূর্য্যের প্রখর আলোকে, স্থিরচক্ষে, তাকাইয়া দেখিতেছেন, এমন অবস্থায়ই সে রমণীমূর্ত্তি, সেই স্থানেই, শূন্যে মিশিয়া গেল। যদিও সে গৃজাঘর তখন লোকে পরিপূর্ণ, তথাপি ফ্রিয়ারের বুকটা ক্ষণকাল ধুক্ ধুক্ করিয়া কম্পিত রহিল। ফ্রিয়ার কি দেখিলেন, কি শুনিলেন, তাহার কিছুই আর তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। যে দেখা দিয়াছিল, তিনি তাহার জন্যে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিয়া, অপরাহ্নে লণ্ডনে আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ছায়ামূর্ত্তির এইরূপ দর্শনকে ফ্রিয়ার একবারে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কারণ, ইহা চতুর্ব্বিধ প্রমাণে সমর্থিত। (১) যে দর্শন-দান করিয়াছে, সে আগের দিন রাত্রিতে আত্মিক-লেখার দ্বারা তাহার পরিচয় দিয়াছে ও দুঃখের কথা জানাইয়াছে। (২) দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে, গৃজাঘরে, দর্শন-দানের ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে, ফ্রিয়ারের হাতখানি সে হাতে ছুঁইয়াছে। (৩) দ্বার মোচন ও পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া, এবং তার পর কথা কহিয়া, শব্দ শুনাইয়াছে। (৪) ফ্রিয়ারের চক্ষের উপর তৎক্ষণাৎ শূন্যে বিলীন হইয়া আপনার সূক্ষ্মশরীরিতা সম্বন্ধে সকল সংশয় ভঞ্জন করিয়াছে। ইহার উপর, পরলোকের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব এবং আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য মনুষ্যের অপরিহার্য্য দায়িত্ব সম্বন্ধে আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে? এবং যাহার বুদ্ধি এইরূপ আশ্চর্য্য প্রমাণেও অভিভূত না হয়, কে তাহার মনে, আর কিরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা, বিশ্বাস জন্মাইতে পারে?

এখানে দুই একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন আছে। তাহার যথাসম্ভব উত্তর হওয়া আবশ্যক। ১ম প্রশ্ন,—ছোট বোনটি দেখা দেয় নাই কেন? মড ক্লেয়ার আপনিই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে,—সে অভাগিনী এখনও গাঢ়তর অন্ধকারে আছে। ২য় প্রশ্ন,—মড ক্লেয়ার শনিবার রাত্রিতে, অর্থাৎ

zy scarf hanging over both arms, and a general impression of grey and white colouring. Then, almost at the same instant, the clock struck twelve. The sound aroused the association natural, and I knew that I had received a message reminding me of my promise and of Maud Clare."

উয়িজা বোর্ডের সাহায্যে আলাপের সময়, দেখা দেয় নাই কেন? উত্তর,—হয় ত তাহার ইচ্ছা হয় নাই; না হয় ত, শনিবার রাত্রিতে, যে গৃহে উপবিষ্ট হইয়া, সকলে তাহার নিকট বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই গৃহের বায়বীয় ও বৈদ্যুতিক অবস্থা স্থূল-তনু-ধারণের উপযোগি নহে। ৩য় প্রশ্ন,—পূজা ঘরে এক ক্রিয়ারই মড ক্লেয়ারকে, দেখিলেন, আর কেহ দেখিলেন না কেন? ১ম উত্তর,—ক্রিয়ারের শরীরে একটুকু মাধ্যমিক শক্তি আছে, অন্যের তাহা নাই। ২য় উত্তর,—মড ক্লেয়ার ক্রিয়ারের প্রতি একটুকু আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই জন্যই তাঁহার হাত খানি ছুঁইয়াছে,—তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; অন্য কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ৪র্থ প্রশ্ন,—মড ক্লেয়ার পূজায় প্রবেশের সময়ে দ্বার খুলিল, অথচ তিরোধানের সময় বায়ুতে মিশিয়া গেল, ইহার কারণ কি? উত্তর,—আগম ও নিগম উভয়ই এক-কারণ-সম্ভূত। মড ক্লেয়ার, প্রবেশের সময়, ক্রিয়ারের শ্রুতি ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই ঐ ভাবে দ্বার খুলিয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না বলিয়া পরিশেষে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপিচ, সে যদি ক্রিয়ারের চক্ষুর সম্পর্কে ঐরূপ অলৌকিক ভাবে তিরোহিত না হইত, তাহা হইলে তাহাকে পৃথিবীর মনুষ্য বলিয়া মনে করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন অনেক প্রকারই কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু মুখ্য কথা এই যে, পণ্ডিত-সমাজ-পূজ্যা পবিত্র-স্বভাবা ও পরীক্ষণ-নিপুণা মিস্ ক্রিয়ার সত্যবাদিনী কি না? ইয়ুরোপের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই ক্রিয়ারকে সত্যবাদিনী বলিয়া সম্মান করেন। ক্রিয়ারের কথা সত্য হইলে, তিনি যাহাকে চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং যাহার স্পর্শে আকৃষ্ট হইয়া উপাসনার সময়ে চক্ষু মেলিয়াছেন, সে পরলোকের অধিবাসিনী; এবং সে তাহার আত্ম-দুঃখের যে সকল কথা কহিয়াছে, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত কর্ম্মফলের এক দীর্ঘ কাহিনী। কর্ম্মস্মৃতির এইরূপ অপরিহার্য্য দুঃখদাহই কুম্ভীপাকের জ্বালাময় প্রদাহ। কিন্তু করুণানিধান বিশ্বেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে এ দাহের পরিণাম-ফল অমৃতময়, —অনন্ত উন্নতির পূর্ব্ব-সোপান,—অনন্ত-স্থায়ি শিক্ষা ও অনন্ত-বৈচিত্র্যময় স্বর্গভোগের প্রাথমিক অনুষ্ঠান।

"I therefore trust my Father's love,
And in His care rely—
Believe I'll in progression move,
And higher life enjoy."

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। "ধম্মপদ। অর্থাৎ ধর্ম্মপদনামক পালি গ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।" ধম্মপদ গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদ ও প্রকাশ বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গদেশে অথবা সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে স্থান, বৌদ্ধ-জগতে অর্থাৎ "সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান ও তিব্বত প্রভৃতি দেশে" ধম্মপদের সেই স্থান। মহাযোগমগ্ন বুদ্ধদেবের জিহ্বা হইতে সতত যে সকল সারার্থ তত্ত্বকথা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে, রাজগৃহনগরে, প্রথম বোধিসঙ্গমকালে, সংগৃহীত হইয়া, ধর্ম্মপদ নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়; এবং ইহার প্রত্যেক পদই বিবেক-বৈরাগ্যমূলক ধর্ম্মজ্ঞানের সোপান বলিয়া ইহা ধর্ম্মপদ নাম লাভ করে। পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ দেশেই এই দুর্লভ ও দেববাক্‌প্রতিম মহাগ্রন্থের অনুবাদ ও অর্থ-ব্যাখ্যা আছে। বাঙ্গালায় এই প্রথম ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল; সুতরাং, অনুবাদক ও প্রকাশক বাবু চারুচন্দ্র বসু এই কার্য্য দ্বারা বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

এই গ্রন্থ বহুশাস্ত্রদর্শী ও বৌদ্ধবৃত্তজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত একটি ভূমিকার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পথ-প্রদর্শক, এবং বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বিদ্যাভূষণ শুধু এই ভূমিকা লিখিয়াই পরিতৃপ্ত রহেন নাই। তিনি এই গ্রন্থের মুদ্রণ সময়ে আগাগোড়া সমস্ত দেখিয়াছেন,—মূলের সংস্কৃত-অনুবাদ সংশোধন করিয়াছেন, এবং আরও অনেক প্রকারে গ্রন্থ প্রকাশের অনুকূল কার্য্য করিয়াছেন; অতএব, ইহার সুকৃতিসম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র বসুর ন্যায় তিনিও বাঙ্গালির ধন্যবাদার্হ।

এই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় পালি ভাষায় লিখিত। পালি আর প্রাকৃত এক নহে; অথচ পালির একটি পংক্তি পাঠ করিলেই, মনে আপনা হইতে প্রতীতি জন্মে যে, ইহা পল্লীপ্রচলিত, রূপান্তর-পরিণত নূতন এক প্রকার সংস্কৃত। আমরা নিম্নে ধম্মপদ পুস্তকের দুইটি পংক্তি, অন্বয়, সংস্কৃতানুবাদ ও বঙ্গানুবাদ সহিত উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক এই দুইটি পংক্তি পড়িলেই পালি ভাষার প্রকার কতকটা বুঝিবেন; এবং সম্পাদক কিরূপ সরল

সংস্কৃত ও সরল বাঙ্গালায় যে পালির অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইবেন। যথা ধর্ম্মপদের আত্মবর্গে,—

অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবসয়ে
অথঞঞ্ঞমনুসাসেয্য ন কিলিস্সেয্য
পণ্ডিতো।

অন্বয়।—অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে, অথ অঞ্ঞং অনুসাসেয্য; পণ্ডিতো (এবং করিয়া) ন কিলিস্সেয্য।

সংস্কৃত।—আত্মানমেব প্রথমং প্রতিরূপে কর্ত্তব্যে নিবেশয়েৎ; অথ (তদনন্তরং) অন্যমনুশিষ্যাৎ; পণ্ডিতঃ (এবং কৃত্বা) ন ক্লিশ্যেৎ (ক্লেশং প্রাপ্নুয়াৎ)।

অনুবাদ।—যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে অগ্রে আপনাকে নিবিষ্ট করিবে, পরে অন্যকে উপদেশ দিবে; পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ করিলে ক্লেশ পাইবেন না।

ধর্ম্মপদের সমস্ত শ্লোকই এইরূপ সরল সংস্কৃতে ব্যাখ্যাত, এবং সরল বাঙ্গালায় অনুদিত হইয়াছে। সম্পাদক এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সকল শ্রেণিস্থ পাঠকের সুখবোধ্য করিতে যত্নের ক্রটি করেন নাই। আমাদিগের ভরসা আছে শিক্ষার্থী যুবক ও শিক্ষিত বৃদ্ধগণও তাঁহার এই গ্রন্থের প্রতি আদর প্রদর্শনের ক্রটি করিবেন না।

আমরা গ্রন্থনিহিত উপদেশের মহার্ঘ গৌরব বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিব না। কেন না, উপদেষ্টার নাম বুদ্ধদেব। বৌদ্ধধর্ম্মের Theology অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব ভারতবর্ষীয় হিন্দুর গ্রাহ্য হইবে না। যদি গ্রাহ্য হইবার কথা থাকিত, তাহা হইলে, ইহা ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত হইত না। যেমন সকল মাটীতে সকল প্রকার শস্য জন্মে না, সেইরূপ সকল দেশে সকল প্রকার ধর্ম্ম বদ্ধমূল হয় না। ভক্তিপ্রবণ ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতি অন্য প্রকার; সুতরাং শুদ্ধ-শুষ্ক-শূন্যবাদাত্মক বৌদ্ধধর্ম্মের মূল প্রসঙ্গের সহিত উহার মেলন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু নির্ম্মল-স্বভাব বুদ্ধদেব, মনুষ্যের নিত্যজীবনসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বেদান্ত ও ভগবদ্গীতার ভাবানুপ্রাণিত ভারতবাসীর চিরপ্রিয়।

২। "পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত ও পরিশিষ্ট। শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।।০ টাকা।" এই বিখ্যাত গ্রন্থের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। অনেকের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, ইহা মহর্ষির স্বর্গপ্রয়াণের পর প্রকাশিত হইবে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ইহা এইক্ষণই প্রকাশ করিয়া, তত্ত্বপিপাসু বঙ্গবাসীকে আনন্দ দান করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল হউক। মহর্ষি, গ্রন্থের প্রারম্ভে, প্রিয় শিষ্য শাস্ত্রিমহাশয়ের সম্ভাষণে লিখিয়াছেন,—

"১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমার জীবন-কাহিনী ঊনচল্লিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করিয়া তোমাকে দিলাম; ইহা তোমার সম্পত্তি হইল। ইহাতে কোন নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দু বিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না।"

আঠার হইতে একচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকে মনুষ্যের নবোদ্গত যৌবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহর্ষির নবোদ্গত যৌবন কিরূপ নির্ম্মল তত্ত্বপিপাসায় ও প্রকৃতির রহস্যপাঠ-লালসায় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে, অনেকেই আপনাকে আপনি ধিক্কার দিবেন,—যাঁহারা ধন-মান-সমৃদ্ধ ও বিলাস-সুখ-লুব্ধ, তাঁহারা লজ্জিত হইবেন; কিন্তু যাঁহাদিগের আত্মায় কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞানালোকের আভা আছে, তাঁহারা এইরূপ একটি মহোজ্জ্বল চরিত্রের ক্রমবিকাশ-দর্শনে, আনন্দে আপ্লুত হইয়া, ভগবানকে ভক্তির সহিত স্মরণ করিবেন।

এই গ্রন্থ বঙ্গীয় চিন্তাবিপ্লবের একখানি অপূর্ব্ব ইতিহাস। বঙ্গবাসি-পৌরাণিকদিগের পুরাতন চিন্তাস্রোত, কিরূপে ধীরে ধীরে নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়া, একটি অভিনব অথচ উদ্যমপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে তাহার ফটোগ্রাফিক চিত্র আছে;—ইহাতে বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মবিকাশের মৌলিক কাহিনী আছে;—আর, পর্য্যটনপ্রিয় মহর্ষিদেব ভারতবর্ষের যে সকল পর্ব্বত প্রান্তর, গ্রাম ও নগর, তীর্থ আশ্রম, সরিৎশোভা ও বনভূমি দর্শন করিয়াছেন, তাহার অতি উপাদেয় বর্ণনা আছে। বনভূমির বর্ণনা ঔপন্যাসিক কাহিনী হইতেও অধিকতর হৃদয়হারিণী। মহর্ষি ইংরেজী, সংস্কৃত, ফার্শী, ফরাশি এবং বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার স্রষ্টা বলিয়া পরিচিত, মহর্ষি তাঁহাদিগের মধ্যেও অগ্রগণ্য ব্যক্তি। সুতরাং, তাঁহার এই স্বরচিত জীবনচরিতের ভাষাও, ভাষাশিক্ষার্থিদিগের চক্ষে, উপাদেয় বস্তু বলিয়া আদর পাইবে।

মহর্ষির ঋষিত্ব ও তপশ্চর্য্যা অবশ্যই সর্ব্বসাধারণের সেব্য সামগ্রী নহে। কিন্তু তাঁহার সাংসারিক জীবনের একটি মাত্র ঘটনা এ স্থলে উল্লেখ করিব। এই একটি মাত্র ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ঋষি যোগীরা যত প্রকার সন্ন্যাসের কল্পনা করিয়াছেন, গার্হস্থ্য সন্ন্যাসই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; এবং যাঁহারা গৃহবাসে থাকিয়াও, বনবাসী ঋষিতাপসের ন্যায়, বিষয়-সংসারে নির্লিপ্ত,—স্বার্থত্যাগে মুক্তচিত্ত, এবং চিত্তের অভ্যন্তরে ব্রহ্মচিন্তায় নিত্যনিমগ্ন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে মহর্ষি নামের যোগ্য। উল্লিখিত ঘটনাটি এই,——

মহর্ষির পিতা প্রসিদ্ধনামা 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর, চিরজীবনকাল, একাই যেমন এক শত হস্তে উপার্জ্জন করিতেন, একাই সেইরূপ, পরের উপকার এবং আরও নানারূপ কার্য্যে, এক শত হস্তে ব্যয় করিতেন। তাঁহার ব্যয়বিধানের অনেক কথা অদ্যাপি বঙ্গদেশে উপন্যাসের মত কথিত, শ্রুত ও আলোচিত হইয়া থাকে। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর ইহা প্রকাশ পাইল যে, তিনি বহু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। কার-ঠাকুর-কোম্পানি নামে তাঁহার একটি হৌস ছিল। হৌসের ঋণের পরিমাণ এক কোটি, পাওয়ানা সর্ব্বসাকল্যে সোত্তর লক্ষ টাকা।

তাহারও সমস্তই আদায় হইবে বলিয়া আশা নাই। এমন অবস্থায়, এই ঋণশোধের কি হইবে ?

মহর্ষির পৈত্রিক সম্পত্তি একটি পাকা ট্রাষ্টডিডের দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। প্রাপক মহাজনেরা কোন দিক্ দিয়া তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন, এমন শঙ্কা ছিল না। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ অন্যবিধ পদার্থে গঠিত। তদীয় স্মরণীয় জীবনের সেই মহামুহূর্ত্তে,—সেই চিরস্মরণীয় পরীক্ষাসময়ে, তাঁহার এক দিকে পিতার রাজপ্রাসাদ ও পৈতৃকবৈভবের অশেষ প্রকার বিলাস-সামগ্রী ; আর এক দিকে পিতৃ-ঋণ। তিনি পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করাই তাঁহার স্বাধীন জীবনের প্রথম কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করিলেন , এবং যদি তদর্থ তাঁহাকে ভিখারী হইতে হয়, তাহাতেও ভীত না হইয়া, তাঁহার রক্ষিত ও অরক্ষিত সমস্ত সম্পত্তিই মহাজনদিগের হাতে বুঝাইয়া দিলেন। মহাজনদিগের মধ্যে সকলেই মহর্ষির এই অশ্রুতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান আলোচনা করিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল,—তাহাদিগের মধ্যে কাহারও চক্ষে জল ঝরিল, এবং চারিদিকে একটা জয়-জয়-ধ্বনি উঠিল। মহর্ষির সেই ভয়ানক পিতৃ-ঋণ কড়ায় ক্রান্তিতে পরিশোধিত হইয়াছে। তাঁহার যে সংসারে, বৎসরে, বার লক্ষ টাকায়ও সমস্ত ব্যয়ের সঙ্কুলন হইত না, সেই সংসারে বার্ষিক বিশ পঁচিশ হাজার টাকায় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহের দৃঢ় বন্দোবস্ত হওয়ায়, তদীয় মিতব্যয়িতার মহিমায়ই পৈতৃক সম্পত্তি দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু, তিনি যে তাঁহার পিতৃদেবকে অঋণী করিবার জন্য, যৌবনের প্রথমোচ্ছ্বাস সময়েই, জীবনের সকল সুখ ও সর্ব্ববিধ সম্পদ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সে কথাটা, মানবজাতির শিক্ষার্থ, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি আশ্চর্য্য কাহিনীর মত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। ধন্য মহর্ষির ঋষিত্ব অথবা মহর্ষিত্ব! ধন্য তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আত্মবিসর্জ্জন!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ইদানীং একটি সচেতন চন্দ্রকান্তমণিস্তম্ভের ন্যায়, সুশীতলপ্রভাময় শান্তশোভায়, দর্শকের নয়ন ও মন তর্পণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, তিনি এইক্ষণ ইহলোক ও পরলোকের মধ্য রেখায় অবস্থিত, এবং জড়জগৎ অপেক্ষা অধ্যাত্মজগতের সহিতই অধিকতর সম্পৃক্ত। আমরা তাঁহাকে দেবধামের অধিবাসিজ্ঞানে উদ্দেশ্যে অভিবাদন করি। তাঁহার সুদীর্ঘজীবনব্যাপি সদনুষ্ঠান-বহুল তপশ্চর্য্যায় বঙ্গদেশের মহান্ উপকার সংসাধিত হইয়াছে ; তাঁহার এই স্বরচিত জীবনচরিত পাঠেও অসংখ্য লোকের উপকার হইবে। গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগও সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু সুবিজ্ঞ শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রযত্নে, উহা মৌলিক গ্রন্থের ন্যায় আর একখানি বৃহৎ গ্রন্থে বিস্তারিত না হইলে, পাঠকের আশা পূর্ণ হইবে না।

৩। "Keshob Chunder Sen—Correct statement of some disputed facts in his life. কেশবচন্দ্র সেন—

তাঁহার জীবনের কতকগুলি বিসংবাদিত ঘটনার যথাযথ বিবরণ।" মূল্য ॥০ আট আনা। এই গ্রন্থের আবরণ-পত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে যে, ইহার ইংরেজী অংশ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় এবং বাঙ্গালা অংশ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় দ্বারা সঙ্কলিত, এবং নববিধান সমাজসংসৃষ্ট প্রচারকদিগের যত্নে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, উচ্ছ্রিতশীর্ষ, উদারচরিত্র, মহামতি কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের চারিত্রগৌরব প্রতিপাদন। তিনি আপনি, বাল্যবিবাহের বিরোধী ও ব্রাহ্মবিবাহ-আইনের প্রবর্ত্তক হইয়াও, কুচবিহাররাজ্যের বালক-মহারাজের করে আপনার বালিকা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে অব্রাহ্মপদ্ধতিতে সম্প্রদান করিয়াছেন,—পুরাতন মিরর পত্রখানি ছল-কৌশলে আপনার করায়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, এবং আরও দুই একটি অসঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনার ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়াছেন, ইত্যাদি কথা উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ অদ্যাপি নাকি তাঁহার চরিত্রসমালোচন-সময়ে দুই একটি মন্দ কথা কহিয়া থাকেন। গ্রন্থকারদ্বয় সে সকল মিথ্যা ও মন্দ কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রকৃত সত্য জানাইতে যত্ন পাইয়াছেন; এবং কেশবচন্দ্রের প্রতি কেন তাঁহারা হৃদয়ের সহিত ভক্তিমান্, তাহাও প্রসঙ্গতঃ একটুকু বুঝাইয়াছেন। তাঁহাদিগের পরিশ্রম সে অংশে সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু, ইহা আমরা বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহাদিগের এই উদ্যমের দ্বারা বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের অবশ্যই একটুকু আনুষঙ্গিক নিন্দা হইয়াছে। কথাটা অতি সংক্ষেপে বুঝাইব।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের এই বঙ্গভূমি, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত সমাজে, নামতঃ পরিচিত হইলেও, উচ্চশ্রেণিস্থ মনুষ্যের বাসভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল না। যখন উহার কিছু কিছু পরিচয় হইয়াছিল, তখন মেকলে প্রভৃতি সদ্বিচারবিমূঢ় শব্দরস-বিলাসী লেখকদিগের অনুগ্রহে, বাঙ্গালির নামে ইয়ুরোপে উপহাস-রসিকতার তরঙ্গ ছুটিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গের সুকৃতিসন্তান কেশব, যখন বঙ্গমাতার নাম লইয়া, ইংলণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন ইংলণ্ডের অধিবাসিদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালিজাতিকে অতি শ্রেষ্ঠজাতি, এবং বঙ্গভূমিকে কতকটা পুরাতন আর্য্যের কীর্ত্তিভূমি মনে করিয়াছিল; এবং বাঙ্গালির মুখে পরমার্থপ্রসঙ্গের উচ্চতম তত্ত্বকথা কানে শুনিয়া প্রাণে চমকিয়াছিল।

বস্তুতঃ, কেশবচন্দ্র বঙ্গের অসামান্য আভরণ,—বঙ্গীয় অথবা ভারতীয় প্রতিভার উচ্চতম বিকাশ, এবং বাঙ্গালিমাত্রেরই জাতীয়গৌরববর্দ্ধক। তিনি যখন এই বঙ্গদেশে, তাঁহার জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য, কর্ম্মরত ছিলেন, তখন আজিকার ঘৃণিত, নিগৃহীত, পাদদলিত বঙ্গভূমিই সমগ্র

পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহা পড়িবার জন্য, এবং তিনি সভাস্থলে অথবা স্বগৃহে যাহা কহিতেন, তাহা শুনিবার জন্য, স্বদেশে ও বিদেশে, সকল শ্রেণিস্থ লোকের মধ্যেই একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঔৎসুক্যের ভাব জন্মিয়াছিল। মিস কব্, মার্টিনিউ, মিল ও মোক্ষমূলর প্রভৃতি জগৎপূজ্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা যখন, তাঁহার আধ্যাত্মিক আলাপে ও অমল-চরিত্র-পর্য্যালোচনায় মোহিত হইয়া, তাঁহাকে দেবপুরুষ-জ্ঞানে সম্মান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সম্পর্কে সর্ব্বত্রই একটা বিচিত্র ভক্তির ভাব ফুটিয়াছিল। আর, রাজ-রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া হইতে রাজপ্রতিনিধি লরেন্স্ পর্য্যন্ত পদস্থ জনেরাও যখন নিঃস্ব, নিঃসহায় ও ঈশ্বর-মাত্রপরায়ণ কেশবের সংবর্দ্ধনায় প্রীতি ও সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, তখন সমাজের নিম্নস্তর-স্থিত সাধারণ লোকেরাও কেশবকে অসাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানে মাথা নোয়াইয়াছিল। বঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে, অন্য বহুবিধ গুণে পূজাস্পদ হইয়াও যে, শুধু সাম্প্রদায়িক অন্ধতায়, আজ্ সেই কেশবের স্বর্গীয় স্মৃতি উপলক্ষে, হৃদয়ের আনন্দে জাতীয়-উৎসব অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে, তাঁহার জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে, সময়ে সময়ে বিকার-বিদ্বেষের ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, ইহাতে সকলেই আমরা ধিক্কৃত ও বিড়ম্বিত হইতেছি; এবং কেশবের ভক্তশিষ্যেরা যে এইরূপ অসামান্য-তেজঃসম্পন্ন ক্ষণজন্মা ধর্ম্মবীরের জন্যও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা প্রসঙ্গে, পক্ষসমর্থনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন, ইহাতেও আমরা যার-পর-নাই লজ্জা বোধ করিতেছি।

কেশব-স্তরের পুরুষদিগকে মিস্ কব প্রভৃতি সমান-প্রকৃতিক সমুচ্চ ব্যক্তিরাই সম্যক্ বুঝিতে পারেন, আমরা পারি না। আমরা যতটুকু পারি, তাহাতে কোন অংশেও তাঁহার বিশাল ও বিশুদ্ধ চরিত্রে কপটতা কিংবা নীচতার পরিচয় পাই না। কুচবিহারের বিবাহ, বিবাহের প্রকৃত অর্থে, বাগ্দান মাত্র; এবং যাঁহারা, নিজ নিজ হৃদয়ের বিশ্বাস-শাসনে, বিধাতাকে মানবজগতের সহিত কর্ম্ম-সূত্রে জড়িত বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগের চক্ষে উহার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই বিধিকৃত। বিধিকৃত কর্ম্ম লইয়া বিবাদ ও বিসংবাদ নিরর্থক শ্রম। অন্ততঃ, কেশব যে এ বিবাহকে বিধিব্যবস্থাপিত অনুষ্ঠান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহার অনুমাত্রও সংশয় নাই।

তবে কি কেশব দোষ-স্পর্শশূন্য অভ্রান্ত পুরুষ? তাহা নহে। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন বিবর্ত্তবিধানের নিয়মাধীন, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার চরিত্রই সেইরূপ ক্রমবিবর্ত্তের নিয়মাধীন। কেশবচন্দ্রও, এই বিশ্বজনীন নিয়মানুসারে, ক্রমে ফুটিয়াছেন, ক্রমে বাড়িয়াছেন; এবং স্তুতিনিন্দার সঙ্কুল-তরঙ্গরাশির মধ্যেও পর্ব্বতের ন্যায় অটল রহিয়া,—অভাব ও অপূর্ণতা পরিহারের দ্বারা পূর্ণতালাভের জন্য, অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া, আপনার অভীষ্ট-আদর্শের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছেন।

কেশবের সহিত অনেক বিষয়ে অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে। কারণ, মত ও বিশ্বাস মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে। কেশব, কুচবিহার বিবাহমণ্ডপে, বিষ্ণু শব্দটিও উচ্চারণ করিতে দেন নাই, অথচ চিরজীবন হরিনাম গাইয়াছেন। এই পরস্পর বিরোধ ও বিসদৃশ অনুদারতা আমাদিগের নিকট একেবারেই ভাল লাগে নাই। কিন্তু, তাই বলিয়া কি, তাঁহার প্রখর জ্ঞান, প্রদীপ্ত প্রতিভা ও পর্ব্বতের ন্যায় গুরুভার-চরিত্রের প্রতিও আমাদিগের ভক্তি কমিয়াছে? যাঁহারা, এইরূপ খুটি নাটির বিচারে, কেশব সম্বন্ধে ভক্তি ও ভালবাসার ভাব পোষণ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মনঃপুষ্ট বিবেক অতিমাত্র তীক্ষ্ণ হইতে পারে; কিন্তু হৃদয় ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা স্বদেশ-বৎসলতা ও জাত্যভিমান-বুদ্ধির অনুমোদিত নহে।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের বহু কথা লিখিবার ছিল; কিন্তু বান্ধবের কলেবরে তাহা কুলায় না। উপসংহার-স্থলে, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে কেশব ও কবের পরস্পর-সম্ভাষিত পত্র কয়খানির সারাংশ পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়াছি; এবং সূক্ষ্মদর্শী কেশব, কুচবিহার-বিবাহ-ব্যাপারে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সকল ঘটনায়ই যে আপনার হৃদ্গত ঈশ্বরনিষ্ঠা দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছেন, এ কথার বিবিধ অকাট্য প্রমাণ পর্য্যালোচনার সুযোগ পাইয়া, চিত্তে প্রীতি লাভ করিয়াছি।

৪। "শব্দরূপ-কল্পদ্রুমঃ। ৩৯ সংখ্যক বসুপাড়ালেনস্থিত-সংস্কৃতবিদ্যালয়তঃ শ্রীগুরুনাথ-বিদ্যানিধিভট্টাচার্য্যেন সঙ্কলিতঃ প্রকাশিতশ্চ। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।"—ইহা একখানি নূতন ধরণের শিক্ষাপুস্তক—প্রবেশিকা-শ্রেণীর বালক এবং সারস্বত-সমাজের প্রথম-পরীক্ষার্থিদিগের নিতান্ত উপযোগি ও উপকার-জনক। ইহাকে সংস্কৃত শব্দরূপের একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অভিধান বলিলে কোন অংশেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অকারান্ত রামশব্দ হইতে হকারান্ত দুহ্ ও ক্ষকারান্ত বিবক্ষ্ শব্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণিস্থ শব্দেরই সকল প্রকার রূপ অতি সুন্দর ও সহজবোধ্য প্রণালীতে প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অবশ্যজ্ঞাতব্য অশেষ কথা, টীকার পদ্ধতিতে, প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে বিন্যস্ত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, অথবা কতকটা প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এই পুস্তক খানি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সম্মুখে থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমরা এই পুস্তকে কেবল একটি শব্দের রূপ সম্পর্কে সামান্য একটুকু অভাব দেখিয়াছি। তাহা গ্রন্থকারের নিকট সসম্মানে নিবেদন করিব। গ্রন্থকার উচ্চশ্রেণিস্থ বৈয়াকরণ এবং অসামান্য পণ্ডিত। সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট শিক্ষালাভে অধিকারী। তিনি দীর্ঘ ঊকারান্ত শব্দের মধ্যে ভ্রূ এবং অতিভ্রূ শব্দের রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যসাহিত্যের নিত্যব্যবহার্য্য 'সুভ্রূ' শব্দের রূপ প্রদর্শন করেন

নাই। ইহা নিশ্চয়ই স্মৃতির ভ্রম। তিনি ভ্রূ শব্দ সম্পর্কে টীকায় লিখিয়াছেন,—"ভ্রূ শব্দস্য প্রধানস্যাপ্রধানস্য চ শ্রীশব্দবৎ সর্ব্বত্র ব্যবস্থা।" এই নিয়মানুসারে সুভ্রূ শব্দের সম্বোধনেও সুভ্রূঃ হয়। কিন্তু কালিদাস লিখিয়াছেন,—"বিমাননা সুভ্রু কুতঃ পিতুর্গৃহে।" ভট্টিতে আছে,—"হা পিতঃ কাসি হে সুভ্রু, বহ্বেবং বিললাপ সঃ।" কালিদাস ও ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃক সম্বোধন-ব্যবহৃত হ্রস্বান্ত সুভ্রু পদ বোপদেব এবং ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি নব্য বৈয়াকরণদিগের অনুমোদিত। যথা বোপদেবঃ,—"সুভ্রূ-দী-ব্যজন্বার্থানাং ধৌ হ্রস্বঃ।" যথা পুনঃ ক্রমদীশ্বরঃ,—"ব্যজন্বার্থাদেশ্চ। পদ্মনাভও ইহাঁদিগেরই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। যথা,—"ভ্রূশ্চান্যপদার্থে।" কিন্তু, বৈয়াকরণবর্য্য বিদ্যানিধি মহাশয় যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাণিনিসম্মত ও কলাপের অনুমোদিত। সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তিনি এই গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ সময়ে আমাদিগের এই কথাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কাব্যসাহিত্যের প্রয়োগ ও টীকাকারদিগের সিদ্ধান্ত সমালোচনার সহিত, মধ্য পথ প্রদর্শন করিলে, আমরা একান্ত বাধিত হইব।

৫। "সৃষ্টিবিজ্ঞান বা সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।" এই অনন্ত বৈভবময়,—অনন্ত বৈচিত্র্যময়,—চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-খচিত নীল-নভস্থল-চন্দ্রাতপিত অনন্তবিধ-জীব-মুখরিত বিশাল বিশ্ব কোথা হইতে "কিরূপে সমুদ্ভূত হইল?" পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু পুরাতন হিন্দু শাস্ত্রের আলোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যত্ন পাইয়াছেন। অধুনাতন বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকের এইরূপ মত যে, মনুষ্য আগে ইহলোকে, তার পর লোকান্তরে, বহুকাল এই বিশ্বরহস্য পাঠ করিলেও, এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ হইবে না। আমাদিগেরও এই মত। আমরা এই প্রশ্নকে চিরজীবনই Unthinkable অর্থাৎ অচিন্ত্যতত্ত্বজ্ঞানে চিত্তের এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া আসিতেছি। কিন্তু হিন্দু দার্শনিকেরা, ঋষিযুগের সময় হইতে ন্যায়দর্শনের সময় পর্য্যন্ত, এই প্রশ্ন লইয়া চিন্তার ব্যায়ামে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। যাঁহারা পূর্ণ বাবুর এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারাও নিশ্চয়ই সেই একপ্রকার আনন্দ অনুভব করিবেন। তাঁহারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে পঁহুছিবেন কি না, সে কথা বলিতে পারি না; কিন্তু, পূর্ণ বাবুর সাহায্যে, ঋষিপ্রবর্ত্তিত চিন্তাবর্ত্মে, ধীরে ধীরে পাদচারণা করিয়া, জ্ঞানালোকদর্শনের আনন্দে কিছুকাল অভিভূত রহিবেন। গ্রন্থখানি সকল সম্প্রদায়স্থ লোকেরই অবশ্যপাঠ্য, হিন্দুর কাছে ইহা বিশেষ আদর পাইবার যোগ্য। গ্রন্থকার পণ্ডিতাগ্রগণ্য। তিনি প্রসঙ্গতঃ যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থীর উপকারজনক। আমরা এই গ্রন্থব্যবহৃত একটি শব্দের প্রয়োগ-রীতি-

পরিগ্রহ করিতে পারি নাই। যথা,—"সমূহ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দৃষ্ট হইবে।" পুনশ্চ, স্থানান্তরে—"সমূহ সাহায্য লাভ করিয়াছি।" সাকল্যবাচক 'সমূহ' শব্দ ভাবে বিহিত ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত ও বিশেষ্য। যথা—ফল-সমূহ, গৃহ-সমূহ, গুণ-সমূহ ইত্যাদি। এই বিশেষ্য শব্দ, কি প্রকারে, 'বহু' অর্থে, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে সমর্থ হই নাই।

৬। "বিদ্যাসাগর,—অর্থাৎ সমালোচনাসংবলিত ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরের জীবনী। দ্বিতীয় সংস্করণ। 'শকুন্তলা রহস্য' 'ইংরেজের জয়' ও 'তিতুমীর' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ মাত্র।" বঙ্গভারতীর আশীর্ব্বাদে, বিগত কএক বৎসরের মধ্যে, বাঙ্গালায় কএকখানি অবশ্যপাঠ্য উপাদেয় গ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সৌম্যশান্ত গীতিকবি শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলালের "বিদ্যাসাগর"ও, অনেকপ্রকার উৎকর্ষসম্পদে, সেই শ্রেণীর মধ্যে, উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। আমাদিগের ভরসা আছে, সাহিত্যসুখ-পিপাসু শিক্ষিত-সমাজের অনুরাগে, প্রত্যেক বৎসরই ইহার এক অভিনব সংস্করণ, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন-সহকারে, প্রকাশিত হইয়া, পাঠকবর্গের চিত্ত প্রীণন করিবে। এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঁচ শত সাত আশি পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। বিহারী বাবু, কি প্রকারে, এত অল্প মূল্যে, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিদিগের মধ্যে এরূপ দুর্লভ বস্তু বিলাইতে পারিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

সর্ব্বজন-পূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কবি ও সামাজিকেরা 'দয়ার সাগর' নামে পূজা করিয়াছেন। মহাকবি মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম এই সুসঙ্গত ও সুখ-শ্রুত উপাধি প্রয়োগ করেন। আমরা সেই দীনবৎসল ও দয়ার সাগর, ভারতবিখ্যাত বিদ্যাসাগরের চারিত্রবৃত্ত সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কিছুই বলিব না। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। যদি পারি, তাহা হইলে কোন দিন তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগের হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিব। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কোন কথা বলিব না বটে; কিন্তু তদীয় চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের সাহিত্যিক চিত্রনৈপুণ্যসম্পর্কে দুই একটি কথা এ স্থলে অতি সংক্ষেপে না বলিয়া পারিতেছি না। বিহারী বাবু এই এক বিদ্যাসাগর-চিত্র উপলক্ষে আমাদিগকে বঙ্গীয় সমাজের কত বিখ্যাতনামা গুণ-সাগর পুরুষের আকৃতি ও প্রকৃতির চিত্রপট দেখাইয়াছেন,—বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সংস্কৃতশিক্ষার সহজপদ্ধতি, এবং সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্ত্তের কত কথাই প্রসঙ্গতঃ শুনাইয়াছেন, তাহার অবধি নাই।

বিহারী বাবুর বাঙ্গালা বড় সরল, বড় সুন্দর, বড়ই মধুর। বাঙ্গালা ভাষা ইদানীং কএকটি বিভিন্ন ভঙ্গীবিলক্ষিত পদ্ধতিতে

পরিচিত। যথা বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা,—বঙ্কিমী বাঙ্গালা, এবং ঠাকুর বাড়ীর বাঙ্গালা। রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, প্রসিদ্ধনামা বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্রও, একটি সরল-তরল, তরঙ্গ-চঞ্চল, তান-মনোহর নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক বলিয়া, প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। এই পদ্ধতির প্রচলিত নাম বঙ্গবাসীর বাঙ্গালা। বঙ্গবাসীর বাঙ্গালায় ভাষাগত সৌন্দর্য্যের যে সকল উপকরণ আছে, বিহারী বাবুর লেখায় সর্ব্বত্রই তাহা সরস-মাধুর্য্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার বিদ্যাসাগর-চরিত, ভাষার আকর্ষণে ও বিষয়বিন্যাসের নৈপুণ্যে, বস্তুতঃই একখানি উচ্চশ্রেণির উপন্যাসবৎ মধুর হইয়াছে। তিনি এই পুস্তকের ২২৮ ২২৯ পৃষ্ঠায়, "কর্ম্মবীরের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চরিত্রে স্বাভাবিক রহস্যরঙ্গের ভাব" বর্ণনায়, "তরুণ অরুণ-কিরণোদ্ভাসিত প্রভাতের কাঞ্চন-জঙ্ঘা" মূর্ত্তি মুহূর্ত্তমাত্র প্রদর্শন করিয়া, যেরূপ কৌশলে,—যেরূপ অল্প কথায়, রণবীর গর্ডনের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুলনা করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা যার-পর-নাই প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার লেখায় 'রহস্য' শব্দটি আমাদিগের কানে একটু বাধো বাধো ঠেকিয়াছে; তা ছাড়া, আর সকলই হৃদয়কে সঙ্গীতলহরীর ন্যায় আকর্ষণ করিয়াছে। রহস্য শব্দের প্রকৃত অর্থ নিগূঢ়-তত্ত্ব,—গোপ্য বস্তু। যথা উত্তরচরিতে,—

"রহস্যং সাধুনামনুপধি বিশুদ্ধং বিজয়তে।"

কিন্তু 'রহস্য' শব্দের এইরূপ অভিনব প্রয়োগের জন্য বিহারী বাবু একা দায়ী নহেন। বঙ্গের প্রায় সমস্ত বড় লেখকই, এ বিষয়ে, বহু দিন হইতে, তাঁহার সঙ্গী কিংবা পথ-প্রদর্শক। বিহারী বাবুর এই পুস্তকে স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে। যথা,—১৩৭ পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত স্থলে মুগ্ধবোধের সূত্র-সদৃশ 'ক্তিরিত'। আমরা ভরসা করি গ্রন্থকার পুস্তকের ভাবি সংস্করণে প্রেফসিটগুলি আপনিই আগাগোড়া পাঠ করিবেন।

৭। "স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত। কলিকাতা—শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।" ইহা একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ; বোধ হয় ইহাই, আত্মচরিত-নির্ম্মাণে, বাঙ্গালায়,—সময়ের গণনায়, প্রথম-স্থানীয়। ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই জ্ঞাতব্য বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। যাঁহারা বঙ্গদেশের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতে ভালবাসেন, এই পুস্তকে, তাঁহাদিগের উপযোগি কথা অনেক আছে। স্বর্গগত দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র সকল বিষয়েই সৌভাগ্যশালী ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ইহাও তাঁহার বিশেষ সৌভাগ্য যে, তদীয় পুত্রেরাও, সকলেই, উচ্চশিক্ষা ও উচ্চপদ, এবং সাহিত্যিক যশোমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, পিতৃসম্মানের উপযুক্ত অধিকারী হইয়াছেন; আর পিতার নাম-কীর্ত্তি রক্ষার নিমিত্ত, বিবিধ সদনুষ্ঠানের সঙ্গে, এই বৃহৎ পুস্তক খানি প্রচার করিয়া, তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রেও জীবিত রাখিতেছেন। এই পুস্তকে সমাজ, সাহিত্য প্রসঙ্গ ও অধ্যাত্মতত্ত্বের যে সকল কথা

আছে, তাহা পড়িয়া, পাঠক কোন স্থলে প্রীত, কোন স্থলে প্রমোদিত, এবং কোথাও বা একটুকু বিস্মিত হইবেন; এবং কার্ত্তিকেয় বাবু কিরূপ কর্ম্মকুশল সুকৃতিপুরুষ ছিলেন, তাহা কতকটা বুঝিতে পাইবেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সুখ-সম্মান-সংবর্দ্ধিত আত্মা, পুত্রগণের অকৃত্রিম ভক্তি এবং দেশস্থ হৃদয়িক ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে শীতল হইয়া, উচ্চস্বর্গে শান্তিলাভ করুক; এবং তাঁহার সাধুজীবনের স্মরণীয় দৃষ্টান্ত কর্ম্মানুরক্ত বিষয়িদিগের হৃদয়ে স্ফুট অক্ষরে লিখিত রহুক।

৮। "গোপবালা। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্ম বাহাদুর কৃত চিত্রাবলী সম্বলিত।—শ্রীবিমলচন্দ্র দেববর্ম্ম প্রণীত।" ইহা একখানি অপূর্ব্ব কাব্যপুস্তক। ইহার চিত্রগুলি দর্শনীয়; আর কবিতানিচয়ও, প্রভাত-শিশির-সিক্ত, মৃদুমুকুলিত, ভ্রমর-মুখর যূথিকার মত, একান্ত কমনীয়। ইহাতে ব্রজ-বিলাস-কাব্যের প্রাণরূপিণী প্রেমময়ী রাধাবিনোদিনী, আর তদীয় প্রেম যজ্ঞের নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী চন্দ্রাবলীর নানারূপ কথা আছে। উভয় নায়িকাই, প্রচলিত পদ্ধতির বহু ঊর্দ্ধস্থিত উচ্চতর ভাব ও বর্ণের উপাদানে চিত্রিত হইয়াছেন; এবং উভয় চিত্রেই, এই হেতু, নয়নানন্দ নূতনত্ব ও নির্ম্মল কাব্য ফলিয়াছে। কবি যুবজন না প্রবয়স্ক, তাহা জানি না। কিন্তু, তিনি তাঁহার এই প্রথম উদ্যমেই, 'আশাতীত সার্থকতায়, কবিসমাজে প্রশংসার আসন, এবং বৈষ্ণব কবিসমাজে বরেণ্য পদ পাইতে অধিকারী হইয়াছেন।

আগরতলার রাজবংশ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। এ বংশের অধুনাতন কুমার ও কুমারীরা, সাহিত্যসেবায়ও, সকলেই হৃদয়ের সহিত অগ্রসর হইয়া, আগরতলার পুরাতন সম্মানকে নূতন উজ্জ্বলতা দান করিয়াছেন। দুই বৎসর হইল, আমরা তত্রত্য একটি রাজকুমারীর একখানি কবিতাপুস্তক পাঠ করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছি। তার পর, সহৃদয়-সাহিত্যসেবী, শান্ত-গভীর-প্রকৃতি শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত বঙ্গভাষা নামক উপাদেয় মাসিক পত্রে, বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকর্ষসাধন বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ ও পণ্ডিত-জন-সুলভ নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া, হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। আজি এ গোপবালা গ্রন্থে, একই সঙ্গে, শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই প্রেমাশ্রসিক্ত বিচিত্র চিত্র দর্শনে প্রকৃতই আমরা মোহিত হইয়াছি। তুলির চিত্রে স্থানে স্থানে এক-আদটু খুঁত আছে; এবং শব্দচিত্রেও সেইরূপ, এখানে সেখানে, সামান্য এক-আদটু দোষ চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্তু উভয়বিধ আণুবীক্ষণিক দোষ সম্বন্ধেই কবিকালিদাসের সেই পুরাতন কথা আমাদিগের স্মৃতিতে আসিয়াছে,——

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ।"

দেশের সকল সম্পদই, কালে লোপ পায়। কিন্তু সাহিত্যসম্পদ, কালস্রোতের

করাল-তরঙ্গ-ঘাতেও অপ্রতিহত রহিয়া, দেশীয়দিগের পুরাতন স্মৃতিকে চিরকাল উজ্জ্বল রাখে। আগরতলার সাহিত্যসম্পদ ক্রমশঃ এইরূপ উৎকর্ষলাভ করিলে, উহার রাজসম্পদও সমধিক উজ্জ্বল হইবে।

৯। "চল্লিশ বৎসর—কাউণ্ট টলষ্টয় এবং নিকোলাস্ কষ্টোমারফ্ বিরচিত ক্ষুদ্র রুশ উপন্যাস। অনুবাদক শ্রীচণ্ডীচরণ সেন। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।" রুশিয়ার প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মবীর পুণ্যপুঞ্জময় টলষ্টয়ের প্রাণের কথা আজি পৃথিবীর সকল দেশেই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বাঙ্গালায় তাঁহার কোন গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে, এমন আমরা জানি না। বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ সাহিত্যিক,—বিশ্রুত-নামা লেখক বাবু চণ্ডীচরণ সেন, টলষ্টয়ের এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া, দেশীয়দিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ সরল ও সুন্দর; কিন্তু লেখনীর দ্রুতচারিতা হেতু, সকলস্থলে, ভাবার্থে কিংবা শব্দগ্রহনে, আশার অনুরূপ বিশুদ্ধ নহে। যথা,—God immanent, God transcendental—এই বাক্যের অনুবাদে চণ্ডী বাবু লিখিয়াছেন "ঈশ্বর দেদীপ্যমান এবং অজ্ঞেয়।" চণ্ডী বাবু সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি একটুকু নিবিষ্ট মনে প্রণিধান করিলেই, ইহা আপনা হইতে তাঁহার মনে পড়িত যে, immanent শব্দের প্রকৃত অর্থ অন্তর্ভূত অথবা অন্তরস্থ, আর transcendental শব্দের প্রকৃত অর্থ অতীন্দ্রিয়। ইংরেজী ভাষার বাঙ্গালা অনুবাদ বড়ই কঠিন। কিন্তু যেখানে প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ একটু ভাবিলেই সংকলিত হইতে পারে, সেখানে শব্দপ্রয়োগে মনে একটা উপেক্ষার ভাব পুষিয়া ফল কি? চণ্ডী বাবুর লেখায় এইরূপ উপেক্ষার ভাব আরও দুই এক স্থলে আমাদিগের চক্ষে পড়িয়াছে। যথা—"ঈশ্বর না থাকিলে কে এই পৃথিবী সৃজন করিল?" আমাদিগের বোধ হয়, লোকে, এইরূপ স্থলে, প্রচলিত বাঙ্গালায় "কে সৃষ্টি করিল?" এইরূপ বলিয়া থাকে। আর এক স্থলে দেখিলাম,—"ধনরাশী ইহার ঘরে বর্ষিত হইতেছে।" এ বাঙ্গালাও প্রচলিত বাঙ্গালার রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এই দ্রুতগামিতা ও ভাবাবেগজনিত অসাবধানতা ভিন্ন চণ্ডী বাবুর পুস্তকে আর সকলই স্পৃহণীয় গুণ, এবং পুস্তকখানি উপদেশপূর্ণ ও পাঠ-সুখাবহ।

১০। "শ্রীকৃষ্ণলীলা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। রচয়িত্রী শ্রীমতি রমণী দেবী। কলিকাতা-শ্যামবাজার ১১নং গোপাল বিশ্বাসের লেন হইতে শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।" গ্রন্থকর্ত্রী প্রগাঢ়ভক্তিমতী পবিত্রহৃদয়া পুরমহিলা। তিনি ভক্তির প্রণোদনায় এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভক্তের নিকট ইহার নিশ্চয়ই আদর হইবে; এবং বঙ্গীয় পুরমহিলাদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি অমিয়মধুর কৃষ্ণনামে অনুরাগিণী রহিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদিগেরও প্রীতি জন্মাইবে।

কৃষ্ণলীলা অনেক প্রকার। বেদব্যাসের

কৃষ্ণলীলা এক বস্তু, হরিবংশের কৃষ্ণলীলা আর এক বস্তু। সেই কৃষ্ণলীলাই বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে; এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কাব্যপুস্তকে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রীমতী রমণী দেবীর এই "শ্রীকৃষ্ণলীলা" বঙ্গীয় গোস্বামিমহাশয়দিগের গ্রন্থোক্ততত্ত্ব-সম্মত, অথচ কাশীরামদাসের মহাভারতে যাহা আছে, তাহাও ইহাতে সুচারুরূপে অভিব্যক্ত। পুস্তক উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা দুই শত বৎসরের পুরাতন পুস্তকের মত বিশ্বাস ও ভক্তির অনলঙ্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে; এবং ভাষা ইহার সর্ব্বত্রই কপোতাক্ষ নদীর আবেগশূন্য স্রোতের মত আপনার অনাবিল মৃদুগতিতে আপনি অনবরত বহিয়া গিয়াছে। ভাষাবিষয়ে কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও ঠাকুর বৃন্দাবনদাস গ্রন্থকর্ত্রীর আদর্শ ও গুরুস্থানীয়। তিনি গুরুসম্প্রদায়ের পদচিহ্ন অনুসরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার রচনায় 'নেপুর' ও 'নয়ান' প্রভৃতি দুই একটি শব্দ আমাদিগের নিকট পুরাতন বাঙ্গালার পদ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস-প্রমুখ পুরাতন কবিরা নয়নের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে নয়ান লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা নূপুরের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত নেউরের অনুকরণে, নেপুর শব্দ বহু স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন কি না, তাহা এইক্ষণ আমাদিগের মনে আসিতেছে না। আমরা পুনরপি বলিতেছি, গ্রন্থখানি সুখ-পাঠ্য; এবং গ্রন্থকর্ত্রীর সারল্য, সুশীলতা ও ভক্তি-শীতল-সৌকুমার্য্যের পরিচায়ক। তাঁহার এই পুস্তক, পুরাতন-প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা পুস্তকের সঙ্গে পরিগণিত হইবে, এবং ভক্ত বৈষ্ণবের পূজা পাইবে।

১১। "নয়নাম্বু। শ্রীতারাসুন্দর ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত।" পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, এ দেশের অতি বড় বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও বাঙ্গালায় একখানি পত্র লিখিতে হইলে প্রাণান্ত কষ্ট অনুভব করিতেন। আজি তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী নব্যপণ্ডিতেরা,—কালীকৃষ্ণ ও তারাসুন্দর প্রভৃতি নবযুব-বৈয়াকরণেরা, সেই বাঙ্গালায় সুললিত কবিতা রচনা করিয়া, প্রশংসা পাইতেছেন। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় নহে কি? আমরা শ্রীযুক্ত তারাসুন্দর ভট্টাচার্য্যের সংস্কৃতকবিতা পড়িয়া প্রীতি প্রকাশ করিয়াছি; তাঁহার বাঙ্গালা কবিতাও প্রীতিসুখাবহ হইয়াছে বলিয়া সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত আছি। কবি সম্ভবতঃ বাল্য ও যৌবনের মধ্যরেখায় অবস্থিত; তাঁহার প্রাণটুকু ভক্তি ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ। সে প্রাণ কবিতার অনেক স্থলে উছলিয়া পড়িয়াছে; লেখার সর্ব্বত্রই হৃদয়িকতার পরিচয় আছে।

অধ্যয়ন-সুখ।

"The tidal wave of deeper souls
Into our being rolls,
And lifts us unaware,
Out of all meaner cares."

যাঁহাকে, ইহজীবনে, কস্মিন্ কালেও কেহ চক্ষে দেখে নাই, অথবা সম্মুখবর্ত্তী অনন্ত কালের সুদূর-ব্যবধানেও দেখিবে বলিয়া সাধারণতঃ কেহ আশা করে না, সেই মনোবুদ্ধির অগম্য, অচিন্ত্যস্বরূপ ঈশ্বরের চিন্তায় বিশেষ কিছু সুখ আছে কি? আছে কি না আছে, তাহা আমার মত লোকে জানে না, এবং জানে না বলিয়াই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন কালের মহাতপা ঋষিরা, ঐ মনঃকল্পিত সুখের জন্য, অনাহারে ও অনিদ্রায়, ছায়াশীতল বৃক্ষের তলে, অথবা ছায়াশূন্য গিরিগহ্বরে, অহোরাত্র উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে, হৃদয়ের কেমন এক উচ্ছ্বাসে, অহ-হ-শব্দসহকারে বলিয়া উঠিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ"—তিনিই রসস্বরূপ,—"আনন্দরূপমমৃতম্"—তিনিই আনন্দ,—তিনিই অমৃত।

আধুনিক কালের বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বলিত, বিলাসোন্মত্ত, সুসভ্য জগতে ফ্রান্সিস্ ডাসিসি * এবং যোহানা গির্ত্তন প্রভৃতি শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তিরাও, উল্লিখিত সুখের অন্বেষণে, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কখনও

* ইটালীর (St. Francis) সেণ্ট ফ্রান্সিস্ নামক বিখ্যাত তাপস ও ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক। আসিসি নামক প্রদেশে, আম্ব্রিয়া নামক জনপদে, ১১৮২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম, এবং ১২২৬ খৃষ্টাব্দে, ৪৪ বৎসর বয়সে, ইঁহার মৃত্যু হয়। জন্মস্থান সম্পর্কে ইঁহার প্রচলিত নাম ফ্রান্সিস্ ডাসিসি। ইঁহার নিত্যনিয়মিত তপশ্চর্য্যার বিবরণ, বিখ্যাত ঐতিহাসিক (Ernest Renan) আরনেষ্ট রেনাঁ কৃত Studies in Religious History নামক গ্রন্থে, বিবৃত আছে। রেনাঁর মতে, যিশুখৃষ্টের পর, এমন ঈশ্বরোন্মত্ত পুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি একদায়, ঈশ্বর ধ্যানে, সপ্তাহকাল, অস্নাত, অভুক্ত ও অনিদ্র ছিলেন। তাহাতে ইঁহার শরীরে অণুমাত্রও বিকৃতি ঘটে নাই। রেনাঁ লিখিয়াছেন,—"His life was a fever of delicious madness, a perpetual intoxication of Divine love." অর্থাৎ ইঁহার জীবন এক আনন্দময় উন্মত্ততার—জ্বরবিকারস্বরূপ,—ঈশ্বর-প্রেমের কেমন এক নিরবচ্ছিন্ন মদমত্ততাস্বরূপ ছিল।

...ত্রেতবৎ উৎপীড়িত হইয়াছেন, কখনও বা উপাস্য বস্তুরূপে অলোকিক সম্মান পাইয়াছেন। * সুতরাং, ঈশ্বর-চিন্তায় কোন কিছু সুখ আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দানে ঈদৃশ ব্যক্তিরাই সমর্থ। আমি এ সুখকে মনঃকল্পিত বলিয়াছি। কারণ আমার মত প্রকৃতি-মূঢ়ের জন্য ইহা সর্ব্বাংশেই আকাশ-কুসুম-সদৃশ। আমার এই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, বিষয়-চিন্তামগ্ন, নিরাশহৃদয়ে, ইহা বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার ন্যায় কখনও এক আধটু স্ফুরিত হইলেও, সে স্ফুরণ প্রায়শঃ কার্য্যে পরিণত হয় না, এবং তাই স্থায়ি আনন্দ জন্মাইতে পারে না।

এইরূপ আবার, পর-সেবা অথবা পরার্থ জীবন-উৎসর্গের সুখ। সভ্যতা ও ...রিকতার অভিধাননিচয়, অশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া,—কথাটার সকল দিক্ আলোচনা করিয়া, পর বলিয়া যাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছে;—যাহারা যোগ-বিজ্ঞানের চক্ষে একই আত্মার অংশস্বরূপ হইয়াও, জড়বিজ্ঞানের জড়দৃষ্টিতে অতি দূরস্থিত পর;—মনুষ্য যাহাদিগের নিকট কখনও এক ফোঁটা জল কিংবা সামান্য একটুক্ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করিতে পারে না; সেই উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অতিমাত্র অসম্পর্কিত পরের সেবায়,—পরের সুখ-শান্তিবিধান অথবা মঙ্গলানুষ্ঠান-কামনায়, আপনার কষ্টার্জ্জিত বিত্তসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া,—কোন দিন না খাইয়া,—কোন দিন মুহূর্ত্তের তরেও মাথাটি রাখিয়া নিদ্রা লাভের জন্য একটুকু স্থান না পাইয়া,—দেশে দেশে,—দুঃখতিমিরাবৃত কারাবাসে, অথবা সমরক্ষেত্রের ক্ষতবিক্ষত ...বাসে,—কিংবা ...শিকাসম্পদশূন্য কাঙ্গালের কুটীরাবাসে, একাকী উপবিষ্ট হইয়া, অশ্রুমোচন অথবা অমূল্য সময় যাপনে, কোন সুখ আছে কি?

যদি এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে চাও, তাহা হইলে হায়োয়ার্ড,* হেয়ার, কারপেন্টার, নাইটিংগেল, উইলবার্ফোর্স ও আমা-

* Johanna Guyon. যোহানা গিয়ঁন্ স্বনাম ধন্যা ফরাশি রমণী। ফ্রান্সের অন্তর্গত মণ্টারজিস্ নামক নগরে, ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে, ইঁহার জন্ম; এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে, ৬০ বৎসর বয়সে, ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি, পূর্ব্বোক্ত মহাত্মার মত, জন্মসিদ্ধ যোগিনী না হইলেও, তপোবলে যোগানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-সাধনা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে দুই এক খানি ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। টেলিমেকস্ নামক গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধকীর্ত্তি ফেনিলন ইঁহারই প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

* যন হায়োয়ার্ড ইংলণ্ডের লোক। ইংরেজেরা সেণ্টপলস্ কেথিড্রেল নামক বিখ্যাত ভজনাগৃহে তাঁহার প্রীতিসমুজ্জল প্রস্তর-প্রতিকৃতি দেববিগ্রহবৎ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। এখনও অনেক পরিব্রাজক সেই প্রতিকৃতি দর্শনের জন্য উক্ত কেথিড্রেলে গমন করিয়া থাকেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।——মেঃ হেয়ার, ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ

দিগের ঈশ্বরচন্দ্রের মত অসামান্য ব্যক্তিদিগের পদপ্রান্তে যাইয়া দণ্ডায়মান হও। যেখানে মনুষ্য ধর্ম্ম বেচিয়া কর্ম্ম করিতেছে; এবং এক গুণ উপকারের প্রতিশোধে, উপকৃত ব্যক্তির বুকের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত, অভিনব সাইলকের উৎসাহে, দশ গুণ মাত্রায় শুষিয়া লইতেছে, সেখানে ইহার উত্তর পাইবে না। যদি পথ ভুলিয়া, সেখানে যাইয়া, কখনও এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন কর, তাহা হইলে হো-হো হাস্যে উপহসিত হইবে, এবং এই সংসারকে একটা হৃদয়শূন্য শ্মশান জ্ঞানে, আপনি আপনার প্রাণে, অবসন্ন হইয়া পড়িবে।

ঠিক্ এমনই আবার, অধ্যয়ন-সুখ। গৃহে ভাল একটি বস্ত্র সংগ্রহের সংস্থান নাই, —গৃহিণীর সুকুমার তনুখানি একখানি স্বর্ণাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিবার কামনা নাই; এবং সংসারের আমোদ-প্রমোদ ও অশেষবিধ উৎসব-হুলহুলায় কর্ণপাত নাই; আছে শুধুই দেবী বাগ্দেবীর প্রসাদস্বরূপ পুঞ্জীকৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে আপনার পিপাসাকুল প্রাণটা ডুবাইয়া রাখিবার অতৃপ্ত বাসনা। এইরূপ রসোল্লাসবিরহিত, নীরব-সাধনারত, নিস্পৃহ শুষ্কজীবনেও কোনরূপ সুখের সম্পর্ক আছে কি?

এই প্রশ্নের উত্তরও সকল স্থানে পাইবে না। পৃথিবীর যে সকল স্থান সাধারণতঃ ভোগ-লালসাসংকুল সুখ-সম্পদের রম্য নিকেতন বলিয়া পরিচিত, সেখানে এই প্রশ্ন লইয়া যাওয়া বৃথা। যেখানে মদিরার টল-টল পূর্ণ-পিয়ালা, মদিরিক-নয়নার মুগ্ধ দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া, গৃহস্বামীর মনোমোহন করিতেছে, এবং কর-বলয়ের মৃদু শিঞ্জন ও মধুরমুখর চরণ-নূপুরের রুণ্‌ঝুণ্ নিক্বণ পারি-

করিয়া থাকিলেও, জীবনের গতিপ্রবাহে বাঙ্গালি হইয়াছিলেন; এবং বঙ্গীয় বালকদিগের মঙ্গলার্থ আপনার দুর্লভ জীবন বিসর্জ্জন করিয়া, অসংখ্য বঙ্গবাসীর অশ্রু তর্পণে, কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র একটি সুদীর্ঘ গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতার লোকেরা কিছুকাল সে গীতটি চিত্তের আবেগে নিরন্তর গাইতেন। গীতের প্রথম লহরী এই,——

"মরণের বুঝি নাইক মরণ?
কৃপানিধি বিধি কেন
ডেভিড হেয়ারকে করিলে হরণ?"

——পরদুঃখকাতরা কার্‌পেনটার কিছুকালের তরে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ——মিস্ নাইটিংগেল সম্ভবতঃ এখনও জীবিত আছেন। ইনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় শত শত ক্ষতবিক্ষত সৈনিককে দাসীর মত পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।——উইলিয়ম উইলবারফোর্স্, যন হাওয়ার্ডের মত, ইংলণ্ডের আর এক কীর্ত্তিস্তম্ভ। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে হাল্ নগরে ইহাঁর জন্ম, এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইনি, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের সময় হইতে, মানবজাতির দুরপনেয় কলঙ্ক —দাস-বিক্রয়-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধবাদিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, ঐ এক মহাব্রতে আপনার দেহপ্রাণ ঢালি দিয়াছিলেন।

পার্শিকাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত রাখিয়াছে, সেখানেও এ প্রশ্ন লইয়া যাওয়া বৃথা। অপিতু, যাহারা পদ, প্রভুত্ব ও পরের উপর আধিপত্য, জয়-জয়-যশোধ্বনির ডঙ্কা, এবং প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের পতাকা লইয়াই একান্ত ব্যাপৃত, তাহাদিগের নিকটও এই প্রশ্ন সম্পর্কে কোনরূপ প্রত্যুত্তরের আশা করা যায় না।

কিন্তু, যে সকল মহানুভব পুরুষেরা, জাতিবিশেষের জীবন-স্রোতে তাড়িত-সঞ্চালন অথবা সাধারণতঃ মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈভব ও সারস্বত-সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য, নিজ নিজ দেহ প্রাণ সমর্পণ করিয়া, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যোগাসীনবৎ, ঐ এক ব্রতের অনুশীলনে একাগ্র চিত্তে অবস্থিত রহিয়াছেন,—যাঁহারা কোন দেশে শঙ্কর, গঙ্গেশ, বামন, বোপদেব, রামানুজ ও রঘুনাথ,—কোন দেশে হুম্বোল্ড ও জন্‌সন্ অথবা মিল ও মেকলে প্রভৃতি নামে সুকীর্ত্তিত, তাঁহারা আপনাদিগের জীবনব্যাপি সাধনার জ্বলন্ত উদাহরণে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ের উপর ক্ষণকালও নির্ভর করিতে পারিলে, এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, অধ্যয়ন-সুখ প্রকৃতই একটি উচ্চশ্রেণীর সুখ। উহা, ঈশ্বর-চিন্তা অথবা পরার্থ প্রাণার্পণের সমকক্ষ না হইলেও, দিব্যোজ্জ্বল বস্তু,—দেবসেব্য সামগ্রী।

বস্তুতঃ, দুঃখের যেমন অসংখ্য প্রকার আছে, সুখেরও সেইরূপ সংখ্যাতীত প্রকার আছে; এবং অধ্যয়ন-সুখ তাহারই অন্তর্গত একটি নির্ম্মল, নিত্যভোগ্য, মনোমদ, মহৎ সুখ;—একপ্রকার কঠোর তপশ্চর্য্যা, অথচ আনন্দময়। যাঁহারা অধ্যয়নব্রতে ঋষি-তাপস-প্রতিম, তাঁহাদিগের কথা কহিব না,—তাঁহাদিগকে ভালরূপে চিনিতে পারি না,—বুঝিতে পারি না। তাঁহারা কি লইয়া, অথবা কি লিপ্সায়, লোকালয়ে অবস্থিত রহেন, তাহা, তাঁহাদিগের সমানধর্ম্মা মনুষ্য ভিন্ন অন্যের বোধগম্য হয় না। নিউটন আর স্পেন্‌সার উভয়েই অধ্যয়নের অনুরোধে চিরকাল অকৃতদার ছিলেন।

ধূস্তুর ধবল-মূর্ত্তি শোভে তপোবনে
তৃষাতুরা মধুকরী কাছে নাহি যায়। *

ধূস্তুরচিত্ত নিউটন প্রায় নবতি বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন সত্তর পার হইয়াছে, তখনও তিনি যুবজনের ন্যায় সুস্থ, সবল, সুশ্রীক ও শ্রমসমর্থ। কিন্তু কিবা যৌবনে, কিবা বার্দ্ধক্যে, কোন দিনও কোন সুন্দরী যুবতী, মধুকরীর মত, তাঁহার গায়ে যাইয়া উড়িয়া পড়িতে, কিংবা তাঁহার-দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও, সাহস পায় নাই। তাঁহার আপনার প্রাণটা কোথায় থাকিত, তাহাই তিনি জানিবার অবকাশ পাইতেন না। এমন অবস্থায় পরের প্রাণ আবার গলায় গাঁথিবেন কোন্ বুদ্ধিতে?

হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার যখন আধোবৃদ্ধ, তখন এক সহৃদয়া সগুণা মধুকরী, কিছুকাল, তাঁ-

* মধুসূদনের পদ-পরিবর্ত্তন।

হার কর্ণে ভালবাসার একটুকু মধু ঢালিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ; এবং তাঁহার পদ-প্রান্তে উপবিষ্ট রহিয়া, তদীয় জ্ঞানাত্মক মধুচক্রের পরিপুষ্টি কার্য্যে আপনার প্রাণ ও মন উৎসর্গের প্রার্থনা জানাইয়াছিল। নীরস-নিষ্ঠুর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে এইমাত্র জানাইলেন যে, তাঁহার এ সুখ-সৌভাগ্যের অবকাশ নাই।

নিউটন আহারেরও অবকাশ পাইতেন না। আহারের টেবিলে, অনেক সময়ে, তিনি চক্ষে চসমা দিয়া অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন ; তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। স্পেন্সারও, এইরূপ, জীবনের অনেক কার্য্য করিবার জন্যই, অবকাশ পাইতেন না ; তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা সে সকল কার্য্য ভক্তির সহিত সম্পাদন করিতেন।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, যাঁহারা তপস্বীর হৃদয় লইয়া অধ্যয়নে মগ্ন, তাঁহাদিগের কথা সাধারণের অনধিগম্য। কিন্তু যাঁহারা অধ্যয়নব্রতে একান্ত নিয়শ্রেণিস্থ,—যাঁহাদিগের পরিবার, প্রণয়িজন ও পারিবারিক জীবন আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আহিতাগ্নিক গৃহস্থের ন্যায় অধ্যয়নরূপ নিত্যব্রত আছে, তাহারাও বলিয়া থাকেন যে, এ সুখে যখন আত্মবিস্মৃত হই ;—যখন বর্ত্তমান কালের সকল কথা,—সাধু-সুজনের অহেতুক দুর্গতি ও ক্রূরাচার-দুর্জ্জনের দর্পোন্নতি,—ধর্ম্মের ক্ষণিক পরাজয় ও অধর্ম্মের ক্ষণিক জয়,—বিচারের সাময়িক বিড়ম্বনা, এবং সমাজ ও ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়ের লাঞ্ছনা প্রভৃতি সমস্তই একবারে ভুলিয়া, অতীতকালের ঐতিহাসিক স্রোতে, অথবা অমল-ভাব-প্রবাহে, ভাসিয়া যাই, তখন সংসারের কোন দুঃখকেই আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না,—সুখেও তখন হৃদয় আর সহজে ঢলিয়া পড়ে না।

অধ্যয়নব্রতের উল্লিখিতরূপ সুখ-সমৃদ্ধি কল্পনার দ্বারাও কতকটা অনুভূত হইতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোন সুখ-সম্পদ্ না ই বা থাকুক,—অন্য কোনরূপ বৈভব, বিষণ্ণহৃদয়ে সান্ত্বনা দানের জন্য, না ই বা যত্ন করুক, কিন্তু বাল্মীকিসদৃশ মহাপ্রতিভাশালী মহাবৈভবসম্পন্ন জগদাদর্শ কবি, যাঁহার কাছে বসিয়া, বীণার বিলম্বিত-ঝঙ্কারে, চারিত্রসৌন্দর্য্যের চারুগীতি গান করেন,—মনীষিজন-পূজ্য বেদব্যাস, যাঁহাকে বেদ-বেদান্তের সারার্থের সহিত, সাগরাম্বরা ভারতভূমির সর্ব্ববিধ সমাজরহস্য, পুরাবৃত্তের কথাচ্ছলে বুঝাইয়া, প্রফুল্ল রাখিতে যত্নপর হন ; পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন ও জৈন-সন্ন্যাসী সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি শাব্দিকেরা, যাঁহার কাছে গুরুর ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়া, শব্দবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন ; এবং অমর হোমার যাঁহার পুরোভাগে প্রেমার্দ্র প্রিয়জনের ন্যায় সতত অবস্থিত থাকিয়া, পুরাতন পাশ্চাত্য বীরদিগের প্রেম ও পুরুষকার, প্রতিভা ও কর্ম্মবৃত্তি, এবং রাজনীতি ও রণ-পদ্ধতি সম্পর্কে সহস্র কথা শুনাইতে ভালবাসেন, তাদৃশ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি একটুকুও সুখ-সম্পন্ন নহেন কি? বৈজ্ঞানিকেরা

যাঁহার অধ্যাপক, কান্ট, কোম্‌টে, এবং হ্যামিল্টন ও কপিল প্রভৃতি দার্শনিকেরা যাঁহার দৃষ্টিপথের সহায়;—পৃথিবীর ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ঔপন্যাসিক ও চরিতাখ্যায়কেরা যাহার গৃহে, যামিনীর নিঃস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যেও, সুমন্ত্র ও শুকদেব প্রভৃতির ন্যায় কথকতার কার্য্য করেন;—জ্যোতির্ব্বিদেরা যাঁহার জগচ্চিত্রপ্রদর্শক নিত্যসহচর, আর এস্কাইলাস ও ইউরিপাইডিস্, শেক্ষপীর ও কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, দান্তে, মিলটন, কাউপার ও টেনিসন প্রভৃতি কবিসম্প্রদায় যাঁহার প্রাণের সাথী ও প্রিয়সুহৃৎ, তিনি এই প্রলাপ ও বিলাপপূর্ণ মনুষ্যসমাজে অত্যল্পমাত্রায়ও সুখসমৃদ্ধিমান্ নহেন কি? তাঁহার দ্বারে হাতী ঘোড়া বান্ধা না থাকিতে পারে,—কতকগুলি কপট স্তাবক অথবা অকপট কুক্কুর, তাঁহার প্রত্যেক পদক্রমে স্তুতি কিংবা কৃতির বিকট শব্দ করিয়া প্রতিবেশীর বিরক্তি জন্মাইতে না পারে; এবং তাঁহার নয়নের প্রত্যেক ইঙ্গিত, মুখচ্ছবির প্রত্যেক ভাব, আর অধর-নিঃসৃত অর্থভাববর্জ্জিত প্রত্যেক শব্দ পাঠ করিবার জন্য, শত শত চক্ষু ও শত শত চিত্ত সতত লালায়িত না রহিতে পারে। কিন্তু তাঁহার গৃহের অভ্যন্তরে দেশ-দেশান্তরের মানসরত্নরাশি, সেই এক অপূর্ব্ব শোভায় বিলসিত রহিয়া, তাঁহাকে যে আনন্দ দান করে, তাঁহার প্রাণটা তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও শীতল রহে না কি?

সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা এবং হীরা, মতি প্রভৃতি বস্তুর অবশ্যই মূল্য আছে। মনুষ্য যখন এ সকল বস্তু অঙ্গে ধারণ করে, তখন সে নিশ্চয়ই শিশুসমুচিত সুখোল্লাসে কিছুক্ষণ অধীর রহে; এবং কখনও বা দর্পণে আপনার সেই সুবর্ণমণিমণ্ডিত সুসজ্জিত মূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইয়া, আপনাকে সাধারণ মনুষ্যজাতির ঊর্দ্ধস্থিত আর এক প্রকার জীব মনে করিতে আরম্ভ করে। মনস্বিনীগণের অগ্রগণ্যা পুণ্যবতী ভিক্টোরিয়া, রূপে গুণে, এবং আরও সহস্র কারণে, রমণীমণ্ডলীর শিরোমণি হইয়াও, আপনার মাথায় কোহিনুর মণি ধারণের জন্য আকুল হইয়াছিলেন। ফরাশি রাজমহিষী, রূপসী এন্টোনেটা, * আপনার কণ্ঠে একছড়া মণিমালা ধারণ উপলক্ষে, যে অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটাইয়াছিলেন, তাহাতে দেশের অনেক বড় লোক অকস্মাৎ ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিল,—অনেক উচ্ছ্রিতশীর্ষ উচ্চপদবীরূঢ় প্রসিদ্ধ পুরুষ, রাজবিচারে অপরাধী হইয়া, বধ্যভূমিতে নিহত হইয়াছিল; এবং সে মণিমালার কাহিনী, কাব্যে, উপন্যাসে, জাতীয় ইতিহাসে ও রাজপথে গীয়মানা রস-মধুরা গাথা ও কবিতার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, ঘরে ঘরে আলোচিত হইয়া, তদা-

* পাঠক, এই প্রসঙ্গে রাজ্ঞী এন্টোনেটার শত্রুমিত্রবিরচিত উভয়বিধ জীবনচরিত ও, ফরাশি দেশের বিবিধ ইতিহাস এবং সঁমুয়্য-ডুমার "Queen's Necklace" অর্থাৎ রাজমহিষীর কণ্ঠহার নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়িলে অনেক কথা জানিতে পাইবেন।

নীন্তন ফরাশিদিগকে কিছুকাল উন্মাদিতবৎ রাখিয়াছিল।

তাই বলিতেছি যে, সোনা রূপা ও মণি মুক্তার মূল্য আছে। কিন্তু চৈতন্যশূন্য জড় বস্তুর তুলনায় চৈতন্যময় বস্তুর যেরূপ অধিকতর মূল্য, সোনা রূপার তুলনায় মানবজাতির অগাধ-গম্ভীর মনঃসাগর-সমুত্থিত চিন্তামণি ও ভাবরত্নের সেইরূপ উচ্চতর মূল্য। এই পৃথিবীতে দুইটা সাগর আছে। একটা সাগর জলময় অথবা জড় বস্তু, উহা এই পৃথিবীকে বেষ্টিয়া আছে। উহার কোন দেশে নাম অতলান্ত, কোন দেশে নাম প্রশান্ত; এবং কোন দেশে নাম ভূমধ্য অথবা ভারত-সাগর। কিন্তু উহা, যে কারণেই কেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, পরিচিত না হউক, সাকল্যে ও সর্ব্বাবয়ব-সমষ্টিতে উহা একই বস্তু, এবং উহার উপাদান পদার্থ জল। উহা হাঙ্গর, মকর, শিশুমার ও কুম্ভীর প্রভৃতির ক্রীড়াস্থান হইলেও, অনেকে উহাকে আদর করিয়া রত্নাকর উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন।

আর একটা সাগর চিন্তাময় অথবা ভাবময়। উহা, পৃথ্বীবিহারী মানবজাতিরূপ বিরাট পুরুষের বক্ষঃস্থলে বিকশিত হইয়া, ঊর্দ্ধ গগনের অপর-পার-স্থিত সিরিয়স্ নক্ষত্র হইতেও শত সহস্র কোটি দূর পর্য্যন্ত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে; এবং এ জগতের যে সকল স্থান কল্পনারও অধিগম্য নহে, সে সকল স্থানেও নিরন্তর আপনার সূক্ষ্ম শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগদ্‌যন্ত্রের নিয়ত গতিতে পরিবর্ত্ত ঘটাইতেছে।* এই সাগরের প্রকৃত নাম মানস-সাগর। উহাতেও মকর, কুম্ভীর ও হাঙ্গর প্রভৃতির মত ভয়ঙ্কর পদার্থ না আছে, এমন নহে। অনেক অসাবধান যুবক ও যুবতী, অল্প বয়সেই, সেই সকল মকর-কুম্ভীরের গ্রাসে পড়িয়া, চিরকালের তরে অন্ধকারে ডুবিয়াছে। কিন্তু উহা যে সকল ভুবন-মোহন মণিরত্নের জন্য মানস-রত্নাকর নামে অভিহিত হইতে পারে, সে সকল 'নিত্যনির্ম্মল, নিত্যোজ্জ্বল, প্রাণ-শীতল স্পৃহণীয় বস্তু কণ্ঠে ধারণের জন্য দেব-প্রতিভাময় পুরুষদিগেরই চিরকাল কেমন এক ব্যাকুলতা দৃষ্ট হইয়াছে,—দেবতারও অনেক সময় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। অধ্যয়ন আর কি? এই মানস-সাগরে, একাগ্রচিত্তে, অজেয় অধ্যবসায়সহকারে, অহোরাত্র সন্তরণের নামই অধ্যয়ন। যদি ইহাতেও সুখ না থাকে, তাহা হইলে, উন্নতস্বভাব মনুষ্যের জন্য সুখ-সামগ্রী সৃষ্টি করা বুঝি বা বিধাতারও অসাধ্য।

এ সুখ, স্বাদুসুরভি সরবতের মত, শুধুই সুপেয় নহে,—সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। কেন না, উহা মরুভূমির মত অনুর্ব্বর মনোভূমিতেও জ্ঞানময় শস্যসম্পদের অপ্রতিম শোভা সম্পাদনে মনুষ্যের বিস্ময় জন্মায়;—হৃদয়কে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করিয়া, এক অপূর্ব্ব উদারতায় অলঙ্কৃত করে;—বুদ্ধিকে সুখ-স্বাস্থ্য-শক্তিবর্দ্ধক বিমল ভোজ্যদানে সংবর্দ্ধিত করিয়া বিশ্বের সকল তত্ত্ব গ্রহণে অধিকারি

* Read Psychic Essays entitled "Thought is a Thing."

করিয়া তুলে;—যাহার বিরূপ-বিশ্রী মুখচ্ছবি দর্শনে স্বজনেরও বিরক্তি জন্মে, তাহাকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া, জ্ঞান-জ্যোতির মহিমা দেখায়;—আর আত্মায় এক অচিন্তিত পরিবর্ত্ত ঘটাইয়া,—যেখানে ক্রোধ, ক্রুরতা ও আত্মম্ভরিতার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, গিরি-বিবরবাসি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রভল্লুকের ভীতিজনক গর্জ্জনের ন্যায়, সর্ব্বদা শ্রূয়মান হইত, সেখানে প্রীতি, স্নেহ ও সরলতার সৌম্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া,—অভিমানের কঠোর-তন্তুতেও, জ্ঞানাগ্নির রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, নম্রতার নয়ন-মনোহর দ্রব নির্ঝর-সদৃশ নূতন কান্তি ফলাইয়া, চণ্ডালকে ঋষিসেব্য ব্রহ্মতেজ, এবং পিশাচ তুল্য নীচাশয় পাপিষ্ঠকেও দেবদুর্ল্লভ মহত্ত্ব ও মাধুরী প্রদান করে। যদি বিবর্ত্ত-বাদে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে যাহার প্রসাদাৎ মনুষ্যপ্রকৃতির এইরূপ আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় বিবর্ত্ত কিংবা পরিবর্ত্ত ঘটে, তাহা নিতান্তই সামান্য পদার্থ কি? অধীতিগণের আদর্শস্থানীয় মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।

যদি সজ্জনের ক্ষণিক সঙ্গই ভবার্ণব-তরণে তরণীর মত উপকারজনক হয়, তাহা হইলে সেই সজ্জনের বিগলিত-হৃদয়-নিঃসৃত সুধাসার পদার্থকে যাহারা দিবারাত্র পান করেন,—যাহারা শঙ্কর-বৃত্তিতার অনুসরণে, আপনার সামান্য জ্ঞান-সৌভাগ্য প্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, অগাধ-জল-সঞ্চার-বাসনায় সেই উদ্বেল সুধারাশির মধ্যে, একবারে ডুবিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

আমি অধ্যয়ন-সুখকে, প্রবন্ধের আরম্ভে, পরমার্থসুখ ও পর-সেবা অপেক্ষা নিম্নশ্রেণির সুখ বলিয়াছি। কিন্তু, এ সংসারের অনেক মহামতি পুরুষের হৃদয়ে, পরমার্থসুখ ও পর-সেবা, অধ্যয়ন-সুখের সহিত একই স্রোতে মিলিয়া মিশিয়া, একীভূত হইয়াছে, এবং ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্ত অসংখ্য ও ধূমাবরণশূন্য অগ্নির ন্যায় জল-জ্জ্বল। এখানে সে অগণিত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মাত্র উল্লেখ করিব; এবং ইয়ুরোপ ও আমেরিকা অদ্যাপি যাহার প্রেম-সুখাবহ পবিত্র নামের উপর প্রীতি ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিতে ভালবাসে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পার্কারের অধ্যয়ন-সম্পর্কিত দুটি কথা কহিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমেরিকার থিয়োডোর পার্কার কিরূপ পরমার্থনিষ্ঠ ভক্তপুরুষ ছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। পার্কার যখন বিজনে, কিংবা বহু লোকের সম্মুখস্থ বক্তার আসনে, উপবিষ্ট হইয়া, ভগবানের নাম লইতেন, তখন তাঁহার বক্ষঃস্থল অবিরল অশ্রুধারায় আপ্লুত হইত; এবং যে সকল সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার প্রাণের কথা কানে শুনিত, তাহারাও সকলেই, সেই একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, নয়নজলে ভাসিত। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতেরা জগজ্জীবন-শক্তিকে কখনও মা বলিয়া ডাকিতে সাহস পান নাই। ভারতীয় ঋষিরা

যাঁহাকে মা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁহারা কখনও তাঁহাকে মা বলিয়া অরাধনা করিতে আনন্দ অনুভব করেন নাই। যেন মাতৃ শব্দের উচ্চারণে, তাঁহাদিগের মনে, একটু অবজ্ঞার ভাব আসিত,—মন আপনা হইতে সংকুচিত হইত। তাঁহারা এই হেতু, উপাসনার সময়ে, 'মা' এই মধুর শব্দ কখনও মুখে আনেন নাই। পার্কার সেই অচিন্তনীয় শক্তিকে, অশিক্ষিত হিন্দুর মত, যুক্ত-করে ও গদ্গদ স্বরে, —দিনে নিশীথে,—শত প্রসঙ্গে, মা বলিয়া ডাকিতেন; এবং পাশ্চাত্য দর্শনের পাষাণ-কঠিন বক্ষ বিদারণ করিয়া, মাতৃনাম-সম্পৃক্ত মহাভক্তির উৎস খুলিয়া দিতেন।

পার্কার পরসেবায়ও প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া পূজা পাইয়াছেন; এবং স্বদেশে ও বিদেশে, এত দুঃখী, এত কাঙ্গাল ও এত ক্লিষ্টহৃদয়-লোকের উপকার করিয়াছেন যে, তাঁহাকে দয়াধর্ম্মের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি পুণ্যময় দয়াধর্ম্মের অনুরোধে, সমৃদ্ধজন-নিপীড়িত অথবা রাজ-শক্তি-নিগৃহীত ত্রাসার্ত্ত দুর্ব্বলের পরিত্রাণ-কামনায়, কোন কোন সময়ে, এমন ভয়ঙ্কর বিশ্বদ্রোহি ভাবে,—এমনই নির্ভয়-নিরপেক্ষ ন্যায়রক্ষক-বীরের প্রতাপে, দণ্ডায়মান হইয়াছেন যে, অতি নিকটবর্ত্তী বন্ধুজনেরাও তাঁহার তদানীন্তন মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা তখন ভাবিয়াছেন যে, যে পার্কার প্রাণপ্রিয় সুহৃদ্দিগের কাছে, প্রীতির সেই কেমন এক বিকাশে, সুকুমার-প্রকৃতি, সলজ্জমধুরাকৃতি নবযুবতী অপেক্ষাও অধিকতর নম্র, অধিকতর কোমল, সেই পার্কারই কি আপনার হৃদয়ের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম অনুরোধে পরের মান-প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত, এমন ভৈরব মূর্ত্তিতে প্রকট হইতে পারেন?

এইরূপ অলোক-সাধারণ অগাধ-স্বত্ত্ব পার্কার, তদীয় গভীর আত্মায়, ঈশ্বরভক্তি ও মনুষ্যনিষ্ঠ প্রীতির তাদৃশ মহাভাব পোষণ করিয়াও, যেরূপ উন্মাদময় উৎসাহের সহিত অহর্নিশ অধ্যয়ন করিতেন, সে কাহিনী আলোচনা করিলে, চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়; অথচ মনুষ্যোচিত শিক্ষালাভের জন্যও মনে একটু গাঢ় অনুরাগ জন্মে।

পার্কার আটচল্লিশ বৎসর কাল মাত্র পৃথিবীতে অবস্থিত ছিলেন। তিনি, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার পিপাসায় এই সময়ের মধ্যে, প্রতিদিন গড়ে পোনর ঘণ্টা অধ্যয়ন করিয়া, পুরাতনে ও নূতনে, ত্রিশটি ভাষায় আধিপত্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যে কোন কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাহার সহস্র পংক্তি এক-বারের আবৃত্তিতেই কণ্ঠস্থ হইত; এবং যাহা মনোযোগের সহিত পড়িতেন, তাহা চির-কালই তাঁহার মানসপটে মুদ্রিতবৎ রহিত। চরিতাধ্যায়কেরা * লিখিয়াছেন যে, তিনি

* পার্কারের জীবনচরিত সম্বন্ধে পাঠক "Life and Correspondence of Theodore Parker" By John Weiss, in two volumes," আর কব্ ও ক্লার্ক প্রভৃতি বহু বিচক্ষণ লেখকের প্রবন্ধ পত্রাদি পাঠ

যে সকল দুর্লভ গ্রন্থ প্রাণের সমান ভালবাসিতেন ও পুনঃ পুনঃ পড়িতেন, তাহার সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র, এবং তিনি নাস্তিক্যবাদের ভিত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত যে সকল প্রচলিত ও অপ্রচলিত পুস্তক পড়িয়াছিলেন, তাহার সংখ্যাও তিন সহস্র। পার্কার বলিতেন—"এত পড়িলাম,—এত শিখিলাম,—এত দেখিলাম,—এত চিন্তা করিলাম, কিন্তু মানুষ কেন নাস্তিক হয়, তাহা বুঝিলাম না। আমি যতই নাস্তিকতার গ্রন্থ পাঠ করি, আমার ঈশ্বরে ভক্তি ও পরকালে বিশ্বাস, ততই যেন দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তর হয়।"

ইংলণ্ডের (Bucklo) বকল্,—সভ্যতার ইতিহাস-লেখক বিখ্যাতনামা তাত্ত্বিক, পার্কারকে একান্ত ভক্তি করিতেন; এবং মাঝে মাঝে পার্কারের কাছে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আপনার ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাইতেন। তিনি বলিতেন যে, "আমেরিকার মানসিক শক্তি কতদূর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, আমি তাহা বুঝিবার জন্যই পার্কারের লিখিত প্রবন্ধাদি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া থাকি।" যখন বকলের ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইল, তখন ইয়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে আমেরিকার আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বকলের নামে ধন্য ধন্য শব্দ উঠিল। বকল্ ইহাতে আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইয়া, পণ্ডিতপ্রবর পার্কারকে তাঁহার গ্রন্থখানি সমালোচনার জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন। পার্কার, সে অনুরোধ রক্ষার্থ তদানীন্তন একখানি মাসিক পত্রে, প্রিয়বন্ধু বকলের গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া, প্রীতির উচ্ছ্বাসে এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, বকল্, চিন্তাশীল পণ্ডিত হইলেও, অদ্যাপি অনেক বিষয়ে অনধীতী। সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার এখনও বহু শত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা বাকী-রহিয়াছে; এবং এই হেতুই গ্রন্থের স্থানে স্থানে নানারূপ ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে। বকল্ এ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন নাই; সমস্ত কথাই শিরোধার্য্যবৎ মানিয়া লইয়াছেন; এবং পার্কারের অকৃত্রিম প্রণয়-সৌহার্দ্দে অণুমাত্রও অবিশ্বাস না করিয়া, অথবা তাহার প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তি বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর না হইয়া, তাঁহাকে প্রতিদানে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পিত অঞ্জলি দিয়াছেন।

করিতে পারেন। উইসের গ্রন্থ সঙ্কলিত, পার্কারের স্বরচিত-চারিতাখ্যানের একস্থলে লিখিত আছে,—"আমার বয়স যখন আট বৎসর হয় নাই, আমি তখনই হোমার, প্লুটার্ক, রলিনের পুরাতন ইতিহাস, এবং আরও রাশীকৃত ইতিহাস-পুস্তক রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া সমাপন করিয়াছি। আমি যখন দশ বৎসর বয়স্ক, তখন আমার কাব্য-পাঠ শেষ হইয়াছে। আমি যখন এগার বছরে পড়িলাম, তখন আমি মনোবিজ্ঞান লইয়া ব্যাপৃত। * * * আমি একবার মাত্র পড়িয়া গেলেই কবিতা পুস্তকের পাঁচ শত কিংবা হাজার পংক্তি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া রহিত।"

প্রথিতনামা গ্রন্থকার, এবং বিবিধজাতীয়,

ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিবৃত্ত-লেখক, পণ্ডিতচূড়ামণি জেমস্ ফ্রিমান ক্লার্ক (James Freeman Clark) থিয়োডোর পার্কারের অন্যতম প্রীতি-বন্ধু বলিয়া সর্ব্বত্র পুজা পাইয়াছেন। বোষ্টননগরের যে ষ্ট্রীটে পার্কারের বাস্তগৃহ ছিল, সেই ষ্ট্রীটেরই অপর পার্শ্বে,—পার্কারের বাস্তগৃহের ঠিক সম্মুখে, একটি দ্বিতল গৃহে, ফ্রিমান ক্লার্ক অবস্থান করিতেন। ক্লার্ক লিখিয়াছেন যে, এক দিন গ্রীষ্মকালে, রাত্রি ঠিক বারটার সময়, তিনি তাঁহার গৃহের বাতায়ন উন্মোচন করিলেন; এবং তখন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, পার্কারের গৃহেরও পুরোবর্ত্তি বাতায়ন উন্মুক্ত রহিয়াছে,—পার্কার তাঁহার অধ্যয়ন-গৃহে একাকী উপবিষ্ট হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন।

ক্লার্কের মনে বড় ঔৎসুক্য জন্মিল। পার্কার সে সময় নানাবিধ কঠিন রোগে জড়িত। তিনি ঐরূপ রুগ্ন অবস্থায়ও কতক্ষণ রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ ভাবে অধ্যয়ন করিবেন, তাহা জানিবার জন্য ক্লার্ক একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। রাত্রি যখন দুইটা বাজিল, তখন তিনি, তাঁহার সেই বাতায়ন পুনরপি উন্মোচন করিয়া, দেখিতে পাইলেন যে, পার্কার গ্রন্থরাশি সম্মুখে লইয়া ধ্যানস্থ ঋষির ন্যায়, তেমনই বসিয়া আছেন; এবং প্রখর আলোকের সাহায্যে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। রাত্রি যখন চারিটা বাজিল, ক্লার্ক তখনও সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া, একদিকে ভক্তি ও আর এক দিকে পার্কারের স্বাস্থ্যভঙ্গভয়ে অভিভূত হইলেন; এবং ধীরে ধীরে, নিজ গৃহের নিম্নতলে নামিয়া,—রাজপথ পার হইয়া, পার্কারের গৃহে, তদীয় অধ্যয়ন-নিলয়ে যাইয়া স্তম্ভিতবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই ভাবে অতীত হইল, তথাপি পার্কারের চৈতন্য নাই, এবং গৃহে অন্য ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছে, আর সেই ব্যক্তি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, এতটুকুও তাঁহার বোধ নাই। ক্লার্ক, ইহার পর, একটুকু শব্দ হয় এমনই ভাবে, হাসিলেন! পার্কার, সেই হাসির শব্দে চমকিত হইয়া, আসন হইতে অতিদ্রুত উঠিলেন; এবং ধীরমূর্ত্তি ক্লার্ককে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে একটি প্রগাঢ় আলিঙ্গন ও প্রীতিপূর্ণ চুম্বনে পরিতর্পিত করিলেন। প্রিয় সুহৃদ্দিগকে, প্রীতিস্নেহের প্রবল উচ্ছ্বাসে, এইরূপ প্রণয়ের আলিঙ্গন ও চুম্বন দান পার্কারের অভ্যস্ত ছিল।

ক্লার্ক, পার্কারের স্বর্গপ্রয়াণের পর, সভাস্থলের একটি বক্তৃতায়, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছেন যে, "সেই জ্ঞানার্ণবমগ্ন অধ্যয়নসুখপরায়ণ, মহাতাপসের মধুমাখা চুম্বনটি অদ্যাপি আমার স্মৃতিতে সজীব সতেজ অবস্থিত রহিয়াছে, এবং আমাকে নিরন্তরই যেন কহিতেছে,—'ভাই, যদি ভগবানের অনন্ত জ্ঞানবৈভব ও প্রেমসম্পদের সামান্য কিছু পরিচয় পাইতেও ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, ব্রতনিষ্ঠ হইয়া অধ্যয়ন কর,—সাধকের অটল প্রাণে নিরন্তর অধ্যয়ন কর; এবং পৃথিবীর সকল সুখ ত্যাগ করিয়া, সদ্গ্রন্থ

অধ্যয়নের সুখ-সাগরে, আকুল অন্তরে, ঝাঁপ দিয়া পড়।" *

এই মানব-জগতে, আরও অনেকে, পার্কারের প্রাণ লইয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন; এবং আপনাদিগের কৃচ্ছ্রসাধ্য অধ্যয়ন-ব্রতের পবিত্র কাহিনী মনুষ্যজাতির ইতিহাসে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, এ সুখের অপ্রতিম মহিমা জানাইয়া গিয়াছেন। হা আমরা হতভাগ্য অন্ধ!—মোহান্ধ পামর! আমরা, কিসের কি আকর্ষণে, আত্মবিস্মৃত হইয়া, এমন অতুল, অমল, অনায়াসলভ্য অথচ অনির্ব্বচনীয় সুখে বঞ্চিত রহিয়াছি;—এবং যে সকল দেবপুরুষেরা, অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া, আমাদিগের শিক্ষা, সমুন্নতি ও মানসিক তৃপ্তির জন্য অমৃতরাশি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথায় একবারে উপেক্ষা করিয়া, অতি অকিঞ্চিৎকর ধূলিখেলাতেই মজিয়া আছি।

ভারতীয় জ্ঞানগুরুরা, বহুকাল হইতে, বিভিন্নপ্রকারে, কহিয়া আসিয়াছেন,—

"অলসো মন্দবুদ্ধিশ্চ সুখী চ ব্যাধিপীড়িতঃ
নিদ্রালুঃ কামুকশ্চৈব ষড়েতে শাস্ত্রবর্জ্জিতঃ।"

অর্থাৎ,—যাহারা অলস, যাহারা মন্দবুদ্ধি, যাহারা একান্ত সুখ-বিলাসী, অথবা যাহারা নানারূপ ব্যাধিপীড়িত, নিদ্রাসক্ত ও ভোগ-সুখের জন্য লালায়িত, তাহারা শাস্ত্রাধিকার ও অধ্যয়ন-সুখে বঞ্চিত।

অলস দুই প্রকার —কেহ অলস শরীরে, কেহ অলস মনে। যাহারা মনে অলস, তাহারা শরীরে সুস্থ হইয়াও মনে উৎসাহশূন্য; সুতরাং শরীরালস জড়ের ন্যায় শিক্ষাসুখে বঞ্চিত। মন্দবুদ্ধিও দুই প্রকার। যাহারা মেধাহীন ও জড়প্রজ্ঞ, তাহারাই সাধারণতঃ মন্দবুদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা খল-মতি ও ছল-পরায়ণ,—পরের অনিষ্টসাধনই নিয়ত যাহাদিগের জপ-মন্ত্র, এবং পরপীড়নের পদ্ধতিসন্ধানই যাহাদিগের দগ্ধ জীবনের প্রধান-তন্ত্র, তাহারাই প্রকৃত মন্দবুদ্ধি। ইহা বলা বাহুল্য যে, তাদৃশ ব্যক্তিরা কখনও অধ্যয়নের নির্ম্মল আনন্দে আকৃষ্ট হইতে পারে না।

সুখী শব্দে যেমন বুঝায় বিলাসী, তেমন বুঝায় বিলাস-সম্পদ-ব্যগ্র, বিভব-প্রিয় ধন-লোলুপ। অপিচ, সুখী মাত্রই সতত ব্যাধি-পীড়িত,—রোগ তাহাদিগের সাথের সাথী,—সখের সামগ্রী উহা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদিগের অঙ্গছাড়া হয় না, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকের শরীর ও মনের অবস্থা এম-

---

* পার্কারের যখন পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তখন ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় একটা হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছিল; এবং "Anecdotes of Parker's Life" অর্থাৎ পার্কারের জীবনের স্মৃতিকথা নামে অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রবন্ধ চারিদিক হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক সে সময়ে কলিকাতাস্থ ঋষিকল্প ডল সাহেবের গৃহ ছাত্র। ডল সাহেবের অনুগ্রহে পার্কার সম্পর্কে তখন যাহা কিছু অধ্যয়ন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা এবং পরবর্ত্তি গ্রন্থাদি সংক্রান্ত-স্মৃতির উপর নির্ভরেই উল্লিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইল।

নই শোচনীয় যে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাও তাহাদিগকে সম্পূর্ণ তৃপ্তিদানে সমর্থ হয় না।

যাহারা শেষোক্ত শব্দটির লক্ষ্যীকৃত হইয়াছে, সারস্বত-সম্পদের বাতাসও তাহাদিগের গায়ে সহে না। শ্লোক-রচয়িতা মনীষী উল্লিখিত ছয় শ্রেণির লোককেই সমান অভিশপ্ত বলিয়া গণনা করিয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহাদিগের মধ্যেও তারতম্য আছে। সে তারতম্যের কারণ লইয়া এখানে আলোচনা অনাবশ্যক।

এই রস-লেশ-শূন্য শ্লোক, পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীর শাসনে, শিশুকালেই এ দেশে সকলের কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার গভীর অর্থ বৃদ্ধকালেও অনেকের হৃদয়স্থ হয় না। যখন ইহা শিশু, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই হৃদয়স্থ রহিয়া, দেববাণীর ন্যায় কার্য্য করিত,—সুকুমার-প্রকৃতি ও সরলমতি শিক্ষার্থীরা যখন, শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকট, শ্লোকের সূক্ষ্মার্থ পরিগ্রহ করিয়া, নিজ নিজ নির্ম্মল-নিরভিমান জীবনকে তদনুসারে নিয়মিত রাখিতে যত্ন পাইত, তখন অধ্যয়নব্রতই ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত হইত;—যাঁহারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে গুরুকুলে অবস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা ব্রহ্মচারীর ন্যায় সময় যাপন করিতেন,—ব্রহ্মচারীর ন্যায় পূজা পাইতেন; এবং তখন চাণক্য, পতঞ্জলি, কপিল ও শঙ্করাচার্য্য-প্রতিম সার্থক-জন্মা পুরুষেরাও, এই দেশেই প্রস্ফুটিত হইয়া, ভারতমাতার পবিত্র কীর্ত্তিতে দিগন্ত আলোকিত রাখিতেন।

সেই হিমাদ্রিপরিচিহ্নিত, সিন্ধুগঙ্গা-গোদাবরী-ধৌত, এবং সাগর-পরিখান্বিত ভারতভূমি তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু উহার প্রাণটা যেন পৃথিবীর কোন্ দেশে উড়িয়া গিয়াছে;—উহার যে প্রাণ, চারি বেদ, চৌদ্দ শাস্ত্র, বিশ্বদুর্ল্লভ বেদান্তভাণ্ডার, দর্শন-পারাবার, এবং অসংখ্য কাব্যের নয়ন-মনোহর সরিৎসরোবর সৃষ্টি করিয়া, সমগ্র মানবজাতিকে চমকিত করিয়াছিল,—সমগ্র পৃথিবীতে গুরুস্থান বলিয়া পূজা পাইয়াছিল, সে প্রাণ যেন, সতীর পবিত্রতনুর ন্যায় শত পীঠে, অথবা ফণার ফণ-জাত জিহ্বার ন্যায় সহস্র ভাগে, বিভক্ত হইয়া, পৃথিবীর আর কোন্ দেশে যাইয়া নিপতিত হইয়াছে। ভারতের সে দিন—সে প্রাণ—সে ব্রহ্মচর্য্য, সে ব্রহ্মণ্য প্রতিভা—সে অধ্যয়ন-[illegible]সা—এবং সে জ্ঞানামৃতপিপাসা আবার কি কখনও ভারতভূমিতে ফিরিয়া আসিবে। হা! আবার কি কখনও ভারতবাসী, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য, যত-চিত্ত যাজ্ঞিকের মত, সংসারের সর্ব্বপ্রকার কষ্টকে কাম্যসুখবৎ সেবা করিবে; এবং কষ্টার্জ্জিত জ্ঞানের বীজতত্ব কর্ম্মক্ষেত্রে রোপণ করিয়া,—জ্ঞানের সাধনা অথবা আরাধনায় সর্ব্বমঙ্গল্য কর্ম্মশক্তি ফলাইয়া, স্বজাতিকে পৃথিবীর জাতীয়সমাজে সম্মানের আসনে উপবিষ্ট করাইতে সমর্থ হইবে।

দার্শনিক মতের সমন্বয়।

[৪]

পাঠক জানেন যে সাংখ্যদর্শন, এই ব্যক্ত-জগতের পশ্চাতে এক নিত্য অব্যক্তজগতের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। সেই নিত্য অব্যক্তজগতের নাম তাঁহার মতে "প্রকৃতি"। এই প্রকৃতিসত্ত্ব তাঁহার মতে নিত্য-পদার্থ। ইহা বহির্জগতের পরমাণুর বীজ। এই নিত্য বীজই ব্যক্তজগতে পরিণত হইয়া পড়িতেছে ও পড়িয়াছে। এই ব্যক্তজগৎ সেই অব্যক্ত নিত্যজগতের পরিচায়ক চিহ্ন মাত্র;—ইহা অসার, অনিত্য ও বিকারী। ব্যক্তজগৎ, অব্যক্তের প্রকৃত স্বরূপ নহে, কিন্তু স্বরূপের আভাস মাত্র,—তাহার অস্তিত্বের পরিচায়ক বা জ্ঞাপক মাত্র। পুরুষ (Consciousness) ও প্রকৃতির আশ্চর্য্য সম্বন্ধ বশতঃ, প্রকৃতির ক্রিয়াপ্রবাহ উপস্থিত হইয়াছে; এবং এই ক্রিয়াপ্রবাহ হইতেই পুরুষের শব্দ, স্পর্শ, বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানবিকার দেখা দিয়াছে। আত্মার উপরে প্রকৃতির ছায়াপাত হইয়া, এই সকল বৈকারিক জ্ঞান জন্মে। বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের বা আত্মার কোন প্রকার শব্দ স্পর্শাদি বিশেষ জ্ঞান বা ক্রিয়া নাই। অতএব এই শব্দ স্পর্শাদি প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রতিবিম্ব চলিয়া গেলে, আত্মা আপন স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে, তখন আর এরূপ পরিবর্ত্তন প্রবাহের অনুভূতি থাকিবে না। কিন্তু সে অবস্থা আমাদের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অতীত। বেদান্ত মতও প্রায় এইরূপ। বেদান্তও এক নিত্য চৈতন্যসত্তা স্বীকার করেন, এবং সেই চৈতন্যেরই বিবর্ত্তময়ী শক্তিরূপে এই জগৎ অবস্থিত বলিয়া প্রমাণ করেন। সেই শক্তিই নিয়ত ঘনীভূত হইয়া ব্যক্তজগতের আকারে দেখা দিয়াছে। সাংখ্যমতে যেমন এক নিত্য-প্রকৃতিবীজ প্রথমতঃ সূক্ষ্মাকারে ও পরে স্থূলাকারে জগতের আকারে পরিণত হইতেছে, এবং আত্মার উপরে তাহার ক্রিয়ার অনুভূতি জন্মিতেছে;—বেদান্তমতেও তদ্রূপ এক নিষ্ক্রিয় চৈতন্যসত্তা প্রথমতঃ সূক্ষ্মশক্তিরূপে, পরে ঘনীভূত স্থূলদৃশ্যরূপে পরিণত হইয়াছে।* উভয়ের মতেই, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ অবস্থাই অনিত্য ও বিকারী, এবং সুতরাং অসত্য। ইহারা পরিবর্ত্তন-প্রবাহ বা অবস্থাভেদ মাত্র। বৌদ্ধ কেবল এই ব্যক্ত পরিবর্ত্তন-প্রবাহেরই উপদেশ

* কিন্তু এ কথার অর্থ ইহা নহে যে, নিষ্ক্রিয় চৈতন্যসত্তার কোন এক বিশেষ-কালে অবস্থান্তর হইয়াছে। চেতনসত্তার বক্ষঃস্থিত শক্তিরাশিই নিরন্তর অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিতেছে, ইহাই প্রকৃত অর্থ। অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণভাব নিত্য।

দিয়াছেন, এবং তিনিও এ গুলিকে অসার, অনিত্য বলিয়া উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন *।

আমরা দেখিতেছি, চৈতন্য বা আত্মার উপরে শক্তি বা প্রকৃতির ক্রিয়া বা প্রতিবিম্বপাতই এই ব্যক্তজগৎ—ইহাই সাংখ্য ও বেদান্ত মত। বৌদ্ধ বলেন যে, যে বস্তুর উপরেই যে বস্তুর প্রতিবিম্বপাত হউক্ না কেন, তাহারা যখন ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানের অতীত, তখন তাহাদের কথা রাখিয়া দেও। আমাদের এই যে প্রতিবিম্বের জ্ঞান হইতেছে, ইহাদেরই স্বরূপ এবং প্রকৃততত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। তাই বুদ্ধ এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহেরই তত্ত্বোপদেশ দিয়াছেন। আত্মা,বা চৈতন্য এবং প্রকৃতি বা শক্তি,—ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ, তাহা আমরা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের দ্বারা নির্দ্ধারিত করিতে অসমর্থ। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ দর্শনেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল সেই পরিবর্ত্তন-প্রবাহের মিথ্যাত্ব বা conditionality দৃঢ়রূপে মানব মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া।

ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুদিন হইতে জগতের Substratum এবং তাহার Qualities লইয়া বাদবিবাদ ও তর্ক চলিয়া আসিয়াছে। ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিতের মতে, Substance বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা কেবল Qualities এরই অস্তিত্ব মানেন। যদি Qualities গুলির সমষ্টিকে Substance বলিতে চাও বল, কিন্তু Substance বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ ইহাঁরা মানেন না। আবার কাহারও মতে, Qualities গুলিকে ধরিয়া রাখে এরূপ পৃথক্ এক Substance এর সত্তা আছে; সেই সত্তারই বক্ষে Qualities গুলি দেখা দিতেছে। কিন্তু ইহাঁরা বলেন যে, এই Substance এর স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। Herbert Spencer এর মতে, সমুদয় পরিবর্ত্তনের Qualities মধ্যে এক নিত্যসত্তা অপরিবর্ত্তনীয় থাকে, তাহাই উহাদের Substance. "So that among all the changes, there is something permanent." (Psychology Vol. II P. 481) এই নিত্য বস্তু তাঁহার মতে নিষ্ক্রিয় ("not a worker of change")। ইহারই বক্ষে যাবতীয় পরিবর্ত্তন চলিতেছে। ইহার অপর নাম Absolute Reality অথবা Unconditioned cause (vide His "First Principles").

"The consciousness of this Absolute Reality is produced in us by the absolute persistence of something which survives all changes of relation." আবার "What we are conscious of as properties of matter *even down to its weight and resis-*

* কি অর্থে ইহারা অসার ও অনিত্য, সে কথা আমরা পরে বিচার করিয়া দেখিব। এই অসারতার অর্থ পরিগ্রহ করিতেও অনেকে ভুল করিয়াছেন।

tance are but subjective affections produced by objective agencies that are unknown." (Psychology, Vol II). সুপ্রসিদ্ধনামা, জার্ম্মাণদার্শনিক, ঋষিকল্প Kantও এইরূপ কথাই বলিতেন। "Unless thought supplied this persistent, permanent background it would be impossible for us to realise the relations in time known as succession and simultaneity" (Wallace's Kant). পণ্ডিতপ্রবর Lockeও এই সত্তা স্বীকার করিতেন। কিন্তু কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত আবার এরূপ কোন নিত্যসত্তা স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন যে, গুণসমষ্টিই বস্তুর বস্তুত্ব। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহাত্মা Bain এই মতের পৃষ্ঠপোষক। "Attributes synthetically united give substance and substance analysed gives attributes. A continued substratum of supporter of attributes an is impossible conception" (Mental and Moral Science, Appendix). Berkley এবং জর্ম্মাণদার্শনিক বিশ্রুতযশা Hegelও এই নিত্যসত্তা মানেন নাই।

ইউরোপে যে বিবাদ, ভারতীয় দর্শনেও সেই বিবাদ। আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়েই এই নিত্যসত্তা স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যের মতে এই নিত্যসত্তার নাম বহির্জগতে প্রকৃতি, ও অন্তর্জগতে পুরুষ। বেদান্ত মতে এই নিত্যসত্তা ব্রহ্মচৈতন্য, প্রকৃতি তাঁহারই নিত্যশক্তি। এই যে জগতে আমরা অনবরত ক্রিয়া বা গুণ বা properties দেখিতেছি, তাহা আত্মার উপরে প্রকৃতির ক্রিয়া, অথবা ব্রহ্মচৈতন্যের শক্তির বিকাশ। বুদ্ধ বলেন, একপ অজ্ঞেয় নিত্যসত্তার কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দাও। ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানে যখন উহার প্রকৃতস্বরূপ বুঝা যাইবে না, তখন উহার কথা সম্প্রতি তুলিও না; অন্তর্জগতে ও বাহ্যজগতে আমরা যে মহাপরিবর্ত্তন-প্রবাহ দেখিতেছি, তাহারই কথা বল।

বোধ করি এতদূরে আমরা এই তিন দর্শনের কোথায় ঐক্য ও কোথায় পার্থক্য তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তথাপি এ সম্বন্ধে আরও অনেক বলিতে আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্ এ।

ভারত-স্মৃতি।

এই কি সে স্বর্ণপ্রসূ সোনার ভারত
এ যদি ভারত কোথা সে শোভা তাবৎ।
কোথা সে দৃষদ্বতী
কোথায় সে সরস্বতী,
যার রম্য তীরে বসি ঋষি অগণন
করিলেন মহাবেদ বেদান্ত রচন।

কোথা সে বশিষ্ঠ গার্গী আদি মুনি যত
জ্ঞান দানে নর-চক্ষু উন্মোচনে রত।
কোথা সে বাল্মীকি মুনি,—
যেন পূত সুরধুনী—
যাঁর রামায়ণ গীতি মাতায়ে জগৎ—
ক'রেছিল একাকার স্বরগ মরত।

পবিত্র আশ্রম মাঝে কই ঋষিবালা
বদনে উছলে বিভা বুকে সুধা ঢালা।
পর সুখে সুখ ভরা,
পর দুখে মর্ম্মে মরা,
এখন ভারতে কোথা সে তাপসী দল?
এ যদি ভারত—কোথা সে শোভা সকল?

কোথা দ্বৈপায়ন কবি-কুল-মণিহার,
ভারতে ভারত ঘোষে কীর্ত্তিরাশি যাঁর।
অনুপম সুপবিত্র,
সীতা শকুন্তলা চিত্র,
কোথা সে সাবিত্রী সতী ভবে অতুলন
এ যদি ভারত কোথা সে শোভা এখন?

এই কি ভারত তোরা সত্য ক'রে বল্
এ যদি ভারত কেন ভরা এত ছল?
সূর্য্যবংশ-পূতদীপ,
কোথা আজি সে দিলীপ,
কোথা সত্যনিষ্ঠ আজ দশরথ রাজ
লোকপ্রিয় সীতা-পতি কোথা তবে আজ?

কোথা সে জনকঋষি দেব অবতার
জন্মিলা রমণীরত্ন সীতা গৃহে যাঁর।
কোথা সে পরশুরাম,
ক্ষত্রিয় বীরত্ব ধাম,
এ যদি ভারত কেন এত হাহাকার
কার শাপে সে সকল হলো ছারখার।

মিছে কথা এ ভারত সে ভারত নয়
সে যে স্বর্গ এ যে দেখি নরক-নিলয়।
কোথায় সে দ্রোণ ভীষ্ম,
একলব্য সম শিষ্য,
কোথা কর্ণার্জ্জুন আদি মহারথিগণ—
যাঁহাদের বীরদর্পে কাঁপিত ভুবন।

এ যদি ভারত সত্য বল একবার,
কোথা সেই যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
কোথা সে হস্তিনা আজ,
গর্ব্ব ভরা কুরুরাজ,
ভারত ভূষণা কোথা সে গান্ধারী সতী
কেন ভারতের আজ হেন দুরগতি।

যাদের হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তি থরে থরে
ছিল সুসজ্জিত, যারা স্বদেশের তরে—
ইঙ্গিতে আপন প্রাণ,
দিত হেসে বলিদান,
যাহাদের স্মৃতি আজ গায় রাজস্থান
সে সকল বীর কোথা করিল প্রয়াণ?

কোথা সেই কুরুক্ষেত্র বৈজয়ন্তীরথে
যথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে দিলা নানা মতে
নাশিতে মনের ক্লেশ,
ক্ষেত্র ধর্ম্ম-উপদেশ,
কোথা কৃষ্ণ কোথা আজি সেই রণাঙ্গন।
এই যদি সে ভারত কেন গো এমন!

কোথা রসরাজ কৃষ্ণ কোথা ব্রজপুর
বহিত যেথানে গোপী হৃদয়ে মধুর—
অপূর্ব্ব প্রেমের স্রোত,
যাহে হ'য়ে ওতো প্রোত,
মধুরে বহিয়া যেত দীনেশ বালিকা
কোথা সে যমুনা কোথা মানিনী রাধিকা।

"দেহিপদ পল্লব মুদরাম্" বলি
যেথানে পড়িত শ্যাম রাই পদে ঢলি
কোথায় সে কুঞ্জধাম,
কোথা বাঁশী-কোথা শ্যাম,
আজি যেন এ ভারত সে ভারত নয়
কোথা সে সকল চিত্র হ'য়ে গেল লয়?

তুলি হেথা শাক্যসিংহ বিজয়নিশান
বাজাইলা ধরমের যে পূত বিষাণ—
আকাশকুসুম হেন,
শূন্যেতে মিশিল কেন,
কোথায় শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য মাঝে যাঁর
উথলে অহংব্রহ্ম চির-অনিবার।

বৈষ্ণব আরাধ্য ধন গৌরাঙ্গ কোথায়,
ভাসালেন বিশ্ব যিনি প্রেমের বন্যায়,
যে ধনে ভারত ধনী,
কোথা সে সকল মণি,
দরিদ্র ভারত আজি কিছু তার নেই
কি দেখে বলিব বল এ ভারত সেই।
আমার মাথার কিরে,
বল্ তোরা বল্ ফিরে,
এই কি সে সুখময় সোনার ভারত?
এই যদি সেই কোথা সে সুখ তাবত।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

ব্রহ্মদেশ কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৌদ্ধ যুবকের সন্ন্যাসাশ্রম ;—ভারতবাসী আর্য্য সন্তানদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যেরূপ কতকগুলি আনুষ্ঠানিক কার্য্য আছে, এই দেশেও সেইরূপ কতকগুলি সংস্কার আছে। এ স্থানে যুবকদিগের প্রথম সংস্কারের নাম সেসাং বা বৈরাগ্যদীক্ষা। দীক্ষার পর তাহারা দ্বিজ হয়, এই দেশে দ্বিজ শব্দের অর্থ উপবীত গ্রহণ নহে, ইহা

ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ভিক্ষু (চিরসন্ন্যাসী) ও সাময়িক আশ্রমবাসী; এই দুইকেই বুঝায়। যাহারা পবিত্র আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করে, এ স্থলে আমরা সেইরূপ গৃহাশ্রমীর কথা বলিব না। যাঁহারা আজীবন ধর্ম্মমন্দিরে থাকিয়া কৌমারব্রত উদ্‌যাপন করেন এবং ভোগলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোর নিয়মাবলী প্রতিপালন ও ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করেন, সেই চিরপ্রবাসী ভিক্ষুদিগের কথাই বলিব। এই যাজকসম্প্রদায়ের সাধারণ নাম পুঙ্গী। যাহার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি নাই, বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা নাই, ত্যাগ স্বীকারে নারাজ, কেয়াঙ্গ গৃহের রীতিনীতি সম্যকরূপে অবগত নহে, যাহার ভাবী জীবন প্রতিভাশালী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না, এবং যে কিছুকাল বৈরাগ্যাশ্রমে থাকিয়া বৈরাগ্য বসন অর্থাৎ পীত বস্ত্র পরিধান না করিয়াছে ও জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের সহবাসে থাকিয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহার না শিখিয়াছে সে পশুবাচ্য, সুতরাং কখন পুঙ্গী হইবার যোগ্য নহে। আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার পর ধর্ম্মপিপাসু যুবককে গৃহাশ্রমের ব্যবহৃত নাম পরিত্যাগ করিয়া আর একটি নূতন আধ্যাত্মিক নাম গ্রহণ করিতে হয়। এই নামের অর্থ সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে বিমুক্ত জীব। কিন্তু পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিলে, তাঁহাদের সম্মতি ভিন্ন কোন যুবক আজীবন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যুবকদিগের পঞ্চদশ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত পুঙ্গী হইবার উপযুক্ত কাল। অনেকে ইহার পূর্ব্বে ও পরে পুঙ্গী হইয়া থাকে, কিন্তু সেইটি তাহাদের উচিত সময়ের সংস্কার নহে। বৈরাগ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হয় শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে। বহির্ভ্রমণ অবৈধ কার্য্য বলিয়া যাজকেরা বর্ষার তিন মাস মন্দিরে থাকিয়া ত্রৈমাসিকী ব্রতানুষ্ঠান করেন। শুভকার্য্যে শুভ দিন ও শুভ লগ্নের প্রয়োজন। যুবকের জন্মপত্রিকা দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ দিন নির্ব্বাচন করিয়া দিলে এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। নিরূপিত সময়ের অব্যবহিতপূর্ব্বে যুবকের সহোদরা ভগিনী, অভাবে জ্ঞাতিস্বসা ও পল্লী বালিকাদল সম্মিলিত হইয়া মনোহর বেশ ভূষায় যুবককে ভূষিত করিয়া দেয়। পরিধানে চেল বস্ত্র, হস্তে স্বর্ণ বলয়, কর্ণে মণিকুণ্ডল, মস্তকোপরি স্বর্ণ ছত্র। এই বেশে এক সজ্জিত যানে আরোহণ করিয়া যুবক পল্লী দর্শনে নির্গত হয়; পথ ঘাট, লোকে লোকারণ্য। সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড লইয়া বাদক ও গায়কদল চলিতে থাকে। বরের সাজে সজ্জিত এই নবীন সন্ন্যাসীর নবীনরূপ দেখিবার নিমিত্ত চারিদিক হইতে জনস্রোত ছুটিয়াছে; এবং মধ্যে মধ্যে তাহার গন্তব্য পথ অবরোধ করিয়া বহুসংখ্যক নরনারী বালকবালিকা তাহাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতেছে। কিন্তু এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে থাকিয়াও যুবক যেন অবিচলিত ভাবে সংসারের সকল ভোগ্য বস্তু পদদলিত ও সকল বন্ধনী ছিন্ন করিয়া যাইতেছে। এই বেশে তাহাকে অগ্রে বন্ধু

বান্ধবের গৃহে যাইয়া তাহাদিগহইতে চির বিদায় লইয়া পরে পিতৃভবনে প্রবিষ্ট হইতে হয়। এ স্থানে, সভামণ্ডপে অন্যান্য ধর্ম্ম-যাজকের সহিত দীক্ষাগুরু উপস্থিত থাকেন, যুবক এখন আর ঐহিক সুখসম্পদের ভিখারী নহে; অম্লানবদনে অঙ্গ হইতে সমস্ত আবর্জ্জনারাশি (আভরণাদি) উন্মোচন করিয়া গুরুপদপ্রান্তে সমর্পণ করে। ইহার পর তাহার মস্তকমুণ্ডিত হয়; পরিধানে এক খানা সামান্য শ্বেত বস্ত্র মাত্র থাকে, দেখিলে বোধ হয় যেন, কোন অজাতশ্মশ্রু ঋষিকুমার বল্কল পরিধান করিয়া সাধন ভজনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ঐশ্বর্য্যের চিরবিকার, পার্থিবরাজ্যে ভোগলিপ্সা প্রবর্দ্ধক নরকের পথপ্রদর্শক ও মদমাৎসর্য্যের আবাসক্ষেত্র। মণিমুক্তাখচিত আভারণাদি অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া যুবক যেন বুঝিতে পারিল, আজ হইতে সংসারের মায়ামোহ হইতে আমি মুক্তিলাভ করিলাম। তখন তাহার হৃদয় যেন কোন অমানুষিক শক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে, এবং সংসারের ঘাত প্রতিঘাত হইতে তাহার স্থিতি স্থান যেন বহু দূরে। দর্শকবৃন্দের অদূরে থাকিয়া যুবক শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করে, দীক্ষাগুরুও এক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে বৈরাগ্যচিহ্ন পীতবসন, মেখলা, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি সজ্জিত থাকে। শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে যুবক বারত্রয় আভূমিষ্ঠ প্রণত হইয়া স্মিতমুখে ঐ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করে। তখন দেখিলে বোধ হয় যেন, একজন ভগবদ্ভক্ত যুবক নূতন বেশে নূতন হৃদয় লইয়া অতি সমাহিতচিত্তে ভগবানের স্তুতিগান করিতেছে। পাঠক, যুবকের স্তুতি-গানের নমুনা একটু দেখুন,—"হে ভগবন্! হে বুদ্ধ! জীবের শেষ কামনা নিবান (নির্ব্বাণ) মুক্তি যেন আমার ভাগ্যে ঘটে ও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন পবিত্র ভাবে ধর্ম্মাত্মাদিগের সহবাসে থাকিতে পারি।" দৃশ্যটি যেরূপ প্রীতিকর ও ভক্তি-উদ্দীপক, কার্য্যটিতে যদি অভিনয়ের ভাব না থাকিত, তবে এই দেশকে আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষ স্থান বলিয়া মনে করিতে পারিতাম। কিন্তু ইহারা দেখাইতে চাহে যতটুকু, কার্য্যে ততটুকু অগ্রসর নহে। মুখসপরা লোককে চেনা ভার; এ দেশে আদতের পরিবর্ত্তে মেকী চাল বেশী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যুবকমাত্রকেই যৌবনের প্রারম্ভে একবার না একবার পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া বৈরাগ্যাশ্রমে যাইতে হয়। কারণ, ইহা তাহাদিগের একটি জাতীয় সংস্কার। এই সন্ন্যাসাশ্রমে যাওয়ার পরেও যাহারা বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে না, আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পাদনের পর তাহারা পুনঃ স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। এরূপ লোকের সংখ্যা শতকরা ৯৯ জনেরও অধিক। কিন্তু কামিনীকাঞ্চনের প্রলোভন এড়াইয়া যাঁহারা উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পুঙ্গীধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমরণ ফেয়াঙ্গ আশ্রমের নিয়ম পালন

করেন। দৃষ্ট হয় অনেক সুখপ্রিয় ভোগ-বিলাসী যুবক দীক্ষিত হইবার পর মুহূর্ত্তেই মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনঃ পরিত্যক্ত সাংসারিক নাম গ্রহণ ও বসনাদি পরিধান পূর্ব্বক নাট্য গীতাদিতে যোগ দেয়। কোন কোন ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টা মাত্র আশ্রমের নিয়মাধীন থাকিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কঠোর বৈরাগ্যধর্ম্মের পরিচয় দেয়। কিন্তু শাস্ত্রের আদেশ অন্ততঃ "সপ্ত রজনী" মন্দিরে থাকিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্মালোচনা করিতে হইবে। যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত ও নিষ্ঠাবান্, তাহারা এক পক্ষ কি এক কি দ্বিমাস মন্দিরে থাকিয়া গুরুসন্নিধানে ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা করে। যাহাদের ভক্তি আরও প্রগাঢ় ও ধর্ম্মানুরাগ আরও বলবতী, তাহারা এক "ওয়া" বা "ওয়াস" অর্থাৎ বর্ষার তিন মাস পর্য্যন্ত ও ততোধিক উন্নতমনা ব্যক্তিরা তিন "ওয়া" অর্থাৎ ৯ মাস আশ্রমবাসে থাকিয়া আশ্রমধর্ম্ম পালন করে। এইরূপ দীর্ঘ প্রবাসের উদ্দেশ্য,—প্রথম "ওয়াব" সঞ্চিত পুণ্যফলে পিতা মুক্তিপদ লাভ করিবেন। দ্বিতীয় মাসের ফলে মাতা নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবেন। তৃতীয়ে নিজের ধর্ম্মপথ সুগম করিবে।

যত দিন পর্য্যন্ত যুবকগণ মন্দিরে থাকে, তত দিন অধ্যয়ন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গুরু সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই তাহাদের করিতে হয় না। শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগের পর গললগ্ন ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাই তাহাদের অন্যতর কার্য্য। সঞ্চয় করা ও অগ্নিস্পর্শ করিবার বিধান না থাকাতে তাহাদিগকে পরান্নভোজী ভিক্ষুক হইতে হয়, কিন্তু ধনী লোকের সন্তানেরা ইহাতে স্বীয় পদ-গৌরব খর্ব্ব হইবে মনে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করে; এবং ইহা আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্য হইলেও তাহারা বাটী হইতে নানাবিধ সুখপ্রিয় ও মুখরোচক খাদ্য আনাইয়া ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অবৈধ কার্য্য; সুতরাং অপর ধর্ম্মভীরু বালকেরা সেই খাদ্য স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে চাহে না।

জগতে অনাবিল সুখ কখন কাহার ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু আলোকের মধ্যে যেরূপ অন্ধকার আছে, অন্ধকারের মধ্যেও আবার আলোক আছে; নীলিম জলদজালের অন্ধকার বক্ষে যেরূপ সৌদামিনীর নৃত্য; চিরদ্যুতিময় ভাস্করের প্রখর আভাতেও রাহুর ছায়াপাত আছে। আজ আমরা এ স্থলে অন্ধকারের ভাগ পরিহার করিয়া আলোকের শুভ্র ছায়া একটু দেখাইবার চেষ্টা করিব। পাঠক! নকল ছাড়িয়া একবার আসলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন, সংসারের অসার আবর্জ্জনারাশির মধ্যে থাকিয়াও কিরূপে নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ বালক আজীবন দেবদুর্ল্লভ অপার্থিব ধন সঞ্চয়ের প্রয়াস পাইয়া থাকে; এবং হৃদয়ের বল দেখাইবার নিমিত্ত কিরূপে সুর্ব্ব সুখ পরিত্যাগ করিয়া অম্লানবদনে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করে। তরুণ বয়সের তরলমতি গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইবার অনেক

বাকি। ক্রীড়াঙ্গনে খেলিবার উপকরণগুলি এখন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সঙ্গিগণের প্রীতি উপহার, পর্ণরাশি শুকাইয়া যায় নাই; উম গন্ধের আতপত্র এখনও ক্রীড়ামন্দিরের দ্বার হইতে অপসারিত হয় নাই। এ হেন সুকোমল বয়সে পিতা মাতার স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া, সুহৃদ্বর্গের সৌহার্দ্দ ভুলিয়া, ছায়ারূপিণী ছোট ভগিনীগুলিকে কাঁদাইয়া সুখের খেলা, সুখের ভবন চিরদিনের তরে পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তাপসাশ্রমের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করা কি সামান্য ত্যাগ স্বীকারের কার্য্য? সভা স্থলের একদিকে পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন উপবিষ্ট, আর একদিকে বাল্যসহচর ও বন্ধুবর্গ ম্লানমুখে দণ্ডায়মান; যে বাল-বন্ধুদিগকে সঙ্গে করিয়া তাহারা বাল্য ও কৈশরে হাসিয়া খেলিয়া কৌতুক কোলাহলের তরঙ্গ তুলিয়া হাটে মাঠে বেড়িয়া বেড়াইয়াছে, আজ যৌবনের উন্মেষ সময় তাহাকে চির বিদায় দিতে সকলে সভাস্থলে সমবেত হইয়াছে; এবং চির সৌহার্দ্দের চিহ্নস্বরূপ আশ্রমবাসের উপযোগী ৭টি আবশ্যকীয় বস্তু উপহার প্রদান করিতে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছে। নবীন সন্ন্যাসী সুহৃদ্বর্গের অকৃত্রিম ভালবাসার শেষ নিদর্শন এই উপহৃত বস্তুগুলি আমরণ অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। দ্রব্য সাতটির নাম পাঠক একবার শুনিতে চাহিবেন কি?

(১) বৈরাগ্য বস্ত্র অর্থাৎ পীত বসন তিন খণ্ড।

(২) ভিক্ষাপাত্র একটি।

(৩) কটীবন্ধনী বা মেখলা একটি।

(৪) বস্ত্রখণ্ড সংযোগের নিমিত্ত ছুঁচ একটি।

(৫) মস্তক মুণ্ডনের নিমিত্ত ক্ষুর একখানা।

(৬) রমণী মুখ হইতে আপনাকে অদৃশ্য রাখিবার নিমিত্ত চক্ষুসম্মুখের আবরণ, তালবৃন্ত একখানা।

(৭) প্রাণী হিংসারূপ মহাপাপ হইতে আত্মরক্ষার্থ পানীয় জল ছাকিয়া লইবার চালুনী একখানা।

জীবনের সম্বল এই ৭টি বস্তু লইয়া যুবক ধর্ম্মমন্দিরে প্রবিষ্ট হয় ও অন্য অর্থের প্রয়োজন না থাকাতে তাহা তাহারা কাকবিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণা করে। মন্দিরে, তাহাদিগকে ধর্ম্মের প্রতিষেধ বাক্য ৫টি অনুক্ষণ স্মরণ রাখিয়া চলিতে হয়। সেই ৫টি এই; (১) মাদক দ্রব্য সেবন, (২) হিংসা, (৩) চৌর্য্য, (৪) পরদার গমন, (৫) মিথ্যা ব্যবহার। তাহাদিগকে উপবিধি তিনটিও পালন করিতে হয়, সেই তিনটি (১) বিলাসদ্রব্য ব্যবহার পরিহার, (২) দ্বিপ্রহরের পর ভোজন না করা, (৩) নাটকাদি অভিনয় দর্শনে না যাওয়া। নিয়মগুলি ধর্ম্মযাজকেরা যেরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করেন, সেইরূপ অপরাপর সাধারণ সকলেরই সমভাবে পালনীয় ও রক্ষণীয়। কিন্তু এখন সকল দেশে যেরূপ হইয়াছে, এই দেশেও ইহার ভয়ানক ব্যভিচার ঘটিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত

বিধি ও উপবিধি ভিন্ন যাজককে আরও অতিরিক্ত নিয়ম দুইটি পালন করিতে হয়। একটি দার পরিগ্রহ না করা ও মণিকাঞ্চনের ব্যবহার ত্যাগ; আর একটি সুকোমল শয্যায় শয়ন পরিহার। ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মপদের লিখিত এই কঠোর নিয়মাধীন থাকিয়া পুঙ্গীদিগকে চিত্ত সংযমন ও আত্মরক্ষা এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা উদর পোষণ করিতে হয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কখন কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। হিন্দুগৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন যেরূপ একটি মহা পুণ্যের কার্য্য; এই দেশে পুঙ্গীভোজনও তদনুরূপ, বরং অপেক্ষাকৃত আরও একটু বেশী। এই কারণ গৃহস্থ মাত্রকেই ভোজনের পূর্ব্বে খাদ্যদ্রব্যের একাংশ অগ্রে পুঙ্গীদিগের নিমিত্ত তুলিয়া রাখিতে হয়। স্বাস্থ্য না থাকিলে শরীর থাকে না, শরীর না থাকিলে ধর্ম্মরক্ষা হয় না। শরীরকে রক্ষা করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন, এই নিমিত্ত পুঙ্গীদিগকে প্রতিগ্রহ করিতে হয়। মহামুনি গৌতমের উপদেশ, কোন ধর্ম্মযাজক যাজ্ঞা করিয়া আহরীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে পারিবে না। তাঁহাকে দাতার বহির্দ্বারে অবস্থিতি করিতে হইবে; এবং তিনি সর্ব্বক্ষণ সম্মুখ দেখিয়া চলিবেন। পার্শ্বে ও পশ্চাৎদৃষ্টি অতৃপ্ত বাসনার পরিচায়ক; সুতরাং তাহার প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া চলিলে নিরয়গামী হইতে হইবে। দানের পর দাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া কি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য; নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিলে যাচক কেবল "সাধু সাধু" এইমাত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন। জ্ঞানিব্যক্তি কখন কোন দ্রব্যেরই অভাব মনে করেন না; অভাব হয় কেবল ভোগবিলাসীদিগের। এ নিমিত্ত অতি সামান্য দানেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাজকেরা সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

পুঙ্গীদিগের ভিক্ষার সময় অতিক্রম হইয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন গৃহী ব্যক্তি ভোজনের উদ্যোগ করিতে পারিবেন না। ভিক্ষার নিরূপিত সময় অরুণোদয় হইতে তাঁহার মধ্যগগনে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; কিন্তু আতুর ও রুগ্ন সন্ন্যাসীরা এই নিয়মের অধীন নহে। শুধু আধ্যাত্মিক ও পার্থিব রাজ্যের পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত এই দেশে ধর্ম্মযাজকের এত সম্মান ও প্রতিপত্তি। পুঙ্গীরা অতি মহিমান্বিত রাজসম্মান ও রাজপদকেও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করেন। রাজা যাইতেছেন রাজসম্মান রক্ষা করিয়া বাজীপৃষ্ঠে; পুঙ্গী যাইতেছেন পদব্রজে, দীনবেশে, নগ্নপদে। দর্শন মাত্র ভূপতি ভূপৃষ্ঠে নামিয়া পড়িলেন; আনত হইয়া "সিকোবা" (প্রণতি) করিলেন; এবং যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। যদি কোন পথবাহিনী রমণী, যাজককে দর্শন করিতে পারিলেন, অমনি পথের এক পার্শ্বে জানু পাতিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে উপবিষ্টা হইলেন এবং যে পর্য্যন্ত তিনি চক্ষে তালপত্রের আবরণ দিয়া বহুদূরে চলিয়া না যাইবেন, সেই পর্য্যন্ত রমণীকে ঐভাবেই থাকিতে হইবে।

পুঙ্গীদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ;—দেশীয় রীত্যনুসারে ধর্ম্মযাজকদিগের মৃত্যুর পর শবদেহের ব্যবচ্ছেদ করিয়া হৃৎপিণ্ডটি বহির্গত করিয়া লইতে হয়। জীবনশূন্য দেহ অল্প সময়ের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কা বিদূরিত করিবার মানসে শবদেহকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দুই খণ্ড কাষ্ঠফলকের মধ্যে, তামাক ও ধূপ ধুনার আবরণে রাখিয়া দিতে হয়। শবাধার একটি কাষ্ঠ পেটক বা মঞ্জুষা ; এইটি ধর্ম্মমন্দিরের এক সজ্জিত প্রকোষ্ঠে সজ্জিত খট্টোপরি নীল চন্দ্রাতপ তলে রক্ষিত হয়। এইভাবে উহা প্রায় একবৎসর থাকে। মৃতব্যক্তির সম্মান সমস্ত সভ্য জগৎই করিয়া থাকেন, করে না কতগুলি অসভ্য বর্ব্বর জাতি। এই দেশেও এরূপ সম্মানের ত্রুটি নাই। এইস্থানে ধর্ম্মযাজকের মৃত্যুর অব্যবহিত পর শবদেহের সৎকার হয় না। এই মৃতদেহ সাধারণ সম্পত্তি, এইকারণ সকলে মিলিয়া মিশিয়া তাঁহার সৎকার করে। সৎকারের দিন একটি সাধারণ পর্ব্ব বিশেষ। বোধ হয় অনেকদিনের অয়োজন ও বহুদূর হইতে লোকসমাগম আবশ্যক বলিয়া এই দীর্ঘসূত্রী সৎকারের বিধান হইয়াছে। প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে সৎকারের দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই হইতে পল্লীমধ্যে আমোদ প্রমোদের স্রোত বহিতে থাকে। এ স্থলে ইহার একটি মাত্র উল্লেখ করিব। কিন্তু মৃতব্যক্তির সম্মান এরূপ ভাবে রক্ষা করা উচিত কি ?

কামিনীর কোমল মুখের ন্যায় প্রলোভনীয় ও চিত্ত আকর্ষণী বস্তু বোধ হয় জগতে আর নাই, যেস্থানে ইহাদের ছায়াপাত হয় না, সেস্থানে যেন সকলই ফাঁকা। ফুটন্তকুসুম বিনা যেমন বাগানের বাহার হয় না, আজি কালির নবীন সভ্যতা, নবীনা কামিনী ভামিনীর সমাগম বিহনে প্রমোদ উদ্যানের শোভা সংর্দ্ধন হয় না। প্রেমের ছবি অঙ্কিত করিতে হইলে অগ্রে কামিনীর ফুটন্ত হাসিমাখা মুখখানা মনে পড়ে। যে দেশে ধর্ম্মের এত কঠোর অনুশাসন ছিল, সেই দেশে আজ মৃত ব্যক্তির সৎকারের সময়েও সেই কামিনী ভামিনী লইয়া আমোদ আহ্লাদ হয়, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মের অধঃপতন ও শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে ? সৎকার উৎসবে বা ব্যসনে আমোদ যেন ভালরূপে জমাট বান্ধে, এই অভিপ্রায়ে ষোড়শী দলের প্রধানা ১৬ জন যুবতীকে অগ্রে নৃত্য গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা বয়সে যেমন নবীনা, সৌন্দর্য্যেরও নিখুঁত জীবন্ত ছবি। মানব চক্ষুর এমনি দোষ যে, সর্ব্বদা রূপ দেখিতে ভাল বাসে, সুতরাং এ হেন অপ্সরীদিগকেও শোভা বর্দ্ধনের নিমিত্ত কৃত্রিম বেশভূষায় সজ্জিত ও অঙ্গরাগ করিতে হয়। এই অভিনেত্রী দিগের সাহায্যার্থ সমসংখ্যক যুবককে দোসর দেওয়া হয়। ইহারাও সুশ্রী ও সুপুরুষ, এবং প্রেমকুঞ্জের উপযুক্ত হরবোলা শুকপাখী। নট নটীর সাজ সজ্জার পারিপাট্য দর্শনে চক্ষে চমক লাগে। এই সজ্জিত যুবক যুবতীগণ চারি চারি জনে

দল বান্ধে। ইহারা সৎকারের পূর্ব্বরজনী পর্য্যন্ত পল্লীমধ্যে নাচিয়া গাইয়া বেড়ায়, পরদিন প্রত্যুষে সকলে শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, সৎকারের স্থান একটি বিস্তৃত ময়দান। নির্দ্দিষ্ট দিনে, প্রাতঃসূর্য্যকে মস্তকে করিয়া চারিদিক হইতে জনস্রোত বহিতে থাকে। এই সময় কাহার চক্ষে অশ্রুধারা, কাহার মুখে হাসির ফোয়ারা। বাস্তবিক দৃশ্যটি যেরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও পবিত্রভাব-উদ্দীপক, তেমনি আবার চিত্তরঞ্জনকারী ;—যুবজনের হৃদয় আকর্ষণী মহাশক্তি রসরঙ্গময়ী নবীনার দল ললিতকণ্ঠে দর্শকবৃন্দের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া শ্মশানক্ষেত্রের পবিত্রতা বিনষ্ট করিতেছে। এই দৃশ্যটি দেখিলে বোধ হয় যেন, ভবের মাঠে ভবের হাট বসিয়াছে, বহুসহস্র নরনারী একত্র সম্মিলিত হইয়া যেন হাসি, কান্না, রঙ, তামাসা প্রভৃতি জীবন-নাটকের নানারূপ বিসদৃশ অভিনয় করিতেছে। বাহক, এক সজ্জিত চতুশ্চক্র গো-যান-পরি শবপেটিক তুলিয়া দেয়। সঙ্গে যাত্রীদল চলিতে থাকে। পেটিক নির্দ্দিষ্টস্থানে আনীত হইলে, উহার দুই দিকে রজ্জু সংযুক্ত করা হয়। এই সময় দুই দিক হইতে যমদূত ও দেবদূত সাজিয়া দুই দল রজ্জু ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করে। ঐশীশক্তিতে বলীয়ান্ দেবদূতের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য যমকিঙ্করগণ আঁটিয়া উঠিবে কিরূপে? তাহারা পরাজিত হইয়া চলিয়া আসে। এই মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে দেব-দূতের আকর্ষণে শবপেটিক নীত হইলে, চারিদিক হইতে "ধূম" * মুখ নিঃসৃত অগ্নি আসিয়াবন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত সপেটিক শবদেহটিকে অনতিকাল মধ্যে শ্মশানানলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। একটি আশৈশব অভ্যস্ত ধর্ম্মজীবনের শেষঅঙ্ক জগতে পবিত্র আদর্শ রাখিয়া এই ভাবে অভিনীত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী বাস্তবিকই শিক্ষাপ্রদ; পৃথিবীর নশ্বরতা প্রতিপাদন করিবার উপযুক্ত সামগ্রী। (ক্রমশঃ।)

শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

* ধূম কামানের আকারে কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে বারুদ ভরা থাকে। চারিদিকে ছোট, বড় অনেকগুলি মুখ রাখা হয়। এই ধূম-মুখে অগ্নি সংযোগ করিলে প্রথমতঃ ইহা উর্দ্ধদিকে দৌড়িয়া যায় পরে নামিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূমমুখে অগ্নি প্রদান করিয়া সকলের একস্থ বসে অনতিকাল মধ্যে ভস্মীভূত হয়।

আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ।

(৫)

দয়ানন্দ হিন্দু সংস্কারক কি না ?

বুঝিলাম যে, দয়ানন্দ সংস্কারক, এখন বুঝিতে হইবে দয়ানন্দ হিন্দু সংস্কারক কি না ? হিন্দু সংস্কারকের একটি লক্ষণ শাস্ত্রাপেক্ষিতা, অপরটি সন্ন্যাস। অতএব দেখা যাউক, দয়ানন্দের চরিত্রে শাস্ত্রাপেক্ষিতা এবং সন্ন্যাস এই দুই ই ছিল কি না ?

ইতঃপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে না হইলেও, মোটামুটি বলিয়া আসিয়াছি যে, হিন্দুর নিকটে শাস্ত্রাপেক্ষিতা আর বেদাপেক্ষিতা একই কথা। শাস্ত্রাপেক্ষিতা আর বেদাপেক্ষিতা যদি একই কথা হইল, তাহা হইলে এইক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দয়ানন্দ কি সত্য সত্যই শাস্ত্রাপেক্ষী ছিলেন ? তিনি কি শাস্ত্রাপেক্ষিতার নিশান স্কন্ধে লইয়াই হিন্দুর সমাজ এবং ধর্ম্ম সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে, ব্যাসাদি মহর্ষিদিগের পর দয়ানন্দের মত শাস্ত্রাপেক্ষী বা বেদাপেক্ষী আচার্য্য ভারতক্ষেত্রে, বোধ হয়, আর কেহই অভ্যুদিত হয়েন নাই। একটু পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, দয়ানন্দের সমগ্র জীবনের সমস্ত কার্য্যই বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন মাত্র। কিন্তু এইক্ষণে বলিব যে, দয়ানন্দের সমগ্র জীবনের সমস্ত কার্য্যই বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুশাসন মাত্র। তিনি এই বেদবিচ্যুত ভারতভূমিতে বেদের অনুশাসন স্থাপনার জন্যই যেন আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—তিনি এই বেদবিস্মৃত আর্য্যজাতিকে পুনরায় বৈদিক অনুশাসনে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়েই যেন আগমন করিয়াছিলেন। এই হেতু তাঁহার ভাষ্য, ভাষণ, ব্যাখ্যা, বিচার, বাদ-প্রতিবাদ সমস্তই বৈদিক অনুশাসনে নিয়মিত,—তাঁহার সংস্কার সম্বন্ধিনী সমস্ত প্রণালীও বৈদিক অনুশাসনেই পরিচালিত। সুতরাং দয়ানন্দের খণ্ডনেও বেদ, মণ্ডনেও বেদ, তাঁহার আক্রমণেও বেদ, সমর্থনেও বেদ। বেদানুকূল যাহা কিছু তাহাই দয়ানন্দের নিকটে গ্রাহ্য, আর বেদপ্রতিকূল যাহা কিছু, তাহাই তাঁহার নিকটে অগ্রাহ্য। মূর্ত্তিপূজা সহজ বুদ্ধি বা সাধারণ যুক্তির একান্ত বিরোধী বলিয়াই যে, দয়ানন্দ উহার প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিতেন,—এমত নহে। অধিকন্তু মূর্ত্তিপূজা বেদ-প্রতিকূল বলিয়াই তিনি উহার প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ করিতেন। যখন যেখানেই মূর্ত্তিপূজার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তখন সেখানেই তিনি মূর্ত্তিপূজার সমর্থকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, চারি বেদের কোন স্থলে মূর্ত্তিপূজার প্রসঙ্গ আছে কি না ? * কাশীস্থ

* দয়ানন্দ একবার পুনায় তৎকথিত আত্মবিবরণের এক স্থানে বলিয়াছেন,—

সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সেই মহা-বিচারের দিনে (১৮৬৯ খৃঃ ১৬ই নবেম্বর) দয়ানন্দের কেবল এই একই পক্ষ ছিল যে, বেদের কোন সূক্তে বা কোন মন্ত্রে মূর্ত্তি-পূজার প্রতিপাদন করা হইয়াছে কি না? ফলতঃ মূর্ত্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই তিনি মূর্ত্তিপূজার মূলোচ্ছেদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নিয়োগ-প্রথা বেদানুমোদিত বলিয়াই, সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও, তিনি উহার সমর্থন করিয়াছিলেন। জন্মান্তরবাদ বেদে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি উহার প্রচার করিয়াছিলেন; এবং সমুদ্র যাত্রার প্রথা বেদ প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়াই, তিনি উহার বৈধতা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রাপেক্ষিতার কি অশ্রুতপূর্ব্ব নিদর্শন! বেদাপেক্ষিতার কি অপূর্ব্ব উদাহরণ! ইহাকে বেদাপেক্ষিতা না বলিয়া বেদপরতন্ত্রতা বলাই যুক্তিযুক্ত।

আজমীর নগরের একটি প্রকোষ্ঠে দয়ানন্দ যখন [১৮৮৩ খৃঃ অব্দে] মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাঁহার চতুর্দ্দিকে যখন নানা স্থানাগত সেবক এবং সুহৃদ্ মণ্ডলী শোকার্ত্তচিত্তে অবস্থিত, হৃদয়ের শেষ স্পন্দনের প্রতীক্ষায় যখন দয়ানন্দ সমাহিত, এবং ইহলোকের পৃষ্ঠে একপদ স্থাপন করিয়া পরলোকের পৃষ্ঠে আর পদ স্থাপন করিবার জন্য দয়ানন্দ যখন উদ্যত, তখন কএক জন সহচর তাঁহার নিকট আসিয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"আপনার শব মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি সন্ন্যাসী আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।"* তাহা শুনিয়া দয়ানন্দ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"তাহা যেন না হয়। মৃত শরীর প্রোথিত করা বিধেয় নহে, যেহেতু বেদে কথিত হইয়াছে,—'বায়ুরনিলমমৃত মথেদং ভস্মান্তং শরীরং।' অতএব তোমরা আমার শরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।" যিনি নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও বেদ-মহিমা বিঘোষিত করেন, করাল মৃত্যুগ্রাসে গ্রাসিত-প্রায় হইয়াও যিনি শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলেন, এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবার জন্য যিনি পূর্ব্ব হইতেই উপদিষ্ট করিয়া থাকেন, † তাঁহার

"and whenever I go there I require all the Pundits of the place by public notice to point out to me whether they have found out any authority in the Vedas for idolworship." The Arya Patrika 1886, May 18 Page 4.

* আধুনিক রীতি অনুসারে সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ, হয় নদীপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত, না হয় মৃত্তিকার গর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। দয়ানন্দ সন্ন্যাসীকুলের সম্রাট্ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মৃত দেহের সৎকারে পুণ্য এবং গৌরব দুই-ই আছে বিবেচনা করিয়া কতকগুলি সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

† তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যে বেদবিহিত প্রণালী অনুসারেই সম্পন্ন করিতে হইবে, এই অভিমতি দয়ানন্দ পূর্ব্ব হইতেই পরোপ-

মত শাস্ত্রাপেক্ষা বা বেদবিশ্বাসী আচার্য্য ভারতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? দয়ানন্দ! ধন্য, তোমার বেদবিশ্বাস। তুমি মথুরাধামে জ্ঞানবৃদ্ধ বিরজানন্দের হস্ত হইতে সেই যে বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়পতাকা গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলে, আশ্চর্য্যের বিষয়,—এক দিনের জন্যও সে পতাকা পরিত্যাগ করিলে না,—এমন কি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও রোগজীর্ণ স্কন্ধে এবং কম্পান্বিত হস্তে সেই পতাকা ধরিয়া থাকিয়া ভারতে বেদপ্রাণতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলে! সুতরাং তোমার বেদাপেক্ষিতা অলৌকিক।

অতঃপর সন্ন্যাস। দয়ানন্দ যখন নিজেই সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাস-মার্গে সুদৃঢ় থাকিয়াই যখন তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত, তখন তাঁহার সন্ন্যাসের কথা লইয়া বিশেষ আলোচনা আর কি করা যাইবে? তবে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের যাজনায়,—সত্যে তন্নিষ্ঠা প্রাপ্তির সাধনায় তিনি যে কঠোরতা, যে নিঃস্পৃহতা এবং যে নিরভিমানিভাব নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা যখন স্মৃতি-পথে জাগরূক হয়, তখন হৃদয় এতই বিলোড়িত হইয়া উঠে যে, তৎসম্পর্কে দুই এক কথা না বলিয়া নিরস্ত থাকা যায় না।

দয়ানন্দের কঠোরতা বস্তুতই বিস্ময়জনক। তিনি দুরন্ত শীতে বা দুরন্ত গ্রীষ্মে কখনই দৃক্‌পাত করিতেন না। যে শীতে মানুষ থরহরি কম্পান্বিত হয়, তিনি সেই শীতের রাত্রিকালে গঙ্গার উন্মুক্ত তটে খড় জড়াইয়া পড়িয়া রহিতেন। যে গ্রীষ্মে লোকে গলদঘর্ম্মদেহ হইয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে থাকে, সেই গ্রীষ্মে তিনি প্রান্তরের মধ্যে একখানা ইটে না হয় একখানা পাথরে মাথা রাখিয়া স্বচ্ছন্দে শুইয়া রহিতেন। তাঁহার প্রথমাবস্থায় তিনি যে এইরূপ কতই কঠোরতা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। ফলতঃ অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য দয়ানন্দের শরীরকে এতই বলশালী এবং এতই ক্লেশসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল যে, কি শীতাতপে, বাত্যাবৃষ্টিতে, কি অনাহারে কি অল্পাহারে, কি পথক্লেশে, কি পর্য্যটন-ক্লেশে কিছুতেই তিনি কাতর বা বিচলিত হইয়া পড়িতেন না। কি প্রকৃতির উপদ্রব, কি সমাজের উপদ্রব, কোন উপদ্রবই তাঁহাকে সন্ন্যাস-নীতির বাহিরে লইয়া যাইতে পারিত না।

সন্ন্যাসী দয়ানন্দ যেমন মানে নিস্পৃহ, তেমনই ধনেও নিস্পৃহ। তাঁহার মানাভিমান সম্পর্কীয় নিস্পৃহতার কথা ইতঃপূর্ব্বে আত্মবিলোপের প্রসঙ্গে কথঞ্চিৎ বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং উপস্থিত স্থলে সে সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিয়া, এই মাত্রই বলিতে ইচ্ছা করি যে, দয়ানন্দের তুল্য একজন সন্ন্যাসী, লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে দুর্লভ হইলেও,—কিংবা তিনি সন্ন্যাসীকুলের শিরো-

কারিণী সভার স্বীকারপত্রে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়া যান। পরোপকারিণী সভার স্বীকারপত্র তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে উদয়পুরে দয়ানন্দ কর্ত্তৃকই লিখিত হইয়াছিল।

ভূষণরূপে পরিগণিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও, বিস্ময়ের কথা এই যে, তিনি কথনও আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যথনই কোন ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে বিগলিতচিত্ত হইয়া, অথবা তাঁহাতে অলৌকিক শক্তির সমাবেশ দর্শনে বিমোহিতচিত্ত হইয়া গিয়া, তাঁহাকে আপনার "গুরু" এবং আপনাকে তাঁহার "শিষ্য" বলিয়া অভিহিত করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন; তথনই তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"আমি কাহারও গুরু নহি। মানুষের গুরু পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না।" তাঁহার শিষ্যত্বাভিলাষী কত ব্যক্তিকেই যে তিনি এইরূপে প্রত্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। যদিও এতদ্দেশীয় রীতি অনুসারে সাধু সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বত্রই গুরুস্থানীয়, এবং সেই জন্য তাঁহারা সকলেরই প্রণম্য; তাহা হইলেও দয়ানন্দ এই রীতিকে সন্ন্যাসরীতির প্রতিকূল বই অনুকূল মনে করিতেন না। কেন না, পাছে অভিমানের কোনও একটু মদিরা স্পর্শে, তাঁহার সন্ন্যাসব্রত কলুষিত হইয়া যায়, এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা ভীত এবং সতর্ক থাকিতেন।

যদি অপক্ষপাত বিচারেই, বিচার-নীতির আদর্শ রক্ষিত হয়, এবং অপক্ষপাত বিচারেই বিচারিত বস্তুর যথার্থ তথ্য নিষ্কাসিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অপক্ষপাতিতার নাম লইয়াই ভারতবাসি! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। ইহা কি ঠিক নয় যে, দয়ানন্দের যশোদুন্দুভি সমগ্র ভারতে বাজিয়া উঠিয়াছিল? তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা দর্শনে সকলেই বিমোহিত হইয়া গিয়াছিল; এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিকটে আর্য্যাবর্ত্ত আপনার মস্তক অবনত করিয়াছিল? যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে তিনি কি চেষ্টা করিলে, সমস্ত না হইলেও, অন্ততঃ ভারতের অধিকাংশ রাজা মহারাজাকেই আপনার মন্ত্রশিষ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না? এবং সেই সূত্রে সহস্র সহস্র মুদ্রার অধীশ্বর হইয়া দুই দশটা মঠ বা মন্দির স্থাপনাপূর্ব্বক অপরাপর সন্ন্যাসীদিগের মত স্বর্ণরঞ্জিত সুচারু পর্য্যঙ্কে শয়ন উপবেশনাদি করিয়া সংসারের সকল প্রকার সুখই উপভোগ করিতে পারিতেন না? কিন্তু তিনি কি তাহা করিয়াছিলেন? তাঁহার সংস্কারকজীবনের প্রথম অবস্থার কথা যথন চিন্তা করি, তিনি যে সময়ে কেবল অঙ্গুষ্ঠাঙ্গ-ভূমি আশ্রয় করিয়াই বিচরণ করিতেন, সেই সময়ের বিবরণ যথন পাঠ করি; তথন দেখিতে পাই যে, তাঁহার সঙ্গে তথন একটি বই দুইটি কৌপীন থাকিত না। দ্বিতীয় কৌপীনের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন,—"আর একটি কৌপীন লইয়া কোথায় রাখিব?" এই দিগম্বর অবস্থার পরে দয়ানন্দের কার্য্যক্ষেত্র যথন ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল, নানা সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গেই যথন তাঁহাকে মিলিতে মিশিতে হইল, বেদভাষ্য-প্রচার বৈদিক যন্ত্রালয় স্থাপন এবং

আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপারে যখন তাঁহাকে ক্রমেই লিপ্ত হইতে হইল, তখন যদিও তিনি কৌপীন ছাড়িয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিলেন, এবং কতকটা অর্থসংগ্রহেও সম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি কি নিজের ভোগসুখে বা দেহের কোনরূপ পারিপাট্যে কখন এক কপর্দ্দও ব্যয় করিয়াছিলেন? উদয়পুর হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়ে মহারাণা সজ্জন সিংহ যখন অর্থাদি প্রচুর উপহার উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার সৎকার করিলেন, তখন তিনি ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সেই উপহৃত অর্থরাশি পরোপকারিণী সভার ভাণ্ডারে পাঠাইয়া দিলেন। তাই জিজ্ঞাসা করি যে, সত্যের সেবা এবং সত্যের প্রচার ভিন্ন—সর্ব্বতোভাবে সন্ন্যাসধর্ম্মের যাজনা ভিন্ন দয়ানন্দ সরস্বতী স্বীয় জীবনে কি আর কিছু করিয়াছিলেন? সুতরাং দয়ানন্দের সন্ন্যাস যেমন সন্ন্যাস নামকে সার্থক করিতেছে, তেমনই সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, দয়ানন্দ সংস্কারক এবং হিন্দু সংস্কারক দুই-ই।

দয়ানন্দ আদর্শ সংস্কারক কি না?

হিন্দু সংস্কারক দয়ানন্দ, হিন্দুজাতির আদর্শ সংস্কারক কি না? এইক্ষণে তাহার বিচার করিতে হইবে। আদর্শ সংস্কারক কথাটা কি? তাহা একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক।

হিন্দুর অতীত ইতিহাসে যে সকল আচার্য্য বা মহাপুরুষ সংস্কারক নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নানা কারণে শঙ্করস্বামীই শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় বলিয়াই কি শঙ্করাচার্য্য আদর্শ সংস্কারক? একাঙ্গীন সংস্কারকেরা কি কখন আদর্শ সংস্কারক হইতে পারেন? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধদিগের প্রতাপে যখন ভারতের চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতেছিল, বেদ বা বেদান্ত ধর্ম্ম যখন বৌদ্ধরূপ রাহুকবলে অল্পে অল্পে কবলিত হইয়া পড়িতেছিল, তখন শঙ্করাচার্য্য অভ্যুদিত হইয়া আপনার অসাধারণ প্রতিভা এবং তর্কশক্তির প্রভাবে কতক পরিমাণে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়াই তিনি আদর্শ সংস্কারক হইতে পারেন না। আমি জানিতে চাহি যে, যে উপায়ে বিকৃত সমাজপ্রকৃতিস্থ হইবে, যে উপায়ে হিন্দুর শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হইবে, যে উপায়ে এই বিচ্ছিন্ন ও বিভক্তীকৃত জাতি একতার সূত্রে সংবদ্ধ হইবে, তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্য কি কিছু করিয়া গিয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা করি যে, যাহাতে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সুব্যবস্থিত হয়, যাহাতে হিন্দুর শিল্প উন্নত, —বাণিজ্য প্রসারিত হয়, যাহাতে হিন্দুর স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়,—এক কথায় যাহাতে হিন্দু সকল অংশে দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়া উঠিয়া জগতের সমক্ষে আবার বিস্ফারিত বক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়, তজ্জন্যই বা শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়া গিয়াছেন? কেবল—

নলিনীদলগত জলমতিতরলং।
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং ॥

বলিয়া কখন কোন জাতি উঠিতে পারে না। কেবল "অদ্বৈতবাদ," অদ্বৈতবাদ" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেও কোন মৃত জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয় না। আমি বলি, সে চিকিৎসা, চিকিৎসাই নয়—যে চিকিৎসায় চিকিৎসিত ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ এবং সবল হইয়া না উঠে। সেইরূপ আমি বলি সে সংস্কার সংস্কার নামের উপযুক্তই নয়—যে সংস্কারে সংস্করণীয় জাতি বা সমাজ সর্ব্বাবয়বে উন্নত এবং পরিপুষ্ট হইয়া না উঠে।

দয়ানন্দ হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক। যেহেতু দয়ানন্দ হিন্দুর একাঙ্গীন সংস্কারক নহেন—সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কারক। পাঠক! এই কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখিয়া চলিবেন যে, দয়ানন্দ সরস্বতী কেবল ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কারক নহেন। কিংবা তিনি কেবল আমাদিগের শাস্ত্রশোধকও নহেন। দয়ানন্দ ভারতের প্রদেশবিশেষের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হয়েন নাই,—তিনি হিন্দুর শাখাবিশেষের কল্যাণের জন্যই আগমন করেন নাই, অথবা তিনি হিন্দু-জীবনের অঙ্গবিশেষ লইয়াই আলোচনা করিয়া যান নাই। পক্ষান্তরে তিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকেই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন,—সমগ্র আর্য্যজাতির হিত চিন্তনেই প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন,—এবং আর্য্য জীবনের আদ্যোপান্তেই আপনার দৃষ্টি নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দয়ানন্দের সংস্কার-প্রণালী একটু নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, কি সমগ্রগ্রাহিতাসহকারে সেই সন্ন্যাসী পুরুষ ভারতের সংস্কার-ব্রতে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমাদিগের বহু-যুগ-সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি কিরূপে বিদূরিত হইবে, আমাদিগের নির্জ্জীব সমাজ কিরূপে সজীব হইয়া দাঁড়াইবে,—ভারতের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, এবং এই মতবিচ্ছিন্ন ও শাস্ত্রবিচ্ছিন্ন দেশে একতার শক্তি কিরূপে সঞ্চারিত হইবে, ইত্যাদি বিষয় দয়ানন্দ যেমন তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তেমনই কি উপায়ে হিন্দুর শিল্প রক্ষিত হইবে,—বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবে, কি উপায়ে ভারতের অর্থ ভারতেই থাকিয়া যাইবে, এবং কি উপায় অবলম্বিত হইলে, ভারতের গবাদি জন্তু সকল রক্ষিত ও কৃষির অবস্থা উন্নত হইবে, তৎসম্পর্কেও তিনি সবিশেষ চিন্তা এবং চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দয়ানন্দের যেমন ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, বেদানুশাসন না মানিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না,—বর্ণাশ্রম রক্ষা করিয়া না চলিলে হিন্দুপ্রকৃতির স্ফূরণ হইবে না; তেমনই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের গোধন সকল রক্ষিত না হইলে, হিন্দু কোনরূপেই হিন্দু হইয়া থাকিতে পারিবে না। বলাবাহুল্য যে, এই জন্যই তিনি গো রক্ষার আন্দোলন উত্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।* হিন্দুর জাতীয় শিল্প রক্ষার জন্যও

* স্বামী দয়ানন্দ কেবল গো রক্ষার আ-

তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি এ সম্পর্কে স্বদেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি যখন দেখিতেন যে, ভারতভূমির শিল্পিগণ ঘোরতর দুর্দ্দশায় দিনপাত করিতেছে, ভারতের শিল্পজাত সামগ্রী দিন দিনই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং অপর দিকে বিদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উপর্য্যুপরি আবির্ভাবে, হিন্দুর গৃহে গৃহে বিদেশীয় সামগ্রীসমূহই সজ্জিত ও আদৃত হইয়া উঠিতেছে, তখনই সেই, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীপুরুষ কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইতে পারিতেন না; অধিকন্তু তিনি তজ্জন্য শোকাহত ব্যক্তির ন্যায় সাতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিতেন।*

দয়ানন্দ কেবল হিন্দুর স্থূলতত্ত্বের কথাই আলোচিত করিয়া যান নাই। তিনি হিন্দুর সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহেরও পর্য্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু কি ভাবে পুত্রোৎপাদন করিবেন, গর্ভস্থ পুত্রকে কি ভাবে রক্ষা করিবেন,—প্রসূত হইলে পর পুত্রের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন—এক কথায় হিন্দু প্রসূতি-গৃহ হইতে শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত কি ভাবে চলিবেন,—কি প্রণালীতে বাল্য, কৈশোর, যৌবনাদি কাল অতিবাহিত করিবেন, এবং কি প্রণালীতে জীবন অতিবাহিত করিলে, জীবনের প্রকৃত আদর্শে উপনীত হইয়া—সত্ত্বের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভে সমর্থ হইয়া অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে গমন করিতে পারিবেন, ইত্যাদি তত্ত্বও তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দুর উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনই জাতিগত এবং সমাজগত ভাবেও হিন্দুকে উন্নমিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ফলতঃ তিনি, কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, সম্পদ্, দেহ, মন,

---

ন্দোলন তুলিয়া যান নাই। যাহাতে সেই আন্দোলন স্থায়ি হইয়া কার্য্যতঃ কিছু করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি গো-কৃষ্যাদিরক্ষিণী নাম্নী এক সভার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার গো-করুণানিধি পুস্তিকা পঠিতব্য।

* কলিকাতা ছোট আদালতের অন্যতম ও ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বামিজীর প্রসঙ্গে লেখকের নিকট একবার বলেন যে, তিনি এলাহাবাদের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে একটি সভায় একদিন আহূত হইয়াছিলেন। সেই সভা দয়ানন্দের উপলক্ষেই হইয়াছিল। সেই সভায় দয়ানন্দ আর্য্যশিল্পের অধোগতি বিষয়ে অনেক কথা বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, আক্ষেপ প্রকাশ করিবার সময় স্বামিজীর মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন, তিনি জাতীয় শিল্পের অবনতির জন্য মর্ম্মান্তিক ক্লেশ বোধ করিতেছেন।

আত্মা প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে —সমগ্র ভাবে হিন্দুর উন্নতি ও উদ্ধারের নিমিত্ত আপনার সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত সাধনা উৎসর্গীকৃত করিয়া স্বীয় জীবনে সংস্কারকের আদর্শত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, —বলিতে কি ভারতের কোন আচার্য্য,—কোন সংস্কারকই,—অথবা কোন হিতৈষীই দয়ানন্দের মত সূক্ষ্মভাবে সমগ্র ভাবে ও সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে আমাদিগের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিয়া যান নাই, সুতরাং দয়ানন্দ সরস্বতীই যে হিন্দুর আদার্শ সংস্কারক, তাহাই এখন প্রতিপন্ন হইল।

বর্ত্তমান কাল গ্রহণ করুক, আর না ই করুক, সকলে স্বীকার করুন বা না ই করুন, কিন্তু এমত সময় সমাগত হইবে, যখন পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানোন্নত জাতিই এই মহাপুরুষকে মনুষ্যের প্রকৃত পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিবাদন করিবেন। এমত সময় নিশ্চয়ই আসিবে, যখন এই উদীচ্য ব্রাহ্মণ-সন্তানের শিক্ষা এবং উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিলেই মানব জীবনের সার্থকতা সাধিত হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিবেন।

উপসংহার।

কিন্তু সে ত বহু কালের কথা,—সে ত সুদূর ভবিষ্যতের কথা,—সে ত সমস্ত মনুষ্য জাতি লইয়াই কথা। সুতরাং, সে কথার আলোচনায় আমাদিগের এখন বিশেষ লাভ নাই। আমরা এখন চাই উঠিতে,—আমরা এখন চাই জাগরিত হইয়া দাঁড়াইতে,—আমরা এখন চাই মনুষ্যের মত মনুষ্যালোকে বিচরণ করিতে। দেখ জগতের ইতিহাস হইতে আজিও হিন্দুনাম বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। দেখ শত সহস্র বৎসরের ঝঞ্ঝাবাতেও হিন্দু আপনার অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই। হিন্দু পাঠানের শাসনে নিষ্পেষিত হইয়াছেন, হিন্দু মোগলের অধীন হইয়া শত শত বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং হিন্দু এখন ইংরাজের সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু হিন্দু হিন্দুই আছেন। ইংরাজ যে জাতির মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জাতিকেই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন—অন্ততঃ তুলিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। ইংরাজ হংকঙ্গে যাইয়া হংকঙ্গের অধিবাসিদিগের সহিত মিশিয়া এমত এক অভিনব জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, —যাহারা হংকঙ্গের অধিবাসীও নহে এবং ইংরাজও নহে। ইংরাজ নবাধিকৃত ব্রহ্মদেশের অধিবাসিবর্গের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এমত একটি অপূর্ব্ব জাতির সঞ্চার করিতেছেন,—যাহারা ব্রহ্মবাসী বলিয়া গণ্য হইবে না এবং ইংরাজ বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারিবে না। কিন্তু ইংরাজের এই জাতিবিপর্য্যয়ের চেষ্টা ভারতে সর্ব্বতোভাবেই ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজ এতদ্দেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, পাঠান মোগলের অপেক্ষাও ইংরাজ দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছেন, এমন কি ইংরাজ আপনার শিক্ষা, সংস্কার ও সভ্যতামন্ত্রে হিন্দুসন্তানকে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে শত শত

স্কুল কলেজের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইংরাজ হিন্দুর বিপর্য্যায়সাধন করিতে পারেন নাই, অথবা হিন্দুকে সর্ব্বতোভাবে অহিন্দু করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়েন নাই। আজিও দেখ হিন্দু বেদ-বিধি মানিয়া চলিতেছেন—আজিও দেখ হিন্দু মন্বাদি মহাজনের পন্থানুসরণ করিতেছেন—আজিও দেখ ভাগীরথীর উভয় তটে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, সহস্র সহস্র হিন্দু, বুঝিয়া হউক আর না বুঝিয়াই হউক, শ্রদ্ধার সঙ্গে হউক আর অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হউক, সেই সর্ব্বার্থ-সাধিনী গরীয়সী গায়ত্রীর আরাধনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করিতেছেন। তবে কে বলে হিন্দুর বিলোপ ঘটিবে? কে বলে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ হইবে? রুগ্ন হিন্দু! তুমি নিরাশ হইও না। বিপন্ন হিন্দু! তুমি আর অশ্রুপাত করিও না। বিকৃত হিন্দু! তুমি আর আক্ষেপ করিও না। ঐ দেখ অমারাত্রির অবসান হইতেছে। ঐ দেখ তিমিরাবৃত আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে আর্য-জ্ঞানের আলোক-রেখা সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ সেই আলোকসঞ্চারে ভারতের ইতস্ততঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। আর ঐ দেখ সেই আলোকের সঙ্গে সঙ্গে গুজরাট প্রদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ পতাকা হস্তে আগমন করিতেছেন। সুতরাং তুমি উত্থান কর। সেই পুরাতন পরব্রহ্মের নাম উচ্চারণ কর, এবং সেই আলোকের সাহায্যে পথ দেখিয়া লইয়া তোমার আলয়ের অভিমুখে তুমি গমন কর।

শ্রীদেঃ———

সমাপ্ত।

মোগলের অধঃপতন।

যে সময়, ভারতবর্ষ এই ভাবে হিন্দু মোসলমানের সংঘর্ষণে আলোড়িত হইতেছিল, তখন নাদিরশাহ বিপুলবাহিনী সমভিব্যাহারে কালান্তক যমের ন্যায় পঞ্চনদ ভূমির দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। নাদির-শাহ্ পারস্যের অন্তর্গত খোরসান প্রদেশে জন্মপরিগ্রহ করেন। তিনি শৈশবকালেই পিতৃহীন হন; এবং তদীয় পিতৃব্য সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি উজবেগের হস্তে বন্দী হন; এবং চারি বৎসরকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া কৌশলক্রমে পরিত্রাণ লাভ করেন। অতঃপর তিনি কতিপয় বৎসর দস্যুবৃত্তিতে অতিবাহিত করিয়া প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। এই সময়, পারস্যের অধিপতি শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। প্রথম জীবনে নাদিরের হৃদয়ে স্ব-

দেশ-প্রেমের অভাব ছিল না। তাঁহার যত্ন ও রণকৌশলে রাজ্যভ্রষ্ট পারস্য অধিপতি পুনর্ব্বার পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। এ পর্য্যন্ত নাদিরশাহের কার্য্যকলাপ স্বদেশ-প্রেমের অনুগত ছিল। কিন্তু ইহার পর সৈন্যবৃন্দের গভীর অনুরাগ ও ভাগ্যলক্ষ্মীর অচিন্ত্য কৃপা তাঁহার চিত্তবিকার জন্মাইয়া দেয়; এবং তিনি পারস্যের অধিপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করেন। রাজপদ গ্রহণের পর পররাজ্য লুণ্ঠন ও নরনারীর রক্তে পৃথিবীরঞ্জনই তাঁহার জীবনের সারব্রত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের প্রারম্ভে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত কাবুল ও কান্দাহার অভিমুখে আপন অধিকার বিস্তার করেন। এই সকল স্থান সহজে বিজিত হওয়াতে নাদিরশাহের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। তিনি ভারত-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দিল্লীর অপরিমিত ধনরত্ন অপহরণ করিবার জন্য সসৈন্যে পঞ্চনদ ভূমিতে আগমন করিলেন; এবং লাহোর বিধ্বস্ত করিয়া রাজধানী অভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।* তিনি দিল্লীর অদূরবর্ত্তী কারনালে পৌছিলে বাদশাহ মোহাম্মদশাহ সসৈন্যে আগমন করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মোহাম্মদ-শাহ পরাজিত হইলেন। অযোধ্যার শাসন-কর্ত্তা সাদত খাঁ বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম হইতেই নাদিরের সহিত তাঁহাব ষড়যন্ত্র ছিল। তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া রণক্ষেত্রে শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। অতঃপর বাদশাহ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দিল্লীর রাজশক্তি আত্মকলহে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য ভারত লুণ্ঠনকালে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হইবেন বলিয়া নাদির শাহের বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভাবী আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছিল; এমন সময় সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াতে তিনি যথাযুক্ত পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়াই সসৈন্যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সাদত খাঁ এ সর্ত্ত সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি নাদির শাহকে কিছু কাল প্রতীক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন; কিছুকাল প্রতীক্ষা করিলেই অধিকতর অনুকূলসর্ত্তে সন্ধিস্থাপন করা যাইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। সন্ধির প্রস্তাবে এক মাস অতিবাহিত হইল; তখন কৃপাভিখারী মোহাম্মদ শাহ বিজয়ী বীরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদনুসারে তিনি পাত্র মিত্র সহ শত্রু শিবিরে উপনীত হইলেন। নাদির শাহ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তা-

(১) Nadir Shah * * now marched in this direction with the design of Conquering Hindustan, and as some say at the suggestion of Nisam-ul-Mulk and Sadut khan. Tarik-i Hindi.

হার পর তিনি কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া বাদশাহকে তেজোহীনতার জন্য নিন্দা করিয়া বলিলেন, "আপনি যে কেবল মাত্র দক্ষিণ পথে বিধর্ম্মী অসভ্য হিন্দুদিগকেই কর প্রদান করিতেছেন, তাহা নহে, আপনার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণকারী (যেমন আমি) আগমন করিলেও আপনি ন্যায় যুদ্ধ না করিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন।" নাদির শাহ বাদশাহের জলযোগের জন্য আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া উজীরের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলেন। তিনি পরামর্শান্তে অভ্যর্থনা কক্ষে প্রতিগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বাদশাহ তদ্গতচিত্তে ভোজনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া জনৈক অনুচরকে বলিলেন, "যিনি এরূপ অবিচলিত চিত্তে আপনার ক্ষমতা ও স্বাধীনতার বিলোপ সহ্য করিতে পারেন, তাঁহার প্রকৃতি কেমন। বিপদের সম্মুখীন হইবার দ্বিবিধ পথ রহিয়াছে। ধৈর্য্য অবলম্বনে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, অথবা সাহস সহকারে কার্য্য করিতে হইবে; সংসারকে আজ্ঞা করিতে হইবে; অথবা উহাকে বশীভূত করিবার জন্য সমস্ত চিত্তবৃত্তির পরিচালনা করিতে হইবে। মোহাম্মদ প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমার শেষোক্ত পথই অবলম্বনীয়।" বন্দী বাদশাহের ভোজন শেষ হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তৈমুর বংশের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। আমার সমস্ত যুদ্ধব্যয় আপনাকে বহন করিতে হইবে। আমার সৈন্যের পক্ষে কএক দিন দিল্লীতে বিশ্রাম করা অবশ্যক।

অনন্তর নাদির শাহ বাদশাহকে সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে দিল্লী গমন করিলেন। লুণ্ঠনলোলুপ পারসিক সৈন্য নাদির শাহের কঠোর শাসনে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া রহিল। এজন্য প্রথমে কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইল না। কিন্তু তাঁহার সহরে প্রবেশের দ্বিতীয় দিবসে একজন কলহপ্রিয় পারসিক সৈন্য কপোতক্রয় ব্যপদেশে বিবাদের সূত্রপাত করিল। তাহার দুর্ব্ব্যবহারে দিল্লীবাসীরা উত্তেজিত হইয়া রাত্রিকালে পারসিক সৈন্যদিগকে সশস্ত্রভাবে আক্রমণ করিল। ইতি মধ্যে নাদিরশাহের মৃত্যুর অমূলক জনরব প্রচারিত হওয়াতে তাহাদের উত্তেজনা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাহাদের হস্তে পারসিক সৈন্য দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। নাদিরের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে রাত্রির জন্য কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বলিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দিল্লীবাসীরা তাঁহাকে দেখিয়াই শান্তভাব অবলম্বন করিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এজন্য তিনি রাত্রি প্রভাত মাত্র অশ্বারোহণে চাঁদনীর চকে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াও ক্রোধোন্মত্ত দিল্লীবাসীরা ভ্রুক্ষেপ করিল না। নাদিরশাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিপ্লব দমন জন্য মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন

সময় জনৈক দিল্লীবাসী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করিল। এই ঘটনায় তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; এবং তাহাতে অমিত ধনরত্নপূর্ণ বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি শোভিত দিল্লী ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাঁহার আদেশে পারসিক সৈন্য পৈশাচিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাল-বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে দিল্লীবাসীর হত্যার জন্য তরবারি কোষোন্মুক্ত করিল। নিহত নরনারীর রক্তস্রোতে রাজপথগুলি প্লাবিত হইল। পারসিক সৈন্য সুদৃশ্য প্রাসাদাবলী অগ্নি সংযোগে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করিল। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত তাহারা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। এই নয় ঘণ্টাব্যাপী হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য নর-নারী জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। * নাদিরশাহ রোসনদ্দৌলা নামক একটা লাল প্রস্তর নির্ম্মিত মসজিদের উপর বসিয়া এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার নির্ম্মম ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শনে ভয় পাইয়া কেহই সে স্থানে উপস্থিত হইয়া দিল্লীবাসীর প্রাণভিক্ষা করিতে সাহস করিল না। অবশেষে বাদশাহ প্রজাবৃন্দের করুণ ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং নাদিরশাহের নিকট গমন পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে অবনতমস্তকে ক্ষমা প্রার্থী হইলেন। ইহাতে নাদিরশাহের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল; তাঁহার আদেশে তাদৃশ সর্ব্বব্যাপি নরহত্যা ও গৃহ-দহন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভোজবাজির ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

শান্তি সংস্থাপিত হইলে, বিমর্ষচিত্ত নাদিরশাহ রাজ-প্রাসাদে প্রতিগমন করিয়া বিমর্ষচিত্ত সম্রাটকে সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহারা এক সঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া কাফি পান করিলেন। অতঃপর নাদিরশাহ মোহাম্মদের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। ফলতঃ দিল্লীর সম্রাট্ কিয়ৎকালের জন্যও আপনাকে পারস্যের করদ রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। বিজয়ী বীর পঞ্চনদ প্রদেশ ও কাবুল রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন; তাহার পর জগদ্বিখ্যাত কহিনূর ও ময়ূর সিংহাসন এবং রাজকোষের পুঞ্জীকৃত ধনরত্ন সমভিব্যাহারে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন। *

* কত লোক এই প্রলয় ব্যাপারে নিহত হইয়াছিল? কিন সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা এক লক্ষ বত্রিশ হাজার। ফ্রেসার সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মৃত্যু সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজারের ন্যূন ও দেড় লক্ষের অধিক ছিল না। তাবিবে-ই হিন্দির লেখক রস্তম আলীর মতে মৃত্যুর সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। বিয়ালি-ই ওয়াকি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সহর কোতওয়াল অনুসন্ধান অন্তে হত্যার সংখ্যা বিশ হাজার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নাদিরনামা গ্রন্থে ত্রিশ সহস্র নগরবাসী নিহত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

* নাদিরশাহ ভারতবর্ষ হইতে রত্নাদিসহ কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন? কিন সা-

নাদিরশাহের আক্রমণের কালে রাজকোষ কপর্দ্দক শূন্য এবং মোগল সাম্রাজ্য নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাজকিরা নামক ইতিহাস লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি এক মুহূর্ত্তে হস্তান্তরিত হয়। এই সময় রাজধানীর বহির্ভাগে বাদশাহের সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। * কাবুল হইতে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ নাদিরশাহ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। শিখগণ সরহিন্দ ও পঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লী ও আগ্রা প্রদেশের একাংশে রোহিলা আফগানগণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা প্রদেশে সাদত খাঁ বাদশাহের প্রতিনিধি ছিলেন; দিল্লীতে নাদিরশাহের অবস্থানকালে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা সফদার জঙ্গ সেখানে অখণ্ড প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতেছিলেন। মালব ও গুজরাট দিল্লীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। নিজাম ও মহারাষ্ট্রা সমগ্র দক্ষিণাপথ গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনকর্ত্তা নিয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার পর ক্ষমতালোলুপ আত্মপরায়ণ রাজপুরুষগণের তাণ্ডবে ও কলহে রাজকার্য্য রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ নাদিরশাহের আক্রমণের পরেই জগৎ প্রথিত মোগলসাম্রাজ্য অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পরেও দ্বাবিংশ বর্ষকাল মোগলসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু তাহা সে সাম্রাজ্যের কায়া নহে, ছায়া মাত্র।

নাদিরশাহের দিল্লী পরিত্যাগের পর মোহাম্মদশাহ আপদ্মুক্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব উদ্ধার জন্য যত্নশীল হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল শান্তিতে বাস করিতে পারিলেন না। আমেদশাহ আবেদালী বা দুরাণী নামক একজন আফগান

হেব লিখিয়াছেন যে, নাদিরশাহ সর্ব্বসাকল্যে আট কোটি পাউণ্ড লইয়া গিয়াছিলেন। রয়ানি-ওয়াকি নামক গ্রন্থে আশী কোটি টাকার উল্লেখ দেখা যায়। দশ টাকায় এক পাউণ্ড ধরিলে উভয়ের সংখ্যায় ঐক্য হইতে পারে। তাজকিরা নামক ইতিহাস রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, একমাত্র মণি মুক্তাতেই পঞ্চাশ কোটি টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

* The Government of the country went so completely out of the grasp of his will that the Fauzders of every *sarkar* and *chackla*, and the Subadar of every city and prince who possessed the strong arm of a military force, refused to pay the revenue. Janhar-i Sam sani of Muhammed Muslim Siddiki.

As the Royal Treasury became gradually emptied the emperor's army was reduced to great straits, and atlast entirely broken up. Whilst the nobles of the land * * * amassed large sum of money, a tweentieth portion of which they did not give

প্রথমতঃ নাদিরশাহের চোপদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপায় কোন ক্রমে কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। নাদিরশাহের মৃত্যুর পর সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে রাজকোষ হইতে তিন শত উষ্ট্রের বহনোপযোগী স্বর্ণ মুদ্রা অপহরণ করিয়া দুরাণী আফগানিস্থানে উপনীত হন। তার-পর আফগানদিগকে বশীভূত করিয়া হিরাট, খোরাসানের কিয়দংশ, সিন্ধু প্রদেশ ও কাশ্মীর অধিকার পূর্ব্বক এক অভিনব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

আমেদশাহ আবেদালী স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি লুণ্ঠন করিয়া কীর্ত্তি সংস্থাপন জন্য সসৈন্যে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর প্রদেশে আগমন করিলেন। বাদশাহ দেশ রক্ষার কল্পনায় জ্যেষ্ঠপুত্র আমেদশাহ ও উজীর কমর উদ্দীনকে সৈন্যাপত্যে বরণ করিয়া তাঁহার গতিরোধ জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের রণ-কৌশলে আবেদালী পরাজিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে উজীর কমর উদ্দীন শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করাতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বাদশাহ উজীরের মৃত্যু সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া একান্ত শোকাকুল হইলেন; এবং সমস্ত রজনী অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে দরবারের সময় পরলোকগত উজীরের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, তিনি বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "হায় দারুণ বিধি! আমার বৃদ্ধ বয়সের প্রধান অবলম্বন ভাঙ্গিয়া দিলে! আমি এরূপ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কোথায় পাইব?" শোক প্রকাশকালে তাঁহার পুরাতন ব্যাধি মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার অশান্তিক্লিষ্ট জীবনের অবসান করিল। মোহাম্মদশাহের রাজত্ব ত্রিংশ বর্ষ কাল স্থায়ী ছিল।

আমেদশাহ।

পিতার পরলোক গমনের পর শাহজাদা আমেদশাহ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নূতন সম্রাট্ উজীরের শূন্য পদে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সফদার জঙ্গকে নিযুক্ত করিলেন। সফদার জঙ্গের প্রকৃত নাম আবুল মনসুর; আবুল মনসুর বাণিজ্য উপলক্ষে পারস্য দেশ হইতে দিল্লীতে আগমন করেন, এবং ঘটনাক্রমে অযোধ্যার প্রতিনিধি সাদেত খাঁর একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। * তিনি তাঁহার কন্যাকে পরিণয়-

to the rightful owners. With this wealth they were able to keep up an immense army, with which the Emperor was unable to cope. Thus the Emperor found himself more circumscribed than the nobles, upon whom, infact he became dependent, and was unable to disprove or displace any one of them. Tarikh-i Ahmad Shah.

* আবুল মনসুরের ন্যায় সাদত খাঁও প্রথমে পারস্যদেশের একজন বণিক ছি-

সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই ঘটনায় দিল্লীর দরবারে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সাদত খাঁর মৃত্যুর পর তিনি অযোধ্যা প্রদেশের শাসনভার লাভ করিতে সমর্থ হন। উজীর কমর উদ্দীন খাঁর পরলোক গমনের পর সফদার জঙ্গ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন; এবং অযোধ্যার শাসনকার্য্যের জন্য সেখানে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত রাখিয়া স্বয়ং রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। নিজাম বাহাদুরের পুত্র গাজি উদ্দীন মোহাম্মদশাহের রাজত্বকালে মির বক্সীর পদে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি সেই পদেই বহাল রহিলেন। *

আমেদশাহের সিংহাসনারোহণের পর অবিলম্বেই রাজপুরুষগণের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হইল। এক পক্ষে সফদার জঙ্গ এবং অন্য পক্ষে মির বক্সী গাজি উদ্দীন। এই বিবাদের সময় উজীর একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদারের হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইলেন। তিনি মোগল রাজ-শক্তিকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একজন নগণ্য জায়গীরদারের হস্তে অবজ্ঞাত করিয়াছেন, গাজীউদ্দিন তাহার বিরুদ্ধে ঈদৃশ অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিতে বাদশাহকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু খোজাজাওয়াদ খাঁ উজীরের পক্ষ অবলম্বন করাতে বাদশাহ তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিলেন না। *

মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে রাজপুরুষগণের আত্মকলহই নিয়মে পরিণত হইয়াছিল। সফদার জঙ্গ এবং তদীয় উপকারী বন্ধু জাওয়াদ খাঁর মধ্যেও বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু কেহই কাহাকেও সহসা অপদস্থ করিতে পারিলেন না। অবশেষে সফদার জঙ্গ জাওয়াদ খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন, এবং কাপুরুষতা ও

লেন। তার-পর এ দেশে আগমন করিয়া আপন প্রতিভাবলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ পূর্ব্বক অযোধ্যার সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হন।

* খোজা জাওয়াদ কে? বাদশাহ আমেদশাহের মাতা উধম বাই প্রথমে একজন নর্ত্তকী ছিলেন; তার-পর বাদশাহের সুদৃষ্টিতে পতিত হইয়া রাজান্তঃপুরে স্থান লাভ করেন। কিন্তু অচিরে চরিত্র দোষে রাজান্তঃপুরের সকলের নিকট ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন; এমন কি বাদশাহ পুত্র আমেদকে মাতৃদর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদশাহের মৃত্যুর পর উধম বাই স্বীয় পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া Parent of the pure প্রভৃতি বিসদৃশ উপাধি লাভ করেন; এবং প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। রাজান্তঃপুরের প্রধান খোজা জাওয়াদ খাঁর সঙ্গে তাঁহার অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই সূত্রে জাওয়াদ খাঁ বাদশাহের নামে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তিনি লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। এই ঘটনায় বাদশাহ একান্ত কুপিত হইয়া সফদার জঙ্গকে পদচ্যুত করিয়া দরবার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন, এবং কমর উদ্দীন খাঁর পুত্রকে খানখানান উপাধি প্রদান করিয়া উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। সফদার জঙ্গ উজীরের পদ হইতে তাড়িত হইলেন; কিন্তু অযোধ্যার শাসনভার তাঁহার প্রতিনিধির হস্তেই রহিয়া গেল। তিনি বাহুবলে লুপ্ত ক্ষমতা উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বাদশাহ ও মিরবক্সী গাজিকে * পরিবেষ্টন করিলেন। কিন্তু তিনি রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া জাটদের শরণাপন্ন হইলেন। তাহারা তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করাতে গাজি উদ্দীন তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন; কিন্তু যাঁহাকে লইয়া বিবাদ, তিনি বিবাদস্থল পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যা প্রদেশে গমন পূর্ব্বক প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। গাজি উদ্দীন জাটদিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বাদশাহের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্র সেনাপতি মহলরাও এবং রঘুনাথ রাওকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তাহারা সসৈন্যে উপনীত হইলে, সম্মিলিত সৈন্যের সেনাপত্য লইয়া খানখানানের সঙ্গে গাজির বিবাদ উপস্থিত হইল। বাদানুবাদের পর গাজি সেনাপতি পদে বৃত হইয়া মহারাষ্ট্র সৈন্য সমভিব্যাহারে জাটদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য গমন করিলেন। সম্মিলিত সৈন্যের আক্রমণে জাট সৈন্য বিপন্ন হইল। কিন্তু, এমন সময়, মোগল শিবিরে গোলা গুলির অভাব হইল; গাজি জনৈক সেনানায়ককে গোলা গুলি আনায়ন করিতে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

জাটদুর্গ গাজির হস্তগত হইলে, তিনি একান্ত বলশালী হইতেন। ইহা খানখানানের প্রভুত্ব রক্ষার পক্ষে বিঘ্নজনক হইত, এজন্য তিনি গোলা গুলি প্রেরণ করিতে নিষেধ করিলেন। খানখানান এই নিষেধ আজ্ঞা প্রদান করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না; বাদশাহের নিকট গাজিকে রাজমুকুটের প্রয়াসী বলিয়াও প্রতিপন্ন করিলেন। বাদশাহ জাট সৈন্যের সঙ্গে যোগ প্রদান করিয়া গাজিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে মৃগয়াব্যপদেশে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। গাজি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অপরিজ্ঞাত রহিলেন না। তিনি বাদশাহের অভিযানের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া জাট সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক

---

* এই গাজি নিজামের পুত্র নহেন, পৌত্র। নিজাম বাহাদুরের মৃত্যু হইলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজি ও কনিষ্ঠ পুত্র সলাবত জঙ্গের মধ্যে বিবাদ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে গাজি নিহত হন এবং সলাবত জঙ্গ শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। গাজির পুত্র দিল্লীতে মিরবক্সী নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার তরুণ বয়স, কিন্তু তিনি বিচক্ষণ রণ-কুশল সেনাপতি ছিলেন। পিতার ন্যায় ইনিও সফদার জঙ্গের বিরোধী ছিলেন।

রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাদশাহ সেকেন্দ্রাবাদ নামক স্থানে উপনীত হইয়া গাজির প্রত্যাগমন সংবাদপ্রাপ্ত হইলেন; * তাঁহার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া ফললাভ হইবে না বিবেচনা করিয়া, দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। গাজি বাদসাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন এবং প্রতিহিংসাবশে তাঁহার চক্ষুঃদ্বয় উৎপাটন করিয়া রাজবংশোদ্ভব অজিমুদ্দীনের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়াদিলেন। ইহার পর তিনি খানখানানকে হত্যাকরিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

অভিশাপ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অসন্তোষ ও সন্দেহ।

বিপথগামী বন্ধুকে সৎপথে আনিবার বাসনা সকল সুহৃদেরই হইয়া থাকে; কিন্তু সেই কার্য্যের জন্য যদি কোন কঠিন উপায় অবলম্বন করিতে হয়, এবং তদ্দ্বারা যদ্যপি বন্ধুবরের অন্তরে কোন ব্যথা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তব্যানুরোধেও সহসা তাহা করিতে পারা যায় না, স্বাভাবিক ভালবাসা বাধা দিয়া থাকে।

অমরনাথ কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়াছে। কিন্তু, শচীকান্ত বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 'সত্যেন এলো না, সে কি বল্লে?' তখন তিনি কি উত্তর দিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। প্রকৃত কথা বলিলে—হয় ত কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সত্যেন মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইবেন। আর সে কথা অমর কি রূপেই বা মুখে আনিবে?

অমর ছোট বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি-

* সেকেন্দ্রাবাদে বাদশাহী শিবিরে ফররুখশিয়রের কন্যা প্রভৃতি রাজমহিলা অবস্থান করিতেছিলেন। আখার-ই মুহাবত নামক ইতিহাসগ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদা মলাহারাও বাদশাহী শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া যান। এ বৃত্তান্ত সত্য হইলে, ইহাই দিল্লীর রাজশক্তির পুনঃ অধঃপতন ও অবমাননার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গ্রাণ্টডফ লিখিয়াছেন যে, কেবলমাত্র জিনিষপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু স্কট সাহেব লিখিয়াছেন যে চীৎকার ও লুণ্ঠনের পর রাজমহিলাদিগকে এক দল সৈন্যসহ দিল্লীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

লেন। প্রকৃত কথা গোপনে রাখিয়া বলিবেন মনে করিয়াই সাক্ষাৎ করিলেন। শচীকান্ত বাবু অমরনাথকে দেখিয়াই বুঝিলেন যে, সত্যেন আসে নাই। তিনি বলিলেন,—

"অমর কি আজ এলে?"

"আজ্ঞা হাঁ আজ এসেছি।"

"সত্যেন এলো না।"

"না।"

"সব ভাল আছে ত? তোমায় আস্‌বার কথা কি বল্লে?"

"সব ভাল আছেন, আস্‌বেন শীঘ্র এই কথাই বল্লেন।"

"শীঘ্র আস্‌বে, তাত অনেক দিন থেকে শুন্‌চি, তবু এখন না আস্‌বার কারণ কি কিছু বল্লে না?"

অমর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—আমি আসিবার কথা অনেকবার বল্লাম, তাহাতে শেষ বল্লেন,—এখানে আমার শরীরটা আছে ভাল, সেই জন্য আর কয়দিন থাকিব মনে করিচি,—দু তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাড়ি যাব, কাকা সে জন্য যেন চিন্তা না করেন।"

শচীকান্ত বাবু আর কিছু বলিলেন না; তিনি এই কথা শুনিয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন। সত্যেন আজি আমার অবাধ্যতাচারণ করিল।

শচীকান্ত বাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন; অনেক দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন; তিনি অদ্য অমরের কথা শুনিয়া সন্দেহ করিলেন, যেন সে তাঁহার নিকট কিছু গোপন করিয়াছে। যে কার্য্যের কারণ সহজে অনুমান করা যায় না; তাহার মূলে কোন না কোন গূঢ় কারণ নিহিত থাকে। ছোট বাবুর সেই গূঢ় কারণটি আবিষ্কারের জন্য মন বিচলিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—শরীর ভাল আছে বলিয়াই যদি আসিতে অনিচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, সে কথা ত আমায় লিখিতে পারিত, আমার নিকট অনুমতি গ্রহণ করিতে পারিত, সেত কখনও কোন কার্য্য আমার অনুমতি ব্যতিরেকে করে না, আর ইহাতেও দোষের কথা কিছু নাই। যাহাহউক, মাধবকে একখানি পত্র লিখি তাহা হইলে সম্ভবতঃ সমস্ত জানিতে পারিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া শচীকান্ত বাবু স্বহস্তে মাধব ঘোষকে নিম্নলিখিত প্রকার পত্র লিখিলেন,—"রোকার অবগত হইবে। আজ প্রায় ৫ মাস তোমরা কলিকাতায় গিয়াছ, কিন্তু সত্যেন এখনও বাটী আসিতে চায় না কেন? আমি ২।৩ খানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার পর অমরকে পাঠাইলাম, তাহাতেও সে বলিয়াছে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে যাইব। আমি সত্যেনের কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; বিশেষ চিন্তিত আছি। আর তুমিও এ পর্য্যন্ত কিছু লেখ নাই কেন? এই পত্র পাঠ সবিশেষ সম্বাদ লিখিবে। এ বাটীর সব উপস্থিত মঙ্গল, সত্যেন ও তথাকার অপর সকলের কুশল লিখিবে। ইতি তাং ৩০ ভাদ্র, সন—সাল।

শ্রীশচীকান্ত রায়।"

পত্র লেখা হইলে উহা একখানি খামের মধ্যে পুরিয়া,—শিরোনামা লিখিয়া অবিলম্বে ডাকঘরে ফেলিয়া দিবার জন্য একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শচীকান্তের পত্রের ফল।

যথাকালে শচীকান্ত রায়ের পত্র মাধব ঘোষের হস্তগত হইল। বৃদ্ধ সত্যেনকে বড় ভালবাসেন। সে ছোট বাবুর পত্রের উত্তরে কি লিখিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ছোট বাবু সত্যেনের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন বুঝিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল; এবং সেই কারণে, তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য পত্রের কথা সবিশেষ বলিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই সংবাদে মনে মনে ব্যথিত হইলেন, কিন্তু সেরূপ ভাব কিছুই প্রকাশ না করিয়া পত্রখানি দেখিতে চাহিলেন। মাধব পত্রখানি আনিয়া তাঁহার হস্তে দিল।

সত্যেন্দ্রনাথ উহা পাঠ করিয়াই, কোনরূপ চিন্তা করিবার পূর্ব্বেই বলিলেন,—"তোমায় আর জবাব লিখতে হবে না, সব উদ্যোগ আয়োজন কর, কাল বাড়ি যাইব।"

মাধব ঘোষ ইহা শ্রবণে আনন্দিত হইল, তাহার আর কলিকাতায় ভাল লাগিতেছিল না। সত্যেন্দ্র খুড়িমাতা ঠাকুরাণীকেও বাটী যাইবার কথা বলিলেন; তিনিও বিশেষ আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ যে হঠাৎ এ রকম মন হ'ল ?"

সত্যেন্দ্র নাথ কেবলমাত্র বলিলেন,—"কাকা পত্র লিখিয়াছেন।"

মাধব ঘোষ, ও দরোয়ান, দাস দাসী, পাচিকা প্রভৃতি সকলেই ব্যস্ত হইয়া বিছানাপত্র, তৈজসাদি, গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিল। উহাদের নিজ নিজ বস্ত্রাদিও পুঁটুলির মধ্যে পুরিল। সত্যেনের পিতৃব্যপত্নী দাসীদিগকে যাহা যাহা করিতে হইবে, দেখাইয়া দিতে লাগিলেন।

এ দিকে সত্যেন্দ্রনাথ না ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা সুখের কথা প্রকাশ করিয়া বড় ফাঁপড়েই পড়িলেন। মালতীর জন্য তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইতে লাগিল। তাহাকে না দেখিয়া কিরূপে থাকিবেন, সেই চিন্তায় তাঁহাকে নিতান্ত আকুল করিয়া তুলিল। অমর আসিবার পর হইতে আজি পর্য্যন্ত, এই কয়দিনের মধ্যে সত্যেনের মালতীর সহিত একবারও ভাল করিয়া দেখা বা কথা কওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। না হইবার কারণ মালতীর এক পিতৃস্বস্রীয়া ভগিনী কয়দিন হইল, তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছেন; রাত্রে উভয়কেই একত্র শয়ন করিতে হয়, সুতরাং প্রেমিকপ্রেমিকার মিলন হওয়া সুকঠিন।

অদ্য রাত্রিতে যাহাতে সাক্ষাৎ হয়, এইজন্য, একখণ্ড কাগজে লিখিয়া সত্যেন যে সময়ে মালতীকে একাকী কক্ষমধ্যে দেখিলেন, গবাক্ষ দিয়া গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। আগত কল্য বাটী যাইবার কথাও তাহাতে লিখিয়াছিলেন।

প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য আকর্ষ, প্রণয়-ভাজনের জন্য রমণী কি না করিতে পারে? গভীর নিশীথে মালতী ধীরে শয্যা ত্যাগ করিলেন, ধীরে দ্বারোন্মোচন করিলেন, ধীরে বাহিরে আসিলেন। একটি স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের পার্শ্ব হইতে এরূপ ঘোর রাত্রি-কালে উঠিয়া, অভিসারে যাইতে একটু ইতস্ততঃ করিল না। সত্যেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। যথা স্থানে যুবক যুবতীর সাক্ষাৎ হইল। পাঠক, যে স্থানে আর একবার প্রেমিকযুগলকে দেখিয়াছিলেন, আজিও তাঁহারা সে স্থানে বসিয়াছেন; সবই আছে, নাই কেবল আকাশে চাঁদ, আর জলের টবে তাহার প্রতিবিম্ব। আজি ভয়ানক অন্ধকারময়ী রজনী, আর এক অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। যুবক যুবতীও নিস্তব্ধ, তাঁহাদের অন্তরও আজি অমনই অন্ধকারময়।

অনেকক্ষণ দুইজনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন, সত্যেন অনেকবার, 'কাল বাটী যাইব'—এই কথাটি বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিলেন না। মালতী প্রথমে কথা কহিলেন, মৃদু স্বরে বলিলেন,—"কাল বাড়ী যাবে," সত্যেন উত্তর দিলেন,—"যাব।" আবার কিছুকালের জন্য নিস্তব্ধ। তৎপর আবার যুবতী বলিলেন,—"আমায় নিয়ে চল!"

স। মালতি এবারে নয়, আর কিছু দিন অপেক্ষা কর।

মা। কত দিন?

স। যত শীঘ্র পারি আবার কলিকাতায় আস্‌ব। তখন একেলা আস্‌ব, তোমায় কাছে রাখ্‌বে। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে দেশে লইয়া যাইব।

মা। বাড়ী গিয়া বিবাহ করিবে?

সত্যেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় না" অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তা হইল, ক্রমে নিশাবসানের পূর্ব্বলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল দেখিয়া, বড় কষ্টেই সাশ্রু-নয়নে আগত বিচ্ছেদের কথা ভাবিতে ভাবিতে যুবক যুবতী পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ আর শয্যা গ্রহণ করিলেন না; একখানি চেয়ারে বসিয়া একাকী সেই স্তব্ধ যামিনীতে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মালতী পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আসিবার কালে ছাদের সিঁড়ীর পার্শ্ব হইতে যেন কেহ সরিয়া গেল বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। মালতীর সহজে আর নিদ্রা আসিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মালতীর স্বপ্ন।

মালতী গৃহ-প্রবেশকালে কাহাকে সরিয়া যাইতে দেখিয়া, ভীতা হইলেন। সত্যেন চলিয়া যাইবেন, সেই জন্যই তাঁহার মনে বিষম যাতনা হইতেছিল, তাহার উপর এই নূতন দুশ্চিন্তায় মালতীকে অত্যন্ত কাতর করিল। মালতী পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল একে একে আলোচনা করিয়া দেখিতে

লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—মিলনে বিচ্ছেদ না থাকিলে, কত সুখের হইত। আজি অনেক দিনের পর, তাঁহার মৃত স্বামীকে মনে পড়িল। যে সুধার আস্বাদনে আজি মালতী বিভোরা, স্বামীর জীবনকালে সে সুধার স্বাদ গ্রহণের সময়, তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। স্বামী জীবিত থাকিলে, আজি তাঁহার জীবনের স্রোত কি ভাবে প্রবাহিত হইত, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, উষার মুকুটজ্যোতিঃ ক্রমশঃ পূর্ব্বগগনে প্রকটিত হইয়া উঠিল; তখন মালতী সামান্য তন্দ্রাভিভূতা হইলেন। সেই স্বল্প নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যেন এক বিজন প্রান্তরে একাকী বিচরণ করিতেছেন। দিবাকর পশ্চিমগগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন, সন্ধ্যার বিলম্ব অল্পই আছে। অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া মালতী দ্রুত চলিতে লাগিলেন। এক নিবিড় অরণ্যে গিয়া পড়িলেন, ভয়ানক অন্ধকার ও এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় মালতী বড়ই ভীতা হইলেন। তখন তিনি রোদন করিতে করিতে অন্ধকারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। সহসা অনন্ত তরুশ্রেণীর ভিতর দিয়া আকাশ পানে নয়ন পতিত হইল, দেখিলেন চন্দ্রদেব উদিত হইতেছেন। মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। আবার চলিলেন,—কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণের বশে মালতী অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে লাগিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, এক অনতিপ্রসর স্রোতস্বতী, এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। নদীবক্ষে কএকখানি ক্ষুদ্র তরী বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মাঝী নাই। এখন জ্যোৎস্নায় কানন পরিপূরিত। মালতীর নৌকা দর্শনে যেরূপ আশা হইল, নাবিকহীন দেখিয়া তেমনই নিরাশ হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন; কেহই আসিল না দেখিয়া, নিজ হস্তে তরী চালনা করিয়া নদী পার হইবার মানসে গাত্রোত্থান করিলেন। তাহার পর যেমন একখানিতে পদার্পণ করিলেন, অমনি তাহা নিমগ্ন হইল। দ্বিতীয় বারও তাহাই ঘটিল। মালতী নিরস্ত হইয়া মহাভয়ে চিন্তা করিতেছেন, দেখিলেন দূরে তীরবেগে একখানি সুসজ্জিত তরী আসিতেছে। ক্রমে উহা নিকটে আসিল,—মালতী যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তথায় আসিয়া নৌকা লাগিল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে নৌকা আরোহণ করিলেন। তখন নিমেষ মধ্যে তাঁহাকে পরপারে পঁহুচাইয়া দিয়া নৌকা পুনরায় তীরবেগে চলিয়া গেল। সেই নৌকার মধ্যে দুই জন মাত্র মনুষ্য ছিলেন। উভয়েই দীপ্তিশালিনী তেজোময়ী রমণীমূর্ত্তি। পরিধানে একখানি মাত্র বসন, কেশদাম আলুলায়িত।

মালতী পরপারে পঁহুছিয়াই চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর, একটি মনুষ্য গমনাগমনোপযোগী সামান্য বন-পথ

পাইয়া, তাহা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু কাল অগ্রসর হইলে পর, মালতী সহসা যাহা দেখিলেন,তাহাতে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। দেখিলেন, সম্মুখে দুইটি প্রসর রাজপথ, একটি এত সুন্দর ও নয়ন-মনোরম যে, সহসা দেখিয়া মনে হয়, উহা বুঝি অমরধামের পবিত্র মার্গ। উহার উভয় পার্শ্বে একপ্রকার সুন্দর তরুশ্রেণী বিরাজিত, তাহার সর্ব্বত্র তুষার-ধবল পুষ্পরাজি প্রাণ-মনোহারি সৌরভ বিতরণ করিতেছে। তাহার পরই অপরূপ অট্টালিকাশ্রেণী আকাশের চাঁদের আলোতে, আর পথপার্শ্বের তাড়িতালোকসম এক প্রকার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে হাসিতেছে। এই পথে শত শত পথিক মহা উল্লাসে ও উদ্যমে গমনাগমন করিতেছে। কিন্তু বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল, বহু বহু দূরে যেন অনন্ত আঁধার বিরাজ করিতেছে। অপর পথটি ইহার বিপরীত প্রকারের। এই পথ ভয়ানক অন্ধকার ও বন্ধুর, জনসমাগম নাই বলিলেই হয়, কদাচিৎ দুই এক জন পথিক গমনাগমন করে। পার্শ্বে সীমাহীন মাঠ মরুভূমি বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রদেব ঊর্দ্ধ হইতে নিজ নির্ম্মল প্রভা প্রকাশ করিয়া জগৎকে এক সুশীতল আবরণে আবৃত করিয়াছেন, কিন্তু হায়! সে জ্যোতি এই পথে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মালতী এই ভয়ানক পথ দর্শনে শিহরিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন বুঝি ইহাই অনন্ত নরকের পথ। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,— একি ইন্দ্রজাল! সম্মুখে দুইটি পথ, একটি সরল ও সুগম, অপরটি ক্রূর ও দুর্গম। এরূপ সুন্দর পথ থাকিতেও কি এক দৈবপ্রভাবে মালতীকে বিষম চিন্তায় ফেলিল, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কোন্ পথ গ্রহণ করিবেন। যখন তিনি স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সরল ও সুরম্য পথটি অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন, তখন উর্দ্ধদেশ হইতে এক বহুপূর্ব্বশ্রুত স্বরে কে যেন বলিলেন,—"মালতী! ভ্রান্ত হইও না। উভয় পথের মধ্যে তুমি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু সাবধান। এই সুরম্য পথের পর, এক অন্ধকার সুখহীন, শান্তিহীন—প্রেতরাজ্য আছে। আর এই আপাতদুর্গম পথের শেষে, এক প্রেমময় চিরশান্তিপূর্ণ পবিত্র আলোকরাজ্য বিরাজিত। এই পথে যাইতে পারিবে কি? মালতী ইহা শ্রবণে শিহরিলেন, ইহার উত্তরে যেন বলিলেন,—না আমি অত অন্ধকারে যাইতে পারিব না।" পুনরায় সেই স্বর বলিল,—"তবে তোমার পক্ষে আমার কাছে আসাই মঙ্গলজনক। আইস মালতী আমি তোমায় তুলিয়া লই।" ইহা শ্রবণে মালতী যেন উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ শত রবিতেজসম্পন্ন এক পরিচিত মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল, তিনি চক্ষু নামাইলেন। তখন মালতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

ঘর্ম্মাক্তকলেবরা, স্বপ্নোত্থিতা মালতী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মি

গবাক্ষ-পথ দিয়া গৃহ মধ্যে পতিত হইয়াছে। তিনি শয্যায় একাকী শয়ানা রহিয়াছেন। শরতের নাতিশীতোষ্ণ মৃদু বায়ু কক্ষ মধ্যে সঞ্চালিত হইতেছে। তিনি মনে মনে অদ্ভুত দীর্ঘ স্বপনের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল সত্যেন অদ্য চলিয়া যাইবেন। ভাবিতে লাগিলেন,—কোন্ পথ গ্রহণ করি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৃহাগমন।

সত্যেন্দ্রনাথ সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া শরীর অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্য সময় হইলে, তিনি নিশ্চয়ই আজি বাটী হইতে বাহির হইতেন না, কিন্তু অদ্য কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করিয়া, ১১টার ট্রেণে বাটী যাইবেন স্থির করিলেন। অদ্য নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাপ্রযুক্ত, সত্যেন মালতীর কথা চিন্তা করিতে অবসর পাইলেন না। জিনিষপত্র সব ঠিক্ ঠাক্ করিতে বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি নিম্নতলের চৌবাচ্চায় স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলেন। অদ্য আর ছাদের উপর টবের জলে সাবান মাখিয়া স্নান করা হইল না। আহার করিতে করিতে মালতীর কথা মনে পড়িতে লাগিল। গত রজনী অন্ধকারে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, আজি বিদায়ের কালে একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। আহারান্তে পূর্ব্ববৎ অদ্যও আয়না, ব্রাস্ লইয়া বাতায়ন-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন;—বাসনা, যদি একবার মালতীকে দেখিতে পান। তাহা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। দেখিলেন সে কক্ষে অন্য দুই জন যুবতী বসিয়া গল্প করিতেছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, ঐ রমণীদ্বয় যদ্যপি গৃহ মধ্যে না থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় মালতীর সাক্ষাৎ পাইতেন, কারণ, মালতীও অমনই তাঁহাকে দেখিবার জন্য অধীরা। সত্যেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ রহিলেন, দেখিতে পাইলেন না।

সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে, বাহির হইবার সময় উপস্থিত হইল। অধিকাংশ দ্রব্যাদি গাড়িতে বোঝাই হইল, অবশিষ্ট একটি ঘরে চাবি দিয়া রাখা হইল। সেগুলি পরে যাইবে স্থির হইল। যথাকালে সকলে যাত্রা করিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া মাধব ঘোষ সকলের টিকিট্ কিনিয়া আনিল। সকলে গাড়িতে আরোহণ করিলেন। যথা-সময়ে ট্রেণ গন্তব্য ষ্টেশনে পঁহুছিল। ষ্টেশন হইতে মাণিকনগর প্রায় তিন ক্রোশ। এই পথের সমস্তটাই প্রায় পাকা, কেবল রায়-দের বাটীর নিকট হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ আন্দাজ কাঁচা আছে। সেখানে অশ্বযান চলিতে সক্ষম হয় না। রায় মহাশয়েরা ষ্টেশন হইতে বরাবর ঘোড়ার গাড়িতে আসিয়া এই স্থান হইতে শিবিকারোহণে বাটী গমন করিয়া থাকেন। আর সাধারণ গৃহস্থ লোকের রমণীগণের যাতায়াতের জন্য গো-শকটই একমাত্র অবলম্ব।

সত্যেন্দ্র এই স্থানে আসিয়া বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। শচীকান্ত বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমন-সংবাদে আনন্দিত হইয়া শিবিকাবাহক ও লোক জন পাঠাইয়া দিলেন। সত্যেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাটী আসিয়া পঁহুচিলেন।

অনেক দিন পরে শচীকান্ত বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া, তাঁহার প্রতি যে অসন্তোষ জন্মিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। তিনি সত্যেনকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সম্ভাষণ করিলেন। সত্যেন অবনতমস্তকে পিতৃব্যকে প্রণাম করিয়া নিকটে উপেশন করিলেন। তাঁহার মনে যে ভাবনা ছিল, তাহাও অপসারিত হইল।

সত্যেন্দ্র অনেকক্ষণ বসিয়া খুড়ার সহিত কলিকাতার নানা বিষয়ে গল্প করিলেন। সন্ধ্যার পর, অমর আসিলেন। দুই বন্ধুতে বৈঠকখানায় বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথন হইল। এই সকল কথোপকথনেব মধ্যে মালতীর কথাই অধিক হইল। যাহা হউক, যখন সত্যেন বাটী আসিয়াছে, তখন আর বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই, এইরূপে বিশ্বাস অন্তরে লইয়া অমরনাথ অদ্য রাত্রে বাটী চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

কবি-সূক্তি।

লভেত সিকতাসু তৈলমপি যত্নতঃ পীড়য়ন্
পিবেচ্চ মৃগতৃষ্ণিকাসু সলিলং পিপাসার্দ্দিতঃ।
কদাচিদপি পর্য্যটন্ শশবিষাণমাসাদয়েৎ
নতু প্রতিনিবিষ্ট-মূর্খজনচিত্ত মারাধয়েৎ॥

যতনে বালুকারাশি করিয়া মর্দ্দন
হইলেও হ'তে পারে তৈল-উৎপাদন,
মরীচিকা মাঝে কভু কোন তৃষাতুর
পাইলেও পে'তে পারে সলিল প্রচুর,
এমন' হইতে পারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
শশকের শিরে শৃঙ্গ দেখিবে শোভিতে;
এ'সকল অসম্ভব হয় সংঘটন
কিন্তু তুষ্ট নাহি হয় দুর্জ্জনের মন।

ভীম।

মূর্ত্তিমান্ ক্ষত্রধর্ম্ম, ভীম, বৃকোদর!
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষিয়া রক্ষার্থী
কৃষ্ণদ্বেষী—দণ্ডী দণ্ডধারী অবন্তীর,
জেনেও পাণ্ডবধ্বংস সমর ভীষণ!
যে কৃষ্ণ পাণ্ডব-সখা,—সর্ব্বস্ব তাদের,
যে অগ্রজ ভিন্ন ভীম নাহি জানে কিছু
এ জগতে, যেই ভ্রাতৃগণ প্রাণাধিক,
মাতা কুন্তী, জায়া দেবী দ্রৌপদী সুশীলা
এ সবে করিতে ত্যাগ শরণার্থী তরে
যাহার হৃদয় উচ্চ হিমাদ্রির মত
অচল ও অবিকম্প, প্রলয় বিষাণ
শুনেও যে না টলিয়া রক্ষিতে আশ্রিতে
আর, পালিতে প্রতিজ্ঞা গম্ভীর নির্ঘোষে
বলিলা "না লজ্ঘি কেহ ভীম-মৃত-দেহ
দণ্ডীরে করিতে স্পর্শ পারিবে জগতে।
ভাই বন্ধু কারেও না চাহে ভীমসেন।"

সীতা আর শকুন্তলা।

জনকনন্দিনী সীতা আর কণ্বদুহিতা শকুন্তলায় অনেক বিষয়েই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, অথচ সাদৃশ্য সত্ত্বেও বিচিত্র বিসদৃশতা আছে। সে সাদৃশ্য ও বিসদৃশতা উভয়ই সাহিত্যিক ও দার্শনিকের সমান আলোচ্য। সাদৃশ্যের কথাই আগে কহিব।

সীতা যেমন, জনক-সম্পর্কে, ঋষিকন্যা; শকুন্তলাও সেইরূপ, কণ্ব-সম্পর্কে, ঋষিতনয়া। সীতার প্রতিপালক পিতা, মিথিলাধিপতি জনক, সৈন্যসামন্তপরিবেষ্টিত রাজা হইলেও, সমগ্র ভারতে ঋষির ন্যায় পূজা পাইয়াছিলেন। তিনি, যোগিগণের অগ্রগণ্য যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট, নিগমান্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, গৃহবাসেও ঋষিজীবন যাপন করেন; এবং যজ্ঞার্থ স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ ও পরাক-সান্তপনাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য তপোব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা, ঋষিদিগের মধ্যেও তেজঃপুঞ্জ পবিত্র পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন। শকুন্তলার প্রতিপালক পিতা, কশ্যপ-গোত্রীয় কণ্ব, পুরাণে ও ইতিহাসে, চিরকালই বনবাসী ঋষি বলিয়া গণ্য। সুতরাং সীতা ও শকুন্তলা, এ অংশে, এক ভূমিতে দণ্ডায়মানা।

পরন্ত, সীতা যেমন, সূর্য্যবংশীয় মহারাজকুলে পরিণীতা হইয়া, অযোধ্যার সিংহাসনে, ভারতবর্ষের রাজরাজেশ্বরীরূপে আসীন হইয়াছিলেন; শকুন্তলাও সেইরূপ, চন্দ্রবংশীয় মহারাজকুলে পরিগৃহীত হইয়া, হস্তিনার সিংহাসনে, ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরীরূপে আসন পাইয়াছিলেন।

এ দিকে আবার, সীতা যেমন, পতিপ্রেমের চরম সৌভাগ্য ভোগের পর, পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, বাল্মীকি-হেন কুলপতি ঋষির তপোবনে, তদীয় স্নেহাশ্রিতা দুহিতার ন্যায় বাস করিয়াছিলেন; এবং সেখানেই, জন্মদুঃখিনী কাঙ্গালিনীর মত, কুশ-কাশের উপর সন্তান প্রসব করিয়া, সমানবয়স্কা ঋষিকন্যাদিগের শ্রদ্ধাভক্তি ও স্নেহময় পরিচর্য্যায় আপনার প্রাণের দুঃখ কতকটা পাসরিয়াছিলেন; শকুন্তলাও সেইরূপ, পতিপ্রেমের নন্দনকানন উপভোগের পর, পতি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও পরিত্যক্ত হইয়া, কুলপতি কশ্যপের তপোবনে কাঙ্গালের যোগ্য আশ্রয় পাইয়াছিলেন; এবং সেখানে, যথাসময়ে, পর্ণকুটীরে পুত্র প্রসব করিয়া, সমানহৃদয়া তাপসীদিগের স্নেহে ও সৌজন্যে, আপনার হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ও অসহ্য বেদনা কতকটা ভুলিয়া রহিয়াছিলেন।

সীতার পুত্র কুশ ও লব, মহর্ষি বাল্মীকির কৃপায়, সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষিত ও সমস্ত বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া, অল্প বয়সেই অসামান্য বীরকীর্ত্তিতে লোকের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন;

শকুন্তলার পুত্র ভরতও, মহর্ষি কশ্যপের নিকট ক্ষত্রসংস্কার-লাভ-হেতু, অল্প বয়সেই, আপনার অমিত তেজে, সর্ব্বদমন নামে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, শেষে সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুশের নামে মহানগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহার নাম কৌশাম্বী। কৌশাম্বী, এক সময়ে, ভারতবর্ষে অতি বড় বিখ্যাত রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বৎসরাজ প্রভৃতি বিশ্রুতকীর্ত্তি সম্রাট্গণ, কৌশাম্বীতে বাস করিয়া, উহার শোভাসম্পদে দেবভূমিকেও ধিক্কৃত করিয়াছিলেন। উহার অধিবাসিদিগের বেশভূষায় অপ্রতিম বৈভব দেখিয়া লোকে তখন বলিত,—

"এষা বেশাভিলক্ষ্যস্ববিভব-বিজিতা-
শেষবিত্তেশ-কোষা
কৌশাম্বী শাতকুম্ভদ্রবখচিত-জনে
বৈকপীতা বিভাতি।"

শকুন্তলাতনয় ভরতের নামে কোন নগর নাই, রাজ্য আছে; সে রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ। ভারতবাসীর পক্ষে শকুন্তলা এ সম্পর্কে চিরস্মরণীয়;—চিরকৃতজ্ঞতাভাজন।

যদি কবিপ্রদত্ত পূজার অঞ্জলি পরস্পরতুলনার একটি সামগ্রী হয়, তাহা হইলেও সীতা আর শকুন্তলা একসঙ্গে উল্লেখযোগ্যা। এই পৃথিবীতে অনন্ত কোটি রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং রূপে ও যৌবনে ফুলের মত ফুটিয়া,—ফুলের মত কিছু কাল ফুল্ল হাসি হাসিয়া,—ফুলের সুমধুর সৌরভ বিলাইয়া, পরিশেষে, বৃন্তস্খলিত শীর্ণ কুসুমের মত, কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। কাব্যে তাঁহাদিগের জীবনের কোনরূপ চিত্র নাই। কঠোরস্মৃতি ইতিহাস তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও কথা যত্নের সহিত কুড়াইয়া রাখিয়া থাকিলেও, কাব্যে তাঁহাদিগের পূজা হয় নাই।

কিন্তু সীতা, ঐতিহাসিক-গগনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হইয়াও, কবিকুঞ্জের আরাধ্য-দেবতা। কবিতা কত প্রকারেই তাঁহার পূজা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উহা, কখনও ভাবে ঢলিয়া, কখনও ভক্তিতে উছলিয়া, কখনও প্রীতির আবেগে ফুলিয়া, কখনও বা স্নেহকরুণার অমিয়-ধারায় গলিয়া, দেব-মানব-দুর্ল্লভ অনন্তবিধ কুসুমে তাঁহার জীবন-বিলসিত অলৌকিক আলেখ্যের পূজা করিয়াছে; এবং মনুষ্য, অদ্যাপি সে কবিকৃত পূজার নির্ম্মাল্য কুসুম সংগ্রহ করিয়া, শিরোদেশে ধারণের জন্য, আকুলতা দেখাইতেছে।

বস্তুতঃ, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে কে এমন জন্মিয়াছেন, যিনি অন্ততঃ একটি কবিতায়ও সীতার পূজা না করিয়া চিত্তে শান্তি পাইয়াছেন? কবিকুল-প্রবর্ত্তক মহাকবি বাল্মীকি, রাম-হৃদয়-সরোজিনী,—রাম-প্রেম-পাগলিনী সীতার নাম গাইয়াই, সংসারে স্বনাম-ধন্য। বাল্মীকি, তাঁহার দৈবী বীণার গুরুগম্ভীর-ঝঙ্কার-সাহায্যে, নাদ-বিস্তার যে গ্রামে উঠিয়া, সীতার নাম গান করিতেন' তাহা সাধারণের অনধিগম্য হইলেও, সে

নামধ্বনি আজি, গোরেশিয়ো * ও গ্রিফিথ্ প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের প্রযত্নে, সপ্ত সাগরের সুদূর অন্তরে, ইয়ুরোপাদি দেশ-দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; এবং সে বিস্ময়-মধুরা গীতির স্বর-লহরী যেখানে পহুঁছিয়াছে, সেখানেই মনুষ্য, কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট হইয়া, নয়ন-জলে ভাসিয়াছে;—মনুষ্যের মধ্যে যাহারা পাষাণের উপমাস্থল, তাহাদিগের প্রাণেও প্রীতি-ভক্তি-পবিত্রতার আনন্দময় উৎস, যেন সে কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া, অজস্র ধারায় উথলিয়া উঠিয়াছে।

বাল্মীকির পর ব্যাস, কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের ক্রূর-কঠোর, হৃদয়-বিদারি কাহিনী লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াও, কথাপ্রসঙ্গে সীতার পুণ্য-ময় স্মৃতির উপর দুটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, আপনার প্রাণ তর্পণ করিয়াছেন। ব্যাস অথবা ব্যাস-শিষ্যেরা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণে, এবং পদ্মপুরাণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে, অল্প বা অধিক পরিমাণে, সীতার কীর্ত্তি গাইয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস কাব্যাভরণ-রঘুবংশের এক অংশকে সীতার কথায়ই পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মেঘদূত মদিরাময় আদিরসের একটি টল-টল পিয়ালা। উহার কোথাও সীতাহেন রমণীর কথা সহজে আসিতে চাহে না। কালিদাস তথাপি, তাদৃশ মেঘদূতের মধ্যেও, প্রসঙ্গতঃ সীতার প্রাতঃস্মরণীয় কথা আকর্ষণ করিয়া, আপনার গভীর হৃদয়ের ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভবভূতি সীতার কথা কহিয়াই সাহিত্যে কৃতার্থ। তাঁহার মালতীমাধব, মৃণ্ময় আম্রের মত, তাকে তোলা শোভা সম্পদে, সময়ে সময়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কিন্তু তাঁহার সীতাকথার অতুল কাব্য—তাঁহার উত্তর-রামচরিত, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য বিলয় পাইলেও, এ জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিতে বিরাজিত রহিবে। ভবভূতির পর, অনর্ঘরাঘব-রচয়িতা মুরারি, প্রসন্নরাঘব-রচয়িতা অপরিচিত জয়দেব, বাল-রামায়ণ-রচয়িতা রাজশেখর, মহানাটক-রচয়িতা অজ্ঞাতনামা কবি, ভক্ত তুলসীদাস, ভক্তিমান্ কৃত্তিবাস, এবং রামরসায়ন-রচয়িতা রঘুনন্দন প্রভৃতি কবিবৃন্দ কত প্রকারেই যে সীতাচরিত্রের আরাধনা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া শেষ করা যায় না। তাই বলিয়াছি যে, ভারতীয় কবিদিগের মধ্যে যাঁহারা কোন প্রসঙ্গেও সীতার কথা কহেন নাই, তাঁহাদিগের সংখ্যা বড় কম।

শকুন্তলা, কবিতার হৃদয়হারি কুঞ্জে, ঠিক্ সীতার মত পূজা না পাইয়া থাকিলেও, আর একপ্রকারে অতি উচ্চ শ্রেণির পূজা পাইয়াছেন; এবং পূজার অনুপ মাহাত্ম্যেই এ মানবজগতে মধুর-মূর্ত্তি দেবতার আসনে বসিয়া আছেন। শকুন্তলাও, সীতার ন্যায়, ঐতিহাসিক রমণী। কেন না, ব্যাসের মহা-

* ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে ইটালীয় পণ্ডিত গোরেশিয়োই সর্ব্বপ্রথম ইটালীয় ভাষায় বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন। গ্রিফিথ্ ভারতবাসী ইংরেজ।

ভারত ও পদ্মপুরাণে তাঁহার বিশেষ বর্ণনা আছে। কিন্তু সে বর্ণনাকে কবিতার পুষ্পাঞ্জলি বলি না। কবিতার পুষ্পাঞ্জলি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল। ধন্য শকুন্তলা! যাঁহাকে কালিদাস, তাদৃশ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে, কাব্যজগতের শীর্ষস্থানে, অলোক-সামান্য প্রতিমার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আর ধন্য কালিদাস! যিনি শকুন্তলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায়, কবিপ্রতিভার চরম সৌভাগ্য প্রদর্শন করিয়া, মর্ত্ত্যজগতেও অমর-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলকে কাব্য বলিয়াছি কি? উহা কাব্য কিংবা কবিতার পুষ্পাঞ্জলি, অথবা স্থপতির পাষাণময়ী কবিতা নহে। উহা একখানি প্রেমাকৃষ্ট তন্ময় চিত্রকরের তুলির চিত্র; এবং বুঝি সে তুলি ভক্তবৎসলা বীণাপাণির কৃপার প্রসাদ-স্বরূপ ময়নপিচ্ছে বিরচিত। কবিকুল-শিরোমণি, তাঁহার "তন্বী শ্যামা" হৃদয়াভিরামা, বিরহিণী যক্ষবিলাসিনী, এবং ইন্দুমতী, মালবিকা ও উর্ব্বশী প্রভৃতি নয়ন-মনোমোহিনী কামিনীর মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন কবির কলমে; আর কণ্বতনয়া শকুন্তলাকে আঁকিছেন উপরিলিখিত বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত সারস্বতী তুলিকায়। তিনি সেই তুলির জন্য যে বর্ণদ্রব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও পৃথিবীর বস্তু নহে। যদি কর-তল-নিষ্পীড়িত জ্যোৎস্না-নিঃষ্যন্দকে পতিসোহাগিনীর বক্ষঃপ্রকৃত স্বেদবিন্দু এবং বিরহিণীর নয়নজলে মিশাইয়া বর্ণ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, বোধ হয় কালিদাস, সেই অপরূপ বর্ণে তাঁহার তুলি ভিজাইয়া, শকুন্তলার চিত্র আঁকিয়াছেন। নহিলে সে চিত্র লইয়া সহৃদয় মনস্বীরা এমন উন্মাদিত হইবেন কেন? কালিদাসের শকুন্তলাচিত্র দর্শনে,—মূলচিত্রের প্রতিকৃতির প্রতিকৃতি পর্য্যালোচনায়, জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিত ও প্রবীণ কবি গেটে, আবেগ-বিহ্বল প্রেমিকের ন্যায়, গদগদ কণ্ঠে কহিয়াছেন,—

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফললাভের অভিলাষ করে,—যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারি বস্তুর অভিলাষ করে,—যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে,—যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" *

যে নায়িকা অভিজ্ঞানশকুন্তল-হেন বস্তুতে চিত্রিত কিংবা বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কবিকৃত পূজা কোথায় যাইয়া পঁহুছিয়াছে, তাহা সকলেরই সহজবোধ্য। কিন্তু এ সকল কথা ছাড়া, সীতা ও শকুন্তলার মধ্যে আরও একটুকু বিশেষ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ-নৈকট্য আছে।

সীতার জন্মবৃত্তান্ত, জগৎপাবনী ভাগীরথীর উৎপত্তিবৃত্তান্তের ন্যায় মনুষ্যের অজ্ঞাত। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা কৃচ্ছ্রসাধক

* বিদ্যাসাগরমহাশয়ের অনুবাদ।

তাপস, অথবা কঠোরকর্ম্মা পরিব্রাজক, তাঁহারা স্তরের পর স্তর পার হইয়া, হর-জটা শৃঙ্গের অন্বেষণে, হিমাদ্রির উর্দ্ধদেশস্থিত শৈল-সোপানে আরোহণ করিয়াছেন; কিন্তু "তরল-তরঙ্গা দ্রবময়ী গঙ্গা," গিরিরাজ-হৃদয়ের কোন্ পবিত্র স্থান ভেদ করিয়া, প্রথম প্রসূত হইয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ঐতিহাসিকেরাও সেইরূপ জগৎপাবনী জনক-নন্দিনীর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে অশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবী পবিত্র,—পার্থিব-সাহিত্য কৃতার্থ, এবং রমণীকুল ধন্য হইয়াছে, তিনি কোন্ কুলে, কাহার ঘরে, জন্মিয়াছেন, তাহা কেহ অবধারণ করিতে পারেন নাই।

শকুন্তলার উৎপত্তিবৃত্তান্তও এমনই কুজ্ঝাটিকায় আচ্ছাদিত। যাঁহার চিত্রগত সৌন্দর্য্যের আভা দেখিয়া, আজি ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভাবে বিভোর; এবং যাঁহার চারিত্রগত মাধুর্য্যের অভিনয়মাত্র দর্শনে, ভীর্ম-প্রেক্ষণী পাশ্চাত্য পুর-ললনারাও, ভারতীয়-সভ্যতার অনন্যসাধারণ সুকোমল সৌন্দর্য্য কতকটা অনুভব করিবার জন্য হৃদয়ে অধীর, সেই শকুন্তলা কোন্ কুলে কাহার ঘরে জন্মিয়াছেন, কেহ তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন নাই।

সীতার জন্মবৃত্তান্ত সাধারণতঃ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। মিথিলাধিপতি জনক, একদিন যজ্ঞীয় প্রয়োজনে, যজ্ঞস্থানের প্রাঙ্গণে, আপনার হস্তে লাঙ্গল লইয়া ভূমিকর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি সেখানে, অকস্মাৎ স্বর্ণপিণ্ডের ন্যায় সুখদৃশ্য একটি সুকুমার-শিশুমূর্ত্তি ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন; এবং "এইটি আমার কন্যাস্বরূপ হউক" এই বলিয়া শিশুটিকে সেই দিন হইতে আপনার অন্তঃপুরে লালনপালন করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্ণপিণ্ডসদৃশ সুকোমল শিশুটিই, 'সীতা' অর্থাৎ লাঙ্গল-কর্ষণপদ্ধতিতে প্রাপ্ত বলিয়া, সীতা নামে পরিচিতা হইলেন; এবং উঁহার মাতৃপরিচয় না থাকা হেতু, লোকে উঁহাকে রত্নপ্রসবিনী বসুন্ধরার গর্ভসম্ভূত একটি অভিনব রত্ন জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। রাজর্ষি জনক, কৃতদার হইলেও, তখন পর্য্যন্ত অনপত্য। সুতরাং সীতার রূপে তাঁহার প্রাণটা ভরিয়া গেল, সীতার স্নেহ সংসারে তাঁহার গভীর আসক্তি জন্মাইল।

শকুন্তলার উৎপত্তি এবং আশ্রয়লাভ-কথাও এইরূপ অপূর্ব্ব। হস্তিনার অনতিদূরে, হিমাদ্রিপ্রস্থে, মৃদুবাহিনী মালিনীর তীরে, মহর্ষি কণ্বের তপোবন। মহর্ষি, মাঝে মাঝে, কঠোরতর তপশ্চর্য্যার কামনায়, তপোবনের নিকটবর্ত্তি গহন-কাননে প্রবেশ করিতেন। তিনি একবার, কানন-পথে, তপোবনে ফিরিয়া আসিবার সময়ে, মালিনীর ছায়াশীতল তটভূমিতে, একটি অলৌকিক লাবণ্যময় অচিরজাত শিশুকে কতকগুলি শকুন্ত অর্থাৎ বিহঙ্গের দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; এবং শিশুর অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া

উহাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেই শিশুই, অনপত্য ঋষির প্রাণাধিকা দুহিতার মত প্রতিপালিত হইয়া, "বন-জ্যোৎস্না-রূপিণী" লতার ন্যায়, ধীরে ধীরে, রূপে ও গুণে বাড়িতে লাগিল; এবং রূপের ডালি শকুন্তলা নামে, কালে পরিচিত হইয়া, হোম-ধূমাবৃত তপোবনকেও তৃষিত বিলাসীর দর্শনীয় করিয়া তুলিল। যথা মহাভারতীয় আদি পর্ব্বে, কণ্বের কথায়,—

"নির্জ্জনে তু বনে যস্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিবারিতা,
শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া।
এবং দুহিতরং বিদ্ধি মম বিপ্র শকুন্তলাম্।
শকুন্তলা চ পিতরং মন্যতে মামনিন্দিতা।"

যদি প্রচলিত পৌরাণিকী কথায় প্রত্যয় করা যায়, তাহা হইলে, সীতা ও শকুন্তলা, জন্মবৃত্তান্তের অজ্ঞেয়তারূপ সাদৃশ্যে, শুধুই একে অন্যের অনুরূপা নহেন; প্রত্যুত তাঁহারা একই বৃন্তের দুটি ফুল,—একই গর্ভসম্ভূতা —অর্থাৎ সহোদরা। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতে ও পদ্মপুরাণে অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। আমি সে বিস্তৃত বর্ণনা হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত না করিয়া, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের কএকটি পংক্তিই অনূদিত অবস্থায় পাঠককে উপহার দিব। কালিদাসের কৌশলময়ী লিখন-ভঙ্গী পাঠকের নিকট অপেক্ষাকৃত প্রীতিকরী হইবে। কালিদাস লিখিয়াছেন, মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্ত যখন, কণ্বের আশ্রমে, ঋষিবালাদিগের আতিথ্য সৎকারে আপ্যায়িত, তখন তাঁহার মনে শকুন্তলা সম্পর্কে নানারূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার দিকে চাহিয়া কহিলেন,——

"ভদ্রে, আপনাদিগের এ সখীর সম্বন্ধে আমার কিছু জানিতে ইচ্ছা হইতেছে; জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

সখীরা উভয়ে এক সঙ্গে বলিলেন, "আপনার সে জিজ্ঞাসা অনুগ্রহ বিশেষ।"

"দুষ্যন্ত কহিলেন—সর্ব্বত্র এইরূপ প্রকাশ যে, ভগবান্ কশ্যপনন্দন কণ্ব চিরব্রহ্মচারী। অথচ আপনাদিগের এই সখী তাঁহারই আত্মজা! ইহা কিরূপে হইতে পারে?"

অনসূয়া প্রত্যুত্তরে কহিলেন—"শুনুন তবে আর্য্য। কুশিক-রাজনন্দন অর্থাৎ কৌশিক এই গোত্রনামধারী এক মহা-প্রভাব রাজর্ষি আছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন কি?"

"দুষ্যন্ত কহিলেন—হাঁ তাঁহার কথা শুনিয়াছি।"

"অনুসূয়া কহিলেন—সেই কৌশিক অর্থাৎ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকেই আমাদিগের এই সখীর জনক বলিয়া জানিবেন। তাত কণ্ব যে পিতা, তাহা শুধুই পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া।"

"দুষ্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন—পরিত্যক্ত! সে আবার কি? আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

"অনসূয়া বলিলেন—তবে শুনুন। সেই রাজর্ষি বিশ্বামিত্র একদা বড় উগ্রতপস্যা আরম্ভ করেন। দেবতারা তাহাতে একান্ত

ভীত হইয়া, তাঁহার নিয়ম-ভঙ্গ উদ্দেশ্যে, মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন।"

"দুষ্যন্ত কহিলেন—ও ভয় ত দেবতাদিগের চিরপ্রসিদ্ধ। তার পর?"

"অনসূয়া কহিলেন—তার পর অতি মনোহর বসন্তসময়ে, মেনকার সেই উন্মাদিনী রূপমাধুরী দর্শনে—অনসূয়া এই পর্য্যন্ত বলিয়াই লজ্জায় মাথা নোয়াইলেন।"

"দুষ্যন্ত কহিলেন—ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা আর বলিতে হইবে না। বুঝিয়াছি ইনি অপ্সরাসন্তান। অনসূয়া কহিলেন—হাঁ তাহাই বটে।" *

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ধৃত রামায়ণীয় শ্লোককে প্রকৃত রামায়ণের অঙ্গীভূত বলিয়া মানিয়া লইলে, "দেব-যজন-সম্ভবা" সীতাও মেনকারই গর্ভসম্ভূতা। যথা বিদ্যাসাগর-প্রকাশিত উত্তরচরিতের টীকায়,—তদুদ্ধৃত রামায়ণীয় শ্লোকে, অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রতি সীতার কথা,—

"মিথিলাধিপতির্বীরো জনকো নাম ধর্ম্মবিৎ;
ক্ষত্রধর্ম্মেণ্যনুরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্।
স সীরাকর্ষণং কর্ত্তুং গতঃ কালে পিতা মম,
পত্নীভিঃ সহ ধর্ম্ম্যাভিঃ স দদর্শাদ্ভুতং মহৎ।
অন্তরীক্ষে চ গচ্ছন্তীং দিব্যরূপাং মনোরমাম্,
মেনকাং বৈ হ্যপ্সরসং দ্যোতয়ন্তীং দিশস্তিথা।
তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং মন্মথস্য রতীমিব,
তস্যাসীন্মানসী বুদ্ধিস্তদা ধৈর্য্যবিচালনী।
অস্যাং নাম মমোৎপদ্যেদপত্যং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্,
মমাপত্যবিহীনস্য মহান্ স স্যাদনুগ্রহঃ।
অথান্তরীক্ষে বাগুচ্চৈরুবাচামানুষী কিল,
প্রাপ্স্যস্যপত্যমস্যাস্ত্বং সদৃশং রূপবর্চ্চসা।
তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কর্ষতো যজ্ঞমণ্ডলম্,
অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং জগতো
গতিম্।"

অর্থাৎ, মিথিলার অধিপতি, বীরপ্রকৃতি, ধর্ম্মবিৎ জনক আমার পিতা। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মে অনুরত এবং ন্যায়তঃ পৃথিবী পালনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি একদা তাঁহার ধর্ম্মপত্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া লাঙ্গলকর্ষণের জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়াছিলেন। সহসা তিনি সেখানে এক অদ্ভুত ও মহৎ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন;—দেখিলেন অপ্সরাকুলের আভরণ-রূপিণী, লোকমনোমোহিনী মেনকা, অপ্রতিম রূপের ছটায় দশদিক্ আলোকিত করিয়া, অন্তরীক্ষে চলিয়া যাইতেছেন; এবং তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন দেবী মন্মথভামিনী আপনিই আকাশপথে বিচরণ করিতেছেন। মেনকার রূপ দর্শনে রাজর্ষি জনকের হৃদয় একটুকু বিচলিত হইল। তিনি বিচলিত হৃদয়ে এইমাত্র বলিলেন,—আমি অপত্যহীন; যদি ইঁহাতে আমার একটি সুকীর্ত্তি সন্তান জন্মে, আমি তাহা সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। তখন

* যথা অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্কে—"রাজা। বয়মপি তাবদ্ভবত্যোঃ সখীগতং কিঞ্চিৎপৃচ্ছামঃ।—সখ্যৌ। অজ্জ অণুগ্গহো এব্ব ইঅং অব্ভত্থণা।—রাজা। ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিত ইতি প্রকাশঃ। ইয়ং চ বঃ সখী তদাত্মজেতি কথমেতৎ।" ইত্যাদি।

অন্তরীক্ষে উচ্চৈঃস্বরে কেমন একপ্রকার অমানুষী আকাশবাণী উচ্চারিত হইল। কে যেন আকাশ হইতে কহিল, তুমি ইহা হইতে এক রূপ-গুণ-সমুজ্জ্বল অপত্য লাভ করিবে। শুনিয়াছি সেই লাঙ্গল-হস্ত রাজা যখন যজ্ঞমণ্ডল কর্ষণ করিতেছিলেন, তখন আমিই না কি জগতের গতিরূপিণী জননী অবনীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছি।

উল্লিখিত কথার শ্রোত্রী চিত্রকূটের অদূরস্থিত তপোবন-বাসিনী অত্রিসহধর্ম্মিণী বৃদ্ধা অনসূয়া, আর কথয়িত্রী স্বয়ং সীতা। সীতার আবির্ভাব-সংক্রান্ত এ সকল কথা, কাল-ক্রমাগত প্রবাদ-পরম্পরায়, কৃত্তিবাসের কবিতায়ও ঠাঁই লইয়াছে। সুতরাং মেনকার সম্পর্ককাহিনীতে অবিশ্বাস করা পৌরাণিকের পক্ষে খুব সহজ নহে। কিন্তু মেনকার অবতারণায় অবিশ্বাস করিলেও, * এতটুকু অবশ্যই মানিতে হইবে যে, সীতা আর শকুন্তলা উভয়েরই জন্মতত্ত্ব অতি নিবিড় ঐতিহাসিক অন্ধকারে আবৃত। পৃথিবী যাঁহাদিগের পদরেণু-স্পর্শে ধন্য হইয়াছে,—যাঁহাদিগের নয়নজলে আর্দ্র হইয়া উহা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অমরাবতীর কান্তি ধারণ করিয়াছে, তাদৃশ ক্ষণজন্মা নরনারীর মধ্যে আরও অনেকেরই জন্মকাহিনী নীহারিকামণ্ডলের ন্যায় অন্ধতমসাচ্ছন্ন।

যাহা হউক, সীতা আর শকুন্তলার সাদৃশ্যের কথা এখানেই পরিসমাপ্ত। অথচ

* বাল্মীকীয় রামায়ণের বর্ত্তমান-কালীন প্রকাশকেরা কেহই মেনকা সম্পর্কিত কথায় বিশ্বাস করেন না। বহুকাল হয় পূজাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রবন্ধলেখককে বম্বে হইতে প্রকাশিত, পুঁথির ধরণে মুদ্রিত, রামানুজটীকাসমেত সমগ্র সাত কাণ্ড রামায়ণ স্নেহের সহিত উপহার দিয়াছিলেন। সে পুস্তকে, সীতার জন্মপ্রসঙ্গে, মেনকার নাম গন্ধও নাই। তাহাতে এইমাত্র আছে, লাঙ্গলহস্ত জনক যজ্ঞভূমিতে সুরম্য শিশুটিরে পাইয়া সন্তানজ্ঞানে কোলে তুলিয়া লইলেন; এবং সেই হইতে সন্তানের মত লালন পালন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতবর্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এবং প্রসিদ্ধনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সাহায্যে বহুশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চাননতর্করত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত রামায়ণ পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি। তাহার কোন এক খানিতেও বিদ্যাসাগর-ধৃত পাঠের মধ্যবর্ত্তি চারিটি শ্লোক,—অর্থাৎ "অন্তরীক্ষেচ গচ্ছন্তীং" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "সদৃশং রূপবর্চ্চসা" এতদন্তক আটটি পংক্তি দৃষ্ট হয় না। রাম-সীতার বিবাহ সময়ে, জনক যে সীতার জন্ম বৃত্তান্ত কহিয়াছেন, এবং যাহা বালকাণ্ডের ষট্‌ষষ্ঠিতম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও মেনকার কোন কথা ঘুণাক্ষরে উল্লিখিত হয় নাই। এমন অবস্থায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ধৃত, কথিত শ্লোক-চতুষ্টয়কে রামায়ণের শ্লোক বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত কি না, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকদিগের বিচার ও বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

যাহা পরস্পর বিসদৃশ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহা নিতান্ত বিস্তারিত।

কিন্তু এখানে, সকল কথার আগে, একটি মুখ্য কথার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। সীতা বলিলে কাহাকে বুঝিব? শকুন্তলা বলিলেই, বা কাহার দিকে লক্ষ্য করিব? যাঁহারা সাহিত্যে প্রবিষ্ট, তাঁহাদিগের নিকট শকুন্তলার তিনখানি পট সুপরিচিত। প্রথম পটে মহাভারতের শকুন্তলা; দ্বিতীয় পটে পদ্মপুরাণের শকুন্তলা;— তৃতীয় পটে কালিদাসের শকুন্তলা। এই তিনের কোন্ চিত্র লইয়া সীতার চিত্রপটের সম্মুখীন হইব?

পদ্মপুরাণের শকুন্তলা মহাভারতীয় শকুন্তলা হইতে অধিকতর দর্শনীয়, এবং অতএবই তুলনার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। *

* যাঁহারা পদ্মপুরাণোক্ত শকুন্তলাবৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সুকৃতি সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল সরকার-প্রণীত শকুন্তলা-রহস্য নামক উপাদেয় গ্রন্থ পাঠে প্রীত ও উপকৃত হইবেন। কালিদাস যে পদ্মপুরাণের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াই অভিজ্ঞানশকুন্তল রচনা করিয়াছেন, ইহা শকুন্তলারহস্য প্রকাশের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজে একবারে অপরিজ্ঞাত ছিল। বিহারী বাবুর যত্ন ও অনুসন্ধান-নৈপুণ্যেই ইহা প্রথম প্রকাশিত, এবং সুতরাং সমালোচনাক্ষেত্র প্রসারিত হয়। তিনি, এই হেতু, সাহিত্যসেবিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু, প্রকৃতির যে নিয়ম—(The Survival of the Fittest)—উৎকর্ষের চিরজীবিতা-বিষয়ক যে বিধান অনুসারে উৎকৃষ্টতম বস্তুই কালের পরীক্ষায় অক্ষয় বটের ন্যায় নিত্যস্থায়ি হয়, যেন সেই নিয়ম ও সেই বিধান অনুসারেই—মহাভারত ও পদ্মপুরাণের শকুন্তলা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এবং কালিদাসের শকুন্তলাচিত্রই, যেমন সংসারে, তেমন সাহিত্যে, সত্যবস্তুরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহা অপরিহার্য্য। সুতরাং আমিও সেই অপরিহার্য্য নিয়ম-বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া কালিদাসের শকুন্তলা-চিত্রেই পাঠকের চক্ষু আকর্ষণ করিব।

সীতার পট অসংখ্য হইলেও, বাল্মীকির সীতাই কাব্যসাহিত্যের সীতা। কবিবর ভবভূতি সীতার যে অভিনব মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহা মূলচিত্রের এতই অনুরূপ যে, দুইখানিকে এক বস্তু জ্ঞানে সমালোচনা করিলেও দোষ নাই। আমি যদি, এই হেতু, সীতার কথা কহিবার সময়ে, কুত্রচিৎ কখনও ভবভূতির আশ্রয় লই, এবং নির্ব্বাসিতা সীতার চিত্তবিবৃত্তিপ্রসঙ্গে ভবভূতির চিত্রপট হইতেই বিশেষ কোন অংশ প্রদর্শন করি, তাহা কদাপি তুলনাপদ্ধতির বিরুদ্ধ হইবে না। এক দিকে বাল্মীকি ও ভবভূতির সেই সর্ব্বজন-বিদিতা সীতা, আর এক দিকে কালিদাসের তুলিচিত্রিতা শকুন্তলা। এই দুইয়ের চরিত্রে কোথায় কি পার্থক্য আছে, এখন সেই কথারই আলোচনা করিব।

সীতা আর শকুন্তলা উভয়ই চারিত্র-

সম্পদে সৌভাগ্যবতী। রমণীকুলে অতি অল্প রমণীই এমন মধুর ও সুন্দর,—এমন মনোমোহজনক অথচ সুখ-শীতল,—পবিত্র অথচ প্রেমাবেগবিহ্বল, প্রেমের পুষ্পিত মধুতে উচ্ছল,—নবনীতের ন্যায় কোমল অথচ কাঞ্চনের ন্যায় কঠোর-তাপ-সহ, কমনীয় চরিত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই উভয় চরিত্রের বিকাশে ও বিস্তারে ক্রমে যে পরিলক্ষণীয় পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত হর্ষবিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া পড়ে।

শকুন্তলা, তাঁহার চারিত্রসৌন্দর্য্যে, তপোবন-শোভিনী, কুমুদ-কহ্লার-কমল-লীলা-বিলাসিনী, সুরভিসুখদা স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র সরসী। সেখানে বায়ু বহে, কিন্তু মৃদু মৃদু। বায়ুর সে মৃদু হিল্লোলে, গাছ নড়ে না, লতা দোলে;—সরসীর তটবর্ত্তি কামিনীফুলের কচিদল ঝুর্ ঝুর্ ঝরিয়া পড়ে;—সরোবরের কমলামোদি স্বল্প জলে তরঙ্গ উঠে না, সুন্দরীর সুচারু অধরে মৃদু হাসির মত অল্প অল্প লহরী খেলায়। সেখানে বিহঙ্গ-বিরুতের মধ্যে, কোকিল, কপোত, চাতক, চকোর, শ্যামা, বুল্‌বুল্ ও দয়েলের কণ্ঠধ্বনি ভিন্ন আর কিছু কর্ণে প্রবেশ পথ পায় না। মৃদুতর ধ্বনির মধ্যে, ভ্রমরের গুঞ্জন, ঝিল্লির ঝিঁ-ঝিঁ-ঝঙ্কার-তান, এবং অধিকতর ক্ষুদ্র পতঙ্গনিচয়ের সঞ্চারশব্দ ভিন্ন আর কিছুতেই চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। সেখানে যদি কেহ ভালবাসার আবদারে ক্ষণকাল বিরক্তি জন্মায়, সে পরিধান-বল্কলাকর্ষী বন্য-স্নেহবিলাসী মৃগশিশু; আর যদি কেহ অন্যরূপে উপদ্রব করিয়া মুহূর্ত্তের তরেও উৎপাত ঘটায়, সে বিকচ-নলিন-লুব্ধ মুগ্ধ অলি। সেখানে প্রাণসখী পুষ্পিতা কিংবা পুষ্পোদ্গমোন্মুখী লতা। তাহাদিগের কাহারও নাম বন-জ্যোৎস্না, কাহারও নাম বন-মাধুরী, এবং কাহারও নাম বনের হাসি। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও পরিণয় হইয়াছে, কাহারও পরিণয়ের কথা চলিতেছে; কেহ বা, পরিণয়ের অপেক্ষা না করিয়া, প্রণয়ের আবেগে, আপনিই পাত্ররূপী পাদপের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সেখানে প্রাণ-সখা, প্রাণের ভাই রমণীর প্রীতিভাজন অশোক, মুখমধুপ্রিয় বকুল, অথবা আতাম্রকিশলয়-কান্ত প্রণয়োদ্ভ্রান্ত সহকার-তরু। সেখানে তপোবনের চারিদিক্ সতত-সমুত্থিত যজ্ঞীয় ধূমে আবৃত, কিন্তু সে ধূমজাল সরসীকে আচ্ছাদিত করে না। সেখানে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, ও সায়ং সময়ে, সুগভীর জলদ-নিনাদে, ঋষিকণ্ঠে বেদধ্বনি হইয়া থাকে। কিন্তু সে বেদধ্বনি, অবিরল-সন্নিবিষ্ট, লতা-গুল্মে বন-সংশ্লিষ্ট বৃক্ষমালার নিবিড় প্রাচীর ভেদ করিয়া, সরসীর সান্নিধ্যে আসিয়া পঁহুচে না।

সীতার চরিত্র ইহার বিপরীত। যদি প্রাকৃতজগতের কোন বস্তুর সহিত উহার উপমা দিতে হয়, তাহা হইলে সে উপমার একমাত্র স্থল পুণ্যতোয়া জাহ্নবী;—কোথাও মৃদুবাহিনী, কোথাও মন্দ্রনিঃস্বন-মহাতরঙ্গে তরঙ্গমালিনী,—জগৎপাবনী—জগজ্জীবনী—জগন্মোহিনী,—এবং বিশাল দৈর্ঘ্যে দেশ-

ব্যাপিনী। জাহ্নবী যেমন, হিমাদ্রির কোন অপরিলক্ষিত ঊর্দ্ধনির্ঝর হইতে অলক্ষিত-নিঃসৃত হইয়া, এবং আপনার গতিপথে বিন্দু-সরোবরের * বিপুলতর জল-রাশির সহিত প্রাণে মিশিয়া, এক প্রাণে—পৃথিবীর দিকে একীভূত প্রবাহ-বিতানে, ধীরে ধীরে বহিয়া গিয়াছে; এবং কোথাও পাহাড় ডিঙ্গাইয়া, —কোথাও বা আপনার অদম্য শক্তিতে প্রস্তরের বাঁধ ভেদ করিয়া,—কোন স্থলে বা ঐরাবতের মত পাপপ্রতিবন্ধিকেও স্রোতে ভাসাইয়া, কল-মধুর জয়-জয়-নাদে সমুদ্রে যাইয়া সঙ্গত হইয়াছে; সীতা চরিত্রও, সেই-প্রকার জনক-নিকেতনরূপ নির্ঝর হইতে প্রথমতঃ সামান্য একটি রজত-রেখার মত প্রবাহিত হইয়া, এবং কিছুকাল পরেই রাম-চরিত্ররূপ রমণীয় ও মহিমময় মহাপ্রবাহের সহিত একপ্রাণে মিশিয়া, বর্দ্ধিত বেগে,—প্রবর্দ্ধিত অনুরাগে, চারিত্রগত শোভাসম্পদ ও সর্ব্বজনীন-মঙ্গল্য শক্তির ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া গিয়াছে;—এবং সম্মুখে যাহা কিছু বাধা, বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধি দৃষ্ট হইয়াছে, তা-হাই আপনার অজেয় পুণ্যপ্রবাহে পরাভব করিয়া, পবিত্র প্রেমের অতল, অপার, আ-নন্দময় সাগরে যাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা-ইব। শকুন্তলাচরিত্রের সবে পাঁচটি দিক্। এক দিকে প্রাণ-সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। দুই-ই শকুন্তলার বড় প্রিয়। আর এক দিকে স্নেহমমতার আশ্রয়পাদপ, উদার-হৃদয় পিতা কণ্ব। তাঁহার প্রতিও শকুন্তলার ভক্তি ও ভালবাসার সীমা ছিল না। তৃতীয় দিকে প্রেমের রমণীমোহন পুতুল রাজা দুষ্যন্ত। শকুন্তলা, প্রথম দর্শনেই, আপনার অনতিস্ফুট কোমল প্রাণটুকু তাঁহার করে মনে মনে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এবং যাঁহাকে আর কখনও চক্ষে দেখেন নাই. তাঁহাকে চিরপরিচিত প্রিয়তমজনের ন্যায় ভালবাসিয়া, আপনাকে ভুলিয়াছিলেন। চতুর্থ দিকে তপোবন এবং তপোবনের নীরব তরু-লতা ও কল-রব পশুপক্ষী। ইহারাও শকুন্ত-লার বড় বেসী ভালবাসার বস্তু ছিল। পঞ্চম দিকে, জীবনের কঠোর পরীক্ষাসময়ে,—দুঃখিনীর অঞ্চলের ধন সর্ব্বদমন। সুকুমার-মতি শকুন্তলার নবনীতকোমল কচিপ্রাণটুকু, কখনও এ দিকে, কখনও ও দিকে, এইরূপ করিয়া এই পাচটি দিকেই সীমাবদ্ধ রহিত।

সীতাচরিত্র, শতমুখী গঙ্গার মত, শত দিকে সমান প্রসারিত,—সমান প্রধাবিত। উহার যে দিকে চাহিবে, সে দিকেই দেখিবে, সীতা স্নেহ-মাধুর্য্য, সৌজন্য, স্বজন-বৎসলতা, অলৌকিক পতিপ্রেম, অমায়িক পিতৃভক্তি, সখীজনে ও সহোদরাসদৃশী ভগিনীগণে অনু-রাগ, শ্বশ্রূজনে সেবাপরতা ও সর্ব্বজনে সুকু-মার দয়ার প্রতিমূর্ত্তিরূপে দণ্ডায়মানা রহিয়া-ছেন;—তরুলতা ও উদ্যান-কাননের প্রাকৃত-

* যথা বাল্মীকীয় রামায়ণে,—ভাগীরথীর উৎপত্তি ও অবতরণ-প্রকরণে, ত্রিচত্বারিংশ সর্গে,——
"বিসসর্জ্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি, তস্যাংবিসৃজ্যমানায়াং সপ্তস্রোতাংসি জজ্ঞিরে।"

রূপোন্মাদে কবিহৃদয়া বিদ্যাধরী, ও পশু-পক্ষীর লালন-পালনে করুণাময়ী দেবাঙ্গনা-রূপে প্রতিভাত হইয়া, হৃদয়িক মাত্রেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন; এবং প্রাণের অভ্যন্তরে রমণী-হৃদয়-স্পৃহণীয় রস-মাধুরী ও মধুর কোমলতার সমস্ত ভাব সম্পূর্ণরূপে পোষণ করিয়াও, আপনার সেই কেমন এক লোকোত্তর পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যের মহিমায়, গুরু লঘু ও আত্মপর সকলকেই মোহিত ও অভিভূত রাখিয়াছেন।

শকুন্তলার সহিত পাঠকের সবে পাঁচ বার কিংবা সাত বার মাত্র সাক্ষাৎকার। প্রথম দেখা কণ্বের সেই সুখ-শান্তিশোভা-নিকেতন সম্মোহন তপোবনে। শকুন্তলা সেখানে, কক্ষে ক্ষুদ্র কলসী লইয়া, লতা ও পাদপের আলবালে জল সেচন করিতেছেন; এবং একটা ভ্রমরের অত্যাচারে অধীরা হইয়া,—যুবতিজন-প্রিয় রঙ্গচাতুরীর কিছুই না জানিয়া, কিছুই না শিখিয়া, অথবা সে ভাবের কিছুই না বুঝিয়া, শুধু ভীরুতাজনিত কর-বিধুননের দ্বারাই, বিভ্রমবিলাসের অপরূপ চিত্র ফলাইতেছেন।

ইহার মুহূর্ত্ত পরেই আবার দেখা দুষ্যন্তের আকস্মিক সমাগমে। মৃগয়াগত দুষ্যন্ত, আশ্রম-দর্শন-বাসনায় তপোবনে উপস্থিত হইয়া, রমণীকণ্ঠস্বর-শ্রবণে, উৎসুক মনে, লতাবিতানের অন্তরালে দণ্ডায়মান আছেন; এবং এতক্ষণ সেখানে থাকিয়াই, শকুন্তলার রূপদর্শনে, প্রকৃতির হৃদয়হারি অভাবনীয় আকর্ষণে, ধীরে ধীরে আত্মহারা হইয়া, প্রেমময়-লালসার পীযূষ-সমুদ্রে ডুবিতেছেন। যেই শিষ্টাচার-ভীত দুষ্যন্ত, সঙ্কোচের নিগড় ভাঙ্গিয়া, লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন, সলজ্জ শকুন্তলাও, লজ্জাবতী লতার মত, আপনাতে আপনি লুক্কায়িত হইয়া, নয়ন-রাগ-জনিত আকস্মিক প্রেমের অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্ফুরণে, সখীদিগের সান্নিধ্যে কেমন এক সহর্ষযন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলার সহিত পাঠকের তৃতীয় সাক্ষাৎকারও, কএকটি দিন পরে, পুনরায় ঐ সুরভি-শীতল সুন্দর লতাগৃহে। লতাগৃহে শীলাময় আসন। সখীরা সে আসনে, সুকোমল-কুসুম-সংস্তরণে, 'পুষ্পশয্যা' রচনা করিয়াছেন; শকুন্তলা নবোদ্গত প্রেমের দুঃসহদহনে দগ্ধবৎ হইয়া, নিদাঘ-দগ্ধলতার মত, সে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছেন। সখী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া তাঁহার বুকে উশীরা-নুলেপ এবং বাহুতে মৃণাল বলয় প্রদান করিয়া, শীকর-সিক্ত পদ্মপত্রে তাঁহাকে বীজন করিতেছেন; এবং তাঁহার তাদৃশী দশা পর্য্যালোচনায় হৃদয়ে যার-পর-নাই ব্যথিত হইয়া, প্রতীকারের উপায় ভাবিতেছেন।

চতুর্থ সাক্ষাৎকারও সেই স্থানে ও সেই সময়েরই ক্ষণমাত্র পরে। প্রার্থিত-দুর্ল্লভ অথচ প্রেম-পাগর দুষ্যন্ত পৃথ্বীপতি হইয়াও, আজি কৃতার্থম্মন্য উপাসকের ন্যায়, অতি বিনীত ভাবে, শকুন্তলার সেই শিলাপট্ট অথবা পুষ্প-শয্যার এক পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছেন; এবং শকুন্তলার তথাবিধ অবস্থা দর্শনে ও সখীদিগের কথা শ্রবণে, একদিকে যেমন সৌভাগ্য-

সুখের অনুভূতি সত্ত্বেও, হৃদয়ে কেমন একটু ক্লিষ্ট হইতেছেন, আর এক দিকে সেইরূপ, ঋষিবালার অকৃত্রিম প্রীতি-স্নেহে তাপিত প্রাণে আর্দ্র হইয়া, পৃথিবীতেই অপূর্ব্ব স্বর্গ-সুখের পূর্ণ স্বাদ লাভ করিতেছেন।

শকুন্তলার সহিত পাঠকের পঞ্চম সাক্ষাৎ-কার, তদীয় হস্তিনাযাত্রা সময়ে, কণ্বের পুণ্য-ময় ও কারুণ্যপূর্ণ আশ্রম-পদে। সে আশ্রমে তখন সন্তানবৎসল, শুদ্ধস্নিগ্ধ, সদাশয় কণ্ব স্বয়ং দণ্ডায়মান;—সে স্থানে সখীবৎসলা, স্নেহবিহ্বলা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা;—সে স্থানে চিরবনবাসিনী ঋষিপত্নীরা ও ঋষিকু-মারগণ;—সে স্থানে শকুন্তলার সুকোমল-কর-লালিত, ও দীর্ঘাপাঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ স্নেহমধুর নামে সম্ভাষিত, মৃগ-শিশু ও মৃগী-নিবহ;—আর সে স্থানে,—সে অপার্থিব ও অমৃতময় স্নেহের লীলাভূমি অথবা সেই পার্থিব-স্বর্গস্বরূপ শান্তরসাস্পদ তপোবনে, তত্রত্য প্রীতিপরিচিত লতাপাদপ। শকুন্তলা যে সকল লতার মূলে জল সেচন না করিয়া আপনার অধরেও এক ফোঁটা জল দিতেন না,—আভরণের জন্য অন্তরে শিশুর মত লালায়িত হইয়াও, যাহাদিগের একটি ফুল নখে ছিঁড়িয়া অঙ্গে পরিতেন না, তাঁহার সেই সকল প্রাণ-প্রিয় লতা সে স্থানে। তিনি যে সকল তরুশিশুকে বাহুতে আবরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিতেন, তাহারা এইক্ষণ, শাখা-পল্লবে প্রসারিত হইয়া, প্রবয়স্ক ভ্রাতার ন্যায় সেই স্থানে। অপিচ, যে সকল মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গ, তরুলতার নিত্যসঙ্গিরূপে তপোবনে বাস করিয়া, ঋষিদিগের কণ্ঠানুকরণে, প্র-ভাতি গীতে ও সায়ন্তন স্তুতিতে কল-কল শব্দ করিত, এবং যাঁহারা, সুপরিচিত জনের ন্যায়, না ডাকিলেও নির্ভয়ে কাছে আসিত, তাহারাও তখন সেই স্থানে,—লতা ও পাদপশাখায় উপবিষ্টবৎ নয়ন-সন্নিধানে।

শকুন্তলা, একে একে, সেই পিতা, সেই প্রাণ-সখী,—সেই প্রাণপ্রিয় তরুলতা ও মৃগ-পক্ষিপ্রভৃতির নিকট বিদায় লইতেছেন, আর আপনি কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইতেছেন। প্রাণের অভ্যন্তরে, প্রিয়বিরহিত চক্রবাকীর মত, পতিদর্শনের জন্য অতি প্রচ্ছন্ন প্রবল পিপাসায় আকুল; অথচ পিতা, পিতৃ-তপো-বন ও প্রণয়ের সাথী সখীদিগের সম্বন্ধেও সমুদ্রের মত উদ্বেল ভালবাসায় অধীর। এক পা, পুরোগমনার্থ যেন একটুকু অগ্রসর; আর এক পা নিশ্চলবৎ দুর্ভর। চক্ষু এক বার চাহিতেছে সম্মুখের দিকে; আবার, ক্ষণে ক্ষণে শত বার, চকিত-চারুতার অপরূপ ভঙ্গিতে, ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে পিছনের দিকে। এই দুই দিকের আকর্ষণে বালিকা তখন যে ভাবে বিবশা, তাহা সরস্বতীর প্রসাদ-বর্দ্ধিত, প্রতিভার বিগ্রহ কালিদাসই আঁকিয়া তুলিতে পারিয়াছেন; এবং এই একটিমাত্র রস-ভাব-বিচিত্র অনুপম চিত্রের অঙ্কণনৈপুণ্যেই তিনি সমগ্র মানবজাতির সাহিত্যজগতে শীর্ষণ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, কোমল-কল্পনার তুলিস্পৃষ্ট কোন চিত্রের সহিতই কালিদাসের এ চিত্রের তুলনা সম্ভবে না।

শকুন্তলার সহিত পাঠকের ষষ্ঠ সাক্ষাৎকার হস্তিনার রাজভবনে। সে দৃশ্য দারুণ-মর্ম্মঘাতি ও দুঃসহ। যে দুষ্যন্ত, তপোবনের নিভৃতনিকুঞ্জে, প্রেমানুরাগের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে, অনায়ত্তপ্রেমাকুলা, বালা শকুন্তলার লালটুকটুক্ পা দুখানি ক্রোড়ে তুলিয়া, সখীদিগের ন্যায় সম্বাহন-সেবায় অধিকার পাইবার জন্য, তৃষিতহৃদয়ে প্রার্থী হইয়াছিলেন, এবং রূপের উপাসনায়ই, তদ্গতচিত্ত ভাবোন্মত্ত উপাসকের মত, আত্মহারা হইয়া, শকুন্তলার মনোহর মূর্ত্তি ধ্যানে, সংসারের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; স্মৃতির কিরূপ এক পাপ-সম্মোহে, অথবা কার কি নিঠুর অভিশাপে, আজি তিনি তাঁহাকে চিনিতেও পারিতেছেন না! শকুন্তলা ভয়ে,—দুঃখে,—লজ্জায় ও অপমানের অরুন্তুদ জ্বালায়, অশ্রু-জলে ভাসিতেছেন, আর কদলীপত্রের ন্যায় থর-থর কাঁপিতেছেন; এবং শার্ঙ্গরব ও গৌতমী প্রভৃতি যে সকল ঋষিতাপসী সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহারাও, হা ধর্ম্ম! হা বিধাতঃ! হা জগদীশ্বর! বলিয়া একবার ক্রোধে জ্বলিতেছেন, আর একবার ঊর্দ্ধ দিকে তাকাইতেছেন!

শকুন্তলার সহিত পাঠকের শেষ সাক্ষাৎকার স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যদেশে, হেমকূট নামক গিরিপ্রদেশে, মরীচিতনয় মহামুনি কশ্যপের আশ্রমে, অথবা আশ্রমের উপকণ্ঠস্বরূপ বৃক্ষবাটিকায়। সেখানে পতিলাঞ্ছিতা শকুন্তলার প্রাণসর্ব্বস্ব, শিশু সর্ব্বদমন, সিংহশিশুর কেশরে আকর্ষণ করিয়া, ক্রীড়া করিতেছে; এবং অকস্মাদাগত অনুতাপ-সন্তপ্ত দুষ্যন্ত, অদূরে দণ্ডায়মান রহিয়া, তাহাকে পিপাসু নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন শোকদুঃখাতুরা শীর্ণকলেবরা শকুন্তলা, শিশুর অন্বেষণে, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দুষ্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পাইয়া তাঁহার পাদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন; এবং আপনার স্মৃতিভ্রংশজনিত দুষ্কৃতির কথা উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিলেন।

এইরূপে, পাঁচ সাত বার ভিন্ন শকুন্তলার সহিত পাঠকের সাক্ষাৎকার নাই, এবং এই পাঁচ সাত বারেও পাঠক শকুন্তলাকে বহুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু সীতা, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সমস্ত সময়ই, পাঠকের নয়নসান্নিধ্যে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেব-প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মানা। জনক-গৃহে আরম্ভ করিয়া, এবং অযোধ্যার রাজধানী হইতে ভারতসাম্রাজ্যের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত শত শত গ্রাম, নগর, জনপদ, দুর্গগহন, সুখসেব্য বনভূমি, তীর্থ ও আশ্রম, গিরিপরিসর ও সরিৎসরোবর পার হইয়া, সাগরের পর-পারে,—লঙ্কার অশোকবনস্বরূপ অন্তর্দ্দাহি কারাগারে,—পরিশেষে বাল্মীকির তপোবন প্রভৃতি বিবিধ স্থানে, শত সহস্র প্রসঙ্গে, শত সহস্র বার, সীতার সহিত পাঠকের সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইয়াছে; এবং সীতার শত-ভাব-সমুজ্জ্বল, শ্বেত-শতদলপ্রতিম অমল-কোমল শুভ্রচরিত্র, একখানি সুখ-পাঠ্য সুবিস্তৃত গ্রন্থের মত, পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে।

কবি টেনিসনের সেই যে একটি গভীরার্থ কথা আছে—"A fierce light beats on the throne." অর্থাৎ একটা ভয়ঙ্কর আলোক সিংহাসনের উপর উদ্ভাসিত রহে, এ কথা সীতার সম্পর্কে সকল সময়েই অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তিনি যখন দুর্ব্বৃত্ত লঙ্কাধিপতির পাপনিবাসে,—মলিন বসনে—স্বতঃস্খলিত ফলমাত্র অশনে, বৃক্ষতলে অবস্থিত, তখনও রাবণের শত শত চেড়ী ও পুরচারি-নরনারী, দিবসে ও রাত্রিতে সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে; এবং তিনি যখন, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে, প্রাণারাম রামচন্দ্রের বর্ত্তুল বাহুর উপর নির্ভরে, 'বাতায়নাবর্ত্তকে' মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম করিয়াছেন, তখনও মনুষ্য তাঁহার চারিত্রবৃত্তের প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই বলিয়াছি, শকুন্তলার চরিত্র বড়ই অল্প স্থান, অল্প সময় ও অল্প কএকটি ক্ষুদ্র ঘটনায় সীমাবদ্ধ। অন্য দিকে, সীতার চরিত্র স্থানে দিগন্তবিস্তৃত, সময়ে প্রায় যুগ-যুগান্তরাল, এবং ঘটনার বৈচিত্র্যে ও ঘটনার বাহুল্যে একটা বিরাট জাতির ইতিহাসব্যাপি।

তথাপি, শকুন্তলা-চরিত্রে যে পাঁচটি দিকের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই পাঁচটি দিকের মধ্যে দুই তিনটি দিকের প্রতি সামান্য একটু দৃষ্টি রাখিয়া, দুইখানি চিত্র ক্ষণকাল তাকাইয়া দেখিলে, উভয়ের পার্থক্য অতি সহজেই পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু সে সকল কথার পূর্ব্বে, আগে দুইয়ের লোকাতীত রূপের কথা একটুকু কহিব। কারণ, রূপের কথায়, চারিত্ররহস্যের অশেষ কথাও আপনা হইতেই আসিবে। চারিত্র সমালোচনার উচ্চপ্রসঙ্গে রূপের অবতারণা অনেকের নিকট অনুপযুক্ত অথবা অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতে পারে। তবে, যাঁহারা চিন্তাশীল,—যাঁহারা চারিত্রতত্ত্ব ও আকৃতিবিজ্ঞানে অধীতী, তাঁহারা জানেন,—যে, "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি," —অর্থাৎ আকৃতি আর প্রকৃতি পরস্পরের প্রতিকৃতি;—অন্তরে যাহার নাম অমায়িক মধুরতা, বাহিরে তাহারই নাম রূপের মাধুরী;—অন্তরে যাহার নাম লীলাবিলাস, বাহিরে তাহারই নাম সলজ্জচাতুরী।

মাধুরী আর নির্ম্মল স্নিগ্ধ মোহনচাতুরী, শকুন্তলার রূপে, মুক্তাফলে লাবণ্যলীলার মত, সর্ব্বদা টল-টল করিত। সে রূপ যেন, পাতা ঢাকা গোলাপের মত, মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিয়া, অল্প অল্প ফুটিত,—অল্প অল্প হাসিত; এবং আপনাতে আপনি লজ্জিত হইয়া, লজ্জার অজ্ঞাত, অনিচ্ছাকৃত, ও অনায়ত্ত চাতুরীতে, আপনারই তনুতে লুকাইয়া রহিতে ভালবাসিত। সখীরা ইহা জানিতেন, এবং শকুন্তলার এই সলজ্জমধুর, স্বভাব-চতুর রূপের কথা তুলিয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে লজ্জা দিতেন;—তাঁহার সহিত কথায় কথায়ই সোহাগের কলহ অথবা ভালবাসার রঙ্গকৌতুক করিতেন। তপোবনের তৃষাতুর ভ্রমর আর কাহাকেও যেন চিনিত না। উহা স্ফুট কমল পরিত্যাগ করিয়া শকুন্তলার অর্দ্ধস্ফুট কমল-সদৃশ, সুন্দর মুখ

খানির কাছে যাইয়া, উড়িয়া উড়িয়া, খেলা করিত। শকুন্তলা যেমন সোনার অঙ্গে বাকল পরিতেন, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাও সেই-রূপ গাছের বাকলেই পিহিত থাকিতেন। কিন্তু সে বল্কলাম্বর আর কাহারও গায়ে বাধিত না; অথচ উহা শকুন্তলার বুকে বাধিয়া পরিহাস ও রসিকতার শত কথা জন্মাইত। যথা অভিজ্ঞান শকুন্তলে,——.

শকুন্তলা—"উহু উহু বুকে বাধে বুকের বাকল!
প্রিয়ংবদে, দৃঢ় বড় বেঁধেছিস্ তুই।
অনসূয়ে, খুলে দেলো সই!

অনসূয়া,—　　এই যাই।

প্রিয়ংবদা,—সই, ও তোমার যৌবনের দোষ, আমায়
কেন লো? তোমার ঐ যৌবনকে বস।

*　　*　　*

শকুন্তলা। দূর! জল-সেকে রাগ ক'রে, ছেড়ে ফুল-
কলি, পোড়া অলি অধরে বসিতে চায়।

*　　*　　*

শকুন্তলা। দূর! পোড়া! এ পাপ ত ছাড়ে না আমায়!
দূরে সরে যাই; এ কিলো বালাই! আসে
হেথা যে আবার!—সই, সই, রক্ষা কর,
আকুল করিল পোড়া ভ্রমরা আমায়।"

রূপ ও যৌবনের অভিনব সুখ-সঙ্গমে নবযুবতীর, অথবা ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা সরলা বালিকার, এইপ্রকার লাস্যে মাখা প্রমোদ-চঞ্চলতা তরল-প্রকৃতির ছল-খল খেলা নহে। উহা সরসীর জল-বিতানে মৃদুসমীর-সঞ্চালিত সুখ-রম্য লহরীর মত;—পবিত্র অথচ প্রীতি-প্রদ,—নির্ম্মল, নয়নানন্দ, প্রাকৃত উৎসব।

কিন্তু সীতার রূপ ও যৌবনে—সীতার লোকোত্তর সৌন্দর্য্যে, কি বা যৌবনের প্রথম উন্মেষে, কি বা উহার পূর্ণ বিকাশে, কোন দিনও এইরূপ নেত্র-কৌতুক বিভ্রমলীলা অথবা নবীন-বয়সের নিসর্গসুন্দর ছল-খল খেলা কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। রূপের পুতুল শকুন্তলা ফুটিয়াছেন তপোবনে, আর রূপসীগণের রাজরাণী সীতা ফুটিয়াছেন রাজ্যাধিপতির রাজভবনে,—বিলাস-বিভ্রমের বিদ্যালয়স্বরূপ বিনোদ-নিকেতনে। সীতার অঙ্গাভরণ স্বর্ণসূত্রগ্রথিত হীরা-মণি-মুক্তা ও প্রবাল; শকুন্তলার অঙ্গাভরণ মৃণাল-সূত্র-গ্রথিত শিরীশ-কুসুম ও মৃণালের বলয়। সীতার সখী-সঙ্গিনীরা প্রাসাদের বিলাসিনী, শকুন্তলার সঙ্গিনীরা আজন্মবনবাসিনী, তপস্বিনী! অথচ দুইয়ে প্রথম হইতেই কি পার্থক্য! বিকাশে কি প্রভেদ!

সীতা, যার-পর-নাই রূপসী হইয়াও রূপের রস-বিলাসে অশিক্ষিত। তিনি সৌন্দর্য্যের অপ্রতিম সম্পদে, তদানীন্তন জগতে, জগন্মোহিনী বলিয়া পরিচিতা; তথাপি প্রথম হইতেই যেন কেমন এক ভাবের ঘন আবরণে আচ্ছাদিতা। তাঁহাকে যে দেখিয়াছে, সে-ই তাঁহার মূর্ত্তিতে, বিদ্যুন্ময়ী রূপপ্রতিভার চমকের সঙ্গে, শারদী জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়াছে; অথচ সে মূর্ত্তিতে, শিশুসমুচিত সারল্যের সঙ্গেও, এমনই একটুকু মুগ্ধ গাম্ভীর্য্য ও মোহন মহিমার

ভঙ্গি প্রতিফলিত রহিত যে, স্নেহকারী গুরুজনেরা ভিন্ন, সকলেই তাঁহার নিকট নতনয়নে দণ্ডায়মান রহিতে বাধ্য রহিয়াছে।

দেবর লক্ষ্মণ সমানবয়স্ক সুহৃৎ, সুখ-দুঃখে নিত্য সহচর, এবং জীবনের সকল ঘটনায়ই নিয়ত অনুগামী। সে লক্ষ্মণও সীতার রক্তারবিন্দসদৃশ পা দুখানি মাত্র দেখিয়াছেন, কখনও মুখচ্ছবি অথবা অঙ্গ-লাবণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সীতা যদি কখনও উর্ম্মিলার কথা কহিয়া স্নেহকৌতুকে পরিহাস করিয়াছেন,তখনও লক্ষ্মণ, সে পরিহাসে গুরুজন-যোগ্য স্নেহেরই বিলাস মাত্র দর্শনে, মাথা হেঁট করিয়া, আর এক দিকে চাহিয়াছেন। লক্ষ্মণের এইরূপ আচরণ লক্ষ্মণ-চরিত্রের গৌরবখ্যাপক হইলেও, উহাতে সীতারও বিশেষ প্রতিষ্ঠার কথা আছে। কেন না, ভরত ও শত্রুঘ্নও তাঁহার নিকট লক্ষ্মণেরই মত অবস্থিত রহিতেন। রূপসীর পক্ষে ইহার অধিক সগৌরব-সম্মাননা ভারতীয় হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন দেশীয় মনুষ্যের কল্পনায়ও ঠাঁই পাইতে পারে না।

সীতা ও শকুন্তলায় রূপের বৈচিত্র্যে যে পার্থক্য, প্রেমের বৈচিত্র্যেও সেই পার্থক্য। সে পার্থক্য বরং একটুকু অধিকতর প্রসারিত। শকুন্তলার প্রেম, শ্যামকণ্ঠ সুন্দর কপোত দর্শনে বন-কপোতীর বিচিত্র উল্লাসের মত, আনন্দ-বিধুর। উহা একবার একটুকু পক্ষ বিস্তার করিয়া আনন্দে উড়িতে চাহে; আবার বিষণ্ণ ও গম্ভীর ভাবে কাছে বসে;—একবার আনন্দের উচ্ছ্বাসে কপোতের গায়ে যাইয়া উড়িয়া পড়ে, আবার দূরে সরিয়া আপনাতে আপনি অবস্থিত রহে।

কণ্বের তপোবনে, মনোহর-মূর্ত্তি দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনে, শকুন্তলারও ঠিক এমনই ভাব হইয়াছিল। তিনি লোক-লোচনের অগম্য বনে, বন-ফুলের মত, প্রস্ফুটিত হইয়া, সমস্ত বন-ভূমিকে রূপে ও সৌরভে আমোদিত করিয়াছেন। কিন্তু আজি পর্য্যন্ত সে রূপ কেহ তাকাইয়া দেখে নাই,—সে সৌরভ কেহ অনুভব করে নাই;—কেহ স্বহৃদয়ের উন্মাদনী পিপাসায় তাঁহার উচ্ছল, উদ্বেল, আনন্দবিহ্বল হৃদয়ে প্রেমের পিপাসা জন্মায় নাই। সুতরাং, তিনি যখন, সহসা দুষ্মন্তের রূপের আকর্ষণে চিত্তে বিচলিত, এবং তাঁহার তৃষিত-নয়নের অতি প্রবল আকর্ষণে প্রাণে চকিত ও তরলিত হইয়া, বন-কপোতীর অধীর-বিধুরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন প্রেমের সে নূতন অনুভূতিতে তাঁহার কেমন এক প্রকার লজ্জা-জড়তা, আর সেই লজ্জা লুকাইবার জন্য অধিকতর লজ্জাকুলতা, সমুদ্ভূত হইয়া সহজেই ধরা পড়িল; এবং যিনি সে সাম-সঙ্গীত-প্রতিধ্বনিত তপোবনের কুশাসন-শয্যায় স্বপ্নেও কখনও প্রেমের কথা চিন্তা করিবার সুযোগ পাইতেন না, প্রকৃতি আপনিই, তাঁহাকে প্রেমের মোহন-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে সহসা এক অভাবনীয় পরিবর্ত্ত ঘটাইল।

শকুন্তলা আপনি যেমন এত দিন প্রেম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞা। তাঁহার প্রাণ-সখীরাও এ রসের মর্ম্মোদ্ভেদে একবারে অযোগ্য।

তাঁহারা প্রেমের কথা যাহা শিখিয়াছেন, তাহা "ইতিহাস-কথা-নিবন্ধন-শ্রবণে।" কিন্তু শকুন্তলা এইক্ষণ অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিলেন যে, তিনি প্রেমের দুশ্ছেদ্য প্রসূন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরাধীন হইয়াছেন,—তাঁহার সখীরাও সহজেই বুঝিতে পাইলেন যে, তাঁহার ঘোরতর অবস্থান্তর ঘটিয়াছে;—বালিকার মুকুলিত-প্রাণ, নিয়তির অলঙ্ঘনীয় শাসনে, পরের হাতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। সখীরা যখন, শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ-কাতরতা দেখিয়া, ক্লিষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন, তখন উভয়েই বলিলেন;—যথা অভিজ্ঞান শকুন্তলে,—

"হলা শকুন্তলে! অনভ্যন্তরে খলু আবাং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু যাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানাং অবস্থা শ্রূয়তে, তাদৃশীং তে প্রেক্ষে। কথয় কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ।"

দেখ্ ভাই শকুন্তলা, তোর হৃদয় কি তবে প্রেমের যন্ত্রণায় পরবশ হইয়াছে? প্রেম কাহাকে বলে, তাহার ত কিছুই আমরা জানি না। প্রেমের কথা, যাহা কিছু হউক, উপাখ্যানেই শুনিয়াছি। উপাখ্যান-কথিত প্রেমাকুলা যুবতীদিগের যেরূপ অবস্থার কথা শুনিয়া থাকি, তোরও ত তেমনই অবস্থা। বল্ ভাই, তোর প্রাণের কথা আমাদিগকে খুলিয়া বল্। তুই কি নিমিত্ত এইরূপ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিস্, তাহা আমাদিগের কাছে প্রকাশ কর্।

এইরূপ কৃত্রিমতা-শূন্য, স্বভাব-সমুৎপন্ন কানন-কুসুম-সদৃশ মধুর প্রেম,—যজ্ঞধূম-বর্দ্ধিতা তপোবন-স্ফুটিতা বাল-যুবতীর এইরূপ তাড়িতাকৃষ্ট প্রেমাবেশ সূক্ষ্মচিত্ত সামাজিকের চক্ষে যেমনই হউক, উহা দেবতার চক্ষে তুলসী-চন্দনের ন্যায় পবিত্র বস্তু। নয়নরাগে উহার উৎপত্তি,—হৃদয়রাগে উহার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ, এবং আত্মোৎসর্গে উহার অবসান। উহার আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই প্রকৃতির স্বভাব-কোমল অমল বিলাস। কণ্বহেন কুলপতি ঋষি এবং মরীচিনন্দন কশ্যপের মত মহা মনীষী মুনির চক্ষেও উহা পবিত্র ও প্রীতিকর বোধ হইয়াছিল। তাহা না হইলে, তাঁহারা অনুমোদন ও আশীর্ব্বাদ দানে শকুন্তলাকে অভিনন্দন করিতেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই প্রেম পূর্ণসৌন্দর্য্যে ফুটিবার-সুযোগ পাইল না। ফুটটি, ফোটো ফোটো অবস্থায়ই, অগ্নিশর্ম্মা দুর্ব্বাসার অকরুণ অভিসম্পাতে বৃন্তচ্যুত হইয়া, বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইল; এবং সে কঙ্কর-ভূমিতে অশ্রুজল-সেকে যতটুকু সজীব রহিতে পারে, ততটুকু-মাত্র সজীব রহিয়া, কালে আবার মুহূর্ত্তের তরে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রীতি জন্মাইল।

সীতার প্রেম সর্ব্বাংশেই অন্যবিধ পদার্থ। যদি রমণীর হৃদয়, এ সংসারে, কোথাও একই আধারে, মাতৃস্নেহের কোমল-মধুর গভীর-ভাব এবং পতিপরায়ণীর উদ্দাম উন্মাদ, মানসিক রসায়নে মিলাইয়া মিশাইয়া, কোন দিন একসঙ্গে পোষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সীতাই সেই হৃদয় লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যদি রমণীর হৃদয়, কোন দেশেও, কোন কালে, আনন্দ-ডগ-মগ অমিয়মধুর প্রফুল্ল প্রেমের পুষ্পিত অনুরাগ, এবং নির্ভয়-নিঃসঙ্কোচ সুখ-সৌহার্দ্দের উচ্ছ্বসিত সোহাগ—প্রাণভরা ভালবাসার তর-তর-স্রোতে একই সঙ্গে প্রবাহিত করিয়া, পতিপ্রাণকে শতবিধ সন্তর্পণে শীতল রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে সীতাই সেই হৃদয় লইয়া—মানবজীবনের লীলাক্ষেত্রে ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

সীতার প্রেমে নয়ন-রাগ না ছিল, এমন নহে। উহা নয়ন-রাগে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া না থাকিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি যখন সখীদিগের সান্নিধ্যে, অথবা দেবর লক্ষ্মণ প্রভৃতির সম্মুখে, শ্রীরামচন্দ্রের "নববিকশিত, নীলোৎপল-শ্যামল, স্নিগ্ধমসৃণ মধুর-কোমল মাংসল-দেহ-শোভার" বর্ণনা করিতেন, তখন তাঁহার সময়জ্ঞান থাকিত না, সঙ্কোচ থাকিত না, এবং সবল হৃদয়ের আনন্দ-প্রবাহ যুবতীসুলভ লজ্জার শাসনও মানিতে চাহিত না। * কিন্তু তাঁহার এইরূপ নয়ন-রাগ অপেক্ষা গুণানুরাগ, এবং গুণানু-রাগ অপেক্ষাও হৃদয়-রাগ ছিল শতগুণ অধিক। তিনি গুণানুরাগে, রামচন্দ্রকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর এবং বীর-জগতের ধুরন্ধর জ্ঞানে, সততই রমণীর অভিমানে ধ্যান করিতেন; আর তাঁহাকে দয়া ও প্রেমের প্রত্যক্ষ অবতার বলিয়া সম্যক্ বুঝিয়া, হৃদয়-রাগের সুখাবহ আবেগে, প্রেমের সোহাগে তাঁহাকে পূজা করিতেন।

সে হৃদয়-রাগের আকর্ষণে সীতা সেবায় শ্রীরামচন্দ্রের দাসী,—সংসারে তাঁহার সতত শুভাভিলাষি-সুহৃৎ,—জীবনের সুখ-দুঃখে নিত্যসঙ্গিনী,—কথোপকথনে সমান-হৃদয়া বয়স্যা,—হৃদয়ের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষায় সাথের সাথী, আমোদবিলাসে অপ্সরা—এবং রাম চিন্তায় চিত্তসমর্পণে—রাম-প্রেমরূপ পীযূষ-সমুদ্রে নিরন্তর সন্তরণে, সর্ব্বতোভাবে রাম-ময়ী।* রাম যেন একটি ইন্দ্রনীলমণিখচিত নয়নমনোহর অমূল্য পুতুল; সীতা সে পুতুলের অধিস্বামিনী;—প্রেমের 'গরবে,' পুষ্পিত কৈশোরেও, প্রগল্‌ভা কামিনী। তিনি তাঁহার প্রাণের পুতুলটি ঝাঁপীপেটারীতে লুকাইয়া রাখিবেন, না আঁচলে বাঁধিয়া, কাছে কাছে রাখিয়া, সর্ব্বদা নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতেন না। জগতে এ প্রেমের আর উপমাস্থল কোথায়? এ প্রেমের অনুকৃতিই বা রাম-সীতার অলৌকিক জীবন ভিন্ন আর কোথায় সম্ভবপর হইতে পারে? ইহা অপার্থিব পদার্থ। পৃথিবীতে ইহা একবার মাত্র ফুটিয়াছে; এবং একবার ফুটিয়া, আপনার অলোকসাধারণ শোভা ও সমৃদ্ধি প্রদর্শন দ্বারা, মানবহৃদয়রূপ অনন্ত আকাশের ঊর্দ্ধধামে ধ্রুব-নক্ষত্রের মত অবস্থিত রহিয়া,

* এইরূপ ভাবের একটি কবিতা মহানাটকে পড়িয়াছি; উহা এক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। চিরকৃতজ্ঞতাভাজন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়ও এইরূপ ভাবের আভাষ পাইয়াছি।

অদ্যাপি জগতের নরনারীকে দাম্পত্যপ্রেমের দিব্য জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিতেছে।

সীতার এই প্রেমে, নয়ন-রাগ যেমন ডুবিয়া গিয়াছিল গুণানু-রাগ ও হৃদয়-রাগে; হৃদয়-রাগ সেইরূপ ডুবিয়া গিয়াছিল আর একটি উচ্চতর বস্তুতে। সে বস্তুর নাম ভক্তি। সীতা রামচন্দ্রকে একখানি গ্রন্থের ন্যায় পাঠ করিয়াছিলেন; এবং সে মহা-গ্রন্থে যে সকল মহাতত্ত্বের পরিচয় পাইয়া-ছিলেন, তাহাতে তিনি নবযৌবনের আনন্দ-স্ফুরণ সময়েও, রামভক্তিরূপ পুণ্যতীর্থে অবগাহন করিয়া, আপনাকে আপনি এক-বারে হারাইয়াছিলেন;—আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই তদ্গত ভক্তির তত্ত্ব অরুন্ধতী ও অনসূয়া প্রভৃতি সতীসাধ্বী ঋষিপত্নীরা, এবং বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ ও অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিরা ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন; এবং বুঝিতে পাই-য়াই তাঁহারা, যুবতী সীতাকে, দেবযুবতী জ্ঞানে, স্নেহার্দ্রভক্তির পুষ্পাঞ্জলিদানে, পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সীতার এই প্রেমমিশ্রা ভক্তি যখন আবেগভরে আলো-ড়িত হইত, তখন তাঁহার প্রেমময় হৃদয়ের নিত্য পরিলক্ষিত সুখ-সোহাগের ভালবাসা একটা সমুদ্রের মত উথলিয়া উঠিত; এবং পৃথ্বীভার-বহনক্ষম শ্রীরামচন্দ্র, অতবড় গভীর-সত্ত্ব পুরুষ হইয়াও, সেই সমুদ্রে হাবুডুবু খাই-তেন। ইহার নিদর্শন রামের বনযাত্রা সময়ে সীতার ভাববিহ্বলতা।

শ্রীরামচন্দ্র যখন, পিতার শ্রদ্ধাবাৎসল্যে, প্রাতঃ সময়ে রাজ্যাভিষেকের জন্য আহূত হইয়া, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই বনবাসের জন্য আদিষ্ট হইলেন, তখন সমগ্র অযোধ্যা, শোকাতুরা পুত্রহারার ন্যায়, একীভূত হাহা-কার শব্দে অবনীকে বিচলিত করিল। সে হাহাকার শব্দ, প্রাসাদে—প্রাচীরে ও পর্ব্বত-গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, চারিদিকে কেমন একটা আতঙ্ক জন্মাইল। অযোধ্যার পশু-পক্ষীও যেন কাঁদিয়া আকুল হইয়া মানুষকে কাঁদাইল। কৌশল্যার বুদ্ধিলোপ হইল—দশরথের কণ্ঠরোধ ঘটিল। সে কাল পর্য্যন্ত পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃপদানত লক্ষ্মণের হৃদয়, ভক্তি-ভ্রষ্ট হইয়া, ক্ষণকালের জন্য বিপথে চলিল। কিন্তু কাব্যপূজিতা সীতার প্রেমসর্ব্বস্ব প্রাণে কাঁটার আঁচড়ও বিঁধিল না। তিনি তখন, মা-নুষের চক্ষে পলক পড়িতে না পড়িতে, কেমন এক পতিগাগলিনী দেবতার মুর্ত্তিতে পরি-বর্ত্তিত হইলেন; এবং শশুর ও শ্বশ্রুজনদিগে-রও মনে বিস্ময় জন্মাইয়া,—সমস্ত অযোধ্যা-বাসীকে চমৎকৃত করিয়া,—শ্রীরামচন্দ্রের পৌরুষী প্রতিজ্ঞাকেও প্রেমের কুসুম-পেলব পুষ্পদামে দলিয়া, বনযাত্রাভিলাষী পতির পার্শ্বে বনবাসিনী তাপসীর ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। তখন যে দেখিল, সেই বুঝিল যে, সীতার প্রেমই সতীর প্রেম। এ প্রেম, "মা ভৈষীঃ" বলিয়া, বরাভয়-করার মত, পতিকে প্রকৃতই আবরিয়া রাখে; এবং শিশির-সিক্ত সুকোমল কুসুম-মালার মত, সুখে ও দুঃখে, বিলাসে ও বিষাদে, সতত তাহার কণ্ঠে থাকে। শিশুমতি শকুন্তলায় এইরূপ চতুরস্র-

শোভিত অমানুষ প্রেম প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পাইল কৈ? সীতায় যাহা অযোধ্যায় ফুটিয়া,ত্রয়োদশবর্ষ-বনবাসে পতিপ্রেম-তপশ্চর্য্যার কঠোর-সাধনে পবিত্রিত,—অশোক-বনের কারাবাসে ও অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত,—পুনরায় অযোধ্যার প্রীতি-স্নেহপূর্ণ পুণ্যময় প্রাসাদে পূর্ণবিকাশে প্রদর্শিত, এবং পরিশেষে প্রজাধর্ম্ম-নিয়োজিত প্রাণ-বলিরূপ নির্ব্বাসন-দুঃখের পরমা শান্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, সখী-সোহাগ সংবর্দ্ধিতা শিরীশ-কোমলা শকুন্তলায় তাহা উপযুক্ত বিকাশ-লাভের অবকাশ পাইল কৈ?

সীতা ও শকুন্তলার প্রেমের পার্থক্য উভয়ের বিরহদশার চিত্রপট-নিচয়ে, আর এক প্রকারে অভিব্যক্ত। সে চিত্ররাজী সংসারে ও সাহিত্যে উপমাশূন্য। চিত্রের রেখাপাত-নৈপুণ্যে, প্রথম দর্শনের বিস্ময়াবেশ সময়ে, উভয়েই মুহূর্ত্তের জন্য এক-ভাবাপন্না ও এক-রূপার মত প্রতীয়মান হইতেছেন; অথচ মুহূর্ত্তের পরেই আবার নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পার্থক্যে প্রস্ফুট হইয়া, তপঃপূত চারিত্রসৌন্দর্য্যের দুইটি পৃথক্ মূর্ত্তিরূপে শোভা পাইয়াছেন। উভয়ই পার্থিব-রাজ্যের অধীশ্বরী, এবং প্রেমারাধ্য রূপরাজ্যের পূজ্যতমা রাজ্ঞী। উভয়েই পতিপ্রাণা, উভয়েই পবিত্রতার প্রতিকৃতি, অথচ দৈববিপাকের দুর্ব্বোধ্য গতিতে উভয়েই আজি পতি-বিরহিণী—বনবাসিনী। একজন নির্ব্বাসিতা, আর একজন নিগৃহীতা।

নির্ব্বাসিতা সীতা, একদিন, দেবতাদিগের কৌশলে, দণ্ডকারণ্যে আনীতা হইলেন। দেবতাদিগের তিরস্করণী শক্তির * মহিমায় তিনি সেখানে মনুষ্যলোচনের অদৃশ্যা। বিধাতার ইচ্ছায় বিরহসন্তপ্ত শ্রীরামচন্দ্রও অকস্মাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সীতা শ্রীরামকে দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু রাম, সীতার মূর্ত্তি চক্ষে দেখিতেছেন না। সীতার করুণাপূর্ণ কথাও কানে শুনিতে পাইতেছেন না। এ দিকে আবার শকুন্তলাও, দেবতাদিগের কৌশলে, কশ্যপের আশ্রমোপকণ্ঠে, অকস্মাৎ অনুতাপ-জর্জ্জরিত দুষ্যন্তের সন্নিহিতা হইয়াছেন। দুষ্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পাইতেছেন; কিন্তু দুষ্যন্তের সেই পুরাতন রমণীমোহন মূর্ত্তি এতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, শকুন্তলা দৃষ্টিমাত্রই তাঁহাকে সেই দুষ্যন্ত বলিয়া অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

সীতা যখন দণ্ডকারণ্যে প্রথম উপস্থিত হইলেন, তখন তমসা আর মুরলা তাঁহার মুখখানি দেখিয়াই হৃদয়ে মর্ম্মঘাতি দুঃখ

* যে সকল সুকৃতি নরনারী, পার্থিব দেহ ত্যাগের পর, দীর্ঘকাল অধ্যাত্মলোকে বাস করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা এখনও পৃথিবীতে সমাগত হইয়া, কোন কোন স্থানে, কদাপি এইরূপ তিরস্করণী শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই শক্তির দ্বারা যাহাতে আবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি দশ জনের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়াও দৃষ্টির বহির্ভূত রহিয়াছেন। Vide Experiences in Spiritualism by Berry.

অনুভব করিলেন। তমসা বলিলেন,—"হা এই কি সেই সীতা! মুখখানি বিষাদে পাণ্ডুবর্ণ, গাল দুখানি শুষ্ক ও শীর্ণ, পৃষ্ঠে কেশরাশি আলুলায়িত ও বিলম্বিত! বাছা আমার এ মূর্ত্তিতেও কিরূপ মনোহারিণী! দেখিলে বোধহয়, যেন করুণ রসের একখানি সজীব প্রতিমূর্ত্তি, অথবা শরীরবদ্ধা বিরহ-ব্যথা, স্বয়ং এ বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

"পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী।"

এইরূপ আবার শকুন্তলা যখন সহসা দুষ্যন্তের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন, তখন দুষ্যন্ত বলিয়া উঠিলেন,——

আহা এ কি সেই শকুন্তলা! পরিধান
ধূসর বসন, বদন বিশুষ্ক, শুষ্ক
ব্রত উপবাসে। বিলম্বিত কেশভারে
বাঁধা এক বেণী। আমা-হেন নিষ্করুণ
নিঠুরের লাগি, সুদীর্ঘ বিরহব্রত-
তপ-অনুষ্ঠানে শুদ্ধশীলা তপস্বিনী।

যথা অভিজ্ঞান, শকুন্তলে,——

অয়ে সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা। যৈষা—
বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, বিরহচিত্রের এই প্রথম পটে সীতা আর শকুন্তলা একরূপা। যেন সীতাই শকুন্তলা, শকুন্তলাই সীতা। আকৃতি আর প্রকৃতি, আচরণ ও অনুষ্ঠান, সমস্তই যেন এক। সুতরাং একটি হইতে আর একটিকে চিনিয়া লওয়াই কঠিন। কিন্তু ইহার পর-পর-পটে দৃষ্টি মাত্রই প্রতীয়মান হয় যে, শকুন্তলা অদ্যাপি সেই তপোবনের ক্রীড়াকন্দুকপ্রিয়া কমকৌতুক-বিলাসিনী সুহাসিনী কুমারী; আর সীতা অগাধ-গম্ভীর স্নেহকারুণ্য, অপ্রতিম পতি-প্রেম, পতিভক্তি, এবং প্রেমভক্তিমিশ্রা বৎসলভাব সমুদ্রসদৃশী স্বর্গসুন্দরী।

শকুন্তলা, দুষ্যন্তের সান্নিধ্যে ক্ষণমাত্র স্তম্ভিতবৎ ও অশ্রুসিক্ত রহিয়া, এবং পদানত দুষ্যন্তের হাতখানি হাতে তুলিয়া লইয়া, তাঁহার চিরসিদ্ধ শিশুবুদ্ধিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্যপুত্র,এ পোড়া আঙটি আবার তোমার হাতে কোথা হ'তে এল?" দুষ্যন্ত অতি সংক্ষেপে যথাযথ অবস্থা জানাইলেন; এবং শকুন্তলা তাহাতেই যেন অতীত দুঃখের সকল কথা ভুলিয়া গিয়া, আবার প্রাণসঙ্গিনীরূপে দুষ্যন্তের প্রাণে মিশিলেন। দুষ্যন্ত যখন, আপনার মোহজনিত নিষ্ঠুরতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় পুনরায় শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিতে যত্নপর হইলেন, তখনও শকুন্তলা সে শিশুকণ্ঠেই উত্তর করিলেন,—"না, না, না; আমি আর ওকে বিশ্বাস করি না। ও তোমারই হাতে থাকুক।"দুষ্যন্ত, ইহার পর, শকুন্তলাকে লইয়া কশ্যপকে প্রণাম করিবার অভিলাষ জানাইলেন। এ সময়েও শকুন্ত-

লার সেই শিশুভাব অপরিবর্ত্তনীয়। শকুন্তলা কহিলেন,—"না, আর্য্যপুত্র, তোমার সহিত গুরুজনের সম্মুখে যে'তে আমার বড় লজ্জা করে।"

বিরহিণী সীতায় এরূপ শিশুসমুচিত কমনীয়তার ক্রীড়া লালিত্য তত নাই; কিন্তু যাহা আছে, তাহা পৃথিবীর আর কোথাও কাব্যে কিংবা ইতিহাসে প্রতিফলিত হয় নাই। পূর্ব্বে কহিয়াছি যে, সীতার প্রেমে মাতৃস্নেহের বৎসলতা ও পতিপাগলিনীর প্রেমোন্মাদ বড়ই সুন্দর মিশিয়াছিল। পাঠক, একটুকু সহিষ্ণুতার সহিত তাকাইয়া দেখিলে, বিরহিণী সীতার তুলিচিত্রে তাহার অনেক নিদর্শন দেখিবেন; আর রমণীর চরিত্র, অমায়িক মুগ্ধতার শীতল জ্যোৎস্না, এবং অমানুষ মহিমার প্রখর জ্যোতির সম্মিশ্রণে, কিরূপ এক অপূর্ব্ব বস্তুতে পরিণত হয়, তাহাও ঐ পটে দেখিতে পাইবেন।

পাঠকের মনে আছে, সীতা, দেবতাদিগের প্রীতির আকর্ষণে, পঞ্চবটীর প্রসিদ্ধ বনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন; এবং সেখানে, "ইতি-উতি" দৃষ্টিপাত করিয়া, বনশোভা দেখিতেছেন। গোদাবরীর কুলকল-জল-কল্লোল মুখরিতা পঞ্চবটী সীতার প্রাণসখীসদৃশী! পঞ্চবটীর মৃগ-পাদপ ময়ূরহংসও তাঁহার প্রাণপ্রিয়। কেন না, তিনি যখন, রামের বনবাস-সময়ে, সুখশীতল ছায়ার ন্যায়, তাঁহার অনুগামিনী হইয়া, ত্রয়োদশবর্ষকাল এই পঞ্চবটীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিলেন, তখন বনভূমির মৃগ-বিহগ প্রভৃতি জীব, আর বিবিধ তরু ও বিবিধ লতাই তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত; এবং উহাদিগের সহিত আমোদ-উল্লাসেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। আজি তিনি, বহুকালের পর, তাঁহার সেই সুখস্মৃতির পঞ্চবটীতে, স্নেহময়ী তমসার সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া, বনের শোভাবৈভব দেখিতেছেন; এবং তাঁহার দুর্ব্বহদুঃখনিষ্পেষিত প্রাণটা, যেন বর্ত্তমান ক্ষণের সমস্তই ভুলিয়া, আপনা হইতে উথলিয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে বনের একপ্রান্তে অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল,—কে যেন গভীর কণ্ঠে কহিল,—

"বিমানরাজ এখানেই তুমি ভূতলে অবস্থিত হও।" *

দুঃখিনী সীতা বহুকাল এ মধুর কণ্ঠ কানে শুনেন নাই। তিনি কণ্ঠস্বর শুনিয়াই, ভয়ে ও উল্লাসে বিবশার মত হইয়া, বলিয়া উঠিলেন,—

"আহা হা! এ জল-ভার-পূর্ণ মেঘধ্বনির মত মধুর-গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি কোথা হইতে আসিল! কোথা হইতে আসিয়া আমার কান দুটিরে যেন ভরিয়া ফেলিল! আমার মত মন্দভাগিনীরেও মুহূর্ত্তের মধ্যে পুনর্জ্জীবিতবৎ করিল!" §

* "বিমানরাজ অত্রৈব স্থীয়তাম্।"

§"অম্মহে জল-ভৃত-মেঘস্তনিত-গম্ভীরমাংসলঃ কুতঃ নু এষঃ ভারতীনির্ঘোষঃ ভ্রিয়মানকর্ণবিবরাং মামপি মন্দভাগিনীং ঝটিতি উচ্ছ্বাসয়তি।"—মূলপ্রাকৃতের সংস্কৃত অনুবাদ।

সীতার কথায় ও তমসা ব্যবহারে তমসার চক্ষেও জল ঝরিল। তিনি সীতার দিকে চাহিয়া কহিলেন ;——

"কিমব্যক্তিহসি নিনদে কুতস্তোপি ত্বমীদৃশী, স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব, চকিতোৎকণ্ঠিতং স্থিতা।"

"বাছা, ময়ূরী যেমন মেঘের ধ্বনি মাত্র শ্রবণেই চকিত ও উৎকণ্ঠিতবৎ হয় ; তুমিও সেইরূপ, কোথা হইতে আগত, কার কি অপরিস্ফুট ধ্বনি শুনিয়াই, এরূপ আকুলা ও উতলা হইলে ?

সীতা কহিলেন,—"ভগবতি, আপনি কি কহিতেছেন—অপরিস্ফুট! আমি ত স্বরমাত্র শুনিয়াই বুঝিয়াছি, ইহা আমার আর্য্যপুত্রেরই কণ্ঠস্বর!" *

আজি দ্বাদশ বৎসর হইল, সীতা রামের চন্দ্রমুখখানি চক্ষে দেখেন নাই ; রামের মুখনিঃসৃত একটি মধুর কথাও কানে শুনেন নাই! তিনি, গর্ভভরালসা অবস্থায়, রামের বাম বাহুকে উপাধানের মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর হইতেই তিনি বনবাসিনী। প্রেমময় রাম, কি জন্য, তাঁহার প্রতি অকস্মাৎ এইরূপ বাম হইয়াছেন, তাহারও আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি অবগত নহেন। আজি সেই রামচন্দ্রের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণমাত্রই তিনি আনন্দে ঐরূপ উন্মাদিনী!

* "ভগবতি, কিং ভণসি অপরিস্ফুটমিতি, ময়া পুনঃ স্বরসংযোগেনৈব প্রত্যভিজ্ঞাতম্ আর্য্যপুত্র এব ব্যাহরতি।"

প্রেমের উপাসনায়, ইহার অধিক আত্মবিস্মৃতি, অথবা আত্মবিস্মৃতিজনিত উদারপ্রেমের ইতোধিক উচ্চতর ভাব, মনুষ্যের কল্পনায় প্রবেশ করিতে পারে কি ?

সীতার মুখের কথা পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই, শ্রীরামচন্দ্র সে বনে প্রবেশ করিলেন। তমসা কহিলেন,—"শুনিয়াছি এক শূদ্র মুনি, কঠোর তপোব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, রাজ্যে অশান্তি ঘটাইয়াছিল ; ইক্ষ্বাকুকুলের রাজা শ্রীরামচন্দ্র, তাহারই দণ্ডবিধানার্থ, জনস্থানে সমাগত হইয়াছেন।" তমসার কথায় সীতার প্রাণ, বুঝি ক্ষণমাত্র কাল, পাদ-দলিত-প্রেমের ক্রোধ-স্ফুরণে, ঈষৎ কলুষিত হইল। সীতা কহিলেন,—

"বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে, সে রাজা আজিও রাজধর্ম্ম হইতে কোন অংশে পরিহীন হন নাই।" *

রামচন্দ্র, সে সময়, বনের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, ধীরে ধীরে, ধৈর্য্য হারাইতেছিলেন। তিনি, পঞ্চবটীর যে সকল স্থানে, সীতার সহিত বিশ্রব্ধবিহারে, পাদচারে পরিভ্রমণ করিয়াছেন,—দুই জনে এক সঙ্গে যে সকল নির্ঝর, কন্দর, ও বিপুল-কলেবর বনতরু নিরন্তর দর্শন করিয়া আনন্দ করিয়াছেন, আজি এত দিনের পর, আবার সেই সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রাণের দুর্ব্বিসহ দহনে, ধীরে ধীরে চৈতন্য হারাইতে ছিলেন।

* "দিষ্ট্যা অপরিহীনরাজধর্ম্মঃ খলু স রাজা।"

সহসা তিনি সীতার দৃষ্টিপথে পড়িলেন। তিনি সীতাকে দেখিতেছেন না। সীতা তাঁহাকে দেখিলেন। কিন্তু যে সীতা এই-মাত্র বলিয়াছেন, যে, "ভাগ্যে রাজার রাজধর্ম্ম বিলোপ পায় নাই," সেই সীতাই, রামচন্দ্রের অন্তস্তাপশুষ্ক, অতিমাত্রমলিন, মুখখানি দেখিয়া, কপালে করাঘাত করিয়া, তমসারে কহিলেন,——

"হায় এই কি আমার আর্য্যপুত্র। মুখচ্ছবি, প্রভাতসময়ের চন্দ্রমণ্ডলবৎ পাণ্ডুবর্ণ,—শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল,—কেবল সেই পুরাতন সৌম্যগম্ভীর অনুভাব মাত্রের দ্বারা পরিচিত। হায় এই কি আমার আর্য্যপুত্র। তবে প্রিয়সখি, আমায় ধরুন, আমায় ধরুন।" *

সীতা, এইরূপ দুটি কথা কহিয়াই, তমসার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; এবং পাদ-দলিত-প্রেম, প্রেমানুরূপ মধুর ক্রোধে মুহূর্ত্তকাল জ্বলিয়াও যে, পুনরায় মায়েব প্রাণে পরিণত হইতে পারে, যেন ইহাই সকলকে দেখাইলেন।

সীতাচরিত্রের এইরূপ আনন্দময়, উজ্জ্বল চিত্র অসংখ্য। ইহা কত দেখাইব, কত কহিব। তথাপি, প্রবন্ধের বিস্তৃতিভয়ে কুণ্ঠিত না হইয়াও, এখানে তাদৃশ দুই চারিটি চিত্র লইয়া, সামান্য একটু আলোচনা আবশ্যক ও অপরিহার্য্য। রাম, দূরে দাঁড়াইয়া, বনদেবতা বাসন্তীর সহিত সীতা-প্রসঙ্গে কথা কহিতেছেন, আর অশ্রুধারায় ভাসিতেছেন ; সীতাও রামের মূর্ত্তি দর্শনে দরদরিত ধারায়, অশ্রু মোচন করিতেছেন ; এবং একদৃষ্টিতে, একমনে, রামের দিকে তাকাইয়া রহিয়া, যেন নয়ন-পিপাসার পরিপূর্ণতর্পণে, রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তখন তমসা, সীতার তথাবিধ আড়ষ্টমূর্ত্তি দেখিয়া, চিত্তে একটুকু আকুল হইলেন। তাঁহারও চক্ষু আর্দ্র হইল। তিনি, সীতাকে স্নেহেব আলিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া, স্নেহগদ্গদ-কণ্ঠে কহিলেন,——

"বিলুলিতমতিপূরৈর্বাষ্পমানন্দশোক-
প্রভবমবসৃজন্তী তৃষ্ণয়োত্তানদীর্ঘা,
স্নপয়তি হৃদয়েশং স্নেহনিঃস্যন্দিনী তে
ধবলবহুলমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেব দৃষ্টিঃ।"

বাছা, তোমার চক্ষু দুটি ত হৃদয়েশ্বরকে শুধুই তাকাইয়া দেখিতেছে না ; দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, যেন তোমার স্নেহ-নির্ঝরা দৃষ্টি, স্নেহের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া, তাঁহাকে স্নাত করিতেছে। তোমার নয়নে একদিকে বহিতেছে আনন্দের অতি প্রবল ধারা, আর একদিকে বহিতেছে শোকের বিগলিত অশ্রু। তুমি যতই দেখিতেছ, তোমার দেখিবার তৃষ্ণা ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। সে অতৃপ্ত তৃষ্ণায় তোমার দৃষ্টি বিস্ফারিত, এবং রামকে যাইয়া যেন একবারে স্পর্শ করিতে পারে, এই ভাবে দীর্ঘা-

* "হা কথং প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলাপাণ্ডুর-পরিক্ষাম-দুর্ব্বলেন আকারেণ অয়ং স সৌম্য-গম্ভীরানুভাবমাত্রপ্রত্যভিজ্ঞাত আর্য্যপুত্র এব, তৎ ধারয়তু মাং প্রিয়সখী।"

য়ত। চক্ষে অঞ্জন নাই, তাই দৃষ্টি ধবল-বহুলা, অথচ মনোহারিণী। যেন দুগ্ধের একটি শুভ্রধারা, চক্ষু হইতে প্রবাহিত হইয়া, রামে যাইয়া স্পৃষ্ট হইয়াছে।

সীতার উল্লিখিতরূপ দৃষ্টিতে কতটুকু গভীর বাৎসল্য, কতটুকু বা গভীরতর অনুরাগ,—কতটুকু স্নেহের কোমল মাধুরী, কতটুকু বা উচ্ছ্বসিত প্রেমের উদ্বেল লহরী, বুদ্ধি তাহা অবধারণ করিতে না পারিলেও, হৃদয় একটু একটু অনুভব করিতে পারে। তাঁহার চিত্ত তখন মেঘমালার বিবিধবর্ণ-চিত্রিত সান্ধ্যগগন সদৃশ; আর বিষাদ-খিন্ন অবসন্ন রামের প্রেম-স্নেহময় চারিত্রজ্যোতিঃ সান্ধ্যগগনে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ। সন্ধ্যাকালের আকাশ যেমন, সায়ন্তন সূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে, ক্ষণে ক্ষণে, নানারূপ বর্ণের অনুরঞ্জনে ও পরিবর্ত্তনে, কেমন এক অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে; সীতার চিত্তও তখন, হর্ষ বিষাদ, আনন্দ ও ঔদাস্য, এবং করুণা ও সমবেদনা প্রভৃতি বিবিধ ভাবের প্রতিক্ষণ-পরিবর্ত্তন-জনিত ক্রীড়ার প্রভাবে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় পরিণত হইতেছে। উহাতে একবার ফুটিতেছে পতি-প্রাণার আকুলতা, আবার ফুটিতেছে প্রেম-পাগলিনীর সোহাগের অভিমান। একবার প্রতিভাত হইতেছে অভিন্নহৃদয় বন্ধুতার অটল ও অন্ধবিশ্বাস, আবার প্রতিভাত হইতেছে অস্থিপঞ্জর-দাহিনী করুণার উচ্ছ্বাস। এই উছলিয়া পড়িতেছে প্রাণভরা ভালবাসা, এই প্রবাহিত হইতেছে পতিস্নেহের নির্ম্মল সুখ-পিপাসা। সীতাহৃদয়ের যে সকল কথা, হৃদয়ের মর্ম্মস্থানকেও যেন বিদীর্ণ করিয়া, এ সময়ে অধরে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহার দুই একটি শুনিলে, পাঠক সীতাচরিত্রের সান্নিধ্যে পঁহুচিতে অবশ্যই কিঞ্চিৎ সহায়তা লাভ করিবেন; আর পতিপ্রেমাকুলা পুর-সুন্দরীরা নিশ্চয়ই প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

রামচন্দ্র, পঞ্চবটীর ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিয়া, সীতার কথা ভাবিতে ভাবিতে কহিতে লাগিলেন,—"হা! যে আগুন এতদিন বুকের মধ্যে পাথরের চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম, সে আগুন আজি পঞ্চবটীর বিবিধ দৃশ্য দর্শনে অতি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে; এবং আগুনের ধূম-রাশি পূর্ব্বেই আমার বুদ্ধি ও হৃদয়কে যেন একবারে আচ্ছাদন করিয়া মোহ জন্মাইতেছে।* হা প্রিয়ে জানকি! তুমি এ সময় কোথায়? হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাস-প্রিয়সহচরি! হা বিদেহরাজকুমারি! তুমি এখন আমায় দেখিতে পাইতেছ না।"

কহিতে কহিতে রাম, মূর্চ্ছিত হইয়া, নিস্পন্দবৎ ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন; এবং সীতাও তখন তমসার পায়ে পড়িয়া আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বিনাকারণে নির্ব্বাসিতা হইয়াছেন,—অগ্নির ন্যায় অমল-স্বভাবা হইয়াও পিশাচীর যোগ্য লাঞ্ছনা পাইয়াছেন, এ কথা তাঁহার

* "অন্তর্লীনস্য দুঃখাগ্নেরদ্যোদ্দামং জ্বলিষ্যতঃ উৎপীড় ইব ধূমস্য মোহঃ প্রাগাবৃণোতি মাং।"

মনে নাই। তাঁহার মন ও প্রাণ তখন রামের পুনরুজ্জীবনে,—রামের প্রাণ-রক্ষণে। তিনি, তমসার পা দুটি ধরিয়া, কেবল এই এক কথা কহিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন,—"দেবি, আমার আর্য্যপুত্রকে এইক্ষণ প্রাণে বাঁচাও, আমার আর্য্যপুত্রকে রক্ষা কর।"

তমসা কহিলেন,—"বাছা, ইহা কি আমার দ্বারা সম্ভবে? তোমার প্রীতিকর করস্পর্শই রামের শরীরে অমৃতস্বরূপ। তুমি যাইয়া স্পর্শ কর, তাহাতেই তিনি প্রাণে বাঁচিবেন।

"ত্বমেব নম্বু কল্যাণি সঞ্জীবয় জগৎপতিম্।
প্রিয়স্পর্শো হি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তো ভরঃ।"

সীতা কহিলেন,—"জং হোদু, তং হোদু, জহা ভঅবদী ভণাদি";—যা হবার তা হউক, ভগবতী যাহা কহিতেছেন, তাহাই করিব। অর্থাৎ—আমি অভাগিনী এখন আর রাম-সেবায় অধিকারিণী নহি। রামচন্দ্রকে দর্শনদান করাও আমার পক্ষে অবৈধ ও নিষিদ্ধ। অতএব, এ ভাবে, এরূপ সহসা সন্নিধান-গমনে আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক,—রাম আমার প্রতি রুষ্ট কিংবা তুষ্ট যাহাই হউন, আমি এ সময়ে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া দূরে থাকিতে পারিব না। সুতরাং, ভগবতী তমসা যাহা কহিয়াছেন, তাহাই করিব।

সীতা, রামের পার্শ্বে যাইয়া, ধীরে ধীরে, তাঁহার ললাটে, কপোলে ও বক্ষঃস্থলে, হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রেমময়ীর সেই চির-পরিচিত, চন্দন-পল্লব-নিঃস্যারবৎ সুকোমল,—শরৎকালীন জ্যোৎস্নার ন্যায় সুশীতল করস্পর্শে সীতাগত-প্রাণ রামচন্দ্রের চৈতন্য জন্মিল। তাঁহার বহির্গমনোন্মুখ প্রাণ, আবার যেন দেহে ফিরিয়া আসিল।

রাম প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন, ইহাতেই সীতা শত কৃতার্থ। তাঁহার হৃদয়ে তখন আনন্দ আর ধরে না। তিনি একটুকু দূরে দাঁড়াইয়া হর্ষগদ্গদকণ্ঠে আপনাতে আপনি দুই একটি কথা কহিলেন। তার-পর, তৎক্ষণাৎই আবার, ভাবান্তরে অভিভূত হইয়া, আরও একটুকু দূরে সরিলেন; এবং কি যেন ভাবিয়া কহিলেন;—"এত্তিঅং এব্ব দানীং মে বহুদরং"—এখন এতটুকুই আমার পক্ষে বহুতর,—অর্থাৎ আমি অভাগিনী নির্ব্বাসিতা,—পতিসেবার সুখ-সৌভাগ্যে বঞ্চিতা। আমি যে এ সময়ে প্রাণনাথের এতটুকু সেবা করিবার সুযোগ পাইলাম, ইহাই আমার পক্ষে বহু। এই অক্ষর কএকটির মধ্যে ক্রোধ থাকিলে, সে ক্রোধ কুসুমের মত কোমল; আর অভিমান থাকিলে, সে অভিমানও অমৃতের মত শীতল।

কিন্তু ক্রোধ আর অভিমান, ইহার পর আর দুই একটি কথায়, অধিকতর স্ফুট হইল; এবং নবীনবয়ঃসমুচিত প্রণয়-কলহের দুই একটি মিঠা কথায় স্পষ্টতর ফুটিয়া, পরিশেষে প্রেমের উচ্চতর গ্রামে যাইয়া শোভা পাইল। রামচন্দ্র সীতার শৈশবাবধি সুপরিজ্ঞাত স্পর্শসুখে, মৃতদেহে প্রাণলাভের মত, অবসন্ন দেহে চৈতন্যলাভ করিয়া, উঠিয়া বসিলেন, এবং বুঝি বা স্নেহময়ী সীতাই অলক্ষিতভাবে তাঁহাকে প্রাণে রক্ষা করি-

য়াছেন ইত্যাকার অনিশ্চিত জ্ঞানে, "হা প্রিয়ে জানকি, তুমি কোথায় ?" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সীতা তখন তমসার দিকে চহিয়া আগে কহিলেন—"হা ধিক। হা ধিক। এ কি। আর্য্যপুত্র যে সত্যসত্যই আমায় খুঁজিতেছেন! তারপর তমসাকে বলিলেন,—ভগবতি, আসুন আমরা এই সময়ে সরিয়া পড়ি। আমি অনুমতি বিনা এখানে আসিয়াছি। আমায়, এমন অবস্থায়, এখানে চক্ষে দেখিলে, 'মহারাজ' আমার যদি অধিকতর কুপিত হন।

এ স্থলে 'মহারাজ' শব্দে নির্ব্বাসিতার ভয়, না পতিপ্রাণার অভিমান, অধিকতর প্রকাশিত, তাহা বুঝিতেছি না। তমসাও বুঝিলেন না। তমসা কহিলেন বাছা, দেবতার বরে তুমি বনদেবতার চক্ষেও অদৃশ্য। রামচন্দ্র কখনও তোমায় দেখিতে পাইবেন না। রাম আবার "প্রিয়ে জানকি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সীতা এবার কহিলেন,—

"আর্য্যপুত্র, এ অভাগিনীরে এইরূপ সম্ভাষণ করা, এখন বোধ হয় একটুকু অসদৃশ হয়। অথবা, আমি বজ্রময়ী, অকারণ কেন, তোমার প্রতি হৃদয়ে ক্রোধের ভাব পরিপোষণ করিব ? তুমি জগদ্দুর্ল্লভ পুরুষ। জন্মান্তরেও তোমার দর্শনলাভ সুদুর্ল্লভ। তুমি যে এখনও এই মন্দভাগিনীকে এইরূপ স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ কর, ইহাই আমার বহু লাভ। তোমার হৃদয় যে কি বস্তু, তাহা আমি জানি। আমার হৃদয়ও তোমার অজ্ঞাত নহে।*

সীতার মুখে, কিছুকাল পরে, এই ভাবের কথা আর একবার যাহা উচ্চারিত হইল, তাহা গাঢ়তর বিশ্বাস এবং অতি বড় প্রগাঢ় প্রেম-স্নেহের পরিচায়ক। সীতা কহিলেন,—"হা দৈব! ইনি আমা ছাড়া, আর আমিও ইহঁা ছাড়া, ইহা কে সম্ভাবনা করিয়াছিল! ইহাঁকে এইক্ষণ যে দেখিতে পাইতেছি, ইহা পুনর্জ্জন্মের মত বোধ হইতেছে। তবে একবার চক্ষের জল মুছিয়া ইহাঁর স্নেহময় মূর্ত্তি খানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই।" †

এই ভাবে, বিরহদগ্ধ হৃদয়ের বিলাপে ও প্রলাপে, পঞ্চবটীর সেই প্রাণারাম বনে, রাম-সীতার বহু সময় অতিবাহিত হইল। রামচন্দ্র, সীতাকে চক্ষে না দেখিয়া, অথচ মাঝে মাঝে সীতার সুকোমল স্পর্শের পরিচয় পাইয়া, কখনও মুক্তকণ্ঠে পরিতাপ, কখনও বা প্রমুক্তধারায় অশ্রুবিসর্জ্জনে, প্রাণে একটুকু শান্তিলাভ করিলেন; এবং পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হই-

* "অহম্ এতস্য হৃদয়ং জানামি, মম এষঃ।" ইত্যাদি।

† "হা দৈব এস ময়া বিনা, অহং এতেন বিনা ইতি কেন সম্ভাবিতম্ আসীৎ, তৎ মুহূর্ত্তকম্ অপি জন্মান্তরতইব লব্ধদর্শনং বাষ্পসলিলান্তরেষু, প্রেক্ষে তাবৎ বৎসলং আর্য্যপুত্রং।"

লেন। সীতার তখন যে ভাব হইল, তাহা মনুষ্যের অপূর্ণ ভাষায় অনির্ব্বচনীয়।

সীতার সখী বাসন্তী পঞ্চবটীর বনদেবতা। তিনি সেখানে, বনবাসিনী তপস্বিনীর ন্যায়, পর্ণকুটীরে অবস্থান করেন; এবং যাঁহারা অকস্মাৎ বনভূমির আতিথ্যগ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগকে ফলমূলের অর্ঘ্যদানে অভ্যর্থনা ও আর পাঁচ প্রকার মঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে, আপনার পুণ্যময় জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এতক্ষণ তাঁহার সহিতই শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথন হইতেছিল। বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রকে অনুযোগ অথবা উপদেশ দিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি রামচন্দ্রকে সীতার সুনির্ম্মল চরিত্রবর্ণন-প্রসঙ্গে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহা মধুমিশ্রিত বিষ-ধারার মত। কথাগুলি কানে শুনিতে ভাল লাগিয়াছে; অথচ প্রত্যেক কথাই, রামের প্রাণে বিষদাহের দুঃসহ যাতনা জন্মাইয়া, তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে। এইরূপ কথোপকথনের সময়ে, সীতা আগাগোড়াই রাম-গুণ-পক্ষপাতিনী। তিনি, এক এক বার, বাসন্তীর উপর প্রণয়কোপের ঝঙ্কার দিয়াছেন; আবার বাসন্তীকে সম্ভাষণ করিয়া মনে মনে কহিয়াছেন,—

"সখি বাসন্তি, তুমি বড়ই নিদারুণ, তুমি বড়ই নিষ্ঠুর। তুমি যে আমার আর্য্যপুত্রকে এইরূপ দুরক্ষর কথা শুনাইতেছ, ইহা তোমার যোগ্য হইতেছে না। আমার আর্য্যপুত্র সকলের নিকটই প্রিয় ব্যবহার পাইবার যোগ্য। বিশেষতঃ আমার প্রাণসখীর নিকট।" *

সেই বাসন্তী যখন রামচন্দ্রকে অযোধ্যাগমন বিষয়ে অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন, তখন আর সীতার প্রাণে ধৈর্য্য রহিল না। তখন সে ক্ষণিক ক্রোধ, ক্ষণিক প্রেম, ক্ষণিক অভিমান ও ক্ষণিক আবদারের সকল ভাব লোপ পাইল; এবং প্রেমভক্তি ও স্নেহবাৎসল্যের কেমন একটা সংমিশ্রণে, তাঁহার সেই চিরপরিচিত অপূর্ব্ব অনুরাগ তাঁহাকে মুহূর্ত্তের তরে আবার উন্মাদিনী করিয়া তুলিল। তাঁহার দুটি নয়নে তখন দরদরিত ধারা, অথচ সে নয়ন যেন, তৃষ্ণার আকুলতায়, তাঁহার দেহ হইতে বাহির হইয়া, রামচন্দ্রের মূর্ত্তিতে যাইয়া লাগিয়া রহিয়াছে।

সীতাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া তমসারও তখন বিশেষ প্রয়োজন। তমসা সীতার তাদৃক অবস্থা দেখিয়া বড়ই করুণকণ্ঠে কহিলেন,—"বাছা তুমি যাইবে কেমন করিয়া? তোমার চক্ষু কি আর তোমার দেহে আছে? তোমার তৃষ্ণাদীর্ঘ চক্ষু, যেন তোমার দেহ পরিত্যাগ করিয়া, রামের তনুতে যাইয়া রোপিতবৎ সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তুমি মর্ম্মচ্ছেদি যত্ন করিয়াও ত চক্ষু দুটি ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছ না।

* "সখি বাসন্তি, কিংত্বমসি এবংবাদিনী, প্রিয়ার্হঃ খলু সর্ব্বস্য আর্য্যপুত্রঃ, বিশেষতো মম প্রিয়সখ্যাঃ।"—পুনশ্চ—"ত্বমেব সখি বাসন্তি দারুণা কঠোরা চ যা এবমার্য্যপুত্রং প্রদীপ্তং প্রদীপয়সি।"

"প্রত্যুপ্তসোব দয়িতে তৃষ্ণাদীর্ঘস্য চক্ষুষঃ
মর্ম্মচ্ছেদপরৈর্যত্নৈরাকর্যো ন সমাপ্যতে।"

তমসার কথা এখন রামময়-জীবিতা সীতার কানে পশিল না। সীতার চক্ষু যেমন তখন দেহে নাই, কর্ণও তেমন তখন বশে নাই। তিনি সেইরূপ দৃঢ়লগ্ন, নিশ্চলনয়নে, রামের পানে চাহিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—

"নমো নমো অপূব্বপুন্নজণিদ-দংসণাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং।—অতি কঠোর পুণ্য বিনা যাঁহার দর্শন লাভ সম্ভবে না, আমার সেই আর্য্যপুত্রের চরণকমলে নমস্কার—আমার সেই আর্য্যপুত্রের চরণকমলে বারংবার নমস্কার।"

রামচন্দ্র দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন; সীতাও, ঐরূপ নমস্কারের কথা কহিতে কহিতে, মূর্চ্ছিত হইয়া, ধরায় লুটাইয়া পড়িলেন। যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন সীতা চক্ষের জল মুছিয়া, একটুকু সুস্থির হইয়া, কহিলেন,—"কিঅচ্চিরং বা মেহন্তরেণ পুণ্ণিমাচন্দস্স দংসণং।"—আহা! মেঘাপসরণের অবকাশে পূর্ণচন্দ্রের দর্শন লাভ কতক্ষণ সম্ভবপর হয়?

রমণীহৃদয়ের এইরূপ ভাবের নাম প্রেম, না ভক্তি,—না ইহা প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকশিত সমাবেশিত মূর্ত্তি, অথবা তাহা হইতেও উচ্চতর অন্য কোন ভাব, তাহা চিন্তা দ্বারা নিরূপণ করা সহজ না হইলেও, এ বিষয়ের চিন্তা বড় সুখজনক।

সীতার প্রেম ও সীতার প্রেমময় ভক্তির এই ভাব রামহৃদয়ে বিশেষরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তিনি, সীতাবিরহের দুর্ব্বিসহ বেদনা অপনোদনের জন্য, তদীয় স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, স্বগৃহে তাহা দেবপ্রতিমার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার প্রাণ যখন বড়ই ব্যাকুল হইত, তখন তিনি, সেই সোনার সীতা দেখিয়াই, আপনার তাপিত হৃদয় সন্তর্পণ করিতে যত্নপর হইতেন। রাম যে সময়ে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, যজ্ঞীয় আসনে উপবিষ্ট, সে সময়েও সীতার স্বর্ণপ্রতিমাই তাঁহার বামে সহধর্ম্মিণী।

কিন্তু বিরহব্যাকুল দুষ্যন্তের হৃদয়, শকুন্তলার জন্য অহোরাত্র লালায়িত রহিয়াও, এইরূপ তন্ময় হইতে পারে নাই;—তিনি, শকুন্তলার প্রেম-রাগে হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে রঞ্জিত হইয়াও, প্রেম-ভক্তির উচ্চতর ধামে পঁহুচিতে সমর্থ হন নাই। দুষ্যন্ত, চিত্রপটে শকুন্তলার একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি স্বহস্তে গোপনে আঁকিয়া, তাহাই অতি গোপনে,—নির্জ্জনে নিরীক্ষণ করিতেন; এবং পাছে রাজমহিষী বসুমতী সে পট দেখিয়া বিরক্ত হন, এই ভয়ে, বয়স্য মাধব্য আর অন্তঃপুর-পরিচারিকা চতুরিকার সাহায্যে উহা সর্ব্বদাই লুকাইয়া রাখিতেন।

শকুন্তলার সে চিত্রপট দর্শনে, দুষ্যন্তের নয়নে, মাঝে মাঝে অশ্রু ঝরিত। ইহা শকুন্তলাচরিত্রের গৌরবের কথা। শকুন্তলার চিত্তগত সৌন্দর্য্য দুষ্যন্তের হৃদয়ে কতকটা অঙ্কিত না থাকিলে, তাঁহার চক্ষু

কখনও আর্দ্র হইত না। কিন্তু তিনি, প্রথম সমাগম-সময়ে যেমন, শকুন্তলার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন, বিরহবহ্নির দহন-সময়েও, চিত্রপটে ঋষিবালার রূপের কথাই একটুকু বেসী চিন্তা করিতেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার রূপোন্মাদের পরিচয় দিতেন। যথা, শাকুন্তলে—

"অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্‌ভ্রমর প্রিয়ায়া-
স্তাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্॥"

অর্থাৎ,—

"কোমল পল্লব জিনি কান্তার অধর
চুমি নাই, প্রেমোৎসবে তৃষা মিটাইয়া।
তুমি যদি সে অধর চুমিবে, ভ্রমর!
কমল-কারায় তোমা রাখিব বান্ধিয়া।"

পক্ষান্তরে, রাম যখন সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমার নিকট উপবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহার হৃদয়, রূপের গ্রাম অতিক্রম করিয়া, প্রেমের অতি উচ্চতর স্তরে আরূঢ় হইত; এবং সে হৃদয় হইতে তখন নির্ম্মলা প্রেম ভক্তিই, সহস্র ধারায়, উচ্ছ্বসিত হইয়া, সমস্ত মানবজগৎকে প্রীতির উচ্চতম আদর্শ দেখাইত। যথা বাল্মীকীয়ে,—

"কাঞ্চনীং মম পত্নীং চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চকর্ম্মণি,
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ।"

এখানে একটি কথা হইতেছে। সীতা ও শকুন্তলার চারিত্রতুলনায় সীতাচরিত্রের যে সরল অংশ আদরের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকের এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, সীতা বুঝি একটুকু অতিরিক্ত ধীর-গম্ভীরা;—নবযৌবনের উল্লাস-সময়েও, একটুকু বেসীমাত্রায় নীহার-তুষারা,—নীরস-স্থবিরা। প্রকৃত কথা তাহা নহে। সীতার প্রকৃতিতে ধৈর্য্য আর গাম্ভীর্য্য, এবং সময় বিশেষে, পাষাণকঠিন স্থবিরতাও একটু প্রবল প্রভাবে প্রকাশিত হইত। নহিলে সীতা, রাবণকর্ত্তৃক অপহরণ, এবং অশোক-বনের অহর্নিশ দহনে, প্রাণে রক্ষা পাইতেন না। অমাংসলা শকুন্তলা, ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে, তখনই মূর্চ্ছিত অথবা মুমূর্ষুর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু সীতা তাদৃক্ দুর্ব্বিপাকেও, সিংহীর দৃপ্তশক্তিতে, পতির গৌরব ও সতীর সম্মান রক্ষা করিয়াছেন; এবং রমণী কোমল-হৃদয়ের কমল-দলের মধ্যেও কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বিতা পোষণ করিতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া, পৃথিবীর রমণীকে পবিত্রতার দেব-প্রভাব বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। তবে, এই ধৈর্য্য, এই অজেয় গাম্ভীর্য্য, এই জগজ্জয়ি তেজস্বিতা সত্ত্বেও, সীতা স্বভাবতঃ কিরূপ "শাদা সিধা" সরলা অবলা,—কিরূপ নম্রনয়না, নবনীত-কোমলা সলজ্জ-মধুরা সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার একটি-মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব।

শ্রীরাম যখন বাসন্তীর সহিত স্বর্ণসীতা-প্রসঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, তখন সীতাও অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছিলেন। সীতা সে সময় যে সকল কথা কহিয়া তমসার কাছে লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে, সকলেরই

এই বোধ হইবে যে, এমন মুগ্ধস্বভাবা রমণী বুঝি এ পৃথিবীতে আর জন্মিবে না। যথা রাম ও বাসন্তীর কথোপকথনে,—

রাম বাসন্তীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে যাইতেছি। সহধর্ম্মিণী বিনা যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় না। তাই আমাকে যজ্ঞের প্রয়োজনে সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করিতে হইয়াছে।" সীতা অদূরে দণ্ডায়মানা ছিলেন। রামের কথায় তাঁহার বুক থর-থর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি, চকিতবৎ কহিলেন,—"কে সে আর্য্যপুত্র ?"

পাঠকের মনে আছে, রাম সীতাকে যেমন দেখিতে পাইতেছেন না, সীতার কথাও তেমন কানে শুনিতেছেন না। রাম বাসন্তীরে কহিলেন—"আমার সহধর্ম্মিণী স্বর্ণময়ী সীতাপ্রতিমা।"

এবার সীতার প্রাণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিল,—চক্ষে ধীরে ধীরে ধারা বহিল। সীতা কহিলেন,—

"হা আর্য্যপুত্র। তুমি আমার সেই আর্য্যপুত্রই বটে। তুমি এতদিনে আমার হৃদয় হইতে পরিত্যাগ-লজ্জার শৈল্য উদ্ধার করিলে।*

রাম বাসন্তীরে কহিলেন,—"আমি অশ্রুসিক্ত নয়নে সর্ব্বদাই সেই প্রতিমাখানি দেখি; এবং উহা দেখিয়াই প্রাণে শীতল থাকি।"

রামের এই কথায় সীতার হৃদয় গভীরতর আনন্দ অনুভব করিল। সীতা, তমসার দিকে চাহিয়া, আত্মপাসরার মত কহিলেন,—

"ধন্য সে প্রতিমা! যাহা আর্য্যপুত্রের নিকট এত সম্মানিত। ধন্য সে প্রতিকৃতি! যাহা এ ভাবে আমার আর্য্যপুত্রের চিত্তসন্তর্পণ করিয়া, সমস্ত সংসারের শুভসম্পাদনে সার্থক্য লাভ করিয়াছে।"*

সীতার জ্ঞান নাই যে, তিনি কাহার প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু তমসার সে জ্ঞান আছে। তমসা, সীতাকে গাঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে টানিয়া, একটুকু হাসিলেন; এবং সস্নেহকণ্ঠে, বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিলেন—

"অয়ি বৎসে, এবমাত্মা স্তূয়তে"—বাছা তুমি ত এ সকল কথায় আপনারই প্রশংসা আপনি করিতেছ। তমসার কথায় সীতার বোধ জন্মিল। তিনি লজ্জায় একবারে জড়সড় হইয়া, মাথা হেঁট করিয়া, কহিলেন,—"হা ছি ছি! ছি ছি! এ কি করিলাম! এ কি কহিলাম! আমি আপনার কথায় আপনি উপহসিত হইলাম।"

রমণীহৃদয়ের অশেষ জগদারাধ্য গুণরাশির মধ্যে আবার এইরূপ মধুর-সারল্য,—মধুমাখা লাজুকতা ও মোহময়ী মাধুরী বিধাতার চরম সৃষ্টি, অথবা বিশ্বসৃষ্টির চরম সৌন্দর্য্য। এত গুণ না থাকিলে, গুণ-নিধান রাম কখনও, সীতার স্বর্ণপ্রতিমা সম্মুখে

* "আর্য্যপুত্র! ইদানীম্ অসি ত্বম্,—অম্মহে! উৎখাতং মে ইদানীং পরিত্যাগলজ্জাশল্যাম্ আর্য্যপুত্রেণ।"

* "ধন্যা সা, যা আর্য্যপুত্রেণ বহু মন্যতে, যা চ আর্য্যপুত্রং বিনোদয়ন্তী আশানিবন্ধনং জাতা জীবলোকস্য।"

রাখিয়া, সেখানে উপাসকের মত উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইতেন না। রামের সে স্বর্ণপ্রতিমা এইক্ষণ ইতিহাস ও কাব্যের বস্তুমাত্র হইয়া রহিয়াছে। উহা আবার কি কখনও ভারতীয়হৃদয়ের আরাধ্য বস্তু হইবে? আর, ভারতীয় কাব্যবিলাসিনীদিগের রসার্দ্র হৃদয়ও কি, পতিনিগৃহীতা শকুন্তলার তপোবন-চরিত্রের অপূর্ব্ব চিত্র,—তাপ-দগ্ধ ও তপঃশুদ্ধ বিরহজীবনের অশ্রুলিখিত অমল-আলেখ্য প্রেমাবিষ্ট নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রেম-ধর্ম্মের সুধারস-আস্বাদনে, এবং ক্ষমা, স্নেহ, সহিষ্ণুতা ও পতিপ্রাণা সতীর তদ্গত-ব্রতশীলতার উচ্চতর তত্ত্বগ্রহণে, চরিতার্থতা লাভ করিবে?

ছায়াদর্শন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

"Then the forms of the departed
Enter at the open door,
The beloved, the true-hearted,
Come to visit me once more,"

উপক্রম।

যে সকল মহানুভাব পুরুষ, আমেরিকার অসংখ্য নরনারীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে, লোকান্তরে প্রয়াণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে (Adin Ballou) আডিন বালুর নাম অতি অগ্রগণ্য। আডিন বালু, একাধারে পণ্ডিত, পরোপকারব্রত, এবং পরমার্থনিষ্ঠ পবিত্র পুরুষ বলিয়া দেশের সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীরা, তদীয় পরলোক-প্রাপ্তির পর, যেরূপ উদ্বেল উৎসাহের সহিত, তাঁহার স্মৃতিপীঠের উপর প্রীতিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দেবতারও স্পৃহণীয়।

আডিন বালু, প্রথমে, দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। সে বিশ্বাসের সারার্থ এই, যাহারা মরিয়া যায়, তাহাদিগের আত্মা, বহু লক্ষ বৎসর, সমাধির অন্ধকারগহ্বরে অচেতনবৎ শয়ান রহে; এবং পরিশেষে, শেষের সে মহাবিচার-দিবসে, পরীক্ষিত হইয়া, হয় অনন্তকালের জন্য স্বর্গসুখে অধিকার পায়; না হয়, বিনা বিরামে, বিনা ব্যবচ্ছেদে, অনন্তকাল হইতে অনন্ত-কাল, আশাশূন্য নরকনিবাসে দগ্ধ হইতে রহে।

এ বিশ্বাস বড় ভয়ঙ্কর। মনুষ্য কিরূপে এইরূপ হৃদয়ঘাতি ভয়ঙ্কর কথায় বিশ্বাসের ভাব পোষণ করিয়াও, জীবনের নিত্যকর্ম্ম

সম্পাদনে যত্নপর রহিতে পারে, তাহা যুক্তির অগম্য।

ভারতীয় ঋষিপ্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ অযৌক্তিক, অমূলক, আশাশূন্য বিশ্বাসের একান্ত বিরুদ্ধ। হিন্দুর আরাধ্য ঈশ্বর—"আনন্দরূপমমৃতম্"—প্রেমময়,—অমৃতময়, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার অনন্ত রাজ্যে কর্ম্মফলের বিচার আছে;—বিচারের শাসনে কর্ম্মানুরূপ উন্নতি অথবা অবনতি,—সুখশান্তিজনক ঊর্দ্ধগতি, অথবা নিয়মিত কালের জন্য দুঃখতাপময় দুর্গতির ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অন্তবৎ কর্ম্মের পরিণাম-ফলে অনন্ত নরকের বিধান নাই।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকার আধুনিক অধ্যাত্মবিজ্ঞান, অর্থাৎ যে তত্ত্ব Modern Spiritualism নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহারও এই সিদ্ধান্ত; এবং উহা সর্ব্বতোভাবেই হিন্দুসিদ্ধান্তের অনুরূপ। আডিন বালুর চিত্তে যখন দেশের প্রচলিত ধর্ম্মসিদ্ধান্তে ঘোরতর অবিশ্বাস জন্মিল, তখন তিনি প্রকৃত সত্য জানিবার জন্য, মিডিয়ামের সাহায্যে ও আরও বহু প্রকারে, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং অনুসন্ধানের ফলে, অধ্যাত্মতত্ত্বের অনেক প্রাণপ্রদ পবিত্র সত্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, উহার প্রচারকার্য্যকে আত্ম জীবনের একটি প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন। আডিন বালু কত কি দেখিয়াছেন, কত কি জানিয়াছেন, সে দীর্ঘ কাহিনী আমরা পাঠককে বান্ধবের দুই চারি পৃষ্ঠায় বুঝাইতে কিংবা জানাইতে পারিব না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের নাম Modern Spirit-Manifestations,—Phenomenal Statements and Communications. এই গ্রন্থ উপহাস রসিকতার বস্তু নহে। উহা তত্ত্বপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

আমরা আজি আডিন বালুর উক্ত গ্রন্থ হইতে পাঠককে একটি আশ্চর্য্য কাহিনী উপহার দিব। কাহিনী যেমন আশ্চর্য্য,—তেমনই সত্য। উহার বক্তা, বিষয়-পরীক্ষক ও প্রকাশক, সকলেই উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মযাজক। কাহিনীটি পাঠ করিলে, পাঠকের নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মিবে যে, যাহারা চলিয়া যায়, তাহারা যেমন ছিল, ঠিক তেমনই থাকে; এবং প্রয়োজন ঘটিলে, তাহারা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে যাতায়াত করিতে পারে।

আত্মিক কাহিনী।

(১)

অক্স্‌ফোর্ড সায়র ইংলণ্ডের অতি পুরাতন আভরণ। অক্স্‌ফোর্ডের সারস্বত-নিকেতন,—অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলণ্ডের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া পরিচিত। এক সময়ে, অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কএকটি যুবক, আত্মসংযমের কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া, কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে জীবন যাপনে কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁহারা প্রাণান্তেও সঙ্কল্পিত নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিয়া চলিতেন না। এই হেতু, তাঁহারা প্রথমতঃ, সম্ভবতঃ একটু শ্লেষের ভাবে, নিয়মতন্ত্রী বা Methodist নামে অভিহিত

হইয়াছিলেন। জন্ ওয়েস্লি (John Wesley) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা প্রবর্ত্তক। কালক্রমে, জন্ ওয়েস্লির অনুবর্ত্তী নিয়মতন্ত্রিগণ, মেথডিষ্ট—Methodist—নামে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের একটা বৃহৎ শাখা বা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হন। সত্যপ্রিয়তা ও সত্যনিষ্ঠতার জন্য এই সম্প্রদায় বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।

মেথডিষ্ট সম্প্রদায় ইউরোপ ও আমেরিকায় এখনও পূর্ণপ্রতিপত্তিতে বিরাজমান। মিষ্টার মিল্‌স্ Mr. Mills এই সম্প্রদায়ের একজন নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মযাজক ও নব্য প্রচারক। তিনি আমেরিকার মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিতও সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মপ্রচার প্রয়োজনে, কখনও আমেরিকায় থাকিতেন, কখনও ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেন।

প্রচারক মিল্‌স্ যার-পর-নাই সত্যনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ ও পবিত্রপ্রকৃতি সাধুপুরুষ। চারিত্রমাহাত্ম্যে তিনি সর্ব্বত্রই পূজা পাইতেন। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানেই লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত ও অন্তরের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

মিল্‌স্ যখন ইংলণ্ডে থাকিতেন, তখন মিষ্টার জেম্‌স্ (Mr. James নামক) একটি নিরীহস্বভাব উদারপ্রকৃতি ভদ্রলোকের পল্লীনিবাসই তাঁহার প্রধান বাসস্থান হইত। জেম্‌সের বাসগ্রাম ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহ, ইহার সর্ব্বত্রই মিল্‌স্ পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। পতি, পত্নী ও কএকটি শিশুসন্তান,—ইহা লইয়াই জেম্‌সের ক্ষুদ্র পরিবার। মিল্‌স্ জেম্‌সের গৃহে অবস্থান সময়ে, তাঁহাদের শিষ্ট আচার ও মিষ্ট ব্যবহারে প্রকৃতই একটু প্রীতি অনুভব করিতেন।

মিল্‌স্, প্রচারকার্য্যে, কএকমাস আমেরিকায় অতিবাহিত করিয়া, সম্প্রতি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াই, তাঁহার সেই প্রিয়নিবাস,—প্রিয়সুহৃৎ জেম্‌সের গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গ্রামের সে শ্রী নাই; সমস্ত পল্লীই যেন আজি, ভীত-ভীত,—ভাবনান্বিত ও বিষণ্ণ। জেম্‌সের গৃহ জন-শূন্য ও নীরব। আজি সেখানে একটি প্রাণীও তাঁহাকে প্রিয়মুখে সম্ভাষণ করিতে আসিল না। তিনি দুই একটি ভয়ত্রস্ত স্থানীয় লোকের মুখে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার সেই অতিথিবৎসল বন্ধু জেম্‌স্ নাই,—জেম্‌সের জীবনসঙ্গিনী সেই স্নেহশীলা গৃহস্বামিনীও নাই। পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশু ক'টি অন্যের তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিত আছে। হঠাৎ ভয়াবহ সংক্রামক পীড়ার আক্রমণে পল্লীর বহুলোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। জেম্‌স্-দম্পতির অকাল মৃত্যুর কারণও ঐ পল্লীব্যাপক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। কি যেন ভয়বশতঃ কেহই তাঁহাদের ঘরে থাকিতে চাহে না। জেম্‌সের ঘর এই হেতুই রুদ্ধ।

মিষ্টার মিল্‌স্ জেম্‌স্-দম্পতির এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আর কোথায়

যাইবেন? তিনি পূর্ব্বের মত, জেম্‌সের শয়নকক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে, আপনার শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। কিন্তু, ঐ গৃহে প্রবেশ মাত্রই, যেন কি এক অজ্ঞাত কারণে, তাঁহার চিত্ত একান্ত বিকল ও অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি জীবনে আর কখনও, বোধ হয়, এইরূপ অধীরতা ও চিত্তবৈকল্য অনুভব করেন নাই।

মিল্‌স্, যথাসময়ে, প্রার্থনাদি করিয়া, শয়ন করিলেন। তিনি যদিও পথ-শ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন ছিলেন, তথাপি, কেমন এক অভাবনীয় অস্থিরতায়, আজি তাঁহার নয়নে, নিদ্রা আসিল না। তিনি শয্যাতলে পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহু সাধনায়ও আজি তাঁহার প্রতি নিদ্রাদেবীর দয়া হইল না। এমন কি, চোখ বুজিয়া থাকাও যেন তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

মিল্‌স্ যে কোঠায় শয়ন করিয়াছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উহারই পাশের কোঠায় তাঁহার বন্ধু জেম্‌স্ ও তদীয় পত্নী শয়ন করিতেন। এক্ষণ সে কোঠায় কেহই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মিল্‌স্ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, ঐ জন-শূন্য অন্ধকার কোঠায়, সেই নীরব নিশীথে, যেন দুটি লোক চুপে চুপে কি কথা কহিতেছে। তিনি উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া কান পাতিয়া শুনিলেন,—প্রকৃতই কে যেন, অস্পষ্ট মৃদুস্বরে, কাহার সহিত কি আলাপ করিতেছে। মিল্‌স্ শয্যা হইতে উঠিলেন। তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। বুক আপনিই একটু কাঁপিল। তথাপি তিনি আলো লইয়া ঐ কোঠায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—কোঠার ভিতরে কোথাও কেহ নাই। বহির্গমনের দ্বারগুলিও সমস্তই ভিতর দিক্ দিয়া বন্ধ। তিনি মনে করিলেন, শব্দশ্রুতি সম্ভবতঃ তাঁহার মতিভ্রম। অতএব তিনি নিঃসন্দেহচিত্তে, শয্যাগৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

শয়ন করিলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না। জেম্‌সের কথা মনে পড়িল। অদ্য এই পল্লীতে আসিয়াই একটা বিস্ময়কর জনরব শুনিয়াছিলেন। জনরবটি এই যে,—সংক্রামক রোগে জেমস্‌দম্পতির মৃত্যু হইবার পরে, তাঁহারা, তাঁহাদের শয়নকক্ষে ও ঐ পল্লীর নানাস্থানে, তাঁহাদিগের সেই পার্থিব দেহে, সময়ে সময়ে, লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। তিনি তখন এই অদ্ভুত গ্রাম্য গুজবে বিন্দুমাত্রও আস্থা স্থাপন করেন নাই; মনেও একবার ওকথা ভাবেন নাই। কিন্তু এক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাটাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। তিনি, অনিদ্র ও অতন্দ্রিত নেত্রে শয়ন করিয়া, মনে মনে কেবল ঐ জনরবের বিষয়ই তোলাপাড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

মিল্‌স্, চিন্তাসূত্রে যুক্তির পর যুক্তি-যোজনা করিয়া, এইরূপ জনরব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সর্ব্বাংশে অমূলক, আপনা আপনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। এমন সময়, আবার সেই দিকে, তেমনই ভাবে, মনুষ্যের মৃদু কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। তিনি

বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলেন। এবার অধিকতর স্পষ্ট শব্দ তাঁহার কানে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি কথা হইতেছে, বুঝিলেন না। তিনি পুনরপি আলো লইয়া সেই কোঠার দিকে চলিলেন। এবার তাঁহার হাত পা কাঁপিল। বুকের ভিতর দুর্ দুর্ শব্দ হইল। তথাপি তিনি আর একবার ঐ কোঠাটি খুব ভাল করিয়া খুঁজিলেন! কিন্তু কোথাও কোন জনপ্রাণীর সন্ধান পাইলেন না। আবার শয়ন করিলেন। আবারও সেই শব্দ তেমনই ভাবে কানে পশিল। তিনি তৃতীয়বার অধিকতর সাহস সহকারে, কোঠাটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোথাও মনুষ্যসমাগমের কোন চিহ্ন দেখিলেন না। ইহার পরে, আর ঐ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। মিস্‌স্ ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই, রাত্রিকার ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। তিনি ঐ বিষয়ে মনে মনে নানারূপ জল্পনাকল্পনা করিতে করিতে প্রচারকার্য্যে, গ্রামান্তরে যাওয়ার উদ্যোগ করিলেন।

জেম্‌সের বাটীর অনতিদূরে, গ্রামান্তরে একটি প্রাচীনা ভদ্রমহিলা বাস করিতেন। প্রাচীনা পল্লীর সর্ব্বত্র "নান্নী"; (Nanny) নামে পরিচিতা। নান্নী গ্রাম্যকুটীরে কষ্টে দিনপাত করিতেন। নান্নীর ধনজন কিছুই ছিল না;—ছিল কেবল সর্ব্বজন-প্রিয় স্নেহশীতল পবিত্র প্রাণ, আর ছিল ভগবানের অপার দয়ায় অটল বিশ্বাস। দুঃখিনী বৃদ্ধার মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব, সমস্তই সেই জগৎপিতা জগদারাধ্য জগদীশ্বর। এই দুর্লভ ধনের অধিকারিণী বলিয়াই নান্নীকে সকলে ভাল বাসিত ও অন্তরের সহিত ভক্তি করিত। যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মপ্রচার প্রয়োজনে ঐ পল্লীতে আগমন করিতেন, তাঁহারাও এই কারণে, বৃদ্ধা নান্নীর সহিত আগ্রহ-সহকারে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন;—নান্নীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সুখী হইতেন।

মিষ্টার মিল্‌স্, যে সময়ে, জেম্‌সের গৃহে নৈশ উপদ্রবের পর, প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে, নান্নী তাঁহার আপন কুটীর-নিবাসে প্রাতঃকালীন গৃহসংস্কার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। দিগ্‌বলয় ঈষৎ কুয়াসাচ্ছন্ন। নান্নীর হাতে একগাছি ঝাঁটা। তিনি গৃহের বহির্দ্বারে ঝাড়ু দিতেছেন, এই সময়ে, দেখিতে পাইলেন, দুটি লোক পরস্পর হাতে হাতে ধরিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা কে, প্রথমতঃ কুয়াসার অস্পষ্ট আলোকে, তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহারও একটু বেশী নিকটবর্ত্তী হইলেন, তিনিও একটু বেশী মনোযোগের সহিত চাহিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে আকস্মিক বিস্ময়ে তিনি একবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। হাতের ঝাঁটাগাছি আপনি মাটীতে পড়িয়া গেল। দেখিলেন, তাঁহার চিরপরিচিত প্রতিবেশী ও

সুহৃৎ স্বর্গগত জেম্‌স্‌ ও জেম্‌সের পত্নী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এ কি দৃষ্টি-ভ্রম, না বুদ্ধিবৈকল্য!—ইহা কি, নাম্নী ক্ষণকাল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তেকে তাঁহারা একবারে নাম্নীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। নাম্নী চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিয়া কহিলেন,—হাঁ তাঁহারাই ত বটে!

নাম্নী বিস্মিত, কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভীত নহন। ভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার অগাধ ভক্তি ও অবিচল বিশ্বাস,—তিনি স্বপ্নেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই,—মানুষকে আশীর্ব্বাদ করাই তাঁহার আনন্দময় জীবনের নিত্য অনুষ্ঠান,—পরলোক তাঁহার চক্ষে পিতৃভবনের ন্যায় প্রিয়ভূমি ও অনন্তশান্তির সুখ-নিকেতন; সুতরাং পারলৌকিক ছায়ামূর্ত্তি, কোন অংশেই তাঁহার কাছে বিপজ্জনক কিংবা ভয়াবহ বস্তু হইতে পারে না। বিশেষতঃ জেম্‌স্‌ ও জেমস্‌-পত্নী নাম্নীর অতি সন্নিহিত প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন,—সর্ব্বদা শত অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগের সদয়হৃদয় ও উদার-সৌজন্যের শত পরিচয় পাইয়াছেন। সেই চির-পরিচিত সুজন,—চিরপ্রীতিভাজন প্রতিবেশী, দুটি দিন পরলোকে বাস করিয়াই, ভয়াবহ দুর্জ্জন হইয়া, অনিষ্টকামনায় তাঁহার সম্মুখীন হইবেন, নাম্নীর পুণ্যময় সরল প্রাণে ঘুণাক্ষরেও এরূপ দ্বিধা বা সংশয়ের ঠাঁই ছিল না। সুতরাং, নাম্নী নির্ভীক নয়নে, ঈষদ্‌বিস্ময়মিশ্র প্রফুল্ল দৃষ্টিতে, ক্ষণকাল তাঁহাদের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ভাবিলেন,—"ইহাঁরা কি তাঁহারাই তবে?" অমনি মুখ ফুটিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি প্রকৃতই মিষ্টার জেম্‌স্‌।"

ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—হাঁ—এ তোমার দৃষ্টিভ্রম নয়, নাম্নী,—আমি সেই জেম্‌স্‌, আর ইনি আমার সেই পত্নী।"

নাম্নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কেমন আছেন?—পরলোকে সুখে আছেন ত?" উত্তর হইল, "আমি এবং আমার শ্রদ্ধাস্পদা পত্নী দুজনেই পরম সুখে আছি। এত সুখে ও এমন শান্তিতে আছি যে, পৃথিবীতে থাকিতে অমন সুখ-শান্তির সম্ভাবনা মনেও কল্পনা করিতে জানিতাম না।"

নাম্নী কহিলেন,—"জেমস্‌, দেবভূমিতে,—দেবতার দেশে যদি এতই সুখ, তবে আবার এই দুঃখদগ্ধ অশ্রুসিক্ত মরুর কঙ্করে ফিরিয়া আসিয়াছেন কেন?"—জেম্‌স্‌ প্রত্যুত্তর করিলেন,—"কেন আসিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। তোমার কাছে ইহা একটু বিচিত্র ও বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে। তথাপি বলিতেছি, শুন। যদিও আমরা এখন লোক-লোচনের অদৃশ্য অধ্যাত্মজগতে অবস্থিত, তথাপি পৃথিবীতে আমাদিগের যে সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও স্নেহের জন রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের প্রাণের একটা বিচিত্র বন্ধন বা সম্পর্ক এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। তুমি ত জান, নাম্নী, আমি ও আমার পত্নী উভয়েই সহসা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া তনুত্যাগ করি।

হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সকলেরই মনে এই ধারণা যে, আমরা কোন উইল করিতে পারি নাই। এই সংস্কার-বশতঃ আমাদের ত্যক্তসম্পত্তির স্বত্বস্বামিত্ব সম্পর্কে কেহই কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাতে পরিণামে আমার সন্তানদিগের মধ্যে অকারণ অশান্তির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। ইহারই প্রতিকারার্থ দেবপুরুষেরা আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিয়াছেন। আমি যে উইল করিয়াছি, এবং সেই উইল যেখানে আছে, তাহা কোন ভাল লোককে বলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যেই, আমরা মাঝে মাঝে কাহারও কাহারও সম্মুখীন হইতেছি।

"গত রাত্রিতে, মিষ্টার মিল্‌স্‌ আমাদিগের গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে ইহা জানাইবার নিমিত্ত কল্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ধর্ম্মযাজক হইয়াও ভয়ে এমন জড়সড় হইয়া পড়িলেন যে, আমরা বহু চেষ্টাতেও তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহার কাছে নিরাশ হইয়াই, আজি এই ভাবে তোমার কাছে আসিয়াছি। অদ্য অপরাহ্নে মিল্‌স্‌ তোমার এখানে আহার করিবেন; তখন তুমি তাঁহাকে ইহা জানাইবে। আমাদিগের এই অনুরোধটি তুমি রাখিবে কি? তুমি আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পাও নাই ত নান্নী?"

নান্নী উত্তর করিলেন,—"ভয়?—এক বিন্দুও নহে। ভয় পাইব কি জেম্‌স্‌, আমি আপনাদিগকে দেখিতে পাইয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। পরলোকে আপনারা এমন সুখে আছেন, ইহা শুনিয়া আমি যে কত প্রীতি অনুভব করিতেছি, তাহা বস্তুতই বলিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না।"

ছায়ামূর্ত্তি এই উত্তরে একটুকু সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"উইলখানি একটা গুপ্ত দেরাজের মধ্যে লুকান আছে।" ইহা বলিয়া দেরাজটি কোন্ স্থানে কি ভাবে আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইলেন, এবং উহা কিরূপে খুলিতে হয়, তাহারও সঙ্কেত বলিয়া দিলেন। উইলের (Executors) অছিগণ ঐ পল্লীতেই বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগেরও নাম ও পরিচয় প্রদান করিলেন। ইহার পরে পুনরপি কহিলেন,—"নান্নী, ধর্ম্মযাজক—মিল্‌স্‌ তোমার এখানে আসিলে, এই সমস্ত তাঁহাকে খুলিয়া বলিও; এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিও, তিনি যেন দয়া করিয়া, তোমার এখান হইতে ফিরিয়া, আর একবার আমাদের বাটীতে গমন করেন, ও নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উইলখানি বাহির করিয়া লইয়া, উইল সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্যই যেন করিয়া যান। তিনি আমাদিগের এই অনুরোধটি রক্ষা করিলে, আমরা প্রকৃতই আত্মায় শান্তি পাইব, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

পরে ছায়ামূর্ত্তিরা ও বৃদ্ধা নান্নী ক্ষণকাল কি চিন্তায় চুপকরিয়া রহিলেন। অতঃপর, জেম্‌স্‌ আবার বলিলেন,—"নান্নী, দেবপুরুষেরা তোমাকে আরও একটি কথা

জানাইতে আদেশ করিয়াছেন,—চমকিত হইও না, ভয় পাইও না,—নান্নী, আগামী শুক্রবার অপরাহ্ণ তিনটার সময়, তোমার তনুত্যাগ হইবে; এবং তুমি দিব্যদেহে,—দিব্যলোকে, আমাদিগের সহিত চিরকালের তরে সম্মিলিত হইবে।"

এইভাবে,—এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে, আসন্ন-মৃত্যুর বিজ্ঞাপন-বার্ত্তা সহসা কানে শুনিতে পাইলে, স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, জগজ্জয়ী বীরের নির্ভীক প্রাণও কাঁপিয়া উঠে,—পাষাণের বুকেও স্পন্দন হয়। কিন্তু পুণ্যবতী নান্নী জীবজগতের এই চিরভয়াবহ অব্যর্থ বিধিলিপির নির্দ্দেশ অটলচিত্তে শ্রবণ করিলেন। তাঁহার চক্ষে একটি পলক পড়িল না। তাঁহার জীর্ণপঞ্জররুদ্ধ শীর্ণহৃদয়ও একবার নড়িল না। ভীত ও বিমর্ষান্বিত হওয়া দূরে থাকুক, নান্নীর নিস্তেজ নয়নতারা, যেন কি এক বিচিত্র জ্যোতির স্ফুরণে, ঐ সময়েই একটু উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল;—কারামুক্তির শুভসংবাদে, দীর্ঘকাল-কারাবাস-ক্লিষ্ট দুঃখ-নিষ্পিষ্ট বন্দীর বদনে যেরূপ হাসির বিকাশ ঘটে, নান্নীর পলিত অধরপ্রান্তেও সেইরূপ একটু হাসির রেখাপাত হইল। নান্নী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমি এই শুভ সংবাদে বস্তুতঃই বড় সুখী হইলাম। জেম্‌স্, সে শুক্রবার কেন আজই হইল না?"—জেম্‌স কহিলেন,—"তবে তুমি প্রস্তুত হইয়া থাকিও নান্নী,—নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নিশ্চিতই দেবদূতের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে।"

নান্নী কহিলেন,—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভগবানের দয়া হইলে, আমি মৃত্যুকালে, দেব-প্রেরিত সূক্ষ্মদেহিদিগের সহিত প্রফুল্ল ও প্রশান্ত মনে সাক্ষাৎ করিতে পারিব।" নান্নীর কথা শেষ হইতে না হইতেই জেম্‌স্ ও জেম্‌সপত্নী আকাশের অসীম অঙ্গে মিশিয়া গেলেন। নান্নীর মনেও কোন সন্দেহ বা সংশয় রহিল না। আত্মিকমূর্ত্তি যাহা বলিলেন, তাহা কদাপি মিথ্যা হইবার নহে, নান্নী হৃদয়ে এই স্থির বিশ্বাস লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

নান্নী, মিষ্টার মিল্‌সের আগমন-প্রতীক্ষায়, অগ্রেই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। অপরাহ্ণে তিনটার সময়, মিল্‌স্ নান্নীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নান্নী যার-পর-নাই প্রীত-প্রফুল্ল তদ্গতচিত্তে পূজনীয় অতিথির অভ্যর্থনা করিলেন। স্বাগত-সম্ভাষণ ও নানাপ্রসঙ্গে দুই চারিটি কথা বার্ত্তার পরে, নান্নীর যত্ন-সজ্জিত আহার্য্যবস্তু মিল্‌সের সম্মুখে স্থাপিত হইল। নান্নী নিজে কিছুই খাইলেন না; পূজনীয় অতিথির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহাকে, প্রীতির সহিত, ভোজন করাইলেন।

ধর্ম্মযাজক মহোদয়, আহার অন্তে, বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলে, নান্নী করযোড়ে তাঁহাকে কহিলেন,—"বাবা, দুঃখিনীর একটি নিবেদন;—আপনি আমার একটি অনুরোধ রাখিবেন কি?" ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"কি অনুরোধ নান্নী?" নান্নী কহিলেন,—"আর কিছুই নহে—আপনি আগামী রবিবার, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, দয়া করিয়া,

আমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য, তৎকালোচিত প্রার্থনা ও উপাসনা করিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ।"

মিল্‌স্ ইহা শুনিয়া, সবিস্ময়ে নাম্নীর মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিলেন, নাম্নীর-আকৃতিতে কোন পীড়ার কোনরূপ লক্ষণ নাই; নাম্নী বেস সবল ও সুস্থ। মিল্‌স্ তাই বলিলেন,—"নাম্নী, তুমি কি পাগল হইয়াছ?" নাম্নী উত্তর করিলেন,—"না—না মহাশয়,—আমি পাগল হই নাই। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সদ্‌জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায়। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি আগামী শুক্রবার অপরাহ্ন তিনটার সময়, নিশ্চয়ই তনুত্যাগ করিব।

[illegible] কহিলেন,—"[illegible], এ কি কথা!" নাম্নী বলিলেন,—"তখন আপনি হয় ত আপনার নিয়মিত কর্ত্তব্য অনুরোধে, এ স্থান হইতে কএক মাইল দূরে অবস্থান করিবেন। তথাপি আমার এই বিনীত-প্রার্থনা, একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইলেও, আপনি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা করিবেন।

মিল্‌স্ বলিলেন,—"আজ মঙ্গলবার। এই শুক্রবারে, অর্থাৎ আর দুটিদিন পরেই নিশ্চিত তোমার মৃত্যু হইবে, ইহা তুমি কি রূপে জানিলে? কি প্রকারে ইহা জানা সম্ভবপর, তুমি আগে সেই রহস্যটি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল, তাহার পরে অনুরোধ-রক্ষার কথা হইবে।"

নাম্নী কহিলেন,—"আমি সমস্তই আপনাকে খুলিয়া বলিতেছি। আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন না। আপনি হয়ত এখানে আসিয়া জনরবে লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবেন,—জেম্‌স্ ও জেম্‌স্-পত্নী, পরলোক প্রাপ্তির পরে, ছায়ামূর্ত্তিতে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, অনেকের নয়নগোচর হইয়াছেন।"

মিল্‌স্ বলিলেন,—"শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আমি এ গুলিকে অসার গ্রাম্য প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই মনে করি নাই।"

নাম্নী কহিলেন,—"কিন্তু, মহাশয়, আমি নিজে আজি তাঁহাদের উভয়কেই চক্ষে দেখিয়াছি। শুধু চক্ষের দেখা নহে, কানে তাঁহাদের কথাও শুনিয়াছি।"

মিল্‌স্ কহিলেন,—"কি!—তুমি নিজে দেখিয়াছ! নাম্নী বলিলেন,—হাঁ মহাশয়, আমি প্রকৃতই নিজে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের কথা শুনিয়াছি।" মিল্‌স্ সন্দিগ্ধভাবে কহিলেন,—"বটে—কখন দেখিলে?" নাম্নী উত্তর করিলেন,—"অদ্য প্রত্যূষে,—আমার এই বাটীর দ্বার-সান্নিধ্যে,—প্রভাত-সূর্য্যের সুস্পষ্ট আলোকে।"

দুইয়ের মধ্যে, ইহার পর, আরও কথোপকথন হইল,—নাম্নী যেখানে, যে অবস্থায়, যেরূপে জেম্‌স ও তদীয় সহধর্ম্মিণীকে চক্ষে দেখিয়াছিলেন,—তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্তই মিষ্টার মিল্‌সের নিকট অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করিলেন। আত্মিকমূর্ত্তিনা উইল সম্বন্ধে মিষ্টার মিল্‌সের

নিকটে, যে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছিলেন, তাহাও যথাশ্রুত নিবেদন করিলেন।

মিল্‌স্‌ আগাগোড়া সবই শুনিলেন,—শুনিয়া ক্ষণকাল প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তির মত নীরব ও নিস্পন্দ রহিলেন। বারংবার রোমাঞ্চিত-কলেবরে নৈশঘটনায় সমস্ত কথা স্মরণ করিলেন; এবং ক্ষণকাল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নারীর দিকে তাকাইয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কর্ম্মের প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি নারীর কথার প্রামাণিকতা পরীক্ষা করা,—এবং কথা প্রকৃত হইলে, ছায়ামূর্ত্তির অনুরোধ রক্ষা করা, সকল কর্ম্মের উপর, অগ্রগণ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন; এবং নারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই জেম্‌সের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ছায়ামূর্ত্তির কথিত দেরাজ হইতে উইল বাহির হইল। উইল দর্শনের পর, মিল্‌সের মনে, নারীর সহিত জেম্‌স্‌দম্পতির সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে, আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। তিনি অছিদিগের সহিত উইলের সর্ত্তানুসারে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া, তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলেন। যাইবার সময়, নারীর সহিত একবার জীবনের শেষ দেখা করিলেন,—বলিলেন,—"মা, তোমার অনুরোধ আমি ভুলিব না।" সরলপ্রাণা পুণ্যবতী বৃদ্ধার জন্য এক ফোঁটা অশ্রু যাজকের নয়ন-প্রান্তে আপনি গড়াইয়া পড়িল।

পরবর্ত্তী শুক্রবার, অপরাহ্ণ তিনটার সময়, বিনা রোগে,—বিনা যন্ত্রণায়, যোগারূঢ়ার ন্যায়, নারী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মিষ্টার মিল্‌স্‌ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভুলিলেন না। তিনি নারীর সমাধিস্থানে, জানু পাতিয়া বসিয়া, তাঁহার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে অন্তিম উপাসনা ও প্রার্থনা করিলেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "সচিত্র দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রিপ্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। ২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বেঙ্গল-মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ১৷০ মাত্র।" পরিভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইংরেজী সাহিত্যের একটি প্রধান সম্পদ্‌। যাঁহারা সাহিত্যে কৃতী, সমাজ-সমালোচনে সুপটু, এবং সংসারের বিবিধতত্ত্ব পর্য্যালোচনে পর্য্যুৎসুক, তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা, নানারূপ কষ্টক্লেশ স্বীকারে, দেশ-দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়াছেন; এবং পর্য্যটন-সময়ে যাহা দেখিয়াছেন, শিখিয়াছেন, অথবা অশেষ কৌশলে অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহাই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামে প্রকাশ করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের বৈভব বাড়াইয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ভ্রমণ-বৃত্তান্তনামক

পুস্তকের সংখ্যা বড় কম। যে কএকখানি আছে, তন্মধ্যে শাস্ত্রিমহাশয়ের এই "দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ" সমধিক আদরের স্থান অধিকার করিবে। ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশের সমস্ত কথাই কৌতূহলের উদ্দীপক ; এবং সে সকল কথা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনই প্রীতিজনক। ইহার রচনা একান্ত সরল, সুখাবহ ও হৃদয়রম্য। যাঁহারা কখনও দক্ষিণাপথে যাইবার সুযোগ পান নাই, এই পুস্তক পাঠ করিলে, দক্ষিণাপথের বহু স্থান ও বহু দৃশ্য, দৃষ্টবস্তুর ন্যায়, তাঁহাদিগের নয়নপথে প্রতিবিম্বিত রহিবে; এবং তাঁহাদিগের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞানের ভাণ্ডার নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। অপিচ, এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে, একশত অপঠিত গ্রন্থে পাঠকের দৃষ্টি পড়িবে। লেখক বহুশাস্ত্রবিশারদ বড় পণ্ডিত। তাঁহার পর্য্যটনশ্রম ও লিপিশ্রম উভয়ই সার্থক হইয়াছে।

এইরূপ পুস্তক কি জন্য দেশের বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহৃত হয় না, তাহা আমরা বুঝিতে পাই না। যদি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষেরা অন্ততঃ ইহার এক সহস্র কাপি ক্রয় করিয়া, প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে এক একখানি পুস্তক উপহার দেন, তাহা হইলেও দেশীয় সাহিত্যের কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে। এই পুস্তকে প্রকৃত ঘটনার সহিত অপ্রকৃত ও অপ্রাকৃত কথা একটু বেশী মিশিয়াছে। ইহার নিদর্শন কালিদাসের বিবরণ। এইরূপ উপকথার আধিক্য উপন্যাসপ্রিয় পাঠকদিগের বিশেষ প্রীতি জন্মাইবে। তাহারা ঐরূপ উপকথায় আকৃষ্ট হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে, দেশের প্রকৃত কথাও অনেক শিখিবে।

২। "মাঘকৃত শিশুপালবধ, বঙ্গানুবাদ ;—প্রথম ভাগ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম এ বিএল কর্তৃক প্রণীত—মূল্য ৷৷০ আনা।" এ দেশে, পূর্ব্বকালে, বড় পণ্ডিতেরাই সাধারণতঃ বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। ইহার নিদর্শন স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্যের মত বড় পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর জন্মিবে কি না, তাহা বলা যায় না; আর তিনি যেমন সরল, মধুর, শিশুবোধ্য ও সুখসুকুমার কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তেমন কবিতাও আর কেহ লিখিবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন পণ্ডিত বলিলে বুঝায় এক শ্রেণীর লোককে, আর কবি বলিলে বুঝায় আর একশ্রেণীর লোককে। যেন পণ্ডিতের পক্ষে কবিসমুচিত সরস-মধুর শব্দবিন্যাস শিক্ষা সময়ের অপব্যয়, এবং কবিসম্প্রদায়ের পক্ষে ব্যাকরণ ও শব্দবিজ্ঞানে সামান্য ব্যুৎপত্তি লাভও অপরাধজনক। তবে, ইহার দুই চারিটি বর্জ্জিত স্থল না আছে এমন নহে। বাবু নবীনচন্দ্র দাস একটি প্রসিদ্ধ বর্জ্জিত-দৃষ্টান্ত। তিনি এক-আধারে সুপণ্ডিত ও সুকবি। তাঁহার অনুদিত রঘুবংশ পাঠ করিয়া লোকে শত মুখে প্রশংসা করিয়াছে; তাঁহার শিশুপালবধের অনুবাদ পাঠ করিয়াও লোকে তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিবে।

এ অনুবাদ অবশ্যই রঘুবংশের অনুবাদ অপেক্ষা একটু বেশী কঠিন। কিন্তু এ দোষ নবীন বাবুর নহে। রঘুবংশের মূল রচনা যেমন, স্বচ্ছতোয়া সরযূর মৃদুবাহি স্রোতের মত, মৃদু মৃদু বহিয়া গিয়াছে, নবীন বাবুর অনুবাদও সেইরূপ, অনারতগতি আমোদ-লীলাবতী তরঙ্গমালার মত, প্রবাহিত হইয়াছে। শিশুপালবধের ্ অনুবাদে সে সুখ-সচ্ছলতার প্রত্যাশা করা যায় না। তথাপি, সে অংশে যাহা ফলিয়াছে, তাহা আশাতীত। যদি গ্রন্থকার সমগ্র শিশুপাল-বধ অনুবাদ করিয়া শেষ ও প্রকাশ করিতে পারেন, তবে তাহা বাঙ্গালাসাহিত্যে তাঁহার একটি উজ্জ্বল ও অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ চিরকাল বিরাজমান রহিবে।

৩। "শোক-গীতি।—Including Grays Elegy in Bengali. শ্রীনবীনচন্দ্র দাস প্রণীত।" এই পুস্তকে 'মার ছবি'—'শ্মশান দর্শন' ও 'পিতৃবিয়োগ' প্রভৃতি চারি পাঁচটি শোক-উদ্দীপক * কবিতা আছে; এবং প্রত্যেক কবিতাই নয়নাম্বুলিখিত গাথার মত হৃদয়স্পর্শি হইয়াছে। প্রথম কবিতা মহাকবি (Cowper) কুপার-কৃত "On the Receipt of my Mother's Picture" অবলম্বনে; এবং দ্বিতীয় কবিতা প্রসিদ্ধ কবি গ্রে (Gray) প্রণীত Elegy অনুসরণে বিরচিত। আমরা দ্বিতীয় কবিতার দুইটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মহাকবি গ্রের মূল রচনা পড়িবার সময় হৃদয় যেমন শিহরিয়া উঠে, সৌভাগ্যবান্ দাস মহাশয়ের অনুবাদ পাঠের সময়েও হৃদয় সেইরূপ শিহরে কি না, কাব্যপ্রিয় পাঠক নিজে তাহার বিচার করুন।

"দিবসের অবসান ঘোষিছে আরতি,
হম্বারবে ধীরে গাভী ফিরিছে প্রান্তরে,
কৃষক আবাস মুখে যায় শ্রান্তগতি
সমর্পিয়া এ জগত ঘোরে ও আঁধারে।

"প্রকৃতির ম্লান দৃশ্য পাইতেছে লয়,
র'য়েছে সমীর শান্ত সুগভীর ভাবে,

* সমাসবদ্ধ পদনিচয়ের সন্ধিবিচ্ছেদ সংস্কৃত ভাষার নিয়মবিরুদ্ধ। যথা বৈয়াকরণী কারিকায়;—"সংহিতৈকপদে নিত্যা,নিত্যা ধাতুপসর্গয়োঃ; নিত্যা সমাসে বাক্যে তু সা বিবক্ষামপেক্ষতে।" কিন্তু উল্লিখিতরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ প্রাকৃতভাষায় নিত্যবিহিত ও সর্ব্বত্র-পরিলক্ষিত। যথা,—"দুল্লহ জণ-অণুরাও লজ্জা গুরুঈ পরব্বসো অপ্পা।" উদ্ধৃত পংক্তিতে দৃষ্ট হইবে যে, যাহা সংস্কৃতে ছিল "জনানুরাগঃ", তাহাই প্রথাবয়ব প্রাকৃতে হইয়াছে "জণ-অণুরাও"। প্রাকৃতের অনুকরণে, সন্ধিবিচ্ছেদের উল্লিখিতরূপ পদ্ধতি, বাঙ্গালায়ও, স্থলবিশেষে, ইদানীং প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যথা, "এক-আধারে এত গুণ।" "এক-আধারে" পদে সমাসচিহ্ন ফেলাইয়া দিলে, কাহারও কিছু কহিবার আর অবকাশ থাকে না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমাস চিহ্ন থাকিলেই বরং ভাল হয়। কেন না, তাহা অর্থবোধের অনুকূল।

কেবল ঘুরিছে উড়ি বেগে ঝিল্লীচয়,
বিরামিছে দূর গোষ্ঠ কিঙ্কিণীর রবে।

বাবু নবীনচন্দ্র, দাস যে প্রণালীতে কালিদাস, মাঘ, কুপার ও গ্রে প্রভৃতি কবির মধুর গম্ভীর কবিতানিচয় বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন, অন্যান্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সেই প্রণালীতে শেক্ষপীরের নাটকনিচয় ও মিল্‌টনের স্বর্গভ্রংশ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে, বাঙ্গালা ভাষার কতই যে উন্নতি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। নবীন বাবুর উদ্যম, আশা ও অক্লান্ত যত্ন, যশঃপ্রতিষ্ঠালিপ্সু নব্যকবিদিগের দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত অনুকৃত হইয়া, শ্রেষ্ঠতর ফলে পরিণত হউক।

৪। "ভিক্টোরিয়া ভারতী। (কাব্য)—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত।" গ্রন্থকার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষারই অনুরাগী। তাঁহার কবিতানিচয়ের কোন কোন স্থানে পাণ্ডিত্য, কোথাও বা একটু কবিত্বেরও আভাস পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমরা তাঁহার দুই একটি কবিতায় সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু, সমস্ত কবিতা পড়িয়াই প্রীতিলাভ করিয়াছি, এমন বলিতে পারি না। গ্রন্থের শেষপৃষ্ঠায় "সাদর উপহার" নামে আর এক জনের একটি অতি স্তুতির উপহাস্য কবিতা গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। ঐটি ওখানে না থাকিলে ভাল হইত।

৫। "কবিতাশতক।—ব্রাহ্মণবাড়িয়া—উপাসনা সমাজের সেক্রেটরী—শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত। নাম শুনিয়াই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহাও একখানি কবিতা পুস্তক। গ্রন্থকার, মহাকবি মধুস্থদনের পদানুসরণে একশত চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়া, তাহারই গ্রন্থনে এই গ্রন্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মধ্যে জাপান-যুবক, জাপান-মহিলা, জাপান-জননী, জাপান-সম্রাট্, জাপান-জনক এবং জাপানের জাতীয় উৎসব নামে ছয়টি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলিতে গ্রন্থকার বীররসের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। পুস্তকের শেষ দিকের কবিতা ক'টি চতুর্দ্দশপদী নহে। মধ্যেও আবার স্থানে স্থানে সে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল, আকাঙ্ক্ষা "অবকাশ-রঞ্জিনী।"

বঙ্গবাসীর উপহার।

বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, অত্যল্প মূল্যে, অতি দুর্লভ গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্যে, উপহার-প্রথার প্রবর্ত্তনা করিয়া, দেশের অপকার, না প্রভূত উপকার করিয়াছেন, তাহা বুঝি না। অপকারের দিকে এই দেখি, যেখানে লোকে দুটি টাকা মূল্যেই বঙ্গবাসীর মত অমন একটা বৃহদায়তন, বিবিধবিষয়পূর্ণ, বিখ্যাত সংবাদপত্রের গ্রাহক হইয়া, বারমাস সাময়িকপ্রবন্ধ পাঠের শিক্ষাসুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইত, সেখানে অনেকেই ইদানীং, লোভের প্রবল আকর্ষণে, সাতটি কি আটটি টাকা

অতিরিক্ত দিতে বাধ্য হইতেছে। উপকারের দিকে এই দেখি, সেই অতিরিক্ত সাতটিমাত্র টাকার প্রতিদানে, শত টাকা মূল্যের দুর্ল্লভ গ্রন্থ, সুদুর্ল্লভ রত্নরাজির ন্যায়, প্রতিবৎসরই নিয়মিত সময়ে লোকের ঘরে ঘরে বিতরিত হইয়া আসিতেছে; এবং এই একই প্রক্রিয়ায়, বঙ্গের অতি দীন-নিকেতনেও ছোট ছোট গ্রন্থালয় সৃষ্টি দ্বারা, সকল শ্রেণির লোককেই সারস্বতসম্পদে অধিকারী করিয়া তুলিতেছে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন,—"গ্রন্থী ভবেৎ পণ্ডিতঃ।" বঙ্গবাসীর ব্যবসায়-নৈপুণ্য অথবা বদান্যতায় অতি সামান্য-শিক্ষান্বিত ব্যক্তিরাও, গ্রন্থধনে ধনী হইয়া, পণ্ডিতের সংখ্যা বড়াইতেছে। ইহাতে দেশের অপকার, না আশাতীত উপকার, তাহা সহৃদয় দেশীয়েরাই অবধারণা করিতে সমর্থ।

বঙ্গবাসীর ভাণ্ডার হইতে এবার বঙ্গের বহুসহস্র লোক সানুবাদ বাল্মীকির রামায়ণ ও নীলকণ্ঠের টীকা সহিত সমগ্র মহাভারত উপহার পাইয়াছেন। এই গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিতে বিশ বৎসর পূর্ব্বে লোকের শত টাকার অধিক ব্যয় হইত। এইক্ষণ পঁয়ত্রিশ কিংবা চল্লিশ টাকাতেই এই উভয় গ্রন্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্রের কর্ম্মকৌশলে সাতটি টাকামাত্র ব্যয়েতেই অতি সুললিত অনুবাদ সমেত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ও সটীক মহাভারত সর্ব্বসাধারণের হস্তগত হইতেছে। যদি ইহাতেও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ,—বিশেষতঃ বঙ্গের সাহিত্যসেবী হিন্দু, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্রকে হৃদয়ের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাদানে কুণ্ঠিত হন, তাহা হইলে বুঝিব যে, সাহিত্যানুরাগ, স্বদেশবাৎসল্য ও কৃতজ্ঞতা, এই তিনটি শব্দই, এ দেশের জন্য, সর্ব্বতোভাবে অর্থশূন্য। কারণ, যাঁহারা হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াও রামায়ণ ও মহাভারতে বীতরাগ,—যাঁহারা সাহিত্য-সেবায় অধিকারী হইয়াও বাল্মীকির মধুরাক্ষরা কথা ও বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জ্ঞান-গভীরা কবিতার রসস্বাদে বিমুখ; এবং যাঁহারা স্বজাতির পুনরুজ্জীবন-ব্রতে ব্রতী হইয়াও পুরাতন-ভারতের বীর-রস-বিহ্বলা তরঙ্গবহুলা কীর্ত্তিকাহিনীতে প্রাণে অনুরাগ পোষণে অসমর্থ, তাঁহাদিগের হিন্দুত্ব, সাহিত্যসেবিতা ও স্বজাতিপ্রিয়তার প্রকৃত কিছু মূল্য আছে কি না, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে নিরূপণ করা কঠিন। বস্তুতঃ, পৃথিবীর পুঞ্জীকৃত কাব্যসাহিত্য এক দিকে, এবং বাল্মীকির রামায়ণ আর ব্যাসের মহাভারত আর এক দিকে। কাব্যসাহিত্য নামে ভারতবর্ষে এই চারি যুগে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এখনও যাহা অভিনব-সৃষ্ট পদার্থের মত আলোকে আসিতেছে, তাহারও আদি প্রস্রবণ প্রধানতঃ মহাভারত ও রামায়ণ। অপিচ, কালিদাস, ভবভূতি, মুরারি, মাঘ, এবং ভারবি ও শ্রীহর্ষ প্রমুখ প্রতিভান্বিত পুরুষেরাও এই দুই কামধেনু দোহন করিয়াই কবি অথবা মহাকবি। অতএব, আমরা ভরসা করি, যদি এ দেশে, এখনও কেহ, রামায়ণ ও মহাভারতের এই বিশেষ-যত্নসম্পাদিত, সুচারুমুদ্রিত, সুলভ সংস্করণ

সংগ্রহ করিবার সুবিধা না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি মুহূর্ত্তকালও আর বিলম্ব করিবেন না। শিক্ষার্থী অথবা সদ্‌গ্রন্থানুরাগীর পক্ষে এমন সৌভাগ্য-সুযোগ সর্ব্বদা ঘটে না।

টেলিগ্রাফের উপহার।

বঙ্গবাসীর বাঙ্গালা সংস্কৃত বিভাগ হইতে বিতরিত হইতেছে রামায়ণ আর মহাভারত, এবং উহারই ইংরেজী বিভাগ হইতে সুলভ দৈনিক টেলিগ্রাফের গ্রাহকদিগের মধ্যে বিতরিত হইতেছে চারিখানি উচ্চমূল্য ইংরেজী গ্রন্থ। গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। Burke's Speeches at the Impeachment of Warren Hastings—Complete in Two Volumes—Containing about 1600 pages—With an elaborate index and a short account of the lives of Edmund Burke and Warren Hastings—Price Rs 6 only postage annas eight only.

২। Bernier's Travels in Hindustan—Commencing from the year 1665—to 1678—or—The History of the Late Revolution of the Dominions of the Great Mogul—Price Rs 5 only postage annas six only.

৩। History of Bengal—From the first Mahomedan Invasion—Until the Virtual Conquest of that Country by the English, A. D. 1757 by Charles Stewart, Esq.'—first published in London,—1813—Price Rs 5 only—Postage annas six only.

৪। Autobiographical Memoirs of the Emperor Jahangir—Written by himself—Translated from a Persian Manuscript—By Major David Price—first Published in Londoñ—1826—Price Rs 5 five only—Postage annas six only.

উল্লিখিত গ্রন্থচতুষ্টয়ের গুণ-বর্ণনা করিয়া উপহসিত হইব না। কেন না, এড্‌মণ্ড বর্ক বাগ্মিকুলের অধিনায়ক কি না, এবং তাঁহার মনোমাদিনী বক্তৃতা পাঠসময়ে অদ্যাপি লোকের প্রাণে উদ্দীপনার উদ্দাম বাড়বাগ্নি উথলিয়া উঠে কি না,—আর বার্ণিয়ারের ভারতভ্রমণ, ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস ও নূরজাহানের প্রেমমুগ্ধ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের স্বরচিত জীবনবৃত্ত শিক্ষার্থি মাত্রের পক্ষেই সুদুর্ল্লভ বস্তু কি না, তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত কথা। এই জন্যই বলিয়াছি যে, আমরা এ সকল গ্রন্থের দোষ-গুণের কথা কহিব না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পাঠকের প্রীত্যর্থ দোষ-গুণের কথা ছাড়া, অন্য একটি কথা কহিব। উপরিলিখিত গ্রন্থগুলির প্রকৃত মূল্য, সহ ডাকমাশুল, ২২।৵০। কিন্তু যাঁহারা টেলিগ্রাফের গ্রাহক, তাহারা ডাকমাশুল সহিত ৫৸০ পাঁচ টাকা বার আনা দিলেই এই পুস্তকনিচয় উপহার পাইতে পারেন। এইরূপ অল্পমূল্যের বিক্রয়কে উপহার নামে নির্দ্দেশ করা, কোন অংশেও অসঙ্গত হয় কি? উপহার বল, আর অতি লাভজনক ব্যবসায় বল, কথিত চারিখানি পুস্তকে যাঁহার বিদ্যা জন্মিবে, ইংরেজী ভাষা তাঁহার জিহ্বায় অলিম্পাসবিলাসিনী বাণীর ন্যায় নৃত্য করিবে,—তাঁহার জলদমন্দ্র বক্তৃতা শুনিয়া লোকে বিমোহিত হইবে।

আচার্য্য বিরজানন্দ।

[১]

সূচনা।

বহু দিন হইতেই ভারতভূমির দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর বিকৃতি বহু শত বৎসর হইতেই ঘটিয়াছে। ঠিক্ কি কারণে হিন্দুর বিকৃতি ঘটিয়াছে, বলা যায় না। ঠিক্ কোন্ সময় হইতে অধোগতির অমানিশা আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তকে গ্রাসিত করিয়াছে, তাহাও নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি না।

হিন্দুজাতির বিকৃতি বা ব্যাধিকাল নিঃসংশয়ে নিরূপিত করিতে না পারিলেও, ব্যাধির চিকিৎসাকাল কতকটা নিরূপিত করা যাইতে পারে। যেহেতু আর্য্যাবর্ত্তের অতীত ইতিহাসের সহিত যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহারা ইহা, বোধ হয়, পরিজ্ঞাত আছেন যে, বুদ্ধ হইতে দয়ানন্দ পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে, এতদ্দেশে, এমত কএকটি অমিত শক্তিশালী পুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে, —যাঁহারা এই ব্যাধিপ্রপীড়িত হিন্দুজাতিকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিবার উদ্দেশে আপনাদিগের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

নিরঞ্জনার নির্ম্মল তট হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া আসিয়া, বুদ্ধদেব বারাণসীর পবিত্র ভূমিতে যখন নির্ব্বাণধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিলেন, তখন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫২২ অব্দে * আর মথুরা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তসংশয় হইয়া আসিয়া দয়ানন্দ যখন হরিদ্বারের উচ্চ ভূমির উপরে উচ্চনাদে বৈদিকধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিলেন, তখন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ ৫২২ আর ১৮৫৭ র সংযোগে যখন মোট ২৩৮৯ বৎসর হইতেছে, তখন এই ২৩৮৯ বা প্রায় চব্বিশ শত বৎসর ধরিয়াই যে হিন্দুজাতির চিকিৎসার পর চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই এখন বুঝা গেল।

এই কিঞ্চিদূন চব্বিশ শত বৎসরের মধ্যে বুদ্ধ, কুমারিল, শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি মহামহিমান্বিত পুরুষগণ হিন্দুজাতির চিকিৎসক বা সংস্কারকরূপে ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের সকলেই যে, হিন্দুর চিকিৎসক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। §

---

* বুদ্ধদেবের জন্মকালসম্পর্কে পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিভিন্ন মত প্রচারিত হইলেও আমাদিগের ধারণা যে, তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৫৭ অব্দে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে,—অর্থাৎ ৫২২ অব্দেই স্বীয় মত প্রকটিত করিয়াছিলেন।

§ বুদ্ধদেব প্রচারিত সিদ্ধান্তমালা উত্তর-

কিন্তু তাহা হইলেও একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব যে, ইহাঁদিগের সকলের চিকিৎসাই কি হিন্দুর পক্ষে সুফলপ্রদ হইয়াছিল? ইহাঁদিগের সকলের সংস্কার-প্রণালীই কি হিন্দু-প্রকৃতির উপযোগিনী হইয়াছিল? অথবা সকলের না হইলেও, কাহারও চিকিৎসা কি এই রোগক্লিষ্ট হিন্দুজাতিকে সর্ব্বাবয়বে সুস্থ ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল? এই সকল প্রশ্ন নিশ্চয়ই অতীব গভীর। এই ক্ষুদ্র সূচনার ক্ষুদ্র অধিকারের মধ্যে এই গভীরতর প্রশ্নমালার মীমাংসা কখনই সম্ভাবিত নহে। এই হেতু, পাঠক! একটু স্থিরচিত্ত হইয়া উন্মীলিত প্রশ্নমালার আলোচনা করিবেন, এবং আলোচনা করিবার সময় যে অলৌকিক আচার্য্যের অলৌকিক চরিত্র এই প্রস্তাবে চিত্রিত করা হইল, সেই আচার্য্য-প্রদর্শিত সংস্কার প্রণালীও হিন্দুর পক্ষে সর্ব্বাংশেই উপযোগিনী হইয়াছে কি না? তাহাও এক এক বার ভাবিয়া দেখিবেন।

কালে একটি অভিনব মতে পরিণত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম নাম পরিগ্রহ করিলেও, তিনি যে তদানীন্তন হিন্দুসমাজের ব্যাধি এবং বিকৃতিরাশি দর্শন করিয়া চিত্তে সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং সেই ব্যাধিক্লিষ্ট বিকৃত সমাজকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়েই হিন্দুর সংস্কারক—প্রথম সংস্কারকরূপেই ভারতভূমিতে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

বাল্য জীবন।

কেবল রণজিৎসিংহ বা হরিসিংহ নেলুয়ার মত একটি বীরেন্দ্রপুরুষ প্রসব করিয়াই পঞ্জাবভূমি পরিশ্রান্ত নহে। পঞ্জাবভূমি কত রণবীরের এবং কত ধর্ম্মবীরেরই লীলাভূমি। পঞ্চনদ চিরদিনই বীরভূমি।

পাঠক! ইহা, বোধ হয়, অবগত আছেন যে, যিনি হিন্দুকে মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে ধর্ম্মবীরের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি পঞ্চনদেরই অধিবাসী। * যাঁহারা গরীয়সী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চিলেনোয়ালা এবং সোব্রাঁওর চিরস্মরণীয় সমরক্ষেত্রে লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারাও পঞ্চনদেরই অধিবাসী। আর, পাঠক! ইহাও, বোধ হয়, পরিজ্ঞাত আছেন যে, একমাত্র গ্রীক ভিন্ন অন্যান্য জাতীয় মনুষ্যদিগের ভাষা যখন অপরিমার্জ্জিত বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত, তখন অষ্টাধ্যায়ীর অনুপম সূত্রমালা বিরচিত করিয়া, যিনি আপনাকে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ বা অদ্বিতীয় সাহিত্যাচার্য্যের আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, তিনিও পঞ্চনদেরই অধিবাসী। ‡ বিশেষতঃ

* গুরু নানক ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের অন্তর্গত তলবন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ পাণিনির অপর একটি নাম শালাতুরীয়। কারণ শলাতুর নগর তাঁহার জন্মস্থান। শলাতুর নগর কোথায় ছিল? এই বিষয়ে

এইক্ষণে—আর্য্যজাতির এই শোচনীয় অধঃপতনের দিনে, সেই অষ্টাধ্যায়ীর অনুপম সূত্রমালার অনুপম মহিমা পুনঃ প্রচারিত করিয়া, যিনি ভারতীয় ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারের পথে এক অভিনব শক্তির সমাবেশ পুর্ব্বক বর্ত্তমান যুগের আচার্য্যপদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছেন, এবং তজ্জন্যই যিনি এই সন্দর্ভের বিষয়ীভূত হইয়া আমাদিগের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তিনিও পঞ্চনদেরই অধিবাসী।

প্রসিদ্ধ কর্ত্তারপুরের সন্নিকট একখানি অপ্রসিদ্ধ পল্লিতে বিরজানন্দের জন্ম হয়। বিরজানন্দের, জন্মপল্লির নাম গঙ্গাপুর। গঙ্গাপুর বই নাম্নী একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। গঙ্গাপুরে নারায়ণ দত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নারায়ণ দত্ত ভরদ্বাজ গোত্রীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনি আবার শারদশাখার অন্তর্নিবিষ্ট। এই নারায়ণ দত্তের ঔরসেই বিরজানন্দের জন্ম হয়। বিরজানন্দের মাতা বা মাতৃপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বিরজানন্দের জন্মকালও নিঃসংশয়ে নিরূপিত করিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, যে সময়ে শিখসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিমালা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পঞ্চনদের বিশাল ভূমিতে একটি বিশালশক্তির সূচনা করিতেছিল, যে সময়ে যমুনাতট হইতে আরম্ভ করিয়া বিতস্তার তটভূমি পর্য্যন্ত—এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে বিজয়িনী শিখসেনা স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত করিয়া একটি অভিনব রাজত্বের ভিত্তিস্থাপনে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে,—অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বিরজানন্দ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। *

পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ শলাতুরকে আধুনিক লাহোর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেহ বা শলাতুরকে প্রাচীন সাম্বার বা আধুনিক কান্দাহার প্রদেশস্থ একটি নগর বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ফলতঃ শলাতুর যে পঞ্জাবেরই অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাণিনির জন্মকালসম্পর্কেও মতবিভেদ লক্ষিত হয়। শ্রীমান্ বেবর এবং শ্রীমান্ বোত্‌লিডেকের মতে পাণিনির জন্মকাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৫০ অব্দ। অধ্যাপক গোল্ড-ষ্টুকরের মতে তাঁহার জন্মকাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭০০ অব্দ। আমাদিগের বিবেচনায় শেষোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন।

* স্বামী বিরজানন্দের অদ্বিতীয় শিষ্য শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী একস্থলে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—"মথুরায় যখন অধ্যয়নার্থ আসিলাম, তখন বিরজানন্দের বয়ঃক্রম ৮১ বৎসর।" The Adrya Patrika 1886, May 18, P. 2 এই ঘটনার পর বিরজানন্দ আরও ৮।৯ বৎসর জীবিত থাকিয়া ১৯২৫ সম্বতে আশ্বিনে,—অর্থাৎ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে দেহত্যাগ করেন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেহত্যাগ-

বিরজানন্দের আদি নাম কি ছিল জানি না, তিনি এইক্ষণে যে নামে ইহলোকবাসীর নিকটে পরিচিত, সে নাম তাঁহার পিতৃদত্ত নহে—গুরুদত্ত। এতভিন্ন তাঁহার আরও কএকটি নাম ছিল। লোকে কখন সুরদাস স্বামী বলিয়া, কখন প্রজ্ঞাচক্ষু স্বামী বলিয়া কখন বা ধৃতরাষ্ট্রজী বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিত। বিরজানন্দ চক্ষুহীন ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে এই সকল নামে নামিত করা হইত। কিন্তু তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষু নাম কেবল চক্ষুহীনতা বশতই প্রদত্ত হইয়াছিল, এরূপ মনে করি না। বিরজানন্দ "বস্তুতই প্রজ্ঞাচক্ষু ছিলেন। বহিশ্চক্ষুর অভাবে তাঁহার অন্তশ্চক্ষু এতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষুর দৃষ্টি এতই প্রখর ও প্রসারিত হইয়া পড়িয়া ছিল যে, যে কোন বিষয় তাঁহার সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইত, তিনি সেই বিষয়ই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মত অক্লেশে ও সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। যাহা হউক উল্লিখিত কএকটি নাম ভিন্ন বিরজানন্দের আরও একটি নাম ছিল। সে নামটি মথুরার অধিবাসীরাই তাঁহাকে দিয়াছিল। এই হেতু মথুরার অধিবাসিগণই তাঁহাকে সাধারণতঃ দণ্ডীজী বলিয়া সম্বোধন করিত। বিরজানন্দ অন্ধ বলিয়া জন্মান্ধ নহেন। তাঁহার বয়ক্রম যখন পাঁচ বৎসর তখন বিসূচিকার কঠোর আক্রমণে

কালে বিরজানন্দের বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বৎসর হইয়াছিল। তাহা হইলে তাঁহার জন্ম ১৭৭৭ বা ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দেই হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কিছু দিবস হইল, পণ্ডিত লেখরাম নামক পঞ্জাব প্রদেশীয় আর্য্যসমাজের এক ব্যক্তি উর্দ্দু ভাষায় স্বামী-দয়ানন্দের একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়া তাহার একস্থলে [পৃঃ ৮৮০] লিখিয়াছেন।—"১৮৫৪ সম্বতে বিরজানন্দ জন্ম পরিগ্রহ করেন।" বাবা ছজ্জু সিংহ নামক আর একটি পঞ্জাবী লেখক সম্প্রতি The Life and Teachings of Swami Dayananda Saraswati নামীয় গ্রন্থের একস্থলে [Part 1, Page 56] উল্লিখিত উক্তির পুনরুক্তি করিয়া এবং তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া বলিয়াছেনঃ—"Virojananda was born in 1854 B. C. at a time when the Moharaja Ranjit Sing sat on the throne of the Punjab." সম্বতের ১৮৫৪, যখন খৃষ্টাব্দের ১৭৯৭র সঙ্গে এক, তখন ১৭৯৭কে জন্মকাল বলিয়া ধরিলে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে বিরজানন্দের দেহান্ত ঘটিয়াছিল, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, দেহান্ত কালে তাঁহার বয়ক্রম প্রায় ৯০ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং বিরজানন্দের জন্মকাল সম্পর্কে কি পণ্ডিত লেখরামের, কি লেখরামের অনুবর্ত্তনকারী বাবা ছজ্জু সিংহের কাহারও উক্তিই যথার্থ নহে। এই হেতু ১৭৭৭ কিংবা ১৭৭৮কেই আমরা বিরজানন্দের জন্মাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

তিনি আক্রান্ত হয়েন। করাল বিসূচিকা অপর কিছু লইতে না পারিয়া, পরিশেষে এই পঞ্চম বর্ষীয় বালকের চক্ষুরত্ন দুইটিই হরণ করিয়া লইল। পঞ্চম বর্ষীয় বালকের চক্ষুহীন হওয়া যে কিরূপ দুঃখদায়ক, তাহা আর বলিতে হইবে না। তবে জগতে প্রজ্ঞাচক্ষু নামে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়েই, হয় ত বিসূচিকা তাঁহাকে হৃতচক্ষু করিল।

বিরজানন্দের বিদ্যারম্ভ পিতৃগৃহেই হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর হইবে। তিনি পিতৃসমীপে ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তুঃ দুঃখের বিষয় এই হতভাগ্য বালকটি কি পিতৃশিক্ষা কি পিতৃস্নেহ কিছুই অধিক দিন প্রাপ্ত হইল না। কারণ, কএক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতা মাতা উভয়ই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। যে বালক এতদিন কেবল চক্ষুহীন ছিল, এক্ষণে সে আবার পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়িল। সুতরাং বিরজানন্দের দুঃখক্লেশ এইক্ষণ হইতে দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। পিতৃ-বিয়োগের পর ভ্রাতার স্নেহ যত্নে কিছু দিন প্রতিপালিত হইলেন বটে, কিন্তু ভ্রাতার আশ্রয় বিরজানন্দের নিকট প্রীতিকর না হইয়া ক্রমশঃই পীড়াকর হইয়া উঠিল। সেজন্য তিনি চিত্তে নির্ব্বিন্ন হইলেন, এবং ভাবীজীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসম্পর্কে তখন হইতেই চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন।

গৃহত্যাগ ও গায়ত্রী-সাধন।

বিরজানন্দের গৃহবাস কি কারণে পীড়াকর হইয়া উঠিল, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, কি পরিবারস্থ অপর কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল কি না, তাহাও ঠিক্ জানি না। যে কারণেই হউক, গৃহে অবস্থিতি করা বিরজানন্দের পক্ষে ঘোরতর অশান্তিকর হইয়া উঠিল। অন্ধ বালক একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই ঠিক্ নাই। নানা চিন্তা এবং নানা আন্দোলনের পর, পরিশেষে সংসারাশ্রম ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। এবং এক দিবস আত্মীয় স্বজনদিগের সম্পর্কজাল ছিন্ন করিয়া হৃষীকেশের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে হৃষীকেশের পথ যেমন দুর্গম, তেমনই দুঃখসঙ্কুল। সুতরাং এই অন্ধ বালকটিকে হৃষীকেশের পথে বিশিষ্টরূপ ক্লিষ্ট হইতে হইল। বিশেষতঃ বিরজানন্দের বয়ঃক্রমও তখন চৌদ্দ পনর বৎসরের অধিক হয় নাই।

পাঠক! এই স্থলে এই প্রশ্নটি স্বতই উপস্থিত হইবে যে, একটি চৌদ্দ পনর বৎসর-বয়স্ক অন্ধ বালক কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া হৃষীকেশে গমন করিলেন? বিরজানন্দ কি নিমিত্ত হৃষীকেশের শৈলারণ্যময় ভয়াবহ প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইলেন? অনুমানের বলে যতটুকু অবধারিত হইতে পারে, তাহাতে আমাদিগের মনে হয় যে, বিরজানন্দ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মত একটি অন্ধ এবং অনাথ বালক সংসারে থাকিলে সংসারের কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত হইতে পারিবে না। তিনি উজ্জলরূপেই

বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, জীবনের প্রথম-স্তরে পদার্পণ করিয়াই যখন তাঁহাকে চক্ষু দুইটি হারাইতে হইল, পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়িতে হইল, এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজনদিগের প্রীতি মমতাতেও চিরদিনের তরে জলাঞ্জলি দিতে হইল, তখন সংসার বা সাংসারিক বন্ধন তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সুখকর হইবে না। সুতরাং এই তুচ্ছাদপিতুচ্ছ জীবনকে, যদি জীবনের পরমপুরুষার্থ সাধক-ব্যাপারে নিয়োজিত করিতে পারি, এবং নিয়োজিত করিয়া যদি কোন অংশেও কৃতকার্য্য হইয়া উঠি, তাহা হইলে, তদপেক্ষা অধিকতর লাভ বা উচ্চতর ভাগ্য এই হতভাগ্য জীবের পক্ষে আর কি হইতে পারিবে? এই বিবেচনা করিয়া বিরজানন্দ তপশ্চর্য্যাতেই দেহপাত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, এবং তপশ্চর্য্যার সংকল্পেই তিনি হৃষীকেশের পবিত্র ভূমিতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

বিরজানন্দ কিন্তু বালক,—উপনীত বালকমাত্র, তপশ্চর্য্যার পন্থা বা প্রণালী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানেন না, উপনয়নের সময়ে কেবল গায়ত্রী দীক্ষা পাইয়াছিলেন, আর শুনিয়াছিলেন যে, গরীয়সী গায়ত্রীর সাধনায় মনুষ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তও লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং তিনি হৃষীকেশের তপোভূমিতে আসিয়া সেই গায়ত্রীকেই অবলম্বন করিলেন, এবং অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল গায়ত্রীর সাধনাই করিতে লাগিলেন। প্রাতে, সায়াহ্নে, এমন কি নিশীথেও তিনি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রতিদিনই স্নানের পর গঙ্গার নির্ম্মল ধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া গায়ত্রীজপে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এইরূপ জপ-যজ্ঞে এই বাল-ব্রহ্মচারীর অলৌকিক দৃঢ়তা দেখিয়া হৃষীকেশের লোকে বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইল, এবং সকলে না হইলেও, কেহ কেহ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, বুঝিবা কোন দেবজন-স্পৃহণীয় দুর্ল্লভ বরপ্রাপ্তির অভিপ্রায়েই এই অন্ধ ব্রহ্মচারীটি এতাদৃশ উগ্র-তপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তখনকার হৃষীকেশ এখনকার মত নানা অংশে সুবিধাকর ছিল না। বন্য জন্তুর উপদ্রবও তখন বড় কম ছিল না। মাঝে মাঝে রাত্রিকালে বন্য হস্তী নামিয়া আসিয়া আমাদিগের এই বাল-তপস্বীটির পর্ণকুটীরখানিও ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইত। বিরজানন্দ তখন প্রায় ফল মূলাদি ভোজন করিয়া দিনপাত করিতেন। কদাচিৎ কোন মঠে বা সত্রশালায় যাইয়া অন্নভোজন করিয়াও আসিতেন। ফলতঃ চতুর্দ্দিকে এইরূপ বাধা ও বিঘ্নরাশি সত্ত্বেও বিরজানন্দ এক দিনের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। অধিকন্তু তিনি স্বীয় সংকল্পে সুদৃঢ় এবং সাধনায় অবিচলিত থাকিয়া তদ্গতচিত্তে গায়ত্রীজপই করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে পর, ঘটনাক্রমে, একটি দৈবপ্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। এরূপ কথিত আছে যে, বিরজানন্দ এক দিন স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় শুনিতে

পাইলেন,—কে যেন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন—"তোমার যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে; তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এই বাণী কর্ণগোচর হইবা মাত্র বিরজানন্দের স্বপ্নভঙ্গ হইল। তিনি তখন চকিতের মত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার নিকট তখন কেহই উপস্থিত নাই। সুতরাং তিনি সেই স্বপ্নশ্রুত বাণীকে দৈববাণী বলিয়াই গ্রহণ করিলেন; এবং সেই বাণী যত বারই শ্রবণ করিলেন, তত বারই চিত্তে আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ হৃষীকেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্যই যখন তিনি দৈবাদিষ্ট হইলেন, তখন তথায় আর কি রূপে থাকিবেন? সুতরাং গায়ত্রী-সাধনার শেষ বা সিদ্ধি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, বিরজানন্দ হৃদয়ে কতকটা হতাশ হইয়া হৃষীকেশ হইতে কনখলে চলিয়া আসিলেন।　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীদেঃ——

রামচন্দ্র।

হে রাঘব, রামচন্দ্র, রঘুকুল-পতি,
কত যুগ যুগান্তর গেল যে বহিয়া
লইয়া বিপ্লব কত এ নর জগতে!—
কত ধর্ম্ম উপধর্ম্ম উত্থান পতন
হইল পৃথিবী বক্ষে!—সাগরে পর্ব্বতে
করিল ধরায় কত স্থান বিনিময়!—
গ্রহ উপগ্রহ কত উঠিয়া আকাশে
আবার পাইল লয়! কিন্তু তবু ভবে
তোমার মহিমময় মুরতি মধুর
ধবল গিরির ন্যায় আছে দাঁড়াইয়া
শুভ্র নিরমল,—বিন্দু কলঙ্ক রহিত!
হে প্রজাবৎসল, তব আত্মত্যাগ-কথা,
তব সীতা-নির্ব্বাসন, মানদণ্ডরূপে
চিরদিন ধরামাঝে রবে বিরাজিত!

শ্রী——

সীতা।

অয়ি রঘুকুল বধু জনকনন্দিনি
জানকি, ধন্যা তুমি নারীকুলে পবিত্রা,
পবিত্রিল ভবধাম তোমার পরশে!
তব সুমধুর পতিপ্রেম পাতিব্রত্য,
কি বা অগ্নিপরীক্ষায়, কি বা নির্ব্বাসনে
পরিম্লান হয় নাই যাহা একদিন,
আজিও সজীব ভাবে রমণী সমাজে
শিখাইছে যেই ধর্ম্ম, তাহে নরনারী
এখনো ধর্ম্মের পথে হ'তে অগ্রসর
পাইয়াছে মহাভেলা এ ভব সাগরে!
নিবে যদি চন্দ্র সূর্য্য,—চির অন্ধকারে
ঢাকে যদি ভারতের সুন্দর বদন!
হে কল্যাণি, তবু তব জ্যোতির্ম্ময়ী ছবি
তাহার সে ম্লানমুখ রাখিবে উজ্জ্বল!

শ্রী——

মহামায়া।

প্রকৃতি ও পুরুষ।

শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে, স্থরথ রাজা ও সমাধিনামক বৈশ্য মেধস মুনির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মূর্খ যেমন বিষয়াশক্তির দ্বারা মুগ্ধ হয়, তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও কি নিমিত্ত তদ্ভাবাপন্ন হইয়াছেন?" তদুত্তরে মুনিবর বলেন;—

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ॥"

অর্থাৎ, সংসারের স্থিতিসম্পাদনকারী মহাবিষ্ণুর মহামায়ার প্রভাব বশতঃই জীবগণ মমতারূপ আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে মোহগর্ত্তে নিপতিত হইতেছে।

তৎপর মুনিবর, রাজার প্রার্থনানুসারে মহামায়ার কীদৃক্ স্বভাব ও কার্য্য, এবং তিনি কিরূপে উৎপন্না হইলেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে আছে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি-আত্মমায়য়া॥"

অর্থাৎ, আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও, আমার স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া, আমার মায়ার সাহায্যে প্রকট হই।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যান আছে;—নগাধিরাজ হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে পুষ্পভদ্রা নদীতীরে মৃকণ্ডতনয় মার্কণ্ডেয় ঋষির বিচিত্র শিলানির্ম্মিত আশ্রম ছিল। একদা শ্রীহরি নরনারায়ণ উভয় রূপ ধারণ করিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবান্ নরনারায়ণকে সষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও স্তুতি করিতে লাগিলেন। নরসখা ভগবান্ স্তুত হইয়া বলিলেন, "হে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ! তোমার ব্রতচর্য্যাতে পরিতুষ্ট হইয়াছি, আমি বরদ, তুমি অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "হে অচ্যুত! আমার বরে প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমি আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি। হে পদ্মপলাশলোচন! তথাপি আপনার মায়া দেখিতে আমি অভিলাষ করি, লোকপালের সহিত লোক সকল যে মায়া দ্বারা সদ্বস্তুতে ভেদ দর্শন করেন।" শ্রীভগবান্ হাস্য করিতে করিতে "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একদা মার্কণ্ডেয় ঋষি সন্ধ্যাকালে পুষ্পভদ্রা নদীতটে উপবেশন করিয়া আছেন, এমত সময়ে মহাঝটিকাবায়ু প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল, তৎপর অতি ভয়ানক ঘোরতর মেঘ সকল বিদ্যুতের সহিত উচ্চৈঃ শব্দ করতঃ স্থূল বর্ষধারা সকল বিক্ষিপ্ত করিতে

থাকিলেও অভক্তেরা মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারে না। শ্রুতিতে আছে,—'স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।' অর্থাৎ ব্রহ্ম দেখিলেন (সঙ্কল্প করিলেন, মনন করিলেন) আমি বহু হইয়া জন্মি।

সাধারণতঃ মায়া, প্রকৃতি, অব্যক্ত, প্রধান, অবিদ্যা অজ্ঞান একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা সম্পূর্ণরূপে একার্থবাচক নহে; এবং বেদান্তদর্শনের প্রকৃতি ও সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি যে একার্থবাচক নহে, এবং বেদান্তদর্শনের পুরুষ ও সাংখ্যদর্শনের পুরুষ যে ভিন্নার্থবাচক তাহা ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ আছে, "মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্ত মহেশ্বরং।" অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং মায়ার আশ্রয়ভূত পুরুষকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। ভগবদাশ্রিতা মায়া কর্ত্তৃক এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এই মায়া ব্রহ্মের সঙ্কল্পের অনুবর্ত্তিনী। এবং ব্রহ্ম সৃষ্টি সঙ্কল্প কেন করেন, কারণ, প্রলয়কালে মহামায়া সৃষ্টিবীজ (কর্ম্মফল) কুড়াইয়া রাখেন, তদ্ধেতু প্রলয়াবসানে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, যথা—"পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ অন্যান্য কল্পে যেমন হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কর্ম্মফলই যদি জীবসৃষ্টির কারণ হয়, এবং কার্য্য যদি সৃষ্ট-জীবের কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে জীব আগে সৃষ্ট, কি কর্ম্ম আগে কৃত। এই প্রশ্নের উত্তরদানে দর্শন অসমর্থ। দর্শন বলেন, যেমন বৃক্ষ আগে সৃষ্ট, কি বৃক্ষবীজ আগে সৃষ্ট, ইহার উত্তর দেওয়া যায় না, ইহাও তদ্রূপ। আবহমান অনন্তকাল হইতেই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে।

সাধারণতঃ লোকে মায়াকে "মিথ্যা" বলে। অমুকে মায়াবী, অর্থাৎ মায়া প্রভাবে, ইন্দ্রজাল, মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতির প্রভাবে মিথ্যা বিষয়কে সত্যবৎ প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু ভগবানের মায়া এইরূপ মিথ্যা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নহে। এই মায়া অসুর রাক্ষসাস্ত্রের ন্যায় বিচিত্র কার্য্যকরণে সক্ষম, এই জন্যই মায়া নামে অভিহিত হয়। (রামানুজ আচার্য্যের মত)। এই মায়া ভগবানের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া তাহার নিজ স্বরূপের ভোগ্যত্ব-বুদ্ধির আবির্ভাব করে। ভগবানের স্বরূপত্ব জ্ঞান হইলেই মায়া তিরোহিত হয়, কারণ ভগবানের স্বরূপত্বের অজ্ঞান অবস্থাই মায়া, ভগবানের স্বরূপত্বের জ্ঞান উপলব্ধি হইলেই মায়ার বা অবিদ্যার নাশ হয়।

ব্রহ্ম মায়াতীত, তাঁহাতে মায়ার সংস্পর্শ নাই। তিনি সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মের সঙ্কল্পানুসারিণী মায়ার সংস্পর্শসহকৃত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলে। এখন, মায়াকে যদি দর্পণ বলা যায়, এবং ঈশ্বরকে যদি বিম্ব বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর বিম্ব মায়া দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া চিৎ প্রতিবিম্ব জীব উৎপন্ন হয়। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের দর্পণ যেমন উপাধি, তদ্রূপ মায়া, ঈশ্বর ও জীবের উপাধি। (নীলকণ্ঠ সূরির মত)।

মায়া দুই প্রকার, যথা,—(১) জীব-মায়া

বা অবিদ্যা। (২) গুণ-মায়া বা প্রকৃতি। বিশ্বসৃজন বিষয়ে জীব-মায়া নিমিত্ত কারণ ও গুণ-মায়া উপাদান কারণ, যেমন ঘট নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ ও মৃত্তিকা উপাদান কারণ, তদ্রূপ। এই বিষয় ক্রমে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির বিষয় কথিত হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি অচেতনরূপা, জড়। যথা,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার, মহত্ত্ব। পরা প্রকৃতি জীবরূপা, চেতনধর্ম্মাক্রান্তা। শ্রুতিতে আছে,—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ "জীবাত্মারূপে অণু প্রবেশ করিয়া নামরূপ প্রকটিত করিব।" জীব-রূপা পরা প্রকৃতি জড়রূপা প্রকৃতির অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্টা আছেন, এ জন্য জড়জগৎ, নাম-রূপ লাভ করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ করিয়াছিলেন ঃ—

"শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি, অন্তরঙ্গা, তটস্থা, ও বহিরঙ্গা। অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, ঐ শক্তিপ্রভাবে তিনি পূর্ণরূপে বৈকুণ্ঠাদিতে স্বরূপ বিভবের সহিত বিরাজ করেন। বহিরঙ্গা শক্তি মায়াখ্যা শক্তি, তাঁহার বহিরঙ্গের বৈভব প্রকট করে। এই শক্তি জড়াত্ম প্রধানরূপা। তটস্থা শক্তি চিদাত্মক শুদ্ধ জীবশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তি। তটস্থা শক্তি জীব শক্তি, এবং বহিরঙ্গা শক্তি মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি ও জীবশক্তি অভেদ; আবার শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি ও মায়ামুগ্ধ জীব শক্তি ভেদ। ইহারই নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ।" (মল্লিখিত শ্রীরূপ সনাতনের জীবনী, ৭১ পৃষ্ঠা)।

উল্লিখিত পরাপ্রকৃতি এই তটস্থাশক্তির বা জীবন-মায়া এবং অপরাপ্রকৃতি বহিরঙ্গাশক্তি বা গুণমায়া। গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

অর্থাৎ আমার এই মায়া অলৌকিকী, অত্যদ্ভুতা। ইহা সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণের বিকাররূপা, এবং সর্ব্বতোভাবে দুরতিক্রমণীয়া। কেবল যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তি-সহকারে আমার ভজনা করেন, তিনিই এই দুস্তরণীয়া মায়াকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

ইহার কারণ এই, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ারূপ যবনিকা আছে। ঐ যবনিকা অপসারিত হইলে, অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যার নাশ হইলে, অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত ব্রহ্ম-দৃষ্টিগোচর হয়েন। অথবা, ব্রহ্ম বিম্ব, মায়া-দর্পণ, জীব প্রতিবিম্ব। মায়ারূপ দর্পণ ব্যবধান থাকাতেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীবাত্মার অনুভূতি হয়। ঐ দর্পণ অপসারিত হইলে, অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যার নাশ হইলে, জীবাত্মারূপ প্রতিবিম্ব আর থাকিতে পারে

না, তখন "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্ম মাত্র থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে, ৯ম অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে তাঁহার মায়ার স্বরূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"ঋতে ঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ "

অর্থাৎ, পরমার্থভূত আমি ছাড়া যাহার প্রতীতি হয়, অর্থাৎ আমি প্রতীত (স্ফুরিত) হইলে যাহার প্রতীতি হয় না, অর্থাৎ আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি হয় ("ভগবান্ যাঁহা ভাসেন তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার"), তাহাই আমার মায়া। আবার যাহা আপনা আপনি প্রতীতির বিষয়ীভূত হয় না অর্থাৎ আমার আশ্রয় ও জ্ঞান ব্যতিরেকে যাহার স্বতঃ প্রতীতি (জ্ঞান) নাই, তাহাই আমার মায়া। যেমন ভাস (জ্যোতিষ্মান পদার্থ) ও অন্ধকার, তদ্রূপ।

উক্ত শ্লোকের বিভিন্ন দার্শনিক মতানুযায়ী না না প্রকার অর্থ হইতে পারে। তৎসমস্তের এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বৈষ্ণব ভাষ্যকার শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন;—মায়া তিন প্রকার, যথা,—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। প্রধান দ্বারা উপাধিসমূহ সৃষ্ট হয়, তাহারা সত্য। অবিদ্যা দ্বারা জীবগণে তাহার অধ্যাস সৃষ্ট হয়, সেই অধ্যাস অসত্য। বিদ্যা দ্বারা সেই অধ্যাস ধ্বংস হয়। প্রধানের কার্য্য সৎ, অবিদ্যার কার্য্য মৃষা, এবং তৎভক্তি সম্বন্ধ নিত্য (জীব ভগবানের নিত্য দাস,এই হেতু জীবনিত্য)। দেহ প্রাধানিক, দেহের ধর্ম্ম আবিদ্যক, এবং ভগবানে জীবে নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান ভক্তি বিদ্যক। শ্রীকৃষ্ণের তিন শক্তি, চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। কারণে কার্য্য সূক্ষ্মাবস্থায় লীন থাকে, শক্তিমানে শক্তিশীল থাকে, এই হেতু "একমেব অদ্বয়ংব্রহ্ম," তিনি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

শ্রুতিতে আছে, "অমুত জহামি তাং ত্যহিরিব ত্বচমাত্তভগ ইতি"। অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছা বশতঃ ভগবানের স্ব স্ব রূপ হইতে পৃথগ্‌ভূতা মায়াশক্তি জড়া, যেমন সর্পের ত্বক্ সর্পের স্বরূপভূতা, কিন্তু সর্প সেই ত্বক্ পরিত্যাগ করিলে জড় হয়, তদ্রূপ। মায়াশক্তি যোগমায়া হইতে উদ্ভবা ও যোগমায়ার বিভূতি। নারদ পঞ্চ রাত্রে আছে,—

"অন্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ"।

যোগমায়া ভগবানের স্ব স্বরূপ চিৎশক্তি। অখিলেশ্বরী মহামায়া যোগমায়ার আবরণকারিণী শক্তি। এই মহামায়ার দ্বারা দেহাভিমানী সর্ব্বজগৎ মোহিত হইয়া আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকের শেষাংশের উদাহরণ এইরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যেমন ভাস অর্থাৎ দীপাদি প্রকাশ গৃহে বিদ্যমান থাকিলে ঘটপটাদির প্রকৃত জ্ঞান হয়, কিন্তু গৃহ অন্ধকারপূর্ণ থাকিলে, ঘটপটাদির প্রকৃত জ্ঞান হয় না। কিন্তু ঘটপটাদির অস্তিত্ব

বা অভাব এই জ্ঞান অজ্ঞানের কারণ নহে। কেবল ভাস ও তমই ইহার কারণ। সেই-রূপ বিদ্যা হেতু মুক্তজীবের নিজ-নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞানানন্দাদির প্রতীতি হয়। কিন্তু দেহ-দৈহিক শোক মোহাদির প্রতীতি হয় না। সেইরূপ অবিদ্যা হেতু বদ্ধজীবের নিজে নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞানানন্দাদি বর্ত্তমান থাকা সত্বেও তাহার প্রতীতি হয় না, দেহদৈহিক শোক মোহাদিই প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন কুসুম ও শৃঙ্গ প্রকৃত বস্তু, কিন্তু আকাশে ও শশকে তাহার অভাব, এই হেতু আকাশ কুসুম ও শশশৃঙ্গ অলীক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ দেহ ও দেহের ধর্ম্ম শোক মোহ সুখ দুঃখাদি সত্য হইলেও জীবের তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। জীবের দেহাদি মিথ্যাভূত, এই দেহ সম্বন্ধ অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হয়, এবং বিদ্যাদ্বারা তাহার লোপ হয়। "Dust thou art, to dust returneth, was not spoken of the soul"

'ধূলিময় তুমি পুন ধূলিতে গমন।
আত্মার প্রতি প্রযুজ্য নহেত বচন॥'

এখন দেখা যাইতেছে, জড়ের ধর্ম্ম জীবে (আত্মাতে) আরোপ করা, জীবের নিজের (আত্মার) সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া অনাত্মীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা, জীবের নিজের স্বরূপজ্ঞানের অভাবই অবি-দ্যার কার্য্য। অনাত্মীয় বস্তুর (প্রকৃতির) স-হিত জীবের (পুরুষের) কোন সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ "নেতি" "নেতি" জ্ঞান হইলে, এবং জীব ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান হইলে (অদ্বৈত-বাদীর মতে) অথবা জীব ভগবানের নিত্য-দাস, ভগবানের সহিত নিত্যজীবের এই নিত্যসম্বন্ধ (বৈষ্ণবাচার্য্যের মতে) এই জ্ঞান (বিদ্যা) উদয় হইলেই জীব জন্মমৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পায়, অথবা জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে মিলিত হয়, অথবা প্রকৃতি বা প্রধানের (সাংখ্যদর্শনমতে) কবল হইতে জীব (পুরুষ) মুক্ত হয়।

প্রকৃতিঃ—সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা ইতি অব্যক্ত প্রকৃতির্বা। সত্বগুণ, রজোগুণ ও তমো গুণ, এই তিন গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ কোনও একটিকে অপরে পরা-ভূত করিয়া প্রবলতর হয় না, তখন তাহাকে প্রকৃতি বলা যায়। প্রকৃতির অপর নাম অব্যক্ত ও প্রধান (সাংখ্যদর্শনমতে)। পুরুষ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত (স ঐক্ষত বহুসাং প্রজায়েয়) করিলে প্রকৃতির গুণক্ষোভ জন্মে ও সৃষ্টিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। গুণ বৈষম্যই সৃষ্টির কারণ।

প্রকৃতি = প্র + কৃ + তি। প্র—প্রকৃষ্ট সত্বগুণ, কৃ—রজোগুণ, তি—তমোগুণ।

"গুণে প্রকৃষ্টে সত্বেচ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসিকৃশ্চ তিশব্দস্তামসঃ স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্ম স্বরূপা যা সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে।
প্রত্যয়ে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ।
সৃষ্টে রাদ্যাচ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা।"
(ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ)।

অজ্ঞান ও অবিদ্যাঃ—অজ্ঞান (জ্ঞানের

লাগিল। অনন্তর চতুর্দ্দিকে ভয়ানক হিংস্র জলজন্তুবিশিষ্ট, ত্রাসজনক আবর্ত্তসঙ্কুল, গভীর শব্দকারী সমুদ্র সকল সমীরণোদ্ভূত উর্ম্মীমালা দ্বারা যেন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন মার্কণ্ডেয় ঋষি পৃথিবীকে জলপ্লাবিত দেখিয়া, ও অন্তর্বাহ্যে আকাশ পরিব্যাপ্ত, খরতর জলবেগে ও বিদ্যুৎ শব্দে উপতাপিত, আপনাকে ও চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীরবিশিষ্ট জগৎকে দর্শন করিয়া ভয়ব্যাকুল হইলেন। বর্ষণ দ্বারা আপূর্য্যমাণ, উর্ম্মী দ্বারা ভীষণ, বায়ু দ্বারা ঘূর্ণমান, সেই মহাসমুদ্র দেখিতে দেখিতে দ্বীপ, বন ও পর্ব্বতাদি সহিত পৃথিবীকে জলে পরিপূর্ণ করিল। তখন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, গ্রহগণ ও দিগ্দেশ সহিত ত্রৈলোক্য জলে প্লাবিত হইয়াছিল, কেবল একা সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি অর্ণবোপরি ভাসিতেছিলেন। তিনি ক্ষুৎপিপাসায় ব্যাকুল, মকর তিমিঙ্গিলাদিদ্বারা উপদ্রুত, তরঙ্গিত বায়ু দ্বারা আহত ও ঘোর অন্ধকারে পতিত হইয়া দিকে দিকে ভ্রমণ করতঃ অত্যন্ত ক্লান্তি বশতঃ আকাশ ও পৃথিবী কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। কখন মহার্ণবে মগ্ন, কখন তরলতরঙ্গে বিতাড়িত, কখন পরস্পর যুধ্যমান হিংস্র জলজন্তু কর্ত্তৃক দংশিত, কখন ব্যাধি পীড়িত হইয়া কখন শোক, কখন মোহ, কখন দুঃখ, কখন ভয় পাইতে লাগিলেন। বিষ্ণুমায়াবৃত মার্কণ্ডেয় এইরূপে সেই মহার্ণবে ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

মার্কণ্ডেয় ঋষি এইরূপে মহার্ণবে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক সময়ে পৃথিবীর এক উন্নত দেশে ফলপল্লবশোভিত একটি কোমল বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি আরও দেখিলেন, সেই বৃক্ষের পূর্ব্বোত্তরদিকস্থ শাখার পত্রপুটে একটি শিশু শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার প্রভায় চারিদিকের তমোনাশ হইতেছে। তাঁহার রূপ মহামরকতের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বদনমণ্ডল পদ্মের ন্যায় রমণীয়, কম্বুগ্রীব, মহোরস্ক, সুন্দর নাসা ও সুন্দর ভ্রূ। নিশ্বাস-পবনে অলকাশোভিত, দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় বলয়াকার কর্ণদ্বয় সুশোভিত, বিম্বাধর শোভায় ঈষৎ রক্তবর্ণ ও অমৃততুল্য হাস্যযুক্ত। পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ অপাঙ্গ, মনোহর হাস্যযুক্ত দৃষ্টি, শ্বাসবেগে চঞ্চল ত্রিবলির সহিত কম্পিত গভীর নাভী এবং অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় উদর; এবং মনোহর হস্তাঙ্গুলি দ্বারা স্বীয় চরণপঙ্কজ ধারণ পূর্ব্বক মুখে প্রদান করিয়া চরণমধু পানশীল।

ঋষি মার্কণ্ডেয় ঐ অদ্ভুত বালকের এইরূপ ভাব দর্শনে বিগতশ্রম হইয়া প্রোৎফুল্লহৃদয়ে সহর্ষে কোন অনির্ব্বচনীয় ভাবে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিলেন, এবং সমীপস্থ হইবামাত্র মশকের ন্যায় বালকের নিশ্বাস পবনবেগে তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় প্রলয়ের পূর্ব্বের ন্যায় এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিত দেখিয়া মোহাভিভূত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ঋষি

দেখিলেন, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্ব্বত, সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, দিক, সুর, অসুর বন, দেশ, নদী, পুরী, আকাশ, খেট, ব্রজ, আশ্রম, ও বর্ণবৃত্তি। তিনি মহাভূত, স্থূল-ভূত, ভৌতিক, কাল, যুগ, কল্প, ব্যবহার্য্য দ্রব্য, ও দিবারাত্রি সহিত অবভাসিত বিশ্ব দর্শন করিলেন এবং হিমালয়, পুষ্পবহা নদী, স্বীয় আশ্রম, এবং তথায় নরনারায়ণকে দেখিলেন।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এইরূপে শিশুর উদরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া পরে শিশুর নিশ্বাস-পবনের দ্বারা পুনরায় বহির্গত হইয়া প্রলয় সমুদ্রে নিপতিত হইলেন। এবং পুনরায় সেই উন্নতদেশে কোমল বটবৃক্ষ ও পত্রপুটে শয়ান অমৃতময় হাস্যযুক্ত বালককে দর্শন করিলেন। ঐ বালক যেন তাঁহার নয়নপথ দিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি হর্ষযুক্ত হইয়া ঐ বালককে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে যোগাধীশ, গুহাশয়, সাক্ষাৎ অধোক্ষজ সেই বালকরূপী ভগবান্ ঋষির নিকট হইতে ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর, তৎক্ষণাৎ সেই বটবৃক্ষ জল-প্লাবন, লোকোপদ্রব ইত্যাদি সমস্ত তিরোহিত হইল, এবং মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্ব্ববৎ স্বীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঋষি মার্কণ্ডেয় এইপ্রকারে নারায়ণ-বিনির্ম্মিত যোগমায়ার বৈভব দর্শন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

শ্রীচৈতন্যের চরিতামৃত পাঠ করিলে জানা-যায় যে, চৈতন্যদেব একদিন সঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রান্ত হইয়া ভক্তগণকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, আঙ্গিনায় এক আম্রবীজ রোপণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ জন্মিল, তাহা বড় হইল, তাহাতে আম্র ধরিল ও পাকিল। তিনি সেই ফল পাড়াইয়া ধুইয়া কৃষ্ণকে ভোগ দিলেন, তৎপর নিজে ও সব বৈষ্ণব ঐ মধুর আম্রফল ভোজন করিলেন। পরিশেষে সেই আম্রবৃক্ষ অন্তর্হিত হইল। মহাপ্রভু বলিলেন "ইহাই ভগবানের মায়া।"

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মায়া শ্রীভগবানের অবিতর্ক্য, অতি বিচিত্র, অলৌকিকী, অত্যদ্ভুতা, অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির কারণ-রূপা, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকের "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ" অংশের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন। "যোগমায়া সমাবৃতঃ যোগঃ যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটমান-ঘটনাপটীয়স্ত্বাৎ।" নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন। "যোগঃ যুক্তিঃ গুণানাং ঘটনং সৈব যোগমায়া, চিত্তসমাধির্ব্বা, যোগো ভগবতস্তৎকৃতা মায়েতি ভগবৎ সঙ্কল্পবশবর্ত্তিনী মায়েত্যর্থঃ।" মধুসূদন বলিয়াছেন। "যোগে চ মম সঙ্কল্পস্তদ্ বশবর্ত্তিনী মায়া।" ব্রহ্মমায়া যবনিকা দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায় অভক্তেরা তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না। ব্রহ্ম সূর্য্য স্বরূপ, মায়া সুমেরু শৈলস্বরূপা, সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বদা প্রকাশমান

অভাব) ও অবিদ্যা এক কথা নহে। অবিদ্যা সৃষ্টিকরণে সমর্থা, সুতরাং অভাব নহে। ভাবরূপা। বেদান্তসার বলেন ;—

"অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি।" অর্থাৎ অজ্ঞান সৎ এবং অসৎ হইতে ভিন্ন, অনির্ব্বচনীয়, সত্ব রজ ও তম এই তিনগুণ-সমন্বিত, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপ, যাহা কিছু (ঠিক কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না), বলিয়া অভিহিত হয়।

মায়া ও অবিদ্যাঃ—ব্যষ্টিভূত (এক একটি) মলিনসত্ব প্রধান অজ্ঞানই "অবিদ্যা," এবং সমষ্টিভূত শুদ্ধ সত্বপ্রধান অজ্ঞানই "মায়া।" পঞ্চদশী বলেন ;—

"চিদানন্দ ময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা।
তমো রজঃ সত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।
সত্বশুদ্ধা-বিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যেচ তে মতে॥"

অর্থাৎ চিৎ—আনন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সংযুক্ত ; সত্ব রজ তমগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি সত্বগুণের শুদ্ধির তারতম্যক্রমে "মায়া" ও "অবিদ্যা" কথিত হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ সত্বগুণ প্রধান অবস্থাকে মায়া এবং রজ তমগুণের দ্বারা কলুষিত সত্বপ্রধান অবস্থাকে অবিদ্যা বলা যায়।

উল্লিখিত পার্থক্য সমস্ত প্রায়ই কাল্পনিক। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি বা প্রধান এবং বেদান্তদর্শনের প্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে পৃথক্। সাংখ্যাচার্য্যের মতে সত্ব রজ তমোগুণ সূক্ষ্ম দ্রব্য পদার্থ অথবা মহাণু। এই তিন জাতীয় মহাণুর নানাভাবে সংযোগ বিয়োগ হেতু, ক্রমবিকাশের নিয়ম অনুসারে মহত্তত্ব, অহঙ্কার, সূক্ষ্মতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। অপ্রসবধর্ম্মী পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃই প্রকৃতি সৃষ্টি প্রসবকর্ত্রী হন। (মল্লিখিত যুগধর্ম্ম, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

সাধারণতঃ লোকে পুরুষ ও প্রকৃতির এই অর্থ বুঝেন যে, পুরুষ বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী। পুরুষ মহেশ্বর, প্রকৃতি মহেশ্বরী। পুরুষ ও প্রকৃতির জ্ঞান এত সূক্ষ্ম যে, কেহই তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না, এই জন্যই নানা দর্শন ও নানা পুরাণে পুরুষ-প্রকৃতির বিবরণ নানা প্রকার দেখা যায়। অনেকে বলেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ, আমরা সৃষ্ট জীব সকলেই প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ একাই আমাদের সকলের স্বামী, তাঁহাকে মধুররসে ভজনা করা যায়। মীরাবাই একদিন বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমি প্রকৃতি সন্দর্শন করি না।" তদুত্তরে মীরাবাই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "এ আবার কোন্ পুরুষ ? এতদিন জানিতাম না যে, এই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কোন পুরুষ আছেন।" অর্থাৎ এক শ্রীকৃষ্ণই সকলের পতি, আমরা সকলেই প্রকৃতি। সাংখ্যশাস্ত্র মতে "ঈশ্বরাসিদ্ধি," এক পুরুষের কল্পনা নাই। প্রত্যেক জীবই (চিৎ) একটি স্বতন্ত্র পুরুষ ও অনাদি এবং প্রকৃতি বা অব্যক্ত বা প্রধান ও অনাদি এবং জড়া।

সুতরাং সাংখ্য মতে পুরুষ বহুল, যেহেতু এক পুরুষের মুক্তি হইলে সকল পুরুষের মুক্তি হয় না। কিন্তু সকল পুরুষের সাধারণ স্বভাব একত্বে (Unification) উপনীত হইতে পারিলে এবং পুরুষকে জাতিবাচক শব্দরূপে গ্রহণ করিলে (species ও genus) এর নিয়ম অনুসারে ("জাতিপরত্বাৎ") এক পরমপুরুষে বা আদি পুরুষে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই এক পরমপুরুষ ও বেদান্তদর্শনের সত্ত্বগুণাধিকা মায়া কর্তৃক উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর একই বস্তু। কিন্তু বেদান্তদর্শনের প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মের অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তিমাত্র, স্বতন্ত্র অস্তিত্বহীনা। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি বা প্রধান অনাদিকাল হইতে অস্তিত্বযুক্তা, সৎ পদার্থ, জগৎ প্রসবকর্ত্রী। সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতি সতী, কারণ,—

"অসদকরণাদুপাদান গ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণ ভাবাচ্চ সৎকার্য্যং॥"

অর্থাৎ, অসৎ হইতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, কোন কার্য্য করিতে হইলে উপাদান গ্রহণ করিতে হয়, এক উপাদান দ্বারা সমস্ত কার্য্য করা অসম্ভব, এবং যাহার যে বস্তু উৎপাদনের শক্তিমত্তা আছে, তদ্দ্বারা সেই বস্তুই উৎপন্ন হওয়ায় কার্য্যে কারণের ভাব থাকে। অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিদ্যমান আছে, সুতরাং ঐ সৎরূপ জগতের কারণও সৎ। কপিলের মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, পুরুষের সন্নিকর্ষ হেতু এক প্রকৃতি হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারই নাম সৎকার্য্যবাদ। বেদান্তদর্শন মতে ব্রহ্ম সৎ; ত্রিসর্গ (সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়) মৃষা, কিন্তু ব্রহ্মের সত্যতায় সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহার নাম সৎকারণবাদ।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি জড়া, অচেতন, তাহার কোন ইচ্ছাশক্তি নাই। তবে প্রকৃতি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করে? উত্তর, প্রকৃতির এক অসাধারণ বিভূতি (শক্তি) আছে। প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মী। প্রকৃতি প্রধান বা অব্যক্ত এবং জগৎ ব্যক্ত। প্রকৃতি কিম্ভূতা?

"হেতুমৎ অনিত্যং অব্যাপি সক্রিয়ং অনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীমব্যক্তং।"

অর্থাৎ এই ব্যক্ত বা বিশ্ব হেতুমৎ অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন, অনিত্য, অব্যাপী, পরিবর্ত্তনশীল, বহু, অধীন, বিশেষ লক্ষণাক্রান্তা, পরস্পর সংযোগার্হ, এবং পূর্ব্বোত্তরতত্ত্বের সাহায্য সাপেক্ষ। অব্যক্ত বা প্রকৃতি ঐ সমস্তের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ প্রকৃতি অহেতুক, নিত্য, ব্যাপী ইত্যাদি।

প্রকৃতি নিত্যা, অনাদি। পুরুষগণও নিত্য, অনাদি। তবে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কি? সাংখ্যকারিকা বলেন,—

"ত্রিগুণং অবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যং অচেতনং ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥"

অর্থাৎ ব্যক্ত বা প্রকৃতিজাত সমস্ত জাগতিক পদার্থ ও অব্যক্ত বা প্রকৃতি ত্রিগুণবিশিষ্ট, বিবেকবিহীন, জ্ঞাতব্য বিষয় (পুরুষ জ্ঞাতা বিষয়ী), সমজাতীয়, অচেতন ও প্রসব-ধর্ম্মযুক্ত। কিন্তু পুরুষ তদ্বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী, অর্থাৎ পুরুষ বিষয়ী বা জ্ঞাতা, বিবেকী, চেতন, অপ্রসবধর্ম্মবিশিষ্ট ইত্যাদি।

অন্য এক কারিকায় আছে ;—

"মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রাকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়কস্ত বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

অর্থাৎ, এই জগতের মূল অর্থাৎ উপাদান কারণ মূল প্রকৃতি (কিন্তু বেদান্তদর্শন মতে ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ)। তিনি অবিকৃতি অর্থাৎ উৎপন্না হন না, তিনি নিত্যা। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চটি বিষয়) মোট সপ্ততত্ত্ব উৎপন্নও বটে উৎপাদকও বটে, অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন। ষোড়শ তত্ত্ব অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয় মন, এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চমহাভূত, মোট ষোড়শটি বিকার অর্থাৎ উৎপন্ন। অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন, এবং অহঙ্কার হইতে মন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ উৎপন্নও নহেন ও উৎপাদকও নহেন।

পুরুষ যে এক নহেন, বহু, তাহা কিরূপে জানা যায়? তৎসম্বন্ধে সাংখ্যকারিকায় আছে ;—

"জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥"

অর্থাৎ, প্রতি দেহে জন্ম, মৃত্যু ও ত্রয়োদশ করণের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা থাকা হেতু, প্রতি দেহে যুগপৎ প্রবৃত্তির (প্রযত্নাদির) অভাব হেতু, এবং বিভিন্ন দেহে ত্রিগুণের বিভিন্নতা হেতু, পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়।

জন্মাদি-ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্," অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ বিয়োগের বিভিন্নতা হেতুও পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। এক পুরুষের অজ্ঞানতা দূর ও মোক্ষ লাভ হইলে সকলের তাহা হয় না।

বেদান্ত ও সাংখ্য, উভয় মতেই প্রকৃতির স্বভাব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে এবং বেদান্ত মতে জীবাত্মার প্রকৃত জ্ঞান (অর্থাৎ জীবাত্মা ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র, জীবাত্মাও ব্রহ্ম অভেদ এই জ্ঞান) জন্মিলে ও সাংখ্যমতে পুরুষের প্রকৃত জ্ঞান (অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র) এই জ্ঞান জন্মিলে এবং লিঙ্গ-শরীরের ধ্বংস করিতে পারিলে অথবা ষট্‌কোষ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব (পুরুষ) মুক্তি লাভ করেন। বেদান্তদর্শন মতে আত্মানাত্ম বি-

বেক দ্বারায় তাহা সুসিদ্ধ হয়। সাংখ্য মতে সাংখ্যযোগাবলম্বনে তাহা সিদ্ধ হয়। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কি, এবং কাল, দেশ ও বস্তুগত পরিচ্ছেদ দ্বারা ও মায়ারূপ দর্পণের সাহায্যে প্রতিবিম্বের দ্বারা কিরূপে একই সৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অশেষ জীবজন্তুরূপে প্রতীয়মান হন, তাহা বেদান্তশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। উপনিষদের শ্লোকের অর্থ সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে, এবং তাহা লইয়াই উভয় মতাবলম্বীরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘনীভূত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে একটি উদাহরণ দিতেছি।

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ॥
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে।
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি)

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৮ম সূত্র এই,—

"চমসবৎ বিশেষাৎ," অর্থাৎ "চমস" শব্দের প্রয়োগবৎ "অজা" শব্দ রূপকার্থে প্রযুক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রধান প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এইরূপঃ—

অজা অর্থে যিনি উৎপন্না হন না, অর্থাৎ নিত্যা অনাদি প্রকৃতি। তিনি লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণা, অর্থাৎ রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি স্বরূপা অর্থাৎ ত্রিগুণান্বিত বহু প্রজা (জগৎ) প্রসব করেন। পুরুষ তাহার স্বরূপ (সজাতীয়) নহেন, এজন্য তিনি পুরুষ প্রসব করেন না। এক অজ (নিত্যপুরুষ, বদ্ধ জীব) ঐ অজাকে (প্রকৃতিকে) সেবকরূপে ভজনা (ভোগ) করিতেছেন। অন্য অজ (শাশ্বত পুরুষ, মুক্ত জীব) ভুক্তভোগা ঐ অজাকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিয়া অর্থাৎ প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করিয়া প্রকৃতির স্বভাব ও নিজের স্বভাব সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বীততৃষ্ণ (আসক্তিশূন্য) হইয়া তাহাকে ত্যাগ করেন।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, ঐ শ্রুতির অজা শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে, অতএব প্রাধানই বিশ্ববিধাত্রী। বেদান্তদর্শন বলেন যে, প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মের শক্তি, তাহা ব্রহ্মসাপেক্ষ। কিন্তু সাংখ্যকার এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, প্রকৃতি স্বপ্রধান ও স্বয়ম্ভুতত্ত্ব।

বেদান্তদর্শন তাহার এই উত্তর দিয়া থাকেন। "চমস" শব্দের ন্যায় 'অজা' শব্দ ছাগী এই অর্থে রূপকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'অজা' শব্দ দ্বারা প্রধান প্রতিপাদিত হইতে পারে না। একটি মন্ত্রে আছে 'অবাগ্ বিলশ্ চমস উর্দ্ধবুধ্নঃ' অর্থাৎ অধোমুখ উর্দ্ধতল একটি চমস বা হাতা বিশেষ। এতদ্দ্বারা কি বস্তু বুঝাইতেছে জানা যায় না। কিন্তু, তৎপরবর্ত্তী এক মন্ত্রে 'চমস' শব্দ মস্তক বা মুণ্ডকে বুঝাইয়াছে। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পরবর্ত্তী কোন শ্রুতিতে ঐ 'অজা' শব্দের অর্থ বিশদীকৃত হয় নাই। উক্ত উপনিষদের অন্য স্থানে উক্ত

হইয়াছে যে, ব্রহ্মের মায়াশক্তি বা প্রকৃতি দ্বারা এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই শ্লোকের লোহিতবর্ণ অর্থে তেজ, শুক্লবর্ণ অর্থে অপ্ এবং কৃষ্ণবর্ণ অর্থে ক্ষিতি বা অন্ন। সুতরাং ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় ক্ষিতি-অপ-তেজ-তত্ত্ব।

শ্রীজানকীনাথ শাস্ত্রী।

আবাহন।

(১)

মা আমার! আসিবি আবার?
শরতের মেঘশূন্য বিমল আকাশে,
রজতের রেখাসম 'ছায়াপথ' ভাসে
অযুত তারার মালা দুইপাশে তার
বিমল চন্দ্রমালোক ক্ষরে সুধাধার,
আকাশ ভরিয়া গায় 'পাপিয়া' সঙ্গীত
'আগমনী',—মধুময় কণ্ঠে—সুললিত।
সেই পথে ভারতের নাশিতে আঁধার
মা আমার, আসিবি আবার?

(২)

মা আমার, আসিবি আবার?
তাই কি মা মরুময় ভারতের বুকে
চিরদীপ্ত শ্মশানের লোল ঊর্দ্ধশিখে
সাময়িক আনন্দের শীতল সলিল
ঢেলে দিলি? তাই কি মা, সুরভি অনিল
পূতিগন্ধ কলুষিত ভারত নাসায়
নন্দনের পারিজাত সৌরভ বিলায়?
তাই কি মা ভারতের আনন্দ অপার?
মা আমার, আসিবি আবার?

(৩)

মা আমার, আসিবি আবার?
তাই কি মা, শরতের বিমল প্রভাতে
আশার আলোকচ্ছটা দশদিশি ভাতে?
নীহার-নিষিক্ত চারু পাদপ-নিকর
প্রফুল্ল কুসুমে হাসে?—স্বচ্ছ সরোবর
কমল কহ্লার কুল মরাল সেবিত
ভ্রমর গুঞ্জিত, তীরে বিহঙ্গ কূজিত,
মা, তোমারি মত হাসে আলোকে ঊষার
মা আমার, আসিবি আবার?

(৪)

মা আমার, আসিবি আবার?
এস মা আঁধার দ্বার দীন ভারতের
মৃত দেহে ঢেলে দাও শক্তি অতীতের।
মাতৃহীন অভাগার উত্তপ্ত পরাণে
ঢেলে দাও শান্তিধারা!—কাতর বয়ানে
ফুটাও হাসির রেখা!—ক্ষুধার্ত্তের মুখে
এক মুষ্টি অন্ন দাও!—অনাথের বুকে
একবিন্দু আশা দাও!—নয়ন আসার
মুছে দাও জননি, আমার!

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

মোগলের অধঃপতন।

দ্বিতীয় আলমগীর।

আলমগীর সদাশয় ও মহানুভব ছিলেন। তিনি রাজত্বের প্রারম্ভে সত্তর জন আরুদ্ধ রাজকুমারকে মুক্তি প্রদান করিলেন। আজিমুদ্দীন ইতিহাসে দ্বিতীয় আলমগীর নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি নামে মাত্র বাদশাহ হইলেন, গাজি স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়া পুত্তলে পরিণত করিলেন। রাজসিংহাসন বাদশাহের নিকট কারাগার অপেক্ষাও হীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তিনি গাজিউদ্দীনের প্রভুত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনরূপেই গাজির সর্ব্বময়-প্রভুত্ব খর্ব্ব করিতে পারিলেন না, এজন্য তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া,আবেদালী দুরাণীকে ভারতবর্ষে আহ্বান করিলেন। আবেদালী এই আত্মকলহের সুযোগে ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে অস্বীকৃত হইলেন না। তিনি সসৈন্যে দিল্লীতে আগমন করিয়া * গাজিউদ্দীনকে পদচ্যুত এবং বাদশাহকে মনোমত উজীর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই গাজি আফগান বীরকে সুকৌশলে আপন পক্ষাবলম্বী করিয়া পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আবেদালী দিল্লীবাসীর নিকট হইতে এককোটী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় তাহাদের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল যে, নাদির শাহের আক্রমণ কালে দশ কোটী মুদ্রা সংগ্রহ করা অপেক্ষা আবেদালীর আদেশে এককোটী মুদ্রা আদায় করাই অধিকতর দুরূহ হইল। বাদশাহ সর্ব্বগ্রাসী গাজির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মহাশত্রুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, অধিকন্তু আমন্ত্রিত শত্রু প্রকৃতিপুঞ্জের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিলেন; তাঁহার অত্যাচারে রাজধানী শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইল। বাদশাহ প্রকৃতিপুঞ্জের দুর্দ্দশার অপনয়ন জন্য একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না। একদিকে তাহাদের কাতর ধ্বনি গগনস্পর্শ করিতেছিল; অপর দিকে

* ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণের পরে ও এই আক্রমণের পূর্ব্বে আবেদালী আর একবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। সেবার বাদশাহ তাঁহাকে পঞ্জাব প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করেন এবং তজ্জন্য তিনি আর অগ্রসর না হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

বাদশাহ মোহাম্মদশাহের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবার আশায় লুণ্ঠনকারীর তোষামোদে ব্যাপৃত ছিলেন। আবেদালী ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক একবৎসর কাল অবস্থান করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আলমগীরের পুত্র শাহ আলম রণকুশল ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। এ জন্য গাজিউদ্দীন তাঁহাকে আপন পথের কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শাহ আলম কৌশলে কারাভবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দূরে পলায়ন করিলেন; এবং গাজি উদ্দীনের করালকবল হইতে পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য মহারাষ্ট্রা সেনা পতি ইটল রাওর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা অর্দ্ধবৎসরকাল দিল্লীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে কোন প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত না হওয়াতে শাহ আলম তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেকেন্দ্রাবাদের জায়গীরদার নজবদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নজবদ্দৌলা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুকূলে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং তিনি সেকেন্দ্রাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সহ অযোধ্যা প্রদেশের প্রধান নগরী লক্ষ্ণৌতে উপনীত হইলেন। এই সময় সফদারজঙ্গের পুত্র সুজাদ্দৌলা অযোধ্যার শাসনপতি ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। দিল্লীর বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে কোন প্রকার সহায়তা করিলেন না। শাহ আলম তথা হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার নিকট গমন করিলেন, ও তাঁহার সহায়তায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এলাহাবাদের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তিনি এই সময় গাজিউদ্দীনের হস্তে আলমগীরের নিহত হইবার সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন। অযোধ্যার শাসনপতি সুজাদ্দৌলা যথাসময়ে এই সংবাদ পরিশ্রুত হইলেন। তিনি বাদশাহ উপাধিধারী শাহ আলমকে হস্তগত করিয়া আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে মনন করিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া এলাহাবাদ গমন করিলেন।

আবেদালীর তৃতীয়বার ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর মহারাষ্ট্রীয় অধিনায়কগণ সসৈন্যে পঞ্জাবে উপনীত হন এবং তথায় সহজেই বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য স্বজাতীয় সুবাদার নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁহারা সমগ্রদেশ অধিকার করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই উদ্যোগ পূর্ব্বকালে দিল্লীর রাজবংশ বসন্ত সমাগমে তুষার রাশির ন্যায় লোকলোচনের বহির্ভূত হইতেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে কেহই মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতার পূর্ণ প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইত।

সুতরাং এই সময়ই দিল্লীর দুর্গ প্রাকারে হিন্দুর বিজয় নিশান উড্ডীন করার পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়দের মাহেন্দ্রক্ষণ স্বরূপ ছিল। *

মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পঞ্জাব অধিকার করিলে আবেদালী আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষাভিমুখে ধাবিত হন। এই সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিলে বাদশাহ গাজির করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহাতে গাজি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিলেন এবং শূন্য সিংহাসনে একজন রাজকুমারকে সাহজাহান উপাধি প্রদান করিয়া বসাইলেন।

* একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক দিল্লীর সাম্রাজ্যের এই সময়ের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "Every petty chief, in the meantime, by counterfeited grant from Delhi, laid claim to Jaigirs and Districts; the country was torn to pieces with civil wars, and groaned under every species of domestic confusion; Villainy was practised in every form; all land and religion were trodden under foot; the bonds of private friendships and connexions, as well as of society and government were broken; and every individual * * * could rely upon nothing but the stregth of his arm."

দ্বিতীয় সাহজাহান।

গাজীর উৎপীড়নে সর্ব্বসাধারণ অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহার উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমশঃ এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, একদা কতিপয় সৈনিক পুরুষ প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হয় এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া নগ্নপদে ও নগ্ন শিরে রাজপথে টানিয়া লইয়া যায়। এই সময় তাঁহার মৃত্যু-বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এ অবস্থায়ও গাজি বিরুদ্ধবাদী সৈনিক পুরুষদিগকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে বিরত ছিলেন না। অবশেষে সেনানায়কগণের মধ্যস্থতায় তিনি পরিত্রাণ লাভ করেন। তিনি আপদ্মুক্ত হইয়াই বিরুদ্ধবাদী সমস্ত সৈনিকপুরুষকে তরবারি মুখে সমর্পণ করেন। তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারে নগরবাসিদের মধ্যে কেহই তাঁহার পক্ষপাতী ছিল না। এই সমস্ত কারণে তিনি আবেদালীর গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আক্রমণে দিল্লী পুনর্ব্বার বিধ্বস্ত হইল। গাজির সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল; তিনি ভগ্নহৃদয়ে দক্ষিণাপথে গমন করিলেন।* আবেদালীর সৈন্য, গৃহ সকল দগ্ধ ও নর নারীকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। রক্তপিপাসু আফগান সৈন্য নির্দ্দোষ নর

* দক্ষিণাপথে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি আর ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে দেখা গিয়াছিল।

নারীর রক্তপাতে কিছুতেই বিরত হইল না। অবশেষে তাহারা মৃত দেহরাশির পুতিগন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া সহর পরিত্যাগ করিল, দিল্লীবাসীর জীবন রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহাদের প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত ছিল; তাহারা তরবারির মুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া দুর্ভিক্ষের ভীষণ গ্রাসে পতিত হইল। দলে দলে নর নারী অনাহারে আপন আপন ভগ্নাবশেষ গৃহ মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তীস্থান সমূহের এইরূপ দুরবস্থার সময়ে মহারাষ্ট্রীয় নায়ক পেশওয়া আবদালীকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিলুপ্তপ্রায় মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণধ্বংস সাধনপূর্ব্বক তদুপরি হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিতে মনন করিলেন।

তদনুসারে তিনি সদাশিব রাও ভাওর অধীন বিংশ সহস্র অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জাঠ বীরগণ এবং রাজপুতনার রাজন্যবর্গ সসৈন্যে মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই অভিযানকে ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন জন্য সমগ্র হিন্দু জাতির সম্মিলিত অভ্যুত্থানরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি দিল্লীতে উপনীত হইয়া দ্বিতীয় সাজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং স্বপক্ষভুক্ত আমীর ওমরাহের সন্দিগ্ধচিত্ত প্রকাশিত করিবার জন্য জাহানবক্ত নামক শাহ আলমের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই অর্ব্বাচীন বাদসাহের শাসনকার্য্যে কিরূপ দক্ষতা ছিল? শাসনকার্য্যে দক্ষতা থাকিলেই বা কি হইত? কারণ, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার প্রজা ছিল না। ফলতঃ বোধ হয়, যেন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মোসলমান রাজলক্ষ্মীর অবমাননার নিমিত্তই তাঁহাকে রাজার প্রতিমূর্ত্তিরূপে রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ভাও দিল্লীতে আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আপামর সাধারণের একান্ত অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠেন, মূল্যবান্ অলঙ্কারের লোভে রাজপ্রাসাদ, সমাধিভবন ও ধর্ম্মমন্দিরের কারুকার্য্য ধ্বংস করেন। তিনি দরবার গৃহের রৌপ্য-নির্ম্মিত ছাদ ধ্বংস করিয়া সতর লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হন, এবং রাজসিংহাসন ও অন্যান্য মূল্যবান্ আসবাব আত্মসাৎ করেন।

হিন্দুজাতিকে মোসলমানের রাজশক্তি চূর্ণ করিবার জন্য সম্মিলিত দেখিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মোসলমান শাসনকর্ত্তাগণ আবেদালীর সঙ্গে যোগপ্রদান করিলেন। হিন্দু ও মোসলমান উভয় পক্ষেই ঘোর যুদ্ধের আয়োজন হইল। কিন্তু কেহই অগ্রে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। অবশেষে মহারাষ্ট্র শিবিরে রসদের অভাব উপস্থিত হওয়াতে সদাশিব রাওভাও ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ক পাণিপাথের বিশাল প্রান্তরে মোসলমান সৈন্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। মহারাষ্ট্রা সৈন্য কখনও সম্মুখ যুদ্ধ

করিত না। তাহারা সর্ব্বপ্রথমে পাণিপথেই সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ জন্য প্রয়াসী হইয়াছিল বলিয়া বলা যাইতে পারে। তাহারা এই প্রয়াসে ব্যর্থকাম হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশাও চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিল। পাণিপথের যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী মোসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন এবং পঞ্চাশ সহস্র মহারাষ্ট্রা সৈন্য রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল।

পাণিপথের যুদ্ধের পর আবেদালী প্রয়োজন বশতঃ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময়, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সদাশিব রাও ভাও স্থাপিত জাহানবক্ত দিল্লীতে বাদশাহ উপাধিধারী ছিলেন। এবং তদীয় পিতা শাহ আলম শূন্য বাদশাহ উপাধি লইয়া এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ছায়াদর্শন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

উপক্রম।

ভারতবর্ষের ভাব-বিভোর ঋষিতাপসেরা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের নাম রস,—"রসো বৈ সঃ।" তিনি রসস্বরূপ,—রসের ন্যায় মধুর,—রসবৎ প্রাণশীতল,—পূর্ণানন্দ। আর, ইয়ুরোপের তপোমগ্ন যোগীরা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের নাম প্রেম,—"God is Love,"—তিনি প্রেমময়—প্রেমের সমুদ্র। এই প্রেমাত্মক রসস্বরূপের ক্রমবিকাশই এই বিশাল বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। যাঁহার আত্মা তত্ত্বের প্রকৃত আলোকে আলোকিত হয়, তাঁহার চক্ষে, এ পৃথিবীর, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সমুদ্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই প্রেমের অনির্ব্বচনীয় লীলায় লীলাময়। প্রেম ফুলে হাসিতেছে, ফলে রস-মাধুর্য্যরূপ মধুমাখা স্বাদে পরিণত হইতেছে;—তুষার-রাশিতে শ্বেত-কান্তিতে বিকশিত হইয়া আনন্দ জন্মাইতেছে;—স্রোতে বহিয়া যাইতেছে; এবং সমুদ্রের তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, যেন উন্মাদময় ভাবাবেশে, উদাত্তগান্ধারে গীত গাইতেছে। ঊর্দ্ধে ঐ যে নক্ষত্রমালা, অনন্ত-বিস্তারিত নীলচন্দ্রাতপের চারুবিতানে নয়নমনোহর মূর্ত্তিতে বিলসিত হইয়া, নিরন্তর ঝিকিমিকি প্রভায় শোভা পাইতেছে, উহারাও প্রেমের কুসুমস্তবকরূপে প্রস্ফুটিত রহিয়া, মনুষ্যকে সেই মহামঙ্গল্য বিশ্বতত্ত্বের মর্ম্মোদ্ভেদে আলোকদান করিতেছে।

প্রেমের উল্লিখিতরূপ, বিশ্বব্যাপি মূর্ত্তি

সাধারণতঃ সকল শ্রেণির মনুষ্যকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু উহা যখন, জগৎ-প্রাণপ্রকৃতিপুরুষের চৈতন্যকণাস্বরূপ নব-নারীহৃদয়ে ঘনীভূত মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া, আশা, পিপাসা ও ভালবাসায় প্রতিবিম্বিত এবং দীর্ঘশ্বাস, দেহসন্তাপ ও নয়নজলের ভাষায় অভিব্যক্ত হয়, তখন সকলেই উহাকে দেখে ;—সকলেই উহাকে, অল্প বা অধিক পরিমাণে, সুশীতল চন্দনরসের ন্যায়, আপনার অঙ্গে মাখে ; এবং যাহারা কবি অথবা দার্শনিকের হৃদয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা উহা হইতেই প্রকৃতির গতি ও পরিণতি বিষয়ে কিছু না কিছু শিখে। আমরা আজি পাঠককে, এ স্থলে, একটি আশ্চর্য্য প্রেমের কাহিনী উপহার দিতে যাইতেছি। স্কটল্যাণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ কবি * এ পবিত্র কাহিনীর সাক্ষী। পাঠক এ কাহিনীটি পাঠ করিলে বুঝিতে পাইবেন যে, প্রেম যখন মনুষ্যহৃদয়ে পূর্ণশক্তিতে প্রস্ফুট হয়, তখন পৃথিবীর কোন শক্তি উহার দুর্দ্দম প্রভাব পরাভব করিতে পারে না, এবং যাহা মনুষ্যের চক্ষে আগে ঐহিক সুখের ছিটা ফোটা বলিয়াই অনুমিত হয়, পরলোকের অনন্ত বিস্তারও তাহার আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। তাদৃশ প্রেম আপনার সৌরভে আপনি সুরভি,—আপনার গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত ; এবং আপনার তেজঃপুঞ্জ পবিত্রতায় আপনি পবিত্র। উহা ইহলোক ও পরলোক উভয় লইয়া এক। উহার আরম্ভ মাত্রই আমরা চক্ষে দেখিতে পাই ; কিন্তু কোথায় উহার পরিসমাপ্ত হয়, তাহা স্বয়ং সেই রসস্বরূপ প্রেমময় ভিন্ন অন্যে বুঝিবে, এমন সম্ভাবনা নাই।

* কবির নাম (James Hogg) জেমস্ হগ। তাঁহার প্রসিদ্ধ আখ্যাতি Ettrick Shepherd অর্থাৎ এট্রিক নামক বনভূমির রাখালকবি। তাঁহার অসংখ্য কবিতাপুস্তক আছে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীরা রাখালকবি হগের কবিতায় বড় অনুরাগী। কবিবর হগ ডিউক অব্ বাক্লিউকের Duke of Buccleuch) প্রসাদাৎ স্বদেশীয় ভদ্রসমাজে সম্ভ্রান্ত পদবীলাভ করিয়াছিলেন। Frasir's Magazine] নামক বিখ্যাত সন্দর্ভপত্রের সম্পাদক, মহামতি হগের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া, এই কাহিনীটি জগতে প্রচার করেন।

আত্মিককাহিনী।

* এট্রিক্ (Ettrick) স্কট্লণ্ডের একটি ক্ষুদ্র আরণ্যপল্লী। এই পল্লী সেল্কার্কশায়রে অবস্থিত, এবং কালিডোনিয়ার প্রসিদ্ধ কাননভূমির সহিত সংযুক্ত। এট্রিকের অধিকাংশ লোকই কৃষক ও পশুজীবী রাখাল। কিন্তু তাহারা সকলেই কিছু কিছু লেখা পড়া জানে,—সকলেই ভদ্রলোকের মত জীবন যাপন করে।

মিষ্টার জেম্স্ হগ্ (Mr. James Hogg) এট্রিকে বাস করিতেন। তিনি এট্রিকের রাখালকবি নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।

হগ্ যখন, বন-বিহগের মত, প্রকৃতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া, তাহার রাখালি বেণুতে কাব্যের সুর ভাঁজাইতেন, তখন যে কেবল অর্দ্ধ শিক্ষিত রাখালেরাই সেই কানন-কবির বেণুরবে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া, ক্ষণকালের তরে, পশুচারণ ক্লেশ ভুলিয়া যাইত, এমন নহে; ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের অনেক বড় বড় ডিউক ও লর্ড এবং বহু কৃতবিদ্য বিজ্ঞ-ব্যক্তিও, তাঁহার দূর-শ্রুত বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া, বংশমর্য্যাদা, পদসম্ভ্রম ও জ্ঞান-গৌরব বিস্মৃত হইতেন; এবং তদীয় বন্যকুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। জেম্‌স্ হগ্ যেমন এট্রিকের রাখালকবি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন, তেমন এট্রিকের নগণ্য অরণ্যও আবার হগের নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত ছিল।

মিষ্টার ডেভিড্ হাণ্টার (Mr. David Hunter) হগের একজন গুণমুগ্ধ ও স্নেহ-গুণ-বদ্ধ সুহৃদ্। হগের কুটীর হইতে ডেভিডের বাসগ্রাম বেশী দূরে নহে। ক্লানকেইথ (Clunkeigh) এট্রিকের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র পল্লী। ডেভিডের পিতা ক্লানকেইথের এক জন বড় জোতদার ও ব্যবসায়ী মহাজন। ডেভিডের পিতা বর্ত্তমান; মাতা পরলোক-গতা। ঘরে দুটি অনূঢ়া সহোদরা আছে। দুইটিই তাহার বয়ঃকনিষ্ঠা। সর্ব্বকনিষ্ঠার নাম (Mary) মেরী। মধ্যমার নাম (Margaret) মার্‌গেরেট্।

ডেভিডের বয়স ত্রিশের বেশী নহে। আকার সুদীর্ঘ। অবয়ব স্থূল না হইয়াও,—সুগঠিত, পেশল ও দৃঢ় সংশ্লিষ্ট। বর্ণ স্বভাবতঃ শ্বেত কিন্তু, নিয়ত বন-ভূমিতে অবস্থান-হেতু, ঈষৎ ম্লান ও রক্তিমাভ। চক্ষু দুটি আয়ত ও দীর্ঘ। চক্ষের তারা নিবিড়কৃষ্ণ। দৃষ্টি কাতর ও ভাবব্যঞ্জক। যুবক প্রিয়দর্শন; চরিত্রগুণে অধিকতর প্রিয়।

ডেভিডের পরিচ্ছদ কিংবা বেশবিন্যাসে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। অনেক সময়ই সে, কোটের বুতাম ও গলার 'কলার' বা গল-বন্ধ আটকাইতে ভুলিয়া যাইত। রুমাল পকেট হইতে অর্দ্ধবিগলিত হইয়া ঝুলিয়া থাকিত, অথবা পথে পড়িয়া গিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইত। সে তাহা টের পাইত না। মাথার কোঁকড়ান চুলগুলি, ললাটের উপর পড়িয়া সর্ব্বদাই উলটপালট হইত; সে তাহার কোন খবর রাখিত না। কিন্তু তথাপি তাহার আকৃতিতে স্বভাবতঃই কি যেন একটু মাধুরী ছিল। এই বেশবিন্যাসের বিশৃঙ্খলতাও তাহার শরীরে বেস মানাইত; ইহাতেও যেন তাহাকে সুন্দর দেখাইত।

ডেভিডের প্রাণ সরল, অমায়িক ও প্রেমপূর্ণ। মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত। ডেভিড্ সঙ্গীতপ্রিয় ও অসামান্য শক্তিসম্পন্ন সুকণ্ঠ গায়ক সে, যখন কানন-পথে বিচরণসময়ে, উন্মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীতে তান ধরিত, তখন এট্রিকের সমস্ত বনকুঞ্জ কুজিত হইয়া উঠিত। বনের পরিরক্ষিত পশুগণও অর্দ্ধচর্ব্বিত শষ্প মুখে লইয়া, যেন আনমনে

সেই স্বরলক্ষ্যে তাকাইয়া থাকিত। তখন বোধ হইত, ইহা কখনও মর্ত্ত্যমানবের নশ্বর-কণ্ঠ নহে,—বুঝি বা কোন বনদেবতাই তাঁহার অমর-সঙ্গীতে স্বর যোজনা করিতেছেন! বলিতে কি, পল্লীর প্রেমিক প্রেমিকাও, তখন, ক্ষণকালের তরে, তাঁহাদিগের বিশ্রব্ধ প্রেমালাপ, বিস্মৃত হইয়া সেই স্বর-লহরী শুনিয়া লইতে অধীর হইত। ডেভিড্ বেহালা বাজাইতে ভালবাসিত; বেহালা বাজাইবার শক্তিও তাহার অসাধারণ ছিল। বেহালা, তাহার, হাতে, মধুরাক্ষরা বাঁশীর মত, মানুষের কানে মিষ্ট লাগিত।

পল্লীর প্রায় সমস্ত লোকেই ডেভিড্‌কে চিনিত। আর যে চিনিত, সেই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। কিন্তু তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও প্রগাঢ় প্রণয় ছিল ভাব-বিভোর হগের সঙ্গে। হগ্ তাহাকে বয়স্য, শিষ্য ও পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। সেও হগের কাছে তাহার মনের কথা কহিয়া অপার প্রীতি অনুভব করিত; এবং হগ্‌কে প্রকৃতই গুরু বা পিতার ন্যায় সম্মান করিয়া, সমস্ত বিষয়েই তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিত।

হগ্ এট্রিকের রাখালকবি। ডেভিড্ এট্রিকের রাখালপ্রেমিক। হগের কবিহৃদয়, ডেভিডের প্রেমিক প্রাণ। এ উভয়ের প্রণয়-সম্মিলনে, এক দিকে কবিহৃদয় যেমন উথলিয়া উঠিত, অন্যদিকে প্রেম-কোমল প্রাণ নবনীতের মত গলিয়া পড়িত। উভয়েই সুখী। উভয়েই আনন্দময়। রাখালকবি রাখালি গাথা রচনা করিতেন; রাখাল প্রেমিক সেই গাথা গান করিত; অথবা উহা তাহার বেহালায় বাদিত হইয়া শ্রোতার হৃদয় মন কাড়িয়া লইত। গ্রামের কৃষক ও রাখাল-গণ, হগের অঙ্গনে সমবেত হইয়া, প্রাণ ভরিয়া উহা শুনিত। বস্তুত এ দুটি প্রীতি-মধুর সরস হৃদয় যখন একত্র সম্মিলিত হইত, তখন এট্রিকের বিজন বনও, যেন ক্ষণ-কালের তরে, অভিনব উৎসাহে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

থরণহিল (Thornhill) ক্লান্‌কেইযের অনতিদূরস্থ গ্রাম। এখানে একটি বৃহৎ 'মেলা' বসিত। থরণহিলের মেলায় পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত গ্রামের স্ত্রীলোক ও পুরুষেরই সমাগম হইত। এক দিন থরণহিলের মেলায়, ডেভিড যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ একটি যুবতীর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। মেলার স্থলে, অনেকের সহিতই অনেকের দেখা সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু এ সাক্ষাৎকার সে শ্রেণীর নহে। চখের দেখায় প্রাণের পরিচয়! দৃষ্টির বিনিময়ে মনের বিনিময়! যুবতী চাবিচক্ষে ডিভিডের পানে চাহিতে পারিল না। চ'খ দুটি লজ্জার আকস্মিক আবেশে, অনিচ্ছায় আনত হইয়া, ভূমি নিরীক্ষণ করিল। যুবকের নয়ন-তারা পুলকে পলক হারাইয়া, কি যেন কি ভাবে, যুবতীর সুন্দর মুখ খানিতে ক্ষণ কাল, স্থির, নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

ডেভিড ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও এই যুবতীকে দেখে নাই, কিন্তু আজি হঠাৎ

দেখিতে পাইয়াই মনে মনে কহিল, 'আমার উধাও প্রাণ যাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, এই বুঝি সেই জন, যুবতীও ডেভিড্‌কে আর কখনও দেখিতে পায় নাই; সেও মনে ভাবিল,—'এ কি! যুবক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি মনে লয়, ইনি আমার চির-পরিচিত আপন জন।' না জানি, কি অনিবার্য্য আকর্ষণে, উভয়েই আত্মহারার মত পরস্পরের সন্নিহিত হইল। মুহূর্তেকে লজ্জা ও সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আবার চারি চ'ক্ষে সম্মিলন হইল। এবার উভয়েই মুখ ফুটিয়া কথা কহিল। দেখিয়া দেখিবার আশা মিটিল না। আলাপ করিয়া আলাপের সাধ পূর্ণ হইল না। উভয়েই ভাবিল,—মরি কি মধুর,—আহা কি সুন্দর! প্রথম সাক্ষাৎকারেই ডেভিড চিরজীবনের তরে ফিমির এবং ফিমিও চিরজীবনের তরে ডেভিডের হইয়া গেল।

ফিমির প্রকৃত নাম (Euphemia Hewitt) ইউফিমিয়া হিউইট্; প্রচলিত নাম ফিমি (Phome) ডেভিড্ তাহাকে ফিমি বলিয়া ডাকিতেই ভালবাসিত। আমরাও তাহাকে, এই প্রস্তাবে, ঐ আদরের নামেই ফিমি বলিয়া উল্লেখ করিব।

ফিমির পিতৃনিবাস থরণহিলে। ফিমির পিতা থরণহিলের একজন বড় সওদাগর বা মহাজন। ফিমি তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান,—স্নেহের পুতুল;—আদরের মেয়ে। ফিমির বয়স এক্ষণ একুশ বৎসর। ফিমি সুন্দরী ও স্ফুরন্ত যৌবনে উৎফুল্লা। বাঙ্গালীর মেয়েরা, এই বয়সে, অধিকাংশ স্থলেই বহু সন্তানের মাতা,—প্রৌঢ়া গৃহিণী। কিন্তু ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি দেশে সে কথা নহে। সে সকল দেশে, এই বয়সের মেয়েরা প্রায়শঃই অনূঢ়া কুমারী,—গৃহ-কর্ম্মে জননীর স্নেহানুবর্ত্তিনী সঙ্গিনী; এবং শরীরধর্ম্মে পূর্ণযুবতী হইলেও, মানসিক বিকাশে, কিঞ্চিন্মাত্রায় বালভাবাপন্না,—বালিকা।

ফিমির আকৃতি যেমন রমণীয়, প্রকৃতি তেমনই কিংবা ততোধিক কমনীয়। তাহার ঢল ঢল চ'খ দুটির সরল ও অমল দৃষ্টি, এবং দেববালিকার মত হাসি হাসি মুখখানির পবিত্র মাধুরীতে, ফিমিকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। ফিমি বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষিণী ও মুগ্ধস্বভাবা; কিন্তু মৃণালের ন্যায় কোমলা ও লতার ন্যায় কৃশাঙ্গী। ফিমির অতি উজ্জ্বলরূপ ছিল, কিন্তু সে রূপে স্বাস্থ্যের সুখ-স্ফূর্ত্তিদ্যোতক আভা ছিল না। বর্ণে রজতধবল শোভা ছিল, কিন্তু সে শোভায় স্বভাবের অরুণ ছটা ফুটিয়া পড়িত না। ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলে, স্বতঃই মনে হইত যে,—এ মৃদু মধুরকান্তি,—বনকুসুমের এই ক্ষীণ জ্যোৎস্না, বুঝি বা, দীর্ঘ দিন এই কঙ্করকঠোর পৃথিবীবাসের জন্য কল্পিত হয় নাই।

মেলাস্থলে উভয়ের আলাপ পরিচয় হইল। দুই চারিটি কথার পরেই, হৃদয়ের কপাট, না জানি কি মোহনমন্ত্রে, আপনি খুলিয়া গেল। যেন কতকালের পুরাতন সৌহার্দ্দ। দুজনে কত কথাই হইল,—দিবা

যে কি ভাবে হেলিয়া পড়িল, কেহই তাহা টের পাইল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইল।

ডেভিড্ কহিল,—"ফিমি, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। বনপথ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, চল এখন তোমাকে বাড়ী পহুঁচাইয়া দেই।"

ফিমির এখন লজ্জা নাই। ফিমি কহিল,—"আর একটু থাকি—আমার সঙ্গে লোকজন আছে, আমার যাইতে কোন কষ্ট হইবে না।" এই বলিয়া আবার দুজনে নানা কথা কহিতে লাগিল। তখন তাহারা উভয়েই মেলার বহির্ভাগে বনভূমির প্রান্তভাগে। কিছুক্ষণ পরে, কএকটি লোককে ঐ দিকে আসিতে দেখিয়া ফিমি কহিল,—আর থাকিতে পারিলাম না। ঐ যে আমার 'সঙ্গীয়' লোকেরা এই দিকেই আসিতেছে।"ডেভিড্ কহিল,—"এখন আসি তবে ফিমি?" ফিমি কহিল,—"আসিবে?—হাঁ—তাইত—আসিবে বই আর কি? ঐ যে অদূরে ছায়াতরুটি রহিয়াছে, দেখ ঐ স্থানটি কেমন সুন্দর, কেমন নির্জ্জন। তুমি সুযোগ পাইলেই ঐ স্থানে আসিও। তুমি যখন আসিবে, আমিও তখনই আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব। আবার কবে আসিবে ডেভিড্?"

ডেভিড্ কহিল,—"তোমার যদি কষ্ট না হয়, কালই আবার আসিব। কিন্তু পিতার দিকে চাহিয়া, পিতৃকুলের কথা চিন্তা করিয়া, পিতার বিপক্ষ-পুত্রকে তুমি মনে রাখিতে পারিবে ত ফিমি?—ফিমি—ফিমি"—প্রিয়তমে"—সহসা "প্রিয়তমে" সম্ভাষণ করিয়া ডেভিড্ আর কিছু বলিতে পারিল না, যেন একটু অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া রহিল;—রসনা বিনা অনুমতিতে প্রাণের কথাটা বলিয়া ফেলিল বলিয়া, যেন একটু সঙ্কুচিত হইল।

ফিমি ঈষৎ হাসিয়া ডেভিডের হাত দুখানি ধরিল, এবং কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—প্রিয়তম,—প্রাণাধিক, চুপ করিয়া রহিলে কেন—এ সঙ্কোচ কাকে? ফিমি যে তোমারই।" ডেভিড্ আর কিছু বলিল না। প্রীতিভরে ফিমির ললাটে চুম্বন করিয়া ঐ দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। আসিবার কালে কেবল এইমাত্র বলিল,—"ভগবান্ তোমাকে কুশলে রাখুন।" দুজনেই আর এক মানুষ হইয়া ঘরে ফিরিল। প্রথম সাক্ষাৎকারেই আলাপ, পরিচয়, প্রণয় এবং ভাবি পরিণয়ের জন্য পরস্পর মনে মনে বাগ্দান পর্য্যন্ত হইয়া রহিল।

ইতিহাস অনেক স্থলে কাব্যে পরিণত হয়; কাব্যও অনেক স্থলে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়া থাকে। রোমিয়ো ও জুলিয়ার প্রেমের কাহিনী সর্ব্বাংশেই কাব্য, না, কাব্যমিশ্রিত ইতিহাস, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ফিমি ও ডেভিডের প্রেমঘটিত প্রকৃত কাহিনীতে, নিয়তির অচিন্তনীয় খেলায়, সে পুরাতম কাব্যের আংশিক অনুবৃত্তি হইয়াছিল। উভয় পরিবারের মধ্যে কোন দিক্ দিয়া, কোন রূপে, কোন সংস্রব ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। শুধু ইহাই নহে,

—কতকগুলি বৈষয়িক ব্যাপারে, কিছু দিন হইতে, দুটি পরিবারে পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষের ভাবসঞ্চিত হইয়াছিল। এক বাটীর লোকের সহিত অন্য বাটীর লোকেরা বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিত না। অকস্মাৎ সাক্ষাৎকার হইলে, পরস্পর মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত। বস্তুতঃ, রোমিয়ো ও জুলিয়ার প্রণয়ের মত, ডেভিড্ ও ফিমির প্রণয় ও প্রাণের পরিচয় যেমন আকস্মিক ও প্রগাঢ়, মণ্টেগো ও কপুলেট পরিবারের মত, তাহাদিগের পিতৃকুলের মধ্যে পরস্পর বৈরীভাবও তেমনই মর্ম্মান্তিক ও ভয়াবহ। অথচ বিধাতার কি ইচ্ছা!—অদৃষ্টের কি গতি। ডেভিড্ ও ফিমির উন্মত্ত প্রেমানুরাগ পরস্পরের পিতৃকুল-বৈরিতার কথা ভাবিয়া দেখিবারও যেন সময় পাইল না। উহা, বন্যার প্লাবনবেগে উছলিয়া উঠিয়া, সে মুগ্ধপ্রাণ দুটিকে ভাসাইয়া লইয়া একই উচ্ছ্বাসে কোথায় যে চলিল, তাহা চিন্তা করিবার আর অবকাশ ঘটিল না।

ডেভিড্ ও ফিমি আপন আপন গৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের প্রেমাকৃষ্ট হৃদয় আর ঘরে ফিরিল না। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সঙ্কেত-তরুতলে দুজনের পুনর্ম্মিলন হইল। এই হইতে, সপ্তাহে একবার কি দুইবার, কোনও না কোন স্থানে, কোনও না কোনও সময়ে—কিন্তু প্রধানতঃ সেই প্রচ্ছায়-শীতল সঙ্কেত-পাদপের তলে,—উভয়ের সমাগম হইত। দিনের পর দিন যত যাইতে লাগিল, প্রণয়ের দুর্দ্দম প্রগাঢ়তাও ততই বাড়িয়া চলিল। ডেভিড্ এখন কদাচিৎ হগের কাছে যাইত, কদাচিৎ তাঁহার কথা ভাবিত। সে তাহার অত সাধের রাখালি-সঙ্গীতও ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন তাহার কণ্ঠ গাইত ফিমি, বেহালায়ও বাজিত ফিমি। বন-বিহগের কল-কাকলিতে সে ফিমির স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিত। প্রস্ফুট বন-কুসুমে ফিমির নয়ন-শোভা দেখিয়া আনমনে চাহিয়া থাকিত। চাঁদের জ্যোৎস্না, তাহার চক্ষে, ফিমির হাসিটুকু লইয়া ফুটিত। বন-বায়ুও যেন ফিমিরই সৌরভ বহিয়া, মৃদু দোলনে ও মধুর স্ফুরণে, তাহার ললাট-কুন্তল লইয়া খেলা করিত। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে ডেভিডের প্রাণে এখন ফিমির প্রেম ভিন্ন আর কোন কথা জাগিত না। প্রেমিকপ্রাণ ডেভিডের এইক্ষণ প্রকৃতই প্রেমোন্মাদ।

ফিমিও এখন আর পিতৃগৃহের সেই তরলা, সরলা, চিরস্ফূর্ত্তিমতী প্রফুল্ল বালিকা নহে। সে এখন সর্ব্বদাই একা থাকিতে চাহে;—একাকিনী বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে ভালবাসে; এবং কাহার যেন কি তপস্যায় ধ্যানস্তিমিতা বন-তাপসীর ন্যায় নির্জ্জনে উপবিষ্ট রহে। ফিমি পূর্ব্বে কদাচিৎ গৃহের বাহিরে যাইত। এখন তাহার মাঝে মাঝেই একবার গৃহের বাহির না হইলে চলে না। সে এখন প্রায় প্রতিদিনই কিছুক্ষণ, এট্রিকের বনভূমিতে বনবিহগীর মত ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং এইরূপ ভ্রমণ-সময়েই তাহার সেই স্বাভাবিক আনন্দস্ফূর্ত্তি আবার ক্ষণকা-

সের তরে ফিরিয়া আইসে। যে কারণে ডেভিড্ উন্মাদগ্রস্ত, সেই কারণেই ফিমি উন্মাদিনী। পিতা ভাবিতেন,—"স্নেহের পুতুল ফিমি আমার দিন দিন এমন হইতেছে কেন?"

ডেভিডের সহিত ফিমির সঙ্কেত-তরুতলে যে সাক্ষাৎকার হইত, তাহা ক্ষণস্থায়ি। কোন কোন দিন ডেভিড, ফিমির পিতৃ-নিবাসে, —প্রাঙ্গণের প্রান্তস্থিত নির্জ্জন পর্ণকুটীরে যাইয়াও ফিমিকে দেখিয়া আসিত। কিন্তু সে এক দিনের তরেও ফিমিকে তাহাদিগের আপন গৃহে লইয়া যাইতে সাহস পাইত না। পিতা কখনও এই প্রণয়ে প্রশ্রয় দিবেন না, উভয়ের মনেই এই আশঙ্কা ও ভয় ছিল। কিরূপে পিতার নিকট এই প্রণয়-রহস্য প্রকাশ করা যায়,—কিরূপে পিতার অনুমতি লইয়া দুজনে পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, গৃহে অবস্থান সময়ে, উভয়ে কেবল এই ভাবনায়ই আকুল থাকিত। ফিমির পরামর্শ লইবার ঠাঁই ছিল না। ডেভিড্, সময়ে সময়ে, হগের কাছে মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিয়া, কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ লইত। হগ্ তাহাকে আশ্বাস দিতেন, এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভরের ভাবে সময় প্রতীক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। ডেভিড্ ও ফিমির প্রণয় কিরূপ সূক্ষ্মতর উপাদান-পদার্থে গঠিত এবং সেই প্রণয় কতদূর প্রগাঢ় ও প্রাণ-নিহিত ছিল, হগ্ ভিন্ন আর কেহই তাহা জানিত না।

প্রণয়িযুগল যখন সঙ্কেত-কাননে একস্থ* হইত, তখন এই প্রণয়ের পরিণাম কি, সে চিন্তা মুহূর্ত্তের তরেও তাহাদের প্রাণে স্থান পাইত না। দুজনে তখন একে অন্যের সম্পর্কে একবারে তন্ময় হইয়া যাইত। ফিমির গায়ে সামান্য একটু শীত লাগিলে, ডেভিডের শরীর শিহরিয়া উঠিত; ডেভিডের গায়ে কাঁটার আচড় পড়িলে, ফিমি বেদনা অনুভব করিত। তাহারা বয়োধর্ম্মে যুবক যুবতী হইলেও, প্রাণের অভ্যন্তরে শিশুর মত সরল, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ ছিল। একজন আর একজনকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, তাই দুজনে নির্জ্জনে মিলিত হইয়া একে অন্যকে নয়ন ভরিয়া দেখিত।

শুধু ইহাই নহে; দুজনে, কল্পনার নিত্য নূতন প্রমোদনে নানারূপ প্রেমের খেলা খেলিত। ডেভিড্ কখনও ফিমিকে বালক-বেশে সজ্জিত করিয়া, হাতে হাতে ধরিয়া, দুটি ভাই বা দুটি বন্ধুর ন্যায়, নানা কথা কহিতে কহিতে, বনপথে বেড়াইত;—কখনও বা বনফুল ও বনপল্লবে ফিমিকে বনদেবী সাজাইয়া, সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া, ললিতকণ্ঠে তাহার বন্দনা গাইত। ফিমিও আবার প্রত্যুত্তরে, কখনও ডেভিডকে রাখাল-প্রেমিক, কখনও বা প্রেম-দেবতারূপে

* বঙ্গের নব্য লেখকদিগের মধ্যে অনেকে, যে অর্থে, 'একত্রিত' এই অপশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কালিদাসপ্রমুখ সংস্কৃত কবিরা, ঠিক্ সেই অর্থেই, 'একস্থ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

নমস্কার করিয়া, গোপাল ও মেষপালের সংবাদ লইত; কখনও ডেভিডের হাতে বেহালা তুলিয়া দিয়া ওস্তাজ জি বলিয়া গীত বাজাইতে অনুরোধ করিত। কোন সময়ে দুজনে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, গান গাইত। কখনও পরস্পর শিশুর মত আবদার করিত। কিন্তু তাহাদিগের এই প্রণয়-সম্মিলন আনন্দময় বাল্যক্রীড়ার ন্যায় সর্ব্বভাবে নির্দ্দোষ ও পবিত্র ছিল। ডেভিডের প্রাণের ভালবাসা ভক্তির উচ্চতর ভাবে এত বেশী মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল যে, পৃথিবীর পঙ্কিল ভোগ-লালসা উহার আশে পাশে আসিতেও যেন ভীত হইত।

উভয়েই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। উভয়েই বুঝিয়াছিল, ভগবান্ তাহাদের দুটি প্রাণ একই বস্তুতে গড়িয়াছেন। সুতরাং উহারা চিরদিন একই সূত্রে গাঁথা থাকিবে। এইরূপে, এট্রিকের নির্জ্জন ও নিবিড় বনে, ডেভিড্ ও ফিমির প্রেমের খেলা অনেক দিন চলিল। এ খেলা, তাহারা পিতা মাতার কোমল স্নেহের আশ্রয়ে থাকিয়াও খেলিতে পারিত। কিন্তু উভয়ের পিতৃপরিবারের মধ্যে বিষাক্ত বৈরীভাব ও বিদ্বেষই ইহার একমাত্র পরিপন্থী ও অন্তরায় ছিল। এই হেতুই তাহাদের অত লুকচুরি, —এই হেতুই নির্জ্জন অরণ্যে সঙ্কেত-তরুর প্রয়োজন।

শীতকাল। স্কটলণ্ডের শীত অতীব তীব্র ও দুঃসহ। ঘরের বাহিরে ত কথাই নাই, ঘরের ভিতরেও, রাত্রিকালে, বিনা অনলতাপে, কেহ আরামে অবস্থান করিতে পারে না। ডেভিড্ ও ফিমির মত প্রেমোন্মত্তও এক্ষণ অনাবৃত অরণ্যে সঙ্কেত-তরুতলে সম্মিলিত হইতে অসমর্থ। ডেভিড্ আজি, ফিমির পিতৃভবন-প্রাঙ্গণের প্রান্ত-কুটীরে, বহুক্ষণ ফিমির সহিত প্রণয় আলাপে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে। রাত্রি দুটা বাজিয়া গিয়াছে। ডেভিড্ তখন তাহাদের গৃহসন্নিহিত পথে। সে মুখে মৃদু মৃদু গান গাইতেছে, আর মনে মনে ফিমির কথা চিন্তা করিতেছে। ফিমি তাহাকে দেখিলে কত সুখী হয়, সামান্য একটু আদর ও আবদার করিলে, ফিমি কেমন আনন্দে গলিয়া পড়ে, এই সকল কথা বারংবার তাহার মনে জাগিতেছে। আর ভাবিতেছে, পিতা কবে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পাইবেন,—কবে ফিমিকে গৃহে লইয়া আসিতে অনুমতি করিবেন;—কবে সে স্বতন্ত্র গৃহে স্বাধীনভাবে ফিমিকে প্রাণ-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়া সুখে বাস করিতে পাইবে। ইত্যাদি নানা কল্পনা জল্পনা করিতে করিতে সে তাহার পিতৃনিবাসের অতি নিকটে আসিয়া পহুঁচিয়াছে। প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ হাঁটিয়া ডেভিড্ এখন ঈষৎ ক্লান্ত।

হঠাৎ ডেভিডের বোধ হইল,—সম্মুখে—কিঞ্চিৎ দূরে একটি লোক যেন তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। হাতে আলো ছিল। আলো ধরিয়া দেখিল, সে লোক আর কেহ নহে,—তাহারই প্রাণের পুতুল ফিমি। ফিমি যখন ডেভিডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের

কামনায় ঘরের বাহিরে আসিত, তখন যে ভাবে আসা তাহার অভ্যস্ত ছিল, ঠিক সেই ভাবে সে, গাউনের অঞ্চলে সুচারু চূর্ণ কুন্তলরাশি আবরিয়া লইয়া, ধীর-পাদ-বিক্ষেপে আসিতেছে। দেখিয়া ডেভিড্ যার-পর-নাই বিস্মিত ও চমকিত হইল। কহিল,—"এ কি এ—ফিমি—এই শীতে—এই গভীর নিশীথে—এই ভাবে—তুমি—এত দূরের পথ আসিয়াছ!—এই না—আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম—তবে আবার এখনই, এই অন্ধকারে—এত দূরের পথ, একাকিনী হাঁটিয়া আসিলে কেন?—এ কি—ফিমি!—আমায় ত পাগলই করিয়াছ, আপনিও কি প্রকৃত পাগল হইবে?"

ফিমি কহিল,—"আমি একটি প্রয়োজনীয় কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাই এই কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। ডেভিড্ বলিল,—"এমন কথা কি হইতে পারে যে, তোমার অমন ক্ষীণ শরীর ও দুর্ব্বল স্বাস্থ্যকে এই কন্‌কনে শীতে, বাহিরের বাতাসে ডালি দিতে হয়! কথাটা কি?" ফিমি বলিল,—"দেখ, আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎকার ও আলাপ-পরিচয়ের দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত, যখন যখন আমাদিগের সুখ-সমাগম হইয়াছে, তখনই তুমি চলিয়া আসিবার সময়, ঈশ্বরের নাম করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছ। তোমার মুখে ঐ নামটি আমি বড় ভাল শুনি, আর ঐ নাম করিবার সময়, তোমার সুন্দর চোখ দুটি যে ভাবে জলপূর্ণ হইয়া আইসে, আমি তাহা দেখিতে বড় ভালবাসি। আমি ঠিক অমন টি পারি না; কিন্তু মনে মনে তোমারই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করি। আজ তুমি তাহা কর নাই। আজ বিদায়ের সময়, আদর করিয়া তুমি আমাকে চুমা দিয়াছ; কিন্তু, "ভগবান্ তোমাকে স্নেহের কোলে আবরিয়া রাখুন ফিমি", এই চির-অভ্যস্ত মধুর কথাটি আমাকে শুনাও নাই। ইহ জীবনে আর যখন আমাদিগের দেখা শুনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তখন আমি তোমার ঐ আশীর্ব্বাদে আজ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না। তাই, ঐ আশীর্ব্বাদ-বাণী একবার কান ভরিয়া শুনিবার জন্য, এত দূরের পথ চলিয়া আসিয়াছি।"

ডেভিড্ কহিল,—"ইহ জীবনে আর দেখা শুনা হইবার সম্ভাবনা নাই" ইহার অর্থ কি ফিমি?" ফিমি কহিল,—"পুনঃ সাক্ষাতের যে দিন অবধারণ করিয়াছ, তাহার পূর্ব্বেই যখন আমার মৃত্যু।"—ডেভিড্ বাধা দিয়া বলিল,—"এই নিশীথ-সময়ে, এতদূর পর্য্যটন করিয়া আসিয়া, আজ তুমি আমাকে পাগলের মত, এ সকল কি শুনাইতেছ? ইহার এক বর্ণও যে আমি বুঝিতে পারিতেছি না, ফিমি। আগামী মাসের ৭ই তারিখ বনভূমির পূর্ব্বতম প্রান্তস্থিত তরুতলে আমাদিগের সাক্ষাৎকার হওয়ার কথা হইয়াছে। সে কথা কি তোমার মনে নাই? এক দণ্ডেই সব বিস্মৃত হইলে! সে প্রতিশ্রুতি কি তুমি রাখিবে না ফিমি?"—

ফিমি কহিল,—"রাখিব।—বেশ কথা, আমি সেই দিন, সেই স্থানে, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" ডেভিড্ কহিল,—"তবে আর কি? জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, ফিমি, প্রিয়তমে, আমি তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় ও মনের সহিত এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" এই বলিয়া ডেভিড্ ফিমির হাতখানি ধরিবার নিমিত্ত হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু সে হাত কোথায়? আলো ধরিয়া চাহিল,—ফিমি আশে পাশেও নাই। ডেভিড্ ফিমিকে দেখিতে না পাইয়া,—উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল—"ফিমি—ফিমি—প্রাণাধিকে,—প্রিয়তমে,—এমন করিয়া তুমি কোথায় লুকাইলে ফিমি?" শুধু ডাকিল না। ডাকিতে ডাকিতে যেদিক হইতে ফিমি আসিয়াছিল, সেইদিক্ পানে প্রাণপণে দৌড়াইল। কিন্তু তাহার সমস্ত শ্রম বৃথা হইল। ফিমি কোন্ পথে কোন্ দিকে চলিয়া গেল, সে কিছুতেই আর তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

ডেভিড্ খানিককাল বিস্মিতভাবে দণ্ডায়মান হইল। তাহার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল,—"এ কি দেখিলাম?—একি তবে আমার ফিমি নয়?—দৃষ্টিভ্রম?—না—তাহা কখনও হইতে পারে না। সেই সুন্দর মূর্ত্তি তেমনই হাসিমুখে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল! চক্ষে তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম,—কানে তাহার কথা,—সেই মধুর কণ্ঠধ্বনি স্পষ্ট শুনিলাম। এই সমস্তই কি ভ্রম—না—ইহা অসম্ভব। কিন্তু তাহার আজিকার এই বিচিত্র ভাবের কোন অর্থই ত বুঝিতে পাইতেছি না। সে কেমন করিয়া এত দূরের পথ, বিদ্যুতের মত, এত দ্রুত আসিল,—কেমন করিয়া আমাকে পিছে ফেলাইয়া আগে সরিয়া পড়িল, ইহা বস্তুতঃই বড় বিচিত্র ও বিস্ময়কর। কিন্তু এ যে দৃষ্টিভ্রম নয়,—প্রকৃতই ফিমি, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

এইরূপ চিন্তাক্লিষ্টমনে ডেভিড্ গৃহে প্রবেশ করিল। সে আর কাহাকেও কিছু বলিল না, ছোট বোন্‌টিকে ডাকিয়া তুলিল। মেরী তাহাকে এক গ্লাস পানীয় জল আনিয়া দিল। ডেভিড্ জল পান করিয়া শয্যায় শুইতে গেল। ডেভিড্ যে দুই একটি কথা কহিল, মেরী তাহার অর্থ বুঝিল না। একবার মনে করিল, দাদা বুঝি, কোথাও মদ্যপান করিয়া আসিয়াছে, তাই এই প্রলাপ উক্তি করিতেছে। আবার ভাবিল, না—দাদার অকস্মাৎ কোন পীড়া হইয়াছে। এই ভাবনায় বালিকা ঘুমাইল না। দাদার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। ডেভিড্ শুইল বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কোঁকাইয়া, এবং বারংবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া, অনিদ্রায় রাত্রি প্রভাত করিল। পর দিনও তাহার শরীর সুস্থ হইল না। দিন কএক সে, রোগীর মত, গৃহে আবদ্ধ রহিয়া, চিন্তাযুক্ত মনে ও বিষণ্ণবদনে সময় অতি বাহিত করিল। কিছুদিন পরে শরীর সুস্থ হইলে, ডেভিড্ পুনরায়

নিয়মিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। পিতার আদেশক্রমে, বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। মাসের ৭ই তারিখ সঙ্কেত-তরু-তলে, ফিমির সহিত পুনর্ম্মিলনের দিন। ডেভিড্ আকুলপ্রাণে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এক, দুই করিয়া, মাসের সেই সপ্তম দিন,—সেই শুভমুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ আবার ফিমিকে দেখিতে পাইবে, ফিমিকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া, সেদিন কেন সে অমন অদ্ভুত আচরণ করিয়াছিল, তাহার আপন মুখে তাহা শুনিয়া লইবে; এবং তাহার ঐরূপ ব্যবহার ও ঐসকল উক্তিতে সে কি অসহ্য কষ্ট পাইয়াছে, তাহাও সমস্ত ফিমিকে খুলিয়া বলিবে। ডেভিড্, বড়ই উৎসুকচিত্তে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সঙ্কেত-তরুতলে যাইয়া উপস্থিত হইল; এবং পাষাণ-ফলকে উপবিষ্ট হইয়া, তৃষিত-নয়নে, ফিমির পথপানে চাহিয়া রহিল। তাহাকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। মিনিট দেড়েক পরেই, ফিমি তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত প্রণালীতে, গাউনের অঞ্চল মাথায় দিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া, ডেভিডের অদূরে দাঁড়াইল। ফিমিকে দেখিয়া ডেভিড্, যেন মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চারবৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; এবং আগ্রহের সহিত কহিতে লাগিল,—"ফিমি অত দূরে কেন, আমার কাছে আইস। তুমি যে তোমার কথা রাখিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। তুমি, কবে না এমনই করিয়া তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছ? আইস, আমার কাছে আইস ফিমি।"

ফিমি কহিল,—"এই দেখ, আমি যেমন বলিয়াছিলাম, তেমন আসিয়াছি। আমি কখনও তোমার সঙ্গে আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিব না। কিন্তু আজ আমি বেশী ক্ষণ তোমার এখানে থাকিতে পারিতেছি না।" ডেভিড্ কহিল,—"যা হউক, যে সময়টুকু তুমি থাকিতে পার, আইস, আমার কাছে আসিয়া একটু বইস। এই দেখ, প্রাণাধিকে, তোমার বসিবার আসনস্বরূপ কোটটি আমার পাতিয়া রাখিয়াছি। এই যে সেই গাত্রাবরণ বস্ত্র (plaid), আইস, ক্ষণকাল তোমাকে এই বস্ত্রাবরণে ঘেরিয়া রাখি। পথে শীতে বড় কষ্ট পাইয়া আসিয়াছ। এই বস্ত্রাবরণে শরীরটাকে একটু গরম করিয়া লও। দুমিনিটকাল আমার কাছে থাক। সেদিন শেষ রাত্রিতে তোমার সঙ্গে সেই শেষ দেখার পর অবধি, আমি মনে মনে তোমার জন্য কত ভয় করিয়াছি,—কত উদ্বেগ ও কত দুর্ভাবনায় কষ্ট পাইয়াছি, তাহা বস্তুতঃই বলিয়া বুঝাইতে পারি না, ফিমি। তাই বলি, আইস, তোমার গায়ে একটু হাত বুলাই,—তোমাকে ভাল করিয়া দেখি। আমি মরিয়াছিলাম, ফিমি; আইস, তোমার স্নেহমাখা করস্পর্শে পুনর্জ্জীবিত হই।"

ফিমি, করযোড়ে, কাকুতি করিয়া কহিল,—"ডেভিড্ প্রাণাধিক, আমায় আজ ক্ষমা কর। আজ আমি তোমার কাছে আসিতে কিংবা তোমার ঐ গাত্রাবরণের নীচে

বসিতে কোন প্রকারেই পারিতেছি না। কেন পারিতেছি না, তুমি সত্বরেই তাহা জানিতে পাইবে। আজ আমি এইমাত্র বলিতে আসিয়াছি যে, আমি যে পর্য্যন্ত না তোমাকে সংবাদ দেই, সে পর্য্যন্ত তুমি আমার অনুসন্ধানে,—আমার সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে, এই সঙ্কেতকাননে আসিও না। আমি যখন বলিয়া পাঠাই, অথবা নিজে আসিয়া বলি;—সম্ভবতঃ নিজেই আসিয়া বলিব,—তখন তুমি অবাধে আসিতে পারিবে।"

ডেভিড্ ফিমির কোন কথারই কিঞ্চিন্মাত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, একটুকু ক্ষুণ্ণমনে কহিল;—"তুমি আমার কাছে আজ কিছুতেই আসিতে পার না,—যে পর্য্যন্ত তুমি নিজে আসিয়া না বলিবে, সে পর্য্যন্ত আমাকে তোমার অনুসন্ধানে আসিতে নিষেধ করিতেছ, এবং তুমি স্বয়ং আসিয়া যখন আমাকে বলিবে, তখন আমি অবাধে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব,—এ সকল কথার অর্থ কি? আমি আজ তোমার কোন কথারই মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারি না, ফিমি। তবে কি তোমার পিতা সমস্ত টের পাইয়াছেন? এবং আমাদিগের এই প্রণয়-সংবাদে, ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। এ কি?"

এই বলিয়া ডেভিড্ ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিল, এবং পুনরায় কি বলিবার অভিপ্রায়ে মুখ তুলিয়া ফিমির দিকে চাহিল। চাহিয়া দেখে, ফিমি দ্রুতপদে সরিয়া যাইতেছে। ডেভিড্ অমনি ত্রস্তব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আধো অস্ফুট স্বরে, "ফিমি ফিমি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ফিমি অতিক্রত চলিয়া গেল। ডেভিড্ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া চলিল। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিল না; দেখিল, ফিমি অবশেষে নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মযাজকের বাটীর, থিড়কী দ্বার দিয়া ধর্ম্মযাজকের গৃহে প্রবেশ করিল। ফিমিকে এই নিশীথ-সময়ে, এমন ভাবে, যাজকের বাড়ীতে যাইতে দেখিয়া ডেভিড্ অন্তরে ভীত, কম্পিত ও যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

প্রেমোন্মাদের বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে এক লক্ষণ ঈর্ষ্যা। প্রেম যেখানে রূপ-লালসায় প্রস্ফুরিত না রহে, ঈর্ষ্যা প্রায়শঃ সেখানে ঠাঁই পায় না। কিন্তু, যাহারা প্রথমতঃ রূপ দেখিয়া পাগল হয়, ঈর্ষ্যায়ও তাহারা অনেক সময়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ডেভিডের মন, মুহূর্ত্তের তরেও কোন দিন তাদৃক্ নিকৃষ্ট ঈর্ষ্যার কলুষিত হয় নাই। কিন্তু, আজি উহাতে ঈর্ষ্যার আগুন, সহসা অতি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। ফিমি শেষ দুই দিনের সাক্ষাৎকারে, দেখা দিয়াও যে তাহার কাছে আইসে নাই, ঈর্ষ্যাদগ্ধ চিত্তে তাহার নূতন নূতন অর্থ প্রকাশ পাইল।

তবে কি বন-বালা ফিমি বিশ্বাসঘাতিনী? ইহা অসম্ভব। অমন দেব-দুর্ল্লভ মধুরাকৃতি কখনও মনুষ্যচরিত্রের দোষ-স্পর্শে কলুষিত

হইতে পারে না। ডেভিড্ সিদ্ধান্ত করিল, দুষ্টপ্রকৃতি যাজক, সম্ভবতঃ মুগ্ধস্বভাবা ফিমিকে বিপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, ধর্ম্মের ভাণে কোনরূপ কৌশল বিস্তার করিয়াছে; এবং ঐ দুর্ব্বৃত্তের উপদেশ অনুসারেই তাহার ফিমি শেষ দেখায় তাহার সঙ্গে ঐরূপ দূরত্ববোধক ব্যবহার করিতেছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া, ডেভিড্ ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল; এবং দ্রুতগতি ধর্ম্মযাজকের গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, পাকশালায় দুটি পরিচারিকা কি কার্য্যে নিরত রহিয়াছে। সে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিল;—"ফিমি কোথায়, তোমরা বলিতে পার কি?

ধর্ম্মযাজকের চরিত্র সম্বন্ধে ডেভিডের হঠাৎ এইরূপ একটা কুৎসিত সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল। ঐ স্থানের ধর্ম্মযাজকটি বেশ শিষ্ট, শান্ত ও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন; কিন্তু বয়সে যুবক ও একটু বিলাসী। কতিপয় বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতী উপলক্ষে, তাঁহার নামে পল্লীতে একটা নিন্দাজনক কুৎসা ও জনরব প্রচারিত হইয়াছিল। ভাল লোকেরা এই জনরবে বিশ্বাস করিতেন না। সম্ভবতঃ কথাটা সম্পূর্ণ অলীক। কিন্তু জনরবে যাজকের প্রভূত অনিষ্ট হইয়াছিল। কোন স্ত্রীলোকই তাঁহার গির্জ্জায় আসিতেন না। পুরুষদিগের মধ্যেও অনেকেই সে পথে পা ফেলিতে ভালবাসিতেন না। আজ ডেভিডও, ঐ জনরবের কথা স্মরণ করিয়াই, ফিমির ব্যাপারে যাজকের উপর কালসর্পবৎ ক্রুদ্ধ হইল। ডেভিড, পরিচারিকা দুটিকে নিরুত্তর দেখিয়া, একটু ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"বল্ ফিমি কোথায়?" দুটি পরিচারিকাই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"কোন্ ফিমি মহাশয়?"

রাখাল-প্রেমিকের সেই মধুর প্রাণ ও মিষ্ট প্রকৃতি এখন কোথায়? ডেভিড আজি আহত ভুজঙ্গবৎ ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত। সে এবার গর্জ্জিয়া উঠিল—"চিনিতে পারিতেছিস্ না—তা পারবি কেন? "ফিমি হিউইট্।" দুজনেই বলিল,—'ফিমি হিউইট!' ডেভিড্ কহিল,—হাঁ—তোদের ঐ ভাণ ও চাতুরি আমার কাছে খাটিতেছে না। আমি সব জানিয়াছি, সমস্ত বুঝিয়াছি।—বল্—ভাল চাহিস্ ত এখনই বল্ ফিমি কোথায়?—আর নহিলে, এই মুহূর্ত্তে তোদের কর্ত্তাকে এখানে ডাকিয়া নিয়া আয়, সে ই আসিয়া আমার কথার উত্তর করুক।'

পরিচারিকাদ্বয়ের মধ্যে—যাহার নাম (Sarah Robson) সে অমনি তাড়াতাড়ি যাজকের কাছে যাইয়া বলিল,—'মহাশয়, ক্লান্কেইথের প্রসিদ্ধ গায়ক ডেভিড হাণ্টার রান্নাঘরের নিকটে আসিয়া বিষম গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তিনি কেবলই—'ফিমি হিউইট্ কোথায়—শীঘ্র বল্'—এই বলিয়া পাগলের মত চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস, আপনি এই বাটীর ভিতর কোথাও ফিমিকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

যাজকের নাম মিষ্টার (Mr. Novison) নেভিসন্ অমনই রান্না ঘরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ডেভিডের নিকটে আসিয়া বিনয়মধুর ও ভদ্রোচিত স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি ভাল আছেন? —আপনার পিতা ও ভগিনীদ্বয় কুশলে আছেন ত?'

ডেভিড্ কর্কশ কণ্ঠে উত্তর করিল,—ভাল?—ভাল বই কি?—দেখিতেছেন না আমি পীড়িত নহি। ভালই ত ছিলাম। আপনিই আমাকে ভাল থাকিতে দিতেছেন না। এ জীবনে, কোন বিষয়ে কাহারও বিরুদ্ধে, কখনও আমার কোনরূপ অভিযোগ করিবার কারণ ঘটে নাই। কিন্তু আজ আপনার বিরুদ্ধে আমার অতি গুরুতর অভিযোগ। আমি আপনার এই সকল মনোরোচক ও শ্রুতিমোদক মধুর কথায় ভুলিয়া যাইব, আপনি কখনই এরূপ মনে করিবেন না। প্রাণ হইতেও আমি যাহাকে বেসী ভালবাসি,আপনি আমার সেই প্রিয়তমাকে, কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাই বলুন। আমি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া এইস্থানে আসিয়াছি। এই মিনিট দুই হইল, সে আপনার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। আপনি এখনই যদি তাহাকে আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে বিষম বিভ্রাট ঘটিবে;—আমি আপনার ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিব।—বলুন, সে কোথায়?"

নেভিসন কহিলেন,—"আপনার প্রিয়তমা!—আমার গৃহে!—কে, সে মিষ্টার ডেভিড্?—এই যে এখানে আমার দুটি পরিচারিকা রহিয়াছে, সে এদের কেহ নয় ত?—আমি যতদূর জানি, মিষ্টার ডেভিড্ এরা ভিন্ন আমার বাটীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক নাই।"

ডেভিড্ আরক্ত নয়নে গর্জ্জিয়া উঠিল, —"এরা নয়—আমি ফিমি হিউইট্‌কে চাই।—সে ফিমি আমারই। সে আমারই বাগ্‌দেত্তা পত্নী। ফিমি এই মুহূর্ত্তে খিড়কীর দ্বার দিয়া আপনার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে।—আর কেহকে নয়, আমি সেই ফিমিকেই চাহি।"

ইহা, শুনিয়া যাজক শিহরিয়া উঠিলেন। যাজক ও পরিচারিকা দুটি, একসঙ্গে, একই ভাবের বিস্ময়কম্পিতকণ্ঠে, "ফিমি হিউইট," এই নামটি দুই তিন বার উচ্চারণ করিলেন।

ধর্ম্মযাজক ধীর-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"মহাশয়, আমার বোধ হয়, আপনার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে—আপনি বস্তুতই প্রলাপ উক্তি করিতেছেন। থরণহিলের সওদাগরতনয়া ফিমি হিউইট্ ভিন্ন—এ অঞ্চলে ফিমি নামে অন্য কোন স্ত্রীলোক আছেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু সে ফিমির মৃত্যু হইয়াছে। গত পরশ্ব দিবস আমার বাসগৃহের পশ্চাদ্দিকে, তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে।"

হঠাৎ যাজকের মুখে এই ভয়াবহ ও মর্ম্মঘাতি সংবাদ শ্রবণে ডেভিডের প্রাণ কাঁপিয়া

উঠিল। কিন্তু ডেভিড্ প্রত্যক্ষ দৃষ্টবিষয়ের বিরুদ্ধে, এরূপ কথায় সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। যাজকের এই উক্তিতে সে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, ক্রোধ ও ঘৃণা-ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া, আধো বিলাপের স্বরে কহিল,—"মিথ্যা কথা,—প্রতারণা।—আপনি ভাবিয়াছেন, এইরূপ চাতুরীর কৌশলে, আমাকে এখান হইতে অপসারিত করিবেন। কিন্তু খাটি জানিবেন, তাহা অসম্ভব। আপনি প্রকৃত কথা বলুন,—এমন গুরুতর বিষয়ে চাতুরীর বা বিদ্রূপ সঙ্গত নহে। আপনি প্রকৃত কথা বলুন।" বলিতে বলিতে ডেভিডের চক্ষে জল আসিল, কণ্ঠ কম্পিত হইল। ডেভিড্ একটু কাতরভাবে কহিল —"মহাশয়, ঊর্দ্ধে ঐ ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আর এই হতভাগ্যের ব্যথিত ও ক্লিষ্ট প্রাণটার দিকে চাহিয়া, একবার বলুন। করযোড়ে, কাকুতি করিয়া বলিতেছি,—মহাশয় সত্য কথা বলুন।"

নেভিসন্ ডেভিডের আকৃতি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, প্রকৃত কারণেই হউক, অথবা ভ্রান্ত বিশ্বাসেই হউক, সে বস্তুতঃই প্রাণে বড় আঘাত পাইয়া আসিয়াছে। অতএব প্রথম হইতেই তিনি, তাহার অসঙ্গত কটুকথা ও ধৃষ্টব্যবহার যাজক-সমুচিত ধীরতার সহিত সহিয়া লইয়াছিলেন। এইক্ষণ তাহার চক্ষে জল ও উন্মাদব্যঞ্জক আকুলতা দেখিয়া, তিনি প্রকৃতই চিত্তে একটু ব্যথিত ও স্পৃষ্ট হইলেন। সুতরাং, অধিকতর মিষ্ট ও সহানুভূতির কণ্ঠে কহিলেন,—"না—প্রতারণা নয়, ডেভিড্! ফিমি বস্তুতঃই ইহলোকে নাই। আমি তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম। আমি স্বয়ং তাহাকে সমাধিস্থ করিয়াছি। শবাধান বা কাফনের উপরে, স্বর্ণাক্ষরে এই কএকটি কথা খোদিত ছিল,—"ইউফিমিয়া হিউইট্, বয়স বাইশ বৎসর।" একবার নয়, দুই তিনবার আমি ঐ লেখা পাঠ করিয়াছি।

যাজকের মুখের ভাব নিরীক্ষণে, এবং তাঁহার তথাবিধ দৃঢ় ও নিশ্চিত উক্তি শ্রবণে, ডেভিডের মনে আর সন্দেহ রহিল না। নিশীথ-সময়ে, বন-পথে ফিমির সেই আকস্মিক দর্শন দান, এবং সেই বিস্ময়াবহ বিচিত্র প্রণালীতে তৎক্ষণাৎই আবার তিরোধান ও তাহার সেদিনকার সেই সকল কথা, একসঙ্গে ডেভিডের মনে জাগিল। ডেভিড্ বুঝিল, যাজকের কথা সম্পূর্ণ সত্য। ডেভিড্ আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিল। হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চ'খের দৃষ্টি এলো, মেলো ও বিঘূর্ণিত হইল। কি যেন অব্যক্ত কাতর উক্তি করিতে করিতে, ডেভিড্ মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। যাজক তাহাকে ধরিলেন, এবং পরিচারিকা দ্বয়ের সাহায্যে, তাহাকে রান্নাঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া, শয্যায় শোয়াইয়া রাখিলেন। ডেভিডের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য যাজক বহু যত্ন করিলেন। দুই ঘণ্টা পরে ডেভিডের অসাড় দেহে পুনরায় চেতনা ফিরিয়া আসিল।

পর দিন প্রভাতে ডেভিড্ আরও একটু প্রকৃতিস্থ হইল;—ফিমি কোন্ এবং, কি পীড়ায়, রাত্রি কতটার সময়, কেমন করিয়া, অকস্মাৎ পরলোক-গত হইয়াছে, সমস্তই সে মনোযোগের সহিত শুনিল। তার পর, ফিমির সমাধিস্থ শিলাফলকের লেখা পড়িয়া, পৃথিবীর সকল আশায় নয়নজলের অঞ্জলি দিল। ডেভিড্ সবিশেষ শুনিয়া এই সার বুঝিল যে, সে যেদিন রাত্রি ছটা পর্য্যন্ত ফিমির গৃহে অবস্থান করিয়া চলিয়া আইসে, সেই দিন,—সেই রাত্রিতেই—মুহূর্ত্ত পরে, হঠাৎ ফিমির মৃত্যু হইয়াছে; এবং পর দিন প্রাতে, ফিমির পিতা শয়নগৃহ হইতে প্রাণাধিকা তনয়ার শব বাহির করিয়া আনিয়াছেন। মৃত্যুর কারণ সন্ন্যাস-রোগ, অথবা হৃদ্‌যন্ত্রের আকস্মিক গতিরোধ। ডেভিড্ এইক্ষণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সে চলিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই নিষ্ঠুর মৃত্যু তাহার ফিমিকে গ্রাস করিয়াছিল; এবং সে তাহার পিতৃনিবাসের সান্নিধ্যে আসিয়া পহুঁছিলে, ফিমিই পথ আগুলিয়া হঠাৎ তাহাকে দেখা দিয়াছিল। সে তাহাকে চক্ষে দেখিয়াছিল, তাহার সহিত কথাও কহিয়াছিল; কিন্তু যাহা দেখিয়াছিল, তাহা ফিমির পার্থিব তনু নহে, ছায়ামূর্ত্তি মাত্র। সে এত দিনে বুঝিতে পারিল যে, ফিমি ছায়ামূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল বলিয়াই, তাহাকে সে ধরিতে পারে নাই। ঐ দিনের পরে আবার যে সঙ্কেত-তরুতলে সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহাতেও ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াই পার্থিবজ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়াছে।

ডেভিড্ চেতনা লাভ করিল বটে; কিন্তু তাহার মানসিক যন্ত্রণা, চৈতন্যসঞ্চারে, দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাঁহার উত্থানশক্তি জন্মিল না। সে তিন সপ্তাহকাল যাজকের পাকশালায় শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। যাজক যথাশক্তি তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই এই অন্তর্দগ্ধ, অসহ্য শোক-সন্তপ্ত, আত্মহারা রোগীর সংশয়াপন্ন অবস্থার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ডেভিড্ ধর্ম্মযাজক মহাশয়কে বিশেষ কাকুতি মিনতি করিয়া কহিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার পিতা ও ভগিনী ছুটির নিকট ফিমি ঘটিত কাহিনীর কোনরূপ উল্লেখ না করেন। যাজক ক্লিষ্ট যুবকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

তিন সপ্তাহ পরে ডেভিডের পিতা বিশেষ সাবধানতার সহিত তাহাকে বাটীতে লইয়া গেলেন। বাটীতে নীত হইলেও তাহার শরীরে স্বাস্থ্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। সে কখনও শয্যায় শয়ান থাকিত, কখনও কখনও উঠিয়া বসিত। যখন একটু প্রকৃতিস্থ থাকিত, তখন দুচক্ষের জল ধারায় পড়িয়া তাহার বক্ষ ভাসাইয়া দিত। সে ঐরূপ সময়ে আপনা আপনি বলিত—"আহা আগে যদি আমি ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে, তাহাকে ছাড়িয়া আসিতাম না। তাহার মৃত্যুশয্যায় বসিয়া তাহাকে জীবনের শেষ দেখা দেখিয়া লইতাম। তাহার অন্তিম আশীর্ব্বাদ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম,—তাহার শেষ নিশ্বাসটুকু

আমার অধরে মিশাইয়া রাখিতাম। যদি এ সকল করিতে পারিতাম,—যদি তাহাকে অশ্রুজলে স্নান করাইয়া সসম্মানে ও সগৌরবে সমাধিস্থ করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে, বোধ হয়, এক্ষণকার এই অসহ্য দুঃখেও একটু শান্তি পাইতাম। প্রাণটা এমনই করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত না। হা প্রিয়ে!—হা প্রাণাধিকে! তুমি এই ভাবে আমাকে ফেলিয়া গেলে!—ঈশ্বরের কৃপায় আমি যদি মরিতে পারিতাম—হায়, আমি যদি মরিতে পারিতাম!"

এইরূপ করুণাপূর্ণ বিলাপ, মাঝে মাঝেই, ডেভিডের হৃৎপঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া, বাহিরে ফুটিত; এবং যে তাহার এ সকল প্রাণস্পর্শি কথা ও কাতর উক্তি শুনিতে পাইত, সেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। কিন্তু কেহই বুঝিতে পারিত না, ডেভিড্ শূন্য আকাশকে সম্ভাষণ করিয়া কাহার জন্য এইরূপ বিলাপ ও এই ভাবে ধারায় অশ্রুপাত করে।

এক মাসের বেশী হইয়াছে, হগ্ ডেভিডকে দেখেন নাই। কোন লোকের মুখেও তাহার কোন সংবাদ শুনেন নাই। ফেব্রুয়ারি শেষ হইয়া আসিল। এই সময় প্রতিবৎসরই ডেভিড, হগের কুটীরে আসিয়া, তাহার সহিত বরফের উপর নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিত। এবার ডেভিড্ আসিল না কেন? হগ্ চিন্তিত ও একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। ক্রমে এই উদ্বেগ এতটা বাড়িয়া পড়িল যে, হগ এক দিন স্বয়ংই ডেভিডের বাড়ীতে না যাইয়া পারিলেন না। যাইয়া দেখিলেন, বাড়ীর সকলেই ডেভিডের জন্য চিন্তিত। দেখিলেন, ডেভিড রান্নাঘরের বারেন্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। যে গাত্রাবরণী (*plaid*) দ্বারা তনু আচ্ছাদন করিয়া সে ফিমির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত,—ফিমির সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সে যাহা দ্বারা ফিমিকে ঢাকিয়া লইয়া সঙ্কেত-তরুতলে উপবিষ্ট হইত, সেই গাত্রাবরণী সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।

হগ্ শুনিলেন, ডেভিড ঐ গাত্রাবরণী ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে চাহে না। সে কাহারও সহিত একটি কথাও কয় না। অনেক পীড়াপীড়ির পর, কোন দিন সামান্য কিছু খায়, কোন দিন কিছুই আহার করে না। এক টুকরা সুপক্ক মাংস কিংবা এক ফোঁটা চা কেহ তাহার মুখে তুলিয়া দিতে পারে না। হগ্ ডেভিডের অবস্থা দেখিয়া ও সবিশেষ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ডেভিডকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। দেখিলেন, সে চিরপ্রমোদময়, চিরপ্রফুল্ল ডেভিড নাই। সে যেন তাহার নির্জীব কঙ্কালতনু পৃথিবীতে রাখিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হগ্ এ শোচনীয় দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষে জল আসিল; হৃদয় শোকাবেগে উথলিয়া উঠিল।

তিনি রান্নাঘরের নিকট হইতে বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। পথে ডেভিডের ভগিনী মারগেরেট তাঁহাকে বলিল,—"আপনি যে আজ দয়া করিয়া দাদারে দেখিতে আসি-

য়াছেন, ইহাতে আমরা বস্তুতঃই বড় ব্যথিত ও আশঙ্ক হইয়াছি। দাদা মনে করে, আমরা কেহই কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু গুরুতর একটা কিছু ঘটিয়াছে, ইহাই আমাদিগের মনে লয়। সে কখনও কাঁদে, কখনও বসিয়া কি ভাবে। আর সময় সময়, হা ফিসি! হা ফিসি! বলিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে। ফিসি কি আমরা বুঝি না। জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেয় না,--আপনার নাম করে। ইহা ত পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ। আপনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন। দাদার মনে কি আগুন জ্বলিয়াছে,—সে কি দুঃখে অবসন্ন ও বিপন্ন আপনি যদি জানিতে পারেন, তবেই একটা প্রতীকারের পথ হইতে পারে, নচেৎ আর কোন আশা নাই।"

হগ্ কহিলেন,—"অবস্থা বস্তুতঃই শোচনীয়। আমি ডেভিডকে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়াছি। সে যেন কি এক গভীর দুশ্চিন্তার অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি কএকটি লোকের নাম করিয়া কহিলেন,—"ইহাঁদিগকে সংবাদ দাও নাই কেন? ইহাঁদিগকে দেখিয়া ডেভিড আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইহাঁদিগের কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সম্ভবতঃ সে সমস্ত খুলিয়া বলিত।"

মারগেরেট বলিল,—ইহাঁরা সকলেই আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। কাহারও সহিত মুখ ফুটিয়া একটি কথা কওয়া দূরে থাকুক, দাদা কাহারও পানে একবার ফিরিয়াও চাহে নাই। মনে লয়, দাদার হৃদয় টা যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আপনি কি মনে করেন, দাদা কি তবে বেশী দিন আর বাঁচিবে না।"

হগ্ বলিলেন,—"বাছা অমন কথা মুখে আনিও না। ঈশ্বর করুন, তোমাদের দাদা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুক।—আমার বিশ্বাস, ডেভিড সমস্ত কথা আমার কাছে খুলিয়া বলিবে।"

ইহার পর হগ্ কিছুক্ষণ বৈঠকখানায় বসিলেন; এবং চা পান করিয়া, একটু স্থির হইয়া পুনরায় ডেভিডের কাছে গেলেন। হগ্ নির্জ্জনে ডেভিডকে লইয়া বসিলেন।

নির্জ্জনে হগের সাক্ষাৎকার পাইয়া, ডেভিড তাহার মৌনভাব ত্যাগ করিল। হগ্ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; ডেভিড আপনিই ফিসিঘটিত আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। হগ্ সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়া বিস্মিত ও অন্তরে স্পৃষ্ট হইলেন; এবং বুঝিলেন এ পীড়ার কোন ঔষধ নাই।

হগ্ ডেভিডের নিকট নিরাশমনে ও ব্যথিত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ডেভিড, হগের কাছে সমস্ত খুলিয়া কহিয়া, যেন হৃদয়ের ভার একটু লঘু বোধ করিল, মনেও যেন, ক্ষণকালের তরে একটু স্ফূর্ত্তি পাইল। সে পিতার জোত জমির শেষ সীমা পর্য্যন্ত হগের অনুগমন করিল। পথে পথে হগকে কহিল,—"ফিসি আবার আমাকে দেখা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত আছে; এবং সেই সময়ে, কখন আমি তাহার সহিত মিলিত

হইতে পারিব, তাহাও বলিয়া যাইবে, কহিয়াছে। বোধ হয়, সেইটিই আমার এই পৃথিবী, ত্যাগের বিজ্ঞাপন। কেমন, আপনি কি মনে করেন?"

হগ্‌ কহিলেন,—"আমারও তাহাই মনে লয়। তোমার ও তোমার স্বর্গগতা প্রিয়তমার মধ্যে যে অদ্ভুত ও বিচিত্র উপায়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইহার পরে স্বপ্নযোগেই হউক, কিংবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, যখন তোমার ফিমি আসিয়া, তোমাদিগের পুনর্ম্মিলনের দিন অবধারণ করিবে, সেই দিনই সম্ভবতঃ তোমার পৃথিবীবাসের শেষ দিন। ইহার পরে, তোমাদিগের প্রাণের পুনর্ম্মিলন, এই দুঃখদগ্ধ পৃথিবীতে হইবে না, লোকান্তরে—দিব্যধামে—আনন্দময় দেবনিবাসে, তোমাদিগের দুটি আত্মা চিরকালের তরে মিলিত হইবে। যদি ফিমির কাছে স্বপ্নযোগেও তুমি এরূপ সংবাদ পাও, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইও।"

ডেভিড বলিল,—"ও—না!—স্বপ্ন কি বলিতেছেন!—আমি স্বপ্নে,—জাগরণে, প্রদোষে, প্রত্যূষে, ও মধ্য রাত্রিতে, প্রত্যক্ষবৎ তাহাকে দেখিতে পাই। আমি তাহাকে চক্ষে দেখি,—তেমনই আদর করিয়া কাছে বসাই,—প্রীতিভরে চুম্ব দেই, এবং প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করি। তখন সে যে পরলোকে, আর আমি ইহলোকে, এমন কথা আমার একটুও মনে থাকে না। কিন্তু সে অদৃশ্য হইলেই, আবার যেন আমার বুক টা ভাঙ্গিয়া পড়ে,—আবার আমি চক্ষে অন্ধকার দেখি।—আ—না—না—আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখি না,—ভবিষ্যতেও স্বপ্নে দেখিব না। আমি জাগ্রত অবস্থায়, আমার চক্ষের সম্মুখে তাহাকে অবস্থিত দেখিব, এবং বন্ধু যেমন বন্ধুর সহিত কথা কহে, সেই ভাবে তাহার সহিত কথা কহিব। আমি দুর্ভাগ্য বশতঃ কএক দিন তাহার দেখা পাইতেছি না। যদি কখনও এমন দিন ঘটে, আবার তাহার দেখা পাই ও কথা শুনি, আপনাকে অবশ্যই জানাইব।"

হগ্‌, আর অধিকক্ষণ সেই অনাবৃত মাঠে, দুঃসহ শীতে ডেভিডের পক্ষে দণ্ডায়মানা থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না। ডেভিডকে ঘরে যাইতে বলিয়া আপনি দ্রুতপদে এট্রিকের বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; এবং তাঁহার দর্শন লাভে ডেভিডও সেই দিন হইতে কএক দিন একটু স্ফূর্ত্তিযুক্ত রহিল। পিতা আবার ঈষৎ আশান্বিত, ভগিনীরা আবার একটু আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু, বর্ষার মেঘভাঙ্গা রোদের মত, দুদিন যাইতে না যাইতেই, এই ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

ডেভিডের শরীর আর ভাল হইল না। তাহার সেই স্ফূর্ত্তি আর স্থায়িভাবে ফিরিয়া আসিল না। ডেভিডের রুগ্ন তনু ভগ্ন তরী ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিল।

এই ভাবে দুই মাস, কি আড়াই মাস অতীত হইয়া গেল। এক্ষণ সে মাসের প্রথম সপ্তাহ। শীত নাই। তুষার নাই।

বাতাস এখন গায়ে বিঁধে না, সুখশীতল স্পর্শে শরীর জুড়ায়। একদিন প্রত্যূষে ডেভিড্ তাহার ঘরে শয্যায় শুইয়া আছে। সেখানে আর কেহই নাই। ডেভিড্ বাতাসে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসিত। ঘরের দরোজা খোলা। তখনও সূর্য্যরশ্মি প্রখর হয় নাই। খোলা দরোজা দিয়া প্রভাতের ফুর্‌ফুরে বাতাস ঘরে প্রবেশ করিয়া, ডেভিডের নিবু নিবু নয়ন, শুষ্ক ললাট ও অধর স্পর্শ করিয়া মৃদু বহিয়া যাইতেছে। ডেভিড্ বেস একটু আরাম অনুভব করিতেছে। সেই দরোজা দিয়া কে সহসা ঘরে আসিল। ডেভিড্ চাহিয়া দেখিল,—ফিমি। হঠাৎ ফিমিকে দেখিতে পাইল; কিন্তু তথাপি তাহার শরীর আজি শিহরিল না,—তাহার বুক কাঁপিল না। সে এক দৃষ্টিতে ফিমির দিকে চাহিয়া রহিল। ফিমি লোকান্তরবাসিনী,—তাহার ছায়ামূর্ত্তি তাহার সম্মুখে, এমন কল্পনাও তখন তাহার আকুলপ্রাণে ঠাঁই পাইল না। ফিমি ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

ডেভিড্ দেখিল,—ফিমির মাথার উপর ধূসর বর্ণের একখণ্ড বস্ত্র লম্বিত রহিয়াছে। শরীরের বর্ণ শ্বেত গোলাপের মত প্রস্ফুট। অধরে মৃদু হাসি। সে হাসি মানুষের নহে,—দেবতার। মুখশ্রী এমনই প্রশান্ত, মধুর, অথচ জীবন্ত যে ডেভিড জীবনে আর কখনও তাহাকে এমন সুন্দর দেখেন নাই। ফিমি তাহার গণ্ডলম্বিত চারুকুন্তলগুচ্ছ বাম হাতে গুছাইয়া লইয়া ডেভিডের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—"এই দেখ, ডেভিড্ আমি তোমায় আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি। আজ রাত্রিতে, সেই সঙ্কেত তরুতলে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে, তুমি আমার সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছ ত, ডেভিড্?

ডেভিড্ ফিমির কথা শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল। বৃদ্ধ পিতার মুখ মনে পড়িল, বোন দুটির স্নেহ-ঢল-ঢল আকুল দৃষ্টি প্রাণে জাগিল। ডেভিড্ কহিল,—"ফিমি, প্রিয়তমে, বাবা বুড়। বোন দুটি অনূঢ়া।—না—ফিমি—আমার বড় ভয় হয়, আমি বুঝি বা এই অবস্থায় সেখানে যাইতে পারিব না!"

জ্যোৎস্নাশীতলা ছায়ামূর্ত্তি বলিল,—"কেন, পারিবে না,—প্রিয়তম ভয় কি?—এখন হইতে আমরা দুজনে মিলিয়া বৃদ্ধ পিতার খবর লইব, দুজনে মিলিয়া বোন্ দুটির ভাবনা ভাবিব। ভয় কিসের ডেভিড্? কেন যাইতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে। দেখিও, আমাকে নিরাশ করিও না। আমি কিন্তু তোমার পথ চাহিয়া সেইখানেই বসিয়া থাকিব।" এই বলিয়া নিরভ্র শরতের জ্যোৎস্নামাখা মধুর হাসিতে ডেভিডের সে ঘর খানি আলো করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, ফিমি আবার সেই পথেই অদৃশ্য হইল। যাইবার সময়, যেন কত স্নেহে গলিয়া, কতই প্রেমে উছলিয়া, মধুর কণ্ঠে আরও যেন কত মধু মাখিয়া, বলিয়া গেল,—"প্রিয়তম, আসি তবে এখন। কথা যেন ভুলিও না। দয়াময় জগদীশ্বর তোমায় স্নেহের কোলে আবরিয়া রাখুন।"

ফিমি চলিয়া গেলে, ডেভিড্ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কাহারেও কিছু বলিল-না,—কেবল হগ্‌কে, অতিদ্রুত লইয়া আসিবার নিমিত্ত পিতাকে অনুরোধ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে দূত পাঠাইয়া দিল।

ফেব্রুয়ারির শেষভাগে হগ্ ডেভিডকে দেখিয়া আসিয়াছেন। মার্চ্চ ও এপ্রিল দুই মাস অতীত হইয়া গেল, ডেভিড্ আর কোন সংবাদ পাঠাইল না। হগ্ মনে করিলেন, সম্ভবতঃ ফিমি আর ডেভিডের খবর লয় নাই। সম্ভবতঃ ডেভিড্ এক্ষণ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া থাকিবে। হগ্, বিনা-সংবাদেই, একবার যাইয়া ডেভিডকে দেখিয়া আসিবেন, মনে মনে ইহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, একদিন প্রাতে হগ্ তাহার কুটীর দ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময়, একটি লোক অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে আসিয়া, তাঁহার সম্মুখে অবতরণ করিল। লোকটি হগ্‌কে নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া বলিল;—"মহাশয়, বিলম্ব করিবেন না, এই অশ্বারোহণে শীঘ্র ক্লান্‌কেইথে চলুন। মিষ্টার ডেভিড্ হাণ্টারের অবস্থা বড় খারাপ, তিনি আপনাকে দেখিবার জন্য আকুল।"

"এই যাইতেছি," বলিয়া হগ্ অমনই অশ্বে আরোহণ করিলেন। ভাবিলেন "এই বুঝি বা ডেভিডকে শেষ দেখা দেখিতে চলিলাম।" তিনি যথাসময়ে ক্লান্‌কেইথে ডেভিডদিগের বাটীতে আসিয়া পহুঁচিলেন। পহুঁচিয়া দেখিলেন, ডেভিড্ বড় দুর্ব্বল;—উত্থানশক্তিরহিত;—শয্যার সহিত যেন একবারে লাগিয়া রহিয়াছে। ডেভিড, ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া, হগ্‌কে দেখিল। হগ্‌কে দেখিয়া তাহার শোণিতশূন্য পিঙ্গল মুখখানি একটু প্রফুল্ল হইল। তাহার নিষ্প্রভ নয়নতারায় ক্ষণকালের তরে যেন, আবার জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসিল। ডেভিড্, হগ্‌কে তাহার কাছে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিয়া, ভগিনী দুটিকে স্থানান্তরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। ভ্রাতৃবৎসলা বোন দুটি, দাদাকে নয়নান্তরালে রাখিয়া, তিলেকের তরেও, স্থানান্তরে যাইতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু দাদার অনুমতি ও হগের অনুমোদনে, তাহারা বাধ্য হইয়া অনিচ্ছায় অন্য ঘরে সরিয়া গেল। হগের দ্বারা, এখনও ডেভিডের কিছু উপকার হইলে হইতে পারে, তাহাদের স্নেহপ্রতারিত সরলপ্রাণে এ দুরাশাও আবার একটু জাগিয়া উঠিল।

ভগিনীরা চলিয়া গেলে, ডেভিড্ আগ্রহের সহিত হগের হাতখানি ধরিয়া অতি ক্ষীণ অথচ মধুরকণ্ঠে কহিল,—"প্রিয়তম বন্ধু,—জীবনের অদ্বিতীয় সহায়, ও পূজাস্পদ সুহৃদ্—আমি চলিলাম। আপনি আমাকে বিদায় দিন। আমার দিন পূর্ণ হইয়াছে। আমি যে সময়ের দিকে, এই দীর্ঘকাল, তৃষিতনয়নে, অথচ ভীত-ভীত মনে, চাহিয়া রহিয়াছিলাম, আমার সেই প্রার্থিত ও শঙ্কিত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আমি আজ প্রত্যূষে, আবার আমার ফিমিকে দেখিতে পাইয়াছি।

হগ্ কহিলেন,—"ফিমিকে দেখিয়াছ,—অবশ্যই স্বপ্নাবেশে, কেমন,—নয় কি?—একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, উহা স্বপ্ন, না সাক্ষাৎ দর্শন?

ডেভিড্ কহিল;—"ও—না—না,—স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়। আমি, এইক্ষণ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া, সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া শুঝিয়া, আপনার সহিত যেমন কথা কহিতেছি, তখনও ঠিক্ এইরূপ অবস্থায়ই ছিলাম। আমি একা থাকিতেই ভালবাসি। একাকী থাকিয়া সর্ব্বদা ভাবি ও প্রার্থনা করি। তখনও একাকী ছিলাম। ঘরে একটু বাতাস আসুক, এই উদ্দেশ্যে দরোজাটি খোলা রাখা হইয়াছিল। সেই খোলা দরোজা দিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া, ফিমি আমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইল। আমি, তাহার তখনকার সেই প্রফুল্ল ও জীবন্ত মুখখানির দিকে বহুক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া তাহাকে কিছুতেই লোকান্তরবাসিনী মনে করিতে পারি নাই।" ইহার পরে ডেভিড্, যেভাবে ফিমি দেখা দিয়াছিল, ও যাহা যাহা বলিয়াছিল, হগের কাছে সমস্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিল।

কবিহৃদয় হগ, সত্যনিষ্ঠ, সরলপ্রাণ, অথচ আসন্নমৃত্যু যুবকের ক্ষীণকণ্ঠে কথিত এই বিস্ময়াবহ অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া একবারে স্তম্ভিত ও বিমূঢ়বৎ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি করিবেন, কি কহিবেন, কিছুই যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি, ডেভিডের হাতখানি হাতে তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, উহা চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল মাত্র। নাড়ী ধরিলেন। নাড়ী সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় ক্ষীণ। নাড়ীর গতি ভগ্ন ও অসমান। ইহা দেখিয়া বুঝিলেন, আর বেসী বিলম্ব নাই।

ডেভিড্ কহিল,—"নাড়ী কেমন দেখিলেন?" হগ্ বলিলেন,—এ অবস্থায় নাড়ী যেরূপ হওয়া উচিত, তাহাই দেখিলাম। অদ্য রাত্রিতে, তোমাদিগের সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ে, তুমি যে ফিমির সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তোমাদিগের সঙ্কেত-তরুতলে সাক্ষাতের সময় কখন? ফিমি অপদেবতা নহে, সে এখন জ্ঞানোজ্জ্বলা দেবতা। ফিমির কথায় বিশ্বাস করিয়া, তোমার সেই সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তব্য।

ডেভিড বলিল,—"ফিমির কথায় আমার বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস নাই। যে ফিমি, পার্থিব জীবনে, পরিহাসচ্ছলেও কোন দিন একটি মিথ্যা কথা মুখে আনে নাই, সে এখন পরলোকবাসিনী দেবতা হইয়া, মিছা কথা কহিয়া আমায় প্রতারণা করিবে, ইহা অসম্ভব। প্রস্তুত আর কি হইব?—তুমি আমার চিরজীবনের সুহৃদ্, সখা, উপদেষ্টা ও অভিভাবক। তুমি এখানে এখনই আমার জন্য প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনাই, সখা, আমার অন্তিমের সম্বল হউক। ইহার পরে যাহা বাকি থাকিবে, জগদীশ্বর স্বয়ং তাহা

করিবেন,—যিনি স্বর্গবাসিনী ফিমির প্রাণের সহিত, এই হতভাগ্যের মর্ত্ত্য-কারারুদ্ধ ক্লিষ্ট-প্রাণটি এখনও এক সুতায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, সেই পতিতপাবন আপনিই তাহার বিধান করিয়া দিবেন। তাঁহার পাদপদ্মই আমার সম্বল। ঘড়িটি আমার চক্ষের সম্মুখে রাখুন। দেখি এখন রাত্রি কতটা বাজিয়াছে।" এই বলিয়া ডেভিড্ নীরব হইল।

হগ্ ঘড়িটি ডেভিডের দৃষ্টিপথে ভাল স্থানে রাখিলেন। ডেভিড কিছুক্ষণ ঘড়ির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন মৃদু মৃদু কহিল। কিন্তু উহা এত মৃদু ও অস্পষ্ট যে, হগ্ তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ডেভিডের পিতা ও ভগিনী দুটিকে দ্রুত ডাকিয়া আনিলেন। বলিলেন,—ডেভিডের কাল পূর্ণ হইয়াছে;—আর বিলম্ব নাই। ভগিনী দুটি আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিল। পিতা কিছু বলিলেন না। তিনি কাতরনয়নে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মুমূর্ষু পুত্রের শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। হগ্, জানুপাত করিয়া, ডেভিডের অনুরোধ অনুসারে, কিছুক্ষণ কায়মনঃপ্রাণে প্রার্থনা করিলেন। সঙ্কেত-সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। মুমূর্ষু বারংবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। হগের প্রার্থনা শেষ হইয়া গেলে, ডেভিড হগের হাতখানি শ্লথ-মুষ্টিতে ধরিয়া রহিল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া আসিয়া যেই সঙ্কেত-সময়ের উপর পহুঁচিল, অমনই হগের হাত হইতে ডেভিডের শ্লথ-মুষ্টি খসিয়া পড়িল। হগ্ চাহিয়া দেখিলেন, ডেভিড নাই। ডেভিডের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ডেভিড সঙ্কেত-তরুতলে প্রিয়তমা ফিমির সহিত চিরজীবনের তরে মিলিত হইয়াছে।

পল্লীর লোক ডেভিডকে ভুলিতে পারিল না। সকলেই ক্রমে ডেভিড ও ফিমির প্রেমকাহিনীর সবিস্তর বিবরণ অবগত হইল। ক্লানকেইথ-পল্লী ও এট্রিক বনভূমি দীর্ঘকাল রাখাল-প্রেমিক নামে পরিচিত ডেভিডের স্মৃতির সম্মান করিল।

ফিমি ও ডেভিডের নিঃস্বার্থ-নির্ম্মল প্রাকৃত প্রেম, পৃথিবীতে ফুটিয়া, পৃথিবীতেই লয় পাইল না। উহা, দুটি সাগরাভিসারিণী স্রোতস্বিনীর সম্মিলিত স্রোতের ন্যায়, একীভূত ধারায় প্রবাহিত হইয়া, প্রেমের সেই অনন্ত সাগরের দিকে প্রবাহিত হইল। অনন্তকালের অনন্ত ব্যবচ্ছেদে, অধ্যাত্মজগতের কোথায় উহার কিরূপ পরিণতি ঘটিল, তাহা পার্থিবজীবের অজ্ঞেয়।

এখানে একটিমাত্র প্রশ্ন আছে। ফিমির ছায়ামূর্ত্তি, সঙ্কেত-তরুতলে দ্বিতীয়বার দর্শন-দানের পর, যাজকের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছিল কেন? উত্তর—সমাধিস্থ পার্থিব-তনুর আকর্ষণে। এ আকর্ষণ কাহারও পক্ষে দৃঢ়, কাহারও পক্ষে লঘু,—কাহারও জন্য দীর্ঘস্থায়ি, কাহারও জন্য ক্ষণিক। এই আকর্ষণের উচ্ছেদকামনায়ই প্রাচীন ঋষিরা পার্থিব তনুর অগ্নিকার্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "হিতোপদেশীয়—মিত্রলাভঃ। মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্বিষ্ণুশর্ম্ম-সঙ্কলিতঃ।—শ্রীগুরুনাথ-কাব্যতীর্থ কৃত,—অন্বয়-বঙ্গার্থ বঙ্গানুবাদ-ব্যাখ্যা-পদপরিচয়-ধাতুরূপ-প্রণালী-ইতিবৃত্তান্ত-প্রশ্নোত্তরমালাপ্রভৃতিভিঃ সমেতঃ। কলিকাতা, ১৩৩নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট 'হরি-যন্ত্রে' শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা।" হিতোপদেশ, শিশুশিক্ষার পুস্তক হইলেও, দেশবিখ্যাত বস্তু। আমরা উহার অনেক টীকা, অনুবাদ, অর্থবিবৃতি ও ব্যাখ্যাপুস্তক দেখিয়াছি। কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গুরুনাথ কাব্যতীর্থের এই মিত্রলাভ-ব্যাখ্যা প্রথম-শিক্ষার্থীর যেমন উপযোগিনী হইয়াছে, আর কোন খানিই তেমন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার অনুবাদ সরল,—অন্বয়-বোধিনী টীকা অন্ধের জন্যও দীপিকার মত, এবং ব্যাখ্যা অতি বিশদ। যাহারা বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের উপক্রমণিকাখানি মাত্র পড়িয়াছে, তাহারাই ইহা, অন্যদীয় সাহায্যব্যতিরেকে, অনায়াসে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। ফলতঃ, এই পুস্তকখানি বিদ্যার্থী ও বিষয়ী উভয়শ্রেণীস্থ লোকেরই সমান-পাঠ্য,—সমান আদরণীয়। শ্রীযুক্ত গুরুনাথ কাব্যতীর্থ, বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার সহায়তাকল্পে, বিবিধ ব্যাকরণ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয় ধনিসন্তানেরা ঈদৃক্ সাধুসঙ্কল্প সুপণ্ডিত-ব্যক্তির সংবর্দ্ধনায় অগ্রসর হইবেন না কি?

২। "ভাষাপরিচ্ছেদ। 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' সমেত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, রায়বাহাদুর কর্ত্তৃক অনূদিত। শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-বাহাদুরের অর্থব্যয়ে 'সাহিত্য-সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" আমরা এ গ্রন্থ, সমালোচনার জন্য, উপহার পাই নাই; গ্রন্থকারের উদারতায়, প্রীতির উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু গ্রন্থখানি এমনই উপাদেয় বস্তু হইয়াছে যে, আমরা অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার সহিত ইহার প্রাপ্তি স্বীকার না করিয়া চিত্তে তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ভাষাপরিচ্ছেদ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-শিক্ষার্থিদিগের প্রথমপাঠ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু, এ গ্রন্থে প্রবেশ লাভ অনেকের পক্ষেই দুষ্কর কার্য্য। শাস্ত্রি মহাশয়ের প্রযত্নে ও পরিশ্রমে, সে দুরধিগম্য ভাষা-পরিচ্ছেদ এক্ষণ সকলেরই সহজগম্য বস্তু হইল। তাঁহার পরিশ্রমকে শত ধন্যবাদ। তাঁহার অনুবাদ যার-পর-নাই প্রশংসার্হ; ব্যাখ্যা ও টিপ্পনীও নিতান্ত উপকারজনক। ঈদৃশ গ্রন্থপ্রকাশে আনুকূল্য করিয়া সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরও পণ্ডিতসমাজে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আদিম-চট্টগ্রাম।

সমুদ্র-পথে।

সত্বর প্রাতরাশ সমাপন করিয়া উদিত ভাস্করকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইলাম ; এবং পূতসলিলা-কর্ণফুলীর চারু বক্ষে, ফ্লোটিলা কোম্পানির বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে সব্‌ডিভিশন দর্শনে যাত্রা করিলাম। বালসূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি অঙ্গে মাখিয়া, নাতিদীর্ঘ ষ্টীমারখানা যেন মনের আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। 'কেবিনের' ছাদে বসিয়া আমরা চারিদিকে প্রকৃতির প্রফুল্লদৃশ্য চিত্রগুলি দেখিতে লাগিলাম। হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইল। দেখিলাম, অদূরে স্বভাব-সুন্দরী প্রকৃতি, আশীর্ব্বাদ-রূপ-ফেণ-পুষ্প সাগরোর্ম্মির উন্নত মস্তকে প্রদান করিতেছেন। যাত্রাকালে ইংরেজের অতুলকীর্ত্তি, "ডবলমুরিংয়ের" লৌহ-সেতু, প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। খাড়ির পরিচায়ক দুইটি 'বয়া' মধ্য দিয়া জলযানগুলির গতি-পথ বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে "ডবলমুরিং।" এই সেতু বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে "আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে" কোম্পানি কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছে। সমুদ্র-সন্নিহিত স্থান বলিয়া এখন চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে এই সেতুটিরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। বহির্বাণিজ্যের কল্যাণে দেশের সার শস্য লুণ্ঠন করিয়া আজি কালি যত বক-ব্রতী বৈদেশিক বণিক এ স্থানে আসিয়া আড্ডা লইতেছেন। সূত্রপাতে শুধু সমুদ্র-পথে বাষ্পীয়যান সাহায্যে বার্ষিক গড়ে ১২৭১০৩১৪ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদির আমদানী ও ১৩৬১৪১৪১ টাকা মূল্যের, রপ্তানী হইতেছে।

পারকী বা বন্দর ও পতেঙ্গা, বামে ও দক্ষিণে রাখিয়া ষ্টীমারখানা কর্ণফুলীর মুখ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। চট্টগ্রামের গৌরব-রবি,—বণিকসম্প্রদায় অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে, এই বন্দরটি লক্ষ্মীর রত্ন-ভাণ্ডার-স্বরূপ ছিল; এবং সমুদ্র-বক্ষে তরণী ভাসাইয়া তাঁহার বর পুত্রেরা একদিন সৌভাগ্যের উচ্চাসনে বসিয়া দেশকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৫৮২ খৃঃ অব্দ। তিন শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আইন আক্‌বরীর সেই প্রাচীন উক্তি ভাষানূদিত করিয়া গ্লেড-উইন (Gladwin) সাহেব বলেন :——

"Chittagong is a large city, situated amongst trees upon the banks of the Sea, and is a great emporium, being the resort of Christian and other merchants."

হায়! দেশের আজি কি অবস্থাই হইয়াছে! সময়ের উৎপীড়নে এই বাণিজ্য-প্রধান চট্টগ্রাম আজ কাঙ্গালের বেশে সাধারণের দয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই শোচনীয় পরিণতির সময়ও চাঁদ সদাগরের দীর্ঘিকার স্ফটিক-স্বচ্ছ নির্ম্মল বারি, সমুদ্রযাত্রী নাবিকদিগের আকণ্ঠ পিপাসায় শান্তি-বিধান করিতেছে, মনসা দেবীর অনুগ্রহে আজ পর্য্যন্ত চাঁদ সদাগরের নাম এই স্থানে আবাল বৃদ্ধ সকলের কাছে সুপরিচিত এবং ষট্ কবি ও বাইশ কবি নামে যে দুই খানা কবি গাথা আছে, এখনও শ্রাবণ মাসে অতি যত্নের সহিত তাহা গৃহে গৃহে পঠিত হয়। দেশীয় প্রাচীন কবির কল্পনা-কুসুম দুই একটি এ স্থানে পাঠকবৃন্দকে প্রীতি-উপহার প্রদান করিব :——

লক্ষীন্দরের উজানীনগর যাত্রা।

"যাত্রা করে চান্দের কোঙর,
চলিল বণিক নারী, পরিয়া বিচিত্র শারী
সারি সারি সুন্দরী বিস্তর।
পঞ্চকুম্ভে জল ভরি, আম্রশাখা তদুপরি,
দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।
সুন্দরী সুভগা নারী, হাতে লয়ে জলঝারি
চালে জল হয়ে কুতূহলী।
ধুপ-দীপ-গন্ধ চুয়া, নারীগণ হস্তে নিয়া
সবে মিলে দিল জয়ধ্বনি।"

সেই চান্দ সদাগরের সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পর পর্য্যন্ত, যে সমস্ত সদাগর দূরবর্ত্তী স্থান, সিংহল, গালী, যব প্রভৃতি হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া স্বদেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া ছিলেন, এ স্থানে তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের মহা-বিপ্লবের সময় চট্টগ্রামে যখন ৩৪ সংখ্যক সিপাহিদল ক্ষেপিয়া সরকারি তহবিল খানা বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবদের উদ্দেশে রুদ্ররোষ ও চণ্ড বেশে প্রধাবিত হইয়াছিল, তখন অত্রত্য সদাগর আবদুল মালুমের অর্ণবপোতগুলি তাঁহাদিগকে বহন করিয়া নিরাপদ স্থান,—বাহির সমুদ্রে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই সদাশয় মালুম সাহেবের সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ যে প্রশংসা পত্র দিয়াছিলেন, তদনুবলে তাঁহার পুত্র সব-রেজিষ্টার হইয়াছেন।

সমুদ্র-উপকূলে পারকী বা বন্দর। এই স্থানে সরকার বাহাদুরের একটি স্বাস্থ্যনিবাস, Sanitarium Bunglow আছে। তাহার পার্শ্বে পতাকা-স্তম্ভ। একটি অনতি উচ্চ পর্ব্বতমালা এই স্থান হইতে সমুদ্রের তীরে তীরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহা দেব-গ্রামের পাহাড় নামে পরিচিত। এই নৈসর্গিক পর্ব্বত-প্রাচীর, সম্মুখস্থ বঙ্গ-সমুদ্রের অত্যাচার হইতে পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে অনুক্ষণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

আমরা দুইঘণ্টা কাল সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে আবার কূল কিনারা দেখিতে পাইলাম, ক্রমান্বয়ে ছনুয়া, কুতুবদীয়া, জলেখাঁর মা'রঘাট ও মহেশখাল দ্বীপপুঞ্জ অতি-

ক্রম করিয়া সব্‌ডিবিশনের হেড্ কোয়াটার কক্সবাজারে, আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সমুদ্রপথে গমনাগমনের সুবিধা মনে করিয়া প্রতি ষ্টেশনে বহুলোকের সমাগম হয়, এক জন ইংরেজ পরিব্রাজক বলেন :—

"Men prefer the more agreeable and quick sea route to the toilsome slow journey over land."

আমাদের দ্রষ্টব্য।—প্রথম ষ্টেশনের নাম ছনুয়া;—একটি অনুর্ব্বর সমুদ্রসন্নিহিত স্থান, এবং সর্ব্বদা সামুদ্রিক লবণাক্ত জলে সিক্ত। গত মহাঝড়ের সময় ইহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার এখন পর্য্যন্ত পূরণ হয় নাই। দৈবপ্রতিকূলতা হেতু সহস্র সহস্র নর নারী ও পশু পক্ষীর আয়ু-সূর্য্য এক অর্দ্ধ রাত্রি মধ্যে নিবিয়া যায়, এখন অনেক স্থানে স্তূপীকৃত নর-কঙ্কাল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশের শোচনীয় পরিণাম জানাইতেছে। সেই মহা দুর্ঘটনার সময়, বাত্যাপ্রপীড়িতা দুর্ব্বলা অবলারাই সর্ব্বাগ্রে, সমুদ্রজলে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া মানবজীবনের অস্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিল। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও যে সমস্ত মানব, প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, গৃহশূন্য অবস্থায় তাহাদের কি যে কষ্ট হইয়াছিল, ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে না। প্রলোভন ও উপনিবেশের অনুবলে অনেকের অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেকের স্ত্রী যুটে নাই, অনেক গৃহ অপূর্ণ রহিয়াছে।

২। কুতুবদ্বীয়া;—এই প্রদেশের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা দ্বীপকে দ্বীয়া বলে। ইহা একটি সমুদ্রপরিবেষ্টিত অনুচ্চ সমতলভূমি। লবণাক্ত জল, কৃষির পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর এবং প্লাবনের সময় সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া দ্বীপবাসীকে ভাসাইয়া নিতে পারে, এই ভয় অপনোদন মানসে ইহার চারিদিকে সমুচ্চ বৃহৎ মৃৎ-প্রাচীরের (Embankment) ঘেরা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইয়া যেরূপে ইহার ক্ষীণদেহ দিন দিন বিধৌত করিয়া সমুদ্রে পলল প্রক্ষেপ করিতেছে, বোধ হয়, অচিরকালেই ইহা ডুবিয়া যাইবে এবং অপর স্থানে আর এক নূতন দ্বীপের সৃষ্টি হইবে। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও প্রায় এরূপই বলিয়াছিলেন;—The doubt that exists as to whether the island is not sinking" কিন্তু ইহা সরকার বাহাদুরের একটি বিশেষ লাভজনক স্থান; এই খাসমহলের বাৎসরিক আয় ৩৩১৯৯৶৬ পাই। কুতুবদ্বীয়ার আলোকস্তম্ভ, বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া, অনুক্ষণ সমুদ্রযাত্রী নাবিকদিগকে বিপথগামী হইবার ভয় হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

৩। কলেখার মা'রবাট,—শুনিয়াছি এই পুণ্যশীলা রমণী একজন সাধারণ গৃহস্থের অঙ্কলক্ষ্মী ছিলেন। কিন্তু নশ্বর জগতে এই অতুল কীর্ত্তি তাঁহার পবিত্র নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া অনুক্ষণ মানবের কণ্ঠে কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে, কুতুবদ্বীয়া পরিবেষ্টিত

সমুদ্র-পথ ছাড়াইয়া গেলে একটি বৃহৎ নদী দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নাম "উল্লনা টিঁয়া।" ইহার বিশেষত্ব এই,—জোয়ার ভাটা সর্ব্বসময়ে, ইহার স্রোত বিপরীতগামী। প্রাকৃতিক নিয়মের কোথায় কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কেহই বলিতে পারে না।

৪। মহেশখাল,—একটি বৃহৎ দ্বীপ; ইহার পরিসর ২০৯ বর্গমাইল, ও ইহার অন্তর্গত ২১টি গ্রামে ৩২৮৬ ঘর লোকের বাস আছে। এই স্থানে দেবাদিদেব মহাদেব আছেন বলিয়া ইহা হিন্দুদিগের একটি মহাতীর্থ হইয়াছে; এবং চন্দ্রনাথ দর্শনাভিলাষী যাত্রিগণ সিন্ধুতীরে ইহাঁকেও দর্শন করিয়া থাকেন। এই আদিনাথের আবাসভূমি, গিরিরাজ মৈনাকের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে একবার বলিয়াছি। এ স্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ভূতপূর্ব্ব সেটলমেণ্ট অফিসার এলেন সাহেব পার্ব্বত্য উপত্যকা ভূমি দৃষ্টি করিয়া এ স্থলে পর্ব্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন;—মেঘনা নদীর-স্রোত-বিধৌত পলল সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হইয়া বালি ও কর্দ্দম সংযোগে স্তরের উপর স্তর বাঁধিয়া এই সমস্ত পর্ব্বত-মালার সৃষ্টি করিয়াছে। এই দ্বীপসন্নিহিত তিনটি উপদ্বীপ;—দাড়া, করিয়া ও বাহাছুর দীয়া এবং ফকিরের ঘোনা, কুতুবজোঁম এবং ঘটভাঙ্গা মৌজার কিয়দংশ ভিন্ন সমস্ত ভূমি এক প্রভাবতী তরফের অন্তর্গত। প্রভাবতী রায়জায়া, কালীচরণের সহধর্ম্মিণী, কালীচরণ খৃঃঅব্দের ১৭৮৪ হইতে ১৭৯০ পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের আদি পুরুষ সদানন্দ দাস ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গ হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। এই বংশের একমাত্র বংশধর রায় প্রসন্নকুমার, এই মহেশ খাল দ্বীপের একমাত্র বর্ত্তমান ভূম্যধিকারী।

৫। সব্‌ডিবিশন বা কাক্সবাজার;—ইহা কাপ্তান কক্স সাহেবের অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ৪০ সহস্র আদি মগ স্বদেশ আরাকান হইতে ব্রহ্মরাজের উৎপীড়নে ভীত হইয়া পলায়ন করতঃ চট্টগ্রামে নবাগত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হয়। ব্রহ্মরাজ, রাজদ্রোহী প্রজাবর্গকে ফিরাইয়া আনিয়া উচিত দণ্ড প্রদান মানসে পাঁচ সহস্র লোক চট্টগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যায়; এবং ইহাতেই প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের সূচনা হয়। কাক্সবাজার বাগখালী নদীর দক্ষিণ উপকূলে স্থিত। ইহার কএক রশি মাত্র পশ্চিমে নীলাম্বুধি অর্থাৎ ভারত সমুদ্রের শাখা বঙ্গ-অথতি, ইহার আয়তন ৮৭৭ বর্গ মাইল মধ্যে ২১৪টি গ্রাম বা পল্লী আছে। ইহার অধিবাসীদিগের মধ্যে ১৮৭২ খৃঃ অব্দের আদম সুমারী মতে ২৪৪ জন হিন্দু, ৮৩১ জন মুসলমান ও ৩২০৫ জন মগের বাস আছে। থানা কাক্সবাজার মহেশখাল চকরিয়া, রাস্তু ও উখিয়া লইয়া ১৭৫৪ইং ১৫ই মে এই সব্‌ডিভিশন গঠিত হইয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে বঙ্গদেশের অন্যান্য নগর বা

উপনগর হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে গঠিত বলিয়া বোধ হইবে। মগ-গৃহগুলি প্রায় কাঠের মাচাং। তাহাদের দেবালয় বা উপাসনা মন্দিরগুলি অতীব সুন্দর। তদ্দর্শনে হান্টার সাহেব (Hunter) বলেন ;—

The horses are not only substantial, but very picturousque and really ornamented অপিচ "With their surrounding verandahs and decorated gable ends, the whole presents an appearance not unlike that of a Swiss cottage."

আজিকালি সকল সমাজে কলঙ্কস্পর্শ হইয়াছে। এখন আর কোথায়ও সেই প্রাচীন কালের উন্নত হৃদয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই। বিলাসিতার তরঙ্গ-তুফানে যেন সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে বিষম বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে যে উদ্দেশ্যে ধর্ম্মকার্য্য করিত, এখন তাহা রঙ্গ-তামাসায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। একদিন দান, ধ্যান, স্বর্গের সোপান ছিল, তাহা এখন নাম ক্রয়ের সিঁড়ী হইয়াছে। পূর্ব্বে দাতা দান করিতেন নিষ্কাম হইয়া; এখন করেন স্তাবকমণ্ডলীর শ্রুতিমধুর স্তুতি বাক্য শ্রবণে আনন্দ ঢালিয়া। পূর্ব্বে এ স্থানের ধর্ম্মভীরু মগেরা মনে করিত, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান একটি মহাপুণ্যের কার্য্য; কিন্তু এখন তাহাদের সেই বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। লোকে বলে "খাল গেলেও রেখা থাকে"; যদিও তাহাদের কার্য্যটি গিয়াছে, সংস্কারটি মাত্র আছে, তথাপি তাহা আছে বলিয়া প্রকাশ্য রাস্তার ধারে ধারে এখনও পথিক ও প্রবাসীর বিশ্রামোপযোগী "চেয়াঙ্গ ঘর" (বিশ্রামাগার) আখ্যাত অনেক সুন্দর গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সেই প্রাচীন প্রথানুসারে এই গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সম্যক্রূপে রক্ষিত হইতেছে না দেখিয়া, অনেক সহৃদয় ব্যক্তি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দৃষ্ট হয়, এখন এই গৃহের অন্যরূপ ব্যবহার হইয়াছে। যত নিষ্কর্ম্মা অলস প্রকৃতির লোকদিগের ইহা আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসের স্থান হইয়াছে; এবং ইহা বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না যে, এইগুলি এখন তাহাদের নানাবিধ কুকার্য্যের আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নারী সমাজে এখনও ধর্ম্মভয় আছে; এবং তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতার গুণেই তাহাদের সমাজ এখনও নিরাময় আছে। সভ্য সমাজ মগ রমণীর নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যেরূপ বহুগুণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, পক্ষপাতশূন্যনয়নে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহাদিগকে আদর্শ-রমণী বলা যাইতে পারে। পাঠক! এই বাঙ্গালী লেখকের কথা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না। ইহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান সম্বন্ধে এক জন ইংরেজ রাজপুরুষ কি বলিয়াছেন, তাহা একবার শুনিবেন কি?

At short intervals there are small

covered stands, each containing vessels of fresh drinking water and a cup; the vessels are refilled daily by the mag women and the regularity with which this duty is attended to, shows the stranger at once that he has arrived in hospitable quarters. অপিচ "Their apparent happiness as they carry on their domestic duties."

এই সমুদ্রসন্নিহিত স্থানে পানীয় জল বড়ই দুষ্প্রাপ্য। পুষ্করিণী যে কএকটি আছে, সকলটির জলই অপেয়। এ স্থানে লোকের পিপাসা-শান্তির সম্বল দুই তিনটি নিখাত কূপ মাত্র। তাহাও আবার দূরে দূরে স্থিত। এই জলকষ্ট বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি জলছত্র স্থাপিত হইয়াছে। জলছত্রের ভার রমণীগণের হস্তে। তাঁহারা দূর হইতে জল বহন করিয়া আনিয়া প্রতিদিন দুই-তিন বার ছত্রের কলসীগুলি পূর্ণ করিয়া লোকের পানীয় জলের অভাব বিদূরিত করেন। সূর্য্য দেবের উদয় কাল হইতে অস্ত গমন পর্য্যন্ত, মগগৃহিণীদের তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই, বস্ত্র বয়ন হইতে, হাট বাজার ও পাহাড় হইতে কাঠ কাটিয়া আনা পর্য্যন্ত, সংসারের যত খুটি নাটী সমুদয় কার্য্যই তাঁহাদের করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা কোন কার্য্যে বিরক্তি বোধ করেন না। সকল কার্য্যই অম্লানবদনে সম্পাদন করেন।

প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি, মৃত্যুর ভীষণ ছায়া দেখিয়া মগেরা কখন ভীত হয় না। আমরা মনে করিতে পারি, তাহারা সাধারণতঃ নিষ্ঠুরপ্রকৃতির লোক বলিয়া পুত্র কলত্রের মৃত্যু দর্শনেও তাহাদের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয় না। বাস্তবিক আমাদের এই অনুমান সত্য নহে। মগ জাতির বিশ্বাস, মৃত্যু, যন্ত্রণার অবসান ও অবিচ্ছিন্ন সুখের অভ্যুত্থান। দেখিলাম, পিতা, মাতা বর্ত্তমান; সপ্তবিংশতিবর্ষীয় কর্ম্মক্ষম পুত্র তাহাদের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। গৃহে যুবতী ভার্য্যা, কিন্তু কোথায়ও ক্রন্দনের রোল নাই। সমস্ত নীরব ও নিস্তব্ধ। গৃহের এক পার্শ্বে, আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টির নিমিত্ত শবাধারে শব রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু সকলের কাজকর্ম্ম নিয়মিতরূপে চলিতেছে। ক্রমে তিন দিন চলিয়া গেল, চতুর্থ দিবসের মধ্যাহ্ন সময় শব-পেটক সৎকারের স্থান,—মহাশ্মশানে নীত হইল। শতাধিক শ্মশানবন্ধু সঙ্গে চলিল। দেখিলাম, শবাধার অতি যত্নের সহিত একটি "আলাওের" মধ্যস্থলে, পুষ্প-শয্যায় রক্ষিত হইয়াছে। আলাও কি, বলিতেছি; ইহা বংশ-নির্ম্মিত বহু চূড়া বিশিষ্ট হিন্দুর রথ ও মুসলমানের তাজিয়ার আকারে গঠিত একটি সজ্জিত খট্টাবিশেষ। চেন, সাটিন প্রভৃতি মূল্যবান্ বস্ত্র দ্বারা ইহার সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত হয়। তদুপরি, যেখানে যাহা আবশ্যক, কাগজের পাতায় লতায়, ফুল ফলের কারুকার্য্য করা থাকে। এই আলাওটির উচ্চতা তিন কি সাড়ে তিন হস্ত। আট জন বাহক নৃত্য করিতে করিতে ইহা

বহন করিয়া লইয়া যায়। সর্ব্বাগ্রে রক্তবস্ত্র-পরিহিতা যুবতীদল; তৎপশ্চাৎ প্রৌঢ়া গণ। অগ্রগামিনী রমণীদিগের কক্ষে চিত্রিত পূর্ণ কুম্ভ; তৎপশ্চাৎবর্ত্তিনী রমণীদের হস্তে মুকুটাকার কাষ্ঠাধারে নারিকেল, কদলী, হলুদ পাতা প্রভৃতি। ইহাদের পশ্চাতে বালক, যুবক ও বৃদ্ধের দল। সঙ্গে বাদ্যকর ঢোল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিতে থাকে। মধ্যে বাজী পোড়ান; এবং শবাধারকে লক্ষ্য করিয়া পয়সা ও লাজ নিক্ষেপ করা হয়।" সঙ্গে শতাধিক লণ্ঠন; দেখিলে, বোধ হয় যেন, বিবাহের বরযাত্রী চলিয়াছে। পুঙ্গী শব-দেহকে মন্ত্রপুত করিয়া দিলে পর উহা শ্মশানানলে দগ্ধ করা হয়!

এ স্থানের বাজারগুলি সাময়িক, ইহাতে অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্যেরই ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। সমস্ত বাজার চীলমৎস্য (flying fish) লুনা মাছ (Jelly fish) হাঙ্গর, কস্তুরা প্রভৃতি সামুদ্রিক দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। বাজারে অন্ন ও আমান উভয় রকমই বিক্রীত হইয়া থাকে। এই স্থানের প্রধান বাজারের নাম বড় বাজার ও মেলীবাজার। সব্‌ডিবিশনের অফিসার মেকাটীস্ সাহেবের দুহিতার নামে মেলীবাজার হইয়াছে। একটি উচ্চ পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে একখানা সুন্দর গৃহ দেখিয়া দর্শনের অভিলাষ জন্মিল। গৃহটি চীনঘর নামে পরিচিত। কেন এই নাম হইল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, চীন দেশের বৌদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। প্রাঙ্গণে পাদুকা ত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম,—দেখিলাম, মন্দিরটি একটি শোভাভাণ্ডার;—ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতির বাহ্যিক শোভা উপেক্ষা করিয়া দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত ধ্যানস্থ সশিষ্য বৌদ্ধ দেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কষিত কাঞ্চনের আভাকে হীনপ্রভ করিয়া আরও অনেক পিত্তলমূর্ত্তি আশে পাশে রহিয়াছে। সম্মুখে নানা জাতীয় পুষ্পে পুষ্পপাত্রগুলি সজ্জিত।

শুনিলাম, অল্পদিন হইয়াছে, এই মন্দিরে অত্রত্য কএকজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির পুত্রদিগের 'মৈসাং সংস্কার' হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রহ্মদেশ হইতে ধর্ম্মযাজকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। একটি বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। বাঙ্গালি দর্শকের মধ্যে যাঁহারা এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, মানুষ মানুষকে যে এত উচ্চ সম্মান দেখাইতে পারে, তাহা কখনও আমাদের ধারণাতেও আসিতে পারে নাই। কোলের শিশু হইতে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ নরনারী পর্য্যন্ত, সকলেই যুক্তকরে পুঙ্গীদিগকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন। আমরা মন্দিরের একজন গৈরিক-বসন-পরিহিত পুঙ্গীকে 'মৈসাঙ্গের' প্রকৃত অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সংস্কার দ্বারা মানবের মহীসঙ্গ অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম "মৈসাঙ্গ"। কথাটি বিশদরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত তিনি

আরও অনেক বলিলেন। বালকের এই সংস্কার হইলে গুরুর উপদেশে তাহাদের সহজে দৈহিক জ্ঞান জন্মে,—অর্থাৎ তখন তাহারা কেশতত্ত্ব, দন্ততত্ত্ব প্রভৃতি শরীরের উপাদানগুলির অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারে। কালে কেশ পলিত ও দন্ত স্খলিত হয়; এই সমস্তের সমষ্টি ভৌতিক দেহেরও স্থিরতা নাই। অতএব এই অসার ও অস্থায়ী পদার্থের গৌরব কাহারও করা উচিত নহে।

এই মন্দির হইতে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, ক্ষোভ হইতেছে, কবিকল্পনার মনোহারিণী তুলিকায় চিত্রিত করিয়া, সে প্রিয়দর্শন চারুচিত্র পাঠককে প্রীতি উপহার দিতে পারিলাম না। বঙ্গসাগরবক্ষে তুষারধবল অনন্ত তরঙ্গমালা দেখিয়া বোধ হইল যেন, পেষণ-যন্ত্রের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, তুলারাশি এক বিস্তৃত ময়দানের চারিদিকে ছুটিয়া পলাইতেছে, এবং যেন পেষণকারীর রক্তরাগরঞ্জিত নয়ন হইতে মার্ত্তণ্ডের তীব্র রশ্মিরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া পলাতককে দগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বেলাভূমিতে দৌড়াইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির এই জীবন্ত ছবি দর্শনের নিমিত্ত সকলেই সমুদ্র তটে বেড়াইতে আসেন; কিন্তু তরঙ্গভঙ্গের ভীষণ আরাবে কর্ণে তালা লাগে এবং অন্তরেও বিষম ভয়ের উদ্রেক হয়। প্রদোষসময়ে প্রকৃতির আর এক মহৎ দৃশ্য,—দিনমণির অস্তগমন। নিয়তির আদেশে সূর্য্যদেব যেন দৈনিক জীবন শেষ করিয়া মহাশ্মশানস্থিত প্রজ্বলিত চিতা সদৃশ লোহিত-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মানবকে জীবনের নশ্বরতা শিক্ষা দিতেছেন।

আষাঢ় মাসের প্রথম পূর্ণমাসী রজনী হইতে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা রজনী পর্য্যন্ত মগদের "ছাদাং" পর্ব্ব। "ছাদাং" শব্দের অর্থ সাধনা। নিরম্বু উপবাস করিয়া এই পর্ব্ব রক্ষা করিতে হয়। চাতুর্ম্মাসিক ব্রত উদ্‌যাপনের পর, এই শারদ-শশীর প্রথম বিকাশের পবিত্র রজনীতে বৌদ্ধদেবের সাধনার ফল ফলিয়াছিল বলিয়া, তাহার উপাসক সম্প্রদায় এই রাত্রিতে পর্ব্বজ্ঞানে উৎসবাদি করিয়া থাকেন। মন্দিরে সকলকে নতজানু হইয়া ভক্তিভরে সাধনা করিতে হয়। বাজী পোড়ান, অদ্যকার প্রধান আমোদ; সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে অর্দ্ধ রজনী পর্য্যন্ত বহুবিধ আলোকপূর্ণ কাগজের কৃত্রিম ব্যোমযান আকাশমার্গে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহারা এত ঊর্দ্ধে উঠে যে, দেখিলে বোধ হয়, যেন নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে।

৬। কাক্স বাজারের ৯ মাইল পূর্ব্বে রাম্বু বা রম্যভূমি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় সময় রাম্বু, বৌদ্ধ গৌরবের অন্যতম উচ্চ স্থান ছিল। এই বনকান্তার-সমাচ্ছন্ন ও নদী উপকূলস্থ স্থানটিকে কবিকল্পনার রম্যভূমি নামে অভিহিত করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই স্থানে মগ উপ-

নিবেশ সংস্থাপিত হয়। 'পর্য্যটক রাল্‌ফ ফিচ্' (Ralph Fitch) এই স্থানে মগ অধিবাসীর আধিক্য দেখিয়া বলেন, "Rames the country of the Maghan" অধিবাসীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল. তাহাদের প্রধান কেয়াঙ্গটি ব্রহ্মরাজধানী মেণ্ডেলে সহরের একটি শ্রেষ্ঠ দেব-মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটি পরিপাটীরূপে সজ্জিত এবং ইহার অধিষ্ঠিত দেব-মন্দিরগুলি নিরেট স্বর্ণ ও রৌপ্যে প্রস্তুত। চিত্রপটগুলিতে যমপুরী, যমতাড়ন, পাপীকে অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষেপ প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে। একটি চিত্র বড়ই সুন্দর। মহাদ্রোণী বৃক্ষের বিস্তৃত ছায়াতলে শুকদেব দণ্ডায়মান, সম্মুখে বৌদ্ধদেব জানু পাতিয়া দীন-বেশে সকরুণ দৃষ্টিতে সন্ন্যাস মন্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন।

রাঙ্গু হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে রামকোট। ইহা রামাউত সন্ন্যাসীদিগের একটি দর্শনীয় স্থান। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অপর সম্প্রদায়ও এ স্থানে আসিয়া দেবদর্শন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী মহলে প্রচার, সূর্য্যবংশ-গৌরব লোকাভিরাম রামচন্দ্র দশাস্য কর্ত্তৃক অপহৃতা বৈদেহীর উদ্ধার-মানসে, সর্ব্ব প্রথমে এই পথে সেতুবন্ধনের মনন করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রের বিস্তৃতি হেতু এই সংকল্প পরিত্যাগ করেন। রামচন্দ্রের এ স্থলে আগমন সম্ভবপর কি না জানি না। কিন্তু সমুদ্রের উপকূল টেকনাফে তাঁহার আগমন পরিচায়ক স্মৃতিচিহ্ন রামের থোলা, সীতাপাহাড় প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই তীর্থ আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ভোলাপুরী, তাঁহার উপাস্য দেবতা, রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতা দেবীর প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এই স্থানের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ ভিন্নরূপ। পূর্ব্বকালে ভারতের এইপর্য্যন্ত সীমা ছিল। পুরাণাদির টীকাকার রামানুজস্বামী ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে এই স্থানে আসিয়া ভারতের সীমা নির্দ্দেশক প্রস্তরফলক প্রোথিত করিয়াছেন; এবং স্থানের রমণীয়তা দর্শনে ইহাকে রম্যভূমি নামে অভিহিত করিয়া নগর পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্থানের নাম পরে অপভ্রংশে রাম্যু হইয়াছে। ১৮২২ খৃঃ অব্দে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় মগ-ভীত দেশীয় ইংরেজ সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলে অনন্য-উপায় হইয়া কাপ্তান কেম্বেল (Campbell) পশ্চিম প্রদেশীয় হিন্দু সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা এই স্থানে আসিয়া এই প্রস্তরফলকের লিখা (অতঃপর অনার্য্য দেশ) দেখিয়া এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে কোন মতেই স্বীকৃত হইল না। কৌশলী কেম্বল সাহেব (Campbell) তাহাদের অজ্ঞাতসারে,—এই প্রস্তর-ফলক সরাইয়া ইরাবতীর উপকূলে স্থাপন করিলেন, এবং বলিলেন হিন্দুর রম্যস্থান পুণ্যতোয়া ইরাবতীর উপকূল পর্য্যন্ত। ইহা শুনিয়া সেই-স্থান পর্য্যন্ত যাইতে আর কাহারও আপত্তি রহিল না।

শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

চারুশীলা।

বাঙ্গালি পশ্চিমে।

সুদূর পশ্চিমে মিরাট সহর। এই সহরের এক অংশে, কএক ঘর বাঙ্গালির বসতি। সহরের সেই অংশকে বাঙ্গালি-টোলা বলে। যেখানে বাঙ্গালি, সেইখানে দলাদলি। এই প্রচলিত কথার সার্থকতা, এই সহরবাসী বাঙ্গালিদিগকে দেখিলেও উপলব্ধ হইত। নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এই বঙ্গবাসী-উপনিবেশের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহাকে লোকে ক্রোরপতি বলিয়া জানে। তাঁহার দয়া, সৌজন্য, পরোপকার প্রবৃত্তির জন্য সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিত। তাঁহার বাড়ী, ঘুড়িগাড়ী দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত। তিনি ওকালতি করিয়া মাসে দশ হাজার টাকারও অধিক উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহার যেমন অনেক গুণ ছিল, তেমন অনেক দোষও ছিল। তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন না। তাঁহার আচার, ব্যবহার দেখিলে, তাঁহাকে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বলিয়া বোধ হইত। তিনি ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত দার্শনিকদিগের ন্যায় তিনি নাস্তিক ছিলেন। যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, যাঁহার পরকালে বিশ্বাস নাই, তাঁহার পাপ পুণ্যে যে বিশ্বাস আছে, তাহা কি করিয়া জানিব? নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই উপনিবেশ-স্থিত দ্বিতীয় উকিল। তাঁহার আয়, নরেন্দ্র বাবু অপেক্ষা অনেক কম হইলেও, তিনি সকল বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইয়া চলিতেন, নরেন্দ্র বাবুর ন্যায় বাড়ী, তাঁহার মতন ঘুড়িগাড়ী না হইলে তাঁহার চলিত না। উভয়ের মধ্যে, ভদ্রতার খাতিরে মৌখিক সদ্ভাব থাকিলেও, অন্তরে বিষম শত্রুতা।

নরেন্দ্র বাবুর দুইটি পুত্র। যোগীন্দ্র ও রবীন্দ্র। অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও, সুখী নহে। বালক দুইটিই বুদ্ধিমান্, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শৈশবেই মাতৃহীন। নরেন্দ্র বাবু দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অনেক বন্ধু, তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিলে, তিনি হাসিতেন এবং বলিতেন, একবার বিবাহ করিয়াছি, এই যথেষ্ট। পুনরায় বিবাহ করিলে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে যথার্থই ভালবাসিতেন। তাঁহার স্থান, অন্যে অধিকার করিবে, এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য, কিন্তু তিনি সে কথা বলিতেন না। তিনি বলিতেন বিবাহ করা উচিত কি না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। অকৃতদার ব্যক্তির চরিত্রে দোষ জন্মিলে যে পাপ হয়, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং নিজের

চরিত্র ভাল রাখিবার জন্য চেষ্টা তিনি কথনও করেন নাই। পত্নীর জীবিতাবস্থায়, তাঁহার মনে পাছে কষ্ট হয়, এই ভয়ে কথনও কোন পাপ-পথে বিচরণ করেন নাই; এখন আর সে ভয় নাই। যিনি ধ্রুব-তারার ন্যায় তাঁহাকে সৎপথ দেখাইতেন, তিনি আর নাই। এখন তিনি পুত্রদ্বয়কে কলিকাতায় রাখিয়া, নিজে মিরাটের সেই রাজপুরীতে যথেচ্ছাচার করিতেন। তাঁহার কতকগুলি দুষ্ক্রিয়াসক্ত সঙ্গীও জুটিয়াছিল। তাহার মধ্যে একজনের নাম বিহারীলাল রায়। তিনি জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ। তিনি নরেন্দ্র বাবুর স্বশ্রেণিস্থ না হইলেও, নরেন্দ্র বাবু পরিহাস করিয়া বলিতেন যে, যদি তাঁহার ভগিনী থাকিত, তাহা হইলে, তিনি আবার বিবাহ করিতেন। তিনি তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিলে বোধ হইত যে, তিনি কথনও কোন দুষ্কার্য্য করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিষে পরিপূর্ণ ছিল। পৃথিবীতে এমন কি পাপ আছে, যাহা তিনি হাসিতে হাসিতে না করিতে পারেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, নরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে চিনিয়াও চিনিতে চাহিতেন না। তিনি যাহা বুঝাইতেন, তাহাই বুঝিতেন। তাঁহার কোথায় কত সম্পত্তি আছে, তাহা জানিতে বিহারী বাবুর বাকী রহিল না। বিহারী বাবু মনে মনে নরেন্দ্র বাবুর সর্ব্বনাশের উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বাবুর শরীর ক্রমে অসুস্থ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বাবুর জন্য ঔষধ আনিবার ভার বিহারীর উপর, বিহারী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া না দিলে, ঔষধ খাওয়া হয় না। রাত্রিতেও বিহারী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা না করিলে তাঁহার কষ্ট হয়, তিনি মনে করিতেন, বিহারীর ন্যায় সুহৃদ্ তাঁহার এ জগতে আর নাই।

এদিকে বিহারী বিষ-প্রয়োগে অল্পে অল্পে তাঁহার জীবন শেষ করিয়া আনিতেছে। তাঁহার রোগ কিছুই নয়, বিহারীর বিষই তাঁহার রোগ; আবার তাহাই তাঁহার ঔষধ। এক দিনেই বিষ-প্রয়োগে তাঁহার জীবন নষ্ট করিলে, পাছে কেহ তাহাকে সন্দেহ করে, সে এই জন্য ধীর উপায়ে তাঁহার জীবন শেষ করিয়া আনিতেছে। বিহারী আসিয়া যথন আদর করিয়া হাসিতে হাসিতে ঔষধের সহিত বিষ দেয়, তথন তিনি বিহারীকে বলেন যে, তোমার মতন সুহৃদ্ আমার আর নাই। তিনি সে সময়ে বিহারীর চক্ষের জল পাছে দেখিতে পান, এইজন্য বিহারী চক্ষু ফিরাইয়া লয়।

নীলকণ্ঠ বাবু, তাঁহার সহিত সমভাবে চলিয়া ঋণে ডুবিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ওকালতিতে আয়, মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা; কিন্তু তিনি যে নরেন্দ্র বাবু অপেক্ষা কম উপার্জ্জন করেন, এ কথা কেহ জানিতে না পারে, সেইজন্য তিনি দুহাতে টাকা ব্যয় করিতেন। লোকে বাবু বলিলে মিরাটে তাঁহাকেই বুঝিত। নরেন্দ্র বাবু এক এক-বার ভাবিতেন যে, নীলকণ্ঠ এত টাকা পায়

কোথা। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক দেনা। নরেন্দ্র বাবু এই এক সুযোগ মনে করিয়া মহাজনদিগকে উত্তেজিত করতঃ তাঁহার নামে নালিশ করাইয়া, নিজে উকিল হইয়া, তাঁহার বাড়ী, বিষয়, ঘুড়ি গাড়ী, সব বক্রয় করিয়া লইলেন, তথাপি দেনা শোধ হইল না। অবশেষে তাঁহাকে "দস্তক" করিয়া ধরিয়া, জেলে দিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহার অসুখ আরম্ভ হইল। ইহার কিছু পূর্ব্বে, নীলকণ্ঠ বাবু তাঁহার নিকট আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই নরেন্দ্র বাবু সম্মত হইলেন না। বলিলেন, তুমি আমার আজন্ম শত্রু, এ জীবনে তোমাকে ক্ষমা করিব না। সেইদিন, নীলকণ্ঠ বাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই বিহারীর সহিত তাঁহার অনেক পরামর্শ হইল। তাঁহারই পরামর্শে ধীর-বিষ-প্রয়োগে নরেন্দ্র বাবু, ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তিনি আর নীলকণ্ঠকে জেলে দিতে পারিলেন না, মনের আশা মনেই রহিয়া গেল।

মৃত্যুকালে পুত্রদ্বয়কে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন! কিন্তু বিহারীর এমনই কৌশল যে, তাহারা পিতার রোগের কোন সংবাদও পাইল না।

বিহারী যখন দেখিল, সকলেই নরেন্দ্র বাবুর মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছে, তখন একবারে বিষের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিয়া তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ একেবারেই নিবাইয়া দিল। কেহ কিছু সন্দেহ করিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র বাবু,মৃত্যু সময়ে,যোগীন্দ্র ও রবীন্দ্রকে প্রতিপালন করিবার জন্য বিহারীকেই ভার দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধারণা ছিল, তিনি যে অর্থরাশি রাখিয়া যাইতেছেন, তাহাতে এ জীবনে তাঁহার পুত্রদ্বয় কোন কষ্ট পাইবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কি কেহ সুখী হইতে পারে? নরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর বিহারী একখানি জাল উইল বাহির করিলেন, তাহাতে নরেন্দ্র বাবু, তাঁহার বিষয় ও পুত্রদ্বয়ের উপর সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্ব দিয়া গিয়াছেন, আর লিখিয়া গিয়াছেন, যদি অকৃতদার অবস্থায় তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কাল হয়, তাহা হইলে বিহারীই তাঁহার সমস্ত বিভবের অধিকারী হইবেন। নীলকণ্ঠ বাবুর অনুগ্রহে, উইলে সাক্ষীর অভাব হইল না, তিনি নিজেই একজন সাক্ষী হইলেন। তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী আরও দুই এক জন নূতন উকিল তাহাতে সাক্ষী হইলেন। তাঁহারা নীলকণ্ঠ বাবুর কথা মত নিজের নাম সহী করিয়া দিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন না যে, নীলকণ্ঠ বাবু উহা জাল করিয়া আনিয়াছেন;—নীলকণ্ঠ বাবুর খাতিরে এক একটা সই করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে নীলকণ্ঠ বাবুদ্বারা উইল প্রবেট্ করা হইল, দেখিতে দেখিতে নীলকণ্ঠ বাবুর দেনা সব শোধ হইল। তাঁহার বাড়ী গাড়ী ঘুড়ি আবার তাঁহার হইল। নরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে আর কাহারও লাভ হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু নীলকণ্ঠ বাবুর পসার দ্বিগুণ হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলে কার সাধ্য? স্বয়ং জজ্ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহার হাতধরা; তাঁহারা নরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে কথা শীঘ্রই বিস্মৃত হইলেন। নরেন্দ্র বাবু সাহেবদের মন যোগাইতে পারিতেন না। সাহেবেরা তাঁহাকে গুণের জন্য সম্মান করিলেও, তাঁহাকে ভালবাসিতেন না। আর নীলকণ্ঠ বাবু!! তিনি সাহেবদের অতি প্রিয় ছিলেন। প্রায় সপ্তাহে সপ্তাহে সাহেবদিগকে আপন প্রমোদোদ্যানে লইয়া গিয়া ভোজ দিতেন। সহস্র সহস্র মুদ্রা তাঁহাদের ভোজনার্থ ব্যয় করিতেন। কোন সাধারণহিতকর কার্য্যে, সাহেবেরা অনুরোধ করিলে, মুক্তহস্তে দান করিতেন। এজন্য সাহেবেরা তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতেন। তিনি যে উইলে সাক্ষী, তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে আদালতে গ্রাহ্য হইল। দুইটি নিঃসহায়, হতভাগ্য বালক, অকূল-সমুদ্রে ভাসিল।

নরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরে যোগীন্দ্র ও রবীন্দ্রকে কলিকাতা হইতে আনা হইল। তাহারা পিতৃশোকে অস্থির হইয়া পড়িল। বিহারী তাঁহার স্ত্রী ও অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা চারুশীলাকে পূর্ব্বেই ঐ বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা যোগীন্দ্রের ও রবীর সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন; যোগীন্দ্র শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইল, তাহার বয়স তখন প্রায় দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। পিতার মৃত্যুতে যে তাহাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা সে উইলের কথা শুনিয়া কিছু কিছু বুঝিল। তাহাদের নবীন নামে একটি বহু পুরাতন ভৃত্য ছিল। সে যোগীন ও রবীনকে অতিশয় ভালবাসিত; বালকদ্বয়ও তাহাকে আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি করিত। বিহারী একদিন দেখিল, যোগীন নবীনের সহিত বসিয়া গোপনে কি কথা বলিতেছে। সে দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া শুনিতে পাইল যে, নবীন নরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে বিহারীকেই সন্দেহ করে। তাহার বিশ্বাস, উইল জাল। নরেন্দ্র বাবু, উইল করিবেন করিবেন মনে করিতেন, আবার বলিতেন এত শীঘ্র করিবারও কিছু প্রয়োজন নাই। নরেন্দ্র বাবু উইল করিবার কথা বলিলেই বিহারী কাঁদিত আর বলিত, তবে কি তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইবে? নরেন্দ্র বাবু হাসিতেন, কিন্তু পাছে বিহারীর মনে কষ্ট হয়, সেইজন্য উইল প্রস্তুত করেন নাই। উইল প্রস্তুত করিলে নিশ্চয়ই তিনি গবর্ণমেণ্টে জমা রাখিতেন। নবীন আরও বলিল তাহার বিশ্বাস, নীলকণ্ঠ বাবুর যোগে বিহারী বাবু উইল জাল করিয়া, অনাথ বালকদ্বয়কে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে। আরও যে বিহারী কি সর্ব্বনাশ করিবে, তাহা ভাবিলে তাহার শোণিত শুকাইয়া যায়। যোগীন

ভীত হইল, বলিল আমি, বিষয় চাহি না; নবীন দাদা তুমি আমাকে ও রবীকে লইয়া কোথায়ও পলাইয়া চল। তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে, পাছে বিহারী বিষয়ের লোভে রবীকে মারিয়া ফেলে; বাবা ও মা চলিয়া গিয়াছেন। রবী ছাড়া আমার আর কে আছে? নবীন বলিল ভয় নাই, ঈশ্বর আছেন। যাহার কেহ নাই, তাহার ঈশ্বর আছেন।

নরেন্দ্র বাবুর শ্রাদ্ধ খুব জাঁক জমকের সহিত হইয়া গেল। সকলে বলিল, বিহারী যথার্থ সুহৃদের মতই কাজ করিতেছে। কিসে নরেন্দ্র বাবুর নাম হইবে, তাহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে। সে ইচ্ছা করিলে, এই শ্রাদ্ধ হইতে দশ বিশ হাজার টাকা লইতে পারিত, কিন্তু একটি পয়সাও গ্রহণ করে নাই। নীলকণ্ঠ বাবু হইতেই লোকে তাহার এই সুখ্যাতির কথা জানিতে পারিয়াছে। নীলকণ্ঠ বাবু অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের দেহের দিকে তাকাইয়া বিহারীর নাম করিয়া বলিতেন "যত্রাকৃতি তত্র গুণা নিবসন্তি" এই মহাবাক্য কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? কে জানিত যে, বিহারীর শরীরে এত গুণ! না হইবে কেন, অমন সুন্দর আকৃতি যার, তাহার হৃদয় কি মহৎ না হইয়া পারে? যাহারা শুনিত, তাহারা ভাবিত, সত্যই ত তাহা না হইলে, নীলকণ্ঠ বাবু যাঁহাকে নরেন্দ্র বাবু এত উৎপীড়ন করিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই নরেন্দ্র বাবুর পুত্রদ্বয়ের জন্য এত করিবেন কেন? জগদীশ্বর জানেন কেন মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তল মানব চক্ষের অতীত।

শ্রাদ্ধের কিছুদিন পরে, বিহারী অনেকগুলি পুরাতন ভৃত্য ছাড়াইয়া দিয়া, ব্যয় কমাইলেন। নবীন, এইরূপে তাড়িত হইল। রবি তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। যোগীন তাই দেখিয়া বিহারীকে বলিলেন, নবীনকে ছাড়াইবার আবশ্যক নাই। বিহারী রূঢ় কথায় উত্তর দিলেন, এসব কথায় তাহার থাকিবার আবশ্যক নাই। যাহা তিনি ভাল বুঝিবেন, তাহা করিবেন। যোগীন্দ্র বড় ধীর ও নম্রস্বভাবের বালক, সে আর দ্বিরুক্তি করিল না। বুঝিল ক্রোরপতি হইয়াও আজ সে পথের ভিখারী।

নবীন সেই রাত্রিতে, ধীরে ধীরে যোগীনের শয়নকক্ষে আসিয়া বলিল, আমি চলিলাম, তুমি কোন ভয় করিও না, আমাকে তাড়াইল ভালই হইল, আমি অলক্ষিতে থাকিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিব। যখন তোমাদের কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, তখনই আমি উপস্থিত হইব। যোগীন তথাপি কাঁদিয়া আকুল হইল। কিন্তু কি করিবে, নবীনকে রাখিবার উপায় নাই দেখিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নবীন যখন চলিয়া যায়, যোগীন অতি কাতর-স্বরে বলিল, ভুলিও না নবীন দাদা, তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহ নাই।

পদ্মাপারে।

বিহারী মিরাটে থাকিয়া নরেন্দ্র বাবুর

ঐশ্বর্য্য ভোগ করা বড় সহজ হইবে না মনে করিয়া, সেই বাড়ী নীলকণ্ঠ বাবুর নিকট বিক্রয় করিয়া, তাহার স্বদেশে এক প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া, স্ত্রী মনোরমা ও কন্যা দুইটি লইয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিল। নরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর, তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার সময়, এই দ্বিতীয়া কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। মনোরমা তাহার নাম সুশীলা রাখিয়াছিল। দেশে প্রকাশ করিল, পশ্চিমে কমিসেরিয়েটে চাকুরি করিয়া সে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। সেই কথাই লোকে বিশ্বাস করিল। যাহার টাকা আছে, তাহার কথা কে অবিশ্বাস করিতে পারে?

বিহারীর ইচ্ছা ছিল, যোগীন ও রবিকে পশ্চিমেই কোন সহরে বিদায় করিয়া দিবেন; কিন্তু তাহার স্ত্রীর জন্য তাহা পারিলেন না। মনোরমা যোগীনকে বড়ই ভাল বাসিতেন;—বলিতেন যোগীন যদি তাহাদের স্বশ্রেণির কায়স্থ হইত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত চারুশীলার বিবাহ দিতেন। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, কায়স্থ সবই কি এক নয়? যোগীনের সহিত চারুশীলার বিবাহ হইতে পারে না? বিহারী বলিতেন তাও কি হয়, তাঁহা হইলে জাত যাইবে। মনোরমা হাসিয়া বলিল, যাহারা মুসলমানের সময় শ্রীমান্ ও শ্রীমতী ছাড়িয়া, বাবু ও বিবি সাজিয়াছিলেন; আজ আবার, ইংরাজের দেখাদেখি মিষ্টার ও মিসেস্ হইতেছেন, তাহাদের আবার জাত! আমি শুনিয়াছি আমাদের এ দেশের বামনদের সহিত ওদেশের বামনদের বিবাহ হয়, তবে কায়স্থদের হইবে না কেন?

বিহারী। এখন হইতে তোমাকে ন্যায় পঞ্চানন বলিব। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা কি অন্যথা হইতে পারে? যদি একা তোমার মেয়ে হয়, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। আমার মেয়ের বিবাহ আমি অজাতে দিব না।

বিহারীর গম্ভীর স্বর ও মুখে বিরক্তির ভাব প্রস্ফুট দেখিয়া, মনোরমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, তাহা আমি চেষ্টা করিলে হইবে কেন?

যখন মনোরমা বুঝিলেন যে, কিছুতেই স্বামীর মন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন তাহার শরীর ক্রমশঃ ক্লিষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। যোগীন ও রবীর মুখের দিকে তাকাইলেই, তাহার স্বামীর দুষ্ক্রিয়ার কথা স্মরণ হইত। উহারা "কাকীমা" বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত। যোগীন ও রবি, তাঁহার জন্য এত অবস্থা-বিপর্য্যয়েও কতক পরিমাণে সুখী ছিল। তিনি মায়ের ন্যায়, সেই অনাথ বালকদ্বয়কে ভালবাসিতেন। তাঁহার ভয়ে বিহারী তাহাদিগকে কোন উৎপীড়ন করিতে পারিতেন না।

মনোরমা দেখিতে দেখিতে মৃত্যুশয্যায় শুইলেন। চিকিৎসকে তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না, তিনি মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও স্বামীকে অনেক বুঝাইলেন, বিশ্বাসঘাতকের

কি শাস্তি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। বিহারী তাহার জন্য কাতর হইলেন, কিন্তু অর্থলোভ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না; বরং তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিয়া তিনি ঐ অনাথ বালকদ্বয়কে তাঁহার মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া তাহাদের উপর আরও বিরক্ত হইলেন।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, তিনি যোগীন ও চারুশীলাকে ডাকিলেন। আর সকলকে সেই ঘর হইতে সরাইয়া দিয়া, তিনি চারুশীলাকে' বলিলেন মা, তোমার পিতার যত বিষয়বৈভব সবই যোগীনের,—তুমি, আমি ও তোমার পিতা, যোগীনের কাছে অনন্ত অপরাধে অপরাধী। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য, আজ আমার মৃত্যু হইতেছে; কিন্তু আমার মৃত্যুতে কি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, যোগীন ছাড়া, আর অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। পিতা তোমার গুরু; আমি তোমার মা, আমিও তোমার গুরু। পিতার আর সব কথা শুনিও, আমার এই কথাটি রাখিও। মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায়, মনোরমার চৈতন্য প্রায়লোপ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি বালিকাকে কি ভীষণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন, তাহা তাঁহার বুঝিবার সামর্থ্য ছিল কি না সন্দেহ। তিনি জানিতেন, তাহার স্বামী বিষয়ের লোভে, যোগীনকে কোন্ দিন মারিয়া ফেলিবেন। যদি আপন কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে, বিষয় তাহার কন্যারই থাকিবে, সুতরাং আর নর-হত্যার প্রয়োজন হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি যোগীনের সহিত চারুশীলার বিবাহ দিতে এত উৎসুক হইয়াছিলেন। চারুশীলা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল, সে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু মায়ের সেই মৃত্যুকালীন কাতরোক্তি তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাড় নাড়িল। তখন মনোরমা যোগীনের হাত ধরিলেন; বলিলেন, বাছা যোগীন এখন তুমি আমার কথা শুনিলে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পাই। যোগীন এ কথা কখনও ভাবে নাই। সে সহসা উত্তর দিতে পারিল না। সেও কাঁদিতেছিল। হঠাৎ তাহার নবীন দাদার কথা মনে পড়িল; ভাবিল যে, আমার স্বজাতি নয়,—যে আমার পিতৃহন্তা, তাহার কন্যাকে বিবাহ করিব, কখনই নয়! মনোরমা তাহার মুখ দেখিয়া তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। তাহার এমনই একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। ভীত হইয়া যোগীন তাহার দিকে তাকাইয়া ভাবিল, অবশেষে আমিই মাতৃহন্তার পাতকে পাতকী হইলাম। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল, যদি কখনও বিবাহ করিতে হয়, চারুশীলাকেই বিবাহ করিব। আর কেহ কখনও আমার স্ত্রী হইবে না। যোগীনের এই কথায় মনোরমার মুখে নির্ব্বাণোন্মুখস্তিমিত প্রদীপের ন্যায় শেষ হাসি দেখা দিল। মনোরমা চারুর হাত ধরিয়া, যোগীনের

হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, এই তোমাদের বিবাহ। চারুকে বলিলেন, এ জীবনে যোগীনই তোমার স্বামী, এ কথা যেন ভুলিও না। এইরূপে মৃত্যুশয্যায় শয়ান মায়ের সম্মুখে, অশ্রুজলে বালক বালিকার বিবাহ হইল। যখন বালক বালিকার সংজ্ঞা হইল, তখন দেখিল, সব ফুরাইয়া গিয়াছে!

সেই ভীষণ রাত্রিতে, শ্মশান হইতে প্রত্যাগত হইয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক, আপন শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আজ সে যথার্থ স্নেহময়ী জননীহীন হইয়াছে। এ জগতে তাহার আর কে আছে! তাহার উপর আবার কি গুরুতর দায়িত্ব সে ইচ্ছা করিয়া আপন স্কন্ধে লইয়াছে। এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে সে অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিল, যেন তাহার পিতা নরেন্দ্র, আবার জীবিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আর সেই স্নেহময় শান্তমূর্ত্তি নাই, যেন ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধরিয়া, বেত লইয়া তাহাকে তাড়না করিতে করিতে বলিলেন,—"তুমি বিষয়ের লোভে পিতৃহন্তার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ, এই বেতের প্রহারে তোমার পিঠ ফাটাইয়া রক্ত বাহির করিব।" এই বলিয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। যোগীন তখন দেখিল, প্রহারকারী যেন নরেন্দ্র নহেন, যেন তিনি বিহারী হইয়া গিয়াছেন। যোগীন যেন প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিল যে, তাহার চীৎকারে সত্য সত্যই রবির ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে ভয়ে "দাদা" "দাদা" বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

যোগীন রবিকে তদবস্থ দেখিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া গেল। "ভয় নাই," "ভয় নাই" একটা কুস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম বলিয়া তাহাকে আবার ঘুম পাড়াইল। আর আপনি! তাহার চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না। সে, সেই অন্ধকার ঘরে, পিতার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেল।

পূর্ণিমার রাত্রি। পূর্ণশশী আপনার পূর্ণকল রূপের অতুল বৈভবে আপনি বিভোর হইয়া, অনন্ত আকাশে অনন্ত গতিতে মহা আনন্দে ছুটিয়াছেন। সে জ্যোৎস্নামাখা চাঁদের হাসি, আজ তাহার ভাল লাগিল না। গৃহমধ্যে, প্রগাঢ় মসীমাখা অন্ধকারে, পিতার যে রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, জ্যোৎস্নার আলোকে সে ভীতি বিদূরিত হইল। হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইল, ভাবিল, সত্য সত্যই কি পিতা রাগ করিয়াছেন? আমি ত ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হই নাই? আমি না সম্মত হইলে, কাকীমার মৃত্যুকালে বড়ই কষ্ট হইত। তিনি আমাদের এত ভালবাসিতেন, মায়ের মত যত্ন করিতেন। তিনি না থাকিলে, এত দিন ত আমাদিগকে মারিয়া ফেলিত! আমাদের কষ্ট দূর করিতে পারিলেন না বলিয়া যিনি স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা না রাখিলে কি

আমার পা। হইত না? পিতার অপমৃত্যু হইয়াছে, তাহার আত্মার কি গতি হয় নাই? তিনি এখনও কি পাপ-পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন? তাই কি তিনি আমার প্রতিজ্ঞার কথা জানিতে পারিয়াই আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিলেন? তবে কি আমি অন্যায় করিয়াছি? হে জগদীশ্বর! আমাকে সাহস ও সুমতি দাও। যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ত রাখিতে হইবে। হে পিতঃ, আমাকে রক্ষা কর। এইরূপ নানা চিন্তা, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল।

যোগীন সেইখানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইল, অদূরে জটাজুটধারী একজন সন্ন্যাসী। তাহার মনে হইল সে এখনও স্বপ্ন দেখিতেছে। হঠাৎ সন্ন্যাসী সেখানে কোথা হইতে আসিবে! সন্ন্যাসী তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিলেন। সুতরাং আর সন্দেহের কোন কারণ রহিল না। তখন, নিশ্চয় বুঝিয়া ধীরপাদ-বিক্ষেপে ভয়ত্রস্ত বালক, সন্ন্যাসীর নিকট গেল। সন্ন্যাসী তাহার হাত দেখিয়া বলিলেন, "তোমার নাম যোগীন, তুমি নরেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ-পুত্র। তোমার মন এখন কোন বিষম সন্দেহে আকুলিত।" সন্ন্যাসী আরও বলিলেন, "তোমার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষার সময় আসিতেছে। সাবধান, নহিলে চিরকালের মত ডুবিবে।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বালক আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অজানিত সন্ন্যাসী কি করিয়া আমার মনের কথা জানিলেন, কি করিয়াই বা আমার নাম ও আমার পিতার নাম জানিলেন? নিশ্চই কোন সিদ্ধপুরুষ আমার মনের অবস্থা জানিয়া আমাকে সৎপথ দেখাইবার জন্য আসিয়াছেন। বালক, সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আপনি যথার্থ ই বলিয়াছেন, আমার হৃদয়ে সংশয়ের ঝড় বহিতেছে, এই বলিয়া সেই দিনের সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিল। সন্ন্যাসী শুনিয়া বলিলেন, তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ভাল কর নাই। যে পিতৃহন্তা, তাহার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিতে পার না; বিশেষতঃ তোমরা এক জাতিও নও। তুমি যে তোমার পিতার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াছ, উহা একবারে স্বপ্ন নয়, ইহার অর্থ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। সন্ন্যাসী আরও বলিলেন, "যিনি মৃত্যুশয্যায় তোমাকে এই ভীষণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া গিয়াছেন, তিনি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইলেও অন্যায় করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, যদি বিহারী, চারুশীলার অন্যত্র বিবাহ না দেন, তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। না হইলে, মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য, অনন্তপাপে কলুষিত হইতে হইবে। এ দিকে পিতৃহন্তার কন্যাকে বিবাহ করিয়াও তোমাকে পাপী হইতে হইবে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ পাপ গুরুতর, আমি গুরুদেবের নিকট জানিয়া, তোমাকে বলিয়া যাইব। এখন তুমি সাবধানে থাকিবে।" মনোরমা তোমাদের একদিন রক্ষা করিয়া-

ছেন, তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন ; এখন কে তোমাদের রক্ষা করিবে ? ভগবান্‌কে ডাক, তিনিই অনাথের সহায়।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল। সুশীলা "মা কোথায়" "মা কোথায়" করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল। চারুশীলাও কাঁদিল ; কিন্তু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া সুশীলাকে নানারকমে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুশীলা কাহারও কথা শুনিল না, আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। রবি ছল ছল চক্ষে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে কোলে করিয়া বলিল, মা গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। কেঁদো না ; তাহা হইলে মা রাগ করিয়া আর আসিবেন না। মা, কা'ল সকালে আসিবেন। হে জগদীশ্বর, তুমিই জান, কেন এই ক্ষুদ্র বালিকার এত যন্ত্রণা।

প্রত্যহ সকালে উঠিয়া সুশীলা রবি দাদাকে জিজ্ঞাসা করে, আমিত আর কাঁদি না, তবে মা আসেন না কেন ? কখনও রাগ করিয়া বলে, এবার মা আসিলে, আমি মার সঙ্গে কথা কহিব না। রবি দাদা তোমার ঘরেই শুইব। মার কাছে আর শুইব না।

মনোরমার মৃত্যুর তিন মাস পরে, বিহারী আবার বিবাহ করিলেন। যে দিন তাহার নূতন স্ত্রী প্রফুল্ল-গোলাপ, ঘরে আসিলেন, সে দিন চারুশীলার বড়ই কষ্ট হইল। হৃদয় যেন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু পাছে, চক্ষে জল আসিলে অন্য লোকে কিছু বলে, এই ভয়ে সে, সেই অবস্থায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। যোগীন তাহার হৃদয় বেদনা বুঝিল ; কিন্তু, বলিতে পারিল না। একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়াছিল, তাহাতেই বালিকার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গিয়াছিল।

সুশীলা আজ যথার্থই সুখী। সে শুনিয়াছে, আজ নিশ্চয়ই মা গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিবেন। রবি দাদাকে সে সে কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কখন সন্ধ্যা হইবে, কখন মাকে লইয়া বাবা বাড়ী আসিবেন। পূর্ব্ব দিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বর ক'নে বাড়ী আসিবেন। আজ সকালেই কেন সন্ধ্যা হইল না। আজ কেন তাহাদের বাড়ীটা গঙ্গাতীরের দিকে সরিয়া গেল না। এখন একবার সন্ধ্যা হউক, তাহার পর, আবার না হয় বেলা হইবে। এখন যদি রবি দাদা সন্ধ্যা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে এত ভাল বাসিব যে, আর কাহাকেও তত ভাল বাসিব না। মাকেও না,—বাবাকেও না। এইরূপ কত কথা। রবি দাদার কোলে বসিয়া হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তার পর, সত্য সত্যই সন্ধ্যা আসিল। বাজনা বাজিল, সুশীলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে সেই বাজনার ধ্বনি যে কি এক স্বর্গীয় আনন্দের আলয় করিয়া তুলিল! ক্ষুদ্র বালিকার আনন্দে, এখন যোগীন, রবি এমন কি, চারুশীলাও একটু উৎফুল্ল হইল। নব বধূ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া, ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুশীলা দৌড়িয়া যাইয়া, তাঁহার

কোলে উঠিয়া তাঁহার ঘোমটা টানিয়া দিল। ঘোমটা টানিয়া দিয়াই তাহার সেই হাসির তরঙ্গ যেন বিষাদে লুকাইয়া গেল। সে তাহার কোল হইতে মাটিতে নামিল, বলিল, এ কেন আমার মা হবে, এ যে ছোট ; এই বলিয়া বালিকা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সকলে বলিল, গঙ্গাস্নানে গেলে মা ছোট হইয়া যায়, আবার বড় হইবে। এ কথায় বালিকা আশায় বুক বাঁধিল ; কিন্তু তাহার মুখের কাতরতা গেল না। বালিকা যে বলিয়াছিল, মা ও বাবার চেয়ে রবি দাদাকে অধিক ভাল বাসিবে, তাহার সেই কথা রহিয়া গেল। সে নূতন মা পাইল, কিন্তু তাহাকে ভাল বাসিতে পারিল না। সেই দিন রাত্রিতে শুইয়া গল্প শুনিতে শুনিতে সুনীলা জিজ্ঞাসা করিল "রবি দাদা, আমার মা কি তোমার মার কাছে গিয়াছেন ? আমরা কি করিয়াছি যে, রবি দাদা তাঁহারা চলিয়া গেলেন ? গল্পের মায়ের মতন আমাদের মারা কি আর ফিরিয়া আসিবে ? না আসেন, আমরা গল্পের মেয়েদের মতন কি তাহাদের কাছে চলিয়া যাইতে পারি না ? সে দেশে কি যাওয়া যায় না রবি দাদা ? রবি গল্প বলিতে বলিতে গল্প শুনিতে শুনিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। বালিকা কিছুক্ষণ উত্তর প্রত্যাশায় চুপ করিয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বিবাহের পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। প্রফুল্লগোলাপ, দরিদ্রের কুটীর হইতে আসিয়া রাজপ্রাসাদ আলো করিয়া বসিয়াছেন। তাহার ধারণা, সমস্ত জগৎ তাহার সুখের জন্য। বিহারী তাহার আজ্ঞাকারী ভৃত্যমাত্র। কত সুন্দর জিনিসে ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন, বিহারী সেই সুন্দর জিনিসের মধ্যে একটি। চারুশীলা, যোগীন ও রবিকে তিনি চাকরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। একটু ত্রুটি হইলেই বিহারীকে দিয়া যোগীন ও রবিকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেন। বিহারী, যোগীনকে এক এক দিন এমনই বেত্রাঘাত করেন যে, তাহার পিঠ কাটিয়া রক্ত বাহির হয়। একদিন এইরূপ প্রহার করিতে করিতে, বিহারী উন্মত্তপ্রায় উঠিয়া বলিলেন, আজ উহাকে মারিয়া ফেলিব। এত প্রহারেও কি উহার চৈতন্য হইল না ? যোগীন নিশ্চল হইয়া মার খাইতেছিলেন। তাঁহার দোষ, তিনি সে দিন গোহাল পরিষ্কার করা হইয়াছে কি না, গরুর খাবার দেওয়া হইয়াছে কি না, না দেখিয়া তাস খেলিতে গিয়াছিলেন। দেখিবার জন্য রবিকে বলিয়াগিয়াছিলেন, পাছে সে কথা জানিতে পারিলে, রবি মার খায়, সেই ভয়ে যোগীন কিছু না বলিয়া দাঁড়াইয়া বেত্রাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। রবি তাহার অবস্থা দেখিয়া, প্রথমে ভয়ে সরিয়া গিয়াছিল, পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, দাদা রোজ নিজ হাতে গোহাল পরিষ্কার করে, গরুর খড় কাটে, একদিন করে নাই,—তা তোমার কি চাকর নাই ? আমরা আর তোমার বাড়ীতে থাকিব না। তুমি দাদাকে মারিয়া

ফেল, আমাকেও একবারে মারিয়া ফেল। যেই রবি এই কথা বলিল, অমনি বিহারী আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া, তাহাকেও সজোরে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিলেন। উভয়ে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল; তথাপি বিহারী নিবৃত্ত হইল না। প্রফুল্লগোলাপ রূপে, প্রফুল্লগোলাপ হইলেও হৃদয়ে পাষাণ,—কিছুতেই দয়া হইল না। তাহার ইচ্ছা, এই আপদ দুইটা কোন রকমে দূর হইলেই হয়। গোল শুনিয়া, চারু ও সুশীলা সেইখানে দৌড়াইয়া আসিয়া বাবা গো! মেরে ফেল না, বলিয়া তাহার হাতের বেত ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু, কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া উভয়েই বালকদ্বয়ের দেহের উপর পড়িয়া, নিজে বেত খাইয়া, তাহাদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। বিহারী বেত মারিয়াও দুইটি বালিকাকে সরাইতে পারিলেন না, তাহাদের আর্ত্তনাদে তাহার চৈতন্য হইল। তিনি বেত ফেলিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

চারিটি বালকবালিকা সেই খানে পড়িয়া প্রহারের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

বিহারী সরিয়া গেলে, একজন চাকর আসিয়া যোগীন ও রবিকে তুলিয়া লইয়া গেল। চারু ও সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের ঘরে গেল। যোগীন যখনই মার খাইত, তখনই সেই স্বপ্নের কথা ও সন্ন্যাসীর কথা মনে করিত। সন্ন্যাসীর সন্ধান করিত; কিন্তু, আর কখনও তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ প্রহারে তাহার সর্ব্বশরীর ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে; তাহার উপর আবার রবির প্রহার; আবার তাহাদের রক্ষা করিতে যাইয়া দুইটি ক্ষুদ্র শক্তিহীনা বালিকা প্রহারিত। কই এত লোকজন কেহ ত আসিল না। বালিকা দু'টি আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়াও, তাহাদের রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছে। যোগীন ভাবিল, এ সংসারে যাহার মা নাই, তাহার কেহই নাই। যদি মা থাকিতেন, তাহা হইলে কি এই দুইটি বালিকা, এইরূপে প্রহারিত হইত? হে ঈশ্বর! পাপ করিয়া থাকি, আমাকে শাস্তি দেও, আমি আর রবির এ যন্ত্রণা চক্ষে দেখিতে পারি না। সেই দিন অবধি, যোগীন গরুর সমস্ত কাজ নিজের হাতে করিত। কোন চাকরের অপেক্ষা রাখিত না। যোগীন সেই দিন হইতে আর কখনও খেলিত না। বিহারী যাহা করিতে বলিতেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই করিত। যতটা পড়া দিতেন, রাত্রি জাগিয়া তাহা পাঠ করিত। রবিকে যে কাজের ভার দিতেন, যোগীন তাহাও করিত। বিহারী তাহাকে মারিবার ছল পাইতেন না, কিন্তু রবি, তাহার কথা শুনিত না, সে প্রায়ই মার খাইত। তাহাকে মারিলে চারুশীলা ও সুশীলা দৌড়িয়া যাইয়া আপন শরীর দ্বারা, তাহাদিগকে এমনই আবরণ করিয়া রাখিত যে, বিহারী আর মারিতে পারিতেন না।

যোগীন ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতেন। রাত্রি জাগিয়া লেখা পড়া করিতেন। সেই গ্রামস্থিত স্কুলের একজন গণনীয় ছাত্র

ছিলেন। কিন্তু, রবি যে দিন মার খায়, সে দিন আর লেখা পড়ায় মন দেয় না। বিহারীকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে; তাহাও সে প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। প্রহারকে সে আর কিছুমাত্র ভয় করে না। সে এত দিন পলাইয়া যাইত; কেবল যোগীন, চারুশীলা ও সুশীলাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সে এক এক দিন রাগ করিয়া ভাত খায় না, কি অন্য কোন বাড়ী হইতে খাইয়া আইসে। সেদিন চারু ও সুশীলার খাওয়া হয় না। চারু ও সুশীলা উভয়েই তাহাকে এত ভাল বাসে যে, বিহারীর নিকটে আর যায় না। সে প্রফুল্ল গোলাপকে এই প্রহারের কারণ মনে করিয়া, আর তাহাকে মা বলে না। তাহার নিকটে পারত পক্ষে, আর যায় না। চারু ঠিক তাহার বিপরীত। পাছে, গোলাপ কিছু মনে করেন, এই জন্য মা মা করিয়া তাঁহাকে এমনই ভাবে যত্ন করে যে, সেই পাষাণ-প্রতিমাও তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। সে পিতার নিকটে রবির জন্য এমনই কাতরভাবে ক্ষমা চায় যে, তিনি অনেক সময়, তাহার জন্য রবিকে মারিতে পারেন না। রবি যাহা পড়ে, সেও তাহাই পড়িত। সে পড়া দিবার সময় রবির নিকটে থাকিয়া এমনই অলক্ষিতভাবে তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিত যে, বিহারী কিছুই জানিতে পারিত না। এখন সে বড় হইয়াছে। সংসারের প্রায় সমস্ত কাজ সে করিত;—রাঁধিত। সকলকে খাওয়াইত; আবার যোগীনের সাহায্য করিবার জন্য বাহিরের সমস্ত কাজও নিজে করিত। প্রফুল্ল তাহাকে ভালবাসিতেন বলিয়াই হউক, কি সংসারের সমস্ত কাজ করিত বলিয়াই হউক, বিহারী তাহার কথা একবারে ফেলিতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স প্রায় তের বৎসর হইয়াছিল। প্রফুল্ল এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহের কথায় বড় একটা মন দিতেন না। তাহার বিবাহ হইলে, ঘরে রান্না করিবে কে? পল্লীগ্রামে যত বড় গৃহস্থ হউক না কেন, সেখানে রন্ধনশালা বাড়ীর মেয়েদের তত্ত্বাবধানে। তাহার উপর, ভাঁড়ার চারুশীলার জিম্বা। সে, সমস্ত বাজারের হিসাবপত্রও রাখিত। প্রফুল্লের একটি পয়সা অপব্যয় হইত না; অথচ নিজের কিছুই দেখিতে হইত না। এমন বিশ্বাসী অথচ কর্ম্মক্ষম দাসী আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সে বাড়ীর সকলেই, চারুকে ভালবাসিত; ভৃত্যেরা তাহাকে মা অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিত। এই বয়সেই, তাহার সমস্ত শরীর যেন সৌন্দর্য্যে উছলিয়া উঠিতেছিল, সে সৌন্দর্য্যে, বিলাসিতার কোন লক্ষণ ছিল না,—গর্ব্বের কোন লক্ষণ ছিল না। সে যেন দেবী-প্রতিমার সৌন্দর্য্য। কেন জানি না, লোকে আপনা হইতেই তাহাকে মা ভগবতী, মা অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিত।

চারু এমন ধীর আদরমাখা ভাবে যোগীন ও রবিকে যত্ন করিত যে, যোগীন আর তাহাকে আপনার পিতৃহন্তার কন্যা বলিয়া মনে করিতে পারিত না। সে সেই

স্বপ্নের কথা ও সন্ন্যাসীর কথা, প্রায় ভুলিয়াছে। এক এক দিন মনে করে, বিহারীর নিকটে মনোরমার মৃত্যুকালীন আদেশ জানাইয়া, চারুকে বিবাহ করিবার কথা বলিবে; আবার ভাবে, তাহা হইলে এ বাড়ীতে এরূপ ভৃত্যভাবেই বা থাকিবে কি করিয়া? কাকীমা জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে বলিতে পারিতেন। আমি লজ্জার মাথা খাইয়া কি করিয়া বলিব? এইরূপ চিন্তা মনে উদিত হইলে, তাঁহার বাক্যস্ফুরণ বন্ধ হইয়া যাইত। বলি বলি মনে করিয়াও, বিহারীকে বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক পবিত্রতা, এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন কথাই চারুকে বলিতে দেয় নাই। চারুও সেই ভীষণ রাত্রির কথা তাঁহাকে কখনও কিছু বলেন নাই। যোগীন কখনও কখনও মনে করিতেন যে, হয়ত চারু সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু, লজ্জায় ও ভয়ে সে কথা কখনও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না।

আজ মালখাঁনগরে বোসেদের বাড়ী হইতে চারুশীলার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে। বিহারী পূর্ব্বে শূদ্র বলিয়া দেশে ঘৃণিত ছিলেন। কিন্তু, এখন তিনি ক্রোরপতি, তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য অনেক কুলীন লালায়িত। পূর্ব্ববঙ্গে মালখাঁনগরে বোসেদের মত কুলীন আর নাই। সেই সর্ব্বোচ্চবংশে সম্বন্ধ, বিহারীর ন্যায় ক্রোরপতিরও অপ্রার্থনীয় হইল না। বিহারী সম্মত হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল।

দার্শনিক মতের সমন্বয়।

(৫)

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শন জাগতিক এই বিশাল পরিবর্ত্তন-প্রবাহের প্রায় একইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; এবং তিনদর্শনেই এই পরিবর্ত্তনপ্রবাহকে অনিত্য, অসার বা Relative বা Conditional বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। এই স্থানে ভারতীয় দর্শনের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব; এবং এইস্থানে ত্রিবিধ দর্শনের একতা। বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে যে নানাবিধ পরিবর্ত্তন-প্রবাহ নিয়ত সঙ্ঘটিত হইয়া চলিয়াছে, সেগুলি অনিত্য ও Conditional; কাজেই ইহাদের Relativity খ্যাপন করাই মানবের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র সম্বন্ধজ্ঞানের উপরেই ইহারা নির্ভর করিয়া আছে, এই তত্ত্ব মানব দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিলেই, ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে। এই তত্ত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, মুক্তি বা নির্ব্বাণ উপস্থিত হইবে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, এই প্রবাহের সম্বন্ধাত্মকতা (Relativity)

খ্যাপন করিতে গিয়া, বৌদ্ধদর্শন যেরূপ কৃত-কার্য্যতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, এরূপ অন্য দর্শনে পারে নাই। এ অংশে বৌদ্ধ-প্রণালীই শ্রেষ্ঠ। মাধ্যমিকদর্শনে, সমস্ত বস্তু বা গুণ-গুলি যে কেবল সম্বন্ধের উপরেই নির্ভর করে, ইহাদের যে প্রকৃত বস্তুত্ব (Individuality) নাই,—তাহা বড়ই আশ্চর্য্য রূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইউরোপীয় দর্শনেও যে জ্ঞানমাত্রেরই এই Relativity প্রখ্যাপিত হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রণালী আমাদের নিকটে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই বোধ হয়।

বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়েই, বাহ্যিক ও আন্তরিক ক্রিয়াগুলির প্রায় একই মূলকারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক নিত্য প্রকৃতি বা শক্তি, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যেমন বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বোধ জন্মাইয়াছে, তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া, আবার শব্দস্পর্শাদিরও বোধ করাইয়াছে। সুতরাং এইভাবে, বিষয় ও বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, মূলতঃ একই পদার্থের পরিবর্ত্তিত আকারমাত্র। একই মূলপদার্থের গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপে সংস্থান-ভেদ মাত্র। অতএব বাহিরে যাহাকে পদার্থের গুণরূপে ("Properties বা Qualities) বলা যাইতেছে তাহা, এবং আন্তরিক বৃত্তি বা Ideas গুলি, একই পদার্থ। কাজেই আন্তরিক ইন্দ্রিয়-শক্তি ও Ideas গুলির তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই, বাহ্য-গুণগুলিরও তত্ত্ব বুঝা যাইবে। এ স্থলেও ইউরোপীয় দর্শনের সহিত হিন্দু-দর্শনের সমতা আছে। "Properties are subjective modifications of an unknown cause" জীবের ইন্দ্রিয়শক্তি ও অন্তঃকরণ এমনি আশ্চর্য্য যে, যাহা বাহিরে ক্রিয়ামাত্ররূপে অবস্থিত, তাহাই, উহাদের প্রভাবে অন্তরে শব্দস্পর্শাদিজ্ঞানরূপে প্রতিভাত। এ তত্ত্ব দার্শনিক Kant অতি চমৎকার ও পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। Herbert Spencerও এ কথা অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন। "All motions are thoughts." যে শক্তিতে বা বলে বা Vibratary-motion এ, বাহিরে বৃক্ষ ভাঙ্গিতেছে, প্রদীপ নিবাইতেছে,—তাহাই চক্ষুতে রূপরূপে, স্পর্শে তাপরূপে ও কর্ণে শব্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে। বাহ্যিক ক্রিয়া বা গুণগুলি এইরূপে নিয়ত শব্দস্পর্শ রূপরসাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া আসিতেছে।

শুধু কি তাই? কেবল কি বাহ্যিক-পরিবর্ত্তনক্রিয়াগুলি, শব্দস্পর্শাদির বোধ জন্মাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছে? ইহারা সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষাদি উত্তেজিত করাইয়া, সুখদুঃখকররূপেও প্রতিভাত হইতেছে। শুধু কি তাই? যাহা সুখকররূপে বুঝা যাইতেছে, আবার তাহা পাইবার জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবৃত্ত হইতেছে; এবং যাহা দুঃখকররূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা পরিহারের জন্য, আমরা ক্রিয়াশীল হইতেছি। এইরূপে অন্তরে ও বাহিরে এক মহাসম্বন্ধ-স্রোত প্রবাহিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। এই কারণে, সম্বন্ধজ্ঞানই বস্তুজ্ঞানের

মূলভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই আন্তরিক Ideas গুলির তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিলেই, বাহ্যক্রিয়ার তত্ত্বও বুঝা যাইতে পারে। অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়পথে যেরূপ অবগুণ্ঠন পরিয়া, বাহ্যিক ক্রিয়াগুলিকে আবৃত করে, আমরা বাহ্য ক্রিয়াগুলিকে তদ্রূপ অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত বলিয়া বুঝিতে পারি। এই জন্যই "বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থে" অন্তঃকরণবৃত্তি ও বিষয়কে একই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়পথ দিয়া বাহির হইয়া, বস্তুতে যাদৃশ আকার প্রদান করে, বস্তুতঃ তাদৃশ আকারে আকারিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন বস্তুস্বরূপ বোধের আমাদের আর অন্য উপায় নাই। দর্শনশক্তি উঠাইয়া দেও, রূপ অন্তর্হিত হইবে। স্পর্শশক্তি লোপ করিয়া দাও, আকার বা Extension ও অন্তর্হিত হইবে। বাহিরে বিশেষ বিশেষ দেশে ক্রিয়া হইতেছে; কিন্তু অন্তঃকরণ, সেই ক্রিয়াগুলির উপরে আকার প্রদান করিতেছে। এই আকারই আমাদের নিকটে রূপরস-গন্ধাদি নামে পরিচিত। এই জন্যই বিষয় ও ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণশক্তি এক ও অভিন্ন বলিয়া, বেদান্ত ও সাংখ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৌদ্ধদর্শনেরও এইরূপই সিদ্ধান্ত। তবে বৌদ্ধের প্রণালীটি এতদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। সম্বন্ধ জ্ঞানই যে, বস্তু বুঝিবার একমাত্র উপায়, তাহা এই দর্শনে অতি সুন্দররূপে বুঝান হইয়াছে। বৃক্ষটিকে যে, "বৃক্ষ"রূপে বুঝিতেছ, ইহার মূল কোথায়? ইহার মূল, বৌদ্ধ মতে, কতকগুলি সম্বন্ধ বা Relation এর উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গুণ-গুণীর সম্বন্ধ, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, কাল-দেশ সম্বন্ধ, —ইত্যাদি সম্বন্ধ জ্ঞানই বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। অতএব যাহা গুণের খেলামাত্র, যাহা সম্বন্ধজনিত প্রত্যয়মাত্র; তাহা অনিত্য, তাহা কেবল পরিবর্ত্তন প্রবাহমাত্র। ইহা কেবলই পরিবর্ত্তনের স্রোত; প্রকৃত "ব্যক্তিত্ব" (Individuality) জগতে কোথাও নাই। যাহাকে "ব্যক্তি" বলিতেছ, তাহা বিশেষ দেশ বা কালে বিধৃত, কতকগুলি সম্বন্ধসমষ্টি মাত্র। কেবল গুণ বা সম্বন্ধই, জগতে, নানাভাবে, নানা পদার্থরূপে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বস্তুর স্বরূপই এই প্রকার। বৃক্ষে যে আকার, বিস্তার, দৈর্ঘ্য, বর্ণ, রস প্রভৃতি দেখিতেছ, উহারা, গো, অশ্ব, মনুষ্যেও আছে;—কেবল অবস্থাভেদ মাত্র। বৃক্ষে যে ভাবে উহারা আছে, অশ্বে সে ভাবে নাই, এইটুকু মাত্র প্রভেদ। তবেই ভাবে মাত্র—অবস্থায় মাত্র—মনুষ্য, বৃক্ষ হইতে পৃথক্। সুতরাং বিশেষ বিশেষ ভাব বা সম্বন্ধই, পার্থক্যের ভিত্তি। যাহার পার্থক্য সম্বন্ধজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহার আবার প্রকৃত-পার্থক্য কোথায়? সমস্তই, গুণ বা সম্বন্ধরাশির প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন বা ক্রিয়াপ্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নাহে। যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার আবার নিত্যত্ব কিসের?—তাহার আবার ব্যক্তিত্ব কৈ? আমাতে গুণগুলি অন্য যে ভাবে দেখা

দিয়াছে, তাহাতে আমাকে "রাম" বলিয়া বুঝিতেছ বটে; কিন্তু এই আমাকেই আবার, অন্য সময়ে বা পর-জন্মে,—যখন এই গুণগুলিই অন্যভাবে দেখা দিবে, তখন—এই আমাকেই তুমি "শ্যাম" বলিয়া মনে করিয়া লইবে। তবেই দেখ, রাম ও শ্যামে বাস্তবিক পার্থক্য কি থাকিল? গুণগুলি যখন যে সংস্থান ধারণ করে, সেই সংস্থানই প্রার্থক্যের হেতু। এই গুণগুলি আর কিছুই নহে; কতকগুলি সম্বন্ধ বা মানসিক Ideas মাত্র। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ-ধৃত এই গুলিই নানাভাবে দেখা দিতেছে।

অতএব অন্তঃকরণের এই Ideas গুলিকে তুমি নিজে যে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারিবে, তোমার বস্তুজ্ঞানও সেই সেই ভাবে পরিণত হইয়া যাইবে। তখন আর এই ভাবের সুখ, দুঃখ, রূপ, রস, গন্ধাদি তোমার মনে পীড়া দিতে পারিবে না। পাতঞ্জল, সাংখ্যদর্শনের একটি অঙ্গস্বরূপ। তাহাতে, এক সংস্কারের দ্বারা, অন্য সংস্কারের অভিভব করিবার উপদেশ আছে। তাহারও অর্থ ইহাই। এতদ্দ্বারা আমরা এ কথা বুঝিতেছি না যে, শব্দ-স্পর্শাদির একান্ত বিলোপ বা ধ্বংসের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। আমরা বুঝিতেছি যে, ইহাদের বর্ত্তমান আকারের উচ্ছেদ করিতে হইবে। যে ভাবে উহাদিগকে চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি, তাহা উল্‌টাইয়া দিতে হইবে। ইহাই মুক্তি, ইহাই বৌদ্ধের নির্ব্বাণবাদ। এই নির্ব্বাণ বা শূন্যবাদের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহাতে বেদান্ত ও সাংখ্যের কোন বিরোধ নাই। বেদান্তও সাংখ্যেও, বর্ত্তমান সংস্কারকে মুছিয়া ফেলিবার উপদেশ দিয়াছেন। যাহা ঐন্দ্রিয়িক অর্জ্জিতজ্ঞান, তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এ তত্ত্ব আরও বিশদ করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা বারান্তরে বলিব। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ।

যশোগান।

নীল-নভঃ প্রাঙ্গন-গায়
কেরে অই ফিরে ফিরে চায়,
করুণ-নয়ন কার,
জাগে তিমিরে—জাগে তিমিরে?

দিব্য চন্দ্র রাজে ভালে,
সুহাসে কি যেন সুধা ঢালে,
শান্ত কিরণ-করে,
ডাকে কাহারে—ডাকে কাহারে?

ফুল্ল কুসুমিত রজনী,
শস্য শ্যামায়িত ধরণী—
শ্যামা ধরণী—
কাহার চরণ পানে,
চাহে কাতরে—চাহে কাতরে?

সুর-সরিত-শোভা-অঙ্গে
কা'র করাঙ্কিত মাতর্গঙ্গে,
কাহার উৎস ধবল অঙ্কে,
মধু বিথারে—মধু বিথারে?

শ্রীঃ——

সাহিত্যপ্রসঙ্গ।

বসন্তের রাণী। *

"বসন্তের রাণী" এ নামটি বড় সুন্দর। এই প্রকারের নামই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আদরের ধন। বাঙ্গালি উপন্যাস লিখিতে শিখিয়াছে স্কট, লিটন ও ডুমা প্রভৃতির উপন্যাস পড়িয়া; এবং বসন্তের রাণী, অথবা প্রেমের রাজ্ঞী প্রভৃতি শ্রুতিমধুর নামে বঙ্গীয় বাল-যুবতীদিগকে অভিহিত করিতেও শিখিয়াছে ইংরেজী উপন্যাসের আশ্রয় লইয়া। যাহা হউক, পুস্তকের নামটি যে নিতান্ত মধুর ভাবের উদ্বোধক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু যিনি এ উপন্যাস-কাব্যের প্রকৃত নায়িকা, তিনি এ নামে অভিহিত হন নাই। এ নাম যাঁহার উপাধি, অথবা আদর-সূচক সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তিনি এ উপন্যাসের কোথায় অবস্থিত, তাহা পাঠক পরে জানিতে পাইবেন। উপন্যাসের সার বৃত্তান্ত এই;——

অশোকপুরের জমিদার বাবু ঘনশ্যাম বসু, কিছুকাল হয়, লোকান্তরিত হইয়াছেন। ঘনশ্যাম ধনে মানে যেমন সমৃদ্ধ, পুরুষকার, পরোপকার-প্রিয়তা ও দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণরাজির জন্যও সেইরূপ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম নীলাম্বর, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল। দুই-ই সুদর্শন, সুশীল ও সুকুমার-স্বভাব। জ্যেষ্ঠ নীলাম্বর কলিকাতায় সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এম্‌. এ উপাধি পাইয়াছেন; কনিষ্ঠ বিনোদলাল, বাড়ীতে থাকিয়া, খেলাবেড়ার সহিত সামান্য লেখাপড়া করিয়া, শিশুসমুচিত সুখ-সোহাগে দিন-যাপন করিতেছে। ঘন-

* শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৪১নং সুকীয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্যামের গৃহিণী সধবা অবস্থায়ই স্বর্গগত হইয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার বিয়োগের পর হইতেই ঘরের কর্ত্রী পুত্রবধূ,—পুত্র নীলাম্বরের প্রাণাধিকা অনঙ্গমোহিনী। অনঙ্গমোহিনী, অতি মধুরাকৃতি নবযুবতী হইয়াও, তেজস্বিনী রমণী; এবং জীবনের উন্মেষ-সময়েই, বুদ্ধির ধীর-গাম্ভীর্য্যে, গৃহের উপযুক্ত অধিস্বামিনী।

বিনোদলাল বালক, তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই। ভ্রাতৃবধূ অনঙ্গই তাহাকে মায়ের প্রাণে ভালবাসেন; এবং জননি-মায়ের মত শত আদরে লালন-পালন করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ জমিদার ঘনশ্যামের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তিনি কাহার হাতে পুত্র দুটি ও পুত্রবধূর পরিরক্ষণ এবং তদীয় বিশাল ভূসম্পত্তি সমবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া যাইবেন, এই ভাবনায় বড় আকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার এক বিশ্বস্ত সুহৃৎ ছিলেন, তাঁহার নাম বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। বিনয়কৃষ্ণ সৎকুলীন ভদ্রলোকের ছেলে,—অতি সদাশয় পুরুষ;—শান্ত, সুবিনীত, প্রীতচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ। বিনয়কৃষ্ণ এক সময়ে অর্থবিত্তেও সমৃদ্ধিশালী ছিলেন; কিন্তু এইক্ষণ তাঁহার সে অবস্থা নাই। তিনি তথাপি স্বভাবতঃ পর-হিতৈষী;- আপনি প্রাণে মরিতে প্রস্তুত, তথাপি পরের প্রাণে আঘাত করিতে অসম্মত। এই সকল এবং আরও বহুবিধ কারণে, বিনয়কৃষ্ণ এক দিকে যেমন ঘনশ্যামের একান্ত প্রীতিভাজন সুহৃৎ, আর এক দিকে তেমন তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী। গুণমুগ্ধ ঘনশ্যাম, বস্তুতঃই বিনয়-কৃষ্ণকে আপনার ভাইটির মত জানিতেন, এবং ভ্রাতৃস্নেহের নির্ভর-বিশ্বাসে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। ঘনশ্যাম এক উইলের দ্বারা বিনয়কৃষ্ণের উপরেই সমস্ত ভার সঁপিয়া যান, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলাম্বর উপযুক্ত ও কার্য্যানুরক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, বিনয়কৃষ্ণই সমস্ত বিষয়ে কর্তৃত্ব করিবেন, এই ব্যবস্থা করিয়া জীবনের চরম সময়ে নিশ্চিন্ত হন।

কিন্তু ঘনশ্যামের এ সাধুসংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। ঘনশ্যামের সংসারে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারী ছিল। তাহার নাম গোবর্দ্ধন ঘোষাল। গোবর্দ্ধন প্রথম বয়সে পাটওয়ারি শ্রেণীর লোক ছিল,—পাঁচ প্রকার নীচবৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাপন করিত; এবং জীবিকার জন্য, অতি বড় জঘন্য ও গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানেও সতত অগ্রসর রহিত। সে তাহার কূটবুদ্ধির কুটিল নীতিতে ক্রমে বাড়িয়াছে, এবং এখন ঘনশ্যামের সংসারে একজন গণ্যমান্য বড় কর্ম্মচারী হইয়া বসিয়াছে। ফলতঃ, গোবর্দ্ধন 'সর্ব্বনেশে' সয়তান,—বাহিরে তিলক, ফোঁটা ও নাকি সুরে ধর্ম্মকথা লইয়া সতত ব্যাপৃত, অথচ ভিতরে বিকট জাতিসর্প হইতেও অধিকতর বিষাক্ত। সে স্বার্থের উদ্দেশ্যে না করিতে পারে এমন কর্ম্ম নাই,—না রটাইতে পারে এমন কথা নাই;—না ঘটাইতে পারে এমন ঘটনা নাই। বড় বড় জমিদারের বাড়ীতে অনেক স্থলে যেমন হইয়া থাকে,

সে সেই ভাবে কতকগুলি দুষ্টনিকৃষ্ট কর্ম্মচারীকে অর্থলাভ ও উন্নতির লোভ প্রদর্শনে বশীভূত করিয়া, এক ভয়ঙ্কর যড়-যন্ত্র বাঁধিল; এবং ঘনশ্যামের আসল উইল গোপন করিয়া, এক কৃত্রিম উইলের প্রচারের দ্বারা, আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ কর্ত্তা হইয়া বসিল।

গোবর্দ্ধনের ষড়যন্ত্রে, সরলমতি বিনয়কৃষ্ণ, বিপদের পর বিপদে অভিভূত হইয়া, আগে দেশান্তরিত, তার পর লোকান্তরিত হইলেন;—পুত্র নীলাম্বর, বিষয়-প্রবেশের পূর্ব্বেই কপট-কৌশলে কলিকাতায় প্রেরিত, এবং সেখানে অনঙ্গমোহিনীর অমূলক মৃত্যু-সংবাদে প্রতারিত ও প্রাণে নিদারুণ বেদনাহত হইয়া, পাগলের মত পাহাড়ে চলিয়া গেলেন;—অনঙ্গমোহিনী পতির নিরুদ্দেশ-বার্ত্তায় প্রথমতঃ একান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন;—পরিশেষে, গোবর্দ্ধনের গুপ্ত ঔষধের গুণে, কতকটা উন্মাদিনীর মত হইয়া, পরিবার ও প্রতিবেশী মণ্ডলের সকলকে অশ্রুজলে ভাসাইলেন। এ দিকে, বালক বিনোদলাল, উন্মত্ততার অপবাদে রাজপুরুষদিগের করায়ত্ত হইয়া, কলিকাতার এক উন্মাদ-নিবাসে বন্দী রহিলেন। চারি দিকের সকল কণ্টক যখন কর্ম্ম-কৌশলে দূর হইল, তখন বুদ্ধির হাঁড়ি ঘোষাল মহাশয় অশোকপুরের অপ্রতিদ্বন্দী কর্ত্তা। তাঁহার বুদ্ধিতে কত বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই কথা প্রসঙ্গে তিনি তখন অধীন কর্ম্মচারিবর্গের নিকট এক-প্রকার প্রকাশ্যভাবেই বড়াই করিতে লাগিলেন।

উপরিলিখিত কর্ম্মকাহিনী লইয়াই এই উপাদেয় উপন্যাস-কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে; আর, উপন্যাস-কবিরা, যেরূপ দণ্ড-পুরস্কারাত্মিকা বিশ্বনীতি অথবা বিধান-লীলার অনুসরণে, মনের সাধ মিটাইয়া, দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের সম্পোষণ করিয়া থাকেন, ইহাতেও সেইরূপ, কাব্যের লয়-সমাধা স্থলে, কর্ম্মফলের অতি আশ্চর্য্য ও অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিণতি ফলিয়াছে। সে পরিণতি অথবা পরিসমাপ্তির ইতিবৃত্তটুকু আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম না। আমাদিগের ভরসা আছে, বঙ্গের উপন্যাস-প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা ননীবাবুর সুপরিচিত নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, এবং মানুষের দুর্ব্বার লোভ ও দুরভিসন্ধিজনিত মন্দচেষ্টা, আপনা হইতেই, কিরূপ অদৃষ্টচর-ভয়ঙ্কর বিপাকে পরিণত হইতে পারে, তাহার চিত্র দর্শনে চিত্তে পুলকিত হইবেন।

গ্রন্থের আরম্ভ বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এমন সুকল্পিত ও সুচিত্রিত আরম্ভ স্বভাবতঃই পাঠকের হৃদয়কে আবির্জিত করিয়া তুলে। গ্রন্থকার সেখানে, অনঙ্গমোহিনীকে অশোকপুরের প্রান্তবাহিনী ত্রিস্রোতা নদীর তটে প্রাণ-প্রিয় নীলাম্বরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান করিয়া, যে ভাবে কথার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কবিত্ব ও চিত্রকুশলতার পরিচায়ক। তিনি অনঙ্গ ও নীলাম্বরের চরিত্র সম্পর্কে আপনি কিছু কহিতেছেন না, অথচ তাঁহারা পরস্পর সম্ভাষণে যে দুই চারিটি কথা কহি-

য়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের হৃদয়ের গতি, প্রেমের গাঢ়তা,—এক জনের অভিমানপূর্ণ তেজস্বিতা, আর এক জনের ধর্ম্মভীরুতা ও সহিষ্ণুতা, সুচারু বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ চরিত্রচিত্রের ক্রম-বিকাশ-প্রদর্শনে গ্রন্থকার আর যত্ন করেন নাই;—প্রেমের এই অনতিস্ফুট কোরক কি রূপে উদ্ভিন্ন কুসুম-শোভায় ফুটিয়া উঠিল, পাঠককে তাহা দেখিবার অথবা বুঝিবার সুযোগ দেন নাই।

উপন্যাসের এক সম্পদ কৌতূহলের উদ্দীপক ঘটনানিচয়ের ক্রমিক প্রকাশ, আর এক সম্পদ নানারূপ চরিত্রের স্বাভাবিক-বিকাশ। বাবু ননীলালের উপন্যাসে প্রথমোক্ত সম্পদ বড়ই সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়া পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে; কিন্তু শেষোক্ত সম্পদ অর্থাৎ চারিত্রবিবৃতি, পাতাঢাকা ফুলের মত, দৃষ্টির অগোচরে রহে। পূর্ব্বে কহিয়াছি, এ আখ্যায়িকার নায়ক নীলাম্বর, নায়িকা অনঙ্গমোহিনী। এ উভয়ের চিত্ত ও চরিত্রের অতি অল্প অংশই অঙ্কিত হইয়াছে। এ অপূর্ণতা অবশ্যই সূক্ষ্মদর্শিপাঠকের একটুকু অতৃপ্তিকর হইবে।

গ্রন্থের আর এক নায়ক বিনোদলাল, আর এক নায়িকা "বসন্তের রাণী"—বালিকা নির্ম্মলা। বিনোদলাল একটি শান্ত শিষ্ট বালক। সে বরশয্যায়, বরের সাজে, বেশ শোভা পাইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া, তাহার চরিত্রে, তাদৃশ কঠোর-পরীক্ষার প্রাণান্তক শিক্ষায়ও আর কোন বিশেষ গুণ ফুটিয়াছে কি না, তাহা সহজে চক্ষে পড়ে না। অপিচ, নির্ম্মলাও, কাশীর সে বীভৎস বিড়ম্বনার পর, তিন দিনেই কিরূপে, "অয়ি লোক-মনোমোহিনী অমৃতময়ী বসন্তের রাণী" রূপে, ফুল্লসৌরভে ও লোভনীয় গুণ-গৌরবে বিকশিত হইল, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হয় না। ইহাদিগের সকলের চরিত্রই সুন্দর ও মনোহর; কিন্তু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রক্রমশূন্য। গ্রন্থকার ইহাদিগকে কবিসমুচিত যত্নের সহিত আর একটুকু ফুটাইয়া দেখাইলে, তাঁহার প্রশংসিত চিত্রনৈপুণ্যের অধিকতর প্রশংসা হইত।

গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মন্দচরিত্র গোবর্দ্ধন ও দুর্ল্লভ রায়। গোবর্দ্ধন যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে। ইহা বেস হইয়াছে। অমন ক্রূর-ভয়ঙ্কর কাল সর্প, আপনার ফণা গুটাইয়া, ও নির্ম্মোক পরিবর্ত্তন করিয়া, এক দিনে মানুষ হয় না। অমন পিশাচ, এক দিনে, প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ, অমন দুরিত-দুর্গন্ধি কলুষ-রাশিকে দেবতারাও এক দিনে দিব্য সৌরভে সুরভিত করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু গোবর্দ্ধনের দুষ্কৃত-সারথি দুর্ল্লভ রায়, এক দণ্ডেই, আসুরী প্রকৃতির নিম্নতম ভূমি হইতে দেব-সমুচিত দয়াদাক্ষিণ্য, কৃতজ্ঞতা ও মহত্ত্বের ঊর্দ্ধতন স্তরে আরোহণ করিয়া, অশেষবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, অশোকপুরের বিষাদ-ভয়াবহ অন্ধকারে বাসন্তী জ্যোৎস্নার আলোক ঢালিয়াছে। দুর্ল্ল-

ভের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্ত একটুকু অস্বাভাবিকের মত বোধ হয়।

গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে অল্প কিঞ্চিৎ Occult অর্থাৎ অলৌকিক তত্ত্বরহস্যের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের উল্লিখিত আপত্তি তাঁহার চিত্তেও উপস্থিত ছিল। নহিলে, তিনি অলৌকিকের আশ্রয় লইতেন না। কিন্তু তাঁহার সে অলৌকিক, লৌকিকের সহিত ভাল মিশে নাই। দুর্ল্লভ, তদীয় বাল্যকালে, একবার অতি উৎকট রোগের প্রভাবে মৃত্যুর গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতেছিল; এবং রোগ-বিকারের তন্দ্রাসময়ে, তাহার প্রসূতির আরাধিতা স্বর্গাবতীর্ণা "সতী-মার" মূর্ত্তি নয়নে দেখিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল। সে এইক্ষণ চাহিয়া দেখিল যে, তাহার সম্মুখ-স্থিতা বালিকা নির্ম্মলাই স্বপ্নের সেই "সতী মা"। নির্ম্মলার দর্শন মাত্রই তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল; সে হৃদয়-পোষিত রাক্ষসী বাসনা তন্মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিয়া দেবতার উপযুক্ত সাধুসঙ্কল্পে দৃঢ়ব্রত হইল।

এ কল্পনা কতকটা সুন্দর হইলেও Occult Science অর্থাৎ অলৌকিক-রহস্যের পরিজ্ঞাত নিয়ম-সঙ্গত নহে। লৌকিক ও অলৌকিক সমস্তই নিয়তির ক্রীড়নক,—নিয়ম-শৃঙ্খলে দৃঢ়জড়িত। নির্ম্মলা যে কালে জন্মগ্রহণও করে নাই,—জন্মিবে বলিয়া অনুঢ় জনক-জননীর অস্ফুট চিত্তেও ঠাঁই পায় নাই, দুর্ল্লভের সে কালেই তাহাকে স্বপ্নে দেখা স্বপ্ন-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তত্ত্ব। গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে (Frederic Myers) ফ্রেডারিক মায়ার্স্ প্রণীত "'Human Personality" অর্থাৎ মানবীয়-অনন্ত নামক বিখ্যাত গ্রন্থ লইয়া একটুকু সময় ব্যয় করিলে, সম্ভবতঃ আমাদিগের সহিত একমত হইবেন। ফল-কথা তিনি দুর্ল্লভ রায়ের এ পরিবর্ত্ত সম্পর্কে ক্রমিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিলে,—অলৌকিকের সহিত লৌকিককে সুকৌশলে মিশাইলে, কাব্যের শোভা একটু বেশী বাড়িত,—যে অতি মন্দ, সেও ভাল হইবার একটা আদর্শপথ চক্ষে দেখিয়া চিত্তে আশ্বাস পাইত। কিন্তু দুর্ল্লভের পটসন্নিহিত সুমতি আর ক্ষেমী আগা গোড়া সমান—আগা গোড়া সুন্দর;—অপূর্ব্ব চিত্র; যেমন স্বাভাবিক, তেমনই সুখ-প্রতিকর। এই উভয় সম্পর্কেই আমরা গ্রন্থকারকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত।

গ্রন্থকার বাবু ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নব্য ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে উচ্চ পদবীরূঢ়। তাঁহার ভাষা হৃদয়হারি,—শুদ্ধ ও সুরুচির পরিচায়ক। আমরা যুগলপ্রদীপের সমালোচনা সময়ে তাঁহার ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি; বসন্তের রাণী পাঠ করিয়া, সে অংশে, অধিকতর প্রীত হইয়াছি।

ভাষার বিশুদ্ধি বঙ্গদেশে একটা বিচিত্র কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালা একটাভাষা কি,—উহার আবার শুদ্ধি, অশুদ্ধি, অথবা বিশুদ্ধি, কি,—এবং সেই মনগড়া বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য একটা মনঃকল্পিত ব্যাকরণই বা

আবার কি,—এইরূপ একটা কথা ইদানীং অনেকের কাছে একটা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, বাবু ননীলাল, উৎকৃষ্ট ঔপন্যাসিক হইয়াও, বাঙ্গালিকে মাতৃভাষার উপাসনা করিতে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার যুগলপ্রদীপ, রচনা সম্বন্ধে প্রশংসাহ পুস্তক। কিন্তু উহাতে ভাষার উপর দুই চারিটি অবিহিত অত্যাচার ঘটিয়াছিল। বসন্তের রাণী সে অংশে একবারে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য। যে সকল যুবক-যুবতীরা উপন্যাস পড়িয়া বাঙ্গালা শিখে, তাহারা এ পুস্তক খানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেও, তাহাদিগের উপকার হইবে। এই পুস্তকে দুইটি মাত্র শব্দ আমাদিগের একটুকু কানে বাধিয়াছে। (১) নিমগ্ন অর্থে 'নিমজ্জিত'। (২) শরীর অর্থে 'কায়া'। শেষোক্ত শব্দটি এইক্ষণ বাঙ্গালা অভিধানেও গৃহীত হইয়াছে। যদি ঈদৃশ শব্দপ্রয়োগে কোন দোষ থাকে, তবে সে দোষ শুধুই ননীবাবুর নহে।

সেই চাঁদ!

১

কাহার সোনার-চাঁদ,—তুমি চাঁদ,
হৃদয়ের চাঁদ তুমি রে কার?
সে'থে কার প্রাণে, ঢাল চাঁদ আলো,
চাঁদপানা মুখ বুঝি বা তার।

২

সোহাগ-সূতায়, চাঁদ গে'থে বুঝি,
গলায় পরে সে চাঁদের মালা—
চাঁদের খেলানা, নিয়ে সে কি খেলে,—
চাঁদ-ফুলে ভরে ফুলের ডালা!

৩

চাঁদ-উপবনে, চাঁদের নিকুঞ্জে,
চাঁদের দোলায় সেকি গো দোলে?
চাঁদের শয়নে, চাঁদ উপাধানে,
শু'য়ে থাকে সে কি চাঁদের কোলে।

৪

চাঁদের আতর গায়ে সে কি মাখে—
চাঁদ লুটোপুটি খায় কি পায়?
চলিতে চরণে-চাঁদ ঝরে পড়ে,
চাঁদের পাখার বাতাস খায়!

৫

চাঁদ গলাইয়া গহনা কি পরে,
চাঁদ কি বসান বসনে তার?
চাঁদে গড়া বীণা, বাজায় কি সুরে,
তারের ঝঙ্কারে অমিয়-ধার!

৬

তাহার স্বভাব চাঁদ ধরাধরি,
সে'থে চাঁদ ধরা দেয় গো তাই;
চাঁদে চাঁদে আহা মরি কি মিলন—
এ মধু মিলনে মরিয়ে যাই।

৭

সে চাঁদবদনী চাঁদ-শিরোমণি,
চাঁদের হৃদয়-চাঁদ সে ধনী।
চাঁদের আয়না, হিয়াখানি তার,
হেরে তায় ভরে সে চাঁদমণি।

৮

আছে না কি শুনি কেবা শ্যামচাঁদ,
এ যুগল চাঁদ গড়েছে সেই—
যত ভাঙ্গা গড়া, সেই শুধু করে,
আর কেহ না কি সে বিনা নেই।

৯

সে চাঁদ-চরণে কত চাঁদ না কি—
দেয় গড়াগড়ি শুনিতে পাই—
এমন চাঁদের শীতল জ্যোৎস্নায়
হরি হরি ব'লে নাচি রে ভাই।

শ্রীঃ ——

মেঘদূতের সপ্ত মুক্তা।

ভূমিকা।

কালিদাসের মেঘদূত, আদিরসাত্মক কাব্য বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। উহাকে, আদিরসের একটি, অপূর্ব্ব, আমোদময়, উপলবেষ্টনীবদ্ধ তরল-তরঙ্গ তড়াগ বলিলে, তড়াগ শব্দ শ্লাঘ্য হয়। এ সংসারে এইরূপ তড়াগ আর কোথায় ক'টা আছে, তাহা জানি না। কিন্তু তড়াগের সহিত উহার একটুকু বড় সুন্দর পার্থক্য। তড়াগের জলে শ্বেত-লোহিত-শ্যামল-প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের ফুল ফোটে,—মুক্তা ফলে না। কালিদাসের এই আদিরস-তড়াগে কএকটি অতি কমনীয়,—অতিতর-তরল, উজ্জ্বল-উদ্রিক্ত, অমৃত-সিক্ত নির্ম্মল-মুক্তা সহৃদয় দর্শকের দৃষ্টি ও হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমি সেই মুক্তা-নিচয় হইতে বান্ধবের পাঠকবর্গকে ক্রমে সাতটি সুপ্রসিদ্ধ মুক্তা উপহার দিব। যাঁহারা এ মুক্তা ক'টি মানস-সূত্রে মালায় গাঁথিয়া সতত গলায় পরিবেন, তাঁহাদের পার্থিবজীবন নিশ্চয়ই উৎকর্ষ ও উচ্চতার দিকে একটুকু উপরে উঠিবে;—তাঁহারা কবি-প্রতিভার স্নিগ্ধমধুর আর্দ্র আলোকে সাংসারিক জীবনে সুখে বিচরণ করিবার পথ পাইবেন; এবং নিজ নিজ হৃদয়কে কবির আদর্শে পরিমার্জ্জিত ও কবিহৃদয়ের ঊর্দ্ধতন-গ্রামে উথিত দেখিয়া, গভীর আনন্দ অনুভব করিবেন। প্রকৃত কবি, প্রকৃতির রহস্যভেদে প্রজ্ঞাবান্ আচার্য্য,—মানবজাতির মনোনিহিত মর্ম্ম-কথার অনুবাদে সিদ্ধপুরুষবৎ, এবং মানব-চরিত্রে যাহা কিছু মধুর ও সুন্দর, তাহারই উপাসক। সুতরাং, কবির উপদেশ উপেক্ষার বস্তু নহে। উহা অনেক সময়ই দৈবী শক্তিতে অনুপ্রাণিত;—এবং নিবিড়-মেঘাবৃত নভোমণ্ডলে, মুহুস্ফুরিত বিদ্যুদ্দীপ্তির মত, দৈবী প্রভায় প্রভান্বিত।

প্রথম মুক্তা।

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে
নাধমে লব্ধকামা।"

অর্থাৎ,

শ্লাঘ্য—মহতের কাছে নিষ্ফল যাচনা,
অধমের কাছে ইষ্টসিদ্ধিও ঘৃণিত।

যাচনা মনুষ্যপ্রকৃতির অপরিহার্য্য বৃত্তি,—মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম। কেন না, মনুষ্য অপূর্ণ ও অভাববিশিষ্ট জীব। সে জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই জীবিকা ও জীবন-রক্ষার জন্য, পর-মুখ-প্রেক্ষী হইয়া যাচনা করিতে আরম্ভ করে; এবং যাইবার সময়ও, পাঁচ জনের কাছে, পাঁচ প্রকার কৃপা ও অনুগ্রহ যাচনা করিয়া চলিয়া যায়। এই ভাবে, মনুষ্যের শৈশব, কৈশোর, স্ফুটনোন্মুখ যৌবন, পরিস্ফুট প্রৌঢ়াবস্থা, এবং পরিশেষে চরম-বার্দ্ধক্য, জীবনের সকল অবস্থাই যাচনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

বস্তুতঃ, মনুষ্যের মধ্যে, কোন দেশে ও কোনকালেও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহাকে যাচনা করিতে হয় নাই; এবং এমন কেহ কোন দিনও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই, যাঁহার জীবনে, অন্যদীয় সাহায্য অথবা অন্যকৃত উপকার গ্রহণের আবশ্যকতা ঘটে নাই। যে বীর-কুল-চূড়ামণি,—বীর-জগতের রাজাধিরাজ ও অপ্রতিহত অগ্রণী, গণনার মধ্য বয়সেই, পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য লইয়া, বালকের মত কন্দুক-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাল্যে ও নব-যৌবনে অন্নবস্ত্রের তরে, এবং জীবনের শেষ-সময়ে সামান্য সুখ-শান্তির জন্যও পরের কাছে প্রার্থী হইতে হইয়াছিল। বোনাপার্টির চরিতাখ্যান, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সকল অংশেই অপূর্ব্ব ও অলৌকিকবৎ। তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তিতেও অলৌকিকতার আশ্চর্য্য গন্ধ আছে। আমি এখানে, উদাহরণের জন্য, একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, তদানীন্তন ফরাশি গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক, উন্মাদ-গ্রস্ত পারিসীয়ানদিগের আক্রমণ হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রাসাদ ও অস্তিত্ব রক্ষার কার্য্যে, প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, একদা মাতা ও ভগিনী প্রভৃতির প্রাত্যহিক-প্রয়োজন-সম্পূরণেও অসমর্থ হইয়া, গভীর রাত্রিতে, আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে, সীন-নদের একটি সেতুর উপরে বড়ই অবসন্ন হৃদয়ে পাদচারণা করিতে ছিলেন। আত্মায় জগজ্জয়ি শক্তি,—মনে দুর্নিবার প্রভুত্ব-প্রভাব; অথচ পকেটে একটি পয়সা নাই। তাই মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন, যখন রাত্রি আর একটু গভীর হইবে,—যখন লোকের যাতায়াত একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে,—কেহ দেখিতে পাইবে না, তখন সেতু হইতে সীনের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সকল দুর্ভাবনার শেষ করিবেন। এমন সময়ে, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত একটি বৃদ্ধ সৈনিক, অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া, এক থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার পকেটে পুরিয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎই বিনা বাক্যব্যয়ে তিরোহিত হইলেন। নেপোলিয়ন এই আকস্মিক ঘটনায় কিছুক্ষণ

স্তম্ভিতবৎ রহিয়া, উপকারীর অন্বেষণে পারিসের পথে পথে, পাগলের মত, ঘুরিয়া বেড়াইলেন; তার পর, নিরাশ-হৃদয়ে ঘরে ফিরিয়া, জীবনের তৎকাল-কর্ত্তব্যে ব্যাপৃত হইলেন।

বোনাপার্টির মত শক্তিশালী সম্রাট্‌দিগের মধ্যে, আরও কেহ কেহ, কর্ম্মসূত্রে বিপাকে পড়িয়া, পরের কাছে কৃপার ভিথারিরূপে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা লোক-সমাজে রাজা, মহারাজ, সুলতান ও বাদসাহ নামে অভিহিত হইয়া, সময় বিশেষে শত সহস্র লোকের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও অনেকেরই এইরূপ সাময়িক ভিক্ষাবৃত্তির কথা ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সম্রাট্ দ্বিতীয় চার্লস্, সিংহাসন-লাভের অব্যবহিত প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত, প্রতিদিনের ভোজ্যান্নের জন্যও, নেদারল্যাণ্ডের পশ্চিম-সীমাভুক্ত সমুদ্র-তট-বাসী ধীবরদিগের কাছে যে ভাবে প্রীতিস্নেহের উপহার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা পাঠ-সময়ে পাষাণ-নয়নেও অশ্রু ঝরে।

ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দৈনিক-প্রয়োজনের প্রকৃতিনিয়মিত অপরিহার্য্য যাচনা ভিন্ন, নিম্নকল্পের সাহায্য-যাচনা, অথবা নিম্নশ্রেণির অনুগ্রহ-প্রার্থনাও শুধুই নিঃস্ব-নিঃসম্বলের নিত্যসঙ্গিনী নহে। যাহারা ছোট'র মধ্যে অতি ছোট, তাহাদিগকে যেমন পরের কাছে যাচ্ঞা করিতে হয়, যাঁহারা বড়'র মধ্যে অতি বড়, তাঁহাদিগেরও, সেইরূপ, সময়বিশেষে, অতি কাতর-নয়নে, ক্লিন্নিত-মনে, যাচ্ঞার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকে।

ঈদৃক্ পরস্পর-প্রার্থনাধীনতা অথবা যাচ্ঞাপরতা জগন্ময়ী মহাশক্তি অথবা জগন্নিয়ন্তিরও নিগূঢ় লক্ষ্য। যিনি, মনুষ্যজাতিকে, এ সাগরাম্বরা অবনীর আধিপত্যরূপ অতুল বৈভব প্রদান করিয়া, সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরাত্মায় অনন্ত উন্নতির অক্ষয় অঙ্কুর রোপণ করিয়া, তাহাকে অনন্ত সুখ ও অনন্ত শক্তিসম্পদের আশা পোষণে অধিকার দিয়াছেন; তিনিই সবল ও দুর্ব্বল, সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ, এবং সমর্থ ও অসমর্থ প্রভৃতি সকল শ্রেণির মনুষ্যকেই পরস্পর-যাচ্ঞার প্রীতিজড়িত প্রয়োজন-সূত্রে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া,—সমস্ত মনুষ্যকে মহামোহময় আকাঙ্ক্ষার তন্তুতে একই মালায় গাঁথিয়া, পাপ-সঙ্কুল মানব-জগৎকে দয়াদাক্ষিণ্য, কৃতজ্ঞতা ও পরার্থ-পরতা প্রভৃতি মহাভাবনিচয়ের পুষ্পিত-কানন রূপে সাজাইয়া তুলিয়াছেন;—আর, পঙ্কে যেরূপ ফুল্ল-পঙ্কজের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ স্বার্থচিন্তার পঙ্করাশি হইতে স্বর্গদুর্লভ প্রেম-পদার্থ উৎপাদন করিয়া, সংসারকে সুধাময় করিয়াছেন। ফলতঃ, মানুষ যদি রোগে শোকে, সুখে দুঃখে, অভাবে ও আতঙ্কে, এবং হৃদয়ের অতি গভীর অবসাদ-সময়ে, মানুষের নিকট যাচ্ঞা করিবার অবস্থায় উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে এ সকল অপূর্ব্ব ও অপরূপ ভাব-কুসুম এ সংসারে কোথায় ফুটিত,—কিরূপে ফুটিবার

অবকাশ পাইত? অপিচ, যে জগতে প্রীতি নাই, পরার্থ ত্যাগ-স্বীকারের উদার ও উন্নত ধর্ম্ম নাই,—কৃতজ্ঞতা নাই, এবং কোমল সৌন্দর্য্যের অনুকারী অন্যান্য মধুর-ভাব নাই, কে সেই দগ্ধশ্মশান-সদৃশ বিরস-ভয়ঙ্কর কঙ্কর-সংসারে মুহূর্ত্তকালও বাস করিতে সমর্থ হইত?

কিন্তু মনুষ্য যাচ্ঞা করিবে কাহার কাছে? ভল্লুক যখন, থূৎকার-বিকট ভয়াবহ ধ্বনির সহিত, গর্জ্জিয়া আসিয়া নাকের উপর কামড় দেয়, মানুষ কি তখন তাহার কাছে মৃদুমধুর মুগ্ধস্বরে প্রাণ ও মান-রক্ষার জন্য যাচমান হয়? মহিষ যখন, নিপান-সলিল হইতে সহসা উত্থিত হইয়া, ক্রোধ-লোহিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করে,—করাল-কলেবর বরাহ যখন, পল্বলের কর্দ্দমরাশি গায়ে মাখিয়া, বেগের সহিত আক্রমণে উদ্যত হয়,—অথবা সুচারু-চিত্রিত সর্প যখন, সুপরিচিত সুহৃজ্জনের মত, অতিমাত্র সন্নিহিত হইয়া, ফণা তুলিয়া ভয় দেখাইতে থাকে, মনুষ্য কি তখন কোন প্রকারেও যাচনার ভাব অবলম্বন করিতে পারে? উল্লিখিতরূপ ভল্লুক, বরাহ ও বর্ণ-বিচিত্র সর্পের নিকট, জীবন অথবা জীবনের অনুকূল সুখ-শান্তির জন্য, যাচমান হওয়া যদি প্রকৃতির রীতিবিরুদ্ধ, তাহা হইলে, যাহারা মনুষ্যদেহে ভল্লুক-স্বভাব,—মনুষ্য-মূর্ত্তিতে বরাহের ন্যায় দয়াদাক্ষিণ্য-শূন্য, এবং ভুজঙ্গের ন্যায় খলতাপূর্ণ, তাহাদিগের নিকট যাচমান হওয়াও মনুষ্যহৃদয়ের স্বাভাবিক রীতিবিরুদ্ধ। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন;—

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে
নাধমে লব্ধকামা,

অর্থাৎ, অধিক-গুণ-গৌরবান্বিত উদার-প্রকৃতি মহতের কাছে, যাচ্ঞা করিয়া যদি ব্যর্থপ্রয়াস হইতে হয়, তাহাও ভাল,—তাহাও শ্লাঘনীয়;—কিন্তু যাহারা অধম ও অতি বড় নীচাশয়, তাহাদিগের কাছে আশার সাফল্য-লাভও বাঞ্ছনীয় নহে।

কবির এই উপদেশের একটুকু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। অধম ও অপকৃষ্টের নিকট যাচনা করিলে, যাচনার সাফল্য-সম্ভাবনা নাই, ইহা অতি স্থূল কথা। ইহা কালিদাসের মত লোক-হৃদয়ের মর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহাকবি অত স্পষ্ট করিয়া না কহিলেও লোকে আপনা হইতেই বুঝিয়া লইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এ কথা কবির লক্ষ্যভূত নহে। কবির প্রধান লক্ষ্য, আত্মার উচ্চতা,—আত্মহৃদয়ের উৎকর্ষ। যাহারা সংসারে অধঃশ্রেণিস্থ লোক বলিয়া পরিগণিত,—যাহারা পার্থিব-বৈভবে উচ্চ পদবীরূঢ় হইয়াও প্রকৃতিতে অতি নিকৃষ্ট, অতি নীচাশয়, তাহাদিগের কাছে যাচমান হইলে, স্বভাবতঃই যে, মনুষ্যের চারিত্রভ্রংশ ঘটে, ইহাই কবির মুখ্য শঙ্কা। এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে কি?

ইয়ুরোপের রাজনৈতিক জগতে—রিশিলু ও ম্যাজেরিণ * সমান পদাভিষিক্ত রাজপুরুষ

* এই দুইটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাম ফরাশি ভাষায় অন্য প্রকার উচ্চারিত হয়। আমরা বাঙ্গালায় ফরাশি উচ্চারণের

ছিলেন। রিশিলু ছিলেন, ত্রয়োদশলুইর প্রধান সচিব, আর ম্যাজেরিণ ছিলেন তদীয় বিধবা মহিষী বিলোল-নয়না এনার প্রিয়তম মন্ত্রী। রিশিলু ও ম্যাজেরিণ, উভয়েই, রাজনীতির প্রয়োজনে, অথবা হৃদয়বৃত্তির অনুসরণে, অনুগত অথবা আশান্বিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মুক্তহস্তে অর্থ, বিত্ত, অথবা পদ-প্রভুত্ব বিলাইতেন। কিন্তু, যাহারা রিশিলুর নিকট, অবস্থার বৈগুণ্যে, নিরাশ হইয়া যাইত, তাহারাও তাঁহার মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিত; যাহারা, ম্যাজেরিণের নিকট মনঃকল্পনার অতিরিক্ত লাভ করিয়া, ক্ষণকালের তরে বিস্মিত হইত, তাহারাও সেই বিস্ময়ভঙ্গের পরক্ষণ হইতেই, তদীয় নীচাশয়তার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিত। মহত্ব ও নীচতার এইরূপ সুদূর-পার্থক্য স্বভাবসিদ্ধ। রাসায়নিক প্রক্রিয়া শ্বেতকে শ্যামবর্ণে এবং নিবিড় শ্যামলকে নির্ম্মল শ্বেতবর্ণে পরিণত করিতে পারে; কিন্তু পার্থিব রসায়নের কোন প্রক্রিয়াই প্রকৃত মহত্ত্বকে নীচতায়, এবং প্রকৃত নীচতাকে মহত্ত্বে পরিবর্ত্তিত কিংবা পরিণামিত করিতে পারে না।

কিন্তু পারুক আর না পারুক, তাহাতে প্রার্থীর আইসে যায় কি? আইসে অনেক, যায়ও অনেক। যাহারা প্রয়োজনানুরোধে পূতিগন্ধি কাদা ছানে, তাহাদিগের সমস্ত শরীর যেমন কদর্য্য গন্ধে কলুষিত হয়; সেইরূপ যাহারা অপরিহার্য্য প্রয়োজনানুরোধেও নীচতা ও নিকৃষ্টতার সন্নিহিত হইতে বাধ্য হয়,—প্রত্যক্ষ-নিরয়-সদৃশ নীচাশয়ের ছন্দানুবর্ত্তনে আত্মবিস্মৃত রহে, তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি, প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের শাসনে, ক্রমে নীচতা ও নিকৃষ্টতার দিকেই নামিতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে, আত্মার অজ্ঞাতসারে, অধঃপাত হইতে অধঃপাতে গড়াইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, যাহারা সিরাজি আতর অথবা সুরভি *শ্বেতচন্দন লইয়া কার্য্য করিয়া থাকে,* তাহারা যেমন ইচ্ছা না করিয়াও, সর্ব্ব অঙ্গে দেব-দুর্ল্লভ সৌরভ অনুভব হেতু, কেমন একটুকু অপূর্ব্ব আনন্দে অধীর হয়, সেইরূপ যাহারা মনুষ্যত্বের সারোৎকর্ষরূপ মহত্বের নিকটস্থ হইতে বাধ্য হয়, তাহারা ইচ্ছা করুক আর না করুক, তাহাদিগের হৃদয় ও মন আপনা হইতেই মহত্বের সুরভিশীতল পবিত্র গন্ধে প্রেম-মুগ্ধ হইয়া, ক্রমে ক্রমে চারিত্রোৎকর্ষের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে। সুতরাং, কিবা প্রার্থী, কিবা প্রার্থিত, কিবা উপকারী, কিবা উপকৃত, যে ভাবে কেন মনুষ্য মহত্বের অঙ্গলগ্ন না হউক, তাহাই তাহার মঙ্গলজনক। মহত্বে যাহার মতি, রতি ও হৃদয়ের প্রীতি জন্মিল, স্বর্গ তাহার জন্য দূরস্থ নহে।'

অবিকল অনুকরণ-চেষ্টা কোন অংশেও উচিত কিংবা আবশ্যক মনে করি নাই।

ছায়াদর্শন।

বিংশ অধ্যায়।

উপক্রম।

সূত্রধারের কর-ধৃত সূতা যেমন কাটের পুতুলকে এক দিক্ হইতে আর এক দিকে টানিয়া নেয়, ঈর্ষ্যা; অসূয়া, অর্থলোভ, এবং লালসা, পিপাসা ও প্রতিহিংসা-প্রভৃতি সাংসারিক-বাসনার সূত্রনিচয়ও সেইরূপ লোকান্তরবাসি—সূক্ষ্মশরীরিদিগকে, সময়ে সময়ে, পৃথিবীতে টানিয়া আনে। সে সংসার নাই,—সাংসারিক-সুখ-দুঃখের সে ক্ষেত্র নাই; তথাপি বাসনার নিবৃত্তি হয় না। বাসনা আগুনের মত প্রাণে জ্বলে,—শিকলের মত হাতে পায়ে বাঁধিয়া রাখে,—জল-নিমগ্ন ব্যক্তির পদ-লগ্ন প্রস্তর-খণ্ডের মত নিম্নদিকে টানিয়া নেয়;—এবং কখনও বা, অতিসূক্ষ্ম সুকোমলতন্তুর মত, চিত্তবৃত্তিকে সংকল্পের প্রতিকূল দিকেও, আকর্ষণ করিতে থাকে। এই জন্যই বাসনাত্যাগ, অথবা—অন্ততঃ—বাসনার সংযম, সকল ধর্ম্মেরই উপদিষ্ট তত্ত্ব। কর্ম্মযোগের জগৎপূজ্য প্রতিষ্ঠাতা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় যত কিছু শিক্ষা দিয়াছেন, বাসনাত্যাগই তাহার মুখ্য কথা।

কিন্তু, বাসনাত্যাগ মনুষ্যের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। মানুষ, সহজে, এ বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে না। শরীরের সকল ইন্দ্রিয় বিকল হইয়াছে,—চক্ষে দৃষ্টি নাই, কর্ণে শ্রুতি নাই, হস্তপদে স্বাভাবিক শক্তি কিংবা গতি নাই, মুখখানি দন্ত-সম্পর্কবিরহে কেমন একটা বিকট বস্তুর মত,—মাথার সে শ্যামকেশরাশি 'শণের নুড়ি'তে পরিণত; তথাপি হৃদয়ের বাসনা আগ্নেয়-গিরির অন্তর্নিহিত অনন্ত শিখার ন্যায় সতত ধূমায়িত ও প্রজ্বলিত। পার্থিব-বাসনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হইলে, অতিতর পূত-চরিত্র ব্যক্তিরাও যে, পর-পারে যাইয়া, শান্তি পান না, এবং পৃথিবীর আকর্ষণ ছেদন করিয়া ঊর্দ্ধধামে উত্থিত হইতে সমর্থ হ'ন না, পাঠক তাহা আজিকার উপন্যস্ত কাহিনীটি পাঠে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। এরূপ একটি কাহিনীর আলোচনায়, জীবনের নিগূঢ়রহস্য সম্পর্কে যে শিক্ষা লাভ করা যায়, একশত উপদেশ শ্রবণেও তাহা হয় কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে। কাহিনীটির উপসংহারে পঁহুছিলে, হৃদয় আপনা হইতে শিহরিয়া উঠে; এবং আত্মা, যেন ক্ষণ-কালের তরে, অতি গভীর মোহনিদ্রা হইতে উদ্বোধিত হইয়া, আপনা হইতে বলিতে থাকে,—হায়! কত কাল—আর কত কাল এইরূপ বাসনার নিগড়ে নিরুদ্ধ রহিয়া সাংসারিকতার কর্দ্দম-রাশিতে ডুবিয়া থা-

কিব ;—কতকালের পর এই দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, জীবনের প্রকৃত পথ লইব ?

আত্মিক-কাহিনী।

ইংলণ্ডে (Quaker) কোয়েকার-পল্লী অনেক আছে ; এবং তাহার প্রত্যেকটিই, কোয়েকার-সম্প্রদায়িদিগের সাধুতা ও ধর্ম্ম-ভীরুতার জন্য, দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমরা আজি লণ্ডনের অনতিদূরস্থ একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ পল্লীর কথা কহিব। এই পল্লীতে (John) 'যন' নামে একটি ভদ্রলোক বাস করেন। যন দরিদ্র। তাঁহার বাসগৃহ অট্টালিকা নহে ;—কিন্তু, সামান্য কুটীর হইতে একটুকু উচ্চশ্রেণীস্থ,—সুখ-সেব্য নিকেতন।

পল্লীটি ক্ষুদ্র,—জন-বহুল না হইলেও দর্শনীয়। পল্লীর মধ্য দিয়া, সুকেশা সিমন্তিনীর সিঁতির মত, শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিত পরিষ্কৃত গ্রাম্যপথ। পথের দুই ধারে লোকের বসতি। অধিকাংশ বাস-গৃহই কুটীর। মাঝে মাঝে দুই একটি একতলা বাড়ী, যুঁইফুলের মালায় গ্রন্থিনিবদ্ধ টগর বা গন্ধরাজের মত, ধব্‌ধবে। প্রায় সমস্ত বাড়ীরই সম্মুখে ও পশ্চাদ্দেশে পরিসর অঙ্গন। কোন কোন বাড়ীর অঙ্গন কুসুম-উদ্যানে পরিণত।

পূর্ব্বে কহিয়াছি, যনের বাসগৃহ সুন্দর গৃহ। উহার সম্মুখে বাগান ; পশ্চাতে তরু-লতা-সমাচ্ছন্ন সুস্নিগ্ধ বিরামস্থান। বস্তুতঃ, যনের নিকেতন নিভৃত-নিকুঞ্জের ন্যায় মনোরম। যনের সে বাস-গৃহ এবং তৎসংলগ্ন উদ্যান ও কুঞ্জ, অনেক সময়ই, একটি যুবতীর প্রফুল্ল কান্তিতে উৎফুল্ল ও উজ্জীবিত রহিত। যুবতী যনের পত্নী নহেন—যনের জনৈক প্রতিবেশী ভদ্রলোকের অনিন্দ্যমূর্ত্তি অনূঢ়া কন্যা।

দুজনে বড় প্রণয়। প্রণয় আজিকালিকার নহে। শৈশবে ধূলিখেলার সঙ্গে ইহার উৎপত্তি। এ প্রণয়ে নেপথ্য নাই। প্রতিবেশীর কাছে ঢাকিবার বা লুকাইবার কোন কথা ছিল না। প্রণয়ীরা শৈশবে পরস্পর খেলার সাথী ছিলেন ; এইক্ষণ পরিস্ফুট যৌবনে পরস্পরের বিশ্রামসুহৃৎ অথবা অবসর সঙ্গী।

যন ও যুবতীর প্রণয় প্রগাঢ়। প্রগাঢ় বটে ; কিন্তু উহা, কোন সময়েই, ঔপন্যাসিক আবেগে আত্মহারা বা আত্মবিস্মৃত হইত না,—উহার সহিত প্রাতনিয়তই একটু সাংসারিকতা, একটু সামাজিকতা, ও একটু পরিণাম-চিন্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিত। নিঃসম্পর্কিত যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রণয়ের শুভ পরিণাম পরিণয়। পরিণয়ে উভয়েই উৎসুক ছিলেন। কিন্তু, তথাপি, যদি অবস্থাবৈগুণ্যে পরিণয় না ঘটে,—যদি পাত্রান্তরে মনোনিবেশ করিতে হয়, তাহা হইলেও গলায় দড়ি দেওয়া অথবা জলে ডুবিয়া মরিবার মত প্রবৃত্তি তাঁহাদিগের কাহারও হইত না। উভয়ের অবসর সময়, বিশুদ্ধ প্রণয়-সমুচিত সদালাপে সুখে অতিবাহিত হইত। বিবাহের কথা মুখে না ফুটিলেও উভয়েরই মনে জাগিত। কিন্তু তদনুরূপ কোন অনুষ্ঠানই হইত না।

যন দরিদ্র ; যুবতীও দরিদ্রা। যনও তাঁহার আশৈশবসঙ্গিনী প্রণয়িনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখে ক্লেশিত করিতে চাহিতেন না ; যুবতীও প্রিয়সখা ও প্রিয়তম সুহৃৎ যনের গল-গ্রহ হইয়া তাঁহার দারিদ্র্যের পরিমাণ বাড়াইতে ভালবাসিতেন না। সুতরাং মনের কথা উভয়ের মনে মনেই লুকায়িত রহিত।

কাল-ক্রমে, লণ্ডনের এক সম্ভ্রান্ত বণিক্-পরিবার-সম্ভূত সমৃদ্ধ যুবা ঐ পল্লীতে আগমন করিলেন। যনের কুটীরের নিকটেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যুবক এখনও অকৃতদার, এবং উপযুক্ত পাত্রীলাভের জন্য একটুকু বেশী আকুল। যনের সঙ্গে ও যনের প্রিয়সঙ্গিনী যুবতীর সহিত, তাঁহার দেখা শুনা ও আলাপ-পরিচয় হইল। ধনী যুবক, যুবতীর চরিত্রগত সুশীলতা ও কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া, মোহিত হইলেন। যুবতীও তাঁহার প্রণয়সম্ভাষণে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ক্রমে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রীতিরও সঞ্চার হইল। কিছু দিন পরে, বণিগ্ যুবক যুবতীর সহিত বৈবাহিক বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। যুবতী, এইরূপে, অসহ্য দারিদ্র্য দুঃখের তীব্র-জ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, জীবনের এক উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করিলেন।

যন, নির্লিপ্ত যোগী না হইয়াও, নীরবে ও নির্ব্বিকার মনে, সমস্ত দেখিলেন। তিনি প্রণয়-কোপে যুবতীকে কোনরূপ অনুযোগ দিলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বি-যুবকের প্রতি ক্রুদ্ধ-কটাক্ষপাতেও তাঁহার মতি হইল না। শেষে—বিদায়ের সময়ে, যুবতীকে অভিসম্পাত করা দূরে থাকুক, বরং সাময়িক উৎসব-উল্লাসে, কৃত্রিম হাসির প্রফুল্ল আবরণে বিষাদের অশ্রু সম্বরিয়া লইয়া,—"আয়ুষ্মতি, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন," এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদে যুবতীর প্রাণ স্পৃষ্ট হইল। নয়নের প্রান্তে দুটি টল-টল নির্ম্মল মুক্তা আপনি গড়াইয়া পড়িল। যুবতী যনের কাছে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শৈশবাবধি এক সূতায় গাঁথা প্রাণটিকে জোর করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া, আর এক সূতায় গাঁথিতে, যুবতীর যে কষ্ট হইল, যুবক যনের গণনা-তৎপর স্থবিরপ্রাণ, তাহা সম্যক্ বুঝিয়া লইতে অক্ষম। যুবতী যথাসময়ে পতির সহিত লণ্ডনে প্রস্থান করিলেন। যনের প্রণয়-জীবনে যবনিকা পড়িল। তাঁহার গৃহ, উদ্যান ও অঙ্গন অন্ধকার হইল। কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখক্লিষ্ট, চির তিমিরান্ধ হৃদয়ে, আলোকও যেমন, অন্ধকারও তেমনই ভাবে মিশিয়া রহিল।

যুবতী এক্ষণ লক্ষপতির গৃহিণী। কুটীর-বাসিনী আজি প্রাসাদ-বিলাসিনী। অসংখ্য পরিচারক ও পরিচারিকা তাঁহার আজ্ঞাধীন। আগে, তিনি নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য গলদঘর্ম্ম হইয়াও, তাহা খুঁজিয়া পাইতেন না ; এক্ষণ, অপূর্ণ বা অসম্পন্ন প্রয়োজনই খুঁজিয়া পান না। মহার্হ বসন তাঁহার পরিচ্ছদ ; মণিমুক্তা—আভরণ ; এবং রাজভোগ্য উপাদ

আহার্য্য তাঁহার ভোজ্য। কাঙ্গালের মেয়ে সহসা বৈভবের সমুদ্রে ডুবিলেন। ইহাতে তিনি যে একটুকু দিশাহারা হইয়া একে আর হইয়া উঠিবেন, ইহা কোন অংশেও বিস্ময়ের বিষয় নহে। বনের ফুলটি বা ফলটিতে যাঁহার চরমতৃপ্তি ও পরমা প্রীতি ছিল, এইক্ষণ স্তূপীকৃত রজত-কাঞ্চনেও তাঁহার কামনা তৃপ্তি লাভ করিতে ভুলিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার এই অপরিসীম অর্থপ্রিয়তার মধ্যেও তিনি কোয়েকার-পল্লীর সুপরিচিত পবিত্রচারিতা ও প্রিয়সুহৃৎ যনের প্রশান্ত প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের কাঁটা, প্রতিনিয়তই যেন কাঙ্গাল যনের সেই পর্ণকুটীরের দিকে হেলিয়া থাকিত।

কিন্তু এই বৈভব-ভোগ, যুবতীর ভাগ্যে, দীর্ঘকাল স্থায়ি হইল না। যুবতী সন্তানবতী হইবার পূর্ব্বেই বিধবা হইলেন। পতি-বিয়োগের পর, লণ্ডনে অবস্থান তাঁহার পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। পল্লীবাসিনীর নিকট নাগরিক-জীবন কোন দিনই তেমন ভাল লাগে নাই। তথাপি এতদিন তিনি পতির আদরে আদরিণী ও পতির গৌরবে গৌরবিনী হইয়া নগর-বাসে অনুরক্ত ছিলেন। এক্ষণ তিনি বিধবা;—সমৃদ্ধশালিনী হইলেও, একাকিনী; সুতরাং অসহায়া ও কৃপার পাত্রী। তিনি চারিদিক্ শূন্য দেখিলেন। পিতৃনিবাসের সেই নির্জ্জন কুটীর ও যনের স্মৃতি তাঁহার প্রাণে আবার নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিল। তিনি বহুটাকার ব্যাঙ্কনোট সঙ্গে লইয়া, কোয়েকার পল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন।

অনেক দিন পরে, শৈশব-সখা যনের সহিত আবার তাঁহার সন্দর্শন ও সাক্ষাৎকার হইল। যন তখনও অকৃতদার। যনের হৃদয়েও প্রবাহশূন্য অনুরাগ ও প্রসুপ্ত প্রেম আবার জাগিয়া উঠিল। এখন দারিদ্র্যের সে প্রতিবন্ধকতা নাই। কেন না, বিধবা যুবতী বিপুল-সম্পত্তির অধিস্বামিনী। অচিরেই যনের সহিত বিধবার বিবাহ হইয়া গেল। যুবতী লণ্ডনের মমতা চিরদিনের তরে ত্যাগ করিলেন। বাকি জীবনের জন্য যনের কুটীরই তাঁহার আশ্রয়-স্থান হইল। বলা বাহুল্য যে, ঐ কুটীর-প্রতিম নিকেতনই তিনি অচিরে কমনীয় প্রাসাদে পরিণত করিবেন, এ আশা তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত ক্রীড়া করিতে লাগিল।

লণ্ডনে বৃহৎ বাটী, এবং নগদে ও বহু জিনিষপত্রে বহু টাকার সম্পত্তি সঞ্চিত ছিল। বাড়ী বিক্রয় করিয়া, সেখানে যাহা কিছু আছে, সমস্ত উঠাইয়া আনা আবশ্যক। যন তাঁহার কুটীরের সেই আসন ছাড়িয়া কিছুতেই নড়িবার পাত্র নহেন। রমণী, যদিও প্রণয়-বশে, প্রভূত সম্পত্তি সহ, নিরয় যনের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তথাপি যন সর্ব্বতোভাবে যেন তাঁহার হইতে চাহিতেছেন না। যন যেন তাঁহার "আপ্‌নিটি আর কৌপ্‌নীটি" আপনার বগলে সারিয়া-সমরিয়া রাখিয়া, বিধবার জীবনের সহিত, বিবাহের সূতায়, আধ' আধ' ভাবে আপ-

নার জীবন গাঁথিয়া লইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কিছুতেই ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তিনি আপনার অভ্যস্ত সুখ-শান্তি লইয়াই বিপন্ন। এইরূপ বিপন্ন বলিয়াই দারিদ্র্য তাঁহার নিত্যসঙ্গী। সুতরাং তিনি আর কি করিবেন? রমণী বুঝিলেন, স্বামী যন হইতে, এই কর্ম্মে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই। শুধুই ভোগের ভাগী, কর্ম্মের বেলায় কেহই নহেন, যন ঠিক্ এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট স্বার্থপরও নহেন। কিন্তু, তিনি শারীরিক অভ্যাস ও শিক্ষার দোষে কর্ম্মজীবনে নিতান্তই নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ ও অপটু। রমণী একাকিনীই লণ্ডনে যাইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিলেন।

যুবতী লণ্ডনে প্রস্থান করিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না। যন প্রতিদিন পথপ্রতীক্ষায় থাকিতেন, প্রতিদিনই তাঁহার আশা নিষ্ফল হইত। যুবতী কি অবস্থায়, কোথায় আছেন, কিছুদিন কেহই ইহার কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে, একদিন কোয়েকার পল্লীতে অকস্মাৎ সংবাদ পঁহুছিল যে, যনের নব-পরিণীতা সমৃদ্ধিশালিনী পত্নী লণ্ডনের এক নিভৃতপথে দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।

অর্থের প্রতি যুবতীর এতদূর আসক্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি যথন যেখানে যাইতেন,—এমন কি প্রাতর্ভ্রমণ ও সান্ধ্যবায়ুসেবনের জন্য যথন বাহির হইতেন, তথনও তাঁহার পকেটে, মোহর ও নোটে, পাঁচ ছয় হাজার টাকা মূল্যের বস্তু লুক্কায়িত থাকিত। লণ্ডনে যাইয়া বাড়ী বিক্রয়ের দ্বারা প্রচুর নগদ টাকা পাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বস্বামীর সঞ্চিত বহু অর্থ তাঁহার করায়ত্ত ছিল। এই অর্থই তাঁহার বিপত্তির কারণ হইল। কোন অর্থলুব্ধ দস্যু, তাঁহাকে অসহায় পাইয়া, যার-পর-নাই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। লণ্ডনের যে অংশে তাঁহার বাটী, সেই স্থানের লোকেরা তাঁহার কোন কোন প্রতিবেশীর উপরই এই দস্যুবৃত্তির অপবাদ আরোপ করিতে লাগিল।

রমণীহত্যার এই রোমহর্ষণ ভীষণ কাহিনী শুনিয়া কোয়েকার-পল্লী শিহরিয়া উঠিল। অনেকে, রমণীর সেই কমনীয় মূর্ত্তি মনে করিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিল। কেহ কেহ তাঁহার প্রীতিমধুর পবিত্রস্নিগ্ধ শিষ্ট-প্রকৃতির কথা আলোচনা করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। আর যন। যেখানে এই সংবাদ আকস্মিক অশনি-খণ্ডের ন্যায় আপতিত হইবার কথা, সেখানে কি হইল? বজ্র তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল বটে, কিন্তু সে পাষাণ-বিগ্রহ একটুকুও বিচলিত হইল না। লোকচক্ষুর অজ্ঞাতসারে, যনের কুটীরে, এক বিন্দুও অশ্রু ঝরিল না। যনের দুঃখ হয় ত বড় গভীর, বড় বেশী মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু, তাহা হইলেও যন একবারে নীরব ও নিশ্চল।

আশৈশব-সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নী চিরকালের জন্য অন্তর্হিতা হইয়াছেন। সে

অন্তর্দ্ধানও মানবজীবনের স্বাভাবিক গতিতে নহে,—নিঃসহায় অবস্থায়, জন-শূন্য নির্জ্জন পথে,—লুব্ধদস্যুর করে,—যার-পর-নাই নিষ্ঠুরভাবে! অমন পত্নীর সর্ব্বনাশ হইল; আর সেই পত্নীর যে ধন-রাশিতে দরিদ্র যন মনে মনে ধনী হইবার আশা পুষিতেছিলেন, সে ধন ও ধনের আশাও অতল জলে বিলয় পাইল। মনের এ দুঃখ বস্তুতই বর্ণনাতীত ও দুঃসহ। কিন্তু যনের প্রীতি, ভালবাসা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা প্রভৃতি সমস্ত মনোবৃত্তিই ফল্গুগঙ্গার ন্যায় অন্তর্ব্বাহি। উহা ভিতরে ভিতরে আলোড়িত, বিলোড়িত ও উচ্ছ্বসিত হইত; কখনও বাহিরে ফুটিয়া পড়িবার পথ পাইত না। এ আঘাত যনের মত নিরীহ-নিষ্ক্রিয়ের উপরে বলিয়াই হত্যাকারী অন্ধকারে মাথা গুজিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ঘুমাইতে সমর্থ হইল। অন্য কাহারও এমন সাংঘাতিক সর্ব্বনাশ ঘটিলে, তাহার আর্ত্তনাদ ও প্রতিহিংসার আকাশ-স্পর্শি চীৎকারে ক্ষুদ্র কোয়েকার-পল্লীর কথা কি, সমস্ত লণ্ডনই উত্তেজিত হইবার বিষয় ছিল। কিন্তু হতভাগ্য যন সমস্তই বিনা বাক্যব্যয়ে সহিয়া লইলেন।

যন লোকের মুখে হত্যাঘটনার নানারূপ কাহিনী শুনিলেন। স্থানীয় জনরব, হত্যার সন্দেহ কোন্ দিকে টানিয়া লইতেছে, ক্রমে তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কিন্তু কিছুতেই লণ্ডনে যাইয়া প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। পত্নীর অপহৃত বা হৃতাবশিষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার চেষ্টা, অথবা উপযুক্ত-প্রতিশোধ-কামনায় হত্যাকারীর প্রতিকূলে বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হওয়া, ইহার কোনটিই তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তিনি, সন্ন্যাসধর্ম্মের পথিক না হইলেও, নিষ্কর্ম্ম-সন্ন্যাসের ভাষায় এই বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিলেন যে, "লণ্ডনে যাইয়া একটা হেঙ্গাম ঘটাইলে কি লাভ হইবে? মৃত পত্নীকে ত আর ফিরিয়া পাইবেন না?—তবে এই কচ্‌কচি কেন?—লণ্ডনে যাইয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের কেল্লায় হানা দিলে, লণ্ডনের সেই লোকারণ্যময় মহা বেবিলনে, খুনী গুণ্ডাদিগের হাতে, তাঁহার অদৃষ্টেও; তাঁহার সেই হতভাগিনী পত্নীর দশা সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে।—না—তিনি লণ্ডনে যাইতেছেন না ইহা অবধারিত।" মনে মনে এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইয়া, কোয়েকার-পল্লীর সেই নির্জ্জন-কুটীরে আজন্মনিরীহ যন, নিস্পন্দ-নিরীহ ভাবেই রহিয়া গেলেন। পল্লীর লোকে, কিছুদিন তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া, পরিশেষে নীরব হইল।

গ্রামে এখন আর এই হত্যাব্যাপার উপলক্ষে বিশেষ কোন আলোচনা বা আন্দোলন নাই। কিন্তু যন যে প্রকার শান্তির জন্য এমন অস্বাভাবিক উদাসীনব্রত অবলম্বন করিলেন,—যে নিরুদ্বেগ নির্জ্জন-বাসের অনুরোধে এতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া লোকের কাছে নিন্দিত হইলেন, সে শান্তি,—সে নিরুদ্বেগ-নির্জ্জন-বাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। একদিন তিনি রাত্রিতে আহারের পর শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন,

এমন সময়, হঠাৎ তাঁহার অনুমান হইল, কে যেন ধীর-পাদ-বিক্ষেপে তাঁহার শয্যার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন,—একটি স্ত্রীলোক। সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। এ স্ত্রীলোক কেমন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল! এই সময়ে, কোন স্ত্রীলোকের এখানে আসিবারই বা প্রয়োজন কি?—দর্শন মাত্রই তাঁহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল। তিনি অধিকতর মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেন। এ ত অন্য কেহ নয়,—এ যে তাঁহারই সেই দস্যুনিহতা দুর্ভাগিনী পত্নী! দেখিয়াই মনের বুক কাঁপিয়া উঠিল;—চক্ষু বিস্ফারিত ও শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ত্রস্ত-ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কণ্ঠস্বর আধ' আধ' স্ফুরিত হইল;—সেই অর্দ্ধ-উচ্চারিত অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ—এ—তুমি!—তবে কি তুমি প্রাণে জীবিত আছ, প্রিয়তমে?"

প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না। রমণী খর-প্রখর তীব্রদৃষ্টিতে মনের চ'খের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মন ধর্ম্মবিশ্বাসে কোয়েকার,—পারলৌকিকতত্ত্বে আস্থাবান্ ও একান্ত নির্ভয়। তিনি তাঁহার স্বর্গগত সহধর্ম্মিণীকে সাদরে হাতে ধরিয়া কাছে আনিয়া বসাইতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর তখন তাঁহার ইচ্ছার অধীন নহে;—তাঁহার পা সরিল না, হাতও নড়িল না। রমণীর দৃষ্টি চ'খের উপর যেন আগুন ঢালিয়া দিতেছে;—মন সেই তীব্রদৃষ্টি হইতে চক্ষু ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, চক্ষু ফিরিল না। মনের অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। মূর্ত্তির মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই; কিন্তু চ'খের দৃষ্টি যেন শতমুখে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে। মন না পারিলেন চক্ষু বুজিতে, না পারিলেন ঘুমাইতে। এই ভাবে, অনিদ্রায়, রাত্রি কাটিয়া গেল। মূর্ত্তি, সমস্ত রাত্রিই, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে, সেই একই অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, উষার আলোকসঞ্চারে নৈশ অন্ধকারের সহিত অন্তর্দ্ধান করিল।

রমণী দস্যুকর্ত্তৃক নিদারুণ আঘাতে দেহপাত করিয়াছেন। দস্যুর প্রতি তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি যার-পর-নাই বলবতী। যে চিরপ্রিয় শৈশব-সুহৃৎকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, সে পতি হত্যাকারী দস্যুর দণ্ডবিধানে যত্ন করিলেন না, এমন নহে;—বাড়ীর বিড়াল-কুকুর কোন নিষ্ঠুর প্রতিবেশীর অত্যাচারে নিহত হইলে, মানুষ যতটুকু দয়াদুঃখ প্রকাশ করে, মন তাদৃশী উপকারপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর জন্য ততটুকু দয়াদুঃখও প্রদর্শন করিলেন না। সম্ভবতঃ এই কারণেই রমণীর আত্মিক-মূর্ত্তি এইরূপ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মনকে যাতনা দিবার উদ্দেশ্যেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু মনের প্রায়শ্চিত্ত একদিনে পরিসমাপ্ত হইল না। পরদিনও আবার, সেই সময়ে, সেই ভাবে, সেই ছায়ামূর্ত্তি মনের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। লণ্ডনযাত্রা সময়ে, তাঁহার পরিধানে যে বেগুনে রঙের গাউনটি ছিল, সেই গাউনটি তেমনই ভাবে পরা রহিয়াছে। সেই মুখ, সেই চক্ষু। সেই

মুখ বটে, কিন্তু মুখে সে মাধুরী নাই। মুখচ্ছবিতে বিকট ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব স্পষ্ট পরিস্ফুট। নয়নে সে প্রীতি-ঢল-ঢল বিলোল কটাক্ষ নাই,—কট-মট স্থির দৃষ্টি যেন মর্ম্মভেদ করিয়া ছুটিতেছে। যন সে রাত্রিও ঘুমাইতে পারিলেন না। ইহার পরে নিত্যই এইরূপে ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব ও যনের অপরিসীম যন্ত্রণা হইতে লাগিল।

ক্রমাগত কএক দিনের অনিদ্রায় যন বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রথম কএক দিন, শারীরিক কষ্টের সহিত মানসিক ভয় ও বিস্ময়ে তাঁহাকে অধিকতর অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এইক্ষণ বিস্ময়ও নাই, ভয়ও নাই; আছে শারীরিক ক্লেশ মাত্র। তাহার কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। তিনি দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছেন যে, এ মূর্ত্তি তাঁহার পত্নীরই আত্মিক প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু সে কেন তাঁহাকে নিষ্ঠুরের মত যন্ত্রণা দিতেছে, এই চিন্তায় তাঁহার শান্তি নাই।

একদিন যনের জনৈক প্রতিবেশী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যন, তোমার কোন পীড়া হইয়াছে কি না, জানি না। হইলে অবশ্যই শুনিতাম। কিন্তু তোমাকে এমন কাতর দেখিতেছি কেন? তুমি শোক-শীর্ণ, না চিন্তা-জীর্ণ? তোমার কি হইয়াছে, ভাই শুনিতে পারি কি?"

যন উত্তর করিলেন,—"শোক ত বাকি জীবনের নিত্যসঙ্গী। না—ভাই, আমার এ অবস্থার কারণ শোক নহে,—উপদ্রব। যার জন্য শোক, তারই উপদ্রব।" এই কহিয়া তিনি ছায়ামূর্ত্তি ঘটিত সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলেন। কহিলেন,—"দিবসে আমি যখন কাজে৹ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি, তখন যদি সে আসিয়া এই৹ রূপে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে, আমার কোন কষ্টই হইত না। রাত্রিতে আইসে বলিয়া, আমি একবারেই ঘুমাইতে পারি না। অনিদ্রায় অনিদ্রায়ই আমি এইরূপ কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি।"

প্রতিবেশী এই কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ অদ্ভুত কথায় তাঁহার যেন সহজে বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। তিনি, ঐ রাত্রিতে যনের কুটীরে যাইয়া, এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন। যন যাহা বলিয়াছিলেন, দেখিলেন, তাহা যুণাক্ষরেও মিথ্যা নহে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কাহিনী সমগ্র পল্লীতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গ্রামের অনেকে শুনিয়াই বিশ্বাস করিল। যাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও এই তত্ত্বে বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা গ্রামময় আন্দোলন শুনিয়াও ইহাতে তত মনোনিবেশ করিল না। কেহ কেহ আবার, যনের ঘরে রাত্রি জাগিয়া, সে ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি চক্ষে দেখিলেন; এবং দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

এক্ষণ যনের গৃহে ছায়া-মূর্ত্তির আবির্ভাব, পূর্ব্বের মত আর, নিত্যকার ঘটনা নহে। যনের বাড়ীতে দর্শনার্থী লোকের সমাগম যত বাড়িতে লাগিল, ছায়া-মূর্ত্তির প্রকাশও

ততই কমিয়া আসিল। কিন্তু, গ্রামের অধিকাংশ লোকই, বহুবার প্রত্যক্ষ দর্শন-হেতু এই ঘটনাকে, দিবার পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবার ন্যায়, ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। লোকের কৌতূহল-তৃষ্ণা প্রশমিত হইলে পর, একদা যন, তাঁহার এক প্রতিবেশীর কাছে বলিলেন যে,—তখনও তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার পত্নীর দেখা পাইয়া থাকেন।

সংসারে সকল ঘটনাই যেমন কালে পুরাণ হয়, এই বিস্ময়কর ঘটনাও কালে সেইরূপ পুরাতন হইয়া পড়িল। গ্রামে উহা লইয়া এখন আর তেমন আন্দোলন বা আলোচনা নাই। যনের সে নৈশ-উপদ্রবও তিরোহিত হইয়াছে। এই সময়ে, কি এক প্রয়োজন উপলক্ষে, লণ্ডনের কোন উচ্চশ্রেণীস্থ শিক্ষিতা মহিলা কোয়েকার-পল্লীতে আগমন করিলেন। লণ্ডনের আরও তিনটি ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কোয়েকার-পল্লীর কোন বাটীতে তাঁহারা মধ্যাহ্নভোজে আহূত হইয়াছেন। গ্রামের কতিপয় মান্য গণ্য ব্যক্তিও এই ভোজে নিমন্ত্রিত ছিলেন। ভোজন-সময়ে, কথাপ্রসঙ্গে, একটি বালক, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল যে, যনের গৃহ ছায়া-মূর্ত্তির ক্রীড়াক্ষেত্র। কিন্তু কথাটা উচ্চারিত হইতে না হইতেই, গৃহকর্ত্তার ইঙ্গিত ক্রমে, বালক এতৎ সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। লণ্ডনের মহিলা ইহা লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না। উল্লিখিত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত তিনি মনে মনে অতিশয় উৎসুক হইয়া রহিলেন।

গল্পে আমোদে ভোজ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। মহিলা বালকটিকে একান্তে ডাকিয়া নিয়া যনের বাড়ীর উপদ্রব-কাহিনী সমস্ত শুনিলেন। মহিলা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে অনুরাগী ও আত্মিকতত্ত্বে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি এই কাহিনী শুনিয়া যনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বালক তাঁহার পথপ্রদর্শক হইল। লণ্ডন হইতে সমাগত অপর তিনটি ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের একজন শিল্পব্যবসায়ী ও তরুণবয়স্ক যুবক। তিনি আত্মিকতত্ত্বে ঘোরতর অবিশ্বাসী। বালকের কথিত কাহিনীকে তিনি গ্রাম্যগুজব জ্ঞানে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন।

যাহা হউক, তাঁহারা ধীরে ধীরে যনের গৃহে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন,—ঘরের দরোজায় তালাবন্ধ; যন বাড়ীতে নাই। গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ণ সময়। দিগ্বলয় তখনও সূর্য্যের প্রফুল্ল কান্তিতে উদ্ভাসিত ও উৎফুল্ল। বালক, সদর দরোজা বন্ধ দেখিয়া, যন বাড়ীতে আছেন কি না, খাটি করিয়া বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত, ঘুরিয়া পশ্চাতের দরোজায় গেল। মহিলা ও আগন্তুক ভদ্রলোক তিন জন, গৃহের সম্মুখ ভাগেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ঘরের ভিতরে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। স্ত্রীলোক যুবতী ও সুন্দরী। বেগুনে রঙের পরিচ্ছদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। দিবালোকে ঘরের ভিতরও আলো-

কিত ছিল। তাঁহারা যুবতীর মুখচ্ছবি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ঘরে যখন মানুষ আছে, তখন অচিরেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে মনে করিয়া, তাঁহারা সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে বালক ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"মন বাড়ীতে নাই।" তাঁহারা বলিলেন,—"মন বাড়ীতে না থাকিলেও একটি স্ত্রীলোক ঐ ঘরের ভিতরে নিশ্চয় আছেন।"

মন যখন বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতেন, তখন ঘরের চাবি জনৈক প্রতিবেশীর কাছে রাখিয়া যাইতেন। বালক এই সন্ধান জানিত। বালক চাবির সহিত সেই প্রতিবেশীকে ডাকিয়া আনিল। লণ্ডনের আগন্তুকেরা তালা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সে যুবতীকে আর দেখিতে পাইলেন না। বাড়ীতে তিন খানি কোঠা। দেখিলেন,—সদর দরোজা ভিন্ন, বহির্গমনের অন্য সমস্ত দ্বার ভিতর দিক্ দিয়া বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা তিন খানি কোঠা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। বাহির হইতে যে রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার আর কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। তাঁহারা সকলেই যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। প্রতিবেশীর নিকট মনের লোকান্তরগতা স্ত্রীর আকৃতি ও পরিচ্ছদের কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। প্রত্যুত্তরে প্রতিবেশী যাহা বলিলেন, তাহার সহিত গৃহাভ্যন্তর-দৃষ্টা রমণীর আকৃতি ও পরিচ্ছদ অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। তখন বালকের মুখশ্রুত কাহিনীতে তাঁহাদিগের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা অবিশ্বাস রহিল না। অবিশ্বাসী যুবক-শিল্পীর বিদ্রূপ ও হাসির হিল্লোলও থামিয়া গেল। তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ের প্রতিকূলে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ফলতঃ, তিনিও, এ তত্ত্বে প্রবুদ্ধ ও বিশ্বাসবান্ হইয়াই, মনের গৃহ ত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহারা, সকলেই বিস্ময়ে একবারে স্তম্ভিতবৎ হইয়া কতকটা অনিচ্ছায়ও, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে লণ্ডনের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "সংস্কৃতব্যাকরণ ও রচনাশিক্ষা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ।" আমরা প্রথম-সংস্করণের পুস্তক দেখি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে ব্যাকরণ-শিক্ষার উপযোগি বিবিধ-বিষয়ের যেপ্রকার সন্নিবেশ-পারিপাট্য দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, ইহা অচিরেই বঙ্গদেশের সমস্ত নর্ম্মাল ও প্রবেশিকা-পরীক্ষার বিদ্যালয়ে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইবে। গ্রন্থকার ব্যাকরণশাস্ত্রে

প্রগাঢ় পণ্ডিত। কিন্তু, তিনি স্বপ্রণীতগ্রন্থে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে যত্নপর না হইয়া, শুধুই ছাত্রশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন; এবং এই একই পুস্তকে সংস্কৃতব্যাকরণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য সমস্ত সার কথা অতি সুন্দর সূত্রবদ্ধ প্রণালীতে বিন্যস্ত করিয়া, শিক্ষক ও শিক্ষার্থি-ছাত্র উভয়েরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সূত্রগুলি সরল, সুখবোধ্য ও স্মরণার্হ। প্রবেশিকা শ্রেণির বালকেরা এই ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রই অতি সহজে এবং শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে আয়ত্ত করিতে পারিবে; এবং এই একখানি ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও ভট্টি প্রভৃতি মহাকাব্য, এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল, ও উত্তর-চরিত প্রভৃতি নাটক টীকামাত্রের সাহায্যে পাঠ করিতে অধিকারী হইবে। সংস্কৃত ব্যাকরণ দুরারোহ পর্ব্বতস্বরূপ। কিন্তু অবিনাশ বাবুর এ পুস্তক, সে পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্য, অতীব সুখ-সেব্য সোপান-রাজিসজ্জিত সুচারু-পথের মত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ, এইরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তকের উপযুক্ত আদর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমরা যে, পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশ পরিশ্রমের সহিত পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহা গ্রন্থকারকে বুঝাইবার জন্য, তৎপ্রদর্শিত স্তু ধাতুর রূপ-নিচয় সম্পর্কে একটি কথা বলিব। তু রু স্তু এই তিনটি অদাদিগণীয় ধাতুর উত্তর, তস্ থস্ বস্ মস্ প্রভৃতি অপিৎ-ব্যঞ্জনাদি সার্ব্বধাতুক-বিভক্তির প্রয়োগে, বিকল্পে ঈড়াগম হইয়া থাকে। যথা,—তুতঃ তুবীতঃ, স্তুতঃ স্তুবীতঃ, রুতঃ রুবীতঃ। শব্দগুরু পাণিনি স্বয়ং এই ব্যবস্থা করিয়াছেন; যথা,—"তু রু স্তু শম্যমঃ সার্ব্বধাতুকে," (৭।৩।৯৫।) এবং কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বামন, জয়াদিত্য ও ভট্টোজিদীক্ষিত প্রভৃতি বৈয়াকরণেরাও এই ব্যবস্থাই মানিয়া লইয়াছেন। নব্যবৈয়াকরণদিগের মধ্যে শাব্দিকচূড়ামণি ক্রমদীশ্বরও এই ব্যবস্থারই অনুগামী। যথা—"তু-রু-ষ্টুভ্যো বা,—অপিতীট্।" কিন্তু, ইতঃপূর্ব্বে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর-মহাশয় তদীয় ব্যাকরণ-কৌমুদীতে, এবং ইদানীং অবিনাশ বাবু তদীয় ব্যাকরণ-শিক্ষায়, কি অনুশাসনের উপর নির্ভর করিয়া, পাণিনির এই পুরাতন ব্যবস্থাকে একপ্রকার অবহেলা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। ইহার অবশ্যই উপযুক্ত কারণ আছে। তবে, এইরূপ সামান্য ও অনতিপ্রচলিত একটি ধাতুরূপ-কথার মত-দ্বৈধে সমালোচ্য মূল-গ্রন্থের যে কিঞ্চিন্মাত্রও গৌরবহানি হয় নাই, তাহা বলা অনাবশ্যক। সমালোচ্য গ্রন্থ সংস্কৃত ব্যাকরণশিক্ষার একখানি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও নিত্যব্যবহার্য্য অভিধান-সদৃশ। ছাত্রেরা সাহিত্যপুস্তক পাঠসময়ে যখন ব্যাকরণের যে কথায় ঠেকিবে, তখনই এই পুস্তকের দুটি পাতা উল্টাইলে, উপযুক্ত সাহায্য পাইবে। পুস্তক আয়তনে বৃহৎ;—ইহার সূত্রসংখ্যা, সুশৃঙ্খলার অনুরোধে, চৌদ্দশত, অথচ মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

২ "ময়মনসিংহের-বিবরণ।—"আরতি-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।" ইহা বিষয়-গত-শিক্ষার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। যাঁহারা বঙ্গদেশের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, এ পুস্তক তাঁহাদিগের উপকারে আসিবে; এবং যাঁহারা বঙ্গীয় প্রদেশ-বিশেষের সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে অভিলাষী, ইহা তাঁহাদিগেরও প্রীতিপ্রদ হইবে। বাবু কেদারনাথ মজুমদার সাহিত্যসেবী যুবা,—ঐতিহাসিক-তত্ত্বের অনুসন্ধানে অধ্যবসায়শীল, এবং বৃত্তান্ত সংকলনে সুপটু। এই পুস্তক প্রণয়ন উপলক্ষে তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। ইহার মুদ্রণ অতি সুন্দর; রচনা সচ্ছল। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি।

৩। "ভারত-প্রদক্ষিণ। শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত।" আমরা স্বভাবতঃই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বড় অনুরক্ত। লোকে উপন্যাস পড়িয়া যে সুখ লাভ করে, আমরা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়া প্রায় তাদৃক সুখ লাভ করিয়া থাকি। বাঙ্গালায় কএকখানি উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। রক্ষিত মহাশয়ের এ ভারত-প্রদক্ষিণও তন্মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশেই সুপাঠ্য। ইহার কোন কোন বিবরণে একটু কবিত্বেরও পরিচয় আছে। নাই কেবল বাঙ্গালার বিশুদ্ধিরক্ষাবিষয়ে আগাগোড়া সকল স্থলে সমান সাবধানতা। যথা,—"স্থল-কমল-গঞ্জন রমণীগণ গৃহকার্য্য তৎপরা।" এখানে 'তৎপরা' শব্দ রমণীর বিশেষণ নহে; 'রমণিগণ' নামক সমাসবদ্ধ পদের বিশেষণ। গ্রন্থকার জানেন যে 'গণ' শব্দ পুংলিঙ্গ। উহাতে যে অকস্মাৎ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা অসাবধানতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ গ্রন্থে 'একত্রিত' প্রভৃতি দুইচারিটি অপপদও স্থানে স্থানে অসাবধানতা হেতু ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু, তথাপি আমরা হৃদয়ের সহিত স্বীকার করি, পুস্তকখানি পাঠে প্রীতিকর; বিষয়াংশে শিক্ষাপ্রদ, এবং ইহার ভাষা সরল ও মধুর।

৪। "ভারত-প্রতিভা,—প্রতাপসিংহ। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ কর্ত্তৃক প্রণীত।" মিবারের অধিপতি মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবন-চরিত, ভারতবাসী হিন্দুর প্রাণপ্রিয় বস্তু। মিত্রমহাশয় আজি সেই বস্তুকে, সুচারু চরিতাখ্যানরূপে সর্ব্বজন-পাঠ্য করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এ পুস্তক উত্তম হইয়াছে। আমরা ভরসা করি বহু লোকে ইহা পাঠ করিবে। কিন্তু মিত্রমহাশয়কে আমরা একটি কথা অকৃত্রিম বিনয়ের সহিত বলিব। তিনি দৌলৎপুর হিন্দু একাডেমির প্রফেসার। ইংরেজী রচনায় ব্যাকরণ-বিষয়ে কিরূপ সাবধান হইতে হয়, তাহা তিনি বিশিষ্টরূপে জানেন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাও যদি মাতৃস্থানীয়া বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ রক্ষাবিষয়ে উপযুক্ত ভক্তি প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে ছাত্রেরা কাহার অনুসরণ করিবে,—

কাহার লেখা পড়িয়া, বাঙ্গালা শিখিবে? তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"আদর্শ ব্যতীত কেহ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সেই আদর্শ স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় হইলেই অধিকতর আদরণীয় ও কার্য্যকরী হয়।"

উপরিধৃত বাক্যে এই 'কার্য্যকরী' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গপদ; উহা কখনও 'আদর্শ' শব্দে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বাঙ্গালা রচনায় এইরূপ পদস্খলন, হয় মুদ্রাকর প্রমাদ, না হয় প্রুফ্‌সংশোধকের অসাবধানতা। যাঁহারা ভারতপ্রতিভার মত উপাদেয় পুস্তক রচনা করিতে পারেন, তাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্রের এমন ক্ষুদ্র কথা পরিজ্ঞাত নহেন, ইহা আমরা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না।

৫। "মর্ম্মোচ্ছ্বাস।—শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায় প্রণীত।—কলিকাতা ভবানীপুর ২নং কেদারনাথ বসুর লেন হইতে শ্রীনবগোপাল চাকি এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" আমরা গ্রন্থের পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে, গ্রন্থকর্ত্রীর একটুকু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। কারণ, তিনি সাহিত্যসমাজে সসম্মান পরিচয় লাভে অধিকারিণী।

কএক বৎসর অতীত হইল, বাবু রামগোপাল চাকি নামক, উত্তররাঢ়ীয় একটি উচ্চসম্ভ্রান্ত কায়স্থ, ঢাকায়, প্রথম সব জজের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রন্থকর্ত্রী রামগোপাল বাবুর কণজন্মা দুহিতা। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় পিতাপুত্রী উভয়েই এক্ষণ পৃথিবীর পর-পার জগতে অবস্থিত। কুসুমকুমারী, স্বর্গগত পিতার পবিত্র স্মৃতির সম্মাননাথ, তাঁহার এই "মর্ম্মোচ্ছ্বাস" পিতৃনামে উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং গ্রন্থপ্রকাশের দুই তিন দিন পরে, আপনিও পার্থিব জীবনের সকল বন্ধন ছেদন করিয়া, পিতৃধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা এ গ্রন্থখানি হাতে লইয়া, গ্রন্থসংলগ্ন একটুকু মুদ্রিত কাগজে, সুযোগ্য প্রকাশক শ্রীমান্ বাবু নবগোপাল চাকির লিখিত শোক-সংবাদ-শীর্ষক পংক্তি কয়টি পড়িয়া, অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। বাবু রামগোপাল বড়ই উদার ও হৃদয়িক পুরুষ ছিলেন। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সুহৃদ্ জ্ঞানে ভালবাসিতাম, এবং তাঁহার সম্পর্কে, তাঁহার এই প্রতিভাময়ী বালিকাকেও সন্তানের মত মনে করিয়া শ্লাঘান্বিত হইতাম। আজি আমরা, সেই বালিকার গ্রন্থ সমালোচনা করিতে, উপবিষ্ট।

"কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তু
দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমীষ্টে।"

গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের বহু কথা বলিবার আছে। আমরা সুযোগ পাইলে তাহা আর এক সময় বলিব। সম্প্রতি এই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, বাঙ্গলায় যদি বিশ পঁচিশ খানি প্রকৃত কাব্যপুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে, "মর্ম্মোচ্ছ্বাস" তাহারই অন্তর্গত একখানি অতি উপাদেয় কাব্য। আমরা শীঘ্র, এমন মধুর, এমন মনোরম, এমনই হৃদয়হারি কবিতা পাঠ করি নাই। ইহার প্রত্যেক ছত্রে প্রতিভারূপিণী সারস্বতী

বাণার সুখ-শ্রুত, সুধাবর্ষি, গম্ভীর ঝঙ্কার প্রাণে যাইয়া স্পৃষ্ট হয়,—প্রত্যেক কবিতাই, উহার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে, ঠিক্ অনুপ্রাণিত বস্তুর মত, হৃদয়-মন কাড়িয়া লয়। লোকে বলে, বঙ্গে কুল-ললনারা কবিতা পাঠে বড় অনুরাগিণী। "মর্ম্মোচ্ছ্বাস" তাঁহাদিগের জন্যই লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া তাঁহারা প্রীত, উপকৃত ও প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইবেন। অপিচ, যাঁহারা বাঙ্গালাসাহিত্যে প্রকৃত অনুরক্ত, তাঁহারাও অবশ্যই ইহার আদর করিবেন। হায়! এ হেন কুসুম, ফুটিতে না ফুটিতেই, অকালে ঝরিয়া পড়িল। কুসুমের জন্য, কাঙ্গালিনী বঙ্গভারতী এক দিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। কুসুম যদি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশীয়েরা পাথরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি খুদিয়া রাখিত। এ দেশে অন্ততঃ তাঁহার একটুকু সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সাহিত্যে গ্রথিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৬। "গীতাগ্রন্থাবলী—প্রথম খণ্ড।—শ্রীশ্রীমদ্ভগবতী গীতা, নারদ-গীতা, উত্তর-গীতা ও যম-গীতা সম্পূর্ণ, এবং শ্রীশ্রীমদ্দেবী-গীতার কিয়দংশ। শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" এই গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বাবয়বে সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ, ইহা গীতাগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড মাত্র। যখন সমস্ত গীতা গ্রন্থ, এক সূতায় গ্রথিত হইয়া, একত্র প্রদর্শিত হইবে, তখন ইহা পণ্ডিত ও অপণ্ডিত উভয় শ্রেণিস্থ পাঠকের কাছেই একটি দুর্ল্লভ সংগ্রহরূপে আদর পাইবে। কেন না, পাঠক তখন গীতা-নিচয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য ও পরস্পর-গুরুক্রম অনায়াসে পরিগ্রহ করিতে পারিবেন। উল্লিখিত পৌর্ব্বাপর্য্য-পরিগ্রহের প্রণালী একটু এখানে প্রদর্শন করিব। ভগবতী গীতায় আছে,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
সর্ব্বং মদর্পণং কৃত্বা মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
যে মাং ভজন্তি মদ্ভক্তাঃ ময়ি তে তেষুচাপ্যহং
নমেস্তিবিপ্রিয়ঃকশ্চিৎপ্রিয়োপিবা মহামতে॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শনৈস্তরতি সোঽপি চ।
ময়ি ভক্তিমতাং মুক্তিরলভ্যা পর্ব্বতাধিপ॥"

যাঁহারা বেদ-ব্যাস সংকলিত ভগবদ্গীতায় অধীতী, তাঁহারা দৃষ্টিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, উপরিধৃত শ্লোক গুলি কৃষ্ণোক্ত উপদেশের পুনরাবৃত্তি মাত্র। এখানে সেখানে দুই একটি শব্দ, অথবা দুই একটি অক্ষর মাত্র, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তনে মূলের কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। যথা,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং।"
"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥
"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥"
"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

এইরূপ শব্দসাম্য ও বর্ণসাম্যে কি প্রতিপন্ন হয়, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠককে বলিয়া

দেওয়া অনাবশ্যক। যাহা হউক, আমরা যে, বাবু মুকুন্দবিহারীর প্রযত্নে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের এরূপ সামঞ্জস্য-সংস্কৃত আলোচনায় সুযোগ পাইলাম, তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাধুবাদ দেই। তিনি ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়াও গীতার গভীর তত্ত্বে অনুরক্ত। ইহা কালের সুলক্ষণ। তাঁহার অনুবাদ অতি সরল;—প্রায় সর্ব্বত্রই অর্থানুরূপ; উদ্যম একান্ত প্রশংসার্হ।

৭। "সাহিত্যসংহিতা।—সাহিত্যসভার মাসিকপত্রিকা। সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।" ইহা একখানি উচ্চশ্রেণির সাহিত্যপত্র, এবং ইহার সম্পাদক ও সহযোগি-লেখকগণ, বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। আমরা এই পত্রিকার ক্রমিক কএক সংখ্যা মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি, এবং পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। পণ্ডিতবর কাব্যবিশারদ বহুকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষার শুদ্ধিশোভারক্ষা বিষয়ে হৃদয়ের সহিত যত্নবান্। আমাদিগের ভরসা আছে, তাঁহার সমুচিত যত্ন ও দৃষ্টি থাকিলে, এবং সুলেখকগণের অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রিবাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতপ্রভৃতি সাহিত্যিকগণের সারগর্ভ প্রবন্ধ ইহাতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইলে, এই পত্রিকা "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতিসাধন" সম্পর্কে আপনার প্রতিশ্রুতিরক্ষায় সমধিক সার্থকতা লাভ করিবে। ইহাতে মেঘনাদ-বধ ও বৃত্রসংহার' নামে একটি বিচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক স্থানে স্থানে লিপিনৈপুণ্য দেখাইয়া থাকিলেও, প্রবন্ধটি কোন অংশেও সাহিত্যসংহিতার যোগ্য হয় নাই। প্রবন্ধটি পাঠের সময়ে, আমরা মহাকবি হেমচন্দ্র এবং তদীয় অতুল কাব্যের গুণ-গৌরব-মুগ্ধ ক্ষমতাবান্ সমালোচক মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্র উভয়কেই স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলাইয়াছি। এতৎ সম্পর্কে ইহার অধিক আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না।

৮। "নববিকাশ। মাসিকপত্রিকা।—সম্পাদক শ্রীহরকুমার সাহা এম, এ; বি, এল্। ঢাকা, গোকুলচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"—ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট সাহিত্যপত্র, এবং বিষয়ের অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্যতায় সুকুমার-মতি পাঠকমণ্ডলের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। লেখকেরা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন হইলেও উচ্চশিক্ষিত; কেহ কেহ, বাঙ্গালা সাহিত্যের সমুন্নতিব্রতে আত্মোৎসর্গ-কামনায়, একান্ত উৎসাহদীপ্ত। নববিকাশের এই মাত্র প্রকাশ হইয়াছে,—এখন পর্য্যন্ত সবে চারি পাঁচ মাসের পত্রিকা পাঠকের পরিচয়ে আসিয়াছে। ইহার প্রচারক্ষেত্র অচিরেই পরিবর্দ্ধিত হইবে;—এবং আশা করি, বাবু হরকুমার সাহা ও বাবু শশিভূষণ বসাক প্রভৃতির লেখা, কালে সাহিত্যসেবিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

চিন্তালহরী।

১

বিশ্বাস আর অবিশ্বাস।

The steps of Faith
Fall on the seeming void, and find
The rock beneath............Whittier.

——বিশ্বাসের পদক্রম,
পড়িলেও যেন-শূন্য ভিত্তিহীন স্থলে,
পায় দৃঢ় শৈল-ভিত্তি, নিম্নে আপনার।

বায়ু যেমন শ্বাস ও প্রশ্বাসের স্বাভাবিক অবলম্ব, বিশ্বাসও সেইরূপ মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার ভাব ও চিন্তার স্বাভাবিক আশ্রয়। আমরা কথাটা প্রায়শঃ কখনও মনে তুলি না,—তুলিয়াও কখনও ভাবিয়া দেখি না, তথাপি বায়ু লইয়াই আমাদিগের জীবনের নিত্যক্রিয়া অতিবাহিত হইতেছে। আমরা নিশ্বাসে বায়ু টানিয়া লইতেছি, প্রশ্বাসে বায়ু বহিঃসারণ করিতেছি; এবং এই ভাবে, দিনে নিশীথে,—জাগরণে ও নিদ্রায়, বায়ুসমুদ্রে সন্তরণ করিয়া, বায়ুর আশ্রয়েই জীবিত আছি। পূর্ব্বতন গুরুজ্ঞানিদিগের অভিধানে, এইহেতুই, বায়ুর এক নাম প্রাণ, আর এক নাম জীবন।

বায়ু যে অর্থে প্রাণ ও জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বিশ্বাসও সেই অর্থে,—সেইরূপ অথবা ততোধিক গাঢ় ভাবার্থে, মনুষ্যের প্রাণ অথবা জীবন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কারণ, মনুষ্য বায়ু বিনা যেমন এক মুহূর্ত্তও শরীর ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, বিশ্বাস বিনাও তেমন এক মুহূর্ত্ত সে প্রাণধারণ করিতে পারে না। তাহার আত্মার অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার, প্রত্যেক প্রক্রমেই, বিশ্বাসের স্বাভাবিক প্রভুতা;—হৃদয় ও মনের প্রত্যেক ভাব ও প্রত্যেক চিন্তায়ই বিশ্বাসের প্রকৃতিসিদ্ধ প্রভাব। ফলতঃ, যে মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়-গ্রথিত বিশ্বাসের সূক্ষ্মতার অলক্ষিত সূত্র একবারে ছিঁড়িয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনুষ্যত্ব অতি ভয়ঙ্কর তমসাচ্ছন্ন হইয়া কেমন এক প্রকার আবর্ত্তবহুল বিপদের গ্রাসে গড়াইয়া পড়ে,—সে উন্মাদ-গ্রস্তবৎ সুহৃৎস্বজনের দুঃখ ও প্রতিবেশীর আতঙ্ক জন্মায়।

কিন্তু, কি বিচিত্র! মানবজীবনের ক্রমবিকাশ, ও কর্ম্মপ্রবাহের সহিত বিশ্বাসের এইরূপ অচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সত্ত্বেও,

অনেকে বিশ্বাসের পবিত্রতম প্রসঙ্গ লইয়া পরিহাস-রসিকতা প্রদর্শন করিতে উৎসুক রহে ; এবং কিছুতেই বিশ্বাস নাই, এইরূপ অলীক, অমূলক, অস্বাভাবিক ও আত্মঘাতি ধারণা চিত্তে পোষণ করিয়া, "কিম্ভূত-কিমাকার" বিকৃত আমোদ অনুভব করিয়া থাকে।

কিছুতেই যাহার বিশ্বাস নাই, পৃথিবীর কে তাহাকে বিশ্বাস করিবে ; এবং তাহার তাদৃশ উদ্ভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল ও আস্থাশূন্য বুদ্ধির কোন্ কথার উপর নির্ভর করিয়া, মনুষ্য তাহার সহিত জীবনের বিবিধ তত্ত্ববন্ধনে অথবা বিচার-বিতর্কের বৃথা ব্যায়ামে প্রয়াস পাইবে ? তাহাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে,——

"কে তুমি মনুষ্য যে, মনুষ্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনার অবিশ্বাসের মোহময় অন্ধকার সম্বন্ধে, কাতর বিলাপ ও করুণ পরিতাপের পরিবর্ত্তে, অভিমানের কর্কশ-কণ্ঠে কথা কহিতে সাহস পাইতেছ ; এবং এ শঙ্কা-জনক রোগ ও শোচনীয় দুঃখদুর্গতির প্রতি-কার-কল্পে আকুলপ্রাণে যত্নপর না হইয়া, ক্ষিপ্তের মত আপনিই আপনার আশ্রয়তরুর মূলচ্ছেদে অগ্রসর হইয়াছ ? তোমার যদি কিছুতেই বিশ্বাস নাই, তবে তোমার আছে কি ? তোমার ঐ উজ্জ্বল ললাট, উজ্জ্বল-তর নেত্রযুগল এবং অভিমানপ্রদীপ্ত উৎসিক্ত মুখচ্ছবির অর্থ কি ? তুমি কি আপনাকেও আপনি 'একজন' বলিয়া জান না,—অগণিত সংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে আপনাকে একটি 'মনুষ্য' বলিয়াও বিশ্বাস কর না ? এই একটি মাত্র সত্যেও যদি অগত্যা বিশ্বাস পোষণ করিতে হয়, তাহা হইলে কত সহস্র গুরুতর সত্য উহার অন্তর্মূলে অনুস্যূত অবস্থায় অস্ফুট বিরাজমান রহে, তাহা কি তুমি ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছ ? * অপিচ, তুমি যাহাকে সম্ভাষণ করিতেছ, সেও যে তোমারই মত আর 'এক জন',—তোমা দ্বারা পরিকল্পিত না হইয়াও সর্ব্বাংশে তোমারই মত আর এক ব্যক্তি,—বাহিরে তোমার মত চক্ষুঃশ্রোত্র ও হস্তপদবিশিষ্ট, এবং অভ্যন্তরে—অন্তরাত্মার সূক্ষ্মতর অবয়ব-সংগঠনে—তোমারই মত স্নেহপ্রীতি ও চৈতন্য-বৃত্তিসম্পন্ন, একথায়ও কি তুমি বিশ্বাস করিতে অসমর্থ হইয়াছ ?"

তাই বলিতেছি, কিছুতেই বিশ্বাস নাই এ কথা কেহ ভুলিয়াও মুখে আনিও না। এমন ভয়ঙ্কর বিকট কথা কখনও মনুষ্যের মুখে শোভা পায় না। কর্ম্মপুরুষ যখন, সমস্ত দিবসের কঠিন পরিশ্রমের পর, গভীর-নিশীথে,—নৈশ নিস্তব্ধতার প্রশান্ত সময়ে, নিদ্রার ক্রোড়ে দেহপ্রাণ সমর্পণ করে, তখন সে ভাবুক আর না ভাবুক, এই অব্যক্ত

* "So intimate, moreover, is the bond which binds together all truths in one indissoluble chain, that the establishment of one great truth often confines a multitude of others, equally important."

Denison Olmstead, L. L. D

বিশ্বাসেই তাহার আত্মা সুস্থির রহে যে, এই সংসার আজও যেমন আছে, কল্যও তেমন থাকিবে;—সংসারের 'কর্ম্মবন্যা' আজও যেমন বহিতেছে, কল্যও তেমনই বহিবে; এবং যে সূর্য্য আজি ঝল-মল সান্ধ্য-দীপ্তিতে পশ্চিম গগনে ডুবিয়া গিয়াছে, সেই সূর্য্যই আবার তাদৃশ ঝল-মল আভায়, ঊষার আরক্তমধুর প্রীতির হাসি হাসিয়া, পূর্ব্ব গগনে উদিত হইবে। কৃষক যখন মুষলধারা বৃষ্টি মাথায় করিয়াও ক্ষেত্রে 'হালি' বপন করে, তখন সে ভাবুক আর না ই ভাবুক, এই বিশ্বাসই তাহার চিত্তকে দৃঢ়স্থির রাখে যে, নিদাঘের পর বৃষ্টির মত, বৃষ্টির পর হেমন্তের হসিতচ্ছবি পৃথিবীকে অবশ্যই আবার প্রফুল্ল করিবে; এবং যে ক্ষেত্র আজি কর্দ্দম-রাশিকলুষিত কদর্য্য বস্তুর ন্যায় নয়নে যার-পর-নাই বিরক্তি জন্মাইতেছে, সেই ক্ষেত্রই সুপক্ব হৈমন্তিক ধান্যের স্বর্ণকান্তিতে নয়ন-মনে সহর্ষপ্রীতি জন্মাইয়া সহস্র লোকের উপজীব্য হইবে। কঠোর-গণনাপরায়ণ জ্যোতির্ব্বিদ্ যখন, গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি গণনা করিয়া, পুরোবর্ত্তি দশ বৎসরের সময়-পঞ্জী রচনা করেন, তখন তিনি ভাবুন আর না ই ভাবুন, বিশ্বাসই তাহার গণিতবুদ্ধির ভিত্তি যোগায়; এবং নভস্তলের দিগন্তবিস্তৃত শূন্যস্থিত গ্রহনিচয়, কখনও কক্ষভ্রষ্ট না হইয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট পথেই নিয়তির রেখা অনুসারে বিচরণ করিবে, এই বিশ্বাস তাঁহাকে স্বকার্য্যে সুস্থির রাখে। অপিচ, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ নিউটন যখন, আপনার সূক্ষ্মতম দৃষ্টির দীপ্তি-প্রভাবে, শতাব্দীর সময়-ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, ধূমকেতু বিশেষের অভ্যুদয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন জগদ্যন্ত্রের নিয়ম-ব্যবস্থিত সুস্থিরতার উপর অটল বিশ্বাসই তাহার প্রতিভায় আলোক ও পৃথ্বীবিশ্রুত বাক্যে সত্যরূপে প্রস্ফুরিত ছিল; এবং তাঁহার নিজ-হৃদয়ে নিঃসংশয় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, মনুষ্য তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, বিশ্বাসই বিশ্বময় কর্ম্মজগতের প্রাণ। বিশ্বাস আছে বলিয়া মানুষ, ব্যোম-যানে আরোহণ করিয়া, বিহঙ্গের ন্যায় বায়ুমণ্ডলে উড়িয়া বেড়াইতেছে;—ডুবারুর পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া, মৎস্যের ন্যায় সমুদ্রের অতল জলে নির্ভয়ে ডুবিতেছে;—নির্ভয়-চিত্তে অন্ধকার খনিগর্ভে প্রবেশ করিয়া অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিতেছে;—দূরবীক্ষণ চক্ষে দিয়া নীহারিকাসমূহের উদয়োন্মুখ নক্ষত্রনিচয়কে করধৃত কন্দুকবৎ পরীক্ষা করিতে চাহিতেছে;—অণুবীক্ষণের সাহায্যে কীটাণুর-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঁকিয়া তুলিতেছে; এবং অতিসূক্ষ্ম সূর্য্য-কিরণকে সূক্ষ্মতর ভাগে বিভক্ত করিয়া, অথবা শূন্যবিলাসিনী বিদ্যুৎপ্রভার রহস্যময় শক্তিমণ্ডলে আশ্রয় লইয়া, প্রকৃতির তত্ত্বরহস্য পরিগ্রহে প্রয়াস পাইতেছে। বিশ্বাস আছে বলিয়া শিল্প, উহার সহস্র হস্তে জড় বস্তুতে

জীবন-সঞ্চারের মত কার্য্য করিয়া, শোভা ও সামর্থ্যের নানাবিধ মূর্ত্তি গড়িতেছে ;—বাণিজ্য, উহার সহস্র শাখায়, তর-তর প্রবাহিত হইয়া,মনুষ্যজাতিকে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, শীতে সুসেব্য বস্ত্র, গ্রীষ্মে সন্তাপহারি সুশীতল সামগ্রী, এবং সকল ঋতুর সকল সময়েই,শারীরিক ও মানসিক সুখ-সন্তর্পণের উপযোগি অনন্ত বস্তু উপহার যোগাইতেছে ;—সাহিত্য, নিত্য নূতন সৃষ্টি দ্বারা, মনুষ্যের আনন্দ বিধানের সঙ্গে সঙ্গেও উপকার সাধন করিতেছে ;—সমাজনীতি ও রাজনীতি, সমাজ ও রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নূতন গড়িয়া, মানবজাতিকে প্রতিদিনই ক্রমোন্নতির নূতনপথ দেখাইতেছে। আর, বিশ্বাস আছে বলিয়াই শিশু, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের কলরব উৎসব পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যালয়ের আপাত-তিক্ত শিক্ষাসব স্বীকার করিতেছে ;—যুবজনেরা নব যৌবনের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সংযমে আকৃষ্ট হইতেছে,—বৃদ্ধ, জীবনের একটি দিন বাকী আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়াও, সংসারের সুদূর-সম্ভাবিত উন্নতির কথা ভাবিতেছে, এবং মুমূর্ষুও, মুহূর্ত্তের তরে চক্ষু মেলিয়া, মনুষ্যকে আপনার মনোগত অভিলাষ জানাইয়া যাইবার জন্য যত্নবান্ হইতেছে।

কিন্তু এ বিশ্বাস, মনুষ্যের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, কাহার উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে ? এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসের কি কোন উপযুক্ত আশ্রয় আছে ? যাহার শাসনে, জলদগ্নিপিণ্ডপ্রতিম কোটি কোটি সূর্য্য, জগদ্ব্যাপি মহাশূন্যে, স্ব স্ব স্থানে বিধৃত রহিবে, আর অনন্ত কোটি গ্রহ ও উপগ্রহ, ক্ষণ মুহূর্ত্তের তরেও বিরত না রহিয়া, অথচ কেহ কাহারও অঙ্গে আপতিত না হইয়া, নিজ নিজ সূর্য্যকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিবে ;—দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন,—শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর নিদাঘ ও বর্ষা, যথানিয়মে আপনাদিগের কার্য্য করিতে থাকিবে ;—শস্যের বীজ, সুকৃষ্টক্ষেত্রে নিষিক্ত হইলে, নিশ্চয়ই এক গুণে শতগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া ফলিবে ;—যাহা সুন্দর ও সুরুচির পরিচায়ক, কালে তাহাতেই লোকের অনুরাগ জন্মিবে, এবং সংসারচক্র যে ভাবে কেন আবর্ত্তিত, বিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত না হউক, উহা ঘুরিয়া, ফিরিয়া, ও অশেষপ্রকারে উদ্ভ্রামিত হইয়া, পরিশেষে অবশ্যই সর্ব্বসুখকর মঙ্গলের পথ লইবে ;— বস্তুতঃ যাহার শাসনে সমস্তই যথাযথ পরিরক্ষিত রহিয়া ক্রমে উচ্চতর উৎকর্ষের দিকে উঠিবে, মনুষ্য কি এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য শক্তি অথবা বিশ্বাসভাজন জনের পরিচয় পাইয়াছে ?

যেমন। সুখী লোকেরা কোন কথারই আমূলতত্ত্ব চিন্তা করিতে অবসর পায় না, তাহারা কখনও এ প্রশ্নেরও প্রকৃত লক্ষ্য বিষয়ে চিন্তা করিতে ইচ্ছা করিবে না ;—সম্ভবতঃ এ প্রশ্নই তাহাদিগের কাছে ভাল লাগিবে না। বৎসর শেষ হইয়া আসিলে, সহস্রপ্রকার সুখ-সম্পদের উপকরণ আপনি আসিয়া পায়ে লুটাইবে, এই বিশ্বাসই বাস্ত-

নীয় বিশ্বাস। ইহার অতিরিক্ত কথায় বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রসঙ্গ তুলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে সকলেরই ইচ্ছা হইবে কেন? তবে, দেশ কাল ও পাত্রবিশেষের নিকট ঈদৃক্ প্রশ্নেরও আদর এবং উত্তর না আছে, এমন নহে। মানবজাতির তত্ত্বসাহিত্য, প্রধানতঃ, এই প্রশ্ন লইয়াই ব্যাপৃত। মনুষ্যজাতির পথ-প্রদর্শকেরা যখন প্রথম চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, তখনই এই প্রশ্ন তাঁহাদিগের মনে অতি গুরুতর সমস্যার মত উপস্থিত হইয়াছে; এবং যাঁহারা এখনও, মানবজগতের গতি ও পরিণতি বিষয়ে সর্ব্বদা ধ্যানস্থবৎ চিন্তা করিয়া থাকেন, এই প্রশ্নই তাঁহাদিগের হৃদয়কে নিয়ত বিলোড়িত করিতেছে।

বিজ্ঞান, উল্লিখিত বিশ্বব্যাপি প্রশ্নের উত্তরে, উহার গভীর-নিঃস্বনা ভেরী নিনাদিত করিয়া, গর্ব্বসহকারে ঘোষণা করিতেছে,—"বিশ্বাসের একমাত্র অবলম্ব সত্য। সত্য ভিন্ন এ সংসারে মনুষ্যের আর আশ্রয় নাই,—বুদ্ধি ও বিবেকের আর দাঁড়াইবার ভিত্তি নাই,—হৃদয়েরও আর বিশ্রাম-স্থান নাই; অতএব তুমি একমাত্র সত্যের অন্বেষণ ও অনুসরণ কর। সত্যই তোমাকে উদ্ধার করিবে।" বিজ্ঞান-গুরু সার্ উলিয়ম্ ক্রুক্স, আজি কএক বৎসর হইল, বৈজ্ঞানিকদিগের মহামণ্ডল-সভার বার্ষিক অধিবেশনে, বৃষ্টলনগরে বলিয়াছিলেন যে, "সত্যই সংসারের সারসর্ব্বস্ব। সত্যকে যে উপাসকের প্রাণে না ভজে, না পূজে—সত্যের সম্মানরক্ষার্থ যে আপনার পুরাতন শিক্ষা, পুরাতন সংস্কার ও প্রাণের সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বতন প্রিয় ধারণা অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হয়, বিজ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই—বিজ্ঞান-মন্দিরের বহির্দ্বারেও তাহার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ।" * সার্ উইলিয়ম একা একজন হইলেও, ইদানীং তিনি বিজ্ঞানজগতে একটি অতিবড় উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভস্বরূপ, এবং বৈজ্ঞানিকদিগের পূজাস্পদ প্রতিনিধি। তিনি তাঁহার পদোচিত প্রতিনিধিত্বের উপর নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইয়া যাহা বলিয়াছেন, সেই কথাই সমস্ত বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ের কথা। কেন না, যে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক হইয়াও সত্যকে আরাধ্য বস্তুর মত উপাসনা করিতে অগ্রসর নহে, তাহার বিজ্ঞান খেলার পুতুল।

শিল্পী ও সাহিত্যিক, যেন বিজ্ঞানের সকল কথা সম্যক্ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া, অথবা সে কথায় ভালরূপ আকৃষ্ট না হইয়া, আর এক দিক্ হইতে ধীরে ধীরে কহিতেছে,—"সত্য কাহাকে বলে তাহা ত আজিও বুঝি নাই,—পাইলেট বুঝেন নাই,

* Sir William Crooks, British Association নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভার সম্বাৎসরে, বৃষ্টলনগরে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই মুহূর্ত্তে লেখকের সম্মুখে নাই। সুতরাং শুধু স্মৃতির উপর নির্ভরেই তাঁহার কথার ভাবানুবাদ সংকলিত হইল। পাঠক মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিলে প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

আমরাও বুঝি নাই। * সত্য অপ্রত্যক্ষ, উহাকে কি প্রকারে বুঝিব? বুঝি সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ জগন্ময় সৌন্দর্য্যস্বরূপ মহাতত্ত্ব। সুতরাং সৌন্দর্য্যই বিশ্বাসের একমাত্র আধার। সৌন্দর্য্য সূর্য্যের মেঘ-বিলসিত শ্বেত-পীত-হরিত-লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে চক্ষের উপর ঝিকিমিকি করে,—চাঁদের জ্যোৎস্নায় উছলিয়া পড়ে,—নদীর জলে ঢেউ খেলায়,—ফুলের ঠোঁটে মুচ্‌কি হাসে,—লতার দোলনে দুলিত রহে, পর্ব্বতের উচ্চতা ও সমুদ্রের বিস্তারে আপনার বিশালতা দেখায়,—সুজনের নয়নে স্নেহে গলে; সুন্দরীর সুখ-স্ফুরিত সলজ্জ প্রেমে কেমন এক প্রকার শোভা পায়; এবং শিশুর সুকুমার-স্নিগ্ধ সুললিত কান্তি হইতে আরব্ধ হইয়া, সংসারের অনন্ত কোটি বস্তুতে সকলেরই দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়। সৌন্দর্য্য বালক ও বৃদ্ধ উভয়েরই সমানসেব্য,—মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েরই সমান আরাধ্য। সৌন্দর্য্যের নিত্য-সিদ্ধ অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বাদ-বিতর্ক নাই। উহাকে দেখিলেই উহাতে বিশ্বাস হয়,—প্রাণ উহার দিকে ঢলিয়া পড়ে,—এবং হৃদয় উহার উপাসনার জন্য অধীর হইয়া উঠে। তাই, আমরা সতত শতপ্রকারে উহারই উপাসনা করি;—মাটীতে উহার পুতুল গড়ি, চিত্রে উহার মূর্ত্তি আঁকি, পাথরে উহার প্রতিমূর্ত্তি খুদি, এবং কাব্যে ও সাহিত্যে উহারই অশেষবিধ বর্ণনা করিয়া, মনুষ্যের চিত্তকে উহার দিকে টানিয়া লই। যাহার কিছুতেই বিশ্বাস নাই, জগদাবরণভূত সৌন্দর্য্যসাগরে তাহারও কিছু কিছু বিশ্বাস আছে। সৌন্দর্য্যে যখন মনুষ্যের প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ জন্মে, তখন সহজেই সে পবিত্রতা ও পরিত্রাণের পথ পায়।"

কঠোর-ভাষিণী সমাজ-নীতি এবং কঠোর-তরা-রাজনীতি, বিজ্ঞান ও শিল্প, উভয়কেই যেন অবজ্ঞা করিয়া, তৃতীয় এক দিক্ হইতে কহিতেছে,—"চাহিয়া দেখ, একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ,—মানুষ এ জগতে কি দুঃসহ কষ্টে দিনপাত করিতেছে, একবার তাহা স্বচক্ষে দেখ। ঐ দেখ শতসহস্র দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত দুঃখিনী, কোলের শিশুকে পশুর মত দূরে ফেলিয়া, অর্দ্ধপক্ক অন্নমুষ্টির জন্য, ডাকিনীর মত মুখ-ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছে;—ঐ দেখ বড়বার নিঃশ্বাস-বহ্নির মত মগরাসুরের নাসানির্গত প্রতপ্ত শ্বাসে, সোনার রাজ্য সহসা দগ্ধ হইয়া দগ্ধশ্মশানে পরিণত হইতেছে;—ঐ দেখ দুর্ব্বলের যাহা কিছু ছিল, বলদৃপ্ত দানব তাহা কাড়িয়া লইয়া খল-খল হাসিতেছে, অবলার হৃৎপিণ্ড ও হৃদয়-গোপ্য পবিত্র সম্মান পদতলে নিষ্পেষণ করিয়া মনুষ্যাকৃতি পিশাচ এই পৃথিবীকে কিরূপ নিবিড় নিরয়-কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছে; এবং ঐ দেখ সুখ-স্ফীত সমৃদ্ধেরা, কাঙ্গালের বুকের রক্তে পুষ্ট হইয়া, সেই কাঙ্গালকেই আবার, কতপ্রকার নির্লজ্জ নিগ্রহে যাতনা দিতেছে। জগতের এইরূপ

* 'What is Truth? Said jesting Pilate; and would not stay for an answer. Bacon.

দুঃখদুর্গতি সম্মুখে থাকা সময়ে, মনগড়া সত্য ও মনঃকল্পিত সৌন্দর্য্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে না। সংসারে বিশ্বাসের একমাত্র বস্তু মঙ্গল, অথবা মঙ্গলাত্মিকা উন্নতি। থাকুক আর না থাকুক, অথবা তাদৃশ মঙ্গলের দর্শন-লাভ সহজ না হউক, মঙ্গলই মনুষ্যের উপাস্য,—মঙ্গলই মনুষ্যের আরাধ্য। সুতরাং সকলেই মঙ্গলের অন্বেষণ কর; এবং যাহাতে সর্ব্বজনীন মঙ্গল স্বরূপতঃ আবির্ভূত হইয়া এ সংসারকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, তদর্থে কর্ম্মপরায়ণ হও। যদি মঙ্গল অর্থাৎ জগন্নিহিত শিব-শক্তির উদ্ধারার্থে সত্য কিংবা সৌন্দর্য্যকেও উপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও কেহ ভীত অথবা কুণ্ঠিত হইও না। ইহা নিশ্চয় যে, মঙ্গলই বিশ্বের দূর-ভাবী দিব্য আদর্শ। অতএব, পৃথিবীর যেখানে যে আছ, সকলেই মঙ্গলের অভ্যুদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মঙ্গলব্রত হও।

বিশ্বাসের প্রাণস্ফূর্ত্তি ভক্তিতে। কেন না, যেখানে বিশ্বাস, সেখানেই ভক্তি; যেখানে ভক্তি, সেখানেই বিশ্বাস। জলের মৃদুসেক বিনা কুসুমের বিকাশ যেমন অসম্ভব, ভক্তির অমৃত-সেক বিনা বিশ্বাসের বিকাশও সেইরূপ অসম্ভব। বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি বিশ্বাসের উৎপত্তি পক্ষে কারণ হইলেও, উহা ভক্তির সুখ-সঙ্গ বিনা কোথাও মুহূর্ত্তকাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না; ভক্তিকে প্রাণের মধ্যে পুষিতে না পারিলে,—ভক্তিতে একেবারে দ্রবীভূত না হইলে, আপনার অস্তিত্বও দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তি, বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি সকলের সকল কথাই, সুরভি কুসুম জ্ঞানে, শিরোণতির সহিত গ্রহণ করে, এবং প্রীতির সূতার মালা গাঁথিয়া, প্রসন্নমূর্ত্তি দেবতার ন্যায় সকলকেই সমান আদরে বলিয়া থাকে,—

"তোমরা যে যাহা কহিতেছ, তাহা আমারই প্রাণের কথা;—তোমাদিগের সমস্ত কথার উপর পুষ্পবৃষ্টি হউক, এবং এ সকল কথার প্রত্যেক অক্ষর মানবজাতির সমবেত-হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহুক। তুমি বিজ্ঞান আছ বলিয়া আমি দাঁড়াইবার ঠাঁই পাইয়াছি, নহিলে কোথায় উড়িয়া যাইতাম;—তুমি শিল্প সৌন্দর্য্যের পট দেখাইয়াছ বলিয়া আমি দেখিয়া নয়ন যুড়াইয়াছি, নতুবা কাহার পানে চাহিতাম; আর তোমরা আর সকলে, কর্ম্মফলে রত্ন ফলাইয়াছ বলিয়াই আমি জগন্মঙ্গলের শীতল ছায়া লাভ করিয়াছি, নচেৎ কোথায় যাইয়া আশ্রয় পাইতাম। তোমাদিগের প্রত্যেকের নাম জয়যুক্ত হউক।

ভক্তির স্বাভাবিক সমন্বয়রূপ মহাভাষ্যে বিজ্ঞান, শিল্প ও সমাজনীতি প্রভৃতি সকলেরই কিরূপ সুন্দর ও সুখময় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে, আর সে সামঞ্জস্য যুগান্তর হইতে যুগান্তরেও মনুষ্যের প্রাণে কিপ্রকার আশ্চর্য্য শান্তি দান করিয়া আসিতেছে, তাহা হৃদয় পাঠককে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, বিজ্ঞানের ভাষায় যাহার নাম সত্য, ভক্তির বৈদিক-সূক্তে তাহাই প্রাচীন ঋষির প্রাণ-

প্রদ মূলমন্ত্র—ওঁ তৎ সৎ—ওঁ তৎ সৎ—ওঁ সৎ সৎ। শিল্প ও সাহিত্য যাহাকে সৌন্দর্য্য বলিয়া সাধনা করে, ভক্তিশাস্ত্রে তাহারই নাম "ভুবন-মোহন-সুন্দর।" আর, সমাজ-নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি মঙ্গলসাধিকারা যে ক্রমোদগম-শীল মঙ্গল লইয়া সতত কর্ম্মনিরত, ভক্তির গভীরতম তত্ত্ববিদ্যায় তাহারই নাম শিব। যখন এই তিন মহাতত্ব—এই একে তিন,—তিনে এক—এই বিশ্বময় (Trinity) অর্থাৎ ত্রিনীতি, এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া, ঋগ্-যজুঃ-সামের সম্মিলিতকণ্ঠে,—সজল-জলদের সুগভীর নিস্বনে, সংসারে ব্যাহৃত হয়, তখন সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনি হইতে থাকে,—সকলেই তখন যেন চিত্তশ্রুতিতে শুনিতে পায়,——

সত্যং শিবং সুন্দরম্,—সত্যং শিবং সুন্দরং।

এই পুরাতনী মহাব্যাহৃতি ভারতে প্রথম উদীরিত হইয়া থাকিলেও,—ইহা এইক্ষণ সমস্ত পৃথিবীর সাধারণ সম্পত্তি। কারণ মনুষ্যের প্রাণ ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ইয়ুরোপীয়দিগের ভাষায় এই মন্ত্রেরই নাম——

"The True, The Beautiful, and
The Good."

কর্ণ কে ?

কর্ণ ও কবিত্বের সম্বন্ধ কি ?

এই হীনবীর্য্য কাপুরুষ প্রাণবিহীন ভারত-সন্তান কি একবারও জিজ্ঞাসা করিবে, কর্ণ কে?—একবারও কি এই মহামহিম চরিত্রের আলোকসামান্য অনন্ত সৌন্দর্য্যাবধারণে যত্নপর হইবে? আর, একবারও কি, এই অতি উচ্চতম স্বর্গীয় আদর্শের সহিত আপনাদের উপস্থিত শোচনীয় অধঃপাতের তুলনা করিয়া, লজ্জা ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইবে? হায়! যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে ভারতসন্তান আর ভীষণ অধোগতির নিবিড় ও আবিল কূপে নিমগ্ন রহিত না—অত্যাচার, পাপ, পৈশাচ ও পাশব কার্য্যদ্বারা গরীয়সী ভারতভূমির কদাপি কলঙ্ক বর্দ্ধন করিত না—বীর-প্রসূ গৌরব-ভূয়িষ্ঠ এই তীর্থক্ষেত্রের এতাদৃশী অবস্থা সঙ্ঘটিত করিয়া ইহাকে শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিত না! হায়! সেইজন্যই ত বলিতেছিলাম হিন্দু সন্তান অতীত আদর্শের পূর্ব্ব-পুণ্য-স্মৃতি একেবারে হারাইয়া ক্রমশঃ অপরিহার্য্যরূপে বিনাশের চরমপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে। কেবল সর্ব্বব্যাপি হাহাকার, নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস আর সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস এই শোচনীয় বিকারগ্রস্ত ভারতবাসীর একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছে। যদি সৌরজগৎ কোনও এক

অপরিজ্ঞেয় আকস্মিক কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শনৈশ্চরাদি সুদূরবর্ত্তী গ্রহসহ হতভাগ্য, দীনতাগ্রস্ত ভারতবাসীর মস্তকদেশে নিপতিত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস কার্য্য সমাহিত করিত, কিংবা সাগর-সলিল একীভূত হইয়া ভারত-ক্ষেত্রকে মহাপ্লাবনে পরিপ্লাবিত করিত, তাহা হইলেও বোধ হয়, এই দুর্ব্বহ কলঙ্ক-ভার আংশিক অপনোদিত হইত,—এই ভীষণ কলঙ্ক-কালিমা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রক্ষালিত হইত।

সেইজন্যই আজি, বহুবৎসর পর, প্রশ্ন উঠিয়াছে,—কর্ণ কে? সেইজন্যই এখন জিজ্ঞাস্য, কর্ণ ও কবিত্বের সম্পর্ক কি? যে সকল পুণ্য শ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় বীর-কেশরিগণ শূর-লীলা-নিকেতন ভারত ক্ষেত্রের চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কর্ণ সেই সকল মহিমার্ণব বীর-বরেণ্য-বৃন্দের এক অতি প্রধান বীর। কিন্তু, এই কি এ দেবচরিত্রের প্রকৃত পরিচয়, না এই স্থানেই কি এই অসংখ্য অবদান-চিত্রিত শ্রেষ্ঠ চরিত্রের পরিসমাপ্তি?

মহাভারতের মহাকবি, কর্ণের যে আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্থলে স্থলে ঈষৎ অস্পষ্ট এবং মলিন ভাবাপন্ন। বোধ হয়, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং ভীমার্জ্জুনের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে যাইয়া এই মহা বীরকে, ইচ্ছাতেই হউক, আর অনিচ্ছাতেই হউক, একটু অন্তরালে রাখিয়াছেন; এবং তুলিকা বা কলঙ্ক-রেখাপাত দ্বারা স্বকীয় উদ্দেশ্য সংসাধনে প্রযত্নবান্ হইয়াছেন। সেই জন্য মহাকবির কর্ণচরিত্র এক অতি বিচিত্র রহস্য, এবং সেই জন্যই অতীব স্থির ও ধীরভাবে পর্য্যালোচনা না করিলে, এই মহাচরিত্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-গৌরবচিত্র সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। বিশেষতঃ বহু সংশয়চ্ছেদিনী যে সহৃদয়তার সাহচর্য্যে ও সাহায্যে, মানব-চরিত্রের মাহাত্ম্য ও বিরোধ করিতে হয়, অবস্থার বিবর্ত্তনে এবং কাল-বৈগুণ্যে সেই সহৃদয়তারও সবিশেষ তিরোধান হইয়াছে। সম-প্রাণতা ও সহৃদয়তার উজ্জ্বল চক্ষু ব্যতিরেকে, চরিত্র মাহাত্ম্যের অনুপম বৈচিত্র্য বা অপ্রতিম সৌন্দর্য্য-ভঙ্গী কদাপি হৃদয়ঙ্গম হয় না। সেই জন্যই আজ সুগভীর দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কহিতেছি, কর্ণ চরিত্রের মর্য্যাদা হয় নাই; এই সংকোচ মানব-সিংহের অগাধ-সৌন্দর্য্যসাগরের ইয়ত্তা হয় নাই, আর, সঙ্গে সঙ্গে যে উদ্দেশ্যে এ চরিত্রকে অপার্থিব আদর্শ সৌন্দর্য্যের অন্বিতা, তাহারও পরিসংশোধন দ্বারা সম্যক্ মীমাংসা ও হয় নাই।

কর্ণ কে? এই মহাজীবন নাটকের প্রথমাঙ্ক কোথা হইতে আরব্ধ হইয়াছে? আর কোথায়ই বা ইহার প্রসার, বিস্তৃতি এবং উপসংহার? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাকবি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য-পরবশ হইয়া কর্ণকে ভস্মাচ্ছাদিত অনল এবং মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অঙ্কিত [illegible], তাহা হইলেও প্রকৃতির বিবর্জ্জনীয় নিয়মে

যখন অনিবার্য্যরূপে সেই মেঘাবরণ ও ভস্মাচ্ছাদন উন্মোচিত হইয়াছে, তখনই মহাবীর স্বীয় সর্ব্বাতিশায়িনী প্রভায় সকলকে সমুদ্ভাসিত ও বিস্মিত করিয়াছেন; এবং যাঁহারা সেই আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া, এই দেবচরিত্রের বিশ্লেষণে প্রয়াসপর হইয়াছেন, তাঁহারা চকিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নত-জানু হইয়া, ভাব-গদ্গদ চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া, এই দেব-বিগ্রহের পূজা করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক, কোন্ স্থানে কর্ণ-চরিত্রের প্রকৃত অবতারণা? কোন্ স্থানে তিনি তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ পার্থিব জীবনের সূত্রপাত করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থানে, এই অতি মূলপ্রদেশে—যে ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন—তদ্দ্বারা প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া দূরে থাকুক বরং এই অলৌকিক রহস্যময় জীবন অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্নই হইয়াছে। মহাকবির বর্ণনায় এই জানা যায় যে, তিনি যুধিষ্ঠির-জননী কুন্তীর কানীন পুত্র। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই, তিনি জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। কোনও এক অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয় কারণ ক্রমে, রাধা নামধেয় কোনও সূত, তাঁহাকে শৈশবে প্রতিপালন করেন। মহাভারতে তিনি তজ্জন্যই রাধেয় বা সূত-নন্দন বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ উল্লিখিত হইয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি সূর্য্য-তনয় বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। এই বৃত্তান্ত যে নিঃসন্দেহ গাঢ় অন্ধকারময়—তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্রও দ্বিধা হইতে পারে না। কতটুকু সত্য, আর কতদূর কল্পনার ভাগ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করাও বড় অধিক সহজ নহে। তবে ইহা একবাক্যে স্বীকার্য্য যে, তিনি যুধিষ্ঠিরজননী পৃথারই অপত্য। ঘটনার অপূর্ব্ব-চক্রে রাজ-পরিবারে বা রাজ-প্রাসাদে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, এবং রাজকীয় সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগও তাঁহার জীবনের প্রথমভাগে আদৌ ঘটিতে পারে নাই। কর্ণ এই ভাবেই, সংসার-মহার্ণবে আপনার জীবন-তরণী ভাসাইয়া দেন, এবং এই ভাবেই দুঃখদুর্দ্দশার সুদারুণ ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা আন্দোলিত হইয়া, বহুদৃশ্যময় চরিত্র, অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখেন। ফলতঃ, এই অসংখ্য ভাববিলসিত জীবনের এই অতি নিবিড় বিষাদপূর্ণ চিত্র যেন, কর্ণচরিত্রানুসন্ধি ব্যক্তির হৃদয়ে, কি এক প্রবল ঔদাস্য এবং তমোময়ী ভীতির সঞ্চার করে। এই অংশ পাঠ করিয়া, সত্যসত্যই যেন পার্থিব শাসনের রৌদ্রমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, প্রাণ আপনা হইতেই কেমন কাতর, অলস ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এইরূপে সাংসারিক নিগ্রহের কঠোর-দণ্ড মস্তকে গ্রহণ করিয়া মহাবীর সংসারে অবতীর্ণ হইলেন। রাধাও তাঁহাকে সুত-নির্ব্বিশেষে পরিপালন করিতে লাগিলেন। কর্ণও রাধাকে পিতৃজ্ঞানে অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। মহাবীর যুদ্ধক্ষেত্রে যে অনতিক্রমণীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান

পূর্ব্বক, অবনীমণ্ডল সন্ত্রাসিত করিয়াছেন, হৃদয়ের কুসুম-সুকুমার উচ্চবৃত্তির অনুশীলনেও সেইরূপ আজীবন স্বকীয় প্রাধান্য অটুট ও অক্ষত রাখিয়াছেন। পরার্থসাধিনী দয়া, আনন্দময়ী ভক্তি, প্রাণামৃত স্নেহ এবং জীবনতোষিনী শ্রদ্ধা প্রভৃতি এই বিশ্ববিমোহন চরিত্রের চির-ভূষণ ছিল, এবং সেই সকল সাধীয়সী বৃত্তি, কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অক্ষয় ও অভেদ্য বর্ম্মে নিরন্তরই সুরক্ষিত ছিল। এইরূপে রাধার সেই নিভৃত আলয়ে, দিন দিন শশিকলার ন্যায় মনস্বী কর্ণ প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন,—দিন দিন স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, কার্য্যতৎপরতাও উপচিত হইতে লাগিল। যে অমোঘ ক্ষাত্র পরাক্রম, এক দিন ভীমবিজয়ী পার্থের পর্য্যন্ত ভীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাও দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কিন্তু, এ তেজ অন্তর্নিরুদ্ধাবস্থায় ছিল। তখনও বাহিরে প্রকটিত হইবার উপযুক্ত সময় বা অবকাশ পায় নাই। যাহা হউক, এই ধূমায়মান অনল একদিন শুভ সুযোগ পাইয়া, বিশ্ববিজেতা পাণ্ডবের পর্য্যন্তও সন্ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল; এবং কুরুপতি দুর্য্যোধনের অটুট আগ্নেয়াস্ত্র স্বরূপ হইয়া বিবিধ উৎকট কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিল।

হস্তিনানগরীতে কুরুপাণ্ডবগণ বীররসেবঅভিনয় শিক্ষা করিতেছেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বালকবীরগণের অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষাভার গ্রহণপূর্ব্বক, পঞ্চালেশ্বর মহারাজ দ্রুপদের অনিষ্টাচরণের অবকাশ অন্বেষণ করিতেছেন। রাজকুমারগণ বহুদিক্‌প্রসারিণী প্রতিভাগুণে, নানা অস্ত্রে সবিশেষ শিক্ষা লাভ করিলেন। এই সময়ে কর্ণও ক্ষত্রিয়শোণিতের প্রবল তাড়নায় উদ্দীপিত হইয়া দ্রোণ-শিষ্যগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। আচার্য্য সমদর্শি ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত হইলেও, ক্ষত্রিয় রাজ-নন্দনগণের উপদেষ্টৃভার গ্রহণ করায়, তদীয় বংশানুবন্ধি নৈসর্গিক ব্রাহ্মণ্য ভাব, ক্ষত্রিয়াভিমানের দূষিত সম্পর্কে, কিছু কলুষিত হইয়াছিল। সেই জন্যই তিনি, অস্ত্রশিক্ষার্থী কর্ণকে বিজাতীয় রোষমিশ্রিত অবজ্ঞা সহকারে, উপেক্ষা করিলেন। কর্ণ কৌরব-গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া, জগতীতলে অতুল ভুজ-বীর্য্যের অক্ষয় পতাকা উড্ডীন করিবেন বলিয়া, হৃদয়ে যে প্রবল আশা পোষণ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাহার মূলদেশ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইল। তিনি অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হইলেন। কিন্তু, এই নিদারুণ প্রাণভেদি অপমান, তিনি অনন্যসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে নীরবে সহ্য করিলেন। তাদৃশ আশাবিভঙ্গ হেতু, অণুমাত্রও বিচলিত বা অধীর হইলেন না। এই শ্রেণীর নিগ্রহ মস্তকে লইয়াই ত, তিনি ভীষণ পরীক্ষাময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আর নিগ্রহের সহিত মহাসংগ্রামে নিরত থাকিয়াই ত, মহাবীর তদীয় মহাজীবনের উচ্চব্রত উদ্‌যাপনে বাধা হইয়াছে। স্নেহমমতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপিণী জননী, যাঁহাকে নিসর্গ সুলভ নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র

ত্যাগ করিয়াছেন, জননী হইয়াও স্বকীয় যে হৃদয়-কুসুম পুত্রকে পর্য্যন্ত বৃন্তচ্যুত করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, এবং মনুষ্যভাবে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া, ঘৃণিত-পৈশাচ বা রাক্ষস ভাবের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্নেহের অদ্বিতীয় ও চরম প্রকর্ষ-স্বরূপ প্রাণের নন্দনকে পর্য্যন্ত অপার দুঃখসাগর-সলিলে ভাসাইয়া দিয়া, বজ্রকঠোর হৃদয়ে স্থির ও ধীর রহিতে পারিয়াছেন, সেই পক্ষে মহাবীর কর্ণের, ধরণী তলে আর কি অসহনীয় আছে? নিগ্রহ ও অত্যাচারই এই জীবন-নাটকের আদি, মধ্য ও অন্ত। কর্ণ অম্লানবদনে ও অকাতরে এই পার্থিব দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচার সহ্য করতঃ, নীরবে অভিমানের দৃঢ়ভূমির উপর দণ্ডায়মান রহিয়া, এই প্রবল ও প্রচণ্ড শাসন মস্তকে গ্রহণ করিলেন। যিনি গাম্ভীর্য্যে হিমাদ্রি—ধৈর্য্যে সর্ব্বসহা স্বয়ং বসুমতী তুল্য,—স্থৈর্য্যে সাক্ষাৎ প্রশান্ত মহাসাগর,—সেই বীরসিংহ, এই নিদারুণ অপমান অবিকৃত ও সৌম্যভাবে হৃদয়ে পাতিয়া লইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি? কিন্তু, স্বাভাবিক অনিবার্য্য অভিমানানল, প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিল। তদীয় হৃদয়শোণিত উষ্ণ হইল, পরভয়েও অভিভূত হইল না। অভিমানের পর উচ্চতর অভিমানের সহিত, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, যেরূপে হউক, তিনি এই ঘোরতর অবমাননার প্রতিশোধ লইবেন। এই প্রতিশোধপ্রতিজ্ঞা কোনও দৈব-সাধন-বাসনার সহগামিনী বা সহযোগিনী নহে। তিনি আপনার বিপুল শক্তিতে সততই পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতেন। তিনি স্পষ্ট জানিতেন, এবং হৃদয়ে নিরন্তর উপলব্ধি করিতেন যে, স্বীয় বাহুবল, উপযুক্ত অবকাশ ও যোগ্য উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হইলে, তিনি কালে ভারতীয় বীর-বরেণ্যবৃন্দের এক উচ্চতম আসনে সমাসীন হইতে পারিবেন। সেই জন্যই, তিনি যেন অন্তর্নিহিত হৃদয়-বেদনা আজ একবারে বিস্মৃত হইয়া, স্বীয় অস্ত্র-শিক্ষার বলবতী ও উদ্দাম লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য, বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ইহাই ত প্রকৃত অভিমান! যিনি যে পরিমাণে, এই সর্ব্বার্থসাধক উচ্চাভিমানের অধিকারী, তিনি সেই পরিমাণে মানবজাতির শীর্ষপ্রদেশে আসন পাইবার যোগ্যপাত্র। নতুবা পার্থিব নিগ্রহের দুই একটি কঠোর আঘাতেই যাঁহারা একেবারে অবনত বা পরিভূত হইয়া জগতে কোনও আশ্রয়স্থল না দেখিতে পাইয়া, ভয়ে বিহ্বল ও ব্যাকুল হইয়া, মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন, কিরূপে সেই পুরুষার্থশূন্য ক্ষীণ-প্রাণ মানবমণ্ডলী অবনীতলে বিজয়-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবেন? যাহা হউক, কর্ণ স্বাভাবিক অস্খলিত ধৈর্য্য ও অকুণ্ঠিত অধ্যবসায়সহকারে, উপযুক্ত গুরু ক্ষত্রিয়ারি ভৃগুসিংহ ভার্গবের শিষ্যত্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক, সময়ে অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করিলেন। এই সময়, কুরুপতি দুর্য্যোধন কি এক অনির্দ্দিষ্ট ও অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃ রাধেয়কে পরম-মিত্রজ্ঞানে প্রীতি উপচারে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। এই অহেতুক

প্রণয়, কাল-স্রোতে অবিচলিত দার্ঢ্য লাভ করিয়া প্রীতিযোগের উচ্চতম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিল।

যাহা হউক, পার্থ, কর্ণের প্রকৃত স্বরূপ এই সময়েই কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বীরের হৃদয়-মুকুরে অন্য বীরের অন্তর্নিহিত বীরভাবের সম্যক্ প্রতিবিম্ব হয়। মহাবীর অর্জ্জুন, সেই জন্যই কর্ণকে আপনার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া, আজীবন তদুপরি বিকট জিঘাংসা পরিপোষণ করিয়াছিলেন। কর্ণও পার্থকেই আপনার দুর্জ্জয় বিক্রমের পরীক্ষাস্থল জ্ঞান করিয়া চিরকালই কৌরব-বীর দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কর্ণের ভাগ্যাকাশে, এই সময় যেন সংসার-চক্রের অনিবার্য্য ও সার্ব্বভৌম পরিবর্ত্তন প্রবাহে, ক্ষণিক সুখ-নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল। কৌরব-পতি তদীয় নিরুপধি প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কর্ণও প্রতিদানে কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়া, সেই রাজ-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এ অতি আশ্চর্য্য প্রীতি-ভাব-প্রতিপাদক শুভ-সম্মিলন। বোধ হয়, এই শুভ-সংযোগই ভারতীয় রাজনৈতিক অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তনেরও হেতুরূপে, পরিণত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন, কর্ণের শৌর্য্য ও বীর্য্যে সর্ব্বদাই আস্থাবান্ ছিলেন; এবং তাঁহাকেই আপন জীবনের একমাত্র কর্ণধার জ্ঞানে তদীয় প্রবল-অরি পাণ্ডবের বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কর্ণও দুর্য্যোধনকেই আপনার প্রতিপালক ও আশ্রয়-বোধে আজীবন প্রাণপণে তাঁহার মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত ছিলেন। কৃতজ্ঞতার এরূপ উচ্চ ও উজ্জ্বল উদাহরণ, পার্থিব ইতিহাসে বড় দুর্লভ। মহাকবি, মহাবীর কর্ণকে, কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ আদর্শ স্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। ফলতঃ তিনি এই বিষয়ে কর্ণের যে চিত্তহারিণী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই, প্রাকৃতরাজ্যের অনেক অধিক দূর-বর্ত্তিনী। মহাবীরের বহু তরঙ্গান্দোলিত জীবন-সাগরের ইহা প্রাণদ অমৃত। সমগ্র হিন্দুজাতির ইহা অনুপম গৌরব। মানব-হৃদয়-সিংহাসনে কর্ণ অনন্তকাল সমাসীন রহিবেন। ভাবগ্রাহিগণ চিরকাল প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লইয়া স-ভক্তি ও সানন্দে তাঁহার উপাসনা করিবে। মহাকবি নখ-দর্পণে কর্ণ-চরিত্রের এই প্রধান ভাগ খুলিয়া দেখাইয়াছেন,—এই অংশে মহাভারত-মহাসমুদ্রে কর্ণের তুলনা নাই।

এইরূপে কর্ণ, অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজারঞ্জনে নিরত রহিলেন। রাজ্য-শাসনেও তাঁহার অসাধারণ পটুতা ছিল। স্বকীয় অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও সাধীয়সী নীতিবলে, রাজ্যের ভূয়সী শ্রীসাধন করিলেন। অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই, অঙ্গ-রাজ্য, সুবিশাল ভারতক্ষেত্রে অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

এই সময়, তাঁহার জীবনে এক অতি অলৌকিকী ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব ঘটনায়, এই সমুচ্চ জীবনের

গৌরব অনন্তগুণে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, কর্ণ যেরূপ অতিমানুষিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেরূপ কর্ত্তব্যধর্ম্মের পবিত্র চিত্র, কবির চরম সৌন্দর্য্য এবং দার্শনিকের সারাৎসার উচ্চতম আদর্শ। কবি এইরূপ সৌন্দর্য্য নির্ণয়েই ত সর্ব্বদা ব্যস্ত। যে কবি যতদূর পর্য্যন্ত এবম্বিধ আদর্শ সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা, তিনি সেই পরিমাণে মানবজাতির উপাস্য। প্রকৃত কবি, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের জনয়িতা; যে আকাশবিহারি সৌন্দর্য্য, আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবলোকন করি না— কবি এতাদৃক্ পুণ্য-সৌন্দর্য্যের সম্মোহন আলেখ্য দান করিয়া কলুষ-পঙ্কিল সংসারে এক অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ভাবের পবিত্র প্রবাহ সঞ্চারিত করেন। প্রকৃতির মর্ম্মার্থ-দর্শি মানব-শ্রেষ্ঠগণ তাদৃক্ প্রাণদ-সৌন্দর্য্যের পবিত্র ও মধুর হিল্লোলে চিরকালই আপনা-দিগকে প্রীত ও আশ্বস্ত করিয়া রাখেন। মহাকবি এই একটিমাত্র চিত্র দ্বারা, কর্ণচরি-ত্রের এই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ জলদক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছেন। মনুষ্যের কি শক্তি যে, এরূপ সৌন্দর্য্যের পুণ্যবিগ্রহের নিকট মস্তক অব-নত না করিয়া ক্ষণকালও স্থির রহিতে পারে?

একদা গৃহে এক ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হইলেন। অতিথি কর্ণের আতিথ্যাভি-লাষী। কর্ণ জীবনদানেও অতিথি সৎ-কারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইলেও কর্ণ-প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইবার নহে। বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ, কর্ণ-পুত্রের মাংস-লোলুপ। কর্ণ শিহ-রিয়া উঠিলেন। কি করিবেন? স্নেহের দুশ্ছেদ্য ও কঠোর বন্ধন। প্রকৃতির দারুণ শাসন! মেদ-মাংস-নির্ম্মিত দেহের অপরি-হার্য্য ধর্ম্ম। কর্ণ কি করিবেন? মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত ও নেত্র স্থির হইল। তিনি একবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, ক্ষণপরেই কর্ত্তব্যজ্ঞান কোটীগুণে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল! প্রবল-বেগে তাঁহার দেহতন্ত্রীতে ধর্ম্মবুদ্ধি উচ্ছলিত হইতে লাগিল! কর্ত্তব্য ও স্নেহের প্রবল এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। ইহা না চলিবে কেন? এই রক্তাস্থিময় দেহে, এবম্বিধ স্নেহ ও কর্ত্তব্যের তুমুল সংগ্রাম না চলিয়া থাকে কোন্ স্থানে? জগতের ইতি-হাস ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। রোমান্ সাধারণ-তন্ত্রের প্রথম অভ্যুদয়ে, একদিন কর্ত্তব্য ও স্নেহের ভয়াবহ সন্ধি স্থলে, উত্তুঙ্গ অদ্রির ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রুটাস ও এইরূপ ভীষণ সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। হিন্দুর প্রাণারাধ্য দাশরথিও একদিন, প্রজানুরঞ্জন-রূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রণোদনায় তাদৃশী পুণ্যস্মর-ণীয়া বৈদেহীর নির্ব্বাসনে হৃদয়নিহিত অপরি-হার্য্য স্বাভাবিক দৈহিক ধর্ম্মের নির্দ্দয় আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। ওতপ্রোত-ভাবে কর্ণের ভাবাকুল হৃদয়ে মহাযুদ্ধ চলিতে লা-গিল। অন্তিমে কর্ত্তব্যেরই বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; কর্ণ টলিলেন না। বুভুক্ষু ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত হইতে কহিলেন। সূর্য্য কক্ষচ্যুত হইলেও কর্ণের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ও

বিফল হইবার নয়। স্বয়ং ধৈর্য্যের ন্যায় ধর্ম্মের মহত্তম ব্রত উদ্‌যাপনে নিয়োজিত রহিলেন—পরার্থসাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিকট—কর্ত্তব্যের মহাস্রোত মধ্যে—স্নেহের দুশ্ছেদ্য-তন্তুও একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া—কোথায় ভাসিয়া গেল!! এ দিকে রোরুদ্যমানা শিশু-জননীর সকরুণ ভীষণ আর্ত্তনাদ, স্বামীকে এতাদৃক্ লোমহর্ষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত, ঘন ঘন নিষেধ চেষ্টা, কিন্তু যে বুদ্ধি মহীয়ান্ কর্ত্তব্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী, পার্থিব জগতে এমন কি আছে যে, সেই বুদ্ধির দুর্ব্বার গতি নিরোধ করে? কর্ণ স্থির ও অব্যাকুল—কর্ত্তব্য উদ্‌যাপিত হইল, কর্ত্তব্যের প্রচণ্ডাভিঘাতে স্নেহ-সূত্র ছিঁড়িয়া গেল—ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হইল!!

নব্য পাঠক! তোমরা ইদানীন্তন জগতের দার্শনিক কেশরী মহর্ষি কান্তের অত্যূর্দ্ধ কর্ত্তব্যোপদেশের কথা স্মরণ করিবে কি? একবার সেই কর্ত্তব্যোপদেশের সহিত, কর্ণ প্রতিপালিত কর্ত্তব্য জ্ঞানের তুলনা করিতে অবকাশ পাইবে কি? তুলনা করিলে বুঝিবে যে, মহর্ষি চিন্তার উচ্চতম গ্রামে উপনীত হইয়া যে কর্ম্মের অনুশাসন করিয়াছেন, মহাবীর কর্ণ প্রাকৃত রাজ্যেই তাহার পূর্ণ উদ্‌যাপন করিয়াছেন! এ স্থলে, কান্তের উপদিষ্ট কর্ত্তব্যের গতি, আর কর্ণ অনুসৃত কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এক ও অভিন্ন। তাই, বলিতে ছিলাম, কর্ণ আমাদের আদর্শদেবতা—আমাদের আরাধ্য আদর্শ—কর্ত্তব্যজ্ঞানের অক্ষয় পুণ্য-বিগ্রহ!! কবির কবিত্ব, এই স্থলে সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; এবং প্রাকৃতরাজ্যের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া মানব-জাতিকে সুমধুর বাক্যে সঙ্কেতে ভূয়োভূয়ঃ আহ্বান করিতেছে। যে জাতির এত বড় উচ্চ আদর্শ, সে জাতি পার্থিব যাবতীয় সুখ সম্পদকে অভোগ্য বা পিশাচ সেবনীয় বলিয়া, আপনা হইতেই দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। আর, যে ভূমিতে এতাদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই পুণ্যক্ষেত্র যে, অবনীমণ্ডলে শ্রেষ্ঠতম তীর্থ স্থান, তাহা কদাপি অস্বীকার্য্য নহে। তাই, এই অধঃপতিত জাতির এই অতি গৌরব ও আনন্দের কথা যে, এই ভারতক্ষেত্রে কর্ণের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল,—কর্ণ এই জাতির আদর্শ পরমসম্পদ্। এরূপ সম্পদ্ সত্য সত্যই জগতে অতি বিরল; বিরল হইলেও যদি কোনও জাতি ইহার একটি সম্পদও লাভ করিয়া থাকে, সে জাতি যে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে রক্ষা করিয়া, জগতীতলে স্বকীয় প্রাধান্য করিবে, তদ্‌বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এইরূপে ভীষণ জীবনসংগ্রামে বিজয়-শ্রীলাভ করিয়া, জগতে কর্ত্তব্যের অটল ও অচল সুবর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মহাবীরের পারিবারিক আভ্যন্তরীণ জীবনও সর্ব্বতোভাবেই সুখাবহ ছিল। সতী ললামভূতা পদ্মা আর বিজয়কেতু বৃষসেন, তাঁহার রাজান্তঃপুর নিরন্তরই উদ্ভাসিত

রাখিতেন। কর্ণ, রাজকীয় অতি দুর্ব্বহ কার্য্যাবসানে শুদ্ধচারিণী পদ্মার সহিত মধুর সংলাপে, আর প্রাণ:কল্প বৃষসেনের অমৃতায়মান অর্দ্ধস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ-নীরে অবগাহন করিতেন। সাংসারিক দুর্জ্জয় ও প্রচণ্ডাভিঘাতে নিষ্পেষিত হইলেও কর্ণ পারিবারিক এই সুখ-সম্পদে আপনাকে সততই সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। এই অতুচ্ছ চরিত্রের এই অংশও বড় অধিক প্রয়োজনীয়, এবং সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কেন না, নৈসর্গিক বহুবিধ দুঃখদুর্গতির প্রবল তাড়নায় আলোড়িত হইলেও, গৃহাভ্যন্তরের এই সুখকরী শান্তি অনেক পরিমাণেই যে, মনুষ্যজীবনের অসহ্য দুঃখভার লাঘব করে, তাহা বড় অল্প-আশা ও আশ্বাসের কথা নহে। বিধাতার শুভ-বিধানে কর্ণ চিরকালই এই সুখের অধিকারী ছিলেন। পদ্মার আদর্শ পাতিব্রত্য, আর বৃষসেনের অলোকসামান্য পিতৃভক্তি কর্ণজীবনের দুর্জ্জয়-দুঃখসম্ভার প্রভূত পরিমাণে মন্দীভূত করিয়াছে, তাহা কর্ণ-জীবনাখ্যায়িকা পাঠার্থীর কম আনন্দের কথা নহে।

কৌরব-পতি দুর্য্যোধন, রাজকীয় গুপ্ত পরামর্শাদি কর্ণের নিকট গ্রহণ করিতেন। সম্পদে ও বিপদে, গৃহে ও অরণ্যে, রণে ও রাজ্যে, কর্ণ চিরকালই কৌরবেশ্বরের অতি বিশ্বস্ত শুভানুধ্যায়ী কর্ণধার ছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস সময় সময় কর্ণকে একটু তরল ও চপল ভাবাপন্ন করিয়াছেন। ইহাতে কবির নিগূঢ়তম অংশও নখ-দর্পণে দেখাইয়াছেন। এই জন্যই ত কবি-গুরু বেদব্যাসের সার্ব্বভৌম গৌরব। যে কাব্যে লোক-চরিত্রের স্বাভাবিক অঙ্কন নাই, যাহাতে অতি প্রাকৃত বা অপ্রাকৃতের কেবল বিকট ও উৎকট চিত্র, তাহা কদাপি মনুষ্য-হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না; এবং লোক-হৃদয়াসনে কখনও আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় না। এরূপ চিত্র সময় সময় আপাতমধুর বাক্যে মানব-মন বিমুগ্ধ করিতে পারে বটে, কিন্তু, সময়ের স্রোতে তাহা ক্ষুদ্র জলবিম্বের ন্যায় বিস্মৃতির তিমির গহ্বরে চির-তরে আরাম লাভ করে। মহাকবি কর্ণচরিত্রের যে এবম্বিধ প্রতিকূল চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে স্বাভাবিকতার মধুরত্ব আছে—সরলতার মনোহারিতা আছে—ভাবের উচ্চ বিকাশ আছে এবং ভাবময় প্রাণ আছে। তাহা না হইলে, আবিলতার বিকট কূপে নিপতিত হইয়া, এই অতি মধুর চরিত্র একবারে ঋজুতার বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্য-ভ্রষ্ট হইত।

কর্ণের নূতন বয়স,—বয়োবৃদ্ধি দ্বারা গাম্ভীর্য্যের বিকাশ হয় নাই। দুর্য্যোধনাদি স্বভাব-চপল ছিলেন। আশৈশব তাঁহাদের সহবাসেই কাল-ক্ষেপ হইয়াছে। সংসর্গের অনিবার্য্য প্রভাব। কর্ণ চরিত্রে, সেই হেতুই, একটু চাপল্যের কলঙ্ক পরিলক্ষিত হয়। ইহা বয়সের তারুণ্য এবং সংসর্গের দুরতিক্রম প্রভাবজাত। এই ভাব ত সর্ব্বথাই স্বাভাবিক। তবে মহাবীর কখনও ছন্দানুবর্ত্তন

দ্বারা নীচ-জন-সুলভ কলঙ্ক-পঙ্কে বিদূষিত হয়েন নাই। তিনি চিরদিনই মনস্বী ছিলেন। মনস্বিতা তাঁহার জীবনের উজ্জ্বলতম অলঙ্কার ছিল। দুর্য্যোধনের মনস্তুষ্টির জন্য, তিনি অসরলতার আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কদাপি স্বার্থ সাধন করেন নাই। এইরূপ শাঠ্যময় নীচ-জন-যোগ্য চাটুবাদকে তিনি, চিরদিনই উচ্চাশয়তার ঘোরতর পরিপন্থী মনে করিয়া, অতি সাবধান হইয়া, উহা পরিহার করিয়া চলিতেন। জন্ম হইতেই স্বার্থোৎসর্গ কর্ণ-জীবনের মহত্তম ব্রত ছিল। তিনি আজীবন সেই ব্রতেরই সম্যক্ সমাধানের জন্য নিরত ছিলেন। কর্ণ-চরিত্রের যদি এইরূপ ঔন্নত্য ও এরূপ উচ্চতা না থাকিত, তাহা হইলে এ চরিত্র ঐতিহাসিকের কদাপি আদর ও গৌরবের সামগ্রী হইত না; এবং আমরাও আজ বহু শতাব্দীর পর, এই সুশোভন চারিত্রিক শুভ-বিগ্রহের নিকট, ভক্তিপূত-হৃদয়ে মস্তক অবনত করিতাম না।

দুর্য্যোধন বড় অভিমানী ছিলেন। তিনি আজীবন কেবল অভিমানেরই অর্চ্চনা করিয়াছেন। সেই দুরাসদ অভিমানই, ভারতীয় বর্ত্তমান শোচনীয় অধঃপাতের মৌলিক কারণ। এই উৎকট অভিমান যদি কোনও নিখিলার্থসাধক জ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারত-ভাগ্যগগন সম্পূর্ণ অন্যভাব ধারণ করিত!! কিন্তু, হায়! বিধাতৃবিধান অপরিহার্য্য!! ধার্ত্তরাষ্ট্রের এই বিজাতীয় অভিমান, একদিন ভারত-শক্তিকে কোটী অংশে চূর্ণবিচূর্ণ করিবে, বিধাতার, বোধ হয়, ইহাই অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধান। তাই আজ ত্রিংশকোটী ভারত-সন্তান, সেই দুর্দ্দ্দর্জ্জয় অভিমানের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! কত দিনে যে ইহার অবসান হইবে, দূর ভবিষ্যৎ তাহা দেখাইবে। কেহ কেহ বলেন, মহাবল কর্ণ, এই ভারতবিধ্বংসি দারুণ অভিমানের ইন্ধন স্বরূপ ছিলেন। কাজেই তাঁহারা সুগভীর-বিষাদ-পূর্ণ হৃদয়ে নির্দ্দেশ করেন যে, মহাবীর, ভারত-ভাগ্যে যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহা সেই গৌরব-প্রদীপ্ত উচ্চ চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। কিন্তু, এ স্থলে, আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। দুর্য্যোধনের অভিমান স্বার্থমূলক। ভারত-সাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম আধিপত্য লাভই সেই প্রচণ্ড অভিমানের একমাত্র লক্ষ্য স্থল ছিল। কিন্তু, কর্ণ সেইরূপ স্বার্থ-বুদ্ধিপ্রণোদিত কিম্বা সাম্রাজ্যাভিলাষ দ্বারা প্ররোচিত হইয়া, ভারতীয় সেই সুমহান্ সাম্রাজ্যাভিলাষদ্বারা প্ররোচিত হইয়া, ভারতীয় এই সুমহান্ সর্ব্বনাশের সাধনভূত হয়েন নাই। দুর্য্যোধনের অভিমান সর্ব্বতোভাবে তামসিক বিকারাচ্ছন্ন, কর্ণের মন্ত্রণা দুর্য্যোধনের স্বার্থেরই অনুসারিণী ছিল। দুর্য্যোধন নিজের ভোগৈশ্বর্য্য সাধনকেই তদীয় জীবনের মূল-সূত্র মনে করিয়াছেন। কর্ণ জীবনাবধি সর্ব্বথা আত্ম-সুখে বিস্মৃত ছিলেন। দুর্য্যোধন ভারতসম্রাট্ হইলে, নিজকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতেন,—অভিমানের পূর্ণসিদ্ধিতে আনন্দে ভাসিতেন, কর্ণ দুর্য্যোধনের সাম্রাজ্যলাভে নিজকে চরিতার্থ মান

করিতেন; এবং জীবনের প্রিয়তম উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল বলিয়া অতুল সুখে বিভোর হইতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয়ের উদ্দেশ্য-গতি পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত। কর্ণের উদ্দেশ্যে কোন স্বার্থপরতার আবিলতা নাই, বরং পরার্থের পরম-মাধুর্য্য প্রাণস্পর্শি সৌকুমার্য্য মহত্ব ও উচ্চতা আছে। যদি কোনও দোষ হইয়া থাকে, তাহা কর্ণের বিচারশক্তির অভাবে,—অপরিণামদর্শিতার একমাত্র কারণে। ইতিহাসে কর্ণের হৃদয়ে কোনও হীনতা প্রকাশিত হয় নাই। দোষ তাঁহার বিচার-শক্তির,—হৃদয়ের নহে। প্রাণ পরিত্যাগেও তিনি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু ছিলেন; দুর্য্যোধনের সর্ব্বতোমুখ স্বার্থই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল,—জীবনের যাবতীয় কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। সুতরাং অপক্ষপাতিতার স্বচ্ছদর্পণে অবলোকন করিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, দুর্য্যোধনই ভারতীয় এই সুমহান্ সর্ব্বনাশের অদ্বিতীয় কারণ। তিনি অভিমানবিমূঢ় হইয়া, নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যরূপে চির-দিনের জন্য ভারতের প্রাণ-শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের বা ভারতের এবম্বিধ সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বনাশ-সাধন কদাপি তাঁহার অভীষ্ট ছিল না। কৌরবেশ্বরের সার্ব্বভৌম ইষ্ট প্রাপ্তিই তাঁহার একমাত্র প্রার্থয়িতব্য ছিল। অতএব কি রূপে বলিব, কর্ণ দুর্য্যোধনের প্রচণ্ড অভিমানানলের ইন্ধন স্বরূপ ছিলেন, আর কি রূপেই বা কহিব, ইহা এই দেব-চরিত্রের অপ্রক্ষালনীয় কলঙ্ক-চিহ্ন? দুর্য্যোধন অভিমানান্ধ ছিলেন; কদাপি কর্ণোদ্দেশ্যের গভীরতা বা উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই,—যদি বুঝিতেন, তাহা হইলে, মুহূর্ত্তের জন্যও এতাদৃশ ভয়াবহ অনর্থ ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাহার মূঢ়তা আর মূঢ়তাসম্ভূত অভিমান, এই দুই প্রলয় কেতু, হিন্দু জাতির আমূল সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই সর্ব্বনাশ, অপরিশোধনীয়—অপরিপূরণীয়,—তাহাতে কর্ণের দোষ কি? স্বার্থের পিশাচ-পূজা করিতে যাইয়া দুর্য্যোধন ভারতের জীবনীশক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন; মহাবীর কর্ণ পরোপাসনার মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও একেবারে দৃষ্টিশূন্য হইয়া, স্বকীয় ভাস্বর নামে দুর্ব্বহ কলঙ্কভার অর্পণ করিয়াছেন। যাঁহারা মানব-চরিত্রের অন্তর্দর্শী—যাঁহারা অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির গূঢ়তম প্রদেশে যাইতে সাহসী হইয়াছেন,—তাঁহারাই মহাবীরের বিচিত্র বিলাসময় সর্ব্বোচ্চ চরিত্রের গতি ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

এই স্থলে, এই মহাবীর-চরিত্রের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা বড়ই আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে ক্ষাত্রতেজ একদিন কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিশ্ববিজেতা সব্যসাচীর একমাত্র মানদণ্ড স্বরূপ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেই অপ্রধৃষ্য প্রভাব এই সময় ভারতীয় শূর সিংহগণের নিকট, কতদূর ও কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ বোধ হয় একেবারে অসঙ্গত বা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাঞ্চালাধিপতি মহারাজ দ্রুপদ, যাজ্ঞসেনীর বিবাহার্থ বিরাট সভার আহ্বান করিয়াছেন। মহাতেজা ক্ষত্রিয়-বীর-বৃন্দ সেই মহতী সভা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। ভারত-সূর্য্য ভীষ্ম, ব্রাহ্মণ-বীর দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতিও উপস্থিত হইয়াছেন। দুর্য্যোধনের হিতার্থী মহাবীর কর্ণও সেই অপূর্ব্ব সভার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। অদূরে ছদ্ম-বেশে পাণ্ডবাদিও ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে উপবিষ্ট আছেন। আর, অনন্ত জ্ঞান-নিধান বাসুদেব, বিধিপূর্ব্বক যাবতীয় যাজ্ঞিক নিয়মের অনুশাসন করিতেছেন। যজ্ঞ-স্থলে যোগ্যতা পরীক্ষা—ক্ষত্রিপ্রভাবের অদ্ভুত, অভিনব, অলৌকিক মৎস্যলক্ষ্যভেদ!! যিনি চক্রচ্ছিদ্রপথস্থ, সেই অভূত-পূর্ব্ব মৎস্যভেদে সমর্থ হইবেন, তিনিই সেই স্বয়ম্বর সভায় পাঞ্চালীকে স্বকীয় ভুজ-গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ পত্নীভাবে লাভ করিবেন। বিষম সমস্যা! সভার পূর্ব্বভাগেই নিখিলার্থদর্শি বাসুদেব শেষ ফল দেখিয়া রাখিয়াছেন। সেই বিপুল সভায় যিনি বিজয়-মাল্য লাভ করিয়া, স্বকীয় ভুজ-বলের অক্ষয় পতাকা উড্ডীন করিবেন, অচ্যুত তাহা পূর্ব্বেই অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। বীর-গুরু বর্ষীয়ান্ শান্তনুনন্দন সর্ব্বাগ্রে ক্ষাত্রগৌরবের পরিচয় প্রদানে অগ্রসর হইলেন। যেই উঠিলেন, অমনি ভীষ্মের চির-অমঙ্গল নপুংসক শিখণ্ডীকে অবলোকন করিলেন; প্রতিজ্ঞা—ক্লীব দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন। মহাবীর অস্ত্র ছাড়িলেন—দংশনোদ্যত বিষধর-তেজ একেবারে নিরস্ত হইল। বীর-তিলক আপনার অনুপম বাহুবলের শেষ পরীক্ষা দিবারও অবকাশ পাইলেন না। সেই স্থানেই মহাকবির বর্ণনায় ভীষ্মদেবের উপবেশন ঘটিল। চেষ্টা করিলেও শান্তনুনন্দন কতদূব কৃতকার্য্য হইতেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তদ্বিষয়ে একেবারে মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। যাহা হউক, এবম্বিধ নীরবভাব অবলম্বনে মহাকবি সেই মহাবীর-চরিত্রের একটি অতি ভয়াবহ অভিভব-কলঙ্ক অতীব সাবধানে পরিহার করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারতে কুত্রাপি যাঁহার স্পষ্টতঃ কোনও পরাভব পরিলক্ষিত হয় না, মহর্ষি কেমন করিয়া সেই পাঞ্চাল-সভায় তেমন অজেয় মহাবীরের অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্করেখাপাত করিয়া, তাদৃশ অত্যুন্নত অলোকসামান্য পুরুষপুঙ্গবকে কলুষিত করিবেন? আর কেমন করিয়াই বা তাঁহার অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ বীর-কীর্ত্তিকে সেই রাজন্যমণ্ডিত বিরাটসভায় বিলুপ্ত ও প্রতিহত হইতে দিবেন? যাহা হউক, অস্ত্রাচার্য্য কৌরবগুরু, দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া স্বকীয় অস্ত্র-পাটবের পরীক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইলেন; কিন্তু, বাসুদেবের সর্ব্বাভিভাবিনী ইচ্ছায় দ্রোণ-শক্তিও প্রতিহত হইল। আচার্য্য খিন্নহৃদয়ে অধোবদনে তৎক্ষণাৎ আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরেই, মহাবীর কর্ণ, পূর্ণ বিক্রমে আপনার অপূর্ব্ব ভুজশক্তির পরিচয়দানে উদ্যুক্ত হইলেন। কিন্তু,

বাসুদেবের অনতিক্রমণীয় চক্রে সেই অদ্ভুত মৎস্য বিদ্ধ হইল না; কর্ণশক্তি কুণ্ঠিত হইল। দুর্য্যোধনের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল বলিয়া, তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে উপবিষ্ট হইলেন। যে স্থলে, ভারত-বীর-চূড়ামণি ভীষ্ম দ্রোণাদি বাহুবলের পরীক্ষা দিবার জন্য উদ্যুক্ত হয়েন, সেই স্থলে, কর্ণের বীরত্ব প্রকাশে অগ্রসর হওয়া, অবশ্যই অত্যন্ত গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়। ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, কর্ণের ক্ষত্রিয় পরাক্রম এই সময় অত্যন্ত উৎকর্ষ এবং বীরকেশরিগণের মধ্যে অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নতুবা, তাদৃশ বীর-ধুরন্ধর ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখ ধানুষ্কগণের সম্মুখে তিনি কদাপি বীরত্ব পরীক্ষার ভীষণ অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন না। যাহা হউক, একে একে সেই বীর-সভায় সকলেই বিফলপ্রয়াস হইয়া, লজ্জায় অধোবদন হইলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশী ক্ষত্রিয়চন্দ্র অর্জ্জুন, সেই অলৌকিক লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইয়া, উপস্থিত বীরমণ্ডলীকে সন্ত্রাসিত করিলেন; এবং স্বীয় অনন্যসাধারণ ভুজ-বলের সাক্ষিস্বরূপিণী যাজ্ঞসেনীকে লাভ করিলেন। ইহা অনন্ত কৌশলময় বাসুদেবেরই ইচ্ছা। অর্জ্জুন বিজয়শ্রী লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণেরই মহীয়সী ইচ্ছার গৌরববর্দ্ধন করিলেন। দুর্য্যোধনের অভিমানানল দারুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ঈর্ষ্যাপর-তন্ত্র হইয়া, এই অসহনীয় মনস্তাপ-সন্তাপ প্রশমিত করিবার জন্য, সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ-প্রমুখ বীর-শ্রেষ্ঠগণ দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় প্রণোদিত হইয়া, প্রচণ্ড বেগে বিপ্ররূপী ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলেন। কৌরবপক্ষ পরাভূত হইল, অর্জ্জুন বিজয়গৌরবে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। কিন্তু, ইহাতেই পার্থের স্বকীয় ভুজবলের যত প্রশংসা, শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবার্থসাধক কৌশল ততোধিক প্রশংসার্হ। যাহা হউক, এই স্থলে, এই প্রসঙ্গের অধিক বিস্তার অনাবশ্যক। দুর্য্যোধন ভগ্নাশ হইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাত্মা কর্ণও নিরন্তর সমাহিতচিত্ত হইয়া, কৌরবপতির সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এই সময়, দুর্য্যোধনও তাঁহাকে দিন দিন অভিনব গৌরবে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এই সময় কৌরব-সভায় তাঁহার গৌরবের অবধি ছিল না। মহাবীর কর্ণ, দুর্য্যোধনের সুবিশাল রাজ্যের দৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। উপযুক্ত কাল ও শুভ অবকাশ পাইয়া, ধানুষ্ককেশরী স্বীয় অসাধারণ ক্ষাত্রপরাক্রম-মহিমার আশ্চর্য্য পরীক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং মহতী বিজয়শ্রী লাভ করিয়া, বিপুল হস্তিনা রাজ্যের গৌরব ও কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। কর্ণও রাজানুগ্রহ প্রদত্ত অভিনব সম্মানে অভিনন্দিত হইয়া, অপরিসীম চিত্তসুখে কালাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়, পাণ্ডবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অতি দীনভাবে, প্রচ্ছন্নবেশে, ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। পথের ভিক্ষুকগণের দগ্ধভাগ্যেও যে কষ্ট সম্ভাবিত নয়,

রাজনন্দনগণ ততোঽধিক নিদারুণ ক্লেশের অনন্ত ভার মস্তকে লইয়া, কালাতিবর্ত্তন করিয়াছেন। পাণ্ডবের অদৃষ্ট-গগনে আবার সুখ-চন্দ্রমার ক্ষণিক আনন্দ আবির্ভাব হইল। সর্ব্বনিয়ন্তা আর একবার তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্ধরাজ সহজ স্নেহ-পরবশ হইয়া, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদান করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসিংহাসনে যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করাইলেন। ধর্ম্মরাজ অসাধারণ ন্যায়বুদ্ধি সহকারে, প্রকৃতিপুঞ্জ প্রতিপালন করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিলেন। বৃকোদর, পার্থ প্রভৃতি অনুজগণও কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া, যুধিষ্ঠিরের অপার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ভীমার্জ্জুনের বিশ্ববিজয়িনী ক্ষত্রিয়শক্তি, অচিরকাল-মধ্যেই, অসংখ্য বিজয়শ্রী দ্বারা, ইন্দ্রপ্রস্থকে ত্রিদিব-পতির অনন্ত রত্নপ্রসবিনী অমরাবতীর ন্যায়, গৌরবৈশ্বর্য্যে পরিশোভিত করিলেন। শ্রী, প্রভা ও ঐশ্বর্য্যে অল্পকাল মধ্যেই, ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনানগরীকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া, স্বকীয় অনিবার্য্য মহিমা, ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। যুধিষ্ঠির, পাণ্ডবহিতৈষি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম আধিপত্যের নিদর্শনস্বরূপ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবের একমাত্র কর্ণধার অখিল-বিশ্রাম-বিগ্রহ বাসুদেব, তাঁহাদিগকে সমুচিত উপদেশ ও মন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিলেন। অমিত-বিক্রম ভীম-সেন, দুর্জ্জয়তেজা পার্থ এবং বীর-বর মাদ্রীকুমারযুগল জিগীষায় উন্মাদিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে পাণ্ডব-গৌরব-স্তম্ভ সংস্থাপিত করিতে বহির্গত হইলেন। অনভিভবনীয় প্রভাব মগধাধিপ জরাসন্ধ পর্য্যন্ত, পাণ্ডব-বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই, বিজিগীষা কার্য্য সুসমাহিত হইল। ভারতের সর্ব্বত্র পাণ্ডব-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও অপরাপর কৌরববীরগণ সভাক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। চেদীশ্বর বীরসিংহ শিশুপাল প্রভৃতি, তথায় উপনীত হইলেন। যাদবশ্রেষ্ঠ অচ্যুত বান্ধবাদি সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইয়া, সেই অনুপম সভার মহিমা অনন্ত গুণ প্রবর্দ্ধিত করিলেন। ভারতীয় বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যপ্রবরগণ সকলেই সেই অদ্ভুতপূর্ব্ব যজ্ঞের বিপুল শোভা সংসাধন করিলেন। পাণ্ডবঐশ্বর্য্যমহিমায় সমাগত রাজসিংহগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। পাণ্ডবপতি যুধিষ্ঠির, ভারতক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম সম্রাট্ বলিয়া, একবাক্যে নমস্কৃত ও অভিনন্দিত হইলেন। বাসুদেবের সুকৌশলে যজ্ঞোদ্দেশ্য নির্ব্যূহ সম্পন্ন হইল।

শ্রীশশিমোহন বসাক এম, এ।

চারুশীলা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চারুশীলা বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। কি করিবে, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না। সে, মায়ের সেই মৃত্যু-কালীন কথা বিস্মৃত হয় নাই। "এই তোমাদের বিবাহ"এই কথা, তাহার কানে, এখনও বাজিতেছে। আজ যেন সে দেখিতে পাইল, তাহার স্নেহময়ী জননী, আবার রুগ্নশয্যায় শায়িত। অতি কাতর-নয়নে তাহার দিকে ফিরিয়া যেন কি চাহিতেছেন। আজ, আর তাঁহার আহার হইল না। সকলকে খাওয়াইয়া, সে শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে, ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল, মনোরমা আসিয়াছেন; কিন্তু, তাহার আর সে মূর্ত্তি নাই,—যেন, জ্যোতির্ম্ময়ী আকাশের পটে মিশাইয়া রহিয়াছেন,—চারুকে বলিলেন, দেখিও প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইও না। আরও দেখিলেন, যেন যোগীন তাঁহার নিকটে। আবার সেই দিনের মত, তাহার হস্ত লইয়া, যোগীনের হাতে রাখিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের বিবাহ দিয়াছি। এ জীবনে চারুর আর বিবাহ নাই। যদি তোমরা এই মরুভূমিতে থাকিতে না চাও ত আমার সঙ্গে ঐ দেশে চল।" এই বলিয়া যোগীনের হাত ছাড়িয়া দিয়া মনোরমা আকাশে উড়িয়া গেলেন। যোগীনও তাঁহার সঙ্গে উড়িয়া গেল। চারু কতবার উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শেষে যখন মাতা ও যোগীন অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন লাফাইয়া তাঁহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিছানায় পড়িয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। মনে হইল, তবে কি যোগীনও আমাকে এই সংসার-অরণ্যে একা ফেলিয়া মায়ের কাছে চলিয়া যাইবেন? অতি কাতরস্বরে ডাকিল, হে ভগবান্ আমাকে রক্ষা কর,—আমাকে মায়ের কাছে যাইবার সাহস প্রদান কর।

পর দিন, প্রত্যুষে উঠিয়াই চারু একজন চাকরের নিকট হইতে, আফিম চাহিয়া লইল। তাহাকে বলিল, সে ঔষধ প্রস্তুত করিবে। একবার ভাবিয়াছিল, চুরি করিয়া লইবে। কিন্তু, পরে ভাবিল, মরিতে চলিলাম, এখন চুরি করিয়া আর পাপ করিব কেন? ভৃত্য আফিম খাইত, তাহার কৌটায় আফিম ছিল; সে, সেই কৌটা হইতে ভৃত্যকে আফিম লইতে বলিল। অন্নপূর্ণা স্বয়ং আফিম লইতেছেন, তাহার কোন সন্দেহ। হইল না। পরে ভৃত্য আফিম খাইবার সময়, যখন দেখিল যে, তাহার কৌটায় আফিম একটুকুও নাই, তখন তাহার মনে সন্দেহ হইল,—সে যোগীনকে ডাকিয়া সমস্ত বলিল।

যোগীন চারুর ঘরে যাইয়া দেখিলেন, সে কি লিখিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সে পত্র লুকাইল। সম্মুখে যোগীন একটা বাটীতে আফিম গোলা দেখিতে পাইলেন। তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। বলিলেন, ছি, চারু, এই কি তোমার স্নেহ-মমতা! তুমি আমাকে, রবিকে ও সুশীলাকে ফেলিয়া যাইতে চাও? চারুর হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল, সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া হৃদয়ের কথা, যাহা লজ্জায় যোগীনকে এতদিন বলিতে পারে নাই, তাহা লিখিয়া রাখিয়া, আফিম খাইবে মনে করিয়াছিল। যোগীনের কাতর-স্বরে তাহার অন্তরে যেন শেল বিঁধিল, চক্ষের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল; কিন্তু, কিছুই বলিতে পারিল না। যোগীন তাহার অসমাপ্ত পত্র, অনেক কষ্টে লইয়া পড়িলেন, দেখিলেন, সে পত্র তাঁহাকেই লিখিতেছিল।

প্রিয়তম!

মায়ের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে, আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমি সে কথা ভুলি নাই। তুমি না বলিলেও, আমি জানি; তুমিও ভুল নাই। সে কি ভুলিবার কথা? তবে, আমার, আবার বিবাহ হইবে কি করিয়া? পিতা যেরূপ কঠিনহৃদয় হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট এ সকল কথা বলা বৃথা। তিনি জাত যাইবে বলিয়া, জোর করিয়া, আমার আবার বিবাহ দিবেন, তাহাতে কি আমায় দ্বিচারিণী হইতে হইবে না? তুমি হয়ত বলিবে, আমাদের শাস্ত্রমতে বিবাহ হয় নাই। শাস্ত্র কি তাহা জানি না। আমার পক্ষে, মায়ের আদেশই শাস্ত্র। আমার শাস্ত্র মতেই বিবাহ হইয়াছে। পিতা, কন্যাদান করিতে পারেন, মাতারও কন্যাদান করিবার অধিকার আছে। মাতা আমাকে মৃত্যুশয্যায় শুইয়া, তোমাকে দান করিয়া গিয়াছেন। কা'ল স্বপ্নে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি আবার আমাকে সেই দিনের দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দিলেন। পরে, তোমাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব মনে করিলাম,—পারিলাম না। তুমিও আমাকে ফেলিয়া গেলে। কোথায় মেঘে অদৃশ্য হইয়া গেলে, আর দেখিতে পাইলাম না! এ ত স্বপ্ন নয়, সত্য সত্যই তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইবে। আমাকে না ফেলিয়া গেলে, সংসারে তোমার উন্নতি নাই,—তাই মা আমাকে পথ দেখাইয়া গেলেন। আমি আজ আত্মহত্যারূপ মহাপাপে কলঙ্কিত হইয়া, কোন্ নরকে যাইতেছি, জানি না। কিন্তু, এই আমার অদৃষ্টের লিখন! অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। প্রিয়তম! তুমি মহাজ্ঞানী; কৈ তুমি ত আমাকে অন্য পথ দেখাইলে না; সুতরাং আমি নিজের বুদ্ধি মত পথে চলিলাম।

চারুর এই অসমাপ্ত পত্র পড়িয়া, যোগীন সকলই বুঝিলেন। কেন চারু, এই ভয়ানক পাপে উদ্যত হইয়াছে, তাহাও বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, চারু আজ তোমাকে সকল কথা বলিব মনে করিয়াই আসিয়াছিলাম, আমি কিছুই ভুলি নাই। তুমি আত্মহত্যারূপ মহাপাপে কলুষিত হইবে কেন? তো-

মার পিতা, তোমার মহাগুরু; তাঁহার আদেশ তোমার অবশ্য পালনীয়। তিনি তোমার জন্য যাহা করিতেছেন,—তোমার ভালর জন্যই করিতেছেন। কাকী-মা যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, যদি তোমার পিতার তাহাতে মত না হয়, তাঁহার কথামত কাজ করাই তোমার উচিত। কারণ, তিনি কাকীমারও গুরু।

চারু অনেকক্ষণ যোগীনের মুখের দিকে তাকাইয়া কি দেখিল; পরে বলিল, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার বিবাহ একবার ছাড়া কি দুইবার হইতে পারে? আমার বিবাহ মা দিয়া গিয়াছেন। তিনি তাই আমাকে কা'ল পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমি কা'ল তাঁহার সঙ্গে যাইব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু, পারিলাম না, তাই আজ যাইতেছি। তুমিই আমার স্বামী,—আমাকে গ্রহণ করা না করা তোমার ইচ্ছা। তুমি গ্রহণ করিলে না, তাই আমি মায়ের কাছে যাইতেছি।

যোগীন, অনেকক্ষণ আর উত্তর দিতে পারিলেন না। পরে বলিলেন, আজ আত্ম-হত্যা করিও না; বিষ তোমার নিকটে রাখিয়া দাও। যদি কোন উপায় করিতে না পারি, তুমি ও আমি একদিনেই চলিয়া যাইব। আমার জীবনে কোন সুখ নাই, —আকাঙ্ক্ষাও কিছু নাই, তবে রবিকে ফেলিয়া যাইতে পারি না, তাহা না হইলে, আজই কাকী মায়ের প্রদর্শিত পথে চলিয়া যাইতাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিহারী, বিবাহের দিন ঠিক্ করিয়া, সমস্ত আয়োজন করিতেছেন। এই তাঁহার প্রথম কাজ। দেশের মধ্যে তিনি একজন গণ্য মান্য লোক। অনেকে, তাঁহাকে পরা-মর্শ দিতেছেন, অন্ততঃ দশ হাজার টাকা খরচ করিতে হইবে, তাহা না হইলে, তাঁহার নিন্দা হইবে। বাই নাচ, যাত্রা, থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদের জন্য, রাশি রাশি অর্থের বন্দোবস্ত হইল, দিন রাত্রি আমোদ ও উৎসব চলিতে লাগিল। প্রফুল্লগোলাপ আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন; তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র অবকাশ নাই। স্বর্ণ ও মণিময় অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, তিনি যেন আপনার রূপে, আপনি উছলিয়া পড়িতে-ছেন। আর কেহ তাহার ন্যায় মহামূল্য অলঙ্কার কখনও পড়ে নাই, সে কথা জানা-ইতেও ত্রুটি করিতেছেন না। যে তাঁহার রূপের ও বসনভূষণের প্রশংসা করিতেছে, সে তাঁহার নিকট আদর পাইতেছে। যাহার বসনভূষণ ভাল, তাহাকেও সমাদরে অভ্য-র্থনা করিতেছেন,—আর যাহারা দরিদ্র, তাহারা নিমন্ত্রিত হইলেও, তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেছেন না।

অন্তঃপুরে যেমন প্রফুল্লগোলাপের আসর বসিয়াছে, বাহিরে বিহারীরও তেমন আসর জমিয়াছে। সকলেই বিহারীর ও প্রফুল্ল-গোলাপের প্রশংসা করিতেছে। সকলেই একমুখে বলিতেছে, প্রফুল্লগোলাপের মত বিমাতা, আজ কা'ল দুর্লভ। লোকে বলি-

তেছে, যদি প্রফুল্লগোলাপের ইচ্ছা না হইত, তাহা হইলে কি বিহারী, তাহার পূর্ব্ব-পক্ষের কন্যার বিবাহে এত জাঁকজমক করিতে পারিতেন? হায়! মানব চিরদিনই এমনই অন্ধ!!!

এ দিকে যাহার বিবাহ তাহার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ নাই। তাহার মুখে কালিমার ছায়া,—তাহাতে আবার সুশীলার ভয়ানক জ্বর; কেহ তাহাকে ফিরিয়াও দেখে না। যোগীন্, রবি ও চারু পালা করিয়া, তাহার সেবা করে। গ্রাম্য-ডাক্তার যখন নাচ দেখিতে আইসেন, তখন একবার তাঁহাকে দেখিয়া যান। যোগীনের উপর অনেক কাজের ভার। সে, সকল সময় সুশীলার নিকট থাকিতে পারে না। রবি আর চারু, প্রায় দিন রাত্রি তাহার নিকটে থাকে। ভীষণ রোগের যন্ত্রণায় সুশীলা ছট্‌ফট্ করে। রবি এক এক বার অস্থির হইয়া, ডাক্তারের নিকট দৌড়িয়া যায়। ডাক্তার নাচ ও গানের আসর জমকাইয়া বসিয়া আছেন, তিনি কিছুতেই উঠিতে চাহেন না। বিহারী ভদ্রলোকদিগকে লইয়া,এত ব্যস্ত যে,তাঁহার উঠিবার সময় নাই। বিশেষতঃ মদের স্রোত চলিয়াছে। এ দিকে সুশীলা রোগের যন্ত্রণায় প্রলাপ বকিতেছে। কখনও বলিতেছে, —"উঃ কাঁটা কাঁটা"; কখনও বলিতেছে, —"মা, মা, একটু দাঁড়াও, আমি এবার তোমার সঙ্গে নিশ্চয় যাইব।" রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে,—একটি কক্ষে রুগ্নশয্যায় শায়িতা বালিকাকে লইয়া, দুইটি বালক ও একটি বালিকা বসিয়া রহিয়াছে। ভিতরে ও বাহিরে শত শত স্ত্রীলোক নাচ দেখিতেছে, গান শুনিতেছে। শত সহস্র টাকা জলের মত বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু, এই বালিকার জীবন রক্ষার জন্য এক জন চিকিৎসকও নিযুক্ত নাই। পিতা অপেক্ষা স্নেহময় এ জগতে আর কেহ নাই; সেই পিতাও একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন না। যোগীন্ একবার তাঁহার নিকট গিয়াছিল। তিনি নেশায় বিভোর! তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। প্রফুল্লগোলাপকে জানাইলে, তিনি বলিলেন যে, ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই কাল জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। এ দিকে, সুশীলার অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিল। তাহার মৃত্যুসময় উপস্থিত। যোগীন্ বুঝিলেন; কিন্তু তিনি রবি ও চারুকে বুঝাইলেন, সুশীলার জ্বর ছাড়িয়া যাইতেছে, তাই এত ঘাম হইতেছে। পরে যখন সব ফুরাইল, তখন তিনি বলিলেন,—"সুশীলা ঘুমাইয়াছে; উহাকে বিরক্ত করিও না।" এই বলিয়া তিনি বিহারীকে যাইয়া সমস্ত বলিলেন। বিহারী পূর্ব্বে এতদূর হইবে বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি অন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া উঠিয়া আসিলেন। সুশীলার গায়ে হাত দিলেন,—কত ডাকিলেন, —কিন্তু কে তাঁহার কথার উত্তর দিবে? রবি ও চারু কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহারা বুঝিল, সুশীলা নাই। বিহারী প্রফুল্লকে ডাকাইলেন। তিনি মহাবিরক্ত হইয়া

উঠিয়া আসিলেন; কিন্তু বিহারীকে এবং রবি ও চারুকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুশীলা কেন অমন করিয়া রহিয়াছে? বিহারী বলিলেন, সুশীলা আর নাই, এখন উপায়? প্রফুল্ল বলিল এ কথা প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। আজ রাত্রিতেই যোগীন্ ও রবি সুশীলার জলসৎকার করিয়া আসুক। কেহই কিছু জানিতে পারিবে না। তা না করিলে, এত টাকা সব নষ্ট হইবে। বর পক্ষীয় লোকে জানিলে বিবাহ হইবে না। বিহারী মদে বিভোর ছিলেন। প্রফুল্ল যাহা বলিলেন, তাহাই বুঝিলেন। পরে, যোগীন্‌কে সেই কথাই বলিয়া, প্রফুল্লের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। যোগীনের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি প্রফুল্লকে চিনিতেন; তবু কখনও মনে করেন নাই যে, তাহার হৃদয় এরূপ পাষাণে নির্ম্মিত। হায়! এই পাষাণ-প্রতিমা, কেন এমন মনোমোহিনীরূপে বিভূষিতা হইল? তাহা না হইলে, কি বিহারী আজ এরূপ পিশাচের ন্যায় হইত?

বিহারী ও গোলাপ চলিয়া গেলে, যোগীন্ ও চারু, অনেকক্ষণ কাঁদিল। তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়, একটু শান্ত হইল; কিন্তু, রবির চক্ষে একটুও জল আসিল না। তাহারও হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু, যখন শুনিল, সুশীলাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিবে, তখন ক্ষোভে ও ক্রোধে তাহার চক্ষের জল শুকাইল। সে যোগীন্‌কে বলিল,—"দাদা, তাহা কিছুতেই হইবে না।" পরে সেই অন্ধকার রাত্রিতে তাহারা দুই ভাই সুশীলার মৃতদেহ গঙ্গার ধারে লইয়া গেল। যোগীন্, রবিকে শান্ত করিবার জন্য বলিল,—তুমি সুশীলাকে লইয়া এখানে বইস, আমি কাঠ লইয়া আসি। যোগীন্ কিছু দূর যাইতে না যাইতে, রবির বিকট চীৎকার শুনিতে পাইয়া, দৌড়িয়া আসিল; দেখিল, রবি ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সে যোগীন্‌কে অঙ্গুলি দিয়া কি দেখাইল; যোগীন্ কিছুই দেখিল না। বলিলেন,—"ভাই শান্ত হও, শান্ত হও, আমাদের অদৃষ্টে বিধাতা দুঃখ লিখিয়াছেন, আমরা কষ্ট না পাইলে, আর কে কষ্ট পাইবে?" রবি কিছুই শুনিল না। পরে, যোগীন্ বলিলেন, এ দেশে জলসৎকারে দোষ নাই; এই বলিয়া, তিনি সুশীলার মৃতদেহ, নদীতে ভাসাইবার উপক্রম করিলেন। রবি, নিশ্চল নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। যেই, জলে পতনের শব্দ হইল, অমনি রবিও—"দাদা কি করিলে, সুশীলাকে ভাসাইয়া দিলে"—এই বলিয়া, লাফাইয়া পড়িয়া সুশীলাকে ধরিতে গেল। যোগীন্, কেবল "ঝুপ্" করিয়া উঠার শব্দ শুনিলেন, আর রবিকে দেখিতে পাইলেন না। তিনিও জলে লাফাইয়া পড়িলেন, কিন্তু রবিকে ধরিতে পারিলেন না। সেই নিবিড় নৈশ-তিমিরে যেন সুশীলার দেহের সহিত রবির দেহ মিশিয়া গেল। যোগীন্ অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া, গঙ্গার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। এ জগতে যাহার জন্য এতদিন অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, আজ সেও

তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার আর উঠিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায় জলে ভাসিয়া চলিলেন। কিন্তু, সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা না হইলে কি, কেহ মরিতে পারে?

পরদিন প্রাতঃকালে, যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল, তাঁহার পরিচিত এক ধীবরের নৌকায়, তিনি শায়িত আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলিল "যোগীন্ বাবু, কি করিয়া, আপনি পদ্মায় পড়িয়া গিয়াছিলেন? অতি কষ্টে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি।" যোগীন্ কিছু উত্তর দিলেন না। নৌকার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, রবি নাই। তখন পুনরায় পদ্মায় লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। ধীবরগণ তাঁহাকে ধরিয়া নিরস্ত করিল, এবং কি হইয়াছে, জানিবার জন্য,অনেক জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু, কোনক্রমেই তাঁহাকে কথা বলাইতে পারিল না। তাঁহারা, তাঁহাকে লইয়া বিহারীর বাটীতে পঁহুচাইয়া দিয়া আসিল। বিহারীর তখন চৈতন্য হইয়াছে। সমস্ত শুনিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, যাহা হইয়াছে, তাহার ত আর উপায় নাই। এদিকে সুশীলার ও রবির মৃত্যু সংবাদ গ্রাম মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল। বিবাহ একমাসের জন্য স্থগিত রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর, নীলকণ্ঠ বাবুর আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু, তাঁহার মনে সুখ নাই। এত দিন কিসে নরেন্দ্র বাবুর সমকক্ষ হইবেন,—কিসে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, এই চিন্তা দিবা নিশি তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু, এখন আর সে আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহার কিছুই ভাল লাগে না। যতক্ষণ কাজ করেন, ততক্ষণ কোনরূপে সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু যখনই কাজ না থাকে, তখনই কিসের চিন্তা যেন তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। তাঁহার স্ত্রী, স্বামীর এইরূপ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু, কি করিলে যে, তাঁহার মনের গতি-পরিবর্ত্তন হয়, তাহার উপায় তিনিও ভাবিয়া পান না। ক্রমে, উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য জন্মিতে লাগিল। নীলকণ্ঠ বাবু মনে করেন, আমি এত টাকা উপার্জ্জন করি, কৈ কেহ ত আমাকে সে জন্য ভালবাসে না। আমার জীবনে কি সুখ? আমি চিনির বলদ,—বহিয়া মরি ছাড়া আর কিছুই নই। সংসারে আমার যাহা কিছু যত্ন, তাহা কেবল টাকার জন্য। আমি মরিলে কে টাকা আনিবে, সেই জন্য আমার স্ত্রী আমার জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন। আবার তাঁহার স্ত্রী মনে করেন, যখন এত করিয়াও স্বামীর মন পাইলাম না, তখন জীবনে আমার কি সুখ! কবে যে, এই জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইব, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। যে সংসারে স্বামী ও স্ত্রীর মনের গতি এইরূপ, সে সংসারে কাহারও সুখ নাই। সে সংসার মরুভূমি। নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী যদি, তাঁহার স্বামীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল দেখিতে পাইতেন,—তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য যত্ন করিতেন, অথবা নীলকণ্ঠ

বাবু যদি, আপনার মন বুঝিয়া আপনাকে সৎপথে লইতে পারিতেন, এবং তাঁহার সুখের জন্যই যে এ সংসার সৃষ্ট হয় নাই, এ কথা যদি বুঝিতেন, তাহার স্ত্রীরও যে, তাঁহা অপেক্ষা গুরুতর ভার বহন করিতে হয়,—এতগুলি মূর্খ দাস দাসী ও অনেকগুলি স্বার্থপর লোক লইয়া দিনরাত্রি সংসার নির্ব্বাহ যে কি কঠিন দায় তাহা বুঝিয়া যদি তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসার চক্ষে দেখিতে পারিতেন, তাহাহইলে, হয়ত তাঁহাদের সংসার শান্তিময় হইত। তাঁহারা যে পরস্পরকে ভাল বাসিতেন না এমন নহে। একে অন্যের সুখের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; কিন্তু, তাঁহাদের ভালবাসায় স্বার্থত্যাগ নাই; তাহা এখনও আমিত্বে পরিপূর্ণ, ইহা কেহই বুঝেন না। এই জন্যই তাঁহারা সুখী হইতে পারিলেন না। মানুষ কিরূপে আপনার যন্ত্রণা আপনি ডাকিয়া আনে, তাহা ইহাঁদের জীবনের ঘটনাবলি পর্য্যালোচনা করিলে জানা যাইবে।

যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, নীলকণ্ঠ বাবু ততই সংসারের প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রোধ-প্রবণতা এত বাড়িতে লাগিল যে, কেহ ভয়ে তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিত না। সর্ব্বদাই দাস, দাসী ও আশ্রিত-স্বজনগণকে ভৎর্সনা করিতেন, কখন কখনও স্ত্রীকেও গালি দিতেন। তাঁহার স্ত্রী, ক্রোধে ও অভিমানে মর্ম্মাহত হইয়া, আশ্রিতদিগকে উৎপীড়ন করিয়া প্রতিশোধ লইতেন। এইরূপে, দিন দিন সংসার ভীষণ নরক সদৃশ হইয়া উঠিল।

নীলকণ্ঠ বাবুর শরীর ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি মনে করেন, তাঁহার স্ত্রী অনন্যমনা হইয়া, তাঁহার সেবা করিবেন,—যখন তাঁহার আবশ্যক হইবে, সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে যত্ন করিবেন। এ বিষয়ে একটু ত্রুটি হইলেই তিনি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেন। তাঁহার স্ত্রী মনে করিতেন,—"যাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিতেছি, তাহাতেও ত স্বামীর মন পাইলাম না, আমি তাঁহার সংসারে দাসীর ন্যায় দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতেছি, একটু ত্রুটি হইলেই ভৎর্সনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছি। আর আমার জীবনে কি সুখ?" অনেক দিন উভয়ে উভয়ের উপর রাগ করিয়া বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করেন। আজ চারি পাঁচ দিন এইরূপে উভয়ের মনোমালিন্য একেবারে শেষ সীমায় উঠিয়াছে। নীলকণ্ঠ বাবুর শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি মনে করেন, তাঁহার স্ত্রী, সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিবেন; কেবল তাঁহারই শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু, এরূপ অবস্থায় তাঁহার স্ত্রীর শরীর ও মন ভাল থাকিবার সম্ভব কোথায়? তিনি যতদূর পারেন, তাঁহার স্বামীর শুশ্রূষা করেন; কিন্তু, নিজের মনের আবেগ দমন করিবার জন্য, সর্ব্বদা সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেই ভালবাসেন। তিনি স্বামীকে একমনে ভালবাসেন, মনে করেন স্বামীরও কিছুরই অভাব বা কষ্ট নাই। তিনি না

থাকিলেও, তাঁহার কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহারা দূরে দূরে যাইয়া পড়িতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠ বাবুর জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিল। মনে করিতেন, যাহার জন্য পাপে ডুবিয়াছি, কৈ সে ত আমার জন্য বিন্দুমাত্রও ভাবে না, কেবল অহোরাত্র কলহ। সংসারে ত কাহারও সুখ নাই। একদিন এই ভাবিতে ভাবিতে, নীলকণ্ঠ বাবু বড়ই বিরক্ত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন; এবং একেবারে ডিপুটী কমিশনার সাহেবের কুঠিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া সমস্ত আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়া বিচার চাহিলেন। কিরূপে উইল জাল করিয়াছেন, কিরূপে বিহারী নরেন্দ্রকে খুন করিয়াছে, তাহা সমস্ত স্বীকার করিলেন। যে সমস্ত লোক, এই মহাপাপে তাঁহার সহায়তা করিয়াছে, তাহাদেরও নাম বলিয়া দিলেন। ডিপুটী কমিশনার তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে অনেক বার সতর্ক করিয়া দিলেন, কিন্তু, নীলকণ্ঠ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে সাহেব তাঁহার স্বীকার উক্তি লিখিয়া লইয়া, তাঁহার অবরোধের আদেশ দিতে বাধ্য হইলেন। পরে বিহারী ও অন্যান্য অপরাধীকে ধরিবার জন্য, আদেশ প্রদান করা হইল।

এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন পরেই, বিহারী গ্রেপ্তার হইয়া মিরাটে আনীত হইলেন। যোগীনও সাক্ষ্য দিবার জন্য আনীত হইলেন। চারুশীলা ও প্রফুল্ল, মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য মিরাটে আসিলেন। চারুর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নর-হত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর কন্যার সহিত, বিবাহ দিতে, বরের পিতা অস্বীকৃত হইলেন। বিচারে দোষী স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বেই, সকলে বিহারীকে দোষী নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অতি আত্মীয় বন্ধুজনও তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক হইয়া, সরকার হইতে ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। প্রফুল্লগোলাপ মনুষ্যচর্ম্মাবৃত পাষাণী হইলেও, এ সময় তাহার অন্যরূপ মূর্ত্তি হইল। স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য, অকাতরে নিজের গায়ের অতি প্রিয় ও মহামূল্য অলঙ্কার খুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। যোগীনকে ডাকাইয়া অতি কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, দয়া-ভিক্ষা করিলেন। বলিলেন,—তোমার কথার উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। আরও বলিলেন, বিহারীকে রক্ষা করিলে তাঁহাকে বলিয়া চারুর সহিত যোগীনের বিবাহ দেওয়াইবেন। যোগীনের বিষয়, তাহা হইলে যোগীনেরই থাকিবে। তিনি বিহারীকে লইয়া, কোন দূর-দেশে ভিক্ষা করিয়া খাইলেও, আর কখনও স্বামীকে পাপে কলুষিত হইতে দিবেন না। যোগীন্ কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। শপথ করিয়া কিরূপে আদালতে মিথ্যা বলিয়া চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ করিবেন? আর যে, তাঁহার পিতৃ-

হন্তা, তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে কি, তাঁহাকে নরকস্থ হইতে হইবে না? তিনি উঠিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া যাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিদ্রা আসিল। নিদ্রার আবেশে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন মনোরমা আকাশ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন। আর অতি কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন, যোগীন্! সহস্র দোষে দোষী হইলেও আমার স্বামী তোমার পিতৃতুল্য, তুমি চারুকে বিবাহ করিয়াছ। দেখিলে ত, মানুষে চেষ্টা করিয়াও, তাহার অন্য বিবাহ দিতে পারিল না। সত্য, আমার স্বামী তোমার পিতাকে হত্যা করিয়াছেন; কিন্তু, তাহার শাস্তি ভগবান্ দিতেছেন, আরও দিবেন। বৎস! তুমি শাস্তি কামনা করিও না। প্রতিহিংসা তোমার উপযুক্ত নয়। যে চিন্তায় তোমার মন অশান্তিতে ডুবিয়াছে, তাহা তোমার ভ্রম। তোমার পিতাও আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আমার চারু ও সুশীলার দিকে তাকাইয়া, তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ঐ দেখ, তিনিও আসিতেছেন। যোগীন্ যেন দেখিতে পাইলেন, যথার্থই তাহার পিতা। তাঁহার মূর্ত্তি শান্তিপূর্ণ। তিনি বলিলেন,—'যোগীন্! তোমার কাকী মা যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই। আমার নিয়তি পূর্ণ হইলেই আমি চলিয়া আসিয়াছি, নতুবা বিহারীর কি সাধ্য, আমার দিন না ফুরাইলে, আমাকে বিষ পান করায়। আমি উহাকে ক্ষমা করিয়াছি। তুমি উহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। প্রতিহিংসা পশুর কার্য্য, মনুষ্যের ধর্ম্ম নয়।' এই কথা বলিয়া, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যোগীন্ তাঁহার পিতার সহিত যাইবার জন্য যেমন উঠিতে গেলেন, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে হইল। সত্য সত্যই কি তিনি বিহারীকে ক্ষমা করিতে পারেন? তবে কি সন্ন্যাসী প্রতারক? কৈ বিহারী তাঁহার ত কোন অনিষ্ট করেন নাই। সে, তাঁহার পিতৃহন্তা; পিতৃহন্তাকে কি, পুত্র ক্ষমা করিতে পারে? স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহারই মনের কল্পনা। তিনি চারুকে বিবাহ করিয়া নিজে সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তাই, তাঁহার বিকৃত-চিত্ত তাঁহার মনোমত স্বপ্ন দেখাইয়াছে। যুক্ত করে ডাকিলেন, হে ভগবন! আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। আমি অতি দীন-হীন, আমাকে আর পরীক্ষা করিও না। আমি এই ভয়ানক পরীক্ষার উপযুক্ত নই। ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে আবার তাঁহার নিদ্রা আসিল।

পর দিন প্রাতঃকালে, চারু কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, আজ তাহার পিতার বিচারের দিন। সে জিজ্ঞাসা করিল, যোগীন্ কি কোন রকমে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না? যোগীনের মনে ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তিনি, শান্তভাবে বলিলেন, "আমি শপথ করিয়া সত্য কথাই বলিব; কিন্তু, তাহাতে তোমার পিতার কোন অনিষ্ট হইবে না। কারণ, আমি আমার

পিতাকে বিষ প্রয়োগের বিষয় কিছুই জানি না। আমার আর রবির প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা আদালতে আর কিছুই বলিব না। চারু সন্তুষ্ট হইল। দায়রায় খুন ও উইল জালের বিচার হইল। নীলকণ্ঠ বাবুর স্বীকার উক্তি, বিষক্রয় ও উইল জালের প্রমাণ হওয়াতে, উভয়েরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। যোগীন্ ও প্রফুল্ল, অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। নরেন্দ্র বাবুর ত্যক্তসম্পত্তি যাহা বিহারী আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা ও নীলকণ্ঠ বাবুকে যাহা দিয়াছিল, সমস্তই যোগীন্ প্রাপ্ত হইল। তাঁহাদের মিরাটের সেই প্রাসাদটি ফিরিয়া পাইল। নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া, পথের ভিখারী হইল। জগদীশ্বরই জানেন, এক জনের পাপে, এত লোকে কষ্ট পায় কেন?

মিরাটের প্রাসাদে চারুশীলাকে ও প্রফুল্লকে রাখিয়া, যোগীন্, রবীন্দ্রের অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু, কোনও সন্ধান পাইলেন না। সুশীলা কি রবির দেহের কোন খবর পাইলেন না। রবি যে পদ্মায় ডুবিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে করিয়া যোগীন্ ও চারুশীলা, অনেক দিন পর্য্যন্ত শোকে অভিভূত রহিলেন। প্রফুল্লের ইচ্ছা সত্বেও, উহাদের বিবাহ একবৎসরের জন্য বন্ধ রহিল। যোগীন্ এক বৎসর পরে, চারুশীলাকে লৌকিক মতে বিবাহ করা স্থির করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও কোম্পানীর আমল যায় নাই। মিরাটে তখন অনেক সিপাহী থাকিত। ১৮৫৭ সালের, মে মাসে, হঠাৎ সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া,] সাহেবদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। সহর সিপাহীদের দখলে রহিল। তাহারা চিরকাল, সামান্য সিপাহীর কাজ করিয়া আসিয়াছে, রাজত্বের কি বুঝিবে; কেবল লুটপাট আরম্ভ করিল। যোগীন্‌কে বলিল, আপনি টাকা দিলে আপনাকে মিরাটের রাজা করিব। যোগীন্ বলিলেন, তোমরা নর-হত্যাকারী বিদ্রোহী, তোমাদিগকে এক কপর্দ্দকও দিব না। এই কথায় উত্তেজিত হইয়া, একজন সিপাহী তাহার তরবারি উঠাইয়া, তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিতে গেল। কিন্তু, অন্য একজন সিপাহীর ইশারায় নিরস্ত হইয়া, তাঁহাকে বান্ধিয়া ফেলিল। এবং তাঁহাকে একটি কুঠুরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। যে সিপাহী ইশারা করিয়া তাঁহাকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিল, সেই অন্য সিপাহীদিগকে নিরস্ত করিয়া অন্য বাড়ী লুট করিবার জন্য তাঁহাদিগকে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া, তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে দেখিলেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহাদের বাল্যকালের ভৃত্য,—নবীন। নবীন বলিল, সে জানিতে পারে নাই যে, বাড়ী আবার তিনি পাইয়াছেন। সে নীলকণ্ঠ বাবুর পাপের শাস্তি দিবার জন্য, বিদ্রোহীদলে মিশিয়া, তাহাদিগকে আনিয়াছিল। নবীন

বলিল, যোগীন্ তুমি সিপাহীদিগকে ঘৃণা-সূচক কথা বলিও না। তাহারা অত্যাচারী ইংরাজের হস্ত হইতে দেশ জয় করিয়া, আবার হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিবে। তুমিও আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে, তোমার কিছুই থাকিবে না। মিরাটস্থ সমস্ত বাঙ্গালিই সিপাহীদের সঙ্গে মিলিয়াছে; এবং তাহাদের পরামর্শ মত সকল কাজ হইতেছে, ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিয়া একজন বাঙ্গালিকে, মন্ত্রী করিবার কথা হইয়াছে।

যোগীন্ বলিলেন, নবীন দাদা তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এই বিদ্রোহের ফল বড় বিষময় হইবে। ইংরাজকে তাড়াইয়া তুমি কাহাকে রাজা করিবে? কোন হিন্দুস্থানী রাজা, এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইবার উপযুক্ত নাই। যাঁহাকে রাজা করা হইবে, তিনিই সুরা ও সুন্দরীতে আসক্ত হইয়া দেশে অত্যাচারের স্রোত বহাইবেন। তুমি কি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? উহাদিগের মধ্যে অনেকেই নরাকার পশু। ভগবান্কে শত শত ধন্যবাদ দাও যে, উহারা আমাদের দেশের রাজা নয়। যেই রাজা হউক না কেন, বাঙ্গালির গোলামি কখনই ঘুচিবে না। যদি পরের অধীন থাকিতে হয়, তাহা হইলে ইংরাজ জাতির অধীন থাকাই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। তুমি কি মনে করিতেছ যে, আজ ইংরাজ চলিয়া গেলে, হিন্দুস্থানী রাজা হইবে? কখনই নয়,—দেখিবে, তখন তুরস্ক, আফগানিস্থান, রুশিয়া, জর্ম্মণী, সকলেই ভারতবর্ষের জন্য লোলুপ হইবে। হয়, মুসলমান রাজা হইবে, না হয় রুশিয়া রাজা হইবে। তাহাতে দেশের অবনতি বই উন্নতি হইবে না। আমাদের উপর, ইংরাজের সহানুভূতি নাই; কিন্তু, বহুদিন একস্থানে থাকিলে ক্রমে, সহানুভূতি হইবে। যখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, আমাদের শত সহস্র বৎসরের শিক্ষা আছে, যখন তাঁহারা বুঝিবেন আমরা অসভ্য বর্ব্বর নই, যখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, আমরা তাঁহাদের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত, তখন তাঁহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে শিখিবেন ও সহানুভূতি দেখাইবেন, তখন,তাঁহারা আমাদিগকে গুরু বলিয়া, ভক্তি করিবেন। এই পদ-দলিত হিন্দুজাতি সমগ্র ইয়ুরোপের গুরু বলিয়া পূজ্য হইবে,—পৃথিবীর সমগ্র শিক্ষিত জাতিই হিন্দু হইবে,—তখন আর আমরা পরাধীন থাকিব না। ইংরাজই সেই হিন্দুজাতির চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবেন। তাঁহাদের বাহুবলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পুরাকালীন শাস্ত্র আলোচনার অবসর পাইব। তবে অনর্থক নরহত্যা করিয়া কি কাজ; যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। যাহারা এই বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের কার্য্যে বাধা দিতেছে। ইহার যে কি বিষময় ফল হইবে, তাহা ভগবান্ই জানেন। নবীন তথাপি যোগীন্কে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন,—যে কাজে সিপাহীরা লিপ্ত হইয়াছে, তাহাও ভগবানের কাজ।

ভগবান্ তাহাদিগকে লওয়াইতেছেন। ইংরাজের আর সে দিন নাই। ভারতে থাকিয়া ভারতের ঐশ্বর্য্যে তাহারা বিলাসী হইয়া, আপনাদের ধর্ম্ম হারাইয়াছে। তাহারা পাপী না হইলে, তাহাদের দুর্দ্দশা কেন হইবে? তুমি সিপাহীদিগের সাহায্য কর, তোমার ভাল হইবে।

যোগীন্ বলিল, নবীনদাদা তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সত্য,—অনেক ইংরেজ পাপাচরণ করিতেছে; তাহার জন্য ভগবান্ তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহাত্মাও আছেন, তাহা না হইলে কি তাঁহারা এক টুকরা ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী হইয়া, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে এই অসীম প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন? ইংরাজের আধিপত্যে আমরা এক সমগ্র জাতির অধীন হইয়াছি। কোন একটা বিশেষ লোকের অধীন নহি। আজ তোমরা তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, কাহাকে তাঁহাদের স্থানে আনিতে চাও? যে রাজা হইবে, সে-ই অত্যাচারী হইবে। ইংরাজ যতই মন্দ হউক, তবু সমগ্র জাতি আমাদের প্রভু। কিন্তু, অন্যকেহ রাজা হইলে, এক জনের অধীন হইতে হইবে। সে অত্যাচারী হইলে, যথেচ্ছাচারী হইবে।

নবীন বুঝিল।—বলিল, যে আগুন জ্বালিয়াছি, তাহা ত আর নিবাইবার উপায় দেখি না। যাহা তুমি বলিবে তাহাই করিব।

দিল্লী।

তাঁহারা আহারে বসিয়াছেন, কত গল্প করিতেছেন, এমন সময় আওয়াজ হইল, "গুড়ুম্, গুড়ুম্ গুম্"। দেখিতে দেখিতে সিপাহী আসিয়া বাঙ্গালা ঘেরিয়া ফেলিল। কমিশনার সাহেব উঠিয়া, বন্দুক আনিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু, তাঁহার আর যাইতে হইল না। চারি পাঁচ জন সিপাহী, তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। আর কতকগুলি সিপাহী, মেম্ সাহেব আর ছোট ছেলে মেয়েদিগকে ধরিয়া লইয়া, এক ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল। সকলেই লুটপাটে, আর বৃথা নর-হত্যা পাপে, নিযুক্ত হইল। যুদ্ধ কোথায়? কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? প্রকৃত যোদ্ধা কোথায়, সকল সিপাহীই এখন ডাকাতেরও অধম। তাহাদের কোন দুষ্কার্য্যই অকরণীয় নাই। ভগবানের ইচ্ছা নয়, তাহারা রাজা হয়,—তাহারা রাজা হইবে কি করিয়া? তাই, তাহারা কেবল রাজা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই একমত হইল, বৃদ্ধ বাদশাহকে রাজা করিয়া, তাহারা ইংরাজকে তাড়াইবে। বৃদ্ধ বাদসাহকে ধরিয়া, সিংহাসনে বসাইয়া, আবার দেশের বাদসাহ বলিয়া প্রচার করিল। তিনি কত আপত্তি করিলেন; কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাঁহার নামে দলে দলে সিপাহী আসিয়া যুটিতে লাগিল। কিন্তু, তাঁহাকে বন্দীর ন্যায় পাহারায় থাকিতে হইল। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, তাঁহার দিন শেষ হইয়াছে। সিপাহীরা মারিলেও মারিবে, তাহাদের হাতে উদ্ধার পাইলে ইংরাজে মারিবে। ভাবনার কূল নাই দেখিয়া, তিনি অহিফে-

নের মাত্রা বাড়াইয়া, বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী নর্ত্তকী ও গায়িকা লইয়া, শেষ দিনের অপেক্ষায় রহিলেন। একবার ভাবিলেন না যে, তাহাতে শান্তি পাইবেন না। যাহাতে শান্তি পাইতে পারিতেন, সেই ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ যে আছে, তাহা স্মরণ হইল না।

মোগল পাঁড়ে, দিল্লীর সেনাপতি। বাদশাহকে পুতুলের ন্যায় সিংহাসনে বসাইয়া, দরবার করিয়া বসিয়াছেন। একপার্শে নর্ত্তকী নাচিতেছে, গাহিতেছে; অন্য দিকে দলে দলে সাহেব মেম বন্দী অবস্থায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মোগল পাঁড়ে, সকলের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সহী করাইবার জন্য, বাদসাহের নিকট ধরিয়াছে। বৃদ্ধ বাদসাহ বুঝিয়াছেন যে, ইহা তাঁহারই প্রাণদণ্ডের আদেশ। তিনি অতি কাতরভাবে ফ্রেজার সাহেব ও তাঁহার মেমের দিকে তাকাইলেন, আবার মোগল পাঁড়ের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন গাঁজার মহিমায় তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। ফ্রেজার সাহেব বলিলেন, বাদসাহ যাহা করিতে হয়, শীঘ্র করুন্; আমার মৃত্যু যাহাতে শীঘ্র হয় তাহা করুন্; আমি স্ত্রী কন্যার এ দুর্দ্দশা আর দেখিতে পারিতেছি না। যদি তখন আপনার কথায় বিশ্বাস করিতাম, যদি ভগবান্ আছেন, এ কথা না ভুলিতাম, তাহা হইলে, আজ আর এ নরাধমের কাছে, এরূপে দাঁড়াইতে হইত না। "নরাধম, কুক্কুর" এর প্রতিফল পাইবি" এই বলিয়া তিনি মোগল পাঁড়েকে পদাঘাত করিলেন। মোগল পাঁড়ে, তাঁহাকে গালি দিয়া এক তরবারির আঘাতে তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। আর আদেশ দিল, "যত ফিরিঙ্গী কুক্কুর আছে টুকরা টুকরা কর।" আমি দাঁড়াইলাম, যতক্ষণ আমার পা তাহাদের রক্তে না ডুবিবে ততক্ষণ আমি নিরস্ত হইব না।

তাহার এই ভীষণ আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, দশ বার জন সিপাহী দৌড়িয়া আসিল। ইংরাজের অসৎ ব্যবহারে সিপাহীরা হাড়ে হাড়ে এত চটিয়া ছিল যে, এরূপ নৃশংস ঘাতকের কার্য্যের জন্যও কত সিপাহী দৌড়িয়া আসিল। তাহারা প্রতিহিংসায় ভুলিয়া গেল যে, তাহারা যোদ্ধা। নিরস্ত্র ব্যক্তি, স্ত্রীলোক ও শিশু-বধ করা যে কত দূর নীচতার কার্য্য, তাহা তাহাদের মনে আসিল না।

ঠিক্ সেই সময়ে, দুই জন ভৈরব ও এক জন ভৈরবী ত্রিশূল হস্তে "হর হর মহাদেব" রবে গগন ভেদ করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের তেজ-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ সকলেই নতশির হইল। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। নর্ত্তকীরা, তালে তালে নাচিতেছিল, তাহাদের উত্থিত পদ, ঊর্দ্ধেই রহিয়া গেল।

ভৈরব ভৈরবীরা একে একে সমস্ত বন্দিগণের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। যাহারা তাঁহাদিগকে কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইয়াছিল, তাহাদের তরবারি কাড়িয়া লইলেন; কেহ বাধা দিতে সাহস করিল না। মোগল তাহাদের পদ তলে লুটাইয়া পড়িল। বলিল,

মা ভবানী কি চিরকালই অসুরের সহায় থাকিবেন? আমি অসুর দলনে নিযুক্ত। কেন মা আমাকে বাধা দিতেছেন?

ভৈরবী বলিলেন,—তোমরাই অসুরের ন্যায় কাজ করিতেছ। তোমরা যদি অসুর-দলনে নিযুক্ত, তবে কেন এই নিরস্ত্র, রমণী ও শিশু-হত্যার পাতকে ডুবিতেছিলে? ক্ষমতা থাকে যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ কর। ইংরাজকে দেখাও, তোমাদের বাহুতে কত বল? তাহা হইলে, ইংরাজ তোমাদের সম্মান করিতে শিখিবে। মনে করিও না তোমরা এই রাজ্য রাখিতে পারিবে। ইংরাজ রাজত্ব ভুলিয়া সওদাগর হইয়াছে। তাই ভগবান্ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তাহারা যে পাপ করিয়াছে, সেই পাপ আজ তাহারা আপন শোণিতে ধুইয়া দিতেছে। দেখিবে পাপমুক্ত হইয়া আবার তাহারা, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া, তোমাদের দুর্ব্বল হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধার করিয়া লইবে। ভগবান্ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের সাহায্যের জন্য। এই বলিয়া, তাঁহারা সমস্ত বন্দিগণকে সে স্থান হইতে সঙ্গে করিয়া ক্যাম্বেলের শিবিরে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুচাইয়া দিলেন। তাঁহারা ফ্রেজার সাহেবের মেমের নিকট তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া, ভৈরব ভৈরবীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিল্লী আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু, সেনাপতি প্রথমে তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিলেন না, তাহার ধারণা হইয়াছিল যে, দিল্লীর বাদসাহকে শীঘ্র পরাস্ত করা যাইবে না। বহু সৈন্য না হইলে ঐরূপ সুদৃঢ় দুর্গ আক্রমণ করা বৃথা। এই ভাবিয়া তিনি অনেক সৈন্য ও অর্থ প্রার্থনা করিয়া, ঐ সকলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া সিপাহীরা দলে দলে নগরের পর নগর লুট করিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমে এক এক জন সর্দ্দার তাহাদিগকে যুদ্ধের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। এখন, তাহাদের আর অর্থের অভাব নাই, কিন্তু তাহাদের দলপতি কেহই ছিল না।

কলিন তখন তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। ভৈরব ভৈরবী সকল সৈন্যের অগ্রে চলিল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কেহই আর যুদ্ধ করিল না। ক্রমে দিল্লী অবরোধ করা হইল। মুসলমান যুদ্ধ করিল। কিন্তু, পরাস্ত হইল; দিল্লী পুনরায় ইংরাজের হইল।

সিপাহী যুদ্ধের অবসানে সন্ন্যাসী ধরার ধুম পড়িয়াছে। ইংরাজের বিশ্বাস সিপাহী মাত্রেই ভণ্ড। যত বিদ্রোহী, সন্ন্যাসী সাজিয়াছে; সুতরাং সন্ন্যাসী দেখিলেই ধরিয়া আনিয়া ফাঁসি দেওয়া হইতেছে। এইরূপে একদিন পূর্ব্বোক্ত ভৈরব ও ভৈরবীকে ধরা হইয়াছিল। উভয়কে ফাঁসি দিবার হুকুম হইল। এই ভৈরব যোগীন্, ভৈরবী চারুশীলা।

যোগীন্ আদেশ শুনিয়া, হাসিলেন, বলি-

লেন,—"ইংরেজের অনেক উপকার করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধে গাছে লট্‌কাইবে। আগে কাহাকে লট্‌কাইবে, তোমাকে না আমাকে? শুনিয়াছি উহারা ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে, কিছু প্রার্থনা আছে কি না? আমি প্রার্থনা করিব, আমাদের একমুহূর্ত্তে ফাঁসি দিবার জন্য, যে একমুহূর্ত্তে জীবনমুক্ত হইয়া এক সঙ্গে আবার চলিতে আরম্ভ করিব।"

যোগীন্ আবার বলিল,—"চারুশীলে, আমরা জীবনে কিছুই করিলাম না, স্বামী স্ত্রী হইয়াও একদিন সুখী হইলাম না। আজ কি না আমার সম্মুখে তোমাকে ধরিয়া গাছে ঝুলাইবে, হায়! আজ মনে হইতেছে, কেন তখন নবীন দাদার কথা শুনিলাম না, ইংরাজ যে এত অধর্ম্মাচারী হইবে, তাহা কখনও মনে করি নাই।"

চারুশীলা বলিল,—"তোমার কাছে শিখিয়াছি যে, কেহ কাহাকে মারে না। আমরা মরিয়াই আছি, ইংরাজ কেবল নিমিত্ত মাত্র বই ত নয়। সুখ, দুঃখ, মান, অপমান সকলই সমান, আমাদের কিছুই নয়। সবই সেই ভগবানের। তাঁহার আবশ্যক থাকে ফাঁসি হইবে, আবশ্যক না থাকে কাহার সাধ্য আমাদের ফাঁসি দেয়?" যোগীন্ বলিল,—"তবে কি আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে?" চারুশীলা বলিল,—"বোধ হয়। আমরা থাকিয়া আর কি করিব। যদি আমরা স্বামী স্ত্রীতে সংসারী হইয়া থাকিতাম, তাহা হইলে, আমাদের অনেক কার্য্য থাকিত, আমরা এত শীঘ্র এস্থানে মরিতে পাইতাম না। ইচ্ছাময়ের সে ইচ্ছা নয়, নতুবা তোমার কেন মনে হইবে, আমার পিতা তোমার পিতৃহন্তা। তুমি পিতৃহন্তার কন্যাকে বিবাহ করিতে পার না, অথচ তুমি আমাকে গ্রহণ না করিলে তোমার মহাপাতক হইত। তাই, ভগবান্ আমাদের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, সে পথে আমরা উঠিতে পারিলাম কৈ? তোমাকে দেখিলে আমি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই। আমি তোমার সন্ন্যাসের কণ্টক, তাই ভগবান্ আমাকে লইতেছেন। কিন্তু, তোমার ফাঁসি কেন হইতেছে তাহা ভগবান্ই জানেন। তুমি কেন উন্নতির পথে উঠিতে পারিলে না?

যোগীন্ বলিল,—"তুমি চিন্তা করিও না; আমাদের ফাঁসী হইবে না। আমাদের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। তুমি যে উন্নতির কথা বলিতেছ, তাহা আরও শত জন্মের আরাধনায়ও হইবে কি না জানি না। উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এখনও যায় নাই। পরহিত-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহারও উদ্‌যাপন হয় নাই, সুতরাং এখনও যাওয়া হইবে না।"

চারুশীলা হাসিল। বলিল,—"যাইবে না, —থাকিবে কি করিয়া, কিছু পরেই ধরিয়া লইয়া গাছে টানাইয়া দিবে। যোগীন্ বলিল যাঁহার কাজ তিনিই তাঁহার বিধান করিবেন। এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, কর্ণেল নীল আসিয়া আদেশ দিলেন, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনীকে গাছে লট্‌কাইয়া দাও। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের বলি-

বার কিছু আছে? তোমরা বিদ্রোহী, অনেক ইংরাজ-রমণী ও শিশু হত্যা করিয়াছ; সুতরাং তোমরা দয়ার অযোগ্য। যোগীন্ বলিল, তোমার নিকট দয়া-ভিক্ষা চাহি না। যিনি রাজার উপর রাজা, যাঁহার নিকট একদিন তোমাকে দয়ার ভিখারী হইতে হইবে, আবশ্যক হইলে তিনিই দয়া করিবেন। আর যদি আমাদের জীবনের কার্য্য শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা চলিয়া যাইব। তোমার ন্যায় ইংরাজের জন্যই, ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য যাইতে বসিয়া ছিল, তথাপি তোমার মত লোকের চৈতন্য হইল না। আমাদের ফাঁসী দাও, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু তোমার যে পাপ হইবে, তাহার জন্য আমরা চিন্তিত। আমরা ইংরাজের অনিষ্ট কখনও করি নাই। ভগবান্ শত শত ইংরাজ-রমণী ও শিশু উদ্ধার করিবার জন্য আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, হত্যা করিবার জন্য নয়।"

চারুশীলা বলিল,—"সাহেব, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। তোমারও স্ত্রী আছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমরা সন্ন্যাসী হইলেও, স্বামী ও স্ত্রী। আমাদের একই মুহূর্ত্তে, এক বৃক্ষে ফাঁসী দাও যেন, আমি শেষ পর্য্যন্ত আমার স্বামীকে দেখিতে পাই। অন্য সাহেব হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু কর্ণেল সাহেবের ইহাতে দয়া হইল না।" তিনি হাসিতে হাসিতে হুকুম দিলেন,—"তাহাই হইবে।"

তিন চারি জন মুসলমান সিপাহী, ভৈরব ও ভৈরবীকে বন্ধন অবস্থায় এক বৃক্ষ-তলায় লইয়া যাইয়া লম্বমান রজ্জুতে তাঁহাদের গলা আট্‌কাইতেছে, এমন সময় জেনারল কলিন ও ক্যাম্বেল সাহেব এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভৈরব ও ভৈরবীকে দেখিবা মাত্র চিনিলেন। "কর কি, কর কি, বলিয়া" সিপাহীদিগকে নিরস্ত করিয়া, কর্ণেল সাহেব তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। বলিলেন,—"বিনা বিচারে, কেন এইরূপ বৃথা নর হত্যা করিতেছ? এ জীবনে না হউক, পর-জীবনেও কি ইহার জন্য দায়ী হইতে হইবে না। সত্য, অনেক অসহায় রমণী ও শিশু-হত্যা হইয়াছে। কিন্তু, সে জন্য প্রতিহিংসা পর-বশ হইয়া, আরও হত্যা করিলে কি আমাদের ভাল হইবে? সাবধান! কর্ণেল, যেমন তুমি আমি পাপের জন্য দায়ী, সেইরূপ সমগ্র ইংরাজ পাপের জন্য দায়ী। ভগবানের বিচারে কিছুই ছাপা থাকিবে না। যে রমণী ও শিশু-হত্যা হইয়াছে, তাহা যে আমাদের জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য হয় নাই, তাহা কে বলিল? তাহারা নির্দ্দোষ,—যিশুও নির্দ্দোষ। সমগ্র মানব-জাতির পাপের জন্য তিনি বলি হইয়াছিলেন। সেইরূপ ইহারাও যে বলি হয় নাই কে বলিল? সে জন্য আর বৃথা হত্যা করিও না।" এই বলিয়া ভৈরব ও ভৈরবীকে লইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কলিন্ ক্যাম্বেলের মহত্ত্ব কি কথ-

নও, নীচের মত লোকে, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? ভগবানের ইচ্ছা, বুঝি, ভারতের অদৃষ্টে আরও অনেক দুঃখ আছে। তাহা না হইলে, সকল ইংরাজই কলিন্ ক্যাম্বেলের ন্যায় হইত।

ঠাকরুণ্ বাড়ীর সাধের প্রতিমা।

শ্রাবণ মাসের পদ্মা ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ভয়ে নৌকা লইয়া কেহ পদ্মায় যায় না। এমন সময় কে ঐ ক্ষুদ্র তরীতে নাচিতে নাচিতে যেন তালে তালে ক্ষেপণীবিক্ষেপে ধীর-গতিতে, ঠাকরুণ্ বাড়ীর মন্দিরাভিমুখে যাইতেছে? সঙ্গে একটিমাত্র কিশোরী। বায়ু-ভরে কিশোরীর অলকারাশি উড়িতেছে। ক্ষেপণী পড়িতেছে, নাবিকের সে দিকে দৃষ্টি নাই। একদৃষ্টে কিশোরীর অলকা-রাশির দিকে তাকাইয়া কি দেখিতেছে। অনেকক্ষণ পরে, নাবিক কহিল, সুশীলা, বহু বৎসর পরে আবার আজ তোমাকে লইয়া এই বিশাল পদ্মাবক্ষে ভাসিতে সাধ হইয়াছে, তাই আজ এ ক্ষুদ্র তরণীতে তোমাকে লইয়া বাহির হইয়াছি। আমাদের বাঁচিয়া কি সুখ? কত কাল আর এই ভাবে ভাঙ্গা মন্দিরে থাকিব? আমার কষ্ট নাই, যখনই কোন কষ্ট হয়, তোমার মুখ দেখিলে সকলই ভুলিয়া যাই। কিন্তু, তোমার কষ্ট মনে হইলে, আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না। আমি যদি তোমাকে লইয়া এ জঙ্গলে লুকাইয়া না থাকিতাম, তাহা হইলে হয় ত তোমার পিতা, তোমাকে খুঁজিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেন। কিন্তু, কি স্বার্থান্ধ আমি, সব ভুলিয়া গেলাম। মনে করিলাম, তোমাকে লইয়া আমি এই বনেও রাজা হইয়া থাকিব।

সুশীলা বলিল, যথার্থই রবি দাদা। কেন আমার ত কোন কষ্ট নাই। তোমাকে পাইয়াছি বলিয়া, আমি ত আর কিছুরই অভাব দেখি না। মা, আমাদিগকে ফেলিয়া গিয়াছেন। শৈশবে যাহার মা না থাকে, তাহার কেহই থাকে না; তা না হইলে কি আমাকে জীবন্তে পদ্মায় ফেলিয়া দিত? ভাল কথা রবি দাদা। আমাকে কেন জীবন্ত পদ্মায় ফেলিয়া দিয়াছিল? তাহা যে তুমি বলিবে বলিয়াছিলে, কৈ তাহা বলিলে না ত?

রবি কহিলেন যে, তোমার জ্বর হইয়া, তুমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলে। তোমাকে মৃত মনে করিয়া, তোমার বিমাতার আদেশে তোমার পিতা, তোমার মৃত-দেহ পদ্মায় ফেলিয়া দিবার জন্য, আমাকে ও দাদাকে পরামর্শ দিল। আমরা দুই ভাই তোমাকে পদ্মায় ফেলিয়া দিবার জন্য, আনিয়া ছিলাম। তার পর দিন, তোমার দিদির বিবাহ। পাছে, কেহ টের পায়, আর বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়,—সেই জন্য, আর কেহ সঙ্গে আইসে নাই। দাদা তোমাকে পদ্মার তীরে আনিয়া, দাহ করিবে বলিয়া, কাষ্ঠ আহরণে গেলেন। আর আমি তোমার কাছে বসিয়া থাকিলাম। তুমি যে নাই, আমি সে ধারণা করিতে পারি নাই। ক্ষণেক পরে, আমি দেখিলাম যে, তোমার চক্ষু নড়িতেছে।

আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দাদা আসিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া, তোমাকে টানিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। আমি তোমাকে ধরিতে যাইয়া, ধরিতে না পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িয়া, তোমাকে ধরিয়া, ভাসিতে ভাসিতে এই ভগ্নমন্দিরে আসিয়াছিলাম। এখানে সেই পূজারি ব্রাহ্মণ, তোমাকে ও আমাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, যথাশাস্ত্র আমাদিগের বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, আমি পূজা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু, আমরা ব্রাহ্মণ নই। ব্রাহ্মণ সাজিয়া দেবী পূজা করি, তাহাতে নিশ্চয়ই পাতকগ্রস্ত হইতেছি ; সে জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব মনে করিয়াছি। একবার পদ্মা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন, দেখিব এবার পদ্মাবক্ষে আমার স্থান হয় কি না ? তোমাকে আর কোথায় রাখিয়া যাইব ?—তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব। আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে ত ?

সুশীলা কহিল, ইহলোকে বা পরলোকে এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে তোমার সঙ্গে যাইতে না পারি ? শীতকালে যখন পদ্মার স্বচ্ছসলিল তর্ তর্ করে, তখন আমার মনে হয়, আমি কেন ডুবিয়া মরি না। আবার যখনই ভাবি, ডুবিয়া মরিলে যদি তোমাকে না পাই, তাহা হইলে অমরার রাণী হইলেও ত আমি মরিতে পারি না। তুমি যদি বল, একসঙ্গে ডুবিলে একসঙ্গে থাকিব, এখনই ডুবিতে পারি। পূজারি ঠাকুর বলিতেন "মা, জীবনে মরণে রবিই তোমার একমাত্র সঙ্গী" আমি কেবল তাহাই শিখিয়াছি। মা চিনি না, পিতাকে ভুলিয়া গিয়াছি, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছি। তোমাকে না ভাবিলে ত আমি ভগবান্‌কেও ভাবিতে পারি না। তোমার সঙ্গে মরিব, ইহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় আর কি আছে ? এস, হাত ধরাধরি ক'রে পদ্মায় ঝাঁপ দি ; এই বলিয়া রবির হাত ধরিয়া সুশীলা জলে ঝাঁপ দিতে যায়, এমন সময় পাহাড় হইতে এক চাপ মাটি ভাঙ্গিয়া নদীতে পড়িল, আর ঝম্ ঝম্ শব্দ হইয়া উঠিল, উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল, রাশি রাশি মোহর নদীতে পড়িতেছে। রবি দেখিয়া বলিল, না সুশীলা, এ ভাবে মৃত্যু ভগবানের ইচ্ছা নয় ; চল, নৌকা লইয়া ঐ মোহর ধরি। এই বলিয়া নৌকা লইয়া, এক নৌকা বোঝাই করিয়া মোহর ধরিল। উভয়ে যত পারিল, রাশি রাশি মোহর পাড়ে উঠাইল। আবার নৌকা বোঝাই। তথাপি শেষ হয় না। ক্রমে ক্রমে, নৌকা বোঝাই করিয়া, আট দশ বার, মোহর লইয়া মন্দিরে রাখিয়া আসিল।

এ সংসারে, টাকা হইলে সকলই হয়। ঠাকুরাণী বাড়ীর জঙ্গল, ক্রমে সহর হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর মত বাড়ী হইল। কত বাড়ী, কত লোকের বসতি হইল। ঠাক্‌রুণ্‌বাড়ী বহু জনাকীর্ণ সহর হইয়া উঠিল।

রবি এখন সুশীলাকে লইয়া সেইরূপ পদ্মায় নৌকা বাহিয়া বেড়ায় ; কিন্তু, সে আর ক্ষুদ্র ডিঙ্গি নহে ;—সে সুন্দর বজরা। সেই-

রূপই মন্দিরে আইসে, কিন্তু, এখন আর পূজার জন্য নয়। সেই মন্দিরে সুশীলার স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার নাম দিয়াছে "ঠাকুরাণী" তাই নাম হইয়াছে "ঠাকরুণবাড়ী।" ঠাকরুণবাড়ীর মন্দিরে মাতৃহীন অনাথ বালক-বালিকা থাকিবার জন্য, এক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে স্বয়ং সুশীলা, জননীর ন্যায়, সকলের তত্ত্বাবধান করে। অনেক অনাথ শিশু, তাঁহাকে মন্দিরবাসিনী স্বর্ণ প্রতিমা বলিয়া মনে করে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এ।

শবরী।

(রামের প্রতি)

কে ডাকিলে মোরে স্নেহের স্বরে,
তুমি কি আমার প্রাণারাম ?—
প্রভু, এসেছ করিয়া করুণা।
ওগো পিঙ্গল, নব শ্যামল,
দয়িত নয়ন-অভিরাম,
তুমি পূরাবে কি মোর বাসনা ?

শিহরি আত্মা পুলকে আমার
উঠিছে কি আজি সান্ত্বনা,
তুমি এস আরো কাছে সখা হে!
চণ্ডালী আমি, নারায়ণ তুমি,
শুনিবে কি মোর প্রার্থনা,
নাথ, ব্যথিতে কি দিবে দেখা হে ?

ঘৃণিতা আমি, নিন্দিতা আমি,
তুমি কি শুনিবে কথা মোর ?
তুমি যে দেবতা স্বরগ-বাসী।
ফেলিতে কি দিবে চরণে তোমার
দুটি ফোটা মোর আঁখিলোর—
আমি যে তোমারি চরণ-দাসী।

কাতরে চরণে লয়েছি শরণ
তুমি ত মানস-বাঞ্ছিত,
ওগো পিঙ্গল, নব-শ্যামল,
তব চরণে ক'রোনা বঞ্চিত।

শ্রীঃ—

গীতি-লহরী।*

আমরা, এই প্রত্যক্ষপরিলক্ষিত জড়-জগতে বহুবিধ অলক্ষিত স্রোতের দ্বারা নিয়ত স্পৃষ্ট অথবা প্রতিহত হইয়া থাকি। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইটির মধ্যে, একটির নাম গতির স্রোত,—Current of Motion আর একটির নাম ধ্বনির স্রোত,—Current of Sound. এই উভয় স্রোতেই, অবস্থাবিশেষে, তান-লয়-সঙ্গত মনোহর তরঙ্গ দোলায়িত হইয়া থাকে। গতির স্রোত যখন তান-লয়-সঙ্গত নয়ন-তর্পণ-তরঙ্গে পরিণত হয়, তখন তাহার নাম নৃত্য। ধ্বনির স্রোত যখন ঐরূপ তান-লয়-সঙ্গত শ্রুতি-তর্পণ-তরঙ্গে পরিণত হয়, তখন তাহার নাম গীত। গতি আর গীতে কিরূপ গূঢ় সম্বন্ধ নিত্যবদ্ধ, তাহা চিন্তা করিলে, হৃদয় ভাবের আবেশে উথলিয়া উঠে।

অনেক জীবের স্বাভাবিক গতিই সুললিত নৃত্যের অনুকৃতি স্বরূপ। কম-কলেবরা কপোতী অথবা হংসী যখন, দর্শকগণের হৃদয়ের ভাব অণুমাত্রও অনুভব না করিয়া, আপনার ক্ষুৎপিপাসার প্রয়োজনে, স্বাভাবিক গমনে, হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়, তখন অনেকেরই মনে লয় যে, যেন কোন নব-যৌবন-স্ফুরণা প্রেমময়ী ললনা, প্রেমারাধ্য প্রিয়তমের অন্বেষণে মন্থরগমনে চলিয়া যাইতেছে। হংসীর ঈদৃশী মনোহারিণী গতি দেখিয়াই কবি গীতে গাইয়াছেন,—

"ধীরে ধীরে চলিল প্যারী হংসীগতি,
কিবা চরণ দু'খানি অগতির গতি।"

এইরূপ আবার অনেক জীবের স্বাভাবিক কণ্ঠধ্বনিই অতি মধুর সঙ্গীতের অনুকরণ স্বরূপ। শ্যামা যখন, গহন কাননে, সান্দ্রপল্লব তমালের ডালে বসিয়া, স্বভাবের প্রণোদনে, কখনও মৃদু মৃদু, কখনও বা সুস্ফুট-মধুর স্নিগ্ধস্বরে 'শীশ্' দেয়, অথবা দয়েল যখন, সুরভিবকুলের শ্যামল-পত্ররাশির মধ্যে, আপনার শ্যাম-তনু কতকটা ঢাকিয়া, স্বর সঞ্চারণ করে, তখন শিশুরাও সে স্বর-লহরীতে সংগীত-লহরীর সুখ-স্বাদ অনুভব করে; এবং যাহারা শিশু নহে,—যাহারা শৈশব ও বাল্যের বয়ঃসীমা অতিক্রম করিয়া, সংসারে প্রেম ও বিরহের প্রভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, তাহারা শ্যামার সে 'শীশে', সোহাগিনীর সংকেত-সম্ভাষণ, আর দয়েলের সে ভাঙা ভাঙা স্খলিত ধ্বনিতে

* "গীতিলহরী অর্থাৎ ৺ কালিদাস মুখোপাধ্যায় ('মির্জ্জা') মহাশয়ের গীতাবলী সংগ্রহ। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

বিরহিণীর বিষাদগীতির সাম্য অনুভবে, প্রাণে শিহরিয়া উঠে।

যেমন বিহঙ্গের মধ্যে শ্যামা, দয়েল ও বুল্‌বুল্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিহঙ্গ, তেমনই মনুষ্যের ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা, উর্দ্দু ও ইটালীয়া প্রভৃতি কএকটি অপেক্ষাকৃত নব্য ভাষা। এখানে বাঙ্গালারই কথা কহিব বাঙ্গালা ভাষা, উহার এক মূর্ত্তিতে, সংগীত-সুধার সমুদ্র স্বরূপ। উহা ভাবের বিকাশে ও রসের উল্লাসে, কখনও মুগ্ধা বালা, কখনও মদিরায়ত-লোচনা প্রগল্‌ভা মোহিনী। উহাতে কথা কহিলেই, গীতের ছন্দ হয়; এবং সে ছন্দোবৈচিত্র্যে স্নেহ, বাৎসল্য, বিরহ ও প্রেম-ভক্তি-করুণা প্রভৃতি কান্ত-কোমল ভাব-নিবহের গঙ্গীভূত রস, আপনা হইতে প্রস্তুত হইতে থাকে। উহা ভাবাবেগ-বিভোরা বিনোদকামিনী, কিংবা ভক্তি-বৈরাগ্যপরায়ণা বন-বাসিনী তপস্বিনীর মত, বিষয়বাণিজ্য ও বিজ্ঞান-শিল্পের বিবিধ প্রসঙ্গে আজ পর্য্যন্ত সামান্য আলাপেও অপটু অথবা বীতস্পৃহ। দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যায়ও এখন পর্য্যন্ত, উহার উপযুক্ত অনুরাগ জন্মে নাই। কিন্তু, উহার কণ্ঠস্বরে এমনই একটুকু অপূর্ব্ব লালিত্য,—অনুপ মাধুরী আছে যে, উহার সুখ-দুঃখের সকল কথাই স্বভাবতঃ সংগীতের মূর্ত্তি ধারণ করে। বস্তুতঃ, গীতাত্মিকা রচনা বাঙ্গালা ভাষায় অতুল সম্পদ। এ অংশে, বাঙ্গালার মাজননী জগন্মোহিনী সংস্কৃতভাষার সহিতও উহার তুলনা হয় না।

সংস্কৃতভাষা, সংগীত অপেক্ষা, শ্লোক-বদ্ধ রচনায়ই অধিকতর অনুরাগিণী, অথবা সমৃদ্ধিশালিনী। সংস্কৃতসাহিত্যে, ইতিহাস, বিজ্ঞান,—ধর্ম্মকথা, কর্ম্মকথা, রাজনীতি, সমাজনীতি, তত্ত্ববিদ্যা অথবা জ্যোতির্ব্বিদ্যা, প্রায় সমস্তই শ্লোক-নিবদ্ধ,—শ্লোকে গ্রথিত। 'প্রায়' বলিতেছি, কেন না, অশ্লোকা রচনাও সংস্কৃতে না আছে, এমন নহে। তবে, তাহার পরিমাণ, তুলনায় নিতান্ত কম। কিন্তু, যে শ্রেণির রচনা খোল, খরতালী, খঞ্জনী, এবং বীণা, বেণু ও ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে, স্বরসংযোগে, গান করা যায়, তাহার ভাগ সংস্কৃতে বড় বেসী নহে। তাদৃশ রচনা সংস্কৃতে অতি সহজসাধ্য হইলেও, তদানীন্তন সামাজিকেরা উহার প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করেন নাই; এবং কবির প্রতিভাও, সুতরাংই, সথ করিয়া সে পথ লয় নাই।

বাল্মীকির রামায়ণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, এবং ব্যাসের মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক আছে; একটি গীত নাই। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে যে, বাল্মীকির সমগ্র রামায়ণ রামাত্মজ কুশ আর লব কর্ত্তৃক প্রথমতঃ এখানে সেখানে, তার পর রাম-সভায় গীত হইয়াছিল। কিন্তু, রামায়ণের কোন একটি শ্লোকেও রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ নাই। অনুষ্টুপ্‌ছন্দের শ্লোককে, এইভাবে গাইতে হইলে, মন্বত্রিসংহিতা হইতে, মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী পর্য্যন্ত, সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থই গান করা যাইতে পারে।

আমাদিগের একটি অধ্যাপক,—পূজাস্পদ কালীবর গিরিঠাকুর,—পাণিনির সূত্রনিচয়, উদাত্ত প্রভৃতি স্বর-ভেদে, কর-ধৃত-তাল-সহকারে, সংগীতের ধরণে গাইতেন, এবং আমরা তাঁহার অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হইতাম না বলিয়া কটু বলিতেন। অনুকরণ-চেষ্টা দূরে থাকুক, তিনি যখন পাণিনির প্রথম-পাদ-পরিগৃহীত মাহেশ্বর সূত্রনিচয়কে কলাবতের অনুকরণে, এবং "মস্‌জি নশোর্ঝলি—রধিজভোরচি—নেট্যলিটি রধেঃ,—রভেরশব্লিটোঃ,—পরেশ্চ ঘাঙ্কয়োঃ" প্রভৃতি ষট্‌স্বরাত্মক স্বল্পাক্ষর সূত্রগুলিরে গোপাল উড়ের ভঙ্গীতে আড়্‌খেমটায় গাইতে আরম্ভ করিতেন, তখন হাস্য সংবরণই আমাদিগের পক্ষে কঠিন হইত।

ফল-কথা, শ্লোক মাত্রকে সংগীত বলিয়া গণনা না করিলে, সংস্কৃতসাহিত্যে গীতের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রচরদ্রূপ সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে জয়দেব-প্রণীত গীতগোবিন্দ ছাড়া, সর্ব্বাবয়বে সংগীতাত্মক আর একখানি গ্রন্থও বিদ্যমান আছে কি না, আমরা তাহা জানি না। সংস্কৃতে, গীতিরচনা বিষয়ে, একমাত্র জয়দেবকে লইয়াই বিশেষ গৌরব প্রদর্শিত হয়। সে জয়দেব বাঙ্গালি।

সংস্কৃতসাহিত্য যে গীতিভক্ত নহে, ইহার এক বিশিষ্ট নিদর্শন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য। দেশীয় লোকের মধ্যে, দশ জনে যাহা চায়, নাট্যকবিরা তাহাই রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়া থাকেন। উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য হইতে কাশ্মীরের শ্রীহর্ষ পর্য্যন্ত, দিক্‌পালগণের সময়ে, গীতের যদি তেমন আদর থাকিত, তাহা হইলে তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যেও তাহার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু, সংস্কৃত নাটকনিচয়ের প্রতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলে, বরং ইহার বিপরীত পক্ষই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, কিবা কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল, কিবা ভবভূতির উত্তর-চরিত ও ভাব-রসজ্ঞ শ্রীহর্ষের রত্নাবলী, ইহার একখানিতেও গীতিরচনায় তেমন আগ্রহ প্রদর্শিত হয় নাই।

ভবভূতির উত্তরচরিত, বিপ্রলম্ভ-করুণ রসের পীযূষ-প্রস্রবণ-সদৃশ। অথচ, উহাতে করুণা কিংবা অন্য কোন রসের একটি গীত দৃষ্ট হয় না। উত্তরচরিত, বীরচরিত ও মালতীমাধব এই তিনখানি নাটকই বিদর্ভ-রাজ্যের অন্তর্গত পদ্মনগরে কালপ্রিয়নাথ নামক মহাদেববিগ্রহের যাত্রামহোৎসবে অভিনীত হইয়াছিল। অথচ তাদৃশ উৎসবেও গীতের গন্ধমাত্র নাই।

শ্রীহর্ষের রত্নাবলী মদন-মহোৎসবের উল্লাসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত; এবং যুবক-যুবতীরা, সে উৎসবে, আসিরসের উদ্বেল আমোদে, উন্মত্তের মত, আত্মবিস্মৃত। তথাপি, তাহাদিগের কণ্ঠে কিঞ্চিন্মাত্র গীতিস্ফূর্ত্তি নাই। দুইটি প্রথমবয়স্কা পুর-পরিচারিকা, বসন্তের সমাগম বর্ণনায়, একটিমাত্র গীত গাইয়াছে। সে গীতটি প্রাকৃত। নাটকে ঐ অনন্যসঙ্গ প্রাকৃত গীতটি না থাকিলে, মনে করিতে হইত যে, কাশ্মীরে তখন গীতের একবারেই প্রচলন ছিল না।

কবিকুল-শিরোমণি কালিদাস উচ্চভাব-পুষ্ট আদিরসের যেমন আচার্য্যগুরু, গীতি-কুসুমেরও তেমন সুরভিসুন্দর কল্পতরু। তাঁহার যে প্রতিভা' সংস্কৃতকবিতায় লোকোত্তর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেই প্রতিভা, প্রবৃত্তি হইলে, অথবা উৎসাহের প্রবর্ত্তনা পাইলে, গীতিরচনায়ও নিশ্চয়ই চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারিত। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! এহেন কালিদাসের হৃদয়-কাননের কএকটি মাত্র গীতিকুসুম, তৎ-প্রণীত পৃথ্বীবিখ্যাত নাটকত্রয়ে স্থান লাভ করিয়া, আজি আমাদিগের আলোচনার বস্তু হইয়াছে, এবং সে কএকটিও পূর্ণাবয়ব-কুসুম-কান্তিতে পরিশোভিত না হইয়া, নথ-ছিন্ন কুন্দযূথিকার কোন একটা দিকের মত দৃষ্ট হইতেছে। যথা,—অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথমাঙ্কের "ইসীসিচুম্বিয়াই" পদাদিকা নিদাঘ-গীতি, এবং পঞ্চমাঙ্কের "অহিণব মহুলোলুবো" ইত্যাদিক শব্দপ্রমুখা, রাজ্ঞী বসুমতীর প্রধানা সহচরী অথবা অপ্রধানা সপত্নী, মঞ্জুভাষিতা চুতমঞ্জরীসদৃশী হংস-পদীর উক্তি।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে, অনেক গীত ঠাঁই পাইতে পারিত। উহাতে আমাদিগের দীনবন্ধু, গিরীশচন্দ্র, কিংবা অমৃতলালের কিঞ্চিন্মাত্র সম্পর্ক থাকিলে, উহার অঙ্কে অঙ্কে, আকাঙ্ক্ষার আনন্দ ও আশঙ্কার অবসাদ, ভাষার স্বাভাবিক গুণে দ্রবীভূত হইয়া, গীতের প্রবাহে বহিত। কারণ, নাটকের নায়িকা মালবিকা, অতি সুকণ্ঠ গায়িকা, এবং গৃহপ্রতিষ্ঠিত নাট্যবিদ্যালয়ের ছাত্রী। গীতিশিক্ষাই তখন তাহার নিত্যকার্য্য; এবং সে কেমন গাইতে পারে, ইহাই তখন বিশেষরূপে বিচার্য্য। গীতের এমন সুযোগ-সম্ভাবনা স্থলেও, কবি সে নাটকে, শ্রোতৃবর্গকে মালবিকার মুখে একটিমাত্র অনতিবিস্তৃত চতুষ্পাদবদ্ধ ছলিক-নামক গীতি শুনাইয়াই, তৃপ্ত রহিয়াছেন; এবং বিক্রমোর্ব্বশীতেও আক্ষিপ্তিকা, দ্বিপদিকা, জম্ভালিকা, খণ্ডধারা ও চর্চ্চরী প্রভৃতি বড় বড় উপাধিমুখরা, অল্পাক্ষরী গীতি-যোজনার দ্বারাই, গীতিবৎসলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অপিচ, এই যে কালিদাসীয় সাহিত্যের সংগীত সর্ব্বস্বস্বরূপ অল্প কএকটি গীতের উল্লেখ করিলাম, ইহার একটিও সংস্কৃত নহে; এবং কোন একটিও শ্লোকের চারি চরণাত্মক চারিটি পংক্তি অতিক্রম করিয়া পঞ্চম পংক্তিতে বিস্তৃত নহে। এক দুই করিয়া পংক্তি গণনা করিলে, কালিদাসের সমস্ত গীতিরচনা বিংশতি পংক্তিতে পঁহুছিবে কি না, সন্দেহ।

তাই বলিয়াছি যে, সংস্কৃতরচনায় বঙ্গভারণ জয়দেব-গোস্বামীর গীতাবলী ছাড়া শ্রুতিসুখাবহ উপাদেয় গীত আর কোন গ্রন্থে বিদ্যমান আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। যদি থাকিত, আর যদি সে সকল গীত পরিরক্ষণের উপযোগি পদার্থ হইত, তাহা হইলে সাহিত্যে তন্নিচয়ের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর প্রদর্শিত হইত না; এবং রাঘব-ভট্ট প্রভৃতি টীকাকারেরা সঙ্গীত-

রত্নাকর, সঙ্গীত-সুধানিধি ও সংগীত-দামোদর প্রভৃতি যে সকল প্রামাণিক গীতিগ্রন্থের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দুই একটি গীত, জয়দেবীয় গীতের মত, অধুনাতন গায়কদিগের নিকট না পঁহুছিয়া পারিত না।

কিন্তু, গীতিবিষয়ে, সংস্কৃতের তুলনায়, সংস্কৃতপ্রসূত অনতিবিকশিত বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালাসাহিত্যের আদি, অন্ত, মধ্য সমস্তই গীতে প্রস্ফুরিত—গীতে বিলসিত, গীতে অলঙ্কৃত, এবং নানাফুলের গীতি-মালায় ওতপ্রোত জড়িত। ঐতিহাসিকেরা যে কালকেই কেন বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি ও আবির্ভাব-কাল বলিয়া অবধারণ না করুন, ইহা নিঃসংশয় কথা যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সময় হইতেই, বঙ্গে উহার সমধিক প্রভাব। বঙ্গের সে অতি পুরাতন, অনার্য্যভাষা ক্রমে লোপ পাইল; এবং সংস্কৃতমিশ্রা বাঙ্গালা, সংস্কৃত শব্দসম্পদে সমৃদ্ধা ও শোভাম্বিতা হইয়া, চারিদিকে প্রচারিত হইতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু, তখন, বাঙ্গালায় গদ্য ফুটিল না,—ফুটিল গীত।

যখন ভাগীরথীর তটে, ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবের উচ্ছ্বাসে,—কীর্ত্তনের নূতন উৎসবে, নব-জলধর-গম্ভীর মধুর-মৃদঙ্গ, মন্দিরাযোগে বাজিয়া উঠিল, তখন বঙ্গদেশে, এক সঙ্গে, সহস্রকণ্ঠে সংগীতময়ী বাঙ্গালা ধ্বনিত হইল। যেমন নব-বসন্ত-সমাগমে, নিকুঞ্জে কিংবা বনে ও উপবনে, এক সঙ্গে অসংখ্য কোকিল-কণ্ঠ কুহরিত হয়, গৌরচন্দ্রের প্রেম-বসন্ত-সমাগমেও, সেইরূপ সহস্র ভক্তকবির কোমল-কণ্ঠ, অতি বড় ললিত, অতিতর মধুর, অতিমাত্র ভাব-রস-পীযূষ-সিক্ত গীতিপদাবলীতে কুহরিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন যাহার গায়ে গৌরাঙ্গের বাতাস লাগিল, সেই আনন্দে মাতিয়া,—ভাবে উথলিয়া,—নাচিয়া নাচিয়া, গীত গাইল। যে আর কিছু না পারিল, সেও, অন্ততঃ দুই চারিটি নূতন গীতে আপনার প্রাণের কথা গাঁথিয়া, প্রাণ জুড়াইল; এবং তৃষিত-প্রাণে অন্যদীয় গীতিসুধা পান করিয়া, ভাবের সেই এক অনির্ব্বচনীয় আবেশে নয়ন-জলে ভাসিল। এই যে, বাঙ্গালায় গীতের প্রবল স্রোত ঢেউ খেলাইয়া প্রবাহিত হইল, আর উহা থামিল না।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায়, বীররস ও আদিরসের অতি উৎকৃষ্ট সংগীত অনেক আছে,—অনেক। ফরাসিদিগের মারশেল প্রভৃতি বীর-রস-গাথাবলী সমস্ত জগতে সুপরিচিত। ফারসি গজল, এবং ফারসির অনুকরণে উর্দ্দু টপ্পা, রস-মাধুর্য্যের টল-টল-পূর্ণতায়, আতটপূর্ণ সরবতের পিয়ালার মত। কিন্তু, বাঙ্গালাসাহিত্য যেমন সর্ব্বাবয়বে গীতিময়,—সর্ব্বতোভাবে গীতিলগ্ন—গীতিমগ্ন, অন্য কোন দেশের কোন শ্রেণির সাহিত্যই সে বিষয়ে তেমন নহে। বাঙ্গালির শত-স্তর বিভক্ত সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, বাঙ্গালাসাহিত্যের এই বিশে-

যন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রতীয়মান হইতে পারে।

সমাজ আর সাহিত্য, শরীর ও প্রাণের মত পরস্পর-বদ্ধ। সমাজ, সাহিত্যের প্রস্রবণ; সাহিত্য সমাজের প্রতিবিম্ব। আমরা বাঙ্গালাসাহিত্যকে সংগীত-বস্তুতে ওতপ্রোত জড়িত বলিয়াছি; বঙ্গের সমাজও যে সংগীতের শতবিধ-সম্পদে সমস্ত অঙ্গে সমুক্ষিত তাহা পাঠক অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন কি? প্রকৃতপ্রস্তাবে, সংগীতই বঙ্গীয় সমাজের প্রাণ। বাঙ্গালির জননে গীত, মননে গীত,—মরণে, তরণে মঙ্গলাচরণে, এবং জীবনের প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানেই, কোন না কোন প্রকারের গীত।

বঙ্গদেশের অতি দীন-হীন কাঙ্গালের কুটীরও, জন্মমৃত্যুর হর্ষবিষাদে, এবং বিবাহের আরম্ভ হইতে অবসান পর্য্যন্ত, বিবিধ আচরণে, কামিনী-কণ্ঠ-সংগীতে কল-কলায়িত হইয়া, প্রাসাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; এবং হিন্দু কৃষকের নবান্ন-অর্চ্চনা ও মুসলমান কৃষকের পাঁচপীরের বাঁশ-পূজাও নানাপ্রকার গীতের আমোদেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কৃষিজীবী রাখাল যখন, স্বর্ণস্তূপ-প্রতিম শস্যসম্পন্ন ক্ষেত্রকে শূকরের অত্যাচার হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ডাবা হুকায় তামাকু টানিয়া, আধোজাগরিত, আধোঘুমন্ত নয়নে, মাঁচার উপর, প্রেমের ধ্যানে, শয়ান রহে; তখন সে গীত গায়,—"আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ।"—আর দাঁড়ী মাঝি নেয়েরা যখন, নদীর জলে জোয়ার বাহিয়া যায়, কিংবা পাবি ধরে, তখন তাহারাও সকলে, সমস্বরে, তানের ঝুমরে; 'সারি' গায়,——

"বদর বদর বলি তোলরে হুজুক,
বিবির সে চাঁদমুখে ভরা মোর বুক;—
আরে ভরা মোর মুখ।"

দাঁড়ী মাঝিদিগের মধ্যে, আর এক প্রকার গীত প্রচলিত আছে, তাহার নাম ভাটিয়াল। ভাটিয়ালে যেমন রাগিণী, তেমনই আবার পদের গাঁথনী। শুনিবার সময়ে মনে লয় যে, বুঝি কোন দুঃখিনী রমণী, আপনার প্রাণের ধন হারাইয়া,—অতি গহন বিজনবনে একাকিনী মৃদু মৃদু কাঁদিতেছে; এবং মৃদুবাহি বন-সমীর, সে ক্রন্দন-ধ্বনির সহিত আপনার হাহাকার-ধ্বনি মিশাইয়া, ভাটায় বহিয়া যাইতেছে, কিংবা মনুষ্যের পাপ-তাপ-সন্তাপিতা জগৎ-প্রাণভূতা প্রকৃতির প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মত শ্রূয়মাণ হইতেছে। উৎকৃষ্ট ভাটিয়াল শুনিয়া, মুহূর্ত্তকাল আবিষ্টবৎ, আত্মবিস্মৃতবৎ, অথবা কেমন এক অলৌকিক আনন্দ বিষাদে আপ্লুতবৎ না হইয়াছে, এমন নিঠুর মূঢ়ের সংখ্যা বঙ্গভূমিতে খুব বেশী নহে। কিন্তু, নিম্নশ্রেণির দাঁড়ী মাঝিরা ভাটিয়াল অপেক্ষা সারিগানেই সমধিক আসক্ত, এবং পূর্ব্ববঙ্গেই উহা বিশেষ প্রচলিত। সারি গানের বহুলপ্রচার সম্বন্ধে একটি শিশুপাঠ্য কবিতার কএকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব। যথা,—

"ছুটেছে নদীর জল
ছল ছল্ কল কল্
সারি গেয়ে, দাঁড়ী নেয়ে, বেয়ে যায় তরী;—

বদর বদর ব'লে,
দাঁড় ফেলে সবে মিলে,
মাঝিও যোগায় সুর হাতে হাল ধরি।"

মুটিয়ারা, দাঁড়ী মাঝি হইতে অধঃস্থ শ্রেণির লোক। তাহারা মাথার উপরিস্থ মোট লইয়াই ব্যস্ত থাকে; রস রসিকতার বেসী অবকাশ পায় না। কিন্তু, তাহারাও যেন, বড় বড় মোট, শক্ত দড়ির সাহায্যে, সদল-বলে টানিবার সময়ে, শ্বাসপ্রশ্বাসে সুবিধা ও প্রাণে একটু আশ্বাস পায়, এজন্য দেশে মোটবাহি গীত আছে; এবং রেজারা দালানের ভিত্তি কিংবা ছাদ পিটাইবার সময়, যে সকল গীত অহরহঃ তালে তালে গাইয়া থাকে, তাহারও অমুদ্রিত গ্রন্থ ও অজ্ঞাত-নামা গুরু অথবা ওস্তাদ আছে। বঙ্গদেশে যত প্রকারের গীত, সামাজিক শক্তির স্বভাব-স্ফুরণে আবির্ভূত হইয়া, সমাজকে যেন এক-বারে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করিলে, এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। আমরা এইহেতু, শুধু প্রকার প্রদর্শনের জন্য, কএক শ্রেণির প্রসিদ্ধ গীতের নামমাত্র এ স্থলে উল্লেখ করিব।

প্রথম, কীর্ত্তনাঙ্গ গীত। ইহার প্রতি-ষ্ঠাতা প্রেমভক্তির পুতুল শ্রীগৌরাঙ্গ; প্রব-র্ত্তক গোস্বামি সম্প্রদায়,—প্রচারক সমস্ত বঙ্গব্যাপি সুবিশাল বৈষ্ণব সমাজ। 'কীর্ত্ত-নাঙ্গ' একটিমাত্র শব্দ; কিন্তু, এক কীর্ত্ত-নাঙ্গের মধ্যে, গীতের কত প্রকার প্রত্যঙ্গ আছে, তাহার অবধি নাই। কীর্ত্তনাঙ্গ গীতে যাহা মনোহরসহি বলিয়া সাধারণতঃ বর্ণিত হয়, তাহার অসংখ্য গীত মানব-জাতির সংগীত-সাহিত্যে স্বর্গের পারিজাত-সৌরভ, অথবা বিরহবিধুরা সুর সুন্দরীর মৃদু-বিলাপের মত। বোধ হয়, মধুরাক্ষর বাঙ্গা-লাভাষা এবং ভক্তিবিহ্বল বাঙ্গালির মধুময় প্রাণ ভিন্ন, পৃথিবীর আর কোথাও ইহা ফুটিতে পারে না।

কীর্ত্তনের পর যাত্রা। বাঙ্গালি, যাত্রা-গীতে সূক্ষ্মসৌন্দর্য্যের যত প্রকার মূর্ত্তি ফলা-ইয়াছে, তাহা পুরাতন গ্রীকসাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন কোন জাতির কোন শ্রেণিস্থ সাহিত্যে ফলিয়াছে, এমন জানি না। বঙ্গীয় যাত্রার কোন কোন গীত, কালিদাস শেক্ষপীরের মত কবিকেও ক্ষণ-কালের তরে মোহিত করিতে পারে। আমরা উপস্থিত স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া, প্রসিদ্ধনামা যাত্রাগায়ক গোবিন্দ অধিকারীর দুইটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিব। এ পদদ্বয় গোবিন্দের নিজ মুখে শুনিয়াছি পদ এইরূপে,—

চিত্র লিখিলেম—নয়ন কজ্জলে,
আমি দেই নাই চরণ,—চলিবে ব'লে।
যদি কেউ বলে, চিত্র কি চলে?—সময়ে চলে;
নলের দগ্ধা মীন, যেমন জলে চলে।

উল্লিখিত পদগুলি যখন উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত-নয়না আকুলপ্রাণা বিরহিণীর কণ্ঠে, বিষাদ-মাখা স্বর-সংযোগে উদ্গীত হইত, তখন সভাস্থ সকলেরই শরীর রোমাঞ্চিত হইত;—অনেকে এ বিরহের ভাবেই ভক্তিসিক্ত পরমা প্রীতির পবিত্র আনন্দ অনুভব

করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতবৎ হইত। কিন্তু, গোবিন্দবিরচিত বহু সহস্র গীতের মধ্যে, এমন গীত আরও অনেক আছে; এবং পশ্চিম বঙ্গের বদন অধিকারী অবধি পূর্ব্ববঙ্গের বিশ্রুতকীর্ত্তি কৃষ্ণকমল গোস্বামী পর্য্যন্ত, যাত্রাকবিদিগের অসংখ্য সংগীত, ইহা হইতেও অধিকতর মনোহর পদাবলীতে গ্রথিত হইয়া, শ্রোতৃবর্গের বিস্ময় ও আনন্দ জন্মাইয়াছে। রামমঙ্গল, মনসামঙ্গল, মনসার ভাসান, পদ্মপুরাণ-গান ও গাজীর গীত প্রভৃতি, যাত্রারই অপকর্ষ অথবা অধস্তন সংস্করণ। সুতরাং এ সকলের পৃথক্ উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে, রামমঙ্গল অর্থাৎ রাম-চরিত-গীতি সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন গায়কের মুখে উহা অমৃতের মত মধুর হয়। মানুষ কান পাতিয়া শুনে, এবং দরদরিত ধারায় অশ্রু বর্ষণ করে।

বঙ্গে, যাত্রার পরই ঢপ। ঢপগায়ক মধুসূদন হোমরের ইলিয়দ ও মিল্টনের স্বর্গভ্রংশ পড়েন নাই; এবং বাল্মীকীয় রামায়ণ ও ভারবি-ভবভূতি প্রভৃতি ভাগ্যবান্ কবিদিগের কাব্যসুধা-স্বাদ-গ্রহণেও অধিকার পান নাই। সুতরাং, তাঁহা দ্বারা মেঘনাদবধ বিরচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু, তিনি তাঁহার সহজনী প্রতিভার স্বাভাবিক প্রভাবে, সর্ব্বদা যাহা রচনা করিয়া গাইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে মহাকবি মধুসূদনের সহোদরসদৃশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অণুমাত্রও ভয় হয় না। মধুকিন্নরের অসাধারণ শক্তির উচ্ছ্বাসে ও অনুকরণে, এ দেশ এক সময়ে ঢপসংগীতে প্লাবিত হইয়াছিল এবং ঢপের কবিত্বমাধুর্য্য তদানীন্তন বাঙ্গালায় প্রকৃতই মধু ঢালিয়া ছিল।

বাঙ্গালা ভাষা, যাত্রা ও ঢপে যেমন ভাষাজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী, পাঁচালীর পল্লবিত শোভাসম্পদেও সেইরূপ জগন্মোহিনী। পাঁচালী-রচয়িতাদিগের মধ্যে, এক দাশরথি রায়ই একে একশত,—সাহিত্যের একটা দিক্,—সংগীত-সাহিত্যরূপ বিস্তৃত উপবনের একটি সুখ-সুগন্ধি স্বতন্ত্র কুঞ্জ। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, দাশুরায়ের যাটটি পালায় সম্পূর্ণ সমস্ত গীত সংকলন করিয়া, এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সে গ্রন্থ নিত্যকথ্য বাঙ্গালা শিক্ষা এবং সে সময়ের ভাষাসমালোচনার একটি সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। গ্রন্থে দাশুরায়ের চরিতাখ্যান উপলক্ষে একটি উপক্রমণিকা আছে। তাহাও সুপণ্ডিতের লিখিত, এবং সুশিক্ষিতের পাঠ্য। ক্ষণজন্মা দাশরথি যদি ইংলণ্ড কিংবা ফ্রান্সের মত স্বজাতিগুণ-বৎসল সমৃদ্ধদেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে যোগেন বাবুর মত আরও বহু গ্রন্থপ্রকাশক, ভিন্ন ভিন্ন আকারে, তাঁহার গীতাবলী প্রকাশ করিতেন; এবং বোধ হয় হাজ্‌লিট প্রভৃতির মত ব্যক্তিরাও সে সকল গীতের সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া, হৃদয়ে প্রফুল্ল হইতেন। যেমন মধুকিন্নরের অনুকরণে বহু লোক বঙ্গে ঢপ গীত গাইয়াছে; দাশরথির অনুকরণেও সেইরূপ, এ দেশের সকল প্রদেশেই, শত শত গুণবান্

গায়কেরা পাঁচালী গাইয়া, বাঙ্গালার সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে।

বঙ্গীয় কবিগানের বিশেষ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেন না, বঙ্গদেশ আর বাঙ্গালির বড় সাধের বাঙ্গালাভাষা ভিন্ন, পৃথিবীর আর কোন দেশে, ও কোন জাতির কোন ভাষায়, কবিগানের সৃষ্টি হয় নাই; এবং উহার রচনা, বিষয়-যোজনা ও রাগ-সঞ্চারণার প্রতি দৃষ্টি করিলে, এক বাক্যে বলিতে হইবে যে, আর কোন দেশেই উহার উৎপত্তি, আভোগ ও ক্রীড়াবিলাস কোন প্রকারে সম্ভবে না। বঙ্গীয় কবিওয়ালাদিগের মধ্যে যাঁহারা বড় কবি ছিলেন, সেই বঙ্গবিখ্যাত হরঠাকুর, মাধব ময়রা ও রামবসু প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দী লোক আবার বঙ্গে জন্মিবে কি? তাঁহারা, সুললিত শব্দের মৃণালসূত্রে নানারূপ নূতন ভাবের কুসুম গাঁথিয়া, বাঙ্গালাভাষার গলায় যে সকল অপরূপ মালা পরাইয়া গিয়াছেন, এ দেশে তেমন মোহন-মালা আর কখনও মানুষের মনস্তর্পণে সমর্থ হইবে কি?

পাঠক জ্ঞাত আছেন কবিগান, মালসী, ডাকমালসী, লহরকবি, টপ্পা, সখীসংবাদ, বিরহ ও ছড়াপাঁচালী প্রভৃতি বহু অঙ্গে বিভক্ত হইয়া, দেশে অজস্র আমোদ বিতরণ করিয়াছে; এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে, এ দেশে, —কখনও উহার অনুকরণে, কখনও উহার প্রমোদ-পদাবলীর অনুসরণে, হাফ-আখড়াই, জারী, তরজা, প্রভৃতি নানাপ্রকার নামে, গীতের তরঙ্গ বহিয়াছে। আমরা এখানে সে সকল গীতের পরিচয়প্রসঙ্গে প্রবন্ধ বিস্তৃত করিব না। কিন্তু, এইরূপ প্রণালীবদ্ধ গীত ছাড়া, এ দেশে, অসঙ্গ বন-বিহঙ্গের মত, আর এক প্রকার সুখ-শ্রুত ও সৌখীন গীত প্রচলিত আছে; উহা উদ্ভট কিংবা বৈঠকি গীত নামে উল্লিখিত হইতে পারে। এস্থলে তাহারই দুটি কথা কহিব।

উদ্ভট-গীত সমবেত-গানের বস্তু নহে। উহা, প্রায়শঃ কখনও বহুকণ্ঠের সম্মিলিত স্বরে উচ্চারিত হয় না; এবং গীত-রচয়িতা সংগীতজীবী হইলেও কখনও আসরে নামিয়া উহা গায় না। কিন্তু বঙ্গের অমুদ্রিত-সাহিত্যে, অর্থাৎ সাহিত্যের যে ভাগ, গ্রন্থবদ্ধ না হইয়া, বর্ণসৃষ্টির প্রাক্কালীন শ্লোকমালা অথবা সদুক্তবাক্যাবলীর ন্যায়, লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত রহিয়াছে,—যাহা রীতিমত শিক্ষার বিষয়ীভূত না হইয়াও, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয়শ্রেণির লোকেরই হৃদয়গঠনে, কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে উদ্ভট-গীতের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে।

উদ্ভট-গীত, সাধারণতঃ শ্যামাসংগীত, শ্যাম-সংগীত, শ্যাম-সোহাগিনী শ্রীরাধিকার বিলাস ও বিলাপ-সংগীত, এবং সামাজিক নায়ক-নায়িকার বিরহ, লালসা ও মান-সংগীতে বিভক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শ্রেণির গীতের মধ্যে, শ্যামাবিষয়ক মাতৃভাবের গীতরচনা দ্বারা দেশে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন; কিন্তু, মহাভক্ত রামপ্রসাদ, যেন মাতৃমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া,

সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যস্থলে আসনলাভ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ যে প্রকার প্রসিদ্ধ মাতৃগীতে, নিধুবাবুও সেই প্রকার প্রসিদ্ধ প্রেম ও বিরহের টপ্পাগীতে। উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। আমরা আজি যাঁহার গীতিপ্রসঙ্গে এত কথা কহিলাম, সেই সুখ-সৌভাগ্যশালী গীতিকবি, স্বর্গগত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়,—নামান্তরে কালী মির্জ্জা,—রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর মধ্যবর্ত্তী। ইঁহাতে রামপ্রসাদের কিছু আছে, নিধুবাবুরও কিছু আছে; এবং দুইয়ের সেই 'কিছু কিছু,'—সেই ভাব ও ভাষার ভালটুকু অথবা গুণের ভাগ, অনুকরণের দোষে অনাঘ্রাত রহিয়াও, এমনই সুন্দর মিশিয়াছে যে, তাহাতে ভক্তি ও প্রীতি উভয়েরই অনাবিল অথচ হৃদয়হারি শোভা ফলিয়াছে। অপিচ, এ দেশের ওস্তাদেরা, এত কাল, যে ক্ষমতাকে গীত-রচনায় উচ্চ শ্রেণীর 'গুণপনা' বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে অপ্রচলিত রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তাহারও পরিচয় আছে।

কালী মির্জ্জার গীতাবলী, কোন দুর্মূল্য দুর্লভ গ্রন্থে সংগৃহীত, এবং বংশপরম্পরাক্রমে কতিপয় লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত থাকিলেও, সমাজে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল না। পুরাতন 'শিল্পসাহিত্য' সম্পাদক, সহৃদয় সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতিলহরী প্রকাশের দ্বারা, কালী মির্জ্জাকে যেমন সাহিত্যিকজীবন দান করিয়াছেন; স্বজাতীয় সাহিত্যেরও সেইরূপ একদিকের একটুকু স্পৃহণীয় সম্পদ বাড়াইয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালাসাহিত্যকে সাহিত্যবিজ্ঞানের চক্ষে, স্তরে স্তরে পাঠ, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে ভালবাসেন, এই গীতিগ্রন্থ পাঠে তাঁহারা প্রীত হইবেন; এবং বিদ্যাসাগরের প্রাক্কালবর্ত্তি বাঙ্গালা, গদ্যে বিকসিত না হইয়াও, গীতের পদ-বন্ধনে কিরূপ পরিমার্জ্জিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

কালী মির্জ্জা অর্থাৎ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গা ও কেদারবাহিনীর কল-মধুর-তরঙ্গ-ধৌত সুপরিচিত গুপ্তিপাড়া গ্রামে, পলাসিযুদ্ধের কএক বৎসর পূর্ব্বে, জন্মলাভ করেন; এবং দেশীয় টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ-সাহিত্য, কাশীধামে বেদান্ত, ও দিল্লী-লখ্নৌ প্রভৃতি স্থানে তৎকাল-প্রচলিত পারস্য ভাষার সহিত সংগীতবিদ্যার বিশিষ্ট অনুশীলন করিয়া, ত্রিশ কিংবা বত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে, স্বদেশে প্রত্যাগত ও সংসারে প্রবিষ্ট হন। কালিদাসের মির্জ্জা উপাধি সম্ভবতঃ মুসলমানের দান, অথবা তাঁহার মুসলমানি চাল-চলনের অনুরূপ আখ্যান। যাহাই হউক, তিনি শুদ্ধশিষ্ট ব্রাহ্মণ হইয়াও ঐ উপাধিতেই প্রসিদ্ধ।

বঙ্গদেশের ধন-সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা, সে কালে, গুণ-সমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের পালন ও পরিপোষণে বড়ই আনন্দ ও আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেন। সুতরাং মির্জ্জা মহাশয়কে দীর্ঘকাল ঘরে বসিয়া রহিতে হইল না। যেই তাঁহার গুণ-গৌরবের যশোধ্বনি চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িল, অমনি বর্দ্ধমানের-যুবরাজ প্রতাপচন্দ্র, তাঁহাকে আদরের সহিত আমন্ত্রণ করিয়া, আপনার সভাসদ্‌রূপে গ্রহণ করিলেন; এবং ইহার কিছুকাল পরেই, কলিকাতাস্থ ঠাকুর-পরিবারের তদানীন্তন দীপস্তম্ভ, গুণগ্রাহিগণের অগ্রগণ্য গোপীমোহন ঠাকুর, তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া, সেখানেই চিরজীবনের তরে, প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলেন।

কলিকাতা, যেমন প্রতিভার মাতৃভূমি, তেমনই উহার ধাত্রীভূমি। বঙ্গের অনেক প্রতিভান্বিত মুখোজ্জ্বল পুরুষ কলিকাতায়ই জন্ম লাভ করিয়াছেন;—অনেকে স্থানান্তর হইতে কলিকাতায় আসিয়া, তত্রত্য আদর ও উপচারের অসামান্য উৎসাহে, দেখিতে না দেখিতেই, অলক্ষিত প্রতিভার উচ্চতর বিকাশে, বাড়িয়া উঠিয়াছেন। হা! এহেন কলিকাতার সহিত বঙ্গের অতি সামান্য কোন প্রদেশেরও যদি প্রাণ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সে দুঃখ, সমগ্র বঙ্গে, হৃদ্‌যন্ত্রের সহিত হস্তপদাদি দূরস্থিত দৈহিক প্রত্যঙ্গের বিচ্ছেদের ন্যায়, কিরূপ দুঃসহ বেদনা জন্মাইবে, তাহা যে আজিকালিকার সদাশয় রাজপুরুষেরাও সম্যক্ বুঝিতেছেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

কলিকাতার মত গুণজ্ঞ-জন-রক্ষিত কুসুমকাননে ঠাঁই না পাইলে, কালী মির্জ্জার গীতিবল্লরীতেও তেমন সুগন্ধ-সুরস শব্দ-কুসুম ফুটিবার সুযোগ ঘটিত কি না, তাহা সংশয়ের কথা। যাহা হউক, ইহা দেশের সৌভাগ্যের বিষয় যে, মির্জ্জামহাশয়, ঠাকুর-বাড়ীর বারিসেকে সংবর্দ্ধিত হইয়া, অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র কলিকাতায় সম্মান লাভ করিলেন; এবং দেশ-দেশান্তরাগত প্রবীণ-গায়কগণের সঙ্গলাভে সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থ হইলেন। কলিকাতায় তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা এই এক কথায়ই প্রতীত হইতে পারে যে, সেখানে যে সকল বড় লোক, তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য, শিক্ষার্থিরূপে সতত লালায়িত রহিতেন, মহাত্মা রামমোহন রায়ও তাঁহার একজন।

কলিকাতায় গীত-রচনা, গীতালাপ, আর সমৃদ্ধব্যক্তিদিগের আমন্ত্রিত গুণিগণের বৈঠকে সংগীতচর্চ্চার নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে যোগদান, ইহাই সুদীর্ঘ কাল কালীমির্জ্জার প্রাত্যহিক জীবনের প্রাত্যহিক কর্ম্ম হইল; এবং যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত মিশিতে পাইল, তাহারা সকলেই কিছু না কিছু শিখিল। মির্জ্জা মহাশয়ের কণ্ঠসুধা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে,—তাঁহার শ্রমার্জ্জিত কলাবত-বিদ্যাও তাঁহার তনুপাতের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার বিরচিত ভাব-মধুরা পদাবলী, পূর্ব্বে দেশীয়দিগের প্রযত্নে সংগীত-রাগ-কল্পদ্রুমে, এবং সম্প্রতি অমৃত বাবুর উৎসাহে ও উদ্যমে, গীতিলহরীতে নিবদ্ধ হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের শতবিধ বৈভবের মধ্যে একটি উপাদেয় বস্তুরূপে সাহিত্যিকের আলোচ্য ও উপভোগ্য হইয়াছে।

যে যাহা স্বর-সন্নিবেশে গাইয়াছে, তাহাই যে সাহিত্যের বস্তু হইয়াছে, এমন নহে। কিন্তু কালীমির্জ্জার অধিকাংশ গীতই অর্থের স্বাচ্ছসরলতা ও শব্দের লালিত্যগুণে বস্তুপদ-বাচ্য। এ সকল গীত কোন অংশেও আধুনিক কালের ভাবান্বিত নহে;—ইহার একটিও রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মত উধাও উড়িয়া ঊর্দ্ধগগনে উঠে না,—বঙ্কিমচন্দ্রের "মথুরাবাসিনী"র মত মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া মন ভুলায় না, এবং গিরিশচন্দ্রের গৌর-গীতাবলীর মত অশ্রুজলে অথবা অমৃতলাল বসুর ঈষদ্‌বক্র গীতিচূর্ণকের মত আমোদময় হাসির হিল্লোলে ভাসে না। কিন্তু, তথাপি ইহার কোন কোন গীতে সদ্ভাব-গম্ভীরা ও সুচারুমার্জ্জিতা পদাবলীর কিরূপ চমক আছে, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে একটি গীত উদ্ধৃত করিতেছি। বাঙ্গালা ভাষা, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও, শব্দসম্পদে কিরূপ সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন, তাহা জানিতে পাঠকের ইচ্ছা হয় না কি?

রাগ ভঁয়রো (ভৈরব)—তাল মধ্যমান।

কেও বিহরে হরহৃদি পরে
হরমন হরে মোহিনী,—
চরণে অরুণ রবিশশী যেন,
নখরে প্রখরে আপনি।
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ,
আপদে সম্পদ-দায়িনী॥
চমকে নূপুর, আলো করে পুর,
মণিময়-পুরবাসিনী,—
রজত-শিখরে, করে অসি ক'রে,
শিশির-শিখর-নন্দিনী,—
যেন চরম সময়,—মরমেতে হয়,
কালী কালভয়-বারিণী॥

মির্জ্জা ঠাকুর, সহজবোধ্য সুখ-শ্রুত শব্দে, সরল ভাবে, অতিতর সরল কথাও গীতে কি রূপ গাঁথিতে পারিতেন, তাহারও একটুকু পরিচয় দেওয়া উচিত। তাঁহার একটি গীতে আছে,—

"আমার ভার এ বড় কি ভার; তোমার,
লইতে বিশ্বের ভার, হয়েছ রূপ-বিস্তার
কালিকে কর নিস্তার, ডাকি বারে বারে;
যে লয় শরণ, তারে বিড়ম্বন, এ ত অবিচার!
দীন-দয়াময়ী নাম, না হইবে দীনে বাম
কলঙ্ক রবে তোমার॥"

মির্জ্জা মহাশয়ের প্রেম-সংগীত আরও বেশী সরল। সংগীতের পদ স্বর-সংযোগ বিনা সম্পূর্ণশক্তিতে অভিব্যক্ত হইতে পারে না। তথাপি, কাফি-আড়ার নিম্নধৃত গীতটি স্বর-সংযোগ বিনাও কিরূপ সুখ-পাঠ্য হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করিতে পারিবেন,—

"যার দুঃখ সেই জানে,—
যে জানে না, সে কি জানে?
আমি যারে চাই, তারে নাহি পাই,
চাই নে কাহারও পানে।
মিলে'ছে ত চিত, কহিতে উচিত,
বলিব তাহার স্থানে।
ব্যথায় ব্যথিত, সে জন ব্যতীত,
হ'বে কি আর কোন খানে॥

অমৃত বাবু কালী মির্জ্জার একটি গীতকে

শক্ষপীরের লেখনীযোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং গীতের[1] নিম্নে অলৌকিক শেক্ষপীরের চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া, পাঠককে তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য, অনুরোধ করিয়াছেন। এরূপ তুলনা আমাদিগের নিকট যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, যেরূপ অমূল্য অমল প্রস্তরের উপাদানে আগ্রার তাজমহল গঠিত হইয়াছে সেরূপ একখানি কি দুখানি প্রস্তর, সামান্য একটি মস্‌জিদেও অকস্মাৎ সংযোজিত হইতে পারে। কিন্তু, যে কারণে, ঈদৃক্ আকস্মিক-যোজনায়, তাজমহলের সহিত, মৃৎস্তূপ-সদৃশ সাধারণ মস্‌জিদের তুলনা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয়; সেই কারণেই, গীতিলহরীর কোন একটি গীতের ভাবের সহিত, শেক্ষপীরের কোন একটি কবিতার ভাব-সাম্য দর্শনে, উভয়ের সমান তুলনা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা তথাপি, ইহা স্বীকার করি যে, স্বজাতিগুণভক্ত স্বদেশানুরক্ত অমৃত বাবু, উল্লিখিত তুলনায়, ইচ্ছা না করিয়াও, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, শিক্ষাসম্পদ ও পরীক্ষণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা মির্জ্জার গীত ও শেক্ষপীরের পদ-নিচয় উভয়ই নিম্নে সাদরে উদ্ধৃত করিলাম।

কালী মির্জ্জা।

"ভালবাসা হইলে কি হয় প্রেমে সুখোদয়।
সদা সশঙ্কিত, স্থির নহে চিত, উভয়েরি ভয়॥
কে কোথা আছে সুখে, সদাই দুঃখিত দুখে—
তাপিত হৃদয়।
যার হয়েছে গিয়েছে, মনে কালী হ'য়ে আছে,
জানিহ নিশ্চয়॥"

শেক্ষপীর।

"Fie, fie fond love! thou art so
full of fear,
As one with treasure laden, hemm'd
with thieves;
Trifles unwitnessed with eyes or ear
Thy coward heart with false
bethinking grieves"

এইরূপ আকস্মিক ভাব-সাম্যের উপর নির্ভর করিয়া, বিখ্যাত কবিদিগকে তুলনা স্থলে আনিতে হইলে, মহাকবি কালিদাসও, এই সমালোচনায়, তুলাদণ্ডে আরোহণ করিতে বাধ্য হইবেন। কালী মির্জ্জার একটি গীতের পদ-বন্ধন এইরূপ,—

"বিবিধ বিধির গুণ জানিলাম এখন প্রাণ,
যা ছিল তাঁহার ঠাঁই, বুঝি আর কাছে নাই,
সকলই তোমায় অর্পণ।"

ঠিক্ এই ভাবেই কবি কালিদাস লিখিয়াছেন,—

"স্ত্রীরত্নসৃষ্টিবপরা প্রতিভাতি সা মে,
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।"

উপরিধৃত পংক্তিনিচয়ে পরস্পর-তুলনার সামগ্রী চক্ষে পড়ে না কি? কিন্তু, এইরূপ তুলনার ফল যাহাই হউক, সংগীতাচার্য্য কালিদাস মির্জ্জা যে, সে কালের একজন সুনিপুণ গীতি-কবি, এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, মির্জ্জা মহাশয় তাঁহার এক-

দিকে কতকটা রামপ্রসাদ, আর একদিকে কতকটা নিধু; এবং আপনাতে আপনি, রাগ-রাগিণীর আলাপে, রীতিমত ওস্তাদ। তাঁহার গীত-নিচয় স্বর-নিরপেক্ষ সাহিত্যের বিচারেও রক্ষিত হইবার যোগ্য; এবং বাবু অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তদীয় গীতি-লহরী, স্থানে স্থানে উপযুক্ত ফুটনোট অথবা টিপ্পনীর সহিত, সুচারুমুদ্রিত সুলভ-গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করিয়া, সংগীত-সাহিত্য-প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদ লাভের যোগ্য হইয়াছেন।

অমৃত বাবুর ভূমিকা ও চরিতাখ্যায়িকা অতি সুন্দর হইয়াছে। উহা একান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও, আমরা পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, তিনি সাহিত্যসেবায় অধিকারী। তিনি কালী মির্জ্জার জীবনবৃত্তান্ত যেমন হৃদয়িকতার সহিত পাঠককে সংক্ষেপে জানাইয়াছেন, মির্জ্জা ঠাকুরের প্রতিপালক, মহোজ্জ্বলমূর্ত্তি গোপীমোহন ঠাকুরের সংক্ষিপ্তজীবনবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ করিয়াও, পাঠকের সেইরূপ প্রীতি জন্মাইয়াছেন। কোথাও তরুর নামে ফলের পরিচয়; কোথাও বা, কারণবিশেষে, ফলের নামে তরুর পরিচয়। বঙ্গের সুদূর প্রান্তে ইদানীং, স্বর্গগত গোপীমোহনের ইহাই পরিচয়ের পক্ষে প্রচুর প্রতিষ্ঠা যে, তিনি স্বনামধন্য সার্ মহারাজবাহাদুর যতীন্দ্র-মোহনের পূজ্যকীর্ত্তি পিতামহ। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন রাজ-মহারাজ-সমাজে সুকৃতি সাহিত্যিক, সাহিত্যিকসমাজেও রাজ-গুণে গৌরবান্বিত। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গাছের নাম গোপীমোহন্ না হইলে, উহাতে যতীন্দ্র-হেন ফল ফলে না; এবং যে গাছে মহারাজ যতীন্দ্রের মত ফল ফলে, সে গাছের জন্য, গোপীমোহন ভিন্ন অন্য নাম শোভা পায় না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ইহাকেই Law of Heridity অর্থাৎ প্রকৃতির উত্তরাধিকার-বিধি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এ ব্যবস্থার সহিত সারস্বত সম্পদের সম্বন্ধ প্রদর্শনে, কলিকাতার ঠাকুরবংশ, প্রায় সকল শাখায়ই, সমান কৃতার্থ।

ছায়াদর্শন।

একবিংশ অধ্যায়।

উপক্রম।

পিতা, পুত্রশোকে আকুল ও আত্মহারা হইয়া অশ্রুপাত করিতেছে; অথবা স্নেহ-কারুণ্যময় মহাশয়-পিতার আকস্মিক বি-য়োগে চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, অসহায় পুত্র অবসন্ন হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। এইরূপ শোক-সন্তাপিত ব্যক্তিকে তুমি কি কথা কহিয়া সুস্থির করিবে?

যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নও আর নাই,—তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হই-

য়াছে,—সে এ জগতের চন্দ্র সূর্য্যও আর চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইবে না, জড়বাদের এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা, যোগশাস্ত্রের নামে উপদিষ্ট হইলেও, জীবের প্রাণে কোন-রূপ শান্তি দেয় না ;—প্রত্যুত, স্নেহ-সূত্রবদ্ধ তাপিত প্রাণে আরও ভয়ঙ্কর জ্বালা জন্মায়।

যদি প্রবাদ-প্রচলিত পুনর্জ্জন্মতত্ত্বের নাম লইয়া, এইভাবে উপদেশ দেও যে, যে তো-মাকে এইরূপ শোক-সাগরে ভাসাইয়া তিরো-হিত হইয়াছে, তাহার সহিত তোমার কোন প্রকার স্থায়ী সম্বন্ধ নাই ;—সে তোমার শত্রু ছিল, সুতরাং শত্রুতার কার্য্য শেষ করিয়া, সে এখন আপনার কর্ম্মানুসারে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং এজগতেই অন্য কোন অজ্ঞাত স্থানে নূতন দেহে স্ফুটিত হইয়াছে ; তাহা হইলেও প্রকৃত স্নেহপিপাসু প্রাণ প্রীতি কিংবা শান্তি লাভ করিতে পারে না। কেন না, সে যদি তাহার পূর্ব্বতন জীবনের সকল কথাই ভুলিয়া গেল,—এক জীব আর এক জীবে পরিণত হইল, তাহা হইলে তাহার পুরাতন অস্তিত্বের আর অবশিষ্ট রহিল কি ?

তবে মনুষ্যের প্রাণ শান্তি পাইতে পারে কিসে ? আমরা এই প্রশ্ন লইয়াই, পুনঃ পুনঃ, নানা প্রকারে, মানবজীবনের পারলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে, আলোচনা করিতেছি ; এবং প্রশ্নের উত্তরে, হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস অনুসারে, পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে, শান্তির একমাত্র অবলম্ব সত্য।—"সত্যাৎ পরতরং নহি"—সত্যের উপর আর নাই। উহা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হইতেও অধিকতর উজ্জ্বল,—সদ্যোবিকশিত সুদৃশ্য কুসুম হইতেও অধিকতর সুন্দর, এবং সক-লের জন্যেই, সকল অবস্থায়, সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলময়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা, পরকালবর্ত্তি জীবনের নিগূঢ় রহস্য জ্ঞান-যোগে পরিগ্রহ করিয়া, শোকাতুর মনুষ্যকে সান্ত্বনাদানের জন্য শতবিধ পদ্ধতিতে যত্ন করিয়াছেন ; এবং যাঁহারা আধুনিক জগতে ঋষিপদ-বাচ্য, তাঁহারাও মনুষ্যকে এই সত্য বুঝাইবার জন্যই অশেষ বিশেষে যত্ন পাইতেছেন। তাঁহাদিগের সকলেরই সকল কথার সারার্থ এই:যে, যে যায়, সে প্রকৃত প্রস্তাবে চির-কালের তরে চলিয়া যায় না ; কিন্তু সূক্ষ্ম-তর দেহ লাভ করিয়া, চর্ম্ম চক্ষুর অলক্ষিত ঊর্দ্ধ জগতে, আপনার কর্ম্মফলের ব্যবস্থা মতে, সুখ-দুঃখমিশ্রিত জীবন যাপনের দ্বারা, ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করে ; এবং যখ-নই সুযোগ পায়, তখনই পৃথিবীতে আ-সিয়া, পার্থিব সুহৃৎস্বজনের কিছু না কিছু উপকার করে। আমরা তাহাকে চক্ষে দেখি না ; কিন্তু সে আমাদিগকে, অনেক সময়েই, চক্ষে দেখে। আমরা তাহার কথা শুনি না ; কিন্তু সে অনেক সময়েই কাছে আসিয়া আমাদিগের কথা শোনে। আমরা জড়দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ আছি বলিয়া, জড়জগতের নিয়মের শাসনে, তাহার সা-ন্নিধ্যে যাইতে পারি না ; কিন্তু সে যখন ইচ্ছা করে, তখনই অধ্যাত্মজগতের নিয়মা-নুশাসনে, আমাদিগের সান্নিধ্যে আসিতে

পারে। অপিচ, তাহার নূতন-গঠিত সূক্ষ্ম শরীরে উপযুক্ত শক্তির বিকাশ হইলে, সে নানা প্রকারে আমাদিগের উপকার করিতেও প্রয়াসপর রহে।

আমরা আজি পাঠককে যে অভিনব আত্মিক-কাহিনী উপহার দিতেছি, তাহা উল্লিখিত কথার একটি আশ্চর্য্য প্রমাণ। যিনি এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে আপনার সাক্ষ্যদান করিয়া এইক্ষণ স্বর্গবাসী হইয়াছেন, সেই সাধুহৃদয় সুপণ্ডিতকে সকলেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিত। যাঁহারা তদীয় মুমূর্ষু বাক্যের অভ্রান্ততার উপর দৃঢ়চিত্তে নির্ভর করিতে পারিবেন, তাঁহারা স্বর্গগত পিতাপুত্র ও প্রিয়জনদিগের নিমিত্ত বৃথাশোকে বিহ্বল না হইয়া, তাঁহাদিগের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য, পবিত্র হৃদয়ে প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য বোধ করিবেন।

আত্মিক কাহিনী।

ডক্টার স্কট্ (Dr. Scott) ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তিনি রাজধানী লণ্ডন নগরে চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন। তিনি চিকিৎসাতত্ত্বে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার বিশেষ সম্মান করিত; এবং তাঁহার সত্যপ্রিয়তা, সুমধুর-ভাষিতা ও চরিত্রগত উদারতার জন্যও সকলেই ভক্তির সহিত তাঁহার নাম লইত। ডক্টার স্কট্, লণ্ডনের ওল্ডব্রড ষ্ট্রীট্ (Old Broad Street) নামক পল্লীতে বাস করিতেন।

এক দিন তিনি অপরাহ্নে আপন গৃহে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। শীতকাল। অদূরে—চিম্‌নীর পার্শ্বে, অনলাধারে, "গার্হপত্য" অনল প্রজ্বলিত রহিয়াছে। তিনি নিবিষ্টচিত্তে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। প্রত্যহই তিনি দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ক্ষণকাল নির্জ্জনে অধ্যয়নসুখে ডুবিয়া থাকিতেন। আজিও সেইরূপে উপবিষ্ট আছেন। এই সময়ে দৈবাৎ চিম্‌নীর দিকে তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি দেখিতে পাইলেন,—চিম্‌নীর বিপরীত দিকে, কে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক, একখানি সবাহুক চ্যায়ারে (Elbow chair) আসীন হইয়া, অনিমিষ-নয়নে, তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

ভদ্রলোকটি বয়সে প্রাচীন। তাঁহার পরিচ্ছদ-পারিপাট্যও প্রাচীন ধরণে বিন্যস্ত। তাঁহার সমস্ত শরীর কালো মখ্‌মলের গাউনে আবৃত, মস্তকে সুদীর্ঘ (wig) পরচুলা লম্বমান। মুখচ্ছবি প্রশান্ত ও প্রসাদ-গম্ভীর,—একটু বেশী স্নেহশীতল ও মধুর। দৃষ্টি প্রফুল্ল ও প্রীতিপ্রদ। ভদ্রলোকটি যে ভাবে, ডক্টারের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, তাহা দেখিয়া ডক্টার মনে করিলেন, তিনি যেন তাঁহার কাছে, বিশেষ কিছু বলিবার জন্য একান্ত উৎসুক।

ডক্টার স্কট্ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন;—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ইঁহাকে কোন স্থানে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না। ভাবিলেন,—ইনি তবে কে?—এখানে কেন আসিলেন?—কোন রোগীর প্রয়োজনে নয় ত?—না, তাহা হইলে, এমন

বিনা সংবাদে আসিবেন কি রূপে? আর আসিয়াই বা ঐরূপ নীরব-গাম্ভীর্য্যে বসিয়া রহিবেন কেন?—ডক্টার একটু বিস্মিত ও বুঝি বা একটুকু বিচলিত হইলেন।

ভদ্রলোক তাঁহাকে তাদৃশ ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া অগ্রেই আগ্রহের সহিত কথা কহিলেন। বলিলেন,—"আপনি এমন বিচলিত কিংবা শঙ্কিত হইবেন না। আমি আপনাকে একটা গুরুতর বিষয়ে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। বিষয়টি আপনার নিজের নহে,—আপনার নিঃসম্পর্কিত, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের। ভদ্র পরিবার বস্তুতঃ বিপন্ন, এমন কি একবারে উৎসন্ন যাইবার পথে। যদিও ঐ পরিবারের সহিত আপনার কোনরূপ সম্বন্ধ অথবা পরিচয় নাই, তথাপি আপনার সাধুতা, হৃদয়িকতা, ও উদারতার দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি; এবং আপনাকেই এই ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত, নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া আপনার সমীপে আসিয়াছি।"

ডক্টার, তাঁহার এই কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কি যেন ভাবিয়া প্রকৃতই একটুকু ভয় পাইলেন; অথচ, সেই ভয়ের সঙ্গে কেমন একটু বিস্ময়, কেমন একটু বিষাদমিশ্র কৌতূহলের ভাব, সহসা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া, তাঁহাকে ক্ষণ কালের তরে কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত করিয়া তুলিল। তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ, ঐ কোঠা ছাড়িয়া, অন্যত্র চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন; আবার, কি মনে করিয়া যেন, তিনি বারেক দুবার বাটীর অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ স্থানে ডাকিয়া আনিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু কিরূপ একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় পারতন্ত্র্য হেতু, কার্য্যতঃ ইহার কোনটিই করিতে পারিলেন না। তিনি অবশেষে এই সকল ভীরুজনোচিত কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার হৃদয় ও মন একটু দৃঢ় করিয়া লইলেন; এবং স্থির হইয়া বসিয়া, তাঁহার স্বাভাবিক ধীরতার সহিত কহিলেন,—"মহাশয়, জগদীশ্বরের নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে প্রকৃত কথা খুলিয়া বলুন,—আপনি—কি?

ভদ্রলোক, প্রথমতঃ, এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করিলেন না; যেমন একতান দৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকাইয়া ছিলেন, তেমনই তাকাইয়া রহিলেন। ঈশ্বর-নিষ্ঠ ডক্টার এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে নিঃশঙ্ক ও নির্ভয়। যে পারতন্ত্র্য তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে কিংবা অন্য কাহাকেও আপনার কাছে ডাকিয়া লইতে দেয় নাই, সেই প্রীতিপ্রসূত পারতন্ত্র্যই এইক্ষণ তাঁহাকে নির্ভয় করিয়াছে। আগন্তুক অপরিচিতের প্রতি, এই অল্প সময়েই তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তিনি তাই নির্ভয়চিত্তে, বিনয় ও বহু অনুনয় করিয়া, বারংবার তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ডক্টার স্কট, বিনা পরিচয়ে, আগন্তুকের কোন কথাই শুনিতে

প্রস্তুত দেখিয়া, আগন্তুক ভদ্রলোক বলিলেন,——

"পরিচয় দিব বলিয়াই ত আসিয়াছি। আমার পরিচয় পাইলে, পাছে আপনি ভীত বা শঙ্কিত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় এতক্ষণ পরিচয় দানে ইতস্ততঃ করিতে ছিলাম। শুনুন তবে, সমস্ত কথা আপনার কাছে খুলিয়া বলিতেছি ;——

আমার নাম (Richard Wallis) রিচার্ড ওয়ালিস। আমি সমারসেট-সায়রে বাস করিতাম। আমি সমারসেটে প্রভূত ভূসম্পত্তি ও বৃহৎ অট্টালিকা রাখিয়া পরলোকগত হইয়াছি। আমার পৌত্র (Reginald Wallis) রেগিনাল্ড ওয়ালিস এক্ষণ সেই সম্পত্তি ভোগ করিতেছে। আমার একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। তাহার নাম (William) উইলিয়ম। ভ্রাতা উইলিয়মও, যন ও হারবার্ট্ নামে দুইটি পুত্র রাখিয়া, পরলোকবাসী হইয়াছেন। আমার সেই দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সম্প্রতি আমার ত্যক্ত সম্পত্তির উপর অবৈধ দাবি করিয়া, আমার পৌত্র রেগিনাল্ডের বিরুদ্ধে, আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।"

ডক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত দিন হইল, আপনার পৌত্র এই সম্পত্তির অধিকারী?" সম্ভ্রমব্যঞ্জক শান্তগম্ভীর ছায়া-মূর্ত্তি উত্তর করিলেন,—"আজ সাত বৎসর। সাত বৎসর হইল, আমি পার্থিব তনু পরিত্যাগ করিয়াছি।" ইহার পরে তিনি আরও বলিলেন,—"আদালতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়ের দাবিই প্রবল হইবে। মোকদ্দমার প্রতিকূল নিষ্পত্তি হইলে, আমার পৌত্র, সমগ্র ইষ্টেট—এমন কি বাসগৃহটি পর্য্যন্ত হারাইয়া, একবারে পথের ভিখারী হইয়া পড়িবে। বিপন্ন পরিবারের অন্নজলের সংস্থানও থকিবে না।"

ডক্টার এক্ষণ সর্ব্বতোভাবে সুস্থির, শঙ্কাশূন্য ও দৃঢ়। তিনি কহিলেন,—"আইন যদি আপনার পৌত্রের প্রতিকূল, তাহা হইলে, তাঁহার উপকারকল্পে আমি কি করিতে পারি বলুন?"

ছায়ামূর্ত্তি বলিলেন,—"প্রকৃত প্রস্তাবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়ের, ঐ সম্পত্তিতে কোন রূপ ধর্ম্মসঙ্গত স্বত্ব নাই। কিন্তু, সম্পত্তির উত্তরাধিকার-নির্ণয়ার্থ আমি যে উইল অথবা তদনুরূপ বৃহৎ এক দলিল সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি, আমার পৌত্র সে দলিল হস্তগত করিতে পারে নাই। সে দলিল তাহার হাতে না থাকা হেতুই, অসহায় রেগিনাল্ড আদালতে তাহার স্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে অসমর্থ।"

ডক্টার কহিলেন,—"অবস্থা ত বুঝিলাম ; কিন্তু ইহাতে আমি কোন্ সূত্রে কি করিতে পারি?"

ছায়ামূর্ত্তি বলিলেন,—"আমি সেই কথাই বলিতেছি। আপনি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার পৌত্রের বাটীতে যাইতে সম্মত হন, তাহা হইলে, আমি সেই দলিল যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, আপনাকে তাহা বলিয়া দিতে পারি। আ-

পনি, কৌশলক্রমে, রেগিনাল্ডকে সেই দলিলের সন্ধান বলিয়া দিয়া অনায়াসেই তাহার 'মহৎ' উপকার সাধন করিতে পারেন।

ডক্টার বলিলেন,—"ভাল একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি ঐ দলিলের সন্ধান আমাকে বলিবার নিমিত্ত এত দূর আয়াস স্বীকার করিতেছেন কেন ? আপনার পৌত্র রেগিনাল্ডকেই কেন সমস্ত বলিয়া দিন না ? —তাহা হইলে ত অতি সহজেই, সকল দিকের সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে।"

ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—"আপনি এ বিষয়ে আমাকে বৃথা কোন প্রশ্ন করিবেন না। সে পথে সম্প্রতি অনেক বিঘ্ন। আপনি নিজেই এক দিন তাহা বুঝিতে পাইবেন। কিন্তু, এখন আমি, শত চেষ্টা করিলেও, পারলৌকিক জগতের সে সকল অবোধ্য তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইতে পারিব না।—কেন আমি, আপনার মত পরের কাছে, প্রস্ফুট কায়িক মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিয়া, স্পষ্ট কথা কহিতে পারিতেছি, অথচ আমার পৌত্র রেগিনাল্ডের নিকট স্বল্পতর ছায়ামূর্ত্তিতেও প্রকট হইতে সমর্থ হইতেছি না, জড়দেহ-নির্ম্মিতির সে জটিল নিয়মাবলী বুঝাইলেও আপনি বুঝিবেন না। তবে, আপনার সাধুতার উপরে আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। আপনার সারল্যে আমার প্রগাঢ় প্রত্যয় আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে আমার পৌত্রকে এই সর্ব্বস্বান্তকর বিপত্তির গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারেন। ইহাতে আপনার যে অর্থক্ষতি হইবে, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, আপনি তাহা পাইবেন ; আপনার যে কায়িক ক্লেশ ও পরিশ্রম হইবে, তজ্জন্যও যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।"

ডক্টার হুট স্বভাবতঃ তেমন অর্থলিপ্সু লোক নহেন। প্রস্তাবিত পুরস্কারের প্রলোভন তাঁহার মনের উপর তত কার্য্য করিল না। কিন্তু, তাঁহার পক্ষে, পরলোকগত আত্মিকপুরুষের তথাবিধ প্রত্যক্ষ দর্শনদান ও তৎকর্তৃক ইহলোক-নিবাসী বিজ্ঞ বৈষয়িকের মত স্পষ্টাক্ষরে অনুরোধ, গুরুতর প্রবর্ত্তনা স্বরূপ হইল। তিনি ছায়ামূর্ত্তির অনুরোধ রক্ষার্থ যথাশক্তি যত্ন করিবেন বলিয়া প্রীতির সহিত প্রতিশ্রুত হইলেন।

ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—"আপনি তবে দয়া করিয়া সমারসেটে যাইয়া আমার পৌত্রের সহিত দেখা করুন। আমার সহিত আপনার পূর্ব্ব হইতেই সাক্ষাৎকার ও আলাপ পরিচয় আছে, রেগিনাল্ডকে ইহা বলিবেন ; এবং তাহার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়া লইয়া, তাহার বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখিতে চাহিবেন। উপর তালার একটা গুপ্ত কোঠায় কতকগুলি পুরাতন জিনিষপত্র ও ভাঙ্গা সিন্দুক ও বাক্স প্রভৃতি ছিল। সেইগুলি ঐ কোঠারই এক পার্শ্বে সরাইয়া ফেলিয়া, সেই স্থানে, আধুনিক রুচির নানাবিধ নূতন সামগ্রী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আপনি সেই ভগ্নদশাপন্ন স্তূপীকৃত অকর্ম্মণ্য জিনিষগুলির মধ্যে, এক কোণে, একটা বড় বাক্স বা (Chest) দেখিতে পাইবেন।

উহাতে একটা ভাঙ্গা তালা লাগান আছে। তালার ভিতরে দেখিবেন একটি চাবি আটকান আছে। সে চাবি তালার মধ্যেও ঘোরে না, টানিলেও বাহির হইয়া আইসে না। কিন্তু, সেই অবহেলিত ও অপ্রয়োজনীয় বাক্সটির মধ্যেই অতি প্রয়োজনীয় দলিলখানি লুক্কায়িত রহিয়াছে। দলিল আমার পৌত্রের হস্তগত না হইলে, তাহার সর্ব্বস্ব নাশের আশঙ্কা।”

ডক্টার কহিলেন,—“আপনার অনুরোধ রক্ষার্থ আমি যথাশক্তি যত্ন করিব।”

ডক্টার, এইরূপে সঙ্কল্পিত বিষয়ে প্রতিশ্রুত ও বাক্যবদ্ধ হইলে, সেই আসনের উপরে, সেইরূপ আসীন অবস্থায়ই, ছায়ামূর্ত্তি বিলুপ্ত ও অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ডক্টার, বিস্মিত-নয়নে, সেই শূন্য আসনের পানে, তাকাইয়া রহিলেন। ভাবিলেন,—“এ কি দেখিলাম!—এ কি শুনিলাম! প্রকৃত অবস্থা যখন এইরূপ, তখন মৃত্যুর আর ভয় কি? মৃত্যু ত তাহা হইলে সূক্ষ্মতর ও শ্রেষ্ঠতর দেহধারণ মাত্র!” তিনি, এই ভাবে, কিছুক্ষণ স্থাণুবৎ নিশ্চল ও নিস্তব্ধ রহিলেন; এই ঘটনার কথা ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকট বলিলেন না। কিন্তু, তথাপি এই কথাই তাঁহার মনে নিরন্তর চিন্তা ও কল্পনার একটা প্রধান বিষয় হইয়া রহিল।

ইহার পরে, কিছু দিন গত হইলে, ডক্টার স্কট, ছায়ামূর্ত্তি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যেই, সমরসেট সায়রে গমন করিলেন। রেগিনাল্ড ওয়ালিসের ।টী চিনিয়া লইতে তাঁহাকে বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। তাঁহার নামের কার্ড পাইয়াই, বাটীর কর্ত্তা রেগিনাল্ড, দ্বারদেশে আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। তিনি স্কটকে যেন কোথাও দেখিয়াছেন, অথচ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেও যেন একটু সঙ্কুচিত হইতেছেন, এইভাবে স্কটের পানে মুহূর্ত্তমাত্র সসম্ভ্রমে তাকাইয়া, তাঁহাকে বিশেষ আদর ও যত্ন সহকারে বাটীর ভিতরে লইয়া গেলেন। উভয়ের মধ্যে, অল্পক্ষণেই, পূর্ব্বপরিচিত সুহৃদের ন্যায় আলাপ চলিতে লাগিল।

ডক্টার বলিলেন যে, তিনি ওয়ালিস-পরিবার ও তাঁহার পিতামহের বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন। তিনি রেগিনাল্ডের পিতামহের নিকট ইহাও শুনিয়াছেন যে, রেগিনাল্ডই তাঁহার সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও মালিক।

রেগিনাল্ডের মুখ একটু বিষণ্ণ হইল। তিনি নিরাশের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—“হাঁ—সে কথা আর কি বলিতেছেন! আমার পিতা অল্পবয়সে লোকান্তরিত হন। পিতামহ, পিতার মৃত্যুর পরে, পরলোকগত হইয়াছেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার ইষ্টেট ও সম্পত্তি এমন গোলযোগে রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আর বলিবার নহে। একখানি দলিলের অভাবে সমস্তই যাওয়ার মধ্যে। দলিল প্রকৃতই সম্পাদিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা কোন স্থানেও তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনি যে উহা

কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। সে দলিল আমার হাতে না থাকা হেতু, আমার পিতার খুড়তাত ভ্রাতারা আমাকে ঘোরতর বিপদে ফেলিয়াছেন। আমি এক্ষণ প্রচুর অর্থব্যয়েও, ইষ্টাট রক্ষা করিতে পারি কি না, সন্দেহ।

ডক্টার বলিলেন,—"তবে কি এখনও আপনার পিতৃব্যদিগের সহিত সে গোলমাল চুকিয়া যায় নাই?"

রেগিনাল্ড কহিলেন,—"মোকদ্দমা চলিতেছে। কত দিনে, কি ভাবে, উহার নিষ্পত্তি হইবে, ঈশ্বর জানেন। আপনার কাছে গোপন করিবার কোন কথা নাই। প্রকৃত কথা এই, সেই দলিল খানি, না পাইলে, আমি কিছুতেই এ সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিব না। দলিল না পাইলে, এ বিপদ্ হইতে কোন প্রকারেই নিষ্কৃতি নাই; অথচ, ঐ দলিল পাইবার আশাও এখন পর্য্যন্ত একবারে দূর হয় নাই। আমি শীঘ্রই উহার জন্য সমস্ত বাটীর সমস্ত স্থান খুব ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখার সঙ্কল্প করিয়াছি।"

ডক্টার বলিলেন,—"আমি ভরসা করি, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে, নিশ্চয়ই সে দলিল পাইতে পারিবেন।"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"পাইব নিশ্চয়ই। আমার মনে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও স্থান পায় না। আমি গত রাত্রিতে এ সম্পর্কে বড়ই একটি বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে স্বপ্নের কথাও আমি ভুলিতে পারি না।

ডক্টার কহিলেন,—"ঐ দলিল প্রাপ্তি সম্বন্ধেই স্বপ্ন কি?—তবে, আপনি অবধারিত উহা পাইবেন।"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন,—একটি অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সঙ্গে মিলিয়া দলিল অন্বেষণে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু, বুঝিতে পারিতেছি না, ব্যাপার খানা কি।—বড়ই বিচিত্র, বড়ই বিস্ময়ের কথা এই যে, আপনিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি।"

ডক্টার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"ঈশ্বর করুন, আমিই যেন সেই ব্যক্তি হই। বস্তুতঃ, আমি সে স্বপ্নদৃষ্ট জন হইতে পারিলে বড়ই সুখী হইব। হয় ত, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এ বিষয়ে আমি কোন না কোনরূপে, আপনার কাজে লাগিলেও লাগিতে পারি। আমি সত্যই আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি; এবং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, দলিল বাহির করা ব্যাপারে আমি যেন প্রকৃতই আপনার সহায় হইতে সমর্থ হই। আপনি কখন উহা খুঁজিবেন?"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"কল্য খুঁজিব।"

ডক্টার কহিলেন,—"কল্য। আচ্ছা কি প্রণালীতে অনুসন্ধান করিতে চাহেন?"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"প্রণালী আর কি?—আমাদিগের দৃঢ় ধারণা এই যে, পিতামহ মহোদয়, দলিল সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত অবশ্যই বিশেষ উৎসুক ছিলেন। সুতরাং, উহা নিরাপদে রাখিবার অভিপ্রায়ে নিশ্চিতই সাধারণের অনধিগম্য কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

আমার সঙ্কল্প এই যে, ঐ দলিলের জন্য যদি বাটীর একার্দ্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, তাহা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। মাটীর উপরে,—মনুষ্যের দৃষ্টিগোচরে, এই বাড়ীর কোনস্থানে যদি উহা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা বাহির করিতে পারিব।"

ডক্টার বলিলেন,—"কিন্তু, কথা এই, তিনি হয় ত দলিল খানিকে এমন এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, সমস্ত বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও আপনি উহার কিছুমাত্র সন্ধান পাইবেন না। আমি জানি, অনেক সময়, এই রকমের জিনিষ, অনেক স্থলে, অতিরিক্ত সাবধানতার পরিণামে, সুপরিরক্ষিত না হইয়া, চিরকালের তরে অদৃশ্য রহে।"

রেগিনাল্ড কহিলেন,—"আগুনে পোড়া না যায়, এমন কোন বস্তু দ্বারা উহা রক্ষিত থাকিলে, সমস্ত বাড়ীঘর ও জিনিষপত্র আগুনে পোড়াইয়াও আমি উহা বাহির করিব।"

ডক্টার কহিলেন,—"বোধ হয়, তবে, বুড় ভদ্রলোকের বাক্স, ট্রাঙ্ক ও সিন্দুক প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া, পুনঃ পুনঃই খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে?"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"ও—তা অনেক বার হইয়া গিয়াছে। আমি সে সমস্ত খুলিয়া, উলটিয়া পালটিয়া, ঝারিয়া পুছিয়া, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কোথাও দলিলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সে গুলি সমস্ত এখন খালি পড়িয়া আছে। উপর তালার একটা গুপ্ত কোঠায় সেই ভগ্ন ও জীর্ণ বাক্স ও ডেক্সগুলি স্তূপাকারে রাখা হইয়াছে। উহার তিন চারিটা ভাঙ্গিয়া, ভিতরে কোন লুকান ড্রয়ার কিংবা দেরাজ আছে কি না, দেখিয়াছিলাম। ইহার পরে, বড়ই বিরক্ত হইয়া, সেগুলি আগুন দিয়া পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছি। যদিও এক সময়ে, ঐ সকল বস্তু মূল্যবান্ আস্‌বাব্‌রূপে আদৃত ছিল, এক্ষণ আর ঐ সকলের কোনই মূল্য বা আদর নাই।"

ডক্টার ইহা শুনিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং কহিলেন,—"কি—আপনি সে গুলি একবারে পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন!—আ—এটি বড়ই অবিবেচনার কাজ হইয়াছে।"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"আপনি যাহা ভাবিতেছেন, তাহা নহে। আমি সেগুলি, টুকুরা টুকুরা করিয়া না ভাঙ্গিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া, এক ছিল্কাও পোড়াইতে দেই নাই। উহার ভিতরে কিছু লুকান থাকা একবারেই অসম্ভব।"

রেগিনাল্ড কতিপয় পুরাতন বাক্স ও ডেক্স একবারে ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন, ইহা শ্রবণে, স্কটের মনে, দলিল সম্বন্ধে প্রথমতঃ গুরুতর ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু, অগ্রে টুকুরা টুকুরা করিয়া ভাঙ্গিয়া,—ভিতরে কি আছে না আছে, ভাল করিয়া দেখিয়া, তৎপর অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া তিনি আবার আশ্বস্ত হইলেন। ডক্টার বলিলেন,—"বেস কথা,—আমি যদিও দলিল অনুসন্ধানের

ব্যাপারে আপনার বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগিব বলিয়া ভরসা করি না, তথাপি আমি কল্য পুনরায় আপনার সহিত দেখা করিব; এবং যত ক্ষণ অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ না হয়, তত ক্ষণ সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া, অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে, কায়মনঃপ্রাণে, প্রার্থনা করিব।" ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে, জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্ববিধ বিষয়েই ঈশ্বর-সান্নিধ্যে প্রার্থনা করিতে ভাল বাসেন। ডক্টার স্কট সেই শ্রেণীর লোক।

ডক্টারের তদ্গত বিশ্বাস ও ভক্তি, রেগিনাল্ডের হৃদয়েও স্পৃষ্ট হইল। রেগিনাল্ড মুহূর্ত্তের তরেও আর এমন উদার-হৃদয় সাধু-পুরুষকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। তিনি বলিলেন,—"না, মহাশয়, তা হইতেছে না। আপনি যখন দয়া করিয়া আমার সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আমি কিছুতেই আপনাকে বিদায় দিতে ইচ্ছা করি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আজিকার রাত্রিটা এই গৃহেই বাস করিবেন; এবং কল্য অনুসন্ধানের প্রথম আরম্ভ হইতেই উপস্থিত থাকিবেন।"

ডক্টার স্কটের সহিত ওয়ালিস-পরিবারের এইরূপে একটু বেশী মিশামিশি হইবার সুযোগ ঘটিল। যদিও এইরূপ সৌহার্দ্দের মিশামিশি ডক্টারেরও আন্তরিক ইচ্ছা, তথাপি, পাছে আগন্তুকের অবস্থান হেতু, বাড়ীর লোকের কোনরূপ অসুবিধা হয়, এই শঙ্কায় তিনি মৌখিক একটু আপত্তি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। অবশেষে, রেগিনাল্ডের অনুরোধে, ঐ রাত্রি ওয়ালিস-প্রাসাদে অবস্থানই তাঁহার অবধারিত হইল। রেগিনাল্ড, স্কটকে লইয়া বাগানে একটু বেড়াইয়া আসিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু, স্কট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি সস্মিত মুখে উত্তর করিলেন;—"আসুন, বাগানে না যাইয়া, আমরা এই বাড়ীটা একটু ভাল করিয়া দেখি।

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"বেস কথা, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত। চলুন তবে, তাহাই করা যাউক।" এই বলিয়া তিনি ডক্টারকে লইয়া উপর তলায় গমন করিলেন; এবং ভাল ভাল সুসজ্জিত কোঠাগুলি ও কোঠার আস্‌বাব ও ছবি প্রভৃতি সমস্ত দেখাইলেন। একে একে সকল দিক্ দেখাইয়া, তিনি ডক্টার স্কট কে সিঁড়ীর কাছে লইয়া আসিয়া নীচে নামিবার উদ্যোগ করিলেন।

এই সময় ডক্টার কহিলেন,—"এই যে উপরের দিকে আর একটি কোঠা রহিল। কেন, এ দিকে কি যাওয়া হইবে না?"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"ওদিকে দেখিবার যোগ্য বিশেষ কিছু নাই। ওদিকে আবর্জ্জনা ও ভাঙ্গা চুরা জিনিষে ভরা কএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঠা ও গুপ্ত কুঠুরী মাত্র, এবং গুম্বজ ও ঘড়িখানায় যাইবার পথ।"

ডক্টার কহিলেন;—"যখন এখানে আসিয়াছি, সমস্তই দেখা যাউক না কেন। বিশেষতঃ, পুরাতন প্রাসাদের চূড়া ও গুম্বজ প্রভৃতি একান্তই দর্শনীয়। যদিও এখনকার

যুগে এ সকলের তেমন সম্মান নাই, তথাপি পূর্ব্বপুরুষদিগের এই সকল কীর্ত্তি দেখিতে আমি বস্তুতঃই বড় ভালবাসি। তাই নিবেদন করি, চলুন না ওটাও দেখিয়া আসি।"

তাঁহারা ওদিকের সমস্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া, একটা অতি জীর্ণ মাল-কোঠার কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ঐ কোঠার দরোজাও খোলা ছিল। ডক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন;—এটা কি?

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"এই কোঠায়ই দাদার সমস্ত সখের জিনিষ, ভাঙ্গা চুরা বাক্স, ডেস্ক ও সিন্দুক প্রভৃতি যত গরদামাল ও আবর্জ্জনারাশি জড়িত করিয়া রাখা হইয়াছে। দেখুন না, উহার স্তূপ একবারে ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত যাইয়া ঠেকিয়াছে।

ডক্টার এইক্ষণ বিশেষ মনোযোগের সহিত চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে তাঁহার দুটি মিনিটও লাগিল না। ছায়ামূর্ত্তি লণ্ডনে ঐ কুঠরীটির যেখানে যাহা যে ভাবে আছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, ঠিক্ সেইখানে, সেই জিনিষ, তেমনই ভাবে রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া, ডক্টার মনে মনে আশ্বস্ত হইলেন। ছায়ামূর্ত্তি যে জিনিষগুলির স্তূপীকৃত অবস্থা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি অমনি সেই স্তূপটার সন্নিহিত হইলেন; এবং একটি বাক্সের প্রতি চক্ষু রাখিয়া, সেই মরিচাপড়া পুরাতন তালা ও তৎসংলগ্ন সেই চাবিটি দেখিয়া লইলেন। ইহার পরে রেগিনাল্ডের পানে চাহিয়া কহিলেন;—আপনি যদি এই সমস্ত দেরাজ, সিন্দুক ও বাক্স এবং উহার ভিতরে যাহা কিছু আছে, সমস্ত পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আপনার ভয়ানক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে!"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"তা ঠিক, বাস্তবিকই বিষম কষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমি স্বয়ং এ গুলি সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। একটি একটি করিয়া পুরাতন কাগজ পত্রের ফিকাপড়া অবোধ্য অক্ষরগুলি পাঠ করিয়াছি। আমার চক্ষুর সম্মুখে, আমার হাতের উপরে, এ সমস্তের যাচাই ও পুনঃ পুনঃ পরখ হইয়াগিয়াছে।"

ডক্টার ইহার পরে,—"যা হউক, এই ক্ষুদ্র বাক্সটি" এই বলিয়া ছায়ামূর্ত্তির কথিত সেই নির্দ্দিষ্ট বাক্সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ক্ষুদ্র বাক্সটি খুলিয়া এবং উহার ভিতরে যাহা কিছু আছে, তাহা বাহির করিয়া আমাকে দেখাইতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?

রেগিনাল্ড বাক্সটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এবং ঈষৎ একটু হাসিয়া কহিলেন,—"আপত্তি কিছুই নাই। কিন্তু, আমার মনে হইতেছে এটাও আমি খুলিয়া দেখিয়াছি।" এই বলিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী ভৃত্যের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, উইলিয়ম, এই বাক্সের কথা তোমার মনে পড়ে কি? উইলিয়ম্ কহিল,—"হাঁ মহাশয়,—আমার মনে আছে,—আপনি এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ঐ বাক্সের ভিতরে যাহা ছিল, সমস্ত বাহির করিবার পরে,

আপনি উহার উপরে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। "হাঁ—আরও মনে হইতেছে, আপনি উহার ডালা বন্ধ করিয়া, উহার উপরেই কিছুক্ষণ আসীন ছিলেন; এবং মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায়, পড়িয়া যাইবার মত শ্রান্তিবোধ করিয়া, আমাকে তাড়াতাড়ি এক ড্রাম ব্রাণ্ডি লইয়া আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন।"

ডক্টার বলিলেন,—"এটা আমার মনের একটা খেয়াল মাত্র, সম্ভবতঃ এ বাক্সে কিছুই নাই। তথাপি, আর এক বার দেখিলে হয় না কি?"

রেগিনাল্ড বলিলেন,—"যা হউক, আপনার সম্মুখেই এটাকে উল্টাইয়া দেখাইতেছি; দেখুন ইহার ভিতরে কি আছে। ইহার পরে ক্রমে অন্যান্য বাক্স ও ডেক্সগুলিও একে একে ঐরূপ করিয়া আপনাকে দেখাইব।"

রেগিনাল্ড ভৃত্যের দ্বারা সে বাক্সটি সম্মুখে আনাইলেন। উহা খোলা হইল। উহার ভিতরে যে সকল কাগজপত্র ছিল, সমস্ত বাহির করা হইলে, ডক্টার ঐ সকল কাগজের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন;—যেন বাক্সের দিকে তাঁহার কোনরূপ মনোযোগ বা দৃষ্টি নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া, ঈষৎ একটু নুইয়া, কাগজগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে একখানি বেতের লাঠি ছিল। তিনি, ঐ লাঠির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবার অছিলায়, বাক্সের তলদেশে উহা দ্বারা একটি আঘাত করিলেন। কিন্তু, এই আঘাত যেন ইচ্ছাকৃত নহে,—দৈবাৎ লাগিয়া গিয়াছে, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি লাঠি টা বাক্সের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইলেন। লাঠি টা বাহির করিয়াই, তিনি মুখচ্ছবি গম্ভীর করিয়া, কাগজের দিক্ হইতে ঘুরিয়া, বাক্সের দিকে ফিরিলেন। ফিরিয়া—বাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া, বাক্সের উপরে উপবেশন করিলেন; এবং পরিচারক উইলিয়মকে বিদায় করিয়া দিয়া, কহিতে লাগিলেন,—"মিষ্টার রেগিনাল্ড ওয়ালিস, আমি আপনার দলিলের সন্ধান পাইয়াছি। একশত গিনির বাজী, দলিল এই বাক্সেই আছে।" এই বলিয়া ডক্টার বড়ই প্রফুল্ল ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ওয়ালিস, পুনরায় বাক্সের ডালা উঠাইলেন,—বাক্স ধরিলেন,—উহার ভিতরে উকি দিয়া, উহার কোণ চারিটা ও তলদেশ ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সমস্ত পরিষ্কার,—উহার কোন স্থানে একগাছি তৃণও দৃষ্টিগোচর হইল না। ওয়ালিস, বিস্মিত ও বিমূঢ়। তিনি অতঃপর ডক্টারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি কি বলিতেছেন,—আপনার এ কথার অর্থ কি মহাশয়?—বাক্স ত একবারে খালি, উহার কোথাও ত কিছু নাই।"

ডক্টার কহিলেন,—"আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করুন। আমি কোন ঐন্দ্রজালিক যাদুকর নহি। কিন্তু, আমি আপনাকে পুনরপি বলিতেছি, আপনার পিতামহকৃত উইল,—সেই হারানো দলিল এই বাক্সেই আছে, ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আপনি আমার পানে বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া আছেন! আমার কথায় আপনার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না! যাক্, তাতে কিছু আইসে যায় না। ইহা আমার একটা আকস্মিক কল্পনা কিংবা আকাঙ্ক্ষার প্রলোভক প্রতারণা হইলেও হইতে পারে,—আপনার যা প্রাণে চায় বলুন,—তথাপি—"

কথায় বাধা দিয়া রেগিনাল্ড ব্যগ্র ভাবে বলিলেন,—"হাঁ হাঁ—কিন্তু",—ডক্টার কহিলেন,—"কিন্তু কি?—আপনার পরিচারকটিকে ডাকুন, এবং তাহাকে একটা হাতুড়ি ও একখানি বাঁটালি দ্রুত লইয়া আসিতে বলুন।" বলিবা মাত্রই এই কার্য্য সম্পন্ন হইল। হাতুড়ি ও বাঁটালি আসিবা পহুঁচিলে, ডক্টার স্কট, হাতুড়ি দ্বারা বাক্সের তলদেশে খুব জোরে একটা আঘাত করিলেন। আঘাত করিয়া বলিলেন,—"আপনি কিছু শুনিতে পাইলেন কি মহাশয়?—এখনও কি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই?"

ওয়ালিস বলিলেন,—"কি শুনিব?—আপনার কথার ভাব যে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডক্টার বলিলেন,—"কেন বুঝিতেছেন না?—এই বাক্সটির ডবল তলা।—একটা কৃত্রিম তলা নিম্নে লুকান রহিয়াছে। আঘাতে কিরূপ ফাঁপা আওয়াজ হইল, আপনি শুনিলেন না কি?"

কথা শেষ হইতে না হইতেই, তাঁহারা বাঁটালি ও হাতুড়ি দ্বারা বাক্সের কৃত্রিম তলা চিড়িয়া ফেলিলেন। চিড়িয়া দেখিলেন, সমস্ত তলদেশ ব্যাপিয়া পার্চমেন্টে লিখিত একখানি দলিল বিস্তারিতভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে!

রেগিনাল্ড ওয়ালিস যেমন বিস্মিত, তেমনই হর্ষাতিশয্যে আত্মবিস্মৃতবৎ। তাঁহার ছুটি চক্ষে প্রীতি ও ভক্তিমিশ্রিত গভীর আনন্দের ধারা বহিল; এবং ওয়ালিস-পরিবারের সে প্রাসাদ দেবতার পদ-ধূলি-স্পৃষ্ট পুণ্য নিকেতনের কান্তি ধারণ করিল। ওয়ালিস তাঁহার পত্নী ও কন্যাদিগকে তখনই উপরে ডাকাইয়া আনিলেন; এবং পরিবারস্থ সকলে একত্র মিলিয়া, ডক্টার স্কটের নিকট আবেগপূর্ণ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ডক্টার স্কট, প্রত্যুত্তরে, মৃদু মৃদু শব্দে, কেবল এইমাত্র বলিলেন,—"আপনারা আমার প্রতি এত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন? আমি যে এই দলিলের আবিষ্কার-কার্য্যে একটা নিমিত্ত স্বরূপ হইতে পারিয়াছি, ইহা নিতান্তই দৈবায়ত্ত ঘটনা। আপনারা করুণানিধান জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।

ডক্টার স্কট তদীয় নির্ম্মল-জীবনের এই গূঢ়রহস্য কিছু কাল কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু, ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে, তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন এই অলৌকিক কাহিনীর আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সম্মুখস্থ আত্মীয়দিগের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন; আর বলিয়াছিলেন যে,—"যাহারা, পারলৌকিক-জগৎকে প্রত্যক্ষ সত্যবৎ বিশ্বাস না করিয়া, পৃথিবীর মুহূর্ত্তস্থায়ি মায়ামোহে মুগ্ধ রহে, তাহাদিগের

অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়।" আত্মিক মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভে ওয়ালিস পরিবার যত উপকৃত, তিনি আপনাকে ততোধিক উপকৃত মনে করিয়া, চক্ষু বুজিবার পূর্ব্বে, অতি গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের নাম লইয়াছিলেন; এবং তাঁহার এই প্রত্যক্ষ দর্শনের পবিত্র ইতিবৃত্ত যেন সাধুসজ্জনের মধ্যে যত্নসহকারে প্রচারিত হয়, সে বিষয়েও বারংবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সাধু অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত, অধ্যাত্মতত্ত্বের বহু প্রামাণিক গ্রন্থে গৃহীত হইয়া, এইক্ষণ সকল দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সুবর্ণবণিকের সামাজিক মর্য্যাদা। *

বণিগ্‌জাতি, পৃথিবীর সকল দেশেই, বিশিষ্ট পদবীরূঢ় সামাজিক। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ইদানীং বণিগ্‌দিগেরই সমধিক প্রভাব। আমেরিকার প্রধান বণিকেরা, কোটীশ্বর নামেও, এক্ষণ আর তৃপ্তিলাভ করেন না। কেন না, তাঁহাদিগের অনেকে শতকোটির অধিপতি। তাঁহারা বণিক্‌সম্রাট্—রেলের রাজা—(Railway king) অথবা ধনকুবের প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, এবং শুধু অর্থবলেই, সাম্রাজ্যের অধিপতি ও সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজপুরুষদিগকে ইচ্ছায়ত্ত রাখিয়া, দেশের রাজনীতির উপরও যথেচ্ছ আধিপত্য করেন।

ইংলণ্ডের রিচার্ড এবং ফরাশি দেশের "হাঁরি কাত্রি" অর্থাৎ চতুর্থ হেন্‌রী, এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুই প্রভৃতি পৃথ্বীপালদিগের প্রভুত্বসময়ে, পৃথিবীর পশ্চিমাংশে, বণিগ্‌জাতির কোনরূপ প্রতিপত্তি ছিল না। তখন, তাহারা পদে পদে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইত; এবং যে সকল আভিজাত-বীরপুরুষ, তাহাদিগের লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনায় অধিকতর উৎসাহ দেখাইতেন, সমাজে তাঁহাদিগেরই সম্মান বাড়িত। কিন্তু, পাশ্চাত্য সভ্যতার সে দিন এখন আর নাই। পৃথিবীর সেই পশ্চিমার্দ্ধ, এই ক্ষণ, সকল বিষয়েই, প্রভূত-ধন-সমৃদ্ধ বণিগ্‌দিগের প্রতিপত্তি-গৌরবে পরাভূত; এবং যাঁহারা এক সময়ে আভিজাত্যে প্রধান ছিলেন, তাঁহারাও ইদানীং উল্লিখিত বণিক্‌সম্প্রদায়ের প্রসাদ লাভের জন্য, প্রার্থীর মত, লালায়িত।

* "শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভূতিকর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত সুবর্ণবণিক্,—অর্থাৎ এই জাতির পুরাবৃত্ত, বৈশ্যত্ব, নির্য্যাতন, সংস্কার-ব্যবস্থা ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ক গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,"—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক বিরচিত "History of the Vaisyas of Bengal" অর্থাৎ বঙ্গীয় বৈশ্যদিগের ইতিহাস,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রকাশিত "শ্রীসদানন্দভট্ট-বিরচিত। বল্লাল চরিত ইত্যাদি—ইত্যাদি।

আর্য্যকীর্ত্তিসম্পন্ন, অশেষ-পুণ্য-গুণ-বরেণ্য, পুণ্যপ্রভাব ভারতভূমিতে কোন দিনও বণিগ্‌জাতির এইরূপ উত্থান ও পতন, উন্নতি ও অবনতি, এবং প্রভুত্ব ও পরাধীনতার অনুচিত পরিবর্ত্ত ঘটে নাই। এ দেশে বণিগ্‌জাতীয়েরা চিরকালই সমাজে সম্মানিত, অথচ সে সম্মান তাহাদিগের ধন-বৈভব ও পূর্ব্বাপর-নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়-মর্য্যাদার অবস্থাসমুচিত।

মহাকবি বাল্মীকি কোন্ কালের ঋষি? বাল্মীকির সময় নির্দ্দেশ করা আজ কাহারও পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে। কেহ বলেন, বাল্মীকি সাত হাজার বৎসরের পরপারবর্ত্তী প্রাগৈতিহাসিক ঋষি; কেহ বলেন, বাল্মীকি তিন হাজার বৎসরের পুরাতন কবি। কিন্তু, বাল্মীকি যে সময়ে এই ভারত-ভূমিতে বিরাজমান ছিলেন, ভারতীয় সমাজে বণিগ্‌দিগের তখন বিশেষ সম্মান ছিল, সন্দেহ নাই। বাল্মীকি তদীয় মহাকাব্যের ফল-শ্রুতি-প্রসঙ্গে বাল-কাণ্ডের প্রথম সর্গে লিখিয়াছেন;—

"পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়োভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ,
জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্বমীয়াৎ॥"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারতেও, নানাস্থলে, বণিক্ অথবা বৈশ্যজাতির সাদর উল্লেখ আছে। ব্যাস, তদীয় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়, কৃষ্ণোক্ত বাক্যেও বৈশ্যদিগের নাম গাঁথিয়া রাখিয়াছেন,—

"কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যম্‌বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।"

রামায়ণ ও মহাভারতের উত্তরবর্ত্তি কালকে আমরা সাহিত্যযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সাহিত্যযুগের ভারতবর্ষে বণিক্-সম্প্রাদয়স্থ ভদ্রলোকেরা যে, দেশের রাজা অবধি সকলের নিকটেই সর্ব্বতোভাবে আদৃত এবং শ্রেষ্ঠি প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধিতে সমাজে অলঙ্কৃত ছিলেন, মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকাব্যে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।* ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বণিক্ অথবা বৈশ্যেরা আর্য্যজাতির মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ' জাতি কি না, সে বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সংশয়-সম্ভাবনার স্থল নাই। এক্ষণ প্রশ্ন এই, বঙ্গদেশে যাঁহারা সুবর্ণবণিক্ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও কি পূর্ব্বকথিত বণিক্ অথবা বৈশ্যজাতিরই অন্তর্গত?

আমরা কোন দিনও সুবর্ণবণিগ্‌দিগের বৈশ্যত্ব সম্পর্কে চিত্তে কোনরূপ সন্দেহের ভাব পোষণ করি নাই। যাঁহাদিগের এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ আছে, তাঁহারা যদি "শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভূতিকর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, সুবর্ণবণিক্,"—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক বিরচিত "History of the Vaisyas of Bengal অর্থাৎ বঙ্গীয় বৈশ্যদিগের ইতিহাস,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রকাশিত "শ্রীমদানন্দভট্ট-বিরচিত বল্লাল-চরিত" এবং সুবর্ণবণিক্‌সম্প্র-

* যথা শাকুন্তলে,—"দেব ইদানীমেব সাকেতস্য শ্রেষ্ঠিনো দুহিতা নির্ব্বৃত্তপুংসবনা জায়া অস্য শ্রূয়তে" ইতি।

দায়ের প্রযত্নে আরও যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের চিত্তও এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় পোষণ করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয়কে ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্বে প্রগাঢ় পণ্ডিত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করি। যেমন শ্রদ্ধা করি, তেমন তাঁহার সিদ্ধান্তের সারবত্তায়ও বিশ্বাস করি। তিনি যখন আনন্দ ভট্ট বিরচিত 'বল্লাল-চরিতং' নামক পুস্তককে পুরাতন ও প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইহার লেখার উপর কতকটা নির্ভর করা যাইতে পারে। এই পুস্তকের এক স্থলে আছে, বঙ্গাধিপতি বল্লাল, সুবর্ণবণিগ্‌দিগের সামাজিক অভিমানে অতিমাত্র কুপিত হইয়া, ক্রোধ-কলুষস্বরে কহিয়াছিলেন,—

"যদি দাম্ভিকান্ সুবর্ণান্ বণিজঃ শূদ্রত্বে ন পাতয়িস্যামি, বল্লভচন্দ্র সৌদাগিরস্য দুরাত্মনো দণ্ডং ন বিধাস্যামি, তদা গোব্রাহ্মণ-ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং বিনাশায় ভীমসেনেন যাদৃশঃ শপথঃ কৃতঃ, এতেষাং পাতনায় শপথো মে তাদৃশো জ্ঞাতব্যঃ। অদ্যাবধি এতে সর্ব্বে শূদ্রবদ্ গ্রাহ্যাঃ। ব্যর্থমেষাং যজ্ঞসূত্রধারণমতঃপরমেষাং যাজনাধ্যাপনে প্রতিগ্রহঞ্চ যে ব্রাহ্মণাঃ করিষ্যন্তি, তে অলস্তোপি পতিষ্যন্তি,—নান্যথা।"

বল্লালের উল্লিখিত বাক্য, ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে, বিভিন্ন প্রকারে উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রিমহাশয়ের পুস্তকে যাহারা সুবর্ণবণিক্ বলিয়া উল্লিখিত, পুস্তকান্তর-ধৃতপাঠে তাহারা হিরণ্যবণিক্ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু, সকল পাঠেরই সারার্থ এই,—

"তদানীং রাজবল্লালো ক্রোধ-ঘূর্ণবিলোচনঃ।
বণিজাং দর্পচূর্ণার্থং শপথং কৃতবান্ ভৃশং॥"

অর্থাৎ রাজা বল্লাল, অকস্মাৎ ক্রোধে আত্মস্খলিত হইলেন; এবং তিনি সুবর্ণবণিগ্‌দিগের দর্পনাশের অভিলাষে, ক্রোধের কলুষিত উচ্ছ্বাসে, ভয়ঙ্কর শপথ করিয়া কহিলেন,—

"যদি আমি এই দাম্ভিক সুবর্ণ বণিগ্‌দিগকে, শূদ্রত্বে পাতিত না করি,—যদি দুরাত্মা বল্লভচন্দ্র সৌদাগিরকে আমি উপযুক্ত দণ্ড না দি, তাহা হইলে গোব্রাহ্মণহত্যায় যে পাতক হয়, আমার এ আত্মাও সেই পাতকে স্পৃষ্ট হইবে।" ইত্যাদি——ইত্যাদি।

স্বদেশের সামাজিক রাজা, সম্প্রদায়বিশেষের উপর এইরূপ অভিসম্পাত করিলে, সে সম্প্রদায় যে, দেশে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রাজা বলিলে এখন বুঝায় রক্ত মাংসের মানুষ,—মনুর সময়ে বুঝাইত, মহাশক্তিশালী দেব-পুরুষ। বল্লাল যখন বঙ্গের অধিপতি, তখনও রাজার রাজ-শক্তি কতকটা ঐরূপ অপ্রতিহত। সুতরাং বল্লালের অভিসম্পাত, আকস্মিক অগ্নির লক-লক জিহ্বার মত, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেশের লো-

কেরা, সুবর্ণবণিগ্‌দিগকে পতিত ও অভিশপ্ত জাতি জ্ঞানে, তাহাদিগের সহিত সর্ব্বপ্রকার সমাজ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিল। আয়র্লণ্ডে সমাজের যে ব্যবস্থাকে„এইক্ষণ (Boycoting) বলে, রাজার অভিশাপ এ দেশে পূর্ব্বকালে ততোধিক নিদারুণ ব্যবস্থার মত ছিল। লোকে অভিশপ্ত ব্যক্তির নামটিও মুখে আনিতে ভয় পাইত। যথা পুরাতন-শাস্ত্রীয়শাসনে,—

"ন নাম গ্রহণং কুর্য্যাৎ কৃপণস্য গুরোস্তথা,
অভিশপ্তস্য পত্ন্যাশ্চ মাতাপিত্রোর্বিশেষতঃ।"

কিন্তু, আধুনিক বঙ্গের বল্লাল যখন পুরাতন মহর্ষি মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিদিগের ন্যায় সিদ্ধপুরুষ, এবং মান্ধাতা ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ন্যায় যজ্ঞপ্রতিষ্ঠিত রাজপুরুষ নহেন, তখন তাঁহার এই অভিসম্পাতের কোনরূপ অলৌকিক মাহাত্ম্য আছে কি? বোধ হয়, সহৃদয় সামাজিক মাত্রই, এই প্রশ্নের উত্তরে, এক বাক্যে বলিবেন,—না। বল্লাল, ব্রাহ্মণের কৌলীন্য সম্পর্কে যে সকল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্ষমতাবান্ কুলাচার্য্যদিগের মহিমায় শত প্রকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়াছে। নিরপরাধ সুবর্ণবণিগ্‌দিগের জাতিপাত-সম্বন্ধিনী উল্লিখিত বিসদৃশব্যবস্থাও যে, সময়ের শাসনে ও সামাজিক শক্তির স্বাভাবিক-স্ফুরণে, পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইবে না, ইহা কে বলিতে পারে?

সুবর্ণবণিগ্‌দিগের মধ্যে অনেকেই, এইক্ষণ, ধনে মানে, জ্ঞানে গুণে, সমাজের আভরণ। কেহ কেহ, রাজা, মহারাজ ও রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিলাভে, রাজদরবারে সম্মানিত হইয়াছেন। কেহ কেহ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেও, অনেকে যেমন, নিজ নিজ স্বভাবের অতিতর নীচতায়, নিতান্ত ছোট লোকের সমশ্রেণিস্থ, সুবর্ণবণিগ্‌দিগের মধ্যেও সেইরূপ ছোট লোক না আছে, এমন নহে। কিন্তু, তথাপি ইহা সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের অধিকাংশ লোকই, আকারে প্রকারে, আচারে ব্যবহারে,—আর্য্যজাতিসমুচিত সদ্‌গুণে ও সৌন্দর্য্যে এবং আর্য্যসেবিত উদারতায় ও ভাষার অনবদ্য মাধুর্য্যে, বৈশ্যলক্ষণান্বিত। তাঁহারা এ দেশে পূর্ব্বে যেরূপ সম্মানিত ছিলেন, এখনও যদি আবার সেইরূপ সম্মান লাভ করেন, তাহা হইলে দেশের উন্নতি ভিন্ন অবনতির শঙ্কা নাই।

শরীর আর সমাজ পরস্পর-প্রতিরূপ। শরীরের কোন কর্ম্মণ্য অঙ্গ যদি অকারণে বিচ্ছিন্ন কিংবা বিপন্ন হয়, তাহা হইলে, তাহাতে যেমন সমস্ত শরীরেরই অনিষ্ট ঘটে, সমাজের কোন কর্ম্মণ্য অঙ্গও যদি উপযুক্ত কারণ বিনা বিচ্ছিন্ন কিংবা বিপন্ন রহে, তাহা হইলে সমস্ত সমাজই সেইরূপ, পরম্পরাসম্বন্ধে, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। মহামতি নিত্যানন্দ ইহা বুঝিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, উদ্ধারণদত্তসূত্রে সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের উদ্ধারবিষয়ে বিশেষ যত্নপর

হইয়াছিলেন। যাঁহারা নিত্যানন্দদেবকে বল্লাল হইতে শতসহস্রগুণ বড় বলিয়া জানেন, তাঁহারা সল্লাস্তচরিত্র সুবর্ণবণিগ্‌দিগের সহিত সামাজিক সৌহার্দ্দে মিলিতে মিশিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবেন না। কারণ তাঁহারা পুরাতন আর্য্যজাতির অন্যতম অঙ্গ।

তোমার কথা।

তব কথা আজ কেহ ত কহেনা
তুমি সবাকার পর,
এ ধরার স্নেহ এমনি অসার
তাই কি ভেঙ্গেছ ঘর!
তুমি যেন কেহ ছিলে না জগতে;
ক্ষণিক স্বপন প্রায়,
আজ তব স্মৃতি পাইতেছে লয়
জগত এমনি হায়!
ক্ষণিক বিচ্ছেদে ভাঙ্গিত যে বুক
আজি দগ্ধ দুরাশায়
বুঝাব কেমনে প্রতি পলে পলে
জুড়াইতে কারে চায়।
জানি আমি যদি হৃদয় শোণিত
ঢালি অশ্রু অবিরল
তোমারি উদ্দেশে অশ্রান্ত চরণে
ভ্রমিলেও ধরাতল
এ জগতে আর তোমাতে আমাতে
কখনো হবে না দেখা,
যত দিন ভবে রহিব জীবিত
বিষাদে যাপিব একা।
সুখ সপ্ন সম গিয়াছ চলিয়া
জান না বিচ্ছেদ-ব্যথা,
উদাসীন প্রাণ গায় নিশি দিন
তোমারি বিরহ গাথা;
অই সেই স্থান যে স্থানেতে তুমি
নিদ্রিত রয়েছ সুখে,
মাতৃস্নেহে তোমা জননী বসুধা
আদরে রেখেছে বুকে,
সময়ের স্রোতে হবে অই স্থান
তৃণ গুল্ম আচ্ছাদিত,
অথবা হইবে অই পুণ্য ভূমি
শস্য ক্ষেত্রে পরিণত।
শত বর্ষ পরে কে জানিবে কার
হৃদয়ের আলো রাশি
অচিহ্নিত রূপে এ বিজন ভূমে
মৃত্তিকায় আছে মিশি!
চরণে দলিবে কত শত জন
ভাবিবে না কভু মনে
একটি জীবন গিয়াছে চলিয়া
চাহিয়া ইহার পানে,
অয়ি প্রেমময়ি এ অতুল প্রেম
হবে কি হেথায় শেষ
ব্যর্থ জীবন সফল যে থানে
নাহি কি এমন দেশ?

যে দিল হৃদয়ে এ অনন্ত প্রেম
স্বজিলা কি তিনি বল
এই পৃথিবীর এ ক্ষুদ্র জীবন
তার অভিনয় স্থল ;
দূর ভবিষ্যতে কহিব কেমনে
কি করিছে অবস্থান
এ অন্ধ নয়নে পর-জীবনের
কে করিবে দৃষ্টি দান !
এ জীবন পরে আবার কি তুমি
দিবে গো তেমনি দেখা
অতৃপ্ত নয়ন আর কি হেরিবে
যে মুখ অমিয়া মাখা ?
আবার কি সেই শান্ত নির্ম্মল
নীলাব্জ নয়ন কোণে
হাসিবে চপলা উল্লাস ভঙ্গিতে
চাহিতে আমার পানে,
ব্যর্থ জীবন হবে কি সফল
তোমারি স্নেহের ছায় ?
আমি ত কাটাই বর্ষ মাস দিন
আশা বা সে দুরাশায়।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "ফরাশি-প্রসূন। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকর্তৃক অনুবাদিত।" ইহা একখানি অভিনব ও উপাদেয় বস্তু। ইহার আকার-প্রকার, রচনা ও গুচ্ছগ্রন্থন-নৈপুণ্য, সমস্তই সুন্দর; এবং ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীতি হয় যে, বুঝি সুন্দরীদিগের সুকুমার করের জন্যই ইহা সংকলিত হইয়াছে। ইহার এক অর্দ্ধে ছোট ছোট ফরাশি উপন্যাস, আর এক অর্দ্ধে ছোট ছোট ফরাশি কাব্য। ফরাশিদেশের উপন্যাস ও কাব্যের মধ্যে অপাঠ্য বস্তুর অভাব নাই; কিন্তু এ পুস্তকে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সমস্তই সুপাঠ্য ও সুখ-পাঠ্য। বস্তুতঃ, কবিবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন নিপুণ উদ্ভাবিত মৌলিক রচনায়, তেমনই নিপুণ অনুবাদে। তাঁহার সাহিত্যব্রত, জাতীয়সাহিত্যের শোভা ও সম্পদ্‌বৃদ্ধি বিষয়ে, এত প্রকারেই, ধীরে ধীরে, নীরব-গাম্ভীর্য্যসহকারে, কার্য্য করিয়া আসিতেছে যে, বোধ হয়, একা তাঁহার দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিক্ অলঙ্কৃত হইবে। তাঁহার কুসুম-কোমলা লেখনী আরও বহুকাল বাঙ্গালা ভাষার সুমঙ্গল্য সুখ-সেবায় নিরত রহিয়া সার্থক হউক।

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'গীতা',—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'বুদ্ধদেব',—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দীপ্রণীত 'আর্য্য',—শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত "সতীপ্রশস্তি ও তর্পণাঞ্জলি" এবং "কয়েকখানি পত্র", আর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ঊষা' নামক পুস্তক উপহার পাইয়া একান্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। আমরা, ক্রমে ক্রমে, সমালোচনা প্রকাশ করিতে যত্নপর হইব।

আচার্য্য বিরজানন্দ ।

(২)

সন্ন্যাস গ্রহণ ও পঠন-পাঠন ।

যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, সে সময়ে কনখলে পূর্ণাশ্রমস্বামী নামে একটি অতি প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। পূর্ণাশ্রম বিদ্যাতে যেমন গভীর, বৈরাগ্যেতেও তেমনই তীব্র। ফলতঃ বিদ্যা এবং বৈরাগ্য, পূর্ণাশ্রমে যেরূপ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, সেরূপ অপর কোথাও করিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। আজিও দেখা যায় যে, পূর্ণাশ্রমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, লোকে তাঁহার নিঃস্পৃহত্ব, তাঁহার নির্ব্বিকারত্ব এবং তাঁহার বিদ্যার গভীরত্ব লইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে।

বিরজানন্দ কনখলে আসিয়া এই পূর্ণাশ্রম স্বামীর নিকটেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।* পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, বিরজানন্দ নাম, গুরুদত্ত নাম। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, তিনি এই স্থলেই—সন্ন্যাস-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার সময়েই বিরজানন্দ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিরজানন্দ কনখলে আসিয়া পূর্ণাশ্রমের নিকটে যেমন সন্ন্যাস দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার নিকট ষট্‌লিঙ্গাদি পড়িতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই উক্তি সত্য হইলে, পূর্ণাশ্রমকে বিরজানন্দের দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু দুই ই বলিতে হয়। কিন্তু আমরা এই উক্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যেহেতু বিরজানন্দ স্বরচিত শব্দবোধের সমাপ্তি স্থলে, আপনাকে "শ্রীগৌরীশঙ্কর শিষ্য" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই গৌরীশঙ্কর কে বা কোথাকার? তৎসম্পর্কে আজিও আমরা কিছুই নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাহা না পারিলেও, গৌরীশঙ্করই যে বিরজানন্দের শিক্ষাগুরু, সে পক্ষে আমাদিগের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেন না, গ্রন্থের সমাপ্তি স্থলে, গ্রন্থকর্ত্তা আপনাকে যাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচিত করেন, গ্রন্থ রচনার চিরন্তন রীতি অনুসারে, তাঁহাকেই গ্রন্থকর্ত্তার গুরু বা অধ্যাপক বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।* তবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে এরূপ হওয়াও কিছুই অসম্ভবিত নহে যে, পূর্ণাশ্রমের নিকটে বিরজানন্দ স্বল্প দিনের জন্যই অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাহা হইলেও, এই স্থলে এই প্রশ্নটি স্বতঃই উত্থাপিত হয় যে, বিরজা-

* কেহ কেহ বলেন, বিরজানন্দের দীক্ষাগুরুর নাম পূর্ণানন্দ সরস্বতী। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ কথা ঠিক্ নহে।

নন্দ নিজে অন্ধ হইয়া অধ্যয়ন করিতেন কিরূপে ?

যাঁহারা শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধতত্ত্ব একটু নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা, ইহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, আমাদিগের চক্ষুকর্ণাদি শারীরিক ইন্দ্রিয় সমূহ যেমন পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে নিবদ্ধ, তেমনই শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলি মানসিক ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গেও সমবেদনার সূত্রে সম্বদ্ধ। এই হেতু, কোন একটি ইন্দ্রিয়ের অভাবে বা বৈকল্যে, অপরটি, তজ্জনিত ক্ষতিপূরণের জন্যই, যেন আপনার শক্তি বাড়াইয়া লয়। তন্নিমিত্ত, সংসারের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, বধির ব্যক্তিগণ অধিকতর চিন্তাশীল। মুকগণ অধিকতর বুদ্ধিশালী, এবং চক্ষুরত্ন সম্পর্কে যাঁহারা একবারেই হতভাগ্য, তাঁহারা মননশীলতায় অপর সাধারণ মনুষ্যের অপেক্ষা যথার্থই অগ্রগামী। পৃথিবীর অন্ধ মনুষ্যগণ বস্তুতঃই অধিকতর মননশীল। মননশীলতা মনোজগতের যে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। একটি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি বলিয়াই, মননশীলতা বিচারপটুতার সৃষ্টি করে, অধিকন্তু, উহা মনুষ্যের মেধা বা স্মৃতিশক্তিকেও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলে। এই নিমিত্ত, মননশীল ব্যক্তিগণ প্রায়ই মেধাবী এবং বিচারপটু; অথবা অন্ধ ব্যক্তিগণ প্রায়ই মেধাবী এবং বিচারপটু। বিরজানন্দ যখন অন্ধ, তখন স্বভাবতঃই যে তিনি মননশীল হইবেন, এবং সেই সূত্রে তিনি যে মেধাবী ও বিচারপটুও হইবেন, তৎপক্ষে আর সংশয় কি? বিশেষতঃ তিনি বাল-ব্রহ্মচারী বলিয়া, তদীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রভা যে তাঁহার মেধা, মননশীলতা এবং বিচারপটুতাকে আরও প্রখর বা আরও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে, তাহারই বা বৈচিত্র্য কি? আর, কি অধ্যয়নে, কি চিন্তনে, কি কোন সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুশীলনে মেধাদির আলোকমালাই যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বিরজানন্দ অন্ধ হইলেও যে অধ্যয়নাদির উপযুক্ত হইবেন, তদ্বিষয়েই বা সন্দেহ কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিরজানন্দের অন্ধত্ব, তাঁহার অধ্যয়নাদির পক্ষে বাধক না হইয়া সাধকই হইতেছে।

যাহা হউক, কনখলে অধ্যয়নের সঙ্গে বিরজানন্দের অধ্যাপনাও চলিতে লাগিল। তিনি, শুনিয়া শুনিয়া নিজে যে বিষয়গুলি শিক্ষা করিতেন, সেই বিষয়গুলিই আবার সুবিধা অনুসারে অপরকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপ পঠন-পাঠনাসূত্রে পঠিত বিষয়গুলি বিরজানন্দের চিত্তপটে যার-পর-নাই অঙ্কিত হইয়া যাইত। বলা বাহুল্য যে, কি উপস্থিত অবস্থায়, কি পরবর্ত্তি অবস্থায়, এবম্বিধ রীতি অনুসারেই বিরজানন্দের পাঠকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। যাহা হউক, তিনি ষট্‌লিঙ্গাদি সমাপ্ত করিয়া, সিদ্ধান্তকৌমুদীর আবৃত্তি শুনিতে লাগিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে, আবৃত্ত সূত্রমালার অর্থোদ্ধার পূর্ব্বক, স্বীয় অনন্যসাধারণ মেধাবলে সমগ্র কৌমুদীখানিকেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ পঠন-পাঠনায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, বির-

জানন্দ কনখল পরিত্যাগ করিলেন, এবং অনুগাঙ্গ ভূমির নানা স্থল পরিভ্রমণ করিতে করিতে, পরিশেষে কাশীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কাশীর বিদ্যাগৌরব বহুকাল হইতেই বিখ্যাত। বিবিধ শাস্ত্রের পঠন পাঠনার নিমিত্ত, কাশীর নাম দিগন্ত প্রসারিত। তবে, এ কালের অপেক্ষা সে কালের কাশী আরও যেন বিদ্যোজ্জ্বলা ছিল বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ, বিদ্যাবিভূষণা বারাণসীতে পঁহুচিয়া বিরজানন্দ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। যিনি উত্তরকালে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যতম বিদ্যাবীর বলিয়া বরণীয় হইবেন, তিনি বারাণসীর বিদ্যাভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কখন কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? সুতরাং বিরজানন্দ কাশীতে বসিয়াও পঠন-পাঠনা আরম্ভ করিলেন। ব্যাকরণের প্রতি তাঁহার যে, কেনই এত বিপুল আস্থা জন্মিয়া ছিল, বলিতে পারি না। পরিশেষে "ব্যাকরণ-সূর্য্য" আখ্যায়, প্রখ্যাত হইবেন বলিয়াই হয় ত ব্যাকরণের প্রতি প্রথম হইতেই তাঁহার এত প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি পিতৃসমীপে সারস্বতচন্দ্রিকা পাঠ করিয়াছিলেন, কনখলে ষট্লিঙ্গ এবং সিদ্ধান্তকৌমুদী সমাপ্ত করিয়াছিলেন; তথাপি কাশীতে আসিয়া আবার শেখর-মনোরমার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। বিরজানন্দের পঠন প্রণালীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার পঠন-পাঠনা একসঙ্গে না হইলেও যে আনুষঙ্গিক ভাবেই চলিত, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং, কাশীতে বসিয়া তিনি যেমন অধ্যয়নে রত হইলেন, তেমনই অধ্যাপনাও আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, কাশীর তুল্য বিদ্বৎসমাজে অধ্যাপনা কি সহজ কথা? বিশেষতঃ, বিরজানন্দের মত একটি অন্ধ এবং অপরিণতবয়স্ক সন্ন্যাসীর পক্ষে কাশীতে অধ্যাপনা যেমন সাহসিকতার পরিচায়ক, তেমনই আবার বিস্ময়েরও উদ্দীপক। ফলতঃ, এই সংবাদ যখন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, একটি অন্ধ সন্ন্যাসী কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অধ্যেতার মূর্ত্তিতে নিজে পড়িতেছেন, এবং অধ্যাপকের মূর্ত্তিতে অপরকেও পড়াইতেছেন; তখন কাশীর বহুতর, অধিবাসীই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাঁহার কথা লইয়া কাশীস্থ বিদ্যার্থি-সমাজে একটু কৌতূহল সঞ্চারিত হইল। অনেক বিদ্যার্থীই বিরজানন্দের নিকট আসিতে লাগিলেন, এবং এমন কি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই অলৌকিক অধ্যাপকটির অলৌকিক প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া, একবারে গ্রন্থপত্র লইয়াই উপস্থিত হইলেন। এইরূপে কাশীতে বিরজানন্দের বিদ্যার্থিসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; আর তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলীও তদীয় চরিত্রে প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অলৌকিকতা দর্শনে এতই আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে "প্রজ্ঞাচক্ষু" উপাধি প্রদান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। ব্যাকরণ ভিন্ন, বিরজানন্দ বেদান্ত শাস্ত্রেরও আলোচনা করিতে লাগিলেন;

এবং এই প্রকারে কাশীক্ষেত্রে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া, গয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গয়ার পথে বিরজানন্দের একটি বিপদ ঘটে। তিনি পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। একে অন্ধ, তাহার উপর অসহায়; সুতরাং বিপন্মুক্তির নিমিত্ত, তিনি পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে, গোয়ালিওর রাজ্যের একটি সর্দ্দার অদূরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সর্দ্দার সেই চীৎকার ধ্বনিকে কোন আর্ত্ত ব্যক্তির কাতর ধ্বনি বিবেচনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ এক ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য পঁহুছিবা মাত্র, দস্যুরা পলায়ন করিল। তখন বিপন্মুক্ত বিরজানন্দ সংঘটিত বিপদের আমূল বৃত্তান্ত সংস্কৃতে বর্ণন করিতে লাগিলেন। সামান্য ভৃত্য, সংস্কৃত বর্ণনার মাথামুণ্ড আর কি বুঝিবে? হতবুদ্ধির মত হাঁ করিয়া, দাঁড়াইয়া কেবল কতকগুলি কথাই শুনিতে লাগিল। সর্দ্দার অদূরবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই, বিরজানন্দের সংস্কৃত কথাগুলি কিছু কিছু শুনিতে পাইতে ছিলেন। বিপন্ন পথিকের মুখে অনর্গল সংস্কৃতোক্তি শুনিয়া, তিনি চিত্তে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, এবং ব্যাপারটা কি ভাল করিয়া জানিবার অভিপ্রায়ে, সমভিব্যাহারী পণ্ডিতটিকে সত্বরেই পাঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিতটি তথায় উপস্থিত হইয়া অল্প কিছু কথাবার্ত্তার পরেই, বিপদের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বুঝিয়া লইলেন, এবং ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সর্দ্দারের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সর্দ্দার বিপন্ন পথিকটিকে একটি অন্ধ সন্ন্যাসী দেখিয়া, সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং উপস্থিত বিপদ সম্পর্কে যৎপরোনাস্তি অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী অতিথিটির যথোচিত সৎকারে সর্দ্দার কিছুমাত্রও ত্রুটি করিলেন না। বিরজানন্দও তাঁহার সেবা ও সৎকারে অতিশয় প্রসন্নতা লাভ করিলেন, এবং তাঁহার আশ্রয়ে কতিপয় দিবস যাপন করিয়া, গয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গয়াতেও তাঁহার পঠন-পাঠনা। তবে বিশেষের মধ্যে এই মাত্র শুনা যায় যে, তিনি তথায় বেদান্ত চর্চ্চায় কিছু অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যাহাহউক, গয়ায় কিছু দিন থাকিয়া, তিনি অপরাপর স্থান ভ্রমণে বাহির হইলেন, এবং এরূপ কথিত আছে যে, এই সূত্রে তিনি কলিকাতা রাজধানী পর্য্যন্তও আগমন করিলেন। এইরূপ দেশাটনে, এবং তৎসঙ্গে পঠন-পাঠনে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া, তিনি পুনর্ব্বার অনুগাঙ্গ ভূমিতে পদার্পণ করিলেন, এবং গঙ্গানিলের স্নিগ্ধ পবিত্র হিল্লোল সেবন করিতে করিতে ইটা জেলার অন্তর্গত শোরোভূমিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেঃ——

ময়মনসিংহে পাঠান রাজত্ব।

বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা বল্লাল বংশোদ্ভব লাক্ষণেয় "শুধু সপ্তদশ পাঠানের করে" লক্ষ্মণাবতীকে ত্যাগ করিয়া, পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে, বাঙ্গালায় পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়া, জিত অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ির কিয়দংশ ও বারেন্দ্র ভূমি লইয়া দেবকুট রাজধানী এবং রাঢ় ও মিথিলার অংশ লইয়া লক্ষ্মণাবতী রাজধানী স্থাপিত হয়। বঙ্গ এবং কামরূপে তখনও মুসলমান প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়া কামরূপ জয় মানসে অগ্রসর হন ও ব্রহ্মপুত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে বিপন্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। (১)

(১) ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে বক্তিয়ারের কামরূপ আক্রমণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"He (Bukhteyar) first led the army to a city named Burdehan or Inurdehan, under the walls of which ran a very large river called Bungmutty three times *as broad as the Ganges.* This river falls into the Sea which is called, in the Hindi language Sumundur" (Page 46)

ষ্টুয়ার্ট "বারদেহান" বা "মারদেহান" নামক যে নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় অবগত হওয়া যায় না। এই নগর বাঙ্গমতী নামক একটি বিশাল নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী বিস্তারে গঙ্গানদী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ ও সমুদ্রে পড়িয়াছে। গঙ্গানদী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ নদ, ব্রহ্মপুত্র ব্যতীত তৎকালে বঙ্গদেশে আর কোন নদ বা নদী ছিল না। বখ্‌তিয়ারের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী ঐতিহাসিক মিনহাজদ্দীন তদীয় তবক-ই-নাসিরি গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্র নদকে গঙ্গা অপেক্ষা তিন গুণ বড় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (মল্লিখিত ময়মনসিংহের বিবরণ ৮৭ পৃষ্ঠা) ব্রহ্মপুত্রই সাগরে মিলিত হইয়াছে। রাঙ্গামাটী নামক একটি স্থান ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। রাঙ্গামাটীর নিকট ব্রহ্মপুত্রও রাঙ্গামাটীয়া নদী বলিয়া পরিচিত। মিনহাজ এই "রাঙ্গামাটীর" কথাই লিখিয়া থাকিবেন। ষ্টুয়ার্ট অনুবাদে বোধ হয় ভুল করিয়া, "রাঙ্গামাটী" স্থলে "বাঙ্গমাটী" করিয়াছেন। রাঙ্গামাটীর পাদপ্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র বর্ত্তমান সময়েও স্থানের নাম অনুসারে "রাঙ্গামাটীয়ার নদী" নামে পরিচিত। রাঙ্গামাটীতে একসময়ে কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ষ্টুয়া-

বখ্‌তিয়ারের পর, ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইক্তার উদ্দীন উজবেগ তুগ্রল খাঁ পুনরায় কামরূপ আক্রমণ করেন। তিনিও রাঙ্গামাটীর দিক্

হইতেই আক্রমণ করিয়াছিলেন। (২) এই আক্রমণে কামরূপরাজ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন ও কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই সুযোগে, গারো পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে বা বর্ত্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহে সুসঙ্গ, মদনপুর, বোকাইনগর, গজরিপা, ভাটী, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি কএকটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। অতঃপর, পলায়মান কামরূপাধিপতি, তুগ্রলখাঁর হত্যা সাধন করিয়া, রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন (৩); কিন্তু, গারোপর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগ আর কামরূপের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল না। কামরূপরাজ দক্ষিণ দিকে দুর্ভেদ্য গারোপর্ব্বত অতিক্রম করিলেন না বটে, কিন্তু পশ্চিম দিকে সেই সময়েও, ত্রিহুতের পশ্চিম গণ্ডক নদী পর্য্যন্ত, স্বীয় কামরূপ রাজ্যান্তর্ভুক্ত রহিয়া গেল। (৪)

তুগ্রল খাঁর হত্যার পর, যখন পূর্ব্ব ময়মনসিংহে পূর্ব্বোক্ত কতিপয় স্থানে, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল, সেই সময়ে পশ্চিম ময়মনসিংহ সেন রাজাদিগের শাসনান্তর্গত থাকিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছিল।

১২৭৯ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তগ্রিল খাঁ দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছেদন করিতে প্রয়াস পাইলে, দিল্লীশ্বর গায়সউদ্দীন বুলবন, তগ্রিলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তগ্রিল পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। বাঁদসাহ বুলবন শত্রুর পশ্চাৎ ধাবন করিয়া সোনারগাঁয়ে উপনীত হন। সোনারগাঁয়ের শাসনকর্ত্তা দনুজরায় (৫) দিল্লীশ্বরকে সাদরে গ্রহণ করেন ও তাহার অধীনতা স্বীকার করেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব (৬) এই দনুজরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার বুকানন হেমি-

টির গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে। Stuart's Bengal page 48 (foot note)

(২) "He (Teghril Khan) having crossed the Bugmutty (?) river invaded the territories of the Raja of Kamrup"

Stuart's History of Bengal Page 66.

৪৬ পৃষ্ঠায় Bungmutty ৬৬ পৃষ্ঠায় আসিয়া Bugmutty হইয়াছে। সুতরাং কালে রাঙ্গামাটীত্ব লাভ অসম্ভব নহে।

(৩) Blochman's History and Geography of Bengal (J. A. S. B 1873 Page 226. তবকত-ই-নাসিরি ২৬৩ পৃষ্ঠা।

(৪) Asiatic Annual Register (1805)

(৫) ডাক্তার জে ওয়াইজ, চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের স্থাপয়িতা রাজা দনুজমাধব দেব ও এই জমিদার দনুজ রায়কে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

(৬) ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন "When the Imperial army arrived at Sonargang Dhinaj Rai, the Chief of that District, paid his compliments to the Emperor &c" বুকম্যান বলেন ঐতিহাসিক বরুণী এই তত্ত্বের প্রথম প্রচারক। অনেকে বলেন বরুণী সাতগাঁও স্থলে ভ্রমে সোনারগাঁও লিখিয়াছেন।

ষ্টন ১৮০৯ খৃঃ সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর (রামপাল) পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন "ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামপাল এবং সুবর্ণগ্রাম উভয়স্থানেই সেন রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, ডাক্তার ওয়াইজও সন্দেহের উপর, উভয়স্থানেই সেনবংশের সংশ্রব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৭) অধ্যাপক বুকম্যান বলিতেছেন,—"ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ, সোনারগাঁ পতনের সময় পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ সেন রাজবংশের শাসনাধীন ছিল" (৮)। স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন "নবদ্বীপের পতনের পর, অন্ততঃ একশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত, বঙ্গে সেনবংশীয় নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া, মুসলমানদিগের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন" (৯)। এই বিভিন্ন মন্তব্য আলোচনা করিয়া, আমরা, বোধ হয়, এই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বক্তিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পর, পলায়মান সেন রাজকুমারগণ সোনারগাঁয়ে আসিয়া আশ্রয়-গ্রহণ করেন, ও দুই এক পুরুষ তথায় রাজত্বের পর, দনুজরায় কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্ব রাজধানী রামপালে প্রস্থান করেন; এবং তথায় যাইয়া আরও কএক বৎসর রাজত্ব করিয়া, মুসলমানদিগের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। (১০)

গায়সউদ্দিন সুবর্ণগ্রাম হস্তগত করিয়া, স্বীয় দ্বিতীয়পুত্র নসিরউদ্দিন মহম্মদকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা রাখিয়া, দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। গায়সউদ্দীনের পর, কৈকুবাদ ও তৎপরে ফিরোজ সা, দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ফিরোজ সা বাঙ্গালার শাসন বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিয়া, বাঙ্গালাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন ও বাহাদুর খাঁকে পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। সোনারগাঁয়ে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। (১১) বাহাদুর খাঁর পর, বহরম খাঁ ও তৎপর ফকিরউদ্দীন সোনারগাঁয়ে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ফকিরউদ্দীন সোনারগাঁয়ের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই, সুলতান সেকান্দর নাম ধারণপূর্ব্বক, আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৩৩৮ খৃঃ সুলতান সেকন্দর, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া,

(৭) T. Wise's "Notes on Sunargaon."

(৮) The Bengal territory conquered in 1203—4 by the Mahomedan did not comprise the Eastern District. The Bangadesh was still under Ballal's descendents till the end of 13th Century, when Sonargaon was occupied by the second son of the Emperor Bulbon.

(৯) ঢাকার পুরাতন কাহিনী (নব্যভারত)

(১০) স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মণের পর, আরও তিন পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন;—২য় বল্লাল, সুষেণ ও সুরসেন। ডাঃ বুকানন ও সুষেণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

(১১) Stuarts History of Bengal Page 79.

১৪৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৭ জন মুসলমান স্বাধীন নরপতি বাঙ্গালাদেশ শাসন করেন (১২)। এই সময় সোনার গাঁ, গৌর, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। এই সময়ের বহু মুদ্রা ও তাম্রলিপি প্রস্তরলিপি প্রভৃতি ব্লকম্যান, ওয়াইজ, থমাস, কানিংহাম, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকলের আলোচনা দ্বারা, মুসলমান শাসন সেই সময় ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঢাকা, ধামরাই, বিক্রমপুর (রামপাল), সোনারগাঁ, আজিমনগর, বন্দর প্রভৃতি স্থানে, যে সকল লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ সময় পর্য্যন্ত ঢাকাই পূর্ব্ববঙ্গের শেষ সীমা ছিল বলিয়া মনে হয়।

১৪৯১ খৃঃ দ্বিতীয় ফিরোজ সা বাঙ্গালার স্বাধীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতে প্রয়াস পান ও তদীয় সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ুনকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। মজলিস খাঁ ময়মনসিংহের উত্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া, সেরপুর প্রদেশ আক্রমণ করেন। সেরপুরের অন্তর্গত গড়দরিপায় (১৩) তখন দলিপ সামন্ত নামক জনৈক কোচ-রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। হুমায়ুনের আক্রমণে দলিপ পরাজিত ও নিহত হন। সেরপুরে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। (১৪) ইহাই ময়মনসিংহে প্রথম মুসলমান প্রবেশের সূত্রপাত।

মজলিস সা হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে, এই দুর্গের ভিতরই তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। সমাধিস্তম্ভের গাত্রে যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, ঐ লিপি আরবি ভাষায় লিখিত ছিল। ১৮৭৪ খৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে ঐ লিপির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নে সোসাইটীকৃত ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

"In the name of God, the Merciful, the Clement! There is no God but Allah,—

Mahammad is Allah's prophet * * * there is no God but Allah * Mahmmad is Allah's prophet * *

(১২) ব্লকম্যানের মতে ১৭ জন, ষ্টুয়ার্টের মতে ১৪ জন।

(১৩) গড় দলিপা ক্রমে গড় দরিপা নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত "List of old Monuments of the Dacca Division" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় "দরিপা" শব্দ "Gayaripa" শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপে কায়া পরিবর্ত্তন করিতে করিতে একটি শব্দ সম্পূর্ণ পৃথক্ অন্য একটি শব্দে পরিণত হয়। ভাষার ইতিহাসে এইরূপে পরিবর্ত্তনের অভাব নাই। মমিনসাহী, আলেপসাহী এইরূপেই ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহে পরিণত হইয়াছে। "রাঙ্গামাটীও," বোধ হয়, এইরূপেই বাঙ্গমাটীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

(১৪) সেরপুরের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

God bless Mohammed, the pure Hasan Hossain * * * built * * the King of the age and the period Saifuddunya uddin Abdul Mazaffar. Feruz Shah the King may God perpetuate his kingdom and his rule! This (vault ?) was completed in blessed Ramjan 8" * *" (8)

১৪৯৮খৃঃঅঃ হুসেন সাহ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহার সময়, সমগ্র ময়মনসিংহে মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এতৎসম্বন্ধে অধ্যাপক বুকম্যান রিআজ-উস-সলাতিনের যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। "হুসেন সাহা উড়িষ্যা জয় করিয়া, তদন্তর্গত রাজাদিগের নিকট হইতে কর লইলেন ও বাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থ আসামপ্রদেশ বিজয় মানসে বিরাট অভিযান করিলেন। তিনি বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে আসামরাজ্যে প্রবেশ করেন ও কামতাছর হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া, অন্যান্য প্রদেশ, যথা—রূপনারায়ণ, মাল, (পাল?) কাচুয়ার, গণা লক্ষণ (?) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাজাদের রাজ্য হস্তগত করেন এবং লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। রাজারা তাঁহাদের উপদ্রবে গিরিমালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন ও মুসলমানেরা তাঁহাদের রাজ্য দখল করিয়া লন। এইরূপে হুসেন সাহা, কামরূপরাজ্য জয় করিয়া, নিজ পুত্র নছরত সাহাকে তাহার শাসনকর্ত্তা রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হন।*

ইহা দ্বারা হুসেন সাহা, ময়মনসিংহ জয় করিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। কেননা, রূপনারায়ণ, মাল

8 সেরপুরের স্বনামধন্য বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী, এই প্রস্তর লিপি প্রাপ্ত হইয়া, তদ্বিবরণসহ ১২৭১বঙ্গাব্দে, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটীকে প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক জার্ণেলে অধ্যাপক বুকম্যান, হরচন্দ্র বাবুর বিবরণসহ, তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদের সহিত তাঁহার প্রেরিত প্রস্তর-লিপির এই অনুবাদ প্রচার করেন। অনেক স্থলে, অক্ষর অস্পষ্ট থাকায় অনুবাদ অসম্পূর্ণ হইয়াছে।

* Hunter কৃত Statistcal Account of Bengal (Dacca Dt.) ও অন্যান্য অনেক ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে "হুসেনসাহা একডালার দুর্গ হইতে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা জলপথে কামরূপ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিকগণ এ পর্য্যন্ত ৪টি একডালা দুর্গের আবিষ্কার করিয়াছেন। ১ম পাণ্ডুয়া একডালা, ২য় বগুড়া একডালা, ৩য় রাজসাহী ও ৪র্থ সোনারগাঁও একডালা। ঐতিহাসিক Marshman সাহেব সোনারগাঁও একডালা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "Ekdala is a large fort near Sonargaon" এই একডালা ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন হুসেন সাহা সোনারগাঁও একডালা হইতেই অভিযান প্রেরণ করেন।

(পাল) কামরূপ, গণ্য লক্ষণ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় না। এই সকল রাজারা ময়মনসিংহেরও হইতে পারেন, অন্য স্থানেরও হইতে পারেন। যাই হউক, এই সকল রাজ্য জয় দ্বারা না হউক, অন্যরূপ প্রমাণ দ্বারাও হুসেন সাহার ময়মনসিংহ জয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

হুসেন সাহ, যখন যে দেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই দেশে জয়চিহ্নস্বরূপ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া, মসজিদগাত্রে তাঁহার স্মরণ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের অধীন টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আটীয়ানামক স্থানে হুসেন সাহার নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ঐ মস্‌জিদ-গাত্রস্থিত প্রস্তরফলকে তাঁহার পশ্চিম ময়মনসিংহ বিজয়বার্ত্তা আরবি অক্ষরে খোদিত রহিয়াছিল। অধ্যাপক ব্লকম্যান ঐ প্রস্তরফলকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেই ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

'The Prophet may God's blessing rest on him !—says "He who builds a mosque for God, will have a house like it built for him by God in paradise." This Jami Mosjid was built by the Great and respected King Alanddunya waddin Abdul Muzuffor Hasain Shah, the King, son of Sayjid—Ashraf, a descendant of Husain,—may God perpetuate his rule and his kingdon ! Dated A, H. 922. (A. D. 1516) *

পশ্চিম ময়মনসিংহে হুসেন সাহার শাসন-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গেল। এখন পূর্ব্ব ময়মনসিংহেও যে হুসেন সাহের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

হুসেন সাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়া, ত্রিপুরা পর্য্যন্ত অধিকার করেন ও খোয়াজ খাঁকে তাহার শাসনকর্ত্তৃত্বপদ প্রদান করেন। খোয়াজ খাঁ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জমাবাদে থাকিয়া, এই যুক্ত প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। খোয়াজ খাঁর নামাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর-লিপিও এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহারও ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিলাম।—

*   *   *

This Mosque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the kingdom of Solomon, Alandinya waddin Abdul Muzuffor Husain Shah. may God perpetuate his kingdom and rule, and elevate his condition and dignity, and render, in every minute his proof victorious, by the Great and noble khan, Khawas

* Notes on Arabic and Parsian inscriptions (T. A. S. B.)

khan, Governor of the land of Tiparah and Vazir of the District in Muzzamabad,—may God preserve him in both worlds! (১)

Dated 2nd. Rabi II 919 (7th. June 1513)

লিপির উল্লিখিত মুয়াজ্জমাবাদ বর্ত্তমান সময়ে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এখানেও বিচার প্রয়োজন। সুপণ্ডিত ব্লকম্যান তাঁহার প্রবন্ধে (২) মুয়াজ্জমাবাদ স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে The union of Tiparah (Tiparah) and Muazzamabad confirms my conjuncture that Mazzamabad belongs to on Sonargaon," লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার অন্য প্রবন্ধে এই ইক্‌লিম মুয়াজ্জমাবাদকে তিনি বর্ত্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছিলেন। (৩)

সুতরাং, হুসেন সাহ ময়মনসিংহের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় ভাগই যে হস্তগত করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত হুসেনসাহী পরগণা ও হুসেনপুরনামক স্থানও হুসেন সাহার শাসন-স্মৃতিস্বরূপ ময়মনসিংহবক্ষে অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হুসেনসাহী এবং হুসেনপুরের নাম ব্লকম্যান সাহেবও হুসেন সাহের শাসন-স্মৃতির নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।(৪) থমাস সাহেব লিখিয়াছেন, হুসেন সাহার রাজত্ব সময়ে, মুয়াজ্জমাবাদে টাকশাল স্থাপিত ছিল। থমাস সাহেব বাঙ্গালার ৭টি টাকশালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—(১) লক্ষ্মণাবতী, (২) ফিরোজাবাদ, (পাণ্ডুয়া), (৩) সাতগাঁও, (৪) শা (অস্পষ্ট), (৫) গয়াসপুর, (৬) সোনার গাঁও, (৭) মুয়াজ্জমাবাদ। ব্লকম্যান আরও তিনটির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ফতাবাদ, খালি ফতাবাদ ও হুসেনাবাদ।

টাকশালের এইরূপ বিভাগ দ্বারা, অনুমিত হয় যে, সেই সময়ে বঙ্গদেশ উপরোক্ত কয় ভাগে বিভক্ত ছিল; এবং পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ইক্‌লিম মুয়াজ্জমাবাদ নামে পরিচিত হইত। এই মুয়াজ্জমাবাদের পরিমাণ ও সীমা কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে তাহা পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্টের লাউর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহা কোন কোন প্রস্তরলিপি দ্বারা অনুমিত হইয়াছে।

হুসেন সাহার রাজত্ব সময়ে, বাঙ্গালার সীমা যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, টোডর

(১) On a new king of Bengal (F. A. S. B 1872)

(২) On a new king of Bengal (J. A. S Bengal 1872)

(৩) History and Geography of Béngal (J. A. S Bengal 1873 Page 214.

(৪) On a new king of Bengal.

মল্লের বন্দোবস্তের সময়, তাহা অব্যাহত ছিল। (১) তবে শাসন-বিশেষে, সময় সময়, ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছিল, আমরা তাহা পশ্চাৎ দেখাইব। হুসেন সাহ কর্ত্তৃক কামরূপ বিজয়ের পর, নছরত সাহ কামরূপের শাসনকর্ত্তা হন। কিন্তু, অল্পকাল পরেই, বর্ষা-সমাগমে, যখন দুর্গম গিরিকান্তার ভীষণ ভাব ধারণ করিল,—পথ ঘাটে চলাচল বন্ধ হইয়া গেল, তখন সেই দুর্য্যোগে পলায়মান রাজারা আসিয়া সদলবলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। নছরত পলাইয়া গারো পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রক্ষা পাইলেন (২)। তাঁহার সঙ্গীয় সৈন্য সামন্ত অরণ্যে বিপদাপন্ন হইয়া জীবন হারাইল। নছরত পলায়ন করিয়া মুয়াজ্জমাবাদ (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ) আগমন করেন ও ময়মনসিংহের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকৃত কামরূপের অংশ, কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এদিকে নছরতের নূতন শাসিত প্রদেশ "নছরত উজিয়াল" নামে পরিচিত হইতে থাকে। পলায়িত নছরত সাহ আশ্রয়স্থলকে "নছরত উজিয়াল" নামাকরণে অভিহিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহার শাসনান্তর্গত সমগ্র প্রদেশকে "নছরত সাহী" নামেও অভিহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা এই নছরত সাহীরই নামান্তর। এই নছরত সাহী, আকবর বাদসাহের সময়ে বাজুহা ও ইংরেজ শাসন-সময়ে ময়মনসিংহ বলিয়া পরিচিত হয়।

(১) J. S. B. Page 213 of 1873.

(২) এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তলিখিত "রিয়াজ-উস-সিলাতিন" গ্রন্থে নছরত সাহা কামরূপে সসৈন্যে নিহত হইলেন, এইরূপ লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক ব্লকম্যান তাঁহার "On a new king of Bengal" প্রবন্ধে রিয়াজের এই উক্তি প্রমাদপূর্ণ বলিয়া দেখাইয়াছেন।

সম্রাট্‌-কুলতিলক আকবর সাহ, ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর মহামান্য দেওয়ান ঈশা খাঁকে যে সনন্দ দ্বারা নছরত সাহীর আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ও সুসঙ্গের রাজাদিগের প্রাপ্ত বাদসাহী দলিলাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলার অংশ, তৎকালে নছরত সাহীর অন্তর্গত ছিল। পরগণা নছরত সাহী ও নছরত উজিয়াল, আজিও সেই প্রাচীন শাসনকর্ত্তার স্মৃতি উজ্জীবিত রাখিয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী গ্রন্থে ঈশা খার সুসঙ্গের রাজাদিগের সনন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হুসেন সাহার সময়ের খোদিত প্রস্তরলিপি সমূহের আলোচনা করিলে জানা যায় যে, হুসেন সাহা রাজস্ব আদায়ের সৌকর্য্যার্থে তৎশাসনাধীন রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালে বিভক্ত ও স্থানে স্থানে দেওয়ান খানা ও থানা প্রভৃতি স্থাপন করেন। এই সময়, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জমাবাদ নামক কোন স্থানে দেওয়ান খানা

স্থাপিত হইয়াছিল; এবং দেওয়ান খানার অন্তর্গত প্রদেশ ইক্লিম মুয়াজ্জমাবাদ নামে অভিহিত হইত। * নছরত ওজিয়াল বা বর্ত্তমান নসিরুজিয়াল পরগণার মধ্যেই কোন স্থান মুয়াজ্জমাবাদ নামে পরিচিত ছিল; এবং সেইস্থানে এতৎ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার বাসস্থান ও টাকশাল স্থাপিত ছিল, কালের অচিন্তনীয় প্রভাবে সেই সকল লয় পাইয়া গিয়াছে।

মুসলমান শাসন পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ময়মনসিংহে প্রবর্ত্তিত হইলে পরও, স্থানে স্থানে কোচরাজগণ স্ব স্ব প্রভুত্ব পরিচালন করিতেছিলেন।

হুসেন সাহার রাজত্ব সময়ে নবদ্বীপে চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাব হয়। চৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তপ্রধান মাধবাচার্য্য চৈতন্য প্রভুর তিরোভাবের পর, এতৎ প্রদেশে (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলায়) বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। (২)

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন কবি নারায়ণ দেব, এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে এ প্রদেশের নিবিড় অরণ্যভূমি মনসার ভাসানের কোমল পদাবলীতে আকুলিত করিতেছিলেন। তাঁহার রচিত "পদ্মাপুরাণ" পাঠে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার তৎসাময়িক অবস্থা ও আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

দার্শনিকমতের সমন্বয়।

[৬]

আমরা যাহা দেখি, শুনি, ভাবি,—ইহারা সমস্তই সাদি ও সান্ত। একটা স্থূল, নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় আসিবার পরই, আমরা দেখিতে, শুনিতে, ভাবিতে পারি। এই যে দেখা, শুনা, ভাবা অবস্থায় পরিণতি, এই পরিণতি হইবার পূর্ব্বক্ষণেও, বস্তুর বা

* অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব হুসেন সাহার সময়ের খোদিত প্রস্তর-লিপির আলোচনায় লিখিয়াছেন।—

"The inscriptions reveal the important fact that Bengal was divided into revenue divisions called Mahalas over which as in the Delhi Empire Shigdars (শীকদার) were placed and into large circles under Sarlashker or Inititary in Commander, who have often also the Vazir (Diwan) of places mentioned in inscription I may cite Iclim Moazzamabab (Eastern Mygmonsingh) Thana Laur Sylhet &c."

(২) ময়মনসিংহের বিবরণ ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পদার্থের একটা অব্যক্ত, সূক্ষ্ম অবস্থা ছিল। দৃষ্টান্ত-সাহায্যে কথাটা আমরা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। আণবিক কম্পন যখন বিশেষ একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে কোন একটি বর্ণ (colour) রূপে আমরা বুঝিতে সমর্থ হই। শব্দাদি সম্বন্ধেও এই কথা। আণবিক কম্পন, যখন যখন একটা বিশেষ অবস্থায় আইসে, তখন হইতেই শব্দজ্ঞানের আরম্ভ। কিন্তু সেই বিশেষ অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে ও পরক্ষণেও, তাহা অন্যভাবে বর্ত্তমান ছিল ও থাকিবে,. আমরা তাহারও আভাস সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি। এক সেকেণ্ডে ত্রিশবার আণবিক কম্পন হইলে, শব্দজ্ঞানের আরম্ভ হয়; এবং এক সেকেণ্ডে ৪০০০ বারের অধিক কম্পন হইলেই, শব্দজ্ঞান আর হয় না; সেই স্থলেই শব্দজ্ঞানের সমাপ্তি। এইরূপ, এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে, যখন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষ কম্পন হইতে থাকে, তখনই নীলাদিবর্ণানুভূতির আরম্ভ হয়। অতএব বর্ণজ্ঞান ও শব্দজ্ঞান এক নির্দ্দিষ্ট সীমায় আরম্ভ হয় ও এক নির্দ্দিষ্ট সীমায় শেষ হয়। কিন্তু আরম্ভের পূর্ব্বে ও শেষ হইবার পরেও, ঐ কম্পনের অবস্থা-ভেদ বর্ত্তমান থাকেই। কেবল আমাদের ইন্দ্রিয় সেইরূপ অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া, তাহার জ্ঞান হয় না, এই পর্য্যন্ত বিশেষত্ব। স্পর্শজ্ঞানও এই প্রকার। পরমাণু নির্দ্দিষ্ট একটা আকৃতি বা সংস্থানে আসিলেই আমরা তাহা স্পর্শ করিতে পারি; তখন হইতেই স্পর্শ-ক্রিয়ার আরম্ভ হইল বলিতে পারা যায়। স্পর্শ-শক্তি যত সূক্ষ্মই হউক্, পরমাণুর সংস্থান-ভেদ এত ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম হইতে পারে যে, তাহার পরে আর তাহা স্পর্শ-যোগ্য থাকে না; তখন স্পর্শজ্ঞান শেষ হইল, ইহা বলা যাইতে পারে। অতএব আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েও নির্দ্দিষ্ট অবস্থায়, বস্তুজ্ঞান লাভ করে; সেই সীমা ছাড়িয়া দিলে, আর বস্তুর কোন প্রকারেই স্থূলভাবে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও বস্তুর ক্রিয়া যে বিলুপ্ত হইল, তাহা নহে। কেবল স্থূলভাবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবস্থার অতীত হইল মাত্র। এইরূপে বুঝা যাইবে যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি—সকলেরই পশ্চাতে একটা অব্যক্ত অবস্থা আছে। একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় আসিলে মাত্র, সেই অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়। এই জন্যই এবং এই হিসাবেই, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্রই সাদি ও সান্ত। এই কারণেই বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও বস্তুর গুণের অন্তরালে, এক সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থা বা সত্তা স্থাপন করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর Herbert Spencerএর এ সম্বন্ধে উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করুন্;—"Whereever we now found being so conditioned as to act on our senses, there arises the question how came it thus conditioned? Unless on the assumption that it acquired a

sensible form *at the moment of perception*, and lost its sensible form at the moment of perception, it must have had an *antecedent existence* under this sensible form and will have a *subsequent existence* under sensible forms are possible subjects of knowledge." তবেই ব্যক্ত জগতের পশ্চাতে যে একটি সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত জগৎ বর্ত্তমান আছে, ইহা অতি বড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এই ব্যক্ত জগৎ, সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম জগতেরই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাভেদ মাত্র। যেখান হইতে এবং যতটুকু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-অবস্থা, ততটুকুই শেষ নহে। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।" গীতার এই উক্তি, এই বৈজ্ঞানিক মীমাংসার উপরে সংস্থাপিত। অতএব যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা, তাহাই পদার্থনিচয়ের স্বরূপাবস্থা নহে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাটি প্রতিক্ষণ পরিণামী, সুতরাং অলীক ও অসার। কেননা, ইন্দ্রিয়-শক্তি এতদপেক্ষা আরও উন্নত হইলে, জগতের ছবি রূপান্তর পরিগ্রহ করিত। ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি অন্তঃকরণের যে ভাবনিচয় (Ideas) আমরা সংস্কাররূপে পাইয়াছি বা অর্জ্জন করিয়াছি, পদার্থের গুণাদিও সেই অর্জিত সংস্কারানুরূপ হইয়াছে। এই সংস্কার রাশির পরিবর্ত্তনে, গুণ-নিচয়েরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবি। যাহাতে এই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, অর্জ্জিত সংস্কার-রাশি ধুইয়া ফেলিতে পারা যায়, তজ্জন্যই হিন্দুদর্শনের উপদেশ।

এই ব্যক্ত জগতের পশ্চাতে, আমরা যে সূক্ষ্ম শক্তিময় অব্যক্ত জগতের অনুমান পাই, সেই সূক্ষ্ম শক্তিময় জগৎই, ব্যক্তজগতের বর্ত্তমান আকারাদি প্রদান করিয়াছে। ইহা হইতেই আবার, আমরা হিন্দুদর্শনের, সূক্ষ্ম শরীর যে স্থূল শরীর গড়াইয়া তোলে, তাহার ধর্ম্মও বুঝিয়া লইতে পারি। প্রত্যেক পদার্থ, যাহা ইন্দ্রিয়-গোচরে আসিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে,উহার একটা সূক্ষ্ম শক্তিময় রূপ ছিল। তাহাই যখন বিশেষ একটা অবস্থায় পরিণত হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ইন্দ্রিয় তাহা বুঝিতে পারিল। আবার যখন অন্য একরূপ বিশেষ অবস্থায় পরিণত হইবে, তখন হইতে এই ইন্দ্রিয়-নিচয় আর তাহাকে বুঝিতে পারিবে না। প্রত্যেক পদার্থের এই যে সূক্ষ্ম শক্তিময় অবস্থা, যাহা বিলুপ্ত হইয়া, বিশেষ পরিণাম পাইলে, আবার সেই অবস্থায় তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে। ইহাই হিন্দুদর্শনের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ। এ সকল তত্ত্ব বৌদ্ধদর্শনেরও অনুমোদিত।

কিন্তু, ব্যক্তজগতের অন্তরালবর্ত্তী যে একটি সূক্ষ্ম শক্তিময় জগতের অনুমান করা যাইতেছে, জীবজগতে, উহা প্রত্যেক জীবের আচরিত আত্ম-কর্ম্মেরই ফলমাত্র। স্থূলাবস্থায় যে জীব যে ক্রিয়া আচরণ করে, তাহাই সামঞ্জস্য লাভ করিয়া, সূক্ষ্মাবস্থাতেও লগ্ন থাকে। আবার সেই ক্রিয়াই, স্থূলভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ ধারণ করে। কিন্তু, এই যে

সূক্ষ্মক্রিয়াত্মক অবস্থা, এটিও অনিত্য ও অসার। ইহাও ক্রমাগত পরিবর্ত্তন পাই-তেছে। পরিবর্ত্তন অত্যন্ত মৃদু হউক, বা শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হউক, উহাও পরিবর্ত্তনেরই প্রবাহ মাত্র। কাজেই তাহা অদ্য একরূপ, কল্য অন্যরূপ, তাহা চির-নিত্য (Absolute হইতে পারে না। উহা Relatively নিত্য-মাত্র। হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় দর্শনেরই অভিপ্রায় এই যে, এই সূক্ষ্ম, ক্রিয়াত্মক জগতেরও ধ্বংস সম্ভব। সূক্ষ্ম ক্রিয়াত্মক অবস্থারও পশ্চাতে, এক নিত্য নিষ্ক্রিয় * অবস্থা আছে। এই নিত্য, নিষ্ক্রিয় অবস্থালাভেরই নাম, হিন্দুদর্শনে, মুক্তি এবং বৌদ্ধদর্শনে, নির্ব্বাণ। যে সংস্কার-রাশি বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং যাহা আবার ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া যাইবে, তাহাই, সাধনবিশেষের প্রভাবে, উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দাঁড়াইবে। এই অবস্থাই জগতের স্বরূপাবস্থা। এ অবস্থা কি রূপে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা দর্শনের সাধনবিভাগের কথা, ইহাই দর্শনের ধর্ম্মাংশ। সুতরাং তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্. এ।

কে বেশী সুন্দর ?

(১)

কে বেশী সুন্দর ?—
বালিকা যুবতীরাণী দুই (ই) মনোহর।
একের সৌন্দর্য্যদাম
উষাময় অবিরাম,—
অপরের রূপ মাঝে বহ্নি নিরন্তর।
হিয়ার সরল খেলা
ফুটে পড়ে দুই বেলা,
কমল আনন 'পরে—জ্যোৎস্না থরেথর!
পাষাণ হৃদয়ে পড়ি,
অমিয়ায় দেয় ভরি,—
মধুর পরশে হয় জীবন অমর!—
দারুণ দহন ভার
সুমধুর মদিরার
হেসে হেসে ঢেলে দেয় হিয়ায় অপার!
একে হাসি পুষ্পগড়া,
অন্যে শান্ত বিষজড়া,—
একে ছায়া, অন্যে কায়া—দীপ্তি মনোহর
বালিকা যুবতী মাঝে কে বেশী সুন্দর ?

(২)

কে বেশী সুন্দর ?—
বালিকা নিতুই এসে

* এই "নিষ্ক্রিয়" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমরা অন্য এক সংখ্যায় বলিব। একেবারে ক্রিয়াবর্জ্জিত, শূন্যাবস্থা, ইহার অর্থ নহে।

কহে কথা মৃদু হেসে,—
অলস পরশে তা'র ভীত কলেবর।
আপন মহিমাভার
হিয়া সদা ভেসে যায়,
নয়নে তারকা ফুটে ক্ষুদ্র মনোহর।
ছলনার ছায়াকণা—
কামাখ্যার উপাসনা—
কেহ কভু নাহি দেখে আননের'পর।
বিলাস তরঙ্গরাশি,
নিত্য হাসে শান্ত হাসি,
প্রভাতী রাগিণী করে মুগ্ধ চরাচর।
কোমল পরশে তা'র
হিয়াতলে নির্ব্বিকার
ফল্গুর পবিত্র ধারা বহে নিরন্তর।—
যুবতী গরব ভরে,
অগ্নি জলে স্তরে স্তরে,
নয়নে বিজলী খেলে—মদনের শর।
উছল কল্পনা গেহে,—
হৃদয়ের নগদেহে,
অসহায় এ জীবন পীড়নে কাতর।
স্নেহ আলিঙ্গন ছলে,
বাহু দুটি রাখি গলে,
শোণিত শুষিয়ে লয়, সোহাগের ভর।
গম্ভীর বেহাগ স্বরে,
জয় করে শক্তিপুরে,
মুহূর্ত্তে গরজি উঠে কামনাসাগর।
একে শান্ত সমীরণ,
অন্যে ঝড় সুভীষণ,
একে স্মৃতি, অন্যে স্থিতি, প্রলয়ের পর;
বালিকা যুবতী মাঝে কে বেশী সুন্দর?

(৩)

কে বেশী সুন্দর?—
বালিকা যুবতী রাণী দুই (ই) মনোহর।
বালিকা সন্ধ্যার মত,
দিবানিশি অবিরত,
আশ্রমমহিমা ধরে বুকের উপর।
যুবতী প্রভাত সম,
রবি ভরা তেজ কম,
যতনে লুকায়ে রাখে শৈলের ভিতর।
বালিকা ঘুমের ঘোরে,
বাঁধে হিয়া বাহু ডোরে,—
মন্দার খসিয়ে পড়ে, স্নেহে নিরন্তর।
যুবতী পুতনাসাজে,
বক্ষ'পরে নিত্য রাজে,—
বিনাশিতে বাহু দুটি সদাই তৎপর।
বালিকা খেলার ছলে,
আসে সদা কুতূহলে,—
শরমে মরিয়ে যায়—চুম্বনে কাতর।
যুবতী বীরের তেজে,
বন্দী করে সেনা সেজে,—
পুরুষের পরাভবে প্রফুল্ল অন্তর;
বালিকা সরল, মুক্তি
যুবতী বেদেশ যুক্তি,—
একে ভুল, অন্যে স্থূল—শিক্ষা মনোহর।
বালিকা যুবতী মাঝে কে বেশী সুন্দর?

শ্রী ———

ব্রহ্মদেশের কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধর্ম্ম;—অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, ধর্ম্মটি আবার কি? বাস্তবিক ইহা কি, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি আমাদের নাই। এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দটির এখন নানারূপ ব্যাখ্যা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্ম একটি ত সকলেরই আছে; পশুর ধর্ম্ম যেমন চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা, পক্ষীর ধর্ম্ম যেমন কুলায় নির্ম্মাণ করা, চঞ্চুপুটের সাহায্যে শাবকদিগকে উড্ডীয়ন শিক্ষা দেওয়া, মানুষেরও সেইরূপ একটি জাতীয় ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা তাহারা সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করে। কিন্তু, যিনি যাহাই করুন ও বলুন না কেন, এ স্থলে ধর্ম্ম অর্থে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ভগবৎ-চিন্তা। আমাদের অনুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র, সুখ-দুঃখরূপ আবরণ দ্বারা অনুক্ষণ ঢাকা থাকিলেও, প্রকৃতিপুঞ্জের চারু চিত্র দর্শন করিয়া, আমাদিগকে অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক একজন আছেন, যাঁহার অলঙ্ঘনীয় বিধির ব্যবস্থানুসারে সমসূত্রে গ্রথিত এই আসমুদ্র পৃথিবী হইতে, ঐ গ্রহ উপগ্রহ পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড সৌরজগৎ পর্য্যন্ত, এক নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু, যে দেশে কর্ম্মবাদেরই আধিক্য এবং একমাত্র কর্ম্মভিন্ন আর কিছুরই প্রতি আস্থা নাই বলিয়া, লোক-সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমাদের ন্যায় অর্ব্বাচীনের, সেই দেশের লোকের ধর্ম্মভাব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, এস্থলে এতৎ সম্পর্কে দুই চারিটি কথা বলিলে, বোধ হয় বড় অসংলগ্ন হইবে না। দুঃখের বিষয় এই, অনেক প্রাজ্ঞব্যক্তি বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মবাসীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টের পার্থক্য বুঝিতে চাহে না, এবং তাঁহার বিশ্বব্যাপক মহাশক্তির কার্য্যও বিশ্বাস করে না। তাহারা, অসংখ্য অপদেবতার প্রতি ভক্তিমান্ এবং মনে করে, মানুষের ন্যায় ইহাদেরও জন্ম-মৃত্যু সুখদুঃখ জ্ঞান আছে। কিন্তু, আমাদের অনুমান হয়, এইরূপ বাক্যেও আলোকের ছায়া ও সত্যের বিমল জ্যোতিঃ একটু আছে। ধর্ম্মপুস্তক "পতিমোক্ষে" আমরা 'বুদ্ধন, স্মরণ ও গচ্ছামী' এই তিনটি আশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই আশ্রম ত্রয়ের লক্ষ্য কি, আমরা পরে বলিব। বুদ্ধদেবকে যদি অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুরাগী শিষ্যেরা যেরূপ পবিত্রভাবে দর্শন করে, তাহা যদি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ব্রহ্মবাসীরা কখনও

অনীশ্বরবাদী নহে। জগতে সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা ও সর্ব্বশক্তিমান মহাপুরুষ একজন আছেন, যিনি কৃষ্ণ, খৃষ্ট, ঈশা, মুশা প্রভৃতি নানা নামে ও নানা ভাবে ভক্তগণের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এরূপ স্থলে, তিনি সম্প্রদায় বিশেষের কল্যাণার্থে অপদেবতা বা বুদ্ধরূপ পরিগ্রহ করিলে হানি কি?

বৌদ্ধ-আশ্রমত্রয়ের প্রথম আশ্রমের নাম 'বুদ্ধন', অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধ্যান, মনন ও চিন্তা করিতে করিতে, জীবের তন্ময়ত্ব লাভ করা, দ্বিতীয় 'স্মরণ', দেশ-বাসীর ধারণা, ধরিত্রী দেবীর দেহায়তন ২৪০০০০ যোজন; তাঁহার স্থিতি স্থান অনন্ত জলধি উপরি, তাহার চতুর্দ্দিকে মহামেরু। এই মহামেরুর সাময়িক আন্দোলন দ্বারা পৃথিবীতে অগ্ন্যুৎপাৎ, ভূমিকম্পাদি নানাবিধ উপদ্রব সংঘটিত হয়। যে সাধক এই সমস্ত আপদ বিপদের মধ্যে থাকিয়াও ভগবানকে বিস্মৃত হন না, তিনিই এই আশ্রমবাসের উপযুক্ত। ইহা কি অবিচলিত ও সমাহিত চিত্তের সুন্দর চিত্র নহে? ইহাতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ভাব কিছু আসে কি?

তৃতীয় আশ্রমের নাম 'গচ্ছামী' অর্থাৎ ধর্ম্মাদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা। যে দেশে উপরোক্ত আশ্রমত্যাগে অষ্ট প্রধান ও ১৩৬ উপনরকে ১৬০০০০ কেনা (কল্প) পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগের বিধান আছে, এবং যে দেশের ধর্ম্ম ভাব এত উন্নত সে দেশে—

"Buddhism has no Saviour, according to it man has no help but to look only to himself" এইরূপ শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় কি? পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রদেশে দুই সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এক "নাত" দ্বিতীয় বুদ্ধদেবের উপাসক। অনেকের বিশ্বাস, "নাথ" শব্দের অপভ্রংশে 'নাত' হইয়াছে। যেরূপই হউক, এ স্থলে আমরা বলিব, এই নাত অর্থে ঈশ্বর জ্ঞানে অপদেবতার পূজা। পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডেও ইহাদের উপাসনা আছে। বোধ হয়, সেই স্থানের বীজ এইখানে অঙ্কুরিত হইয়া, শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়াছে; এবং সেই স্থানের জাতীয়ভাব এই স্থানে পূর্ণরূপে সজীবতা লাভ করিয়াছে, ভূতযোনির উপাসনা ভারতেরও অনেকস্থানে বিস্তৃতভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই দেশের নাত উপাসকদিগের বিশ্বাস ইহাঁদিগের একটি সার্ব্বভৌমিক রাজা আছেন, প্রতি মঘি শকাব্দার প্রারম্ভে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, তিন দিন মাত্র এ স্থানে অবস্থিতি করেন, পরে হিমাদ্রিসুতা যোগীশ্বরী যোগমায়ার ন্যায়, স্বগৃহে চলিয়া যান। কেরল জাতির মধ্যেও তিনি দেবতাজ্ঞানে পূজিত এবং ঈশ্বর শক্তিতে বিরাজিত। তাঁহার প্রতি তাহাদের যে অচলাভক্তি, তদনুবলে তাহারা অনেক সময় অকূল ভব সমুদ্রের কূল দেখিতে পায়। রাজার প্রতিগমনের পরে "কারপর্দ্দাসগণ" তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহারা রাজার উচ্চ সম্মান পান না। কারণ, ইহাঁরা প্রভুর আজ্ঞাবাহক ভৃত্য মাত্র;

এবং নকল কখন আদতের স্থান অধিকার করিতে পারে না। আমাদের মতে, অপ-দেবতার উপাসনায় এই উৎসাহ; ভাবটি নিতান্ত নীচগামী হইলেও প্রশংসার যোগ্য বটে; কারণ, ইহাতে নাস্তিকতার ও অবিশ্বাসের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। তিনি অপদেবতাই হউন, আর উৎকৃষ্ট দেবতাই হউন, যাঁহাকে আমরা ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিব, তিনিই আমাদের ঈশ্বর, তিনিই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, ত্রাতা, বল, বুদ্ধি, মুক্তি ও ভক্তি প্রদাতা। তাঁহাকে ভিন্ন আমরা দ্বিতীয় ঈশ্বর মানিব না। দ্বিতীয় ঈশ্বর আমাদের পূজ্য ও উপাস্য দেবতা নহেন। ধর্ম্মরাজ্যে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কি, তাহা আমরা বুঝি না, যিনি পূর্ণ, যিনি সত্য, তাঁহার অপকৃষ্টভাব কল্পনা করা একটি মহাপাপ। সমস্ত সাগরের জল যেমন এক পদার্থ, ও সমগ্র পৃথিবীতে যেমন এক সূর্য্য সমভাবে আলোক প্রদান করেন, যাঁহাকে অথবা যাঁহার ছায়াকে আমরা স্রষ্টার আসনে দেখিব, তখন ইহাই বুঝিব যে একই ঈশ্বর বহু বস্তুতে প্রতিভাত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত আর্য্য দার্শনিক পণ্ডিতগণও মানবের আধ্যাত্মিক বৃত্তির উন্নতি ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির সহজ উপায় উদ্ভাবনের মানসে, ঈশ্বরের প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করিবার বিধান করিয়াছেন। হিন্দুর কাষ্ঠে লোষ্ট্রে দেবতাজ্ঞান, ইহাতে কি ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতার ও সর্ব্ব শক্তিমত্তার পরিচয় দেয় না? যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজিত, তিনি না আছেন, এমন কোন্ স্থান বা কোন্ পদার্থ আছে? তুমি ধনী, তোমার প্রশস্ত দেব-মন্দিরে তিনি উপস্থিত থাকিবেন, আমি কাঙ্গাল বলিয়া কি আমার ভগ্ন ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরে তাঁহার অধিষ্ঠান হইবে না? তুমি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর না বলিয়া, তুমি তোমার ঈশ্বরকে সর্ব্ব স্থলে ও সকল বস্তুতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও না; আমার ধর্ম্ম আমাকে নিরন্তর বলিয়া দিতেছে, "বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল।" বিশ্বাস করিলে আমি যেখানে, যে অবস্থায় থাকি না কেন, সকল স্থানে সকল বস্তুতে আমার উপাস্য দেবতাকে চাক্ষুষ দেখিব। অবিশ্বাসী রাজা হিরণ্যকশিপু স্ফটিকস্তম্ভে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরির আবির্ভাব বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ সর্ব্ব স্থানে ঈশ্বরসত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; অটল বিশ্বাসের অনুবলে অবিশ্বাসী পিতাকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—পিতঃ! একবার বিশ্বাস করুন, এই স্তম্ভ মধ্যে আমার প্রাণের হরি বিরাজমান আছেন। পুত্রের সত্য কথা অবিশ্বাসী পিতার কাছে উপেক্ষিত হইল, দৈত্যরাজ অপত্য-স্নেহ বিস্মৃত হইয়া প্রহ্লাদকে অধিকতর উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ ভক্তের এই লাঞ্ছনা আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না, বিরাট নরসিংহ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া অবিশ্বাসী পামরের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া, সকল দর্প চূর্ণ

করিলেন এবং নাস্তিকের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন।

ব্রহ্মদেশে ভূতযোনির পূজা যে নিতান্ত পাপজনক ও ভয়াবহ কার্য্য এবং তাহাতে ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করা যে নিতান্ত মূর্খতার পরিচায়ক,—"Demon-worship is sinful and dangerous" প্রতীচ্যবাসীর ঐরূপ উক্তি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা কখন প্রস্তুত নহি, এবং তাঁহারা যে আরও বলেন, Demon-worship is morally degrading ইহাকেও উচিত প্রয়োগ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না। কেবল ও অন্যান্য অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস, এক নাত্ হইতে সমস্ত ভৌতিক ও জড় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি যেরূপ ভাবে মানব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সেইরূপে বৃক্ষপত্রে, লতাবল্লীতে, মধুমালঞ্চে, কাষ্ঠ লোষ্ট্রে, সকল বস্তুতে ও প্রকৃতির সর্ব্ব অঙ্গে সমভাবে বিরাজিত। তিনি প্রাণী-জগৎকে নিরন্তর শীতবাতাদির উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার গতি কখন আকাশে, বায়ুহিল্লোলে, কখন গৃহে, প্রান্তরে, সাগরে। যাঁহাতে এই সমস্ত অমানুষিক শক্তি সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তিনি কি কখন অপদেবতা হইতে পারেন? আবার নারী সমাজেও তিনি গৃহদেবীরূপে পূজিতা, তাঁহারা তাঁহার সম্মানার্থ প্রত্যেক গৃহদ্বারে জলপূর্ণ কুম্ভ সকল স্থাপন করে। যাজক আসিয়া মন্ত্রপূত করিয়া দিলে, ঐ জল, ভূত-ভয়, ব্যাধি-ভয়, সর্প-ভয় ও নানাবিধ আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করার মানসে এবং গৃহকে নিরাময় করিয়া বিদেশগামী স্বামী, পুত্র, ও বন্ধুবান্ধবদিগকে সত্বর ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত স্ব স্ব গৃহে ফিরাইয়া আনিবার কামনায়, এক এক বার গৃহে ও প্রাঙ্গণে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। মাঠে কৃষকেরাও তাঁহাকে ক্ষেত্রদেবতা জ্ঞানে পূজা করে। তাহারা অগ্রে অন্ন ব্যঞ্জন দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া না দিয়া কখন মুখে দিবে না। "None would even think of eating a morsel without first holding up his platter in the air and breathing out a prayer to the Nat. দেশে মহামারী উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে, নাত মহিষীর সম্মানার্থ পল্লী মধ্যে এক মহাভোজের আয়োজন হয়। সেই স্থানে লোকে মৃৎপাত্রের গায়ে ওলাদেবীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া, সূর্য্যাভিমুখে স্থাপন করে এবং যষ্টির আঘাতে তাহাকে ধীরে ধীরে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে, পৃথিবী যতই সান্ধ্য-অন্ধকারে ঢাকা পড়েন, গ্রাম্য লোক দলে দলে সমাগত হইয়া উচ্চধ্বনিতে ভয়বিঘ্নকারিণী ওলাদেবীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে ইহাতেও যদি কোন ফলোদয় না হয়, "কেয়াঙ্গ" গৃহ হইতে স্থশিষ্য পীতবসনপরিহিত "পুঙ্গী" আসিয়া শান্তি মন্ত্র পাঠ করেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারাও যদি

দেশ হইতে ভয় ভীতি চলিয়া না যায়, তবে গ্রামবাসীরা কিছুকালের তরে গ্রাম ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যায়। প্রত্যাগমনের সময় পুনঃ বিশেষরূপে নাত দেবতার অঙ্গরাগ করিয়া গৃহেপ্রবিষ্ট হয়।

কতকগুলি অসভ্য পাহাড়ী লোক, সম্যক্‌রূপে না হইলেও, কএকটি নিকৃষ্ট ভাব, অন্যায়রূপে এই নাত দেবের প্রতি আরোপ করে। এইটিই তাহাদের ভ্রম ও অসভ্যতার পরিচায়ক। তাহাদের সংস্কার, বহুরূপবিশিষ্ট নাত, পূর্ব্বে মানব ছিলেন, সংসার প্রলোভনে আত্মশুদ্ধিতা বিনষ্ট হইলে, এবং অপঘাত ও অস্বাভাবিক মৃত্যু দ্বারা আত্মার অধোগতি হইলে, তাহারা নাতরূপে পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয় এবং লোকের মনে নানাবিধ ভয় সঞ্চার করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে বিব্রত করে। আবার অন্য ভাবেও বলিয়া থাকে, ইহাঁরা পাপীর প্রাণে অনুক্ষণ শান্তিবারি সেচন করিয়া থাকেন, এবং "They leave their trembling worshippers in peace and quietness." ইহাই যদি সত্য হয়, তবে জীবের নিকৃষ্ট আত্মা লইয়া ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করা কি ভ্রম নহে? যিনি পূর্ণ, তাঁহার অপূর্ণ ভাব থাকা কিরূপে সম্ভবে? পাপী ভিন্ন ঈশ্বরকে কেহ কখন ভয় করে না; কিন্তু, কবে সকলে তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে?] যদি ভয়হারককে ভয় করিতে হয়, তবে নির্ভয় হইবে কাহার কাছে যাইয়া?

কেরল ও বন্যজাতিরা নাতের প্রীতির নিমিত্ত; তাঁহাকে মদ্য; মাংস, কঙ্কাল, তীর, ধনুক, ভল্ল, কুঠার প্রভৃতি দ্রব্য উপহার দিয়া থাকে। সমুদ্রগামী নাবিকগণও নাতের দ্রষ্টব্য স্থানে—জলযানগুলির পুরোভাগে, সপাত্র বরাহ ও ষাঁড় মাংস, বসা, রক্ত প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখে। হত্যাজীবী ব্যাধেরাও নির্জ্জন কান্তার ভূমেতে, পক্ষীপালক ও তণ্ডুলায় এই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দেয়। লোকের বিশ্বাস প্রকৃতিরূপিণী স্ত্রী-নাতেরা পুরুষ নাতের ছায়ানুবর্ত্তিনী। তাঁহারা কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য ভাবে বিচরণ করেন। এবং স্বামীর ভোজনের সময় নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্য দ্বারা তাঁহাদিগের মন পুলকিত করিবার চেষ্টা করেন। ইহারা দৃশ্য ভাবে লোককে নানাবিধ ভেঙ্কী তামাসা দেখাইয়া থাকেন; এবং অদৃশ্যভাবে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কখন কখন তাঁহারা লোকের ভাগ্যফল বলিয়া দেন, এবং দূরদেশগামী স্বামী, কবে গৃহের দিকে ফিরিবেন, বিরহিণীর কর্ণকুহরে স্বপ্নাবেশে তাহাও বলিয়া যান।

আমরা এক্ষণ নিখুঁত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এই দেশে যাজক সহবাসে বুদ্ধাশ্রয়ে বা দেবনিকেতনে (কেয়াঙ্গ-গৃহে) থাকাই ধর্ম্ম। এবং শাস্ত্রের পঞ্চাদেশ * উল্লঙ্ঘন করাই অধর্ম্ম। দেশবাসীরা সাধারণতঃ ত্রিমার্গী অর্থাৎ অপদেবতার উপাসক, জ্যোতিষ-

* পঞ্চাদেশ যথা,—(১) হিংসা, (২) পরস্বহরণ, (৩) পরদার-গমন; (৪) অসত্য ব্যবহার, (৫) মাদক দ্রব্য সেবন ও পরিহার।

শাস্ত্রানুগামী এবং ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে আস্থাবান্; কিন্তু বৌদ্ধদেবের ধর্ম্ম উপদেশ অন্যরূপ। তিনি বলেন, ঐ সমস্ত কিছুই নহে, কেবল কর্ম্মসূত্রই একমাত্র মানব-জীবনের পরিচালক। ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্তই কর্ম্মের আয়ত্ত। কর্ম্ম অভাবে সমস্তই মিথ্যা। কর্ম্মই সমস্তের প্রসূতি। নাত উপাসক ভিন্ন সমতলবাসী বৌদ্ধেরা মনে করে, জগতের সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যের ফল কর্ম্ম, ও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি, দুষ্কৃতি। তাহারা আরও বলিয়া থাকে কৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন কর্ম্মই মানব জীবনকে বার বার ষষ্ঠ দেবলোকে, ষোড়শ ব্রহ্মলোকে এবং অষ্ট নরকে পরিভ্রমণ করাইয়া থাকে। "নাগ-সেনা" বলেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চকাণ্ড গুলিও * নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং এক দীপ-শিখা হইতে অন্য দীপ প্রজ্বলিত করার ন্যায়, তখন জীব এক কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে চলিয়া যায়। কিন্তু এ হেন কর্ম্মবাদীকেও অভাব ও দুঃখের সময় আবার "ফ্রা কৈবা" (প্রভু কোথায়) বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে দেখা যায়। বুদ্ধদেব এই দেশে "ফ্রা" † নামে অভিহিত। কিন্তু এই কট্‌মট অপরিচিত নাম লইয়া আমরা বাঙ্গালী পাঠক সমীপে উপস্থিত হইব না। চিরপরিচিত বুদ্ধ নামেই তাঁহাকে ডাকিব। বুধ অর্থাৎ জ্ঞান হইতে বুদ্ধ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, বুদ্ধ অর্থে যিনি জ্ঞানময় তিনিই বুদ্ধ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিই বুদ্ধ, যিনি সর্ব্বসাক্ষী তিনিই বুদ্ধ। ঈশ্বরের এইসমস্ত গুণ আছে, কিন্তু মানবের নাই; সুতরাং মানব ঈশ্বর হইতে পারে না। কিন্তু, ঈশ্বর মানবেতে আছেন, অতএব ঈশ্বরকে মানবাকারে পূজা করিলে দোষ কি? ঈশ্বরকে মানব জ্ঞানে পূজা করাই মহাপাপ। মানব শরীরে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস ও তাহাতে তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করাতে হানি কি? হিন্দুর যিনি ইষ্টদেবতা, তাঁহাকে কি তাঁহারা পৃথিবীর মনুষ্য বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকেন? অবতারাদির মানবীয় দেহে, ঈশ্বরের প্রতিভা প্রকাশ পায়; লোকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদিগকে ভক্তি ও পূজা করে। বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট, চৈতন্য দেবকে, জগাই মাধাই প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ভগবৎ ভাবেই পূজা করিয়াছিলেন। পঙ্কিল মানবী ভাব, কখনও তাঁহারা তাঁহার প্রতি আরোপ করেন নাই।

এ স্থলে বুদ্ধদেবের জীবনী প্রদান করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমা হইতে অনেক কৃতী ব্যক্তি, সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু, যাঁহার উপাসনা এ দেশে এত বিস্তৃত, এবং আবাল বৃদ্ধ যাঁহার প্রতি সমান ভক্তিমান্, সেই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী এক জন প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছি এবং তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে তাঁহার চরিত্রের যেরূপ সমালোচন করিয়াছেন, প্রিয়দর্শন পাঠকবৃন্দকে এ স্থলে

* পঞ্চকাণ্ড যথা;—রূপ, সংস্কার, বেদনা প্রভৃতি।

† "ফ্রা",—এইস্থলে সমস্ত মঘীনাম ত্যাগ করিলাম।

তাহার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব। অসভ্য মঘ জাতির কল্পনা-শক্তি ও কাব্যানুরাগ দেখিয়া, আমরা মুগ্ধ হইয়াছি এবং ভাষান্তরিত করিবার সময়, সেই ভাব সম্যক্‌রূপে বজায় রাখিতে পারি নাই বলিয়া, ক্ষুব্ধ হইতেছি।

বাসন্তী পূর্ণিমা। নিরভ্র আকাশ। নির্ম্মল নীলোজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী-প্রাচীর ললাট-ফলকে রজতের টিপ কাটিয়া, পূর্ণেন্দুর বিমল জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে ফুটিয়া ফুটিয়া, দিগ্‌বলয় আলোকিত করিতেছে। নিম্ন জগৎ, কৌমুদীময়, হাস্যময়, প্রফুল্লতাময়, প্রকৃতির প্রতিনিভৃত-কক্ষ, প্রতিকুঞ্জ-কানন, প্রতিবৃক্ষ-বাটিকা, চন্দ্রমার শীতল কর-স্পর্শে ক্রমে ক্রমে উদ্ভাসিত, উন্মেষিত, উজ্জ্বলীকৃত, যেন হাসির তরল উচ্ছ্বাসে সমগ্র বিশ্ব সংসার বিমোহিত। প্রকৃতির এ হেন সুখৈশ্বর্য্য সময়, ফুটন্ত জ্যোৎস্নালোকে, শাক্যরাজ শুদ্ধোধন-মহিলা মায়াদেবী, অবতাররূপী ভগবান্ বুদ্ধকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন। নব-প্রসূত কুমারের ভাস্কর-জ্যোতিতে সূতিকাগার আলোকিত হইল। মহানগরী কপিল-বাস্তুর অনন্ত সৌধমালা আনন্দ ধ্বনিতে বিকম্পিত হইল।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে, পবিত্রক্ষেত্র বারাণসীর ৫০ ক্রোশ উত্তরে, রাজপাট কপিল-বাস্তুর রাজ-প্রাসাদে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। মাতা মায়াদেবী ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অপুত্রক ছিলেন। বধিগত * নামে এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বুদ্ধজীবনে প্রবিষ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষায়, শ্বেত-হস্তীরূপে মায়া-গর্ভে প্রবিষ্ট হন। গর্ভমধ্যে তিনি "শুক্তি মধ্যগত শ্বেতসূত্রের" ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জাতিস্মর হইয়া ভূমিষ্ঠ হন, এবং জন্মমাত্র সপ্তপদ গমন করেন। তাঁহার প্রতিপদ-বিক্ষেপে এক একটি প্রস্ফুটিত উৎপল উৎপন্ন হইল। মহাকাশে দেবগণ স্তুতিগান আরম্ভ করিলেন; এবং নভোমণ্ডল হইতে অজস্রধারে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। আসমুদ্র পৃথিবী, কুমারের জন্ম-উৎসব-আনন্দে মাতিয়া গেল। প্রাণী জগৎ যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, সাধনাব্রত অবলম্বন করিল।

পঞ্চম দিবসে সিদ্ধকামী বুদ্ধদেব, সিদ্ধার্থ নাম পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু, গার্হস্থ্য নাম গোতমই রহিল। এক সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্‌বাণী,—বার্দ্ধক্যের জীর্ণবেশ, মৃত্যুর শোচনীয় অবস্থা, পীড়ার অসহনীয় যন্ত্রণা, জীবনের অনিত্যতা, এই দুঃখ চতুষ্টয়ের পরিণাম দর্শন করিয়া, যৌবন-সমাগমে সিদ্ধার্থ সংসার বাসনা পরিত্যাগ করতঃ চলিয়া যাইবেন। বংশের একমাত্র গৌরব-রবি সিদ্ধার্থের এই ভাবী অমঙ্গল সূচনায় ভীত হইয়া, রাজা শুদ্ধোধন উপরোক্ত দুঃখাবহ দৃশ্য যেন পুত্রের চক্ষুর অন্তরালে থাকে, অনুক্ষণ তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহিষী মায়াদেবী পুত্র-প্রসবের সপ্তম দিবসে, নিয়তির আদেশানুসারে, অঞ্চলের ধন সিদ্ধার্থকে অঙ্ক হইতে ধরাপৃষ্ঠে রাখিয়া, মায়া কাটাইয়া সূতিকাগার হইতে চলিয়া

* সমস্ত মঘীনাম আমরা পরিহার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

গেলেন। মহাপজবতী নামে তাঁহার একটি সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি শিশুর মাতৃস্থানে বসিয়া, অতি যত্নের সহিত, সিদ্ধার্থকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারই অঙ্কে পরিবর্দ্ধিত কুমার, ক্রমে ক্রমে শৈশব, বাল্য, কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনের প্রথম সীমায় উপনীত হইলেন। পুত্রকে গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট করাইবার মানসে ও সিদ্ধ পুরুষের বাক্য ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, রাজা শুদ্ধোদন কোন দেশাধিপতি দণ্ডপাণীর সর্ব্বললামভূতা ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্না কন্যা যশোদার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দিলেন। কিন্তু, উদ্দামযৌবনের প্রবল তাড়নে নিপীড়িত হইয়া, এহেন সাধ্বী সতী প্রণয়িনীর প্রণয়-পাশকে অনাদর ও অবজ্ঞাদ্বারা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। পতি পত্নীর পবিত্র সম্মিলনে সংসার যে সুখনিকেতন হইতে পারে, এই ধারণা তাঁহার তৎকালিক কলুষিত চিত্তে স্থান পায় নাই। তিনি ৪০০০ সহস্র বারবিলাসিনী ও নর্ত্তকীর কৃত্রিম প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, কর্ণবিহীন তরণীর ন্যায় সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। এইরূপ ভোগবিলাসে ২৯ বৎসর কাটিয়া গেল।

এক মুহূর্ত্তের ঘটনাতে সমস্ত জগৎ উলটপালট হইয়া যাইতে পারে। যিনি ভবিষ্যতে আদর্শপুরুষ হইবেন, তাঁহার এইরূপ দুর্গতি ঈশ্বরের চক্ষে আর ভাল লাগিল না। একদিন সিদ্ধার্থ শকটারোহণে নগর ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন, সঙ্গে অনুচর ও সহচরবৃন্দ। যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক অশীতিপর বৃদ্ধ, নিতান্ত কাঙ্গালের বেশে যষ্টির সাহায্যে অতি মন্থরগতিতে পথ বহিয়া চলিয়াছে, তাহার জীর্ণশীর্ণ দেহ, পত্রকম্পনের ন্যায়, কাঁপিতেছে; এবং এতই দুর্ব্বল যে, বোধ হইতেছে, প্রতিপাদক্ষেপেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বৃদ্ধের এইরূপ দীনতা দর্শনে, রাজপুত্রের চক্ষে চমক লাগিল। শকটচালককে বলিলেন, ইহা কি বৃদ্ধের বংশগত দোষ, না সমস্ত জীবেরই এইরূপ পরিণতি? চাতুরিক বিনীতভাবে রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল,— যুবরাজ, বৃদ্ধের বার্দ্ধক্য তাহাকে এরূপ হীনাবস্থায় নিপতিত করিয়াছে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্ম নহে। পৃথিবীর জীব মাত্রেরই এরূপ অবস্থা; পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকলেই এই বার্দ্ধক্যদশার অনুবর্ত্তী; ইহাই জীবের নিয়তি, এবং ইহাই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

আর এক দিবস, যুবরাজ দক্ষিণ দ্বার দিয়া পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, পথে এক ব্যক্তি আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় বসিয়া কাঁদিতেছে; যুবরাজ আবার সারথিকে বলিলেন, মানবগণ কি এতই অজ্ঞ, দুর্ব্বল ও বাতুল যে, তাহারা জীবনের পরিণাম কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না? হায়! অস্থায়ি যৌবনমদে মত্ত হইয়া মানবগণ কি দুর্গতিই না ভোগ করে! চক্ষু ফিরাইবামাত্র অন্য দিকে দেখিলেন, একটি শবদেহ পতিত রহিয়াছে,—শরীরের দেহ কান্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নব-দ্বার দিয়া অসংখ্য কৃমিকীট নির্গত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া,

শকটচালককে আবার বলিলেন, অশ্বকে সত্বর গৃহাভিমুখে পরিচালন কর, আর আমি এরূপ বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিতে পারিতেছি-না।—উহঃ! কি ভয়াবহ দৃশ্য! এই ক্ষণস্থায়ি জীবনের এত অহঙ্কার, এত গর্ব্ব কিসের জন্য? যাহার সমস্তই বার্দ্ধক্যে বিনষ্ট হইয়া যায়, পীড়াতে শ্রীভ্রষ্ট হয়, দুঃখ-কষ্টের আধার হইয়া আজীবন নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে, এইরূপ ধ্বংসশীল দেহের প্রয়োজন কি? জীবনের নশ্বরতার প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল, হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি গৃহাশ্রমের যন্ত্রণা ও সন্ন্যাসাশ্রমের মহিমা বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন,—ঐশ্বর্য্যের উচ্চাসনে বসিয়া লোক কখন অবিনাশি সুখের মুখ দেখিতে পায় না; ভোগ্য বস্তু সম্মুখে রাখিয়া, লোকে কখন বাসনাকে অতৃপ্ত রাখিতে পারে না; ধর্ম্মের পবিত্রক্ষেত্রে যাইতে হইলে, অগ্রে সমস্ত অকিঞ্চিৎকর সুখ-লিপ্সাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। বিষয়াশক্তি কখন ধর্ম্ম উপার্জ্জনের অনুকূল সামগ্রী নহে; এবং অভাবে না পড়িলে, ভোগ ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় না। যে ভাব, যে বেদনা, অনুক্ষণ কাঙ্গালের হৃদয়ে খেলিতে থাকে, তাহা জানিতে হইলে অগ্রে আপনাকেও তদাবস্থাপন্ন করিয়া লইতে হইবে; এবং তাহার যে অসীম সহিষ্ণুতা গুণ আছে, তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। চির-দরিদ্র আপনার অভাব বুঝিয়া যেমন ক্লিষ্ট হয়, পরের অভাব দেখিয়াও তাহার প্রাণ কাঁদে। সে যেমন কখন জগতের সহানুভূতি প্রত্যাশা করে না, তদবস্থাপন্ন অপরের দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করিতে না পারিয়া, অশ্রু সম্বরণও করিতে পারে না। লোকের হীনাবস্থা দর্শনে ধন-গর্ব্বিত পামরের অন্তর কখন দ্রবীভূত হয় না। দরিদ্রকে ভালবাসে সংসারে এরূপ লোক অতি বিরল। অনাদরের অন্তর্যাতনা যে কত, সে নিজের অবস্থা দেখিয়া যেরূপ বুঝিতে পারে, অপরে কখন সেইরূপ পারে না। সমশ্রেণীর লোকেই সমবেদনা অনুভব করিতে পারে। সুতরাং, তদবস্থাপন্ন লোককে দেখিলে, তাহার হৃদয় ব্যথিত হয়, এবং তাহার প্রতি তাহার প্রাণের ভালবাসা স্বতঃই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

সিদ্ধার্থের হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক স্ফুরিত হইয়াছে। তিনি তৎসাহায্যে মানবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিলেন। জ্ঞান, সমস্ত জগৎকে আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করে। সিদ্ধার্থ বুঝিলেন, ধনগর্ব্বিত ব্যক্তিরা কখনও পর্ণকুটীরবাসীর অভাব বুঝিতে পারে না। তাহা বুঝিতে হইলে, আপনাকে অগ্রে সেই পথের পথিক হইতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ, যখন জগতে কাহারও ভাগ্যে ঘটে না; এবং প্রকৃতির বিধানানুসারে কখন ঘটিতেও পারে না; তখন পার্থিব ধন সম্পত্তিকে তাহার মূলীভূত জ্ঞান করিয়া, আস্ফালন করা কি অজ্ঞতার পরিচয় নহে? সুখ পাইবার আশায়, যাহারা অনুক্ষণ সুখ সুখ করিয়া বেড়ায়,

মরিচীকাভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, তাহারা কখন সুখের মুখ দেখিতে পায় না।

এইসকল চিন্তা লইয়া সিদ্ধার্থ গৃহাভিমুখী হইয়াছেন এমন সময় দেখিলেন,— বাটীর পুরঃদ্বারে এক সৌম্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাঁহার শরীরের চর্ম্ম শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে; ললাটে চিন্তারেখা, মস্তক কেশশূন্য ও মসৃণ। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! বাল্য যৌবনকে ডাকিতেছে,—যৌবন বার্দ্ধক্যে পরিণত হইহইতেছে,—বার্দ্ধক্য, রোগশোককে আকর্ষণ করিয়া, যত্ন-রক্ষিত শরীরের সকল শ্রী বিনষ্ট করিতেছে। আবার জলবুদ্বুদের ন্যায়, এই সমস্ত কালের করাল আস্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। যে স্থানে ভৌতিক দেহের এত পরিবর্ত্তন, সেই স্থান কখন নিরাপদ হইতে পারে না। যদি চিরদিনের নিমিত্ত, এই সমস্তকে নিগ্রহ করা যাইতে পারে। তবে জীব, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি প্রভৃতি দুর্ব্বিনীতের হস্ত হইতে, চির-শান্তি লাভ করিতে পারে। শরীরধারী মানবের মৃত্যুভয়, কেবল জন্ম হয় বলিয়া। এইজন্য পরিহারের চেষ্টাই মানবের প্রধান লক্ষ্য। সত্য বটে জীবজগৎ কখন মৃত্যুভয় এড়াইতে পারে না। কিন্তু, সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে, আত্মসংযম দ্বারা মানবগণ সম্যকরূপে, তাহা হইতে নির্ভয় হইতে পারে। অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্তই তাহাদিগকে বার বার এই বহুরূপীবেশ পরিগ্রহ করিতে হয়। সিদ্ধার্থ দেখিলেন, বৃদ্ধের স্থবির অবস্থা শুধু বয়সের পরিচায়ক নহে; তিনি একজন প্রাজ্ঞ বহুদর্শী সন্ন্যাসী। তাঁহার অন্তরে চির-শান্তি বিরাজমান। সংসারের মায়া-বন্ধনী ছিন্ন করিয়া, মানবগণকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইবার নিমিত্ত, তিনি যেন বর্ত্তিকা হস্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সন্ন্যাসী অধিক কিছু বলিলেন না;—কেবল "পথ দেখ" বলিয়াই পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সিদ্ধার্থের হৃদয় আরও উদ্বেলিত হইল। বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র শুনিতে পাইলেন, যশোদারা এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন। পুত্রের অমিয়মাখা মুখচ্ছবি দর্শন করা, গৃহস্থ লোকের সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু কুমারের জন্মবার্ত্তায় সিদ্ধার্থের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিকল করিল। তিনি নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, হায়! যতই আমি পাশমুক্ত হইবার কল্পনা করিতেছি, ততই আমার বন্ধনীর উপর বন্ধনী পড়িতেছে। সংসারের চক্রব্যূহ হইতে কি কখন নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না?

পুত্রের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া, রাজা শুদ্ধোদন, পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানী পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী অনুক্ষণ জাগিতেছিল, তিনি সিদ্ধার্থের গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত, এক দূরদর্শী পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানে সিদ্ধার্থের বিষয়বুদ্ধি আরও মলিন হইয়া পড়িল। পরিস্ফুট জ্ঞান যাঁহাকে বৈরাগ্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, এবং যিনি আত্মতত্ত্ব বুঝিয়া সংসারের

নশ্বরতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সামান্যবুদ্ধি শিক্ষকের গণ্ডুষ প্রমাণ উপদেশবারি প্রদানে, তাহার আকণ্ঠ-শুষ্ক পিপাসার শান্তি হইবে কিরূপে? সিদ্ধার্থের বিশ্বপ্লাবী ধর্ম্ম ভাব, শিক্ষকের সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞানকে ভাসাইয়া চলিল। তাঁহার সমস্ত যত্ন বিফল হইল। তাঁহার সমস্ত শ্রম সেই বৃদ্ধের 'পথ দেখ' এই একটি কথাতে পণ্ড হইয়া গেল।

গম্ভীরা রজনী, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, নিশ্চল ও নিষ্প্রভ। সিদ্ধার্থ চিন্তা-উদ্বেলিত হৃদয় লইয়া, আপন কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। দীপাধারের দীপ জ্বলিতে ছিল; তিনি বর্ত্তিকা আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। নিদ্রিতা যশোদারার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া, জন্মের মত পুত্র ও পত্নীকে দেখিয়া লইলেন। পরে চিত্তের শান্তির নিমিত্ত, একবার প্রণয়িনীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। কিন্তু, চক্ষুপল্ল সংযুক্ত হইল না। চিত্তের অসংযত অবস্থায়, চক্ষে কখনও নিদ্রার আবেশ হয় না। সিদ্ধার্থ শয্যা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মুক্ত গবাক্ষ দ্বার দিয়া, গ্রহ-নক্ষত্র খচিত নীলাকাশের প্রতি, একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার মাতার বক্ষঃ-সুশোভন পুত্রের বিমল মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিলেন। জায়া যশোদারা তখন সুষুপ্তা। সিদ্ধার্থ পুত্রস্নেহে আকৃষ্ট হইলেন না, পত্নীর প্রেমকে গ্রাহ্য করিলেন না। সংসারের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি সংসারের সমস্ত বন্ধনী ছিন্ন করিতে যাইতেছিলেন। মুক্ত বাসনা যাঁহাকে ঊর্দ্ধ দিকে পরিচালন করিতেছিল, তিনি সংসার লইয়া কি করিবেন? রজনীর মধ্যযাম অতীত প্রায়; এহেন সময়, তিনি নিঃশব্দে পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে, কঠোর তাপসাশ্রমে ছয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘ প্রবাস-যাত্রায় লোকে বুঝিল,তাঁহার মৃত্যু সংঘটন হইয়াছে। কিন্তু, তিনি বহুবিধ জীবন-সংগ্রামের পর, আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন, সন্ন্যাসাশ্রমও ত সত্য অন্বেষণের সুগম পথ নহে। কিছু দিন সংসারে থাকিয়া, আবার তাঁহার তৎপ্রতি বিরাগ জন্মিল। দেখিলেন,সংসারে আকাঙ্ক্ষার পর আকাঙ্ক্ষা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে নিরন্তর নিরয়গামী করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতিপুঞ্জের শোভা সন্দর্শন করিয়া, হৃদয়কে বলীয়ান্ করিবার মানসে আবার তিনি ভিক্ষাপাত্র লইয়া দেশ পর্য্যটনে নির্গত হইলেন। নানা স্থান পর্য্যটন করিলে, বহু লোকের সহবাসে থাকিয়া, লোকের বৈষয়িক বিষয়ে ভালরূপ প্রাজ্ঞতা জন্মে; কিন্তু বুদ্ধদেবের বিষয়বাসনা স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহার উন্নত মন, উন্নত চিন্তা, সর্ব্বদা তাঁহাকে ঊর্দ্ধ দিকে পরিচালন করিতেছিল, তিনি ভাবিলেন, মার্জ্জিত জ্ঞান না জন্মিলে,কখন মানবের চিত্তাকাশ পরিষ্কৃত হয় না। সেই অন্বেষণ-ব্রত উদ্যাপন বাসনায়, তিনি অগম্য বহুবিধ বিজন কান্তার পরিভ্রমণ করিয়া,"বেস্থনী" নগরীতে উপনীত হইলেন। এ স্থানে,এক প্রধান

ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, কিছুকাল অধ্যয়নে রত হইলেন। পরে রাজ-গেহে যাইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নতমনা উদ্ধক ঋষির শিষ্য হইলেন। কিন্তু, যাঁহার অন্তর্চক্ষু জাগরিত হইয়াছে, যাঁহার দৃষ্টিশক্তি পার্থিব ছাড়িয়া অপার্থিবের সীমা দেখিয়াছে, প্রব্রজ্যার এই সামান্য শিক্ষাতে তাঁহার তৃষিত প্রাণ শীতল হইবে কিরূপে? তিনি গুর্ব্বাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, আপনাকে আপনি প্রবুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এই অবস্থায় ৪৫ বৎসর কাটিয়া গেল। নানা স্থানে সঙ্গত-সমিতি সংঘটন করিয়া, অনেককে তাঁহার স্বমতে আকর্ষণ করিলেন। আনন্দ, দেবদত্ত, উপালী, অমুরুদ্র, ইহারা তাঁহার প্রধান শিষ্য হইল। ভক্তিপ্রাণ শিষ্যেরা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তিনি জগতে পবিত্র ধর্ম্ম-জীবনের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া, অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর যোগ-সাধনের শেষ পুরস্কার, নির্ব্বাণ-পদ লাভ করিলেন।

মন্দিরের উপাসনা।—স্ত্রী পুরুষ সকলেই অবনত মস্তকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। স্ত্রীরা পদদ্বয় বস্ত্রাবৃত করিয়া ও পুরুষেরা জানু পাতিয়া, বেদিকা সম্মুখে উপবিষ্ট হয়। দেবালয়ে কাহারও পাদুকা ব্যবহারের নিয়ম নাই। উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে, বার-ত্রয় ও অন্তে একবার উপাসকবৃন্দকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে হয়। মন্দির হইতে নিস্ক্রান্ত হইবার সময়, সকলে দক্ষিণাস্য হইয়া বহির্গমন করে। রিক্তহস্তে দেব-দর্শনে যাইতে নাই, এই নিমিত্ত, ধ্বজা ও পুষ্প লইয়া সকলে মন্দিরে সমাগত হয়। প্রতিগমন কালে, এই সমস্ত দ্রব্যাদি দেব-সম্মুখে রাখিয়া, তিনবার ঘণ্টাধ্বনি করিয়া যাইবার নিয়ম। এই ঘণ্টা "সাক্ষী ঘণ্টা" নামে অভিহিত। কিন্তু, কোন পুণ্য কার্য্য করিলে, তাহার সাক্ষী রাখা যেন যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উক্তি,—পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করার ন্যায়, যন্ত্রণাদায়ক কার্য্য আর নাই; তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তে, প্রাণপণ চেষ্টা করাই জীবনের প্রধান কার্য্য। নিবাণ (নির্ব্বাণ) হইলে, সমস্ত বাসনার শান্তি হয়; সুতরাং ভোগলিপ্সা বিবর্জ্জিত হইয়া, মুক্তআত্মার অনুসরণ করাই মানবের মানবত্ব। বৌদ্ধদেব কামনা বিরহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাতে কোন মানুষের ভাব ছিল না, সুতরাং তিনি বিমুক্ত ছিলেন। ভক্তেরা তাঁহাকে ভক্তির উচ্চাসনে সংস্থাপিত করিয়া, এখন প্রার্থনা মন্দিরে গলদশ্রুনয়নে বলিয়া থাকেন,—

"বৌদ্ধই আমার আশ্রয় স্থান, তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা আমার পালনীয়, তাঁহার সহবাস চিন্তাই, আমার মুক্তির সোপান।"

আরও বলিয়া থাকেন, "হে বুদ্ধদেব! তুমি জীবের দুঃখ-কষ্ট প্রশমিতা। আমি, আমার শরীর, মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সহিত, তোমার নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি। আমি

বার বার তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি মানবের দুষ্প্রাপ্য, তোমার নিয়মাবলী দুষ্প্রাপ্য, এব তোমার সংবাদ বন্টনা করা দুষ্প্রাপ্য, আমি বিনয়ের সহিত, সাগ্রহে ও সসম্মানে, যুক্তকরে তোমার প্রতিকৃতির সম্মুখে এই উপহার প্রদান করিতেছি। ভক্তিসহকারে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি,—তোমার উপাসনা দ্বারা আমার জ্ঞান-সূর্য্য সমুজ্জল হউক, আত্মা বিশুদ্ধি লাভ করুক, এবং নামকীর্ত্তনে প্রীতি উৎপাদিত হউক। বাঞ্চাবল্পতরো! তুমি আমার আত্মাকে পাপ-চতুষ্টয় হইতে বিমুক্ত কর। মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং অনশন,এই কষ্টত্রয় হইতে সর্ব্বদা রক্ষা কর। আমার হৃদয়ে বল প্রদান কর, যেন আমি শত্রু পক্ষ ও নরকের অষ্ট দ্বার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি।"

বুদ্ধদেব ধর্ম্ম ও জ্ঞানকে এরূপে বিভক্ত করিয়াছেন,—মন্দিরাভ্যন্তরের নিয়মাবলী প্রতিপালন পূর্ব্বক, আত্মজ্ঞান লাভ করাই ধর্ম্ম, ও দিবসের প্রতি মুহূর্ত্তে, জীবনের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া, পদক্ষেপ করাই জ্ঞান। অপিচ,—

"আঁধার প্রকৃতি গর্ভ কর আলোকিত,
পুষ্পিত উদ্যানে জল করহ সিঞ্চন;
নিবিয়া যাইতে দীপ কর উজ্জ্বলিত,
জ্ঞানের ত্রিমার্গে সদা কর বিচরণ।"

জ্ঞান, ধর্ম্মের পথ প্রদর্শক; ধর্ম্ম, মুক্তির সোপান; এবং মুক্তিই মানবজীবনের পরমগতি। স্রষ্টা নাই, এই কথা বুদ্ধদেব কোন স্থানে বলেন নাই। তিনি প্রকৃতি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার শক্তিকেও মানিয়া চলিতেন। ইহাতে নাস্তিকতার ভাব কিছু আছে কি? যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, যিনি ঈশ্বর ও আপনাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিতে শিখিয়াছেন, তাহার স্রষ্টা ও সৃষ্ট, এই জ্ঞান থাকার প্রয়োজন কি? ইহাকে কেন বলিব "Denial of creator?" এই দেশে উপাসনার একটি প্রধান উপকরণ ধ্বজা। দেব মন্দিরে যাইতে হইলে একটি ধ্বজা হস্তে লইয়া যাইতে হয়। উপাসনা ধ্বজা, একখণ্ড মসৃণ কাগজমাত্র; নানাবিধ জীব জন্তুর আকারে আকারিত। ইহার চতুষ্পার্শ্ব সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট, মধ্যস্থানে নীতিমালা লিখিত। এই ধ্বজার অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের ন্যায়,হাটে বাজারে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে; ধ্বজায় লিখিত নীতি-কথার নমুনা একটু পাঠকবৃন্দকে দেখাইব।—

"দেব উদ্দেশে যিনি মন্দিরে এই ধ্বজা দান করিবেন, তাঁহার হৃদয় বলিষ্ঠ হইবে। দাতার সন্তান সন্ততির মধ্যে, যাহার জন্ম বুধবাসরে, এই ধ্বজাদানের অনুবলে সে সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর ও মানবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে। শুক্রবার জাত শিশুর নির্ব্বাণপথ অনুক্ষণ পরিষ্কৃত থাকিবে। সোম-জাত হইলে, সংসারের ত্রিপাপ ও রোগ শোক হইতে বিমুক্তি লাভ করিবে। মহর্ষি গোতম এক জন উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার উপদেশ সমস্ত সুনীতি সম্পন্ন। একদিন রাজা বিম্বেশ্বর, কথাপ্রসঙ্গে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— আপনি কে? এবং

আপনার অনুপস্থিতি দ্বারা সম্প্রতি কোন্ স্থানকে ক্লিষ্ট করিতেছেন, আপনি কি ঈশ্বরের প্রতিরূপ? না নাগা, না শক্র; অথবা মানবরূপী কোন ভৌতিক পদার্থের প্রতিকৃতি?” বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি বুদ্ধদেব ধীরভাবে বলিলেন,—“মহারাজ! আমি, ঈশ্বর কি কোন ভৌতিক পদার্থ নহি। সামান্য মানবরূপে আমার জন্ম। শান্তির বিমল জ্যোতিঃ দেখিতে পাইব, এই আশায় যোগাশ্রমের অনন্তসুলভ নিয়মাবলী শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি শিষ্যমণ্ডলীকেও উপদেশ করিতেন, স্রষ্টা ও পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করাই ধর্ম্ম। এবং,—

(১) সংসারে বাঁচিয়া থাকাই কষ্ট।

(২) বাসনাই সমস্ত দুঃখের মূল।

(৩) ধর্ম্মের অষ্টমার্গই শান্তির সুখনিকেতন।

(৪) বাসনার নিবৃত্তিই দুঃখের চির-অবসান।

(৫) আত্ম নির্ভরতাই মানবের চরম সুখ।

তিনি আরও বলিতেন, “পরিত্রাতা একজন আছেন। তিনি জীবলোককে ত্রাণ করিবার নিমিত্ত, অনুক্ষণ তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন।” এ স্থলে, তাঁহার স্তুতি গানের নমুনা একটি প্রদান করিলে, পাঠক আরও ভালরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিবেন;—

“জরা মৃত্যু ভয় শূন্য নিত্য সত্যময়,
আদি নাই, অন্ত নাই, সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা।
জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ভয় পরিত্রাতা,
যুগ যুগান্তর হ'তে সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা।”

ইহাতে নাস্তিকতার ভাব কিছু আছে কি?

শ্বেত হস্তী।—এই দেশে রাজাদিগের শ্বেত হস্তী রাখা একটি মহা গৌরবেববিষয়। প্রবাদ,—দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, জলরূপ পরিগ্রহ করিয়া, ঐরাবতী নামে এই দেশকে পূত করিয়াছেন। এই বিশ্বাস শুধু বৈদেশিক উপনিবেশিকদিগের। কিন্তু, বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরা বলিয়া থাকেন, মহর্ষি গৌতমের শেষ জীবনে, শ্বেতহস্তীরূপে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম নানাবিধ বিপ্লবে পড়িয়াও বিনষ্ট হয় নাই। এই নিমিত্ত, তাঁহারা শ্বেত হস্তীকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। মহানগরী মেণ্ডেলেশ্বরের একটি শ্বেত হস্তী ছিল। উহার শিশু অবস্থায়, উহাকে এক জন উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোক, স্বীয় স্তন্য পান করাইত। এই হস্তীটির একশত শরীররক্ষক অনুচর ছিল। ত্রিশ জন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী অনুক্ষণ উহার পরিচর্য্যা করিত। মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রী, স্বয়ং ইহাদের মধ্যে থাকিয়া, কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। হস্তীটি নিত্য চুয়া চন্দনাক্ত জলে স্নাত হইত। উহার ব্যবহৃত পাত্রাদি মূল্যবান্ ব্রহ্ম স্বর্ণে নির্ম্মিত ছিল। তাহার তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত, নিয়ত রাজ নর্ত্তকিগণ নৃত্য করিত, এবং চক্ষে নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত, সুগায়কগণ মধুরকণ্ঠে স্তুতিগান করিত। মহিষী সমভিব্যাহারে স্বয়ং রাজা অতি সম্মানের সহিত, তাহাকে অভিবাদন করিতেন। হস্তীরাজ যখন বায়ু সেবনে নির্গত হইতেন, তখন রাজপথ সুবাসিত কেঁয়াজলে সিক্ত হইত, এবং স্বর্ণ ও মণি মুক্তা খচিত অস্তপত্র তাহার বিভূষিত মস্তকোপরি সূর্য্যালোকে ঝলমল করিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সোনার কৌটা।

(ইতিবৃত্তমূলক ক্ষুদ্র উপন্যাস)।

অনেক দিন হইল, এক দিন রাজপুতানার ভিয়সর দুর্গের অনতি দূরবর্ত্তী দেবাদিদেবের মন্দিরের উচ্চ চূড়ায়, মিবারের "পঞ্চরত্নের" পতাকা, প্রভাত সমীর স্পর্শে দুলিতেছিল। অদূরে চম্বলনদ, বেত্রাবতী নদীকে বক্ষে ধারণ করিয়া, উন্মত্ত প্রেমিকের ন্যায় ঘোর গর্জ্জনে ধাবিত হইতে ছিল। অকস্মাৎ মন্দির সম্মুখে বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ও দুইখানি শিবিকা আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের সম্মুখে চিতোরাধিপতি রাণা রায়মল্ল, তেজস্বী কৃষ্ণ বর্ণের অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, ও তাঁহার পশ্চাতে শিবিকাদ্বয় হইতে রাজমহিষী দেবযানী ও রাজা রায়মল্লের ভ্রাতৃ তনয়া ইন্দুমতী, শিবিকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। মন্দিরের প্রহরিগণ দৌড়িয়া আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিল। তাহাদের মধ্যে একজন তরুণ বয়স্ক প্রহরী, অগ্রসর হইয়া, রাণার চরণ স্পর্শ করিয়া, তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল, ও শিবিকার নিকটে গিয়া, রাজমহিষী দেবযানী ও রাজকুমারী ইন্দুমতীর চরণ স্পর্শ করিয়া, করযোড়ে যেন, কোন আদেশ লাভের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। রাণা বালকের সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ, আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে কিছু না বলিয়া, দেবযানী ও ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অপরাহ্ণে মন্দির হইতে প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইল। রাণা রায়মল্ল বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, প্রহরী-বালক পূর্ব্ববৎ করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। রাণা আবার তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমাকে যেন পূর্ব্বে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি, ঠিক মনে হ'চ্ছে না। তুমি কত দিন থেকে এ মন্দিরে আছ?'

বালক উত্তর করিল, "পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, এখানে এসেছিলেম। আমার বয়স তখন, দশ বৎসর মাত্র।"

"এখানে তোমার কেহ আত্মীয় আছে?"

"এখানকার প্রহরিগণ প্রায় সকলেই উচ্চ বংশসম্ভূত রাজপুত। আমি অতি নীচ জাতীয় ক্ষত্রিয়;—জাতিতে সোহাগি। আমি ইহাদের সকলকে যথাসাধ্য পরিচর্য্যা ক'রে থাকি, ইহাঁরাও স্নেহ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করেন।"

রায়মল্ল সোহাগি-বালকের আরক্ত চক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুমি এত

অল্প বয়সে মাদক দ্রব্য সেবন কর কেন? তোমার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে, ও তোমার কথা শুনে, আমার মনে বিশ্বাস হ'য়েছে, তুমি অমিত মাত্রায় অহিফেণ সেবন কর।"

সোহাগি-বালক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল "দেব! আপনার অনুমান সত্য। আমি এই বয়সেই অমিত মাত্রায় অহিফেণ সেবন করি।"

রায়মল্ল বলিলেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অহিফেণ সেবন পরিত্যাগ কর। আর যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে আমার সৈনিক শ্রেণীভুক্ত ক'রতে ইচ্ছা করি।"

সোহাগি-বালক, মুখ অবনত করিয়া, করযোড়ে উত্তর করিল "মহারাণা! সোহাগি-বালকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আপনার এই দুইটি আদেশ প্রতিপালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব!"

"কেন?"

সোহাগি-বালকের বলিষ্ঠ দেহ যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল। তাহার আরক্তিম বিশাল লোচনযুগল যেন, অধিকতর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। সে উত্তর করিল, "মহারাণা! আমার পিতার একটু সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি সেই সামান্য ভূখণ্ড ল'য়ে স্বাধীনতার সুখভোগে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। অকস্মাৎ একদিন সেই ভূমিখণ্ড মালবের যবনরাজ গিয়াস উদ্দিনের হস্তগত হ'ল। পিতা মনের দুঃখে অজ্ঞাত বাসে চ'লে গেলেন। আমিও সেইদিন অবধি দেব ভবানীপতির প্রহরিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'লেম। সেইদিন অবধি মনের দুঃখ ভুলবার জন্য প্রচুর পরিমাণে অহিফেণ সেবন করতে লাগলেম। সেইদিন অবধি প্রতিজ্ঞা করলেম, যতদিন পিতার ভূসম্পত্তি যবনের কবলচ্যুত না হয়, ততদিন অনাদিদেবের পদতলে ধূলায় লুণ্ঠন ক'রে জীবনশেষ করব। মহারাণা! অহিফেণ সেবন পরিত্যাগ করলে, মনের দুঃখে আমাকে আত্মহত্যা বিধান করতে হবে।"

রায়মল্ল বলিলেন "তুমি কোন সময়ে অবকাশ মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি এখন চললেম।"

সোহাগি যুবক করযোড়ে বলিল "অনুমতি করেন তো আমি ভিয়সর দুর্গ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে যাই।"

রাণা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি ভিয়সর দুর্গে যাব না। অপর পথ অবলম্বন ক'রে চিতোরে ফিরে যাব।" সোহাগি যুবক বলিল "দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি বিস্মৃত হ'য়ে ছিলেম যে, ভিয়সর হরবতী রাজবংশের পুরাতন দুর্গ, আর চিতোরের রাজবংশের সঙ্গে হরবতী রাজপুরুষগণ কিছুদিন হ'তে বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন।" রাণা বলিলেন,— "যদি আবার কখনও চিতোরের সঙ্গে হরবতী রাজবংশের পূর্ব্ব সৌহার্দ্য সংস্থাপিত হয়, তবে আবার রাজপুতগৌরব ভিয়সর দুর্গে পদার্পণ করব।"

কল্লোল-বিধূনিত পার্ব্বত্য প্রদেশে, বীরবালকের মধুর বাণী, ইন্দুমতীর অন্তর মধ্যে যেন কোন্ বিগত দিনের,—কোন্ পূর্ব্ব জন্মের,—সুখ-স্বপ্নের অস্ফুট স্মৃতি জাগাইয়া দিল। ইন্দুমতী একবার যুবার মুখের দিকে চাহিয়া, মুখ অবনত করিলেন। যুবক বলিল,—"দেবি! আপনি কি এই নীচকুলোদ্ভূত দীন জনের স্কন্ধে পদার্পণ করতে সঙ্কোচ বোধ কর্‌চেন? ভগবতী সিংহবাহিনীর পাদপদ্মে কি মহিষাসুরের পৃষ্ঠদেশ-স্পর্শে অপবিত্র হ'য়েছিল?"

অকস্মাৎ অদূরে অশ্বসমূহের পদধ্বনি উত্থিত হইল। ইন্দুমতী সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। যুবা বলিল,—"ভয় নাই রাজকুমারি! রাণা স্বয়ং সসৈন্যে এই দিকে আস্‌ছেন। অই দেখুন, চিতোর সেনাগণের পীত বর্ণের শিরোভূষণ, চন্দ্রকিরণে চমকিতেছে! তবে এখন এ দাসকে বিদায় দিন।

ইন্দুমতী বলিলেন,—"বীরযুবক! ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর। আমি রাণার নিকটে তোমার অতুল বীরত্বকাহিনী বিবৃত কর্‌ব। তিনি তোমার উপর কত প্রীত হ'বেন। তোমাকে কত পুরস্কার দিবেন।"

সোহাগি-বালক উত্তর করিল,—"রাজকুমারি! রাজপুত-বালক নীচবংশোদ্ভূত হইলেও, বীরধর্ম্ম পালন করে, তার জন্য পুরস্কার কামনা করে না। তবে একটিমাত্র কথা আপনাকে বল্‌তে ইচ্ছা করি। যদি আবার কখনও আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছা করেন, কিংবা যদি কখনও কোনও বিপদের সময়, এই দীন সোহাগির সাহায্যের প্রয়োজন হয়, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমার এই "সোনার কৌটা" আপনার নিকটে রাখুন। আর স্মরণ রাখ্‌বেন, "সোনার কৌটা" এইমাত্র সঙ্কেত বচন, কোন লোকের মুখে অনাদিদেবের মন্দিরের যে কোন প্রহরীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেই, আমি আপনার কাছে উপস্থিত হব। কিন্তু, একটি মাত্র অনুরোধ, এই "সোনার কৌটা" গোপনে রাখ্‌বেন, আর যত দিন আপনার সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন এই কৌটা খুল্‌বেন না; ও ইহার ভিতরে কি আছে তা দেখ্‌বেন না। তবে এখন বিদায় গ্রহণ করি।"

সোহাগিযুবক একটি সোনার কৌটা ইন্দুমতীর হাতে দিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তাহার সুকুমার বীরদেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে পর্ব্বতকন্দরের অন্তরালে লুকাইল। ইন্দুমতী আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি "সোনার কৌটা" আপন বসন মধ্যে লুকাইয়া, সাশ্রুনয়নে সেনাদলবেষ্টিত রাণা রায়মল্লের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, দাঁড়াইলেন।

(৩)

প্রবাদ আছে, আহত ভুজঙ্গ আততায়ীর হাত হইতে একবার মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিলে, সে জীবনসত্ত্বে আততায়ীকে ভুলিতে পারে না। মালবরাজ গিয়াস উদ্দিনের সেনাপতি, মমদ উদ্দিনেরও সেই দশা ঘটিল। যে দিন সে

অল্প বয়সে মাদক দ্রব্য সেবন কর কেন? তোমার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে, ও তোমার কথা শুনে, আমার মনে বিশ্বাস হ'য়েছে, তুমি অমিত মাত্রায় অহিফেণ সেবন কর।"

সোহাগি-বালক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল "দেব! আপনার অনুমান সত্য। আমি এই বয়সেই অমিত মাত্রায় অহিফেণ সেবন করি।"

রায়মল্ল বলিলেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অহিফেণ সেবন পরিত্যাগ কর। আর যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে আমার সৈনিক শ্রেণীভুক্ত ক'রতে ইচ্ছা করি।"

সোহাগি-বালক, মুখ অবনত করিয়া, করযোড়ে উত্তর করিল "মহারাণা! সোহাগি-বালকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আপনার এই দুইটি আদেশ প্রতিপালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"কেন?"

সোহাগি-বালকের বলিষ্ঠ দেহ যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল! তাহার আরক্তিম বিশাল লোচনযুগল যেন, অধিকতর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। সে উত্তর করিল, "মহারাণা! আমার পিতার একটু সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি সেই সামান্য ভূখণ্ড ল'য়ে স্বাধীনতার সুখভোগে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তেন। অকস্মাৎ একদিন সেই ভূমিখণ্ড মালবের যবনরাজ গিয়াস উদ্দিনের হস্তগত হ'ল। পিতা মনের দুঃখে অজ্ঞাত বাসে চ'লে গেলেন। আমিও সেইদিন অবধি দেব ভবানীপতির প্রহরিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'লেম। সেইদিন অবধি মনের দুঃখ ভুল্‌বার জন্য প্রচুর পরিমাণে অহিফেণ সেবন কর্‌তে লাগ্‌লেম। সেইদিন অবধি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম, যতদিন পিতার ভূসম্পত্তি যবনের কবলচ্যুত না হয়, ততদিন অনাদিদেবের পদতলে ধূলায় লুণ্ঠন ক'রে জীবন শেষ কর্‌ব! মহারাণা! অহিফেণ সেবন পরিত্যাগ কর্‌লে, মনের দুঃখে আমাকে আত্মহত্যা বিধান কর্‌তে হবে।"

রায়মল্ল বলিলেন "তুমি কোন সময়ে অবকাশ মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি এখন চল্‌লেম।"

সোহাগি যুবক করযোড়ে বলিল "অনুমতি করেন তো আমি ভিন্নসর দুর্গ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে যাই।"

রাণা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি ভিন্নসর দুর্গে যাব না। অপর পথ অবলম্বন ক'রে চিতোরে ফিরে যাব।" সোহাগি যুবক বলিল "দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি বিস্মৃত হ'য়ে ছিলেম যে, ভিন্নসর হরবতী রাজবংশের পুরাতন দুর্গ, আর চিতোরের রাজবংশের সঙ্গে হরবতী রাজপুরুষগণ কিছুদিন হইতে বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন।" রাণা বলিলেন,—"যদি আবার কখনও চিতোরের সঙ্গে হরবতী রাজবংশের পূর্ব্ব সৌহার্দ্য সংস্থাপিত হয়, তবে আবার রাজপুতগৌরব ভিন্নসর দুর্গে পদার্পণ কর্‌ব।"

কল্লোল-বিধূনিত পার্ব্বত্য প্রদেশে, বীরবালকের মধুর বাণী,ইন্দুমতীর অন্তর মধ্যে যেন কোন্ বিগত দিনের,—কোন্ পূর্ব্ব জন্মের,—সুখ-স্বপ্নের অস্ফুট স্মৃতি জাগাইয়া দিল। ইন্দুমতী একবার যুবার মুখের দিকে চাহিয়া,মুখ অবনত করিলেন। যুবক বলিল,—"দেবি! আপনি কি এই নীচকুলোদ্ভূত দীন জনের স্কন্ধে পদার্পণ করতে সঙ্কোচ বোধ কর্‌চেন? ভগবতী সিংহবাহিনীর পাদপদ্ম কি মহিষাসুরের পৃষ্ঠদেশ-স্পর্শে অপবিত্র হ'য়েছিল?"

অকস্মাৎ অদূরে অশ্বসমূহের পদধ্বনি উত্থিত হইল। ইন্দুমতী সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। যুবা বলিল,—"ভয় নাই রাজকুমারি! রাণা স্বয়ং সসৈন্যে এই দিকে আস্‌ছেন। অই দেখুন, চিতোর সেনাগণের পীত বর্ণের শিরোভূষণ, চন্দ্রকিরণে চমকিতেছে। তবে এখন এ দাসকে বিদায় দিন।"

ইন্দুমতী বলিলেন,—"বীরযুবক! ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর। আমি রাণার নিকটে তোমার অতুল বীরত্বকাহিনী বিবৃত কর্‌ব। তিনি তোমার উপর কত প্রীত হ'বেন। তোমাকে কত পুরস্কার দিবেন।"

সোহাগি-বালক উত্তর করিল,—"রাজকুমারি! রাজপুত-বালক নীচবংশোদ্ভূত হইলেও, বীরধর্ম্ম পালন করে, তার জন্য পুরস্কার কামনা করে না। তবে একটিমাত্র কথা আপনাকে বল্‌তে ইচ্ছা করি। যদি আবার কখনও আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছা করেন, কিংবা যদি কখনও কোনও বিপদের সময়, এই দীন সোহাগির সাহায্যের প্রয়োজন হয়, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমার এই "সোনার কৌটা" আপনার নিকটে রাখুন। আর স্মরণ রাখ্‌বেন, "সোনার কৌটা" এইমাত্র সঙ্কেত বচন,কোন লোকের মুখে অনাদিদেবের মন্দিরের যে কোন প্রহরীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেই, আমি আপনার কাছে উপস্থিত হব। কিন্তু, একটি মাত্র অনুরোধ, এই "সোনার কৌটা" গোপনে রাখ্‌বেন, আর যত দিন আপনার সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন এই কৌটা খুল্‌বেন না; ও ইহার ভিতরে কি আছে তা দেখ্‌বেন না। তবে এখন বিদায় গ্রহণ করি।"

সোহাগিযুবক একটি সোনার কৌটা ইন্দুমতীর হাতে দিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তাহার সুকুমার বীরদেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে পর্ব্বতকন্দরের অন্তরালে লুকাইল। ইন্দুমতী আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি "সোনার কৌটা" আপন বসন মধ্যে লুকাইয়া, সাশ্রুনয়নে সেনাদলবেষ্টিত রাণা রায়মল্লের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন।

(৩)

প্রবাদ আছে, আহত ভুজঙ্গ আততায়ীর হাত হইতে একবার মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিলে, সে জীবনান্তে আততায়ীকে ভুলিতে পারে না। মালবরাজ গিয়াস উদ্দিনের সেনাপতি শমস্ উদ্দিনেরও সেই দশা ঘটিল। যে দিন সে

সোহাগি-যুবকের ভীম-পদাঘাতে চঞ্চল তরঙ্গে পড়িয়া, বহু আয়াসে আপন জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, সেই দিন অবধি, রাণা রায়মল্লের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। চারি বৎসর পরে, সহসা একদিন গভীর রজনীতে, বহু সংখ্যক যবন সেনা আসিয়া চিতোর দুর্গ আক্রমণ করিল। আপাততঃ যবন যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, রায়মল্ল নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন। তিনি সম্প্রতি, তাঁহার সৈন্যদল বিদ্রোহী মীনা সেনাগণকে বশীভূত করিবার জন্য, কমলমীর দুর্গে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, অল্প সংখ্যক সৈনিক চিতোরে আছে, তাহাদের সাহায্যে সেই বিংশ সহস্রাধিক শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া বাতুলতা মাত্র। তিনি কমলমীর দুর্গ হইতে তাঁহার সেনাগণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কি প্রকারে তাহাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি অন্তঃপুরবাসিনী রমণিগণের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যবনদস্যু আলা উদ্দিনের চিতোর আক্রমণকালীয় সেই সুন্দররাজপুত নারীর চিতারোহণের লোমহর্ষণ দৃশ্যের পুনরাভিনয় অবশ্যম্ভাবী।

দুর্গের পশ্চিম পার্শ্বস্থ কক্ষে, রাজকুমারী ইন্দুমতীর সঙ্গে, তাঁহার পরিচারিকা গোমতীর কথোপকথন হইতেছিল। গোমতী বলিতেছিল, "একি কথা রাজনন্দিনী আমি তেলির মেয়ে, এ সকল কাজ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

ইন্দুমতী বলিলেন,—"তুই বীরঝাঁপ" হ'তে লাফ দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এসেছিলি, আর এই সামান্য কাজটা করতে পারবি না?" গোমতী হাসিয়া বলিল,—"রাজকুমারি! তুমিও সে কথা সত্য বলে বিশ্বাস কর?" "সত্য কি মিথ্যা, সে সব কথা পরে শুনব। এখন আমি যা বলচি, তাই কর্। এই সামান্য কাজটা করতে পার্‌লে, তোকে আমার এই লক্ষ টাকার হীরার হার পুরস্কার দিব। তুই এই যবন সৈনিকের পোষাক প'রে, দড়ী ধরে, ধীরে ধীরে দুর্গের নীচে নেমে যাবি। তার পর, তোর গ্রামে গিয়ে, তোর স্বামীকে অনাদিদেবের মন্দিরে পাঠিয়ে দিবি। সেখানে গিয়ে তোর স্বামীকে কেবল এই দুইটি কথা বল্‌তে হবে "সোনার কৌটা।" গোমতী বলিল,—"আচ্ছা তা যেন হ'ল, কিন্তু সেই সোহাগি ছোঁড়ার কাছে, এই খবর পাঠিয়ে দিলে কি লাভ হবে? সে চিতোরের কেল্লা রক্ষা কর্‌বে, সে কি কোন মন্ত্র জানে না কি?"

"সে যে কত বড় বীর, তা তুই পরে দেখ্‌তে পাবি। আমার বিশ্বাস, সে এই সংবাদ পেলেই, যে কোন উপায়েই হোক্, আমাদিগকে যবনের হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌বে। গোমতী বলিল,—"রাজকুমারি! তোমার কি অসম্ভব আশা। লোকে কথায় বলে, প্রেমে পড়্‌লে সে মেয়ে মানুষের আকাশ পাতাল জ্ঞান থাকে না। কিন্তু, এই

মন্দিরে দেখে ছিলেম, সেই দিনই আমার মনে সন্দেহ হয়ে ছিল, তুমি সেখানে ছদ্ম-বেশে অবস্থান ক'রছিলে। তা, এখনও কি তোমার প্রকৃত পরিচয় গোপন করবার আবশ্যকতা আছে?"

সোহাগি-যুবক উত্তর করিল "আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। যে দিন"—

এই সময়ে, গোমতী হীরার হার পরিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুত পদে আসিয়া, বলিতে লাগিল "মহারাণা! রাজমহিষী আপনার নিকট অনুরোধ ক'রচেন যে, আজিকার এই উৎসবের সঙ্গে, রাজকুমারী ইন্দুমতীর বিবাহ-উৎসবও সম্পন্ন হোক্। আপনার কি মত, জানবার জন্য,তিনি আর ইন্দুমতী, এই পাশের ঘরে পরদার আড়ালে আছেন।

রাণা বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "সে কি! ইন্দুমতীর বিবাহ? কোথায়,—কার সঙ্গে বিবাহ, আমি ত তার কিছুই জানি না।"

গোমতী বলিল, "যার সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ হবে, এই দেখুন, এই সোনার কৌটার ভিতরে তার নাম লেখা আছে।"

রায়মল্ল সোনার কৌটা হাতে লইয়া বলিলেন, "একি! এতে ত লেখা আছে, হরবতী রাজকুমার নারায়ণ দাস!" তা, তাঁর সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহের কথা আমি ত কিছুই জানি না। আর এ সোনার কৌটা কোথা হ'তে, কে ল'য়ে এসেছে, তাও কিছুই জানি না। গোমতী মৃদু হাস্যে উত্তর করিল "ঐ সোহাগি-সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করুন; উনি সব জানেন।

রাণা সোহাগি-যুবার হাতে সোনার কৌটা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই সোনার কৌটার বিষয় কিছু জান?"

সোহাগি-যুবক কর-যোড়ে উত্তর করিল, "দেব! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি আপনাকে এতদিন বলি নাই, আমিই হরবতী-রাজ-তনয় নারায়ণ দাস।

আপনাকে আর অধিক কথা বলবার কি প্রয়োজন? আপনি আমার বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। সম্প্রতি, আজ দুই মাস হ'ল, আমি যে প্রকারে রাজদ্রোহী, বিধর্ম্মী, কাপুরুষ দুজনকে সংহার ক'রে, যবনের, হাত হ'তে পিতৃসিংহাসনের পুনরুদ্ধারসাধন করেছি, সে সকল কথাও আপনার কিছুমাত্র অবিদিত নাই।

রাণা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নারায়ণ দাসকে আলিঙ্গন করিয়া, বলিলেন, "বৎস! এতদিন আমার নিকট হ'তে প্রকৃত পরিচয় গোপন ক'রেছিলে কেন? মিবারের রাণার সঙ্গে, হরবতী রাজ-বংশের বৈরিতার সূত্রপাত হ'য়ে ছিল, সেই আশঙ্কায় বুঝি, তোমার পিতৃতুল্য, বৃদ্ধ রায়মল্লকে আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ ক'রে ছিলে? সে, যা হউক, আজ তোমার অতুল বীরত্বে রাজপুতনার পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হ'ল। তুমি আজ, এ চিতোরের ঘোর অন্ধকারের দিনে, রাজপুতকুলের আদিত্যরূপে দেখা না দিলে, এতক্ষণে চিতোর দুর্গ ঘোর শ্মশানে পরিণত হ'ত।"

গোমতী বলিল, "মহারাণা! উঁকে সো-

নার কৌটার কথা ত এখনও জিজ্ঞাসা ক'রলেন না।"

রাণা উত্তরের প্রতিক্ষায় নারায়ণ দাসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নারায়ণ দাস বলিলেন, "দেব! এ সোনার কৌটা আমার অহিফেনের কৌটা। পিতৃরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হ'য়ে আসবার সময়, এই সোনার কৌটা মাত্র সম্বল সঙ্গে ল'য়ে এসেছিলেম। আপনি যে দিন, অনাদিদেবের মন্দিরে, আমাকে অমিত মাত্রায় অহিফেন সেবনের জন্য তিরস্কার ক'রেছিলেন, সেই দিন অবধি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম, যদি কখনও পিতৃ-সিংহাসন যবনের গ্রাস হতে মুক্ত ক'রে, হববতী রাজসিংহাসনের উপযুক্তা কোন রাজপুত নারীর পাণিগ্রহণ ক'রতে পারি, তবে এই সোনার কৌটা তাঁর হাতে সমর্পণ ক'রব; আর, তাঁরই ইচ্ছামত, পরিমিত মাত্রায় অহিফেন সেবন ক'রব। তাই, এই চারি বৎসর রাজকুমারী ইন্দুমতীর নিকটে, এই সোনার কৌটা গোপনে রেখে দিয়েছিলেম।"

রাণা গোমতীকে বলিলেন, "তবে মহিষীকে সংবাদ দাও, আজ চিতোরের বিজয়োৎসবের সঙ্গে ইন্দুমতীর পরিণয়োৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হবে। বৎস, নারায়ণ দাস! আজ আমার প্রিয়তমা সোদর তনয়া ইন্দুমতীর কর-কমলে, তোমার এই সোনার কৌটা সমর্পণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, ভবিষ্যতে ইহার অভ্যন্তরস্থ অহিফেন, অমৃতে পরিণত হউক!"

পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে, একখানি ক্ষুদ্র, সুন্দর, আভাময়, চম্পকগুচ্ছ-বিনিন্দিত কর-পুট, চিকের বাহিরে আসিল। সেই সমৃণাল বিকচ-কমলের মত, করতলের উপর, নারায়ণ দাস তাঁহার সোনার কৌটা রাখিয়া দিলেন।

রাজপুতানার মধ্যাহ্ন সূর্য্য হরবতী-রাজ, নারায়ণ দাসের "সোনার কৌটা" মিবার-পঙ্কজ ইন্দুমতীর হাতে পড়িয়া, তাহা হইতে সমগ্র রাজস্থানে যে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা রাজপুতানার ইতিবৃত্ত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

শ্রীনলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্।

লিসিদাস।

[ইংরেজ-কবি মিল্টন হইতে]

এসেছি হে সুন্দর শিরীষ, আমি এসেছি আবার,
এসেছি হে শেফালিকা, নবকলি পূর্ণ-তরুসার,
কোমল কলিকা তব অফুটন্ত করিতে চয়ন,
শোক-অশ্রু-তপ্ত হস্তখানি মোর করি প্রসারণ,
না লাগিতে হেমন্তের সুরভি-পরশ

ছিঁড়িতে পল্লব তব হয়েছি বিবশ।
বেদন-সংগীত, সুখ-স্মরণীয় বিষাদের দিন
করেছে পাগল, তোমা করিবারে নব-বৃন্ত-হীন ;
মরিয়াছে লিসিদাস*—লিসিদাস অপ্রাপ্ত-যৌবন,
সুকুমার লিসিদাস—নাহি তার যোগ্য কোন জন।
কে না গাবে তার শোক-গাথা ?—সে ত জানিত মোহন
গাইতে আপনি তুলি' মেঘ-মন্দ্রে মধুর নিক্কণ।
হবে না সে তলহীন সাগরের দেশে তাহার সমাধি
অশোচিত, অকরুণ বায়ুর হিল্লোলে ভাসা নিরবধি,
বিলাপ-সঙ্গীত এক করি' বিরচন
নাহি দিতে তার তরে প্রিয়-উপায়ন !
গাও হে কিন্নরী-সহচরি, তানে করি উদ্ভাসিত
স্বর্গ-মন্দাকিনী-স্রোত নারায়ণ-চরণ-প্রসূত ;
ধর বীণা, ষড় রাগে উঠুক কাঁপিয়া তার ধ্বনি,—
কি লাজ, সরম যদি বাজে তাহে বিষাদ-রাগিণী !
আবার করুণময়ী বাণী এক যেন, হেন গায় সেই দিন
আশীষ-সঙ্গীত শুভ, যবে মোর দেহ হ'বে শ্মশানে বিলীন,
ধীর-প্রাণ-স্নেহে যেন ব'লে যায় ফিরিয়া আবার
স্বর্গের অমৃতময়ী শান্তিগাথা শ্রবণে আমার !
এক শৈল-শিখর-প্রান্তরে মোরা বেঁধেছিনু সাধের আলয়,
চরাতেম ধেনু কোলে ঝরণার, নদীতটে, গাছের ছায়ায়,
থাকিতাম এক সাথে, হেরিতাম শ্যাম ভূমে জাগাইতে শির,
অলস কিরণ-পাতে সুপ্তোত্থিত প্রভাতের অরুণ আঁখির;
চরাতেম ধেনু দোঁহে, করিতাম হরিষে শ্রবণ—
মল্লার টানিয়া গান ঝিঁঝিঁটিকা গাইত যখন ;
চরাতেম ধেনু-নৈশ-নীহার-নিষিক্ত-নীল-ভুঁয়ে,
যাবৎ জ্যোতিষ্কপুঞ্জ সান্ধ্যতারা অবসন্ন-ছায়ে
পশ্চিম গগনে হেলি সুপ্তনেত্রে চাহিত বিদায়।
পাহাড়ী রাগিণী দিত অবসরে দিব্য পরিচয়,

* Lycidas.

আলাপনে বন-বেণু মধুতান করিত বাদন ;
দানব, যক্ষিণী, রক্ষ রক্তকর করি আস্ফালন,
পুলকে আসিত ছুটি শুনিবারে সে মধুর স্বর,
তান-মুগ্ধ পর্ব্বতক * অলক্ষ্যে আকাশ করি ভর।
বিষম দুর্দ্দৈব অহো! নাহি, সখা, তুমি ভবে আর,
লয়েছ বিদায় চির, কভু নাহি ফিরিবে আবার!
অই শোন, গোপালক, মরু-গুহা-প্রান্তরে অজ্ঞাত
মালতী-মাধবী-শ্যামা-ব্রততী-নিচয়-প্রত্যাগত—
শোকধ্বনি বাজে তব, মুহূর্ত্তে বেড়িয়া চারিদিক্,
বন-লতা, বন-কুঞ্জ, পূর্ব্বাপর সতেজ, নির্ভীক,
শাখা-পত্র-পুষ্প-ফল রুদ্ধ শ্বাসে বক্ষে আবরিয়া,
শোক-ম্রিয়মাণ, কাঁদে তব ভাগ্য-মহিমা স্মরিয়া!
অকালে গোলাপ-গুচ্ছ কীট-দষ্ট লোটায় ভূমিত,
যেমতি দংশিনী নাশে পশু-পোত লেহিয়া শোণিত,
কিংবা যথা ঝরে হিম-বিন্দু-পাতে কুসুম মধুর,
সদ্য-স্নিগ্ধ-মুকুলিত-সৌন্দর্য্য নিমেষে হয় চুর,
তেমতি হে লিসিদাস, মরণে তোমার
হয়েছে রাখালগণ হীন অন্তঃসার।
কোথা ছিলে, বনদেবি, যবে চণ্ড পয়োধি-উচ্ছ্বাস
ভীম দন্তে করেছিল সুকুমার লিসিদাসে গ্রাস?
জানি—তুমি তখনে ত নাহি ছিলে মত্ত-লীলা-ভরে
মনের-প্রান্তর-লগ্ন আর্য্যকুল-সমাধি-শিখরে ;

* Damoetus—an old shepherd ("a doltish clown")—'Arcadia.' পক্ষান্তরে, মিল্টনের শিক্ষক Mr. Chappel এর উদ্দেশে এ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায়, এবং মিল্টন আপনাদিগকে পর্ব্বতবাসী কৃষকপুত্ররূপে বর্ণনা করায়, আমরা Damoetus কে পর্ব্বতবাসী কৃষকদের অধিনেতা বলিয়া ধরিতে পারি। সুতরাং এ বিবেচনায় Damoetus এর বঙ্গ-প্রতিশব্দ "অপূর্ব্বকারাবাসোক্ত" 'পর্ব্বতক' কিংবা পার্ব্বতীয়দের অধীপ বলা, অসঙ্গত মনে করি না।

দ্বীপান্তর-তরুকুঞ্জে নাহি ছিলে করিতে বিহার,
কিংবা ভোজ-সিদ্ধ-'দেব' তটিনীর * শ্রান্ত-স্রোত-পার!
আঃ কি ভ্রম! আঃ কি ভ্রম!—এ যে ব্যর্থ জাগ্রত স্বপন—
দেবতা কি পারে কভু ভবিতব্য করিতে খণ্ডন?
আপনি দিবস-যামী অরোফিস্ † শিয়রেতে জাগি,
কিবা ক'রেছিল বাণী প্রিয়তম তনয়ের লাগি,
যাঁর লাগি করেছিল মহা-শোকে ব্রহ্মাণ্ড চীৎকার,
আঘাতে যখন, হায়, ভীম-রাবী তরঙ্গ বিস্তার,
কবির সে ছিন্ন মুখ নিক্ষেপিল সুখে,
লেসোবিক্-তটে হেবোরাস্-স্রোত-মুখে? ‡
কি ফল লভিলে, হায়, অবিরাম মাতিয়া আপনি
লক্ষ্য-হীন, হেয়, কৃচ্ছ্র-গোপ-ধর্ম্মে দিবসরজনী,
অথবা সাধিয়া যোগ ভারতীর কঠোর উদ্দেশে?
পেতে না কি সমধিক সুখ যদি প্রেমিকের বেশে,
আড়ালে ডাকিয়া তব প্রেয়সীরে করিতে চুম্বন,
এলো কেশ জড়াইয়া বন-ফুলে করিতে বন্ধন!
যশোলিপ্সা—সে যে নীতি মহাজনে শিখায় কঠোর,—
(জীবনে মরণে এ তো বিবেকীর অবসাদ ঘোর),
জনমের সুখ নাশি হ'য়ে থাকা খাটুনীর ভাগী;
ভরসার পথে যদি চাহি কভু সফলতা লাগি;
যমদূত ধায় পাছে ভীমদণ্ড করিয়া সন্ধান,
সংহারে আঘাতে শিশু। 'নাহি নাশে লব্ধ যশোমান'—
পরশি শ্রবণ, আমা কম্পমান বলিল ভারতী,—
"নশ্বর জগতে, বৎস, কোথা পাবে বিশুদ্ধ সুখ্যাতি!
কোথা স্বর্গ-সৃষ্ট-খ্যাতি—ধরণীতে সাফল্য কোথায়,
মর কি অমর হ'বে মানবের মুখের কথায়?
সঞ্জীবিত সুবিস্তার বিরাজিছে শুদ্ধ খ্যাতি কনক-কিরণে

* The wizard stream Deva.

† Orpheus.

‡ Down the swift Hebrus to the Lesbian shore.

অম্লান বিশ্বতশ্চক্ষু ধর্ম্মরাজ-অধিকৃত ধর্ম্মাধিকরণে ;
যশোমান ভগবান্ দানে সত্য করিয়া বিচার,
অমৃতের খ্যাতি—পুণ্য-জীবনের যোগ্য পুরস্কার।"
ওহে উৎস অরেথুস্ * অয়ি পুণ্য-সলিলা তটিনি,
শান্তস্রোতা মিনিসাস্ † সজ্জিত নড়ুল নিনাদিনী,
সে ত গাথা উচ্চতম, ভারতীর বাণী যাহা করিনু শ্রবণ।
গাইব এখন আমি করিল বাসব-দূত যাহা নিবেদন।
সুধাইছে ইন্দ্র ডাকি' উত্তাল সাগরে, আর মত্ত প্রভঞ্জনে,
সুশীল গোপালে কোন্ দুষ্টভাগ্য অলক্ষিতে বধেছে পরাণে ?
প্রচণ্ড পবনে খুঁজি' তন্ন তন্ন করিছে বিচার
ক্ষিপ্ত অন্তরীপ-বাহী। জানে না সন্ধান কেহ তার।
রাজর্ষি ম্রারুত ‡ আসি পরিশেষে নিবেদিল তাঁহার ধারণা,—
তাঁর রুদ্ধকারা হ'তে পারে নাই বাহিরিতে বায়ু এক কণা।
শান্ত ছিল চরাচর, প্রশান্ত সাগরতটে বসি'
খেলিবারে ছিল সহ-সহচরী বৃত্তাঙ্গী উর্ব্বশী।
গ্রহণ-নির্ম্মিত-তরী § কালান্তক, অভিশপ্ত, বিশ্বাস-হরণ,
অতল সাগর-জলে পূত-লিসিদাসে সেই দেছে বিসর্জ্জন।
ধীর-পাদে মহামান্য কেমাস্ ‖ আসিল তার পর,
লোমজ-দুকূল, শষ্প-বিভূষিত কিরীট তাঁহার
শোভমান অনুজ্জ্বল চারুচিত্রে, আশে পাশে লেখা—
লোহিত জবায় যথা—কি গভীর বিষাদের রেখা।
বলিলা কাঁদিয়া—'হায় কে নিলে হরিয়া মোর বাছনির প্রাণ ?'
সকলের শেষে আসি, সকলের শেষে পুনঃ করিল প্রয়াণ
গেলিলি হ্রদের মান্য মহাযোগী বৃদ্ধ কর্ণধার ; ¶

* Arethuse.
† Mincius.
‡ Sage Hippotades (Son of Aelus.)
§ Bark Built in the eclipse.
‖ Camus.
¶ The pilot of the Galilean Lake (St. Peter)

সৌবর্ণ আয়স দুটি চাবি তাঁর করে গুরুভার,
(হৈম চাবি খুলে দ্বার, লৌহময়ী করে দৃঢ় তোরণ বন্ধন ;)
জলন্ত কুন্তল নাড়ি, বলিলা জলদ-স্বরে গম্ভীর বচন—
'হে কুমার, হে গোপাল' কত সুখে করিতাম তোমার লাগিয়া
বিতাড়িত শত যাত্রী, যারা শুধু আপনার পিয়াসা মাগিয়া,
অতর্কিতে, অলক্ষিতে ছুটে আসে অনাহূত ভরিতে কুটীর!
রাখে না কিছুর ধার, না মানে, না জানে আর ধারা কোনো স্থির!
তাহাদের লক্ষ্য শুধু কৃষকের দীনভোজে পেতে অগ্রগ্রাস,
অপর সমগ্র যোগ্য আহূত অতিথিগণে করিয়া নিরাশ।
অবোধ লোলুপ জীব! না জানে কথনো ভাল রীতি
পশু-পালনের, কিংবা বিচক্ষণ রাখালের নীতি!
গোপধর্ম্ম?—কি ফল?—কি আবশ্যক?—হয়েছে তাদের স্বার্থলাভ;
আপন বাসনা যবে, তানহীন, লয়হীন অসার আরাব
জুড়িয়া ভগন বেণু বাঁশায় কর্কশ, ধীর, না পায় তা, অনন্ত প্রসার;
বুভুক্ষিত মেষপাল চায় তাহাদের পানে, একমুটো না পায় আহার;
মরে বিষ-কুয়াসায় জ্বলিয়া মরমে, মারী ব্যাপিয়া বিনাশে সহচর;
আবার ওদিকে হের,—দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল পুনঃ আস্ফালিয়া বিকট নখর,
অবাধে চিবায়ে চুপি হৃদয়ের হাড় মাস সমাজ করিছে নিতি ক্ষয়।
করাল কৃপাণ দ্বারে আছে লম্বমান, সব একবারে করিবে প্রলয়।

এসহে আবার ফিরি, এস ফিরি, আলোফিস,* থামিয়াছে সে স্বর গম্ভীর,
কাঁপিতে যাহার রবে সতরঙ্গে; এস, এস মধুময়ী গাথা সিসিলীর,†
শৈল-উপত্যকাকুলে-কর আজ্ঞা-সমাধিতে করিতে বর্ষণ,—
তার অঙ্গচ্যুত করি, মুকুল, কুসুমগুচ্ছ বিচিত্র বরণ!
হে গম্ভীর উপত্যকে, ছায়া-স্নিগ্ধ-মলয়ের প্রমোদ-প্রান্তর,
চঞ্চল-সমীর-যুতা, উৎসময়ী তটিনীর আনন্দ-নির্ঝর,
হে গম্ভীর উপত্যকে, নিদাঘ-রক্ষিত-কায়-মধু-অঙ্কময়ি,
উজল সুষম তব পুষ্প কর বরিষণ সমাধিতে এই,
কর বরিষণ পুষ্প শ্যাম-শষ্প-জাত-ফুল্ল-সুধার কিরণে,

* Alphous.

† Sicilian Muse.

সাজাও সমগ্রভূমি তরুণ-বাসন্তী-চারু-অরুণ-প্রসূনে।
ছড়াও মধুর শোভা বিজনের সুগন্ধ বকুল,
কামিনী গুচ্ছকশীলা, নব পাণ্ডু মল্লিকা-মুকুল,
বিশদ টগর-রাজি, নীলকণ্ঠ কুসুমের তোড়া,
বরিষ উজল পূত কুরবক, কুসুমের সেরা,
সুরভি-গোলাপফুল, ঝুমকার বিচিত্র স্তবক,
কর বরিষণ হেথা নত-শিরা পিঙ্গল অশোক,
শোকের শরীরী * ছবি আন সাথে কুসুমে ডাকিয়া,
বল পারিজাতে তার সৌন্দর্য্য রাখিতে ছড়াইয়া,
পীত-শতদলে বল অবিরল শোক-অশ্রু করিতে বর্ষণ,
লিসির ¶ সমাধি-তলে রচিতে সুগন্ধফুলে শোক-আবরণ। §
শোকাতুর প্রাণে তবু লভিবারে শান্তি ক্ষণেকের,
চঞ্চল মানস-পটে কর, নর, কল্পনা সুখের।
অহো, প্রতি তটে তটে ভৈরব জলধি এবে করিছে বহন
মনোরম দেহখানি তব আজি শবরূপে করি নিক্ষেপণ,
তরঙ্গ-সঙ্কুল হেবো রিডাসের * দূরতম পারে,
লয়েছ বিদায় চির যথা বা প্রচণ্ড স্রোত-ভরে
জলজীবি-পূর্ণ তলে সাগরের দুর্দান্ত-প্রস্থান;
এত অশ্রু, দীর্ঘ শ্বাস আমাদের করি প্রত্যাখ্যান,
রয়েছ নিদ্রিত কিংবা শ্রুত বেলেরাস § অঙ্ক করিয়া আশ্রয়,

* বঙ্গভাষায় অনেক স্থলেই কোনও বিশেষ্যপদ ও তদ্‌বিশেষণ পদের লিঙ্গ ব্যবহারে তারতম্য দৃষ্ট হয়। ব্যাকরণ-শাস্ত্রমতে ইহা অত্যন্ত দোষাবহ হইলেও, অনেকেই ইহা গ্রাহ্য করিয়া চলেন না। বিশেষতঃ নিরঙ্কুশ-কবিপথে এ দোষ অবশ্যমার্জ্জনীয়, এই ভরসায় স্থানে স্থানে বিশেষণ তদ্‌বিশেষ্য পদ হইতে বিভিন্ন লিঙ্গাকারে রাখিতে সাহসী হইয়াছি।

¶ A shortened form of Lycidas.

§ The flower passage (L. 142—51).—বিলাতী ও আমাদের দেশী ফুলগুলির মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য না থাকিলেও, কাব্যোক্ত ফুলগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির বিচারে তত্তদ্‌স্থানে তৎতৎগুণ বিশিষ্ট দেশী ফুলগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

* Hebrides. § Bellerus.

স্পেন-গত-দেব-দৃষ্টি শৈল-রক্ষকের মত হ'য়োনা নিদয়।
হে স্থর, ফিরিয়া চাও তোমার দেশের পানে,
দীন সহচরে তব হও কৃপাবান্ ;
হে গুগুক, কর রক্ষা অসহায় লিসিদাসে,
নিরাশ্রিতে কর তব আশ্রয় প্রদান!

কেঁদনাহে শোকাতুর রাখাল বালকগণ, কেঁদনা হে আর,
এখনো রয়েছে জীবি লিসিদাস, তোমাদের লক্ষ্য বেদনার,
যদিও জলধি-তলে রয়েছে ডুবিয়া তার কান্তি স্থমোহন।
এহেন ত নিতি নিতি স্থনীল গগনে যায় ডুবিয়া তপন,
আবার নিস্তেজ শিরে খরজ্যোতিঃ করে বিচ্ছুরণ,
সাজিয়া আলোকে নব, প্রসারিয়া স্থবর্ণ-কিরণ,
নব তেজে জ্বলে পুনঃ প্রভাতের আলাময় আকাশের ভালে ;
ডুবেছে অতলে যদি, উঠিছে জাগিয়া লিসি পুনঃ নববলে
অনন্তের পথে, বিশ্বপালকের জ্যোতিঃপুঞ্জ করিয়া নির্ভর,—
সেথানের উপবন নূতন, স্থন্দরতম, স্থশীতল অস্ফুট নির্ঝর—
পূত অমৃতের পাতে মরতের ধূলামাটি করিতেছে ক্ষয়,
শুনিছে মঙ্গল-গান অনির্ব্বচনীয় নিতি অনিন্দ্য, অভয়,
প্রেম-প্রীতি-পুণ্য-ভরা অনন্ত স্থখের রাজ্য করিয়া আশ্রয়।
হের, অই দেবগণ, মহর্ষি, রাজর্ষি সবে বরিছে তাহায়,
আদরে, উৎসবে, প্রীতি-বরণে, নেহার, অই পশিয়া বিমান,
বিজয়-সঙ্গীত-ভরে হইতেছে সবে ব্যোম-পথে আগুয়ান্,
লিসির নয়ন হ'তে অশ্রুজল চিরতরে দিতেছে মুছিয়া।
লিসিদাস, আর নাহি কাঁদিবে রাখালগণ তোমার লাগিয়া ;
সাগরের কূলে এবে রয়েছ বরিত পদে জল-দেবতার,
তাপ-জীর্ণ-ধরণীর ব্যথা হ'তে পেলে এ তো যোগ্য পুরস্কার ;
হ'য়ো তবে, লিসিদাস, তাহাদের প্রতি কৃপাবান্,
দুরন্ত সাগরে আসি যারা চাহে লঙ্ঘিতে উজান।

গাইল জনেক দীন রাখাল এহেন গান কাননে, সাগরে,
ধূসর নিথর উষা ছড়া'য়ে পড়িতেছিল যবে ক্ষীণ-করে ;
আঁটিয়া করুণ-তান পরশিল বিবিধ স্থতার,

জাগা'য়ে উৎসবে নব সপ্তস্বর-মাধুরী বীণার
ভানুদেব অতঃপর ক্ষিপ্রকরে বাড়াইয়া পাহাড়ের ছায়া,
অস্তশিখরের পথে পশ্চিমগগনে তার ডুবাইল কায়া।
রাখাল উঠিল জাগি গুছাইয়া আপনার নীল আভরণ,
শ্যামল-প্রান্তরে, নব গোচারণে করিবারে কালি বিচরণ।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

কাব্যপ্রকাশ।

(মম্মটাচার্য্য কৃত কাব্যপ্রকাশ।)

প্রথম উল্লাসঃ।

(প্রথম উল্লাস।)

বৃত্তিমুখ। গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায় সমুচিতেষ্টদেবতাং গ্রন্থকৃৎ পরামৃশতি।

অনুবাদ। গ্রন্থকার (১) গ্রন্থের আরম্ভে বিঘ্নবিনাশার্থে উপযুক্ত অভীষ্ট-দেবতা সরস্বতীর সঙ্গে উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ স্থাপন, অর্থাৎ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন।

(১) ভরত মুনিই গ্রন্থকার।* তিনি সংক্ষেপে অলঙ্কার-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য, কতকগুলি কারিকা রচনা করিয়া যান। সেই কারিকাগুলির সমষ্টিকে কাব্যপ্রকাশ বলে। মম্মটভট্ট উক্ত কারিকামালার বৃত্তি রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, এই বৃত্তি-গ্রন্থের নামই কাব্যপ্রকাশ। সাধারণতঃ কারিকা ও ভট্টের বৃত্তিগ্রন্থ উভয়কে মিলিত ভাবে কাব্যপ্রকাশ বলা হয়। মহর্ষি ভরত আদি আলঙ্কারিক। বামন ও আচার্য্য দণ্ডী প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ মহর্ষি ভরতের মতানুসারেই অলঙ্কারের অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপর, আচার্য্য অভিনব গুপ্ত, নবদ্বীপের রঘুনাথের মত, বামন-প্রমুখের উপর দোষ দিয়া, অলঙ্কারের নব্য মত স্থাপন করিয়া যান। [মম্মটাচার্য্য] অভিনব গুপ্তের শিষ্য বলিয়া সকলের বিশ্বাস। মম্মট "শ্রীমদাচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদাঃ" বলিয়া ভক্তি-নম্রকন্ধরে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মম্মটাচার্য্য অভিনব গুপ্তের মতানুসারে

* বিজ্ঞ পাঠকবর্গ, এ প্রসঙ্গে, প্রবন্ধের উপসংহার স্থলে, সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিলে বাধিত হইব।

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং
হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্
নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতি-
মাদধতী ভারতী কবের্জ্জয়তি। (২)

অনুবাদ।—নিয়তিকর্ত্তৃক-নির্দ্দিষ্ট-নিয়ম-শূন্যা,—কেবল আনন্দময়ী, অন্য উপকরণের অনধীনা,—নয়টি রস দ্বারা সদাই হৃদয়হারিণী অপূর্ব্ব সৃষ্টিবিধানকারিণী, কবির বাণী জয়যুক্ত হউন।

বৃত্তিঃ।—নিয়তিশক্ত্যা নিয়তরূপা, সুখ-দুঃখমোহস্বভাবা,পরমাণ্বাদ্যুপাদান-কর্ম্মাদিসহ-কারিকারণ-পরতন্ত্রা,ষড্রসা—ন চ হৃদ্যৈব তৈঃ, তাদৃশী ব্রহ্মণো নির্ম্মিতিঃ নির্ম্মাণং ;— এতদ্বিলক্ষণা তু কবিবাঙ্ নির্ম্মিতিঃ,—অতএব জয়তি। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি তাং প্রতি অস্মি প্রণত ইতি লভ্যতে।

বৃত্তির অনুবাদ। কবির সৃষ্টি হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মার সৃষ্টি নিয়তির শক্তি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ,—অর্থাৎ নিয়তি * কর্ত্তৃক স্থাপিত নিয়মের অধীন। মনুষ্যের কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্টকে নিয়তি বলে। ব্রহ্মার সৃষ্টি মনুষ্যের অদৃষ্টাধীন। কেন না, ন্যায়শাস্ত্রের মত এই যে, মনুষ্যদিগের অদৃষ্ট-ফল প্রদান করিবার জন্যই ঈশ্বর চন্দ্রসূর্য্যাদিসমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিয়তি অনুসারে পাপের ফল দুঃখ এবং পুণ্যের ফল

ভরতকৃত কারিকার বৃত্তি করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ, কাব্য-প্রকাশেরই পরবর্ত্তী সমালোচক। তিনি অভিনব গুপ্তের শিষ্য-প্রশিষ্যমণ্ডলীর মধ্যগত। অভিনব গুপ্তের সম্প্রদায় মধ্যে মম্মটাচার্য্যের সমকক্ষ দার্শনিক বোধ হয় আর ছিল না। কাব্যপ্রকাশের বিচার অত্যন্ত মৌলিক, প্রগাঢ় ও গভীর। এই জন্যই কাব্যপ্রকাশ কঠিন গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু, এই কাঠিন্যের জন্য প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিই দায়ী, মম্মটাচার্য্য নহেন।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, কাব্যপ্রকাশ এ দেশে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। কাব্যপ্রকাশের তখন টোল ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু এই কাব্যপ্রকাশ পাঠ করেন। কাব্যপ্রকাশের "যঃ কৌমার-হরঃ" শ্লোকটি তাঁহার প্রেমময় জীবনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলিলেও ক্ষতি নাই।

(২) কাব্যশাস্ত্র, বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বাণীর যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,সেই সরস্বতীই,অলঙ্কারশাস্ত্রের যোগ্য অভীষ্ট দেবতা। এই জন্য, মহর্ষি তাঁহাকে "নিয়তিকৃত" এই শ্লোক দ্বারা প্রণাম করিতেছেন।

* মুনি ও মম্মটাচার্য্য উভয়েই ন্যায়-দর্শনের অনুগামী। এই জন্য উক্ত দর্শনের পারিভাষিক (Technical) শব্দ "নিয়তি" "পরমাণু" "উপাদান" "সহকারি কারণ" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু, সাংখ্য বা বেদান্তের পরিভাষা ব্যবহার করেন নাই। উক্ত মতে কথা বলিলে, এই শ্লোকের এত চমৎকারিতা জন্মিত না। এই শ্লোকের বিবৃতি দেখুন।

সুখ হওয়ার কথা নিরূপিত আছে। ব্রহ্মার সৃষ্টি, অদৃষ্টসংঘটিত, এই কঠোর নিয়মের অধীন।— কিন্তু বাণীর সৃষ্টি এরূপ কোন নিয়মের অধীন নহে।—ব্রহ্মার সৃষ্টিতে সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটিই আছে।—কিন্তু, বাণীর সৃষ্টিতে সুখ ছাড়া আর কিছুই নাই।—ব্রহ্মার সৃষ্টি পরমাণু প্রভৃতি উপাদান কারণ (১) (material causo) এবং মনুষ্যের কৃত কর্ম্মরূপ সহকারি (২) কারণের অধীন। কিন্তু, বাণীর সৃষ্টি সেরূপ কোন উপাদান বা নিমিত্ত কারণের অধীন নহে।—ব্রহ্মার সৃষ্টিতে মাত্র ছয়টি রস, আবার সেগুলি সকল অবস্থায় প্রীতিদায়ক নহে। কিন্তু, বাণীর সৃষ্টিতে আদিরস লইয়া নয়টি রস আছে। অথচ, উহারা সর্ব্বদাই প্রীতিপ্রদ। এই সকল কারণে বাণীর সৃষ্টি ব্রহ্মার সৃষ্টি হইতে ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত। অতএব, তাঁহার জয় হউক। জয় শব্দ দ্বারা নমস্কার সূচিত হইয়াছে। অতএব, বাণীর সমীপে আমি প্রণত হই, এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল। মুনি এই শ্লোক দ্বারা বাণীকে প্রণাম করিয়াছেন।

বিবৃতি। বৃত্তিকার বুঝাইয়াছেন, বাণীর অর্থাৎ কবির সৃষ্টিতে কোন উপাদানের প্রয়োজন নাই। লৌকিক ও ব্যবহারিক ঘট পটাদি বস্তুরই উপাদান আবশ্যক; কবির সৃষ্টি অলৌকিক, তাহার উপাদান নাই। যে বুদ্ধির নূতন নূতন উন্মেষ হয়, যাহার দীপ্তি আছে, তাদৃশী বুদ্ধিকে প্রতিভা বলে। এই প্রতিভাও কবি-সৃষ্টির উপাদান নহে। কি বেদান্ত, কি সাংখ্য, কোন মতেই প্রতিভা কবি-সৃষ্টির উপাদান নহে। বেদান্ত মতে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। রজ্জু কারণ, এবং তাহাতে আরোপিত সর্পটী তাহার কার্য্য। রজ্জুতে আরোপিত সর্পরূপ কার্য্য যেরূপ বস্তু, মৃত্তিকায় আরোপিত ঘটরূপ কার্য্যও সেইরূপ বস্তু; রজ্জু-সর্প যেরূপ মিথ্যা, মৃদ্ঘটও সেইরূপ মিথ্যা। রজ্জু-সর্প যেমন রজ্জু ছাড়া কিছু নহে, মৃদ্ঘটও সেইরূপ মৃদ্ ভিন্ন কিছু নহে। রজ্জু ও মৃদ্‌ই সত্য, সর্প ও ঘট উভয়ই মিথ্যা। কাজেই কারণে ভ্রমবশতঃ কার্য্য প্রতীতি হয়। কার্য্য কারণ ভিন্ন কিছু নহে; ভ্রম-বশতঃ ভেদ-প্রতীতি হয়। বেদান্তের এই বিবর্ত্তবাদ অনুসারে প্রতিভা কাব্যসৃষ্টির উপাদান নহে। কাব্য-সৃষ্টি ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় প্রতিভার বিবর্ত্ত নহে। কাব্য-সৃষ্টি অলৌকিক ও অনির্ব্বচনীয়।

সাংখ্য মতানুসারেও কবি-সৃষ্টি দুগ্ধ-বিকৃতি দধির ন্যায় প্রতিভার পরিণাম নহে। সাংখ্য মতে বুদ্ধি হইতেই ক্রমশঃ অহঙ্কারাদি ক্রমানুসারে মৃদাদি পঞ্চভূত জন্মিয়াছে। বুদ্ধি, মৃত্তিকার সজাতীয় সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। এই জড় বুদ্ধি হইতে ঘটাদির ন্যায়, কাব্য-সৃষ্টি হইতে পারে না। দধি যেমন দুগ্ধের বিপরিণাম, সেইরূপ কাব্য-সৃষ্টি বুদ্ধির বা প্রতিভার বিপরিণাম নহে। কবির সৃষ্টি প্রাকৃত বিকার নহে। উহা অলৌকিক ও অতি বিচিত্র। বাণীর সৃষ্টি অতি অলৌকিক এই কথা বলিবার জন্যই বৃত্তিকার কবির সৃষ্টিকে

(১) (২)। ৪৬৮ পৃষ্ঠার নোট দেখুন।

ব্রহ্মার সৃষ্টি হইতে ভিন্ন ও উপাদানাদি কারণ-শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহা যে কি বস্তু, তাহা এই অলৌকিকতা প্রতিপাদক শ্লোকে বলিতেও প্রবৃত্ত হন নাই। কাব্যের লৌকিক হেতু পরে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বৃত্তিঃ। ইহ অভিধেয়ং সপ্রয়োজন-মিত্যাহ।

অনুবাদ। এই কারিকাগ্রন্থে প্রতিপাদিত কাব্যের প্রয়োজন আছে, এই কথা বুঝাইবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোক বলা হইতেছে।

বিবৃতি। বাণী হইতে কাব্য সৃষ্টি হয়। এই জন্য বাণীর পূজা। কিন্তু, কাব্যের কোন প্রয়োজন না থাকিলে, কাব্যকর্ত্রী বাণীর পূজার আবশ্যকতা থাকে না; এই আশঙ্কায় কাব্যের কি কি প্রয়োজন আছে, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

কারিকা। কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে, (১) ব্যবহারবিদে, (২) শিবেতর ক্ষতয়ে,—সদ্যঃ পরনির্ব্বৃতয়ে, কান্তাসম্মিততয়োপদেশ যুজে (৩) ॥২।

কারিকার্থ। যশের জন্য, অর্থলাভের জন্য, ব্যবহার-জ্ঞানের জন্য, অনর্থনিবৃত্তির জন্য, তৎক্ষণাৎ পরমানন্দ লাভের জন্য, এবং বণিতাবৎ উপদেশ লাভের জন্য, কাব্য অবশ্যক। ২।

বৃত্তিঃ। কালিদাসাদীনামিব যশঃ, শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিবধনং, রাজাদিগতোচিতাচারপরিজ্ঞানং, আদিত্যাদের্ময়ূরাদীনামিব অনর্থনিবারণং, সকল-প্রয়োজন-মৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিত-বেদ্যান্তরং আনন্দং, (করোতীত্যত্রিমেণ পদেনান্বয়ঃ)।

অনুবাদ। কাব্য, কালিদাসাদি কবির যশের ন্যায় যশ প্রদান করে;—কবি ধাবক, রত্নাবলী রচনা করিয়া, রাজা শ্রীহর্ষ হইতে যেরূপ ধন পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ধন প্রদান করে;—ময়ূরভট্ট, সূর্য্যশতক রচনা দ্বারা সূর্য্য হইতে যেরূপ মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মঙ্গল প্রদান করে;—আবার সকল প্রয়োজনের প্রধান, তৎক্ষণাৎ কাব্যাস্বাদ-জনিত পরমানন্দের অনুভূতিরূপ প্রয়োজন সাধন করে। সে আনন্দ ভোগ করিবার সময়ে অন্য কোন জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না।

বৃত্তিঃ। প্রভুসম্মিত-শব্দপ্রধান-বেদাদি শাস্ত্রেভ্যঃ, সুহৃৎসম্মিতার্থতাৎপর্য্যবৎপুরাণেতিহাসেভ্যশ্চ, শব্দার্থয়োর্গুণভাবেন, রসাঙ্গভূতব্যাপার-প্রবণতয়া বিলক্ষণং যৎকাব্যং,—লোকোত্তর-বর্ণনা-নিপুণকবিকর্ম্ম, তৎ কান্তা ইব সরসতাপাদনেন অভিমুখীকৃত্য, রামাদিবৎ বর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ ইতি উপদেশং চ, যথাযোগং কবেঃ, সহৃদয়স্য চ, করোতি ইতি সর্ব্বথা তত্র যতনীয়ম্।

(১) অর্থকৃতে,—অর্থকরণায়, কৃধাতোর্ভাবে কিপ্। (২) ব্যবহার-বিদে,—ব্যবহার-বেদনায়, বিদধাতোর্ভাবে কিপ্। (৩) উপদেশ যুজে,—উপদেশ-যোগায়, যুজের্ভাবে কিপ্।

অনুবাদ। বেদ-শাস্ত্র, প্রভুর ন্যায়, শব্দ-প্রধান; পুরাণেতিহাস, সুহৃদের ন্যায়, অর্থ ও তাৎপর্য্য-প্রধান। কাব্যশাস্ত্র শব্দ-প্রধানও [অ]র্থ-তাৎপর্য্য-প্রধানও নহে। কাজেই [বেদ] এবং পুরাণ এই উভয় শাস্ত্র হই-তেই স্বতন্ত্রলক্ষণাক্রান্ত। কেন না, উহাতে শব্দ ও অর্থ এই দুইটিই গুণীভূত (অপ্রধান বা গৌণ) হইয়া, পড়িয়া থাকে; এবং উহাতে রসের অঙ্গীভূত ব্যঞ্জকতা বা ভঙ্গিক্রমে অভি-প্রায় প্রকাশকতা (ব্যঞ্জনা শক্তি) থাকে। এইরূপ কাব্য লোকোত্তর বর্ণনাকুশল কবির ক্রিয়া বিশেষ। উহা, শব্দার্থ ত্যাগ করিয়া, কান্তার ন্যায় স্বাভিমুখ্য সম্পাদনের দ্বারা, রামের ন্যায় চলিবেন, রাবণের ন্যায় চলি-বেন না, এইরূপ উপদেশ প্রদান করে; এবং কবি ও সহৃদয়কে, বর্ণিতরূপে, যথাযোগ ধন ও যশ প্রভৃতি দান করে। অতএব কাব্য-রচনা ও কাব্য পাঠের জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বিবৃতি। শব্দই প্রধান যাহার, তাহা শব্দ প্রধান। বেদশাস্ত্র শব্দ প্রধান, অর্থ প্রধান নহে। বেদোক্ত ক্রিয়া করিতে হইলে, বেদ যে শব্দ উচ্চারণ করিয়া যে অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন, ঠিক সেই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই অর্থ প্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু, সেই অর্থ বজায় রাখিয়া, অন্য শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। এইজন্য বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও উৎসর্গাদি ক্রিয়ায় বেদোক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া বাক্য করিতে হয়; নতুবা সেই সেই কার্য্যের কোন ফল হয় না। বিবাহাদি ক্রিয়ার বচন অনুবাদ করিয়াও কার্য্য করা যায় না। এই-জন্য বেদকে শব্দপ্রধান বলে। বৈদিক শব্দ মাত্রেরই স্বতন্ত্র প্রভাব আছে।

পুরাণ ও ভারতাদি ইতিহাস, বেদের ন্যায় শব্দ-প্রধান নহে। তাহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য অন্য যে কোন যোগ্য শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কাজেই তাহারা অর্থ-প্রধান। কেন না তাহাদের অর্থ অনুসারে কার্য্য করা হয়। পুরাণগণ, এইরূপে শব্দ ছাড়িয়া, অর্থ দ্বারা আমাদের উপকার করে বলিয়া, আমাদের সুহৃৎস্থানীয়।

কাব্যে বেদের ন্যায় শব্দ প্রাধান্য, বা পুরাণের ন্যায় অর্থপ্রাধান্য নাই। কাব্যোক্ত শব্দার্থ অতি দুর্ব্বল। উহাতে শব্দার্থ হইতে উত্থিত ব্যঞ্জকতা শক্তি বা ধ্বনি দ্বারা প্রকারান্তরে অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়। ব্যঞ্জকতাকে শব্দার্থ বলা যায় না, উহা অনিয়ত ভাববিশেষ। কাব্য, শব্দ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বনিতার ন্যায় ভঙ্গিক্রমে, প্রকারান্তরে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, এবং সরসতা দ্বারা সহৃদয়কে নিজের দিকে টানিয়া ফিরাইয়া রাখে, এইজন্য, উহার সঙ্গে রসবতী বনিতার সাদৃশ্য আছে। তৃতীয়াধ্যায়ে ব্যঞ্জনাশক্তির বিচারে, ইহা খুলিয়া বলা হইবে।

রামের ন্যায় চলিবে, রাবণের ন্যায় চলিবে না, এরূপ উপদেশ কাব্যের একটি লক্ষণ। যে কাব্য পাঠ করিলে, রাম অপেক্ষা প্রতিনায়ক রাবণের প্রতি অধিক অনুরাগ জন্মে, রাবণ সীতা হরণ করিয়াও আশা পূর্ণ-

করিতে পারিল না বলিয়া দুঃখ জন্মে, সে কাব্য কাব্যের সর্ব্বপ্রধান-লক্ষণশূন্য এবং ভারতের সত্ত্বগুণপ্রধান সহৃদয়-সমাজে নিতান্ত নিন্দিত সদোষ কাব্য। ইয়ুরোপীয় আদর্শে রচিত, প্রচলিত বাঙ্গালা মহাকাব্যনিচয়ে ও উপন্যাসাদি কাব্যে এই দোষ অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কাব্য "লোকোত্তর-বর্ণনা-নিপুণ কবির কর্ম্ম"। স্বর্গ ও দেবাদির বর্ণনা হইলেই তাহা লোকোত্তর বর্ণনা হয় না। গিরি, নদ নদী, ষড় ঋতু, সন্ধ্যা—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অনুরাগ, শোক ও উৎসাহ প্রভৃতির চমৎকৃতিজনক বর্ণনাকে লোকোত্তর বর্ণনা বলে। যে বর্ণনায় সহৃদয়ের বিস্ময় ও চমৎকার না জন্মে,তাহা লোকোত্তর বর্ণনা নহে। ব্যঞ্জনা শক্তির অধ্যায়ে ইহা বুঝান যাইবে। *যে বর্ণনায়, শব্দার্থের সর্ব্বতোমুখী ব্যঞ্জকতা* থাকে, এবং তাহা রস-সংযুক্ত রহে, সেই বর্ণনা লোকোত্তরতা লাভ করে। কালিদাসের মেঘদূত, কুমার, বিক্রমোর্ব্বশী, অভিজ্ঞান-শকুন্তল,—শ্রীহর্ষের রত্নাবলী,—বাণভট্টের কাদম্বরী,—ভবভূতির মালতীমাধব, উত্তরচরিত,—দণ্ডিকৃত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত ও অমরুশতক লোকোত্তরতার জন্য, সহৃদয়-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৃত্তিকারের মতে লোকোত্তরতাশূন্য বর্ণনাও কাব্যমধ্যে গণ্য হয়। এই জন্যই, ব্যঞ্জকতাশূন্য বাচ্যার্থপ্রধান কাব্যকে অবর কাব্য বলা হইবে। ইয়ুরোপীয় আদর্শে রচিত বাঙ্গালা মহাকাব্য সমূহে, বাচ্যার্থের প্রাধান্য বশতঃ লোকোত্তরতা বড় ঘটে নাই। লোকোত্তরতাশূন্য কাব্য, লবণ-রহিত ব্যঞ্জন; উহাতে উদর পূর্ণ হয়, কিন্তু রসনা তৃপ্তি লাভ করে না।

বাঙ্গালায় শব্দার্থ অতি দুর্ব্বল, এই তোচিতাঙ্গালা শব্দের উপর বিশেষ কারুকা...মিব অপারে না। এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, বৈষ্ণব কবিগণ রসব্যঞ্জকতার দিকে ধাবিত হইয়া, এক অভিনব লোকোত্তরতা উৎপাদন করিয়াছেন। কিন্তু, ঐ সকল অতি ঘন, অতি তরঙ্গিত, রসপ্রবাহে লোকোত্তরতা, অধিকাংশ স্থলেই অগূঢ়। এইজন্য উহা আলঙ্কারিকদিগের আদর্শভূত লোকোত্তরতা নহে। ভবভূতি করুণ-বিপ্রলম্ভরসে স্থানে স্থানে কতকটা চণ্ডিদাসাদি বৈষ্ণবকবিগণের ভাবাপন্ন। এইজন্য, তিনি উত্তর-চরিত লিখিয়াও, কবিকুল-গুরুর নিম্নে পতিত রহিয়াছেন। বৃত্তিকারের সম্মত' লোকোত্তরতা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। রসের বিচারে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। লোকোত্তরতা কাব্যের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

চতুর্থ শ্লোকে যদিও কাব্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তথাপি এই পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কাব্য লক্ষণ প্রবিকীর্ণ হইয়াছে। এ জন্য, ১ম ও ২য় শ্লোকেও ভঙ্গিক্রমে কাব্য লক্ষণ বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকের শেষ ভাগেও বলিয়াছেন "এই থানে কাব্যলক্ষণ শেষ হইল"। অর্থাৎ কাব্যের লক্ষণ বুঝিতে হইলে, কাব্যপ্রকাশের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করা আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্ এ, বি এল্।

কাব্যপ্রকাশ ও কবি মম্মট।

সংস্কৃতভাষা, অলঙ্কারশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সম্পদে, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে, সুপ্রসিদ্ধ। অলঙ্কারশাস্ত্রের নানাবিধ গূঢ়গভীর কথা লইয়া, সংস্কৃতভাষায় যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা হইয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন ভাষায় তাহা হয় নাই। অপিচ, ইহাও স্বীকৃত কথা যে, সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থনিচয়ের মধ্যে, কাব্যপ্রকাশই, সমগ্র ভারতবর্ষে, সকল শ্রেণির পণ্ডিতের নিকট সর্ব্বথা সম্মানিত।

বঙ্গীয়কবি বিশ্বনাথ-কবিরাজকৃত সাহিত্যদর্পণ, কোন কোন অংশে, কাব্যপ্রকাশ হইতে অধিকতর প্রশংসনীয় হইলেও, কাব্যপ্রকাশের রচনা অতি বড় গাঢ়, এবং আগাগোড়া সমস্ত স্থলই উচ্চপ্রতিভার পরিচায়ক। এ কথার ইহাই বিশেষ প্রমাণ যে, ভারতবর্ষের অন্যূন পঞ্চাশ জন পণ্ডিত, কাব্যপ্রকাশের টীকা লিখিয়াছেন;—মল্লিনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাব্যসমালোচকেরা, কাব্যপ্রকাশের কারিকা অথবা বৃত্তির প্রতিই সমধিক গৌরব দেখাইয়াছেন; এবং অদ্যাপি ভারতবর্ষের সুপরিচিত শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে, কাব্যপ্রকাশই একান্ত উৎসাহের সহিত অধীত, অধ্যাপিত ও নানাপ্রকারে আলোচিত হইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণ, বঙ্গদেশের বাহিরে, কোথাও তেমন সম্মানিত নহে। কিন্তু কাব্যপ্রকাশের সম্মান বঙ্গ ও বোম্বাই প্রভৃতি সকল প্রদেশেই সমান। এইক্ষণ প্রশ্ন এই, কাব্যপ্রকাশের রচয়িতা কে? মম্মট ভট্ট যে উহার বৃত্তিগুলি লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে কাহারও কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদ নাই। কিন্তু, বৃত্তির মূলসূত্র কারিকা। সে মূলীভূত কারিকাগুলি কাহার রচনা?

পণ্ডিতবর প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায়, স্বনামপ্রসিদ্ধ ভরত মুনিকেই, কাব্যপ্রকাশের কারিকা-রচয়িতা অর্থাৎ গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বসন্ত বাবু, ব্যবসায়ে উকীল হইলেও, পণ্ডিত-কবি এবং অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। তিনি, পাণিনীয় ব্যাকরণের কিঞ্চিদংশ অবলম্বনে, বাঙ্গালায় যে তিন চারি খানি ব্যাকরণগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ নিপুণতার নিদর্শন। আর, সম্প্রতি তিনি কাব্যপ্রকাশের অর্থবিবৃতিসমেত অনুবাদকার্য্যে অগ্রসর হইয়া, যেরূপ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। যদি, এই আরব্ধ কার্য্য তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে, এই এক গ্রন্থই তাঁহার যশঃস্তম্ভস্বরূপ বিদ্যমান রহিবে। তাদৃশ সুপণ্ডিত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। তথাপি, প্রকৃত সত্যের অনুরোধে, কথাটা আলোচনায় যোগ্য; এবং আমরা পুনরপি জিজ্ঞাসা করি,

কাব্যপ্রকাশের মূল-সূত্রস্বরূপ কারিকাগুলি কাহার লেখনীপ্রসূত ?

যাঁহারা, ইদানীং ভারতবর্ষে আলঙ্কারিক পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত, তন্মধ্যে অসংখ্যপণ্ডিত-রত্নপ্রসবিনী উর্ব্বর-বুদ্ধি বঙ্গভূমির অন্যতম উজ্জ্বল আভরণ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নাম আদরের সহিত উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে কাব্যপ্রকাশের বৃত্তি ও কারিকা উভয়ই এক হাতের লেখা,—একই দার্শনিক-কবি মম্মটভট্টের স্বপ্রণীত বস্তু। তাঁহার সিদ্ধান্ত সরল ও সারগর্ভ। আমরা, তাঁহার লেখার কিয়দংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া, প্রকাশ করিতেছি। তিনি, যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া, আপনার পরিগৃহীত সিদ্ধান্তে পৌঁচিয়াছেন, তাহাতে আপত্তির কোন স্থল আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার লেখার ভাবানুবাদ এই,——

"কাব্যপ্রকাশ দুইটি অংশে পল্লবিত। এক অংশের নাম কারিকা; আর এক অংশের নাম বৃত্তি। বঙ্গদেশে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কাব্যপ্রকাশ-নিবদ্ধ কারিকানিচয়, ভরতমুনি প্রণীত, এবং উহা অলঙ্কারসূত্র নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; মম্মট, ঐ সকল কারিকাসূত্রের বৃত্তি মাত্র রচনা করিয়াছেন, এবং সেই বৃত্তিগুলিই ইদানীং কাব্যপ্রকাশ নামে পরিচিত হইয়াছে। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়াই, কাব্যপ্রকাশাদর্শ নামক টীকাগ্রন্থের রচয়িতা মম্মট ভট্টকে বৃত্তিকাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন," ইত্যাদি। মহামহোপাধ্যায় পুনরপি কহিতেছেন,——

"বঙ্গদেশের এই প্রবাদ অবিচারমূলক। যদি, ভরতমুনিই কারিকানিচয়ের রচয়িতা হইবেন, তাহা হইলে, চতুর্থ উল্লাসে, কারিকা কথিত অর্থের সমর্থনের জন্য, "উক্তং হি ভরতেন" ইত্যাদি কথা দ্বারা, ভরতোক্তি উদ্ধৃত হইত না।"

মহামহোপাধ্যায়ের এ কথার উত্তর নাই। কারণ, কারিকাগুলি ভরতমুনির রচিত হইলে, কারিকাপ্রোক্ত সিদ্ধান্তসমর্থনের জন্য, আবার সেই ভরতেরই দোহাই দেওয়া হইবে কেন? ভরতমুনি, মহামহোপাধ্যায়ের মতে, নাট্যসূত্র মাত্রের রচয়িতা। যথা তদুর্দ্ধৃত দশরূপক-কারিকায়,—

"যং নাট্যবেদং বেদেভ্যঃ সারমাদায় ব্রহ্মা কৃতবান্, যৎসম্বদ্ধমভিনয়ং ভরতশ্চকার ইতি।" ভরত প্রসঙ্গতঃ রসাদিবিষয়ক সূত্রনিচয়ও রচনা করিয়াছেন, কখনও অলঙ্কারসূত্র রচনা করেন নাই। তিনি যে নাট্যাচার্য্য নামেই প্রসিদ্ধ, ইহাই তাহার কারণ।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়, এ প্রসঙ্গে আরও বহু কথা লিখিয়াছেন। আমরা এ স্থলে তাঁহার সমস্ত কথার অনুবাদ করিয়া, এই ক্ষুদ্র মন্তব্যকে একটি বৃহৎ প্রবন্ধে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু, তিনি যেরূপ প্রমাণপ্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া, মম্মট ভট্টকে কাব্যপ্রকাশের কারিকারচয়িতা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে চিত্তে সন্দেহের আর স্থল থাকে না। তবে, তিনি ইহা

স্বীকার করেন যে, কাব্যপ্রকাশের অনেক কারিকা অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ। মম্মট সে গুলিকে স্থানে স্থানে পরিশোধন, পরিবর্ত্তন, অথবা প্রয়োজনানুরোধে পরিবর্দ্ধন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে, আপনার বস্তুরূপে, ব্যবহার করিয়াছেন।

পশ্চিম ভারতের পণ্ডিতবর্গ, ন্যায়রত্ন অপেক্ষাও, মম্মট ভট্টের অধিকতর পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের মতে কাব্যপ্রকাশের একটি পংক্তিও ভরতমুনির নহে। তাঁহারা এই কথার প্রমাণার্থ, দশম-উল্লাসের 'মালা তু পূর্ব্ববৎ' এই কারিকাটিকেই বিশেষরূপে উল্লেখ করেন; এবং যে মালোপমার কথা, কারিকার কোন স্থলেও উক্ত হয় নাই, অথচ বৃত্তিতে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, সেই মালোপমা সম্পর্কে এস্থলে কারিকার সূত্রে দৃষ্টান্ততা সম্ভাবনে, এক মাত্র মম্মটকেই সূত্রকার ও বৃত্তিকার বলিয়া অবধারণ করেন।

বস্তুতঃ, আমরা সামান্যতঃ যতটুকু বুঝি, তাহাতে ইহাই মনে লয় যে, পরবর্ত্তী বিশ্বনাথ যেমন আপনি ছন্দোবদ্ধ বাক্যে সাহিত্যদর্পণের সূত্ররচনা করিয়াছেন, এবং আপনিই আবার গদ্যে তাহার বৃত্তি করিয়া, এই প্রথার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন; মম্মট ভট্টও সেইরূপ আপনিই কারিকা লিখিয়াছেন, এবং আপনিই আবার গদ্যে তাহার বৃত্তি বুঝাইয়াছেন। মম্মট ভট্টের সময়ে এ প্রথার প্রচলন না থাকিলে, প্রান্তবঙ্গের বিশ্বনাথ ইহার অনুসরণ করিতে প্রবর্ত্তিত হইতেন না। কাব্যপ্রকাশের কারিকাগুলি যে, কোন অংশেও, ভরতমুনির বস্তু নহে, ন্যায়রত্নধৃত অলঙ্কারশেখরের একটি উক্তিও তাহার বিশেষ প্রমাণ। যথা,——

"অলঙ্কারবিদ্যায়াঃ সূত্রকারো ভগবান্ শৌদ্ধোদনিঃ;" অর্থাৎ ভগবান্ শৌদ্ধোদনিই, অলঙ্কার-সূত্রের সূত্রকার। এই শৌদ্ধোদনির সূত্রনিচয় আমরা কখনও চক্ষে দেখি নাই। যদি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলোকদান করিলেও আমরা তাহা গুরুতর অনুগ্রহ বলিয়া মানিয়া লইব।

অন্তিম দর্শন

অথবা

অনন্তযাত্রার বিদায়গ্রহণ।

উপক্রম।

পিঞ্জরের বিহঙ্গ যখন, পিঞ্জর হইতে অকস্মাৎ মুক্তি লাভ করিয়া, আকাশে উড়িয়া যায়, তখন উহা সে পরিত্যক্ত পিঞ্জরের পানে প্রায়শঃ ফিরিয়া চাহে না; এবং যাহারা উহার পিঞ্জরের সাথী ছিল, অনেক সময়, তাহাদিগেরও কোন সংবাদ লয় না। উহা তখন আকস্মিক মুক্তির অপূর্ব্ব আন-

দেহই অধীর ও আত্মবিস্মৃতবৎ রহে; সুতরাং সংবাদ লইবে কাহার, অথবা কিসের?

কিন্তু, মনুষ্যের অবস্থা আর একপ্রকার। মনুষ্য যখন, দেহপিঞ্জর হইতে, নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের মত, মুক্তি লাভ করে, তখন সে তাহার ঐ পরিত্যক্ত পিঞ্জরের প্রতি বহুক্ষণ আকৃষ্ট রহে; এবং যাহারা সাংসারিক জীবনে সুদীর্ঘকাল তাহার পিঞ্জরের সাথী ছিল, তাহাদিগকে দর্শনদানের জন্যও প্রাণে একান্ত আকুল হইয়া উঠে।

এ কথা আমাদিগের মনঃকল্পনা নহে। যাঁহারা পৃথিবীর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, পর-পারে যাইয়া 'সুস্থিত' হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই, অধ্যাত্ম-আলাপের বিবিধ প্রণালীতে * উপদেশ-প্রার্থী সুহৃৎস্বজনকে ইহা জানাইয়াছেন।

তবে, তাঁহারা শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনে,—অনন্তযাত্রার সে অচিন্তিত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তক্ষণে, আত্মীয়স্বজনকে মনের সাধ পূর্ণ করিয়া দেখা দিয়া যান না, ইহার কারণ কি? এ বিষয়েও পরলোকবাসী সূক্ষ্মশরীরীরা অশেষ উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জীবনের ঐ মহামুহূর্ত্তে,—ইহকাল ও পরকালের ঐ মহাসন্ধিসময়ে, অনেকের 'কিছু কাল' চৈতন্য থাকে না। অনেকে তখন, চৈতন্যসম্পন্ন রহিয়াও, পিছনের দিকে আর ফিরিয়া চাহিতে ভালবাসেন না। অনেকে আবার, ইচ্ছা সত্ত্বেও, দর্শনদানের উপযোগি শক্তির অভাবে, দেখা দিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, যাঁহারা এ পারে আছেন, তাঁহাদিগেরও এক শতের মধ্যে একজন আত্মিক-মূর্ত্তি দর্শনের উপযুক্ত শক্তি রাখেন না।

এই সকল এবং আরও বহু কারণে, যাইবার সময়, জীবনের শেষ দেখা দিয়া যাওয়া মনুষ্যের মধ্যে সকলের ভাগ্যে সংঘটিত হয় না। তথাপি, উল্লিখিতরূপ দর্শনদানের এত আশ্চর্য্য কাহিনী অকাট্য প্রমাণসহকারে গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয় চমকিত হয়, এবং চিত্ত, পৃথিবীর ক্ষণিক সুখ ও ক্ষণিক দুঃখের ধূলিখেলা বিস্মৃত হইয়া, ঈশ্বর ও অনন্তকাল-স্থায়ি পরলোকের কথা চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আমরা, এতৎ সম্পর্কে, কএকটি প্রামাণিক কাহিনী বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিব। কাহিনীগুলি যে সুবিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত,

* আলাপ অনেক প্রকারে সংসাধিত হইয়া থাকে। পরলোকবাসিদিগের মধ্যে কেহ স্বপ্নে দেখা দেন,—স্বপ্নেই কথা কহেন; কেহ ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়া, মনুষ্যের মত স্পষ্ট শব্দে মনের কথা জ্ঞাপন করেন। কেহ বা, কোন মিডিয়ম অর্থাৎ মাধ্যমিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির দেহে আবিষ্ট হইয়া, তাহার জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত ভাষায় আলাপ করেন। কেহ কেহ আবার, প্লাঞ্চেট অথবা উয়িজাবোর্ড প্রভৃতি তথাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে, মনুষ্যের কর-স্পর্শসম্পর্কশূন্য পেন্সিল অবলম্বন করিয়া, জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়া জানান। প্রণালীর এইরূপ পার্থক্য, অধ্যাত্মশক্তির তারতম্য হেতু। ছায়াদর্শনের অনেক প্রবন্ধে, এ সকল কথা নানাপ্রকারে বিবরিয়া বুঝান হইয়াছে।

এ কথার জন্য আমরাই দায়ী রহিলাম; কিন্তু, অর্থ ও তাৎপর্য্যসংগ্রহ পাঠকের আত্মকার্য্য। কোন্ কাহিনীটি হৃদয়কে কিরূপ সত্যে আকর্ষণ করে, পাঠক নিজে তাহা পরীক্ষা করিবেন।

(১)

এলবার্ট ফিচে * ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনর ছিলেন। ফিচে, রাজ্যশাসন সম্পর্কে যেমন যশঃকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পাণ্ডিত্য ও ধার্ম্মিকতার জন্যও সেইরূপ, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই পূজা পাইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত (Burma Past and Present) ব্রহ্মদেশের ভূত ও বর্ত্তমান কাহিনীনামক গ্রন্থ অদ্যাপি অনেকে ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই, অলৌকিকে অবিশ্বাসী। ফিচেও দীর্ঘকাল অলৌকিকে অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি, ঈশ্বর মানিতেন, পরলোকও মানিতেন, কিন্তু মানিতেন না পরলোকের সহিত ইহলোকের প্রীতিসম্বন্ধ। যাঁহারা পৃথিবীর তনু ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারেন, এবং পৃথিবীর বন্ধুবান্ধবদিগকে, সূক্ষ্মতর শরীরে, দর্শনদানে কৃতার্থ করিতে পারেন, এমন অদ্ভুত কথায় কোন প্রকারেও তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। কিন্তু, বিশ্বাসের আলোক যখন ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়, তখন কে উহা অতিক্রম করিতে পারে? ফিচেরও বিশ্বাস হইল; এবং সে বিশ্বাস, বজ্রলেপবৎ তাঁহার হৃদয়ে চিরকালের তরে নিবদ্ধ রহিল।

ফিচে যখন রাজকীয় কর্ম্মসম্পর্কে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মুলমিন নগরে অবস্থিত ছিলেন, তখন এক দিন, তিনি, প্রভাত সময়ে, শয্যাত্যাগ করিয়া, মুখ-প্রক্ষালনাদি প্রাতঃকার্য্য সমাপনের পর, শয্যাগৃহের সমীপবর্ত্তি আর একটি ঘরে বস্ত্র পরিধান করিতেছেন। শয্যাগৃহ, বস্ত্রগৃহ ও গৃহের বারিন্দা, সমস্তই তখন, প্রভাত-সূর্য্যের ঝলমল দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। মাঝে মাঝে, ভৃত্যেরা আসিতেছে, ভৃত্যেরা যাইতেছে, এবং একে অন্যের সহিত কথা কহিতেছে। ফিচে, ঐ সময় দেখিতে পাইলেন, একটি ভদ্র লোক বারিন্দার এক দ্বার দিয়া, তাঁহার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

পরের গৃহে, অনুমতি বিনা, এইরূপ প্রবেশ একান্তই রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু, যিনি ফিচের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা রীতিবিরুদ্ধ নহে। কেন না, তিনি ফিচের প্রাণ-সুহৃদ্। দুই জনে, এক সঙ্গে, শিশুকালে, গলায় গলায় গাঁথা রহিয়া, শিশুশিক্ষার বিদ্যালয়ে, শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি পড়িয়াছেন। তার পর, কলেজেও দুজনে একই 'মেসে' অবস্থান করিয়া, একত্র শিক্ষালাভ করিয়াছেন; এবং পরিপক্ক বয়সে, কর্ম্মসূত্রে পরস্পরের দূরবর্ত্তী হইয়া থাকিলেও, আশৈশব-বর্দ্ধিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের মধুর আকর্ষণে ও ভালবাসার সেই কেমন এক বন্ধনে, জীবনের সকল অবস্থায়ই একপ্রাণতায় আনন্দ অনুভব করিয়াছেন।

* Lieut.—Gen. Albert Fytche.

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তখন ফিচের বন্ধু, মুলমিন হইতে ৬০০ শত মাইল দূরে, একটি নগরে অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু, সেখান হইতে সর্ব্বদাই মুলমিনে জাহাজে যাতায়াত হইত। সুতরাং, ঐরূপ আকস্মিক আগমন কোন অংশেও অসম্ভব নহে। ফিচে তাঁহার শৈশব-সুহৃৎ ও প্রাণ-প্রিয় বন্ধুকে সহসা ঐরূপ সমাগত দেখিয়া, আনন্দে একবারে অধীর হইলেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন,—"ভাই, এক পিয়ালা গরম চায় হুকুম দিয়া বারিন্দায় যাও, আমি এখনই তোমার কাছে আসিতেছি।"

ফিচে, তাঁহার তাদৃশ বন্ধুর সহিত প্রাণ-ভরা ভালবাসার আলাপ ও আপ্যায়নের জন্য কিরূপ উৎসুক, তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। তিনি অতি দ্রুত বস্ত্র পরিধান করিয়া, বারিন্দায় বসিবার স্থানে আসিলেন; এবং তাঁহার বন্ধুকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার বন্ধু সেখানে নহেন। তিনি যার-পর-নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অমনিই তাঁহার ভৃত্য-দিগকে ডাকিলেন। কিন্তু, ভৃত্যেরা কেহই কিছু কহিতে পারিল না। কেন না, তাহারা তাঁহার বন্ধুকে দেখে নাই। দ্বাররক্ষক সন্ত্রীকে ডাকিলেন, সেও কোন ব্যক্তিকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিতে পায় নাই।

উল্লিখিত অবস্থায় ফিচে, দিবসের ঐরূপ পরিস্ফুট আলোকে, চক্ষে তবে কি প্রত্যক্ষ করিলেন? তাঁহার চিত্ত, ভয়ে ও ভাবনায়, স্তম্ভিতপ্রায় হইল। তিনি এক দুই করিয়া দিন গণিতে লাগিলেন, এবং চৌদ্দ দিন পরে সংবাদ পাইলেন যে, যে সময়ে তাঁহার বন্ধু মুলমিনে তাঁহাকে ঐ ভাবে দেখা দিয়া, যেন অনন্তকালের অনন্তযাত্রার বিদায় লইয়া ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে, অথবা তাহার একটুকু মাত্র পূর্ব্বে, ছয় শত মাইল দূরে, দেশান্তরে, তাঁহার তনুত্যাগ হইয়াছিল। ফিচে যে তাঁহার পরলোক-প্রবিষ্ট প্রিয়তম বন্ধুকে প্রয়াণ-মুহূর্ত্তেই চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও সংশয় ছিল না। কারণ, তিনি লিখিয়াছেন, যে তিনি এই প্রত্যক্ষদর্শনের সত্যতা সম্বন্ধে শপথ করিতে প্রস্তুত।*

এই দর্শন দানে, নিম্নলিখিত কএকটি কথা প্রমাণিত হইতেছে। (১) যাঁহারা চলিয়া যান, তাঁহাদিগের হৃদয় ও মন পৃথিবীতে যেমন ছিল, অন্ততঃ কিছু কাল, তেমনই রহে; এবং মনের পুরাতন সংস্কার-নিচয় ও হৃদয়ের চিরসঞ্চিত ভালবাসা, তেমনই অপরিবর্ত্তিত রহিয়া, প্রবল শক্তিতে কার্য্য করে। (২) মৃত্যুর অর্থ,—বিলয় নহে, দেহান্তর-লাভ। পৃথিবীতে যে মুহূর্ত্তে মনুষ্যের মৃত্যু ঘটে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই, লোকান্তরে, সূক্ষ্ম-শরীরে, তাহার পুনর্জ্জন্ম ঘটে; এবং সে প্রাকৃতনিয়মে, অধ্যাত্মধামে, পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া, নূতন দেহে, নূতন শক্তি ও নূতন

* ফিচে প্রণীত ব্রহ্মদেশের বিবরণ। আমরা, ইদানীং ব্রহ্মদেশ-নিবাসী, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু শ্রীমান্ বাবু ভূপেন্দ্রনাথ দাসের অনুগ্রহে এই বিবরণে প্রথম আকৃষ্ট হই।

স্ফূর্ত্তির সহিত, নূতনপ্রকারের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। (৩) তাহার ঐ নূতন দেহ পুরাতন পার্থিবদেহের প্রতিকৃতির মত হইলেও, উহা সুক্ষসার তেজোময় বস্তুতে রচিত, এবং গতায়াত ও জ্ঞান-লাভের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। পৃথিবীর মনুষ্য, এক মিনিটে এক শত পদের ব্যবধানও অতিক্রম করিতে পারে না; কিন্তু, পৃথিবীর পরপারবর্ত্তী সুক্ষশরীরীরা, এক মিনিটে ছয় শত কিংবা ছয় হাজার মাইল পথও মানসিক বস্তুর ন্যায় চলিয়া যাইতে পারে। মহাকবি শেক্ষপীর সেইরূপ বস্তুকে —"Such stuff as dreams are made of"—অর্থাৎ স্বপ্নের উপাদান-বস্তুসদৃশ মনে করিয়াছেন। কিন্তু অধুনাতন জড়বিজ্ঞানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে বস্তু যত বেশী সুক্ষ, সেই বস্তুই তত বেশী সারসম্পন্ন, শক্তিযুক্ত, সুদৃঢ়গঠিত, ও সর্ব্ববিধ কর্ম্মসমর্থ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম। তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায়-নিবদ্ধ।—মূল্য ১৷৷৹ টাকা।" "হদিস —পূর্ব্ব বিভাগ, অর্থাৎ পূর্ব্বার্দ্ধ। সুপ্রসিদ্ধ আরব্য হদিস পুস্তক 'মেস্কাত্তোল্‌মসাবিহ' হইতে অনুবাদিত,—প্রসিদ্ধ ভাষা 'এশাতোল্‌মাত্ত' অবলম্বনে টীকা লিখিত। মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।" ৩। "আচার্য্য কেশবচন্দ্র। অন্ত্য বিবরণ, তৃতীয় অংশ। মূল্য ১৲ টাকা।" আমরা কলিকাতাস্থ নববিধানমণ্ডলীর ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এই তিন খানি বহুমূল্য পুস্তক উপহার পাইয়া একান্ত আপ্যায়িত ও উপকৃত হইয়াছি। এ সকল পুস্তক, শুধু সাহিত্যসম্পর্কে সমালোচিত হইতে পারে না। তাহা কর্ত্তব্য নহে। ইহার প্রত্যেক খানিই অর্থে গম্ভীর, উদ্দেশ্যে উদার ও উন্নত; সুতরাং ভক্তি ও বিশ্বাসের আলোকে সমালোচ্য। ইহা বলাবাহুল্য যে, তাদৃশ সমালোচনা শ্রম-সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ। আমরা, ক্রমে ক্রমে, যথাশক্তি সমালোচনা প্রকাশে যত্নপর হইব।

২। "রচনানুবাদ-শিক্ষা। কলিকাতা, ৩৯নং বসুপাড়া লেন-স্থিত সংস্কৃতবিদ্যালয় হইতে কাব্যতীর্থোপনাম শ্রীগুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত ও প্রকাশিত;—শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রি সংশোধিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।" পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গুরুনাথ বিদ্যানিধি কলাপ-ব্যাকরণের বিবিধ গ্রন্থ এবং মিত্রলাভ প্রভৃতি সাহিত্যপুস্তক সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া, শিক্ষার্থিদিগের অশেষ উপকার করিয়াছেন, এবং শিক্ষিতসমাজেও যার-পর-নাই যশঃপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই 'রচনানুবাদ-শিক্ষা' যে লব্ধ-যশ ও শ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠাকে যে সমধিক উজ্জ্বল করিবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এ পুস্তক খানি সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের জন্য, একটি অতি উপাদেয় আলোক-বর্ত্তিকার মত। যাহারা কলেজিয়েট স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসে, অথবা সংস্কৃত টোলে ব্যাকরণ সাহিত্যের শ্রেণীতে হিতোপদেশ প্রভৃতি পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিয়াছে, তাহারাই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে; এবং ইহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ ও প্রত্যেক পৃষ্ঠাই তাহাদিগের উপকারে আসিবে। বিদ্যানিধি মহাশয় সংস্কৃত-

ব্যাকরণসাহিত্যে সুগভীর পণ্ডিত, ইহাই এত দিন আমাদিগের ধারণা ছিল; কিন্তু, তাঁহার এই 'রচনানুবাদ-শিক্ষা' যেরূপ বিষয়বিন্যাসের পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলার সহিত রচিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের এইরূপ মনে লইতেছে যে, হয় তিনি ভাল ইংরেজী শিখিয়াছেন, না হয় ত রচনা ও অনুবাদ-শিক্ষার উপযোগি গ্রন্থ পত্র ইংরেজী ভাষায় কিরূপ উৎকৃষ্ট শৃঙ্খলার সহিত রচিত হয়, তাহা তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ সময়ে আমরা পুনঃ পুনঃই বলিয়াছি,—

"ন খলু ধীমতাং কশ্চিদবিষয়ো নাম।" বিদ্যালয়ের বালকেরা, এই পুস্তক খানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিলে, তাহাদিগের সে শ্রম বিফল হইবে না।

৩। "কল্কি-অবতারের মোকদ্দমা।—অথবা বিক্রমপুরে ভীষণ ব্যভিচার। (ঢাকা-প্রকাশ হইতে পুনর্মুদ্রিত)।" আমরা বঙ্গদেশের হিন্দুমাত্রকেই এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতির গৌরব এবং স্বসমাজস্থ পুর-মহিলাদিগের জাতি, মান ও ধর্ম্মরক্ষার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহাদিগকে এই পুস্তক পাঠ করিতে বিশেষরূপে অনুনয় করি। বিক্রমপুরবাসীরা, 'বিক্রমপুর' এই নামটি লইয়া, বড়ই অভিমানের ভাব পোষণ করেন; এবং পুরাতন গ্রন্থপত্রে 'বিক্রমপুর' শব্দ শ্রীসংযোগে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, সভাস্থলেও বক্তৃতা করিয়া থাকেন। সেই বিক্রমপুরের কেন্দ্রস্থলে, কএকটা কুৎসিত-লালসাকুল কুকুর ও ক্রূর-কঠোর পিশাচ, কল্কি-অবতাররূপে প্রকট হইয়া, এত কাণ্ড করিয়াছে,—এত সম্ভ্রান্ত পুর-সুন্দরীর সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, আর বিক্রমপুরবাসীরা ঢাকা, কলিকাতা, হায়দরাবাদ ও কামস্কট্কা প্রভৃতি স্থানে বসিয়া ভারত-উদ্ধারের কবিতা আওড়াইতেছেন! ধিক্ আমাদের শিক্ষায়, ধিক্ আমাদিগের স্বজাতিবাৎসল্যে, এবং ততোধিক ধিক্কার আমাদিগের মনুষ্যত্বে!

যিনি এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বদেশহিতৈষী। আমাদের বোধ হয়, পুস্তকের স্থানে স্থানে, তাঁহার লেখনী অশ্রুজলে সিক্ত হইয়াছে। আমরাও ইহা পড়িবার সময় কখনও কাঁদিয়াছি, কখনও ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছি। প্রকাশক যদি দয়া করিয়া, দশ জনের সাহায্যসহকারে, এই পুস্তকের লক্ষ কাপি পুনর্মুদ্রিত করেন, এবং সমৃদ্ধ সামাজিকদিগের বিশেষ আনুকুল্যে ইহা ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত, সকল জাতির মধ্যে অর্দ্ধ মূল্যে বিলাইয়া দেন, তাহা হইলে দেশের একটা কার্য্য হইবে। বিক্রমপুরে অনেক ধনী লোক আছেন, তাঁহাদিগের ধনও, ঈদৃক্ অনুষ্ঠানে, স্বদেশের কল্যাণসাধনে, সার্থকতা লাভ করিবে। শুনিয়াছি, এ পুস্তক লইয়া ঢাকায় ছুটাছুটি হইতেছে; এবং যে পড়িতেছে, সেই ক্রোধার্ত্ত ব্যাঘ্র কিংবা কুপিত-ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। ইহাতে যে সকল কথা বিবৃত হইয়াছে, সমগ্র মানবজাতির সমবেত ইতিহাসে তাহার শতাংশও আর কখনও সংঘটিত হইয়াছে, এমন আমরা কানে শুনি নাই, কল্পনা করিতেও সমর্থ হই নাই। আমরা পুনরপি বলিতেছি, ধিক্ আমাদিগের জাতিমানে! ধিক্ বিক্রমপুরের দলাদলি তর্জ্জন ও ব্রহ্মণ্য গল-গর্জ্জনে! ধিক্ হিন্দুর হিন্দুত্বাভিমানে! এই পুস্তক ঢাকাপ্রকাশ কার্য্যালয়ে প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

হিন্দুজ্যোতিষ।

হিন্দুজ্যোতিষ প্রথমতঃ বেদে, তৎপর পুরাণে এবং অবশেষে সিদ্ধান্তগ্রন্থে প্রাপ্তব্য। ইহাদিগকে ক্রমে বেদ-মধ্যগত জ্যোতিষ, পুরাণান্তর্গত জ্যোতিষ এবং সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ, বলা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদাদির স্থানে স্থানে,যে সকল জ্যোতিষিক ঘটনাবলী বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাই বেদ-মধ্যগত জ্যোতিষ। যজ্ঞ সম্পাদনের কাল নির্ণয়ের জন্য, প্রাচীন ঋষিগণ বেদ-মধ্যস্থ জ্যোতিষ অবলম্বন করিয়া, যে ক্ষুদ্র জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ নামে খ্যাত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে সূর্য্য চন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন গ্রহের উল্লেখ নাই। যজ্ঞকাল নির্ণয় করা যখন উদ্দেশ্য, তখন সূর্য্য চন্দ্রাতিরিক্ত গ্রহোল্লেখের প্রয়োজনও দেখা যায় না। বেদ-মধ্যগত জ্যোতিষ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, সৌর-চান্দ্র বর্ষের পার্থক্য, অধিমাসের প্রবর্ত্তনা প্রভৃতি অতি প্রাচীন সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। চন্দ্র নিজে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহে, উহা সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া, আমাদিগের নৈশ-অন্ধকার বিদূরিত করে, ইহাও সেই কালে বিদিত ছিল।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া, প্রাচীন ঋষিগণ যে যে বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা বেদ-মধ্যগত জ্যোতিষের সহিত মিশ্রিত ভাবে পুরাণে, কোথাও স্পষ্টতঃ এবং কোথাও রূপকের আকারে অস্পষ্টতঃ বর্ণিত। দার্শনিক কঠোরতা দূরীকরণোদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে রূপকের সাহায্যে এরূপ সকল উপাখ্যান প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, এইক্ষণ তাহার রহস্যভেদ করাই দুষ্কর। পুরাণে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নব-গ্রহেরই গতিবিধি বর্ণিত রহিয়াছে। অনেক স্থলে, বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনা একত্র আলোচনা না করিলে, ঠিক্ দার্শনিক সত্য স্থির করা সুকঠিন। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের মতে কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে ইন্দ্র, উপেন্দ্র, অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্ সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের নাম। লিঙ্গ ও কূর্ম্ম পুরাণের মতে, মাঘ মাসে বরুণ, ফাল্গুন মাসে পূষা, চৈত্রে অংশ, বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে অর্য্যমা, শ্রাবণে বিবস্বান্, ভাদ্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জ্জন্য, কার্ত্তিকে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণে মিত্র এবং পৌষে বিষ্ণু তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আদিত্য এক বৎসরের মাসভেদে তাপের পার্থক্য হেতু, দ্বাদশ আদিত্যের কল্পনা। তৈত্তিরীয় সংহিতার মতে প্রজাপতি হইতে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি। বৈদিক ভাষাতে প্রজাপতি

অর্থ সম্বৎসর ; সুতরাং ইহা দ্বারা সম্বৎসরে দ্বাদশ আদিত্যের প্রকাশ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। বালগঙ্গাধর তিলক বলেন, যখন মহাবিষুবন্ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ছিল, তখন সৌরবর্ষের গণনা আরম্ভ করা হয়। কাজেই প্রজাপতি বা সম্বৎসর হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি এবং পুনর্ব্বসুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি হইতে তাহার নাম আদিত্য।

বেদ-মধ্যগত জ্যোতিষ কি পৌরাণিক জ্যোতিষ আলোচনা করিয়া,বহু জ্যোতিষিক তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায় সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে সময়ের কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। যে সকল মহাত্মা গণিত ও জ্যোতিষের আলোচনা দ্বারা আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না, তাঁহাদিগের মধ্যে আর্য্যভট্টই প্রথম। তাঁহার রচিত আর্য্যসিদ্ধান্তের কালক্রিয়া পাদের দশম শ্লোকে দেখা যায়—

ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দা স্তদেহ মম জন্মনো
হতীতাঃ।

অর্থাৎ কলিযুগের ষাইটগুণিত ষাইট বৎসর অথবা ৩৬০০ বৎসর অতীত সময়ে, আমার জন্ম হইতে ২৩ বৎসর অতীত হইয়াছিল। অতএব খৃষ্টীয় ৪৭৬ সনে, আর্য্যভট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জানা যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম বিধি মত যে ভূ-ভ্রমণবাদ কপার্নিকাস ইয়োরোপে প্রচার করেন, তাহার সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে আর্য্যভট বলিয়াছেন "ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকাবুদয়াস্ত মরৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহাণাং"। নভোমণ্ডল স্থির, পৃথিবীই অনবরত আবর্ত্তন করিয়া গ্রহনক্ষত্রের দৈনিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে। এই আর্য্যভটই গ্রীকদিগের নিকট অর্জুবিয়স্ এবং আরবীয়দিগের নিকট অর্জ্জভর নামে খ্যাত। সে সময়ের জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ তিন স্কন্ধে বিভক্ত ;—তন্ত্র স্কন্ধ, হোরা স্কন্ধ এবং মিশ্র স্কন্ধ। জ্যোতিষের যে বিভাগ দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, সেই স্কন্ধের নাম তন্ত্র জ্যোতিষ বা গণিতজ্যোতিষ। যে স্কন্ধ দ্বারা জাতকের জন্ম লগ্নাদি নিরূপণ করতঃ তাহার ভাগ্যফল বিচার করা যায়, সেই স্কন্ধের নাম হোরা বা ফলিত-জ্যোতিষ। যে শাখা স্কন্ধে যাত্রা পরিপাটী, বিবাহ গর্ভাধান, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার প্রকরণ, রাষ্ট্রবিপ্লব, এবং প্রশ্ন বিষয়ক শুভাশুভ গণনা প্রভৃতি বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম মিশ্র স্কন্ধ। এই ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষ যে গ্রন্থে বর্ণিত থাকে, তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলে। ভারতবর্ষে ১৮ খানা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। যথা ১ সূর্য্য, ২ ব্রহ্মা, ৩ ব্যাস, ৪ বশিষ্ঠ, ৫ অত্রি, ৬ পরাশর, ৭ কশ্যপ, ৮ নারদ, ৯ গর্গ, ১০ মরীচি, ১১ মনু, ১২ অঙ্গিরা, ১৩ লোমশ, ১৪ পৌলিশ, ১৫ ভৃগু, ১৬ যবন, ১৭ বৃহস্পতি এবং ১৮ শৌনক। এই ১৮ খানা সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মধ্যে ১৭ খানাই পাওয়া যায়

না; কেবল সূর্য্য সিদ্ধান্ত নামে একখানা দেখা গিয়া থাকে। তাহাও আসল সূর্য্য-সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উহার মধ্যেই একটি শ্লোক পাওয়া যায়।—

শৃণুষ্বৈকমনাঃ পূর্ব্বং যদুক্তং জ্ঞানমুত্তমং
যুগে যুগে মহর্ষীণাং স্বয়মেব বিবস্বতা।
শাস্ত্রমাদ্যং তদেবেদং যৎ পূর্ব্বং প্রাহ ভাস্করঃ
যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলম্॥

অর্থাৎ যুগে যুগে মহর্ষিগণকে স্বয়ং সূর্য্যদেব যে উত্তম জ্ঞান বলিয়া থাকেন, তাহা এক মনে হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভাস্করদেব যে আদি শাস্ত্র বলিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই এই। যুগ পরিবর্ত্তনহেতু, ইহাতে কেবল কালভেদ মাত্র। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্ত আদি মূল সূর্য্য-সিদ্ধান্তের এক সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। সুতরাং দেবপ্রণীত কি ঋষিপ্রণীত মূল ১৮ খান সিদ্ধান্তের একখানিও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর্য্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ-মিহির, ভাস্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এবং উপরি-উক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তই হিন্দু জ্যোতিষের মূল ভিত্তি। হিন্দুশাস্ত্রে বিজাতীয় রীতিনীতি গ্রহণ, এমন কি ভাষা অধ্যয়ন সম্বন্ধেও যেরূপ স্পষ্ট নিষেধ দেখা যায়, ম্লেচ্ছ জ্যোতিষ সম্বন্ধে সেরূপ কঠোর নিয়ম কিছু পাওয়া যায় না, বরং যবনাচার্য্য-দিগের মত সাদরে গ্রহণ করারই উপদেশ পাওয়া যায়। গর্গাচার্য্য বলেন,—

ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্র মিদং স্থিতং
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দ্দৈববিদ্বিজঃ।
যস্মাদ্ যৎ সদসৎ ফলং নিগদিতং সত্যং হি
কিং পঙ্কজে
শঙ্কা পঙ্কভবা তথা ফণিফণোৎপন্নে মনৌ
দূষণং।
ব্রহ্মদ্বেষী তুরষ্ক সম্ভবমিদং তার্জীয়কং বর্ত্ততে
শাস্ত্রং যদ্যপি সদ্দ্বিজৈরপি তথাপ্যধ্যেতুমর্হং
ভবেৎ॥

অর্থাৎ যবনগণ ম্লেচ্ছ হইলেও তাহারা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অবগত। জ্যোতির্ব্বিদ্ যবনগণ যখন ঋষিবৎ সম্মানার্হ হইতেন, তখন জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রাহ্মণগণ যে পূজনীয় হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি? সেই ম্লেচ্ছপ্রণীত জ্যোতিষগ্রন্থ পাঠে ব্রাহ্মণগণের কোন দোষই হইবে না। যেমন পঙ্কোদ্ভব পঙ্কজ গ্রহণে পঙ্কশঙ্কা থাকে না, এবং বিষধর সর্প-ফণাসম্ভূত মণি গ্রহণে কোন দোষ নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মদ্বেষী তুরষ্ক দেশসম্ভূত তার্জীয়ক-দিগের প্রণীত শাস্ত্র পাঠেও ব্রাহ্মণের কোন দোষই হইতে পারে না। বরাহ-মিহির তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে সূর্য্য সিদ্ধান্তাদির সহিত রোমক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়া, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

অনেকের বিশ্বাস, জ্যোতিষ শাস্ত্র যখন লগ্নাচার্য্যকে দেওয়া হইয়াছে, তখন কোন সদ্ ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করিলে, তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় হন; অর্থাৎ তাঁহাকে নিয়া কোন ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তি ভোজন করিবেন না, এরূপ একটি নিষেধ বাক্য আছে বটে; কিন্তু তাহা কূটবিদ্যা

জ্যোতির্বিদের জন্য নহে। এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ দেব বলেন।—

অধ্যেতব্যং ব্রাহ্মণৈরেব তস্মাজ্জ্যোতিঃ শাস্ত্রং
পুণ্য মেতদ্রহস্যং।
এতদ্বুদ্ধ্যা সম্যগাপ্নোতি যস্মাদর্থং ধর্ম্মং
মোক্ষমগ্র্যং যশশ্চ॥

এই পুণ্যজনক জ্যোতিষশাস্ত্ররহস্য ব্রাহ্মণদিগেরই অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু, ইহা দ্বারা সম্যক্ অর্থ, ধর্ম্ম ও যশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অন্তে মোক্ষ গতিপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থেও ঠিক উক্তরূপই বলিয়াছেন। যথা,—

তস্মাদ্ দ্বিজৈরধ্যনীয় মেবং পুণ্যং রহস্যং
পরমঞ্চ তত্ত্বং।
যো জ্যোতিষং বেত্তি নরঃ স সম্যগ্ ধর্ম্মার্থ
মোক্ষান্ লভতে যশশ্চ॥

মাণ্ডব্য মুনি বলেন।—

এবংবিধঞ্চ শ্রুতিনেত্র শাস্ত্রং স্বরূপ ভর্ত্তুঃ
শম্ভু দর্শনং বৈ।
নিহন্ত্যশেষং কলুষং জনানাং ষড়্বর্গজং
ধর্ম্ম সুখাস্পদং স্যাৎ॥

এবম্প্রকারে বেদচক্ষু জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়নে মনুষ্যগণের কাম ক্রোধাদি ষড়্বর্গ সম্ভূত ? পাপ রাশি বিদূরিত এবং ধর্ম্ম সুখাস্পদ ও ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। গর্গ বলেন—

জ্যোতিশ্চক্রে তু লোকস্য সর্ব্বস্যোক্তং
শুভাশুভং
জ্যোতির্জ্ঞানন্ত যো বেদ স যাতি পরমাং
গতিং।

উক্তরূপে মুনিগণ ও আচার্য্যগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন,—কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম ভালরূপে অবগত না হইয়া, কেবল লোক ভুলানের জন্য, জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জন্য বহু নিন্দা শ্রুতি পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ বলেন,—

ত্রিস্কন্ধ পারং গত এব পূজ্যঃ শ্রাদ্ধে সদা
ভূসুর বৃন্দ মধ্যে।
নক্ষত্র সূচী খলু পাপ-রূপো হেয়ঃ সর্ব্ব
সুধর্ম্মকৃত্যে॥

যে দ্বিজ ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি শ্রাদ্ধ স্থলে ব্রাহ্মণ সমূহ মধ্যে পূজিত। আর সাক্ষাৎ পাপস্বরূপ নক্ষত্রসূচী সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যে পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন।

প্রমিতাক্ষরাতেও উক্ত হইয়াছে যে,
"শ্রাদ্ধে গণকানামপাংক্তেয়ত্বং ধর্ম্মশাস্ত্রে
যদুক্তং তন্নক্ষত্রসূচকাভিপ্রায়েণ জ্ঞেয়ং॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে গণকের অপাংক্তেয়ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা নক্ষত্রসূচক সম্পর্কে বুঝিতে হইবে। নক্ষত্রসূচী কাহাকে বলে, তৎসম্পর্কে বৃহৎ সংহিতায় আছে,—

"অবিদিত্বৈব যঃ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে
স পংক্তিদূষকঃ পাপো জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ।
তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈবসাধনং
পর বাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্যক্ অবগত না হইয়া, জ্যোতিষী বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন, সেই পাপ, পংক্তিদূষক

ব্যক্তিকে নক্ষত্র সূচক বলে। যাঁহারা তিথি নক্ষত্রাদি উৎপত্তি সাধন ও গ্রহস্ফুটাদি সাধন বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অথচ, পর-বাক্যে নির্ভর করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া গৌরব করেন; তাঁহারাই নক্ষত্রসূচক।

বাস্তবিক পক্ষেও আমাদের দেশে আজকাল যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই নক্ষত্রসূচক, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদিগেরই বা দোষ কি? দেশের অবস্থা এরূপ যে, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুরস্কার স্বরূপ ক্রিয়া উপলক্ষে বিদায়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং তদ্দ্বারাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কোনরূপ কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু, জ্যোতিষশাস্ত্র ব্যবসায়ীর জন্য, উক্তরূপ বিদায়ের কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ অদৃষ্ট গণনা, প্রশ্ন গণনা প্রভৃতি ফলিত অংশই সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে গণিত জ্যোতিষের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আমাদের দেশে লুপ্তপ্রায়।

জনসাধারণের বিশ্বাস যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন কেবল অদৃষ্ট গণনা, প্রশ্ন গণনা ও শুভক্ষণ স্থির করা। শাস্ত্রও বলেন—

"যাব্রহ্মণা বিলিখিতা নুরভালপট্টে প্রারব্ধ কর্ম্মসদসৎফল পাক পংক্তিঃ।
হোরা প্রকাশয়তি তামিহ কর্ম্মপংক্তিং দীপোযথা নিশি ঘটাদিকমন্ধকারে॥
শুভক্ষণ ক্রিয়ারম্ভজনিতা পূর্ব্বসম্ভবাঃ। সম্পদঃ সর্ব্বলোকানাং জ্যোতিশ্শাস্ত্র-প্রয়োজনং॥

সমাজের উন্নতাবস্থাতে গণিত জ্যোতিষের বহু প্রয়োজন থাকিলেও, প্রথমাবস্থাতে যে ফলিতাংশের জন্য গণিতাংশের প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশেও বহুকাল পর্য্যন্ত এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাত্মা কেপ্‌লার সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে যে,— Kepler saw the weakness of Astrology as a science but could not bring himself to deny a certain connection between the positions of the planets and the qualities of those born under them. He spoke of Astronomy as the wise mother and Astrology as the foolish daughter, but he added that the existence of the daughter was necessary to the life of the mother. অর্থাৎ কেপ্‌লার অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে ফলিত জ্যোতিষের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রহের অবস্থানের সহিত, জাতকের চরিত্রগত কোন নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি গণিত জ্যোতিষকে জ্ঞান-বৃদ্ধা জননী এবং ফলিত জ্যোতিষকে দুষ্টবুদ্ধি কন্যা বলিতেন। তিনি আরও বলিতেন যে, মাতার জীবনের জন্য কন্যার অস্তিত্বের আবশ্যক।

Astrology was considered the

একটি পৃথিবীর গ্রহ এবং পাশ্চাত্য মতে মঙ্গলাদির ন্যায় পৃথিবীও সূর্য্যের একটি গ্রহ। পাশ্চাত্য মতে গ্রহস্ফুটাদি সায়ন প্রণালীতে অর্থাৎ ক্রান্তিপাত বিন্দু (Vernal equinox) হইতে গণিত। হিন্দু মতে উহা নিরয়ণ প্রণালীতে অর্থাৎ স্থির বিন্দু অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভ বা রেবতী নক্ষত্রের অন্ত হইতে গণিত। সৌর কক্ষাকে ভ-চক্র ও রাশিচক্র কহে। উহা যেমন অশ্বিন্যাদি সমান ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত, তেমন মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত। বোধ হয়, নক্ষত্র ভাগই প্রাচীনতর; কারণ বেদের কোন স্থানে মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশির কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক এক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ এবং এক এক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। সুতরাং এক এক রাশি ২¼ নক্ষত্রের সমান।

বিষুবন্ বা ক্রান্তিপাতে বিন্দু স্থির না হইলেও উহার পশ্চিমাভিমুখ গতি এত সূক্ষ্ম যে সমস্ত কক্ষা পরিভ্রমণ করিতে উহার প্রায় ২৬ হাজার বৎসরের আবশ্যক। প্রতি বর্ষে উহার গতির পরিমাণ পাশ্চাত্য মতে ৫০ বিকলা। এবং হিন্দু মতে ৫৪ বিকলা। ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রংপাক্ পরিলম্বতে

তদ্‌গুণাদ্ ভূদিনৈর্ভক্তাদ্‌দ্যুগণাদ্ যদবাপ্যতে।
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নভিধা॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

অর্থাৎ ভ-চক্রে মহাযুগে ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে পরিলম্বমান হয়। ভুজকে ৩ গুণ করিয়া ১০ দ্বারা ভাগ করিলে অয়ন হইবে।

ইহাতে বোধ হয় সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ক্রান্তিপাত বিন্দু, দোলকের ন্যায় ২৭ অংশ পূর্ব্বদিকে এবং ২৭ অংশ পশ্চিমদিকে দোদুল্যমান হইয়া থাকে; সুতরাং উহার বিস্তৃতি ১০৮ অংশ অর্থাৎ ৩৬০ অংশের দশ ভাগের তিন গুণ। মুঞ্জাল, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদের মতে উহা পূর্ব্ব পশ্চিমে দোদুল্যমান না হইয়া, বরাবর রাশিচক্রের উপরে বক্রগতিতে অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখে ঘুরিয়া আসে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতও এইরূপ। জ্যোতির্ব্বিদাচার্য্য বরাহমিহির বলেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে অয়নাংশ ধরা যায় তাহাকে ৫৪ বিকলা দ্বারা ভাগ করিলেও দেখা যায়, কল্যব্দ ৩৬০০ বৎসরের শেষ ভাগ নিরয়ণ ছিল অর্থাৎ সে সময়ে ক্রান্তিপাত বিন্দু অশ্বিনীর প্রারম্ভে ছিল। হিন্দু মতে বিষুবন্ ১৮০০ বৎসরে প্রায় দুই নক্ষত্র পরিমাণ পশ্চাৎ সরিয়া থাকে। সুতরাং বাসন্ত বিষুবন্ এই হিসাবে কলির প্রারম্ভে মৃগশিরা নক্ষত্রে, ১৮০০ বৎসর পরে কৃত্তিকা নক্ষত্রে এবং ৩৬০০ বৎসর পরে অশ্বিনী নক্ষত্রে, ছিল। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার অরিয়ণ (Orion) নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বৈদিক প্রমাণ দ্বারা দেখা যায়, বাসন্ত বিষুবন্ কোন সময়ে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, পরে মৃগশিরাতে এবং অবশেষে কৃত্তিকাতে ছিল। তাঁহার যুক্তির সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বোধ হয়। কারণ, নিরয়ণ গণনার সহিত ঋতুর মিল থাকিতে পারে না। প্রায় দুই হাজার বৎসরে, এক মাসের অন্তর হইয়া থাকে। ঋতুর সহিত মিল রাখিয়া, ইয়োরোপ খণ্ডে বর্ষ গণনা করা হয়, সায়ন প্রণালীতে অর্থাৎ ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে পুনঃ সেই ক্রান্তিপাত বিন্দুতে আসিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে, তাহার নাম বর্ষ। উহার সূক্ষ্ম পরিমাণ ৩৬৫·২৪২১৯ দিন। হিন্দুমতে নাক্ষত্রিক বর্ষ অর্থাৎ কোন স্থির নক্ষত্র হইতে পুনঃ সেই নক্ষত্রে আসিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে তাহার নাম বর্ষ। উহার সূক্ষ্মমান ৩৬৫·২৫৬৩৭ দিন। কিন্তু সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে উহার মান ৩৬৫·২৫৮৭৫ দিন। এই দুইএর অন্তর মাত্র ·০০২৩৮। বর্ত্তমান কালের ন্যায় যখন অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির আবিষ্কার হয় নাই তখনও যে আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এত সূক্ষ্মভাবে বর্ষমান স্থির করিয়া ছিলেন, তাহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে।

কেহ কেহ মনে করেন, প্রাচীন ঋষিগণ যোগ-বলে দিব্য চক্ষু দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যাদির গতি বিধি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে গণিত-চন্দ্র সূর্য্যাদি স্ব স্ব স্থানে প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও তদনুসারেই ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। যেহেতু, উহাদিগকে চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত মনে করা আমাদের ভ্রম। এরূপ উক্তির মূল্য কত, পাঠকই বিচার পূর্ব্বক স্থির করিবেন। জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, গণনার সহিত যদি দৃষ্টির মিল না থাকে, তবে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সেই গণনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। আমি যদি গণনা করিয়া বলি যে, অমাবস্যা দিন রাত্রি ১০ টার সময় চন্দ্রোদয় হইবে। তবে লোকে সেই সময়ে চন্দ্র না দেখিয়া কি আমার গণনার প্রতি উপহাস করিবে না? মন্দোচ্চ (Apse) লক্ষাধিক বৎসরে এবং ক্রান্তিপাতবিন্দু ২৬ হাজার বৎসরে এক এক বার ঘুরিয়া আসে। এ সকল অতিসূক্ষ্ম গতিও যে আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাদের গণিত তিথ্যাদির সহিত দৃক্ তুল্যতায় কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বলা কতদূর সঙ্গত সহজেই অনুমেয়। শাস্ত্রকারগণ পুনঃ বলিয়াছেন, জ্যোতিষশাস্ত্রে কালে সংস্কার দেওয়া আবশ্যক। গণেশ দৈবজ্ঞ ৬০ বৎসর পরে তাঁহার পিতৃকৃত গ্রন্থে সংস্কার প্রদান করিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়াছিলেন। সূর্য্য সিদ্ধান্ত বলিতেছেন।—

"যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলং"

"তত্তদ্‌গতিবশান্নিত্যং যথা দৃক্ তুল্যতাং গ্রহাঃ

প্রযান্তি তৎপ্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ"। ইত্যাদি, ইত্যাদি। শাস্ত্রকারগণ বহুস্থানে দৃক্-তুল্যতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল, রাঘবানন্দ চক্রবর্তী নামক কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণিত ফলে বীজ-সংস্কার প্রদান করিয়া, "সিদ্ধান্ত রহস্য" ও "দিন চন্দ্রিকা" নামক দুইখানি করণ-গ্রন্থ

প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার খণ্ডা (Tables) গ্রহণ করিয়াই, আমাদের দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহস্ফুট ও পঞ্জিকাদি গণনা করিয়া থাকেন। যদি দৃক্ তুল্যতার আবশ্যকতা স্বীকার করা না যায়, তবে খাটি সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে পঞ্জিকাদি গণনা না করিয়া, বীজ সংস্কৃত মত গ্রহণ করা হয় কেন? প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিয়াছেন,—

"বিফলান্যান্যশাস্ত্রাণি ; বিবাদস্তেষু কেবলং সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাক্ষী,—চন্দ্র সূর্য্য, ইহার অর্থ কি? গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থান গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ কর, দেখিবে, দৃষ্ট স্থানের সহিত গণিতাগত স্থানের মিল হইবে। চন্দ্রগ্রহণ হইলে, যে যে স্থান হইতে চন্দ্র দেখা যায়, সেই সেই স্থান হইতে গ্রহণও দেখা যাইবে। সুতরাং কোন স্থানের দেশান্তর নির্দ্ধারণ করার জন্য বলা হইয়াছে, মধ্য রেখাতে যে সময়ে গ্রহণ আরম্ভ হইবে, তাহা গণনা দ্বারা স্থির কর এবং প্রস্তাবিত স্থানে কোন্ সময় গ্রহণ আরম্ভ হয়, তাহা পরিদর্শন কর। এই দুই সময়ের অন্তরই সেই স্থানের দেশান্তর। এই স্থলে, গণিতাগত সময়ে যদি মধ্য রেখাতে গ্রহণ আরম্ভ না হয়, তবে যে উক্ত ফল অশুদ্ধ হইবে, ইহাও কি বলিয়া দিতে হয়?

প্রাকৃতিক কোন পদার্থই চিরকাল এক রকম থাকে না। গ্রহ নক্ষত্রাদির আকার, গতি বিধি প্রভৃতি কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। সুতরাং গণিত স্থানের সহিত দৃষ্ট স্থানের মিল না হইলে, সংস্কার প্রদান করিয়া, দৃগ্‌গণিতৈক্য করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়। প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সত্যের অনুরোধে যবনাচার্য্যদিগের মত গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আজ কাল আমাদের মানমন্দিরের অভাব, বেধযন্ত্রের অভাব এবং নিজেরা পরিদর্শন করিতে অশক্ত, সুতরাং প্রাচীন জোতির্ব্বিদ্‌গণ পরিদর্শনদ্বারা পরীক্ষা করার জন্য, অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমরা বলিতেছি, পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও ঠিক্ আছে, দৃক্‌তুল্য না হইলেও তদনুসারেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রভৃতি দেবপ্রণীত সিদ্ধান্তের গণিত ফল বিভিন্ন; সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে গণিত ফল গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করিলে কেন যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করা হইবে না, বুঝিতে পারা যায় না। অধুনা সূর্য্য সিদ্ধান্তের গণনাই দৃক্‌প্রত্যয় সিদ্ধ অথবা যে গণিত ফল দৃক্‌প্রত্যয়সিদ্ধ তাহাই গ্রাহ্য, ইহা বলিলে আর কোন গোল থাকে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজকুমার সেন এম, এ।

অভিশাপ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুর্গাপূজা।

আশ্বিন মাস, অম্বিকাপূজা আগত প্রায়। মা আনন্দময়ী ভবানীর আগমন সূচনায় বুঝি আজি নিরানন্দ তিরোহিত হইয়া এক বিমল শান্তি সুধায় সকলের মনপ্রাণ পুলকিত করিতেছে। সামান্য কৃষক হইতে অতি বলশালী রাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত, আজি সকলের হৃদয়ই পুলকে পরিপূর্ণ। বালক বালিকাগণের আমোদ, তাহারা নূতন কাপড়, নূতন জামা, নূতন জুতা পরিবে। আর স্কুল পাঠশালার ছুটি হইবে, ইহাও তাহাদের আমোদের অন্যতর কারণ। বিরহবিধুরা রমণী অনেক দিনের পর স্বামীর দর্শন পাইবে এইজন্য তাহাদের আমোদ। প্রবাসী-যুবক পূজার ছুটিতে বাটী যাইয়া তাহার প্রিয়তমা পত্নী ও স্নেহের পুত্র কন্যাকে দেখিবে, এই আশায় তাহার আনন্দ। প্রৌঢ় প্রৌঢ়াগণের আনন্দ, তাঁহারা পুত্র পৌত্রগণকে পূজায় নূতন পোষাক দিবেন, কন্যা জামাতাকে আনিয়া আহ্লাদ করিবেন, নূতন জামাতাকে মনোমত তত্ত্ব করিবেন, বৈবাহিক বাটী হইতে নিজ পুত্রের তত্ত্ব লইবেন, পুত্র বিদেশ হইতে গৃহে আসিবে, এই সকলের জন্য। আর যাহাদের বাটীতে মা জগজ্জননীর শুভাগমন হইবে, তাহাদের আনন্দ, উৎসাহ, উদ্যম অপার।

পল্লীগ্রামের সামান্য কৃষকগণেরও সমস্ত বৎসরের মধ্যে এ সময়টিই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের সময়। তাহারা ভাদ্রমাসে ধান কাটিয়া সকলেই অল্প বিস্তর ধান্য জমা করিয়াছে, মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়াছে, জমিদারের খাজানা দিয়াছে। আনন্দ সকলেরই; কেবল শোকার্ত্তের নিকট ইহা বড় দুঃখের সময়। সকল উৎসব আনন্দের সময়ই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের নিকট অতীব কষ্টের হইয়া থাকে। আর কষ্ট কাহাদের? যাহাদের অতৃপ্ত আশা ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় মথিত হইতেছে তাহাদের। যে পর্য্যন্ত না তাহাদের অন্তরের আশা পূর্ণ হয় বা উহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়, বুঝি তত দিন অমরেন্দ্রের স্বর্গীয় সুধাও তাহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আশাই মানবের সুখ, আশাই জীবন। কোনরূপ আশা বাসনা শূন্য জীবন যদি

কাহারও থাকে, তবে তাঁহার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে বিরল।

সত্যেন্দ্রনাথের কথা বলিতেছিলাম। আজি তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ, এই আনন্দ-স্রোতে সত্যেন্‌ও কি ভাসমান? না, কথনই নয়, তিনি আজি অসুখী। যতই দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার অসুখের সীমা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। সত্যেন্, পূজার কয় দিন নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত একপ্রকার ভুলিয়া রহিলেন। শুধু অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় অন্তর পরিপূর্ণ থাকা প্রযুক্ত যে, সত্যেনের এত দুঃখ তাহা নহে, সেই আশা পূর্ণ হইবার পথে বিঘ্ন দেখিয়াই তাঁহার বিশেষ কষ্ট। কথাটা খুলিয়া না বলিলে বুঝিতে পারিবেন না। সত্যেন্ কলিকাতা হইতে বাটীতে আসিবার পর শুনিলেন যে, তাঁহার বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে।—অগ্রহায়ণের ২১শে বিবাহ, আর পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন কন্যাপক্ষ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবে।

পল্লিগ্রামের ন্যায় সহর অঞ্চলে আশীর্ব্বাদের গুরুত্ব তত অধিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কথায় যেই পাত্রপাত্রীর আশীর্ব্বাদ হইল সেই বিবাহ হইয়া গেল;—আশীর্ব্বাদ হইলে আর প্রায়শঃ বিবাহ-সম্বন্ধ ভঙ্গ হয় না। এই কারণে যতই দিন যাইতে লাগিল, সত্যেন্দ্রনাথের চিন্তানল ততই প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজয়া দশমী।

বঙ্গের বিজয়াদশমীর আনন্দোৎসব এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এ উৎসবে ভোজ নাই, কোলাহল নাই, সাজ নাই, আড়ম্বর নাই, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান নাই। ইহাতে যাহা আছে, তাহা কোথাও নাই। বোধ হয়, জগতের কোন সভ্যজাতির কোন উৎসবে নাই। যে ব্যক্তি কখন ইহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তিনি এ আনন্দের অনুভব করিতেও অক্ষম। সমগ্র পৃথিবীর কোন উৎসবের সহিত এ আড়ম্বরহীন শান্ত উৎসবের তুলনা হইতে পারে না।

আজি বিজয়া। মা দশভুজা তিন দিনের জন্য শোক তাপ ভুলাইয়া ছিলেন, আজি তিনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন। বৈকাল হইল, চারি দিকে ঢাক ঢোল সানাইয়ের বিষাদ গান বিজয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। বালক বালিকা, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া নূতন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভাসান দেখিতে অগ্রসর হইল। ক্রমে রবি অস্তগমন করিলেন, সকলেই স্ব স্ব গৃহে ফিরিল। মাকে বিসর্জ্জন দিয়া সানাই এখন আর এক করুণ সুর ধরিল। সে সুরে উল্লাস নাই, মাদকতা নাই, উৎসাহ নাই, এক অলস ভাব তাহার সহিত জড়িত।

সন্ধ্যা অতীত হইল। যাহাদের বাটীতে আনন্দময়ীর আগমন হইয়াছিল, তাহারা এবং তাহাদের প্রতিবাসিবর্গ পূজার দালানে

বসন্তই বৎসরের প্রথম ঋতু। "মুখং বা এতদৃতুনাং যদ্ বসন্তঃ" তৈত্তি, ব্রা প্র ১,২,৬, এই শ্রুতি বাক্য উপলক্ষে, কালমাধব বলেন,—"সংবৎসরোপক্রমস্থেন বসন্তস্য প্রাথম্যং দ্রষ্টব্যং।

"বসন্তো গ্রীষ্মোবর্ষা তে দেবা ঋতবঃ শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরস্তে পিতরঃ" শতপথ ব্রাঃ দ্বি ১।

"স (সূর্য্যঃ) যত্র উদগাবর্ত্ততে দেবেষু তর্হি ভবতি দেবাং স্তর্হ্যভিগোপায় ত্যথ যত্র দক্ষিণা বর্ত্ততে পিতৃষু তর্হি ভবতি পিতৃং স্তর্হ্যভিগোপায়তি।" শতপথ ব্রাঃ দ্বি ৩। অর্থাৎ সূর্য্যদেব যখন উত্তরাভিমুখে গমন করেন, তখন তিনি দেবতাদিগের মধ্যে থাকেন এবং তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তিনি যখন দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন, তখন তিনি পিতৃগণের মধ্যে থাকেন এবং তাহাদিগকে রক্ষা করেন। এ সকল শ্রুতি বাক্য হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বে উত্তরায়ণে বর্ষারম্ভ এবং বসন্ত প্রথম ঋতু ছিল। এখনও আমাদের দেশে উত্তরায়ণ হইতে গণনা করিয়া মাঘ ফাল্গুন দুই মাস বসন্তকাল বলা যায়, এবং মাঘী পঞ্চমীতে বসন্তোৎসব হয়। "মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্য যচ্চিত্রা পূর্ণমাসঃ" তৈত্তি সংসপ্ত ৪।৮। ইহাতে দেখা যায়, কোন সময়ে চৈত্র পৌর্ণমাসীতে বর্ষারম্ভ অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইত। পূর্ণিমা দিন চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রে থাকিলে, সূর্য্য রেবতী নক্ষত্রে থাকে। সূর্য্য রেবতী নক্ষত্রে থাকার সময়, উত্তরায়ণ হইলে তাহার ৯০ অংশ দূরে অর্থাৎ সপ্তম নক্ষত্র পুনর্ব্বসুতে বসন্ত বিষুবন্ বা মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত। কেহ কেহ মনে করেন, এই সময়েই জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে সৌরবর্ষ গণনার আরম্ভ এবং পুনর্ব্বসুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি হইতে সূর্য্যের নাম আদিত্য।

এষাহ সংবৎসরস্য প্রথমা রাত্রির্যৎ ফাল্গুনী পৌর্ণ-মাসী।" শতপথ ব্রাঃ ষষ্ঠ ২।

"এষা বৈ প্রথমা রাত্রিঃ সংবৎসরস্য যদুত্তরফল্গুনী। মুখত এব সংবৎসরস্যাগ্নিমাধায় বসীয়ান্ ভবতি" তৈ ত্তি ব্রাঃ প্র ১।২।৮।

"মুখমুত্তরে ফল্গুন্যৌ পুচ্ছং পূর্ব্বে। তদ্ যথা,—প্রবৃত্তস্যান্তৌ সমেতৌ স্যাতাং। এবমেতৎ সংবৎসরস্যান্তৌ সমেতৌ ভবতঃ।" গোপথ ব্রাঃ প্র ১৯।

ইহাতে দেখা যায়, কোন সময়ে, যখন উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে পৌর্ণমাসী হইত, তখন বর্ষারম্ভ অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইত। পূর্ণিমা দিন চন্দ্র উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে থাকিলে সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দশ নক্ষত্র উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকে। সুতরাং সে সময়ে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে উত্তরায়ণ এবং তাহার সপ্তম নক্ষত্র মৃগশিরাতে বসন্ত বিষুবন্ বা মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত।

"অশ্লেষার্দ্ধাদাসীদ্ যদা নিবৃত্তিঃ কিলোষ্ণকিরণস্য যুক্তময়নং তদাসীৎ সাংপ্রতময়নং পুনর্ব্বসুতঃ।" পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।

"অশ্লেষার্দ্ধাদ্দক্ষিণমুত্তরময়নং রবের্ধনিষ্ঠাদ্যং নূনং কদাচিদাসীদ্, যেনোক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রেষু সাংপ্রতময়নং সবিতুঃ কর্কটকাদ্যং মৃগাদিতশ্চান্যৎ উক্তাভাবো বি-

কৃত্তিঃ প্রত্যক্ষপরীক্ষণৈ র্ব্যক্তি।" বৃহৎ সংহিতা।

ইহাতে দেখা যায়, পূর্ব্বে অশ্লেষার মধ্য স্থানে দক্ষিণায়ন ও ধনিষ্ঠাতে উত্তরায়ণ হইত এবং বরাহমিহিরাচার্য্যের সময়ে দক্ষিণায়ন পুনর্ব্বসুতে ছিল। সুতরাং পূর্ব্বে ৯০ অংশ দূরে অথবা সপ্তম নক্ষত্র কৃত্তিকাতে এবং বরাহমিহিরের সময়ে অশ্বিনীতে বসন্ত বিষুবন্ বা মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত। এক সময়ে যে কৃত্তিকা নক্ষত্র বর্ত্তমান অশ্বিনীর ন্যায় আদি নক্ষত্র ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এখনও ফলিত জ্যোতিষে, নাক্ষত্রিকী দশার আরম্ভ কৃত্তিকা হইতে। "কৃত্তিকাস্বগ্নি মাদধীত……মুখং বা এতন্নক্ষত্রাণাং যৎ কৃত্তিকাঃ।" তৈত্তি ব্রাঃ প্র। ১। ২।

উপরে যাহা দেখান গেল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বে ক্রান্তিপাত বিন্দুর পশ্চাদ্‌গতির সহিত আমাদের দেশেও আরম্ভ বিন্দুর পরিবর্ত্তন হইত এবং অয়নাংশের পরিমাণ ২৭ অংশ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় নক্ষত্র হইতে গণনা করা হইত। প্রথম পুনর্ব্বসু, পরে মৃগশিরা, তৎপরে কৃত্তিকা এবং অবশেষে অশ্বিনী হইতে গণনার আরম্ভ। এই সিদ্ধান্ত ঠিক্ হইলে, উক্ত নিয়মে কল্যব্দ ৫৪৮০ হইলে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ৩৯৫ বৎসর পরে, উত্তর ভাদ্রই আদি হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে আছে "চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে" এই স্থলে প্রাক্ পশ্চাৎ না বলিয়া কেবল প্রাক্ বলারও তাৎপর্য্য সহজে বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় নক্ষত্র গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত, অয়নাংশ ২৭ পর্য্যন্ত হইতে পারে, সুতরাং তাৎকালিক আরম্ভ বিন্দু বাসন্ত বিষুবন্ বিন্দু হইতে ২৭ অংশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত; কিন্তু কখনও পশ্চিম দিকে আসিতে পারে না। কোন প্রাচীন গ্রন্থেও এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, আরম্ভ বিন্দু ক্রান্তিপাতের পশ্চিম দিকে ছিল। পরিলম্বতে ক্রিয়াপদ এবং এক যুগে ৬০০ বার, এই দুই কথা হইতেই অনুমান হয় যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তকার ক্রান্তিপাত বিন্দুর দোলায়মান গতি (Oscillition) স্বীকার করিতেন। ৬০০ বার সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, "ত্রিংশৎকৃত্যঃ". পাঠ ঠিক্ কিনা সন্দেহ। ভাস্করাচার্য্য বলেন, সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে উহার পরিমাণ "অযুতত্রয়ং কল্পে"। ভাস্করাচার্য্য না জানিয়া একটা মিথ্যাকথা লিখিলেন, ইহাও মনে করা যায় না। ভাস্করাচার্য্যের কথানুসারে সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে এক মহাযুগে ৬০০ বার না হইয়া, ৩০০০ বার হয়। আজ কাল অনেক শিক্ষিত যুবক, জ্যোতিস শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন, ভরসা করি তাঁহারা এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

উপরে যাহা দেখান গেল, তাহাতে বুঝা যায়, হিন্দুদিগের গণনা নিরয়ণ হইলেও মলমাস বা অধিমাসের ত্যাগ দ্বারা যেরূপ সৌরচান্দ্র বৎসরের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইতেছে, ঠিক সেই রূপে, ১৮০০ বৎসর পরে পরে, দুই দুই নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া, সায়ন গণনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইত। ইহা যুক্তিযুক্ত ও

একত্র সমবেত হইয়া শান্তিবারি গ্রহণ করিয়া, বিশুদ্ধ কদলীপত্রে ৺শ্রীশ্রীদুর্গা নাম লিখিল। এইবার বিজয়ার সম্ভাষণ আলিঙ্গন। পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, শত্রু মিত্রে, মিত্রে মিত্রে, ভগিনী ভ্রাতায়, মাতা পুত্র, এবং শ্বশুর জামাতা, প্রভৃতি যাহার যেমন সম্বন্ধ সে সেইরূপ সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিল। আজি শত্রু মিত্র সব সমান, হাস্যবদনে উভয়কে উভয়ে আলিঙ্গন করিল। সকল মনোমালিন্য আবার সকলে ভুলিল। বৈরীভাব আজি হিন্দুর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল।

রায়দের বাটীতে এই সকল মিটিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। অমর চলিয়া গেলে পর, সত্যেন্ বহির্ব্বাটীতে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'এখন আর উপায় কি' এ বিবাহে কি নিস্কৃতি নাই? আমার একমাত্র আশা ভরসা ছিল,—অমর। এখন বুঝিলাম সে আশা নাই। সে ইহাকে আমার জীবনের একটা সামান্য অলীক প্রহেলিকা মাত্র মনে করিল। হায়! আমার মনের কথা কে বুঝিবে, আমার মনের যাতনা কে অনুভব করিবে, আর কাহাকেই বা বলি। তবে কি কাকাকে এ বিবাহে অসম্মতি জানাইব? না, তা পারিব না। তবে কি বাটী হইতে কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া যাইব? না, তাহা হইলে কাকা কাকীমার মনে বড় কষ্ট হইবে। অদৃষ্টে যাহা আছে হউক। এক জন আছে যাহাকে বলিতে পারি।—বিনোদ, তাহা হইতে যে বিশেষ কার্য্য হইবে, তা মনে হয় না। হায় অদৃষ্ট, সেও একবার পূজায় এলো না।

সত্যেন্ এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক যুবক পশ্চাৎ হইতে তাঁহার চক্ষু দুইটি চাপিয়া ধরিলেন। সত্যেন্ কিয়ৎক্ষণ চুপ-করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'অমর'!

যুবক ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। তখন সত্যেন্ তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"বিনোদ, কখন এলে?"

"কি দাদা এর মধ্যেই এই ভাবনা, না জানি বিয়ে হ'লে কি কর্‌বে। আমি এই আস্‌চি"।

"এতরাত্রি হইল যে, গাড়ী পাওনি বুঝি?"

"দাঁড়াও দাদা! আগে দশমীর প্রণামটা সেরেনি,"—এই কথা বলিয়া বিনোদ লাল সত্যেন্দ্রনাথকে প্রণাম্ করিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিনমস্কার করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

বি। চারটের ট্রেণটা মিনিট দু তিনের জন্য মিস্ কর্‌লাম; তারপর একবার মনে কর্‌লাম বাড়ি ফিরে যাই, প্রাণটা কিন্তু তা বল্‌লে না। তার পর, আজ আর ট্রেণ্ নাই, সেই সাতটার ট্রেণটায় এলুম্। ষ্টেশনে নেবে দেখি যে, একখানাও গাড়ি নাই, পাল্কি খুঁজলাম তাও পেলাম না। একখানা যদিও ছিল, তার আবার দু'টা বই বেহারা দেখতে পেলাম না। কাজেই বসে বসে শেষে একখানা গাড়ী এলো, ব্যাটা বল্লে বাবু আড়াই টাকা ভাড়া দিতে হবে। শেষ দু টাকায় রাজী হলো।

স। বাড়ীর সব ভাল ত?

বি। হাঁ ভাল, তোমাদের সব ভাল ত; দেখো, খুকি ভাল আছে?

স। উপস্থিত সব ভাল, খুকির একটু পেটের অসুখ করেছিল, এখন ভাল আছে। তার পর মহাশয়,এবারে পূজার তিন দিনের মধ্যে একবার পায়ের ধুলো পড়্‌লনা কেন?

বি। সে কি দাদা, ও কথা কি বল্‌তে আছে? এবার আমার জাঠতুতো ভাই নূতন পুজো করেছিল; অনেকবার বল্লে যদি না থাকি, তা হলে আবার মনে মনে অভিমান কর্‌বে, এই জন্য আস্‌তে পার্‌লুম না।

স। একবার নবমীর দিনও কি আস্‌তে পার্‌লে না?

বি। নবমী না হয় দশমী, আজত এসেচি। লুচি খাওয়াবার ইচ্ছা থাকে, তাত আজও হ'তে পারে।

স। হাঁ,সেই জন্যই আমার ঘুম হচ্ছিল-না। যা হোক্, ভাই, তুমি বাঁচ্‌বে অনেক দিন।

বি। দ্যাখো, সে তোমার ভগিনীর কপাল জোর। হঠাৎ এ কথাটা হোল কেন?

স। তোমার কথা এই আমি মনে কর্‌ছিলাম।

বি। আমার পরম ভাগ্য, এ অধমকে তাহলে এক আধবার মনে পড়ে। কল্‌কাতা থেকে এলে কবে? দাদা,আর চিঠি পত্র ত লেখ না।

স। প্রায় দিন পঁচিশেক এসেছি, তুমিই কোন্ একখানা চিঠি লিখে খবর নিয়েছিলে?

বি। তুমি দাদা কোথা থাক না থাক, কোথায় লিখ্‌ব? শুনেছিলুম, কলিকাতা ছাড়্‌তে চাচ্ছিলে না; যাহোক্ দাদা ঘরের ছেলে যে ঘরে এসেছ এই ভাল।

স। আস্‌ব না কেন?

বি। তা কি জানি বল দাদা, এখন এই বুধবার দিন আশীর্ব্বাদটা হবে ত?

স। এই রকমই ত শুন্‌চি।

বি। দাদা, এখন থেকেই ভারি হচ্চ, বিয়ে হলে ত আর কথাই কবে না দেখ্‌চি। আমরা ত আর তোমার সে পরিটি কেড়ে নোবো না।

স।—না ভাই সত্য বল্‌চি, আমায় কেউ কিছু আজ পর্য্যন্ত বলে নি, অমরের কাছে শুনেছি।

বি।—অমর বাবু আছেন কেমন? তিনি এখন কি করেন?

স।—অমর এখন বসেই আছে, একটা কাজের চেষ্টা কর্‌চে।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বাটীর ভিতর হইতে একজন দাসী আসিয়া বলিল,—"জামাই বাবু, বাড়ীর ভিতরে আসুন।" বিনোদ বাবু 'চল যাচ্চি' বলিয়া উঠিলেন। তার পর, সত্যেনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"দাদা এস, খাইগে।"

সত্যেন্ বলিলেন,—"চল, আমি একটু পরে যাচ্চি।"

বিনোদলাল দাসীর সহিত বাটীর ভিতর

চলিয়া গেলেন। সত্যেন্ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বিনোদকে বলিলে কোন উপকারের সম্ভাবনা আছে কি না,—তাহাকে বলি কি না বলি। বিনোদ একটা অনুরোধ করিলে কাকা তা রাখ্‌তে পারেন, ; কিন্তু সে কি আমার প্রাণের কথা বুঝ্‌বে, সেও হয় ত অমরের মত কথাটা উড়িয়েই দেবে। * * *"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদলাল।

বিনোদলাল আপনাদের নিকট অপরিচিত হইলেও আপনারা, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাঁহার পরিচয় কতকটা যে আপন। আপনিই স্থির করিয়া লইয়াছেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধের সময়ও আসিতে পারেন নাই। তাহার পর, এই বৎসরাধিক কালের মধ্যে জামাই ষষ্ঠীর সময় এক বার মাত্র আসিয়াছিলেন, কাজেই পাঠক মহাশয়দিগের সহিত পরিচয় হইবার বিশেষ সুযোগ ঘটে নাই।

বিনোদ বাবু সত্যেনের ভগিনীপতি অর্থাৎ লীলাবতীর স্বামী। তাঁহার নিবাস মাণিকনগর হইতে সাত ক্রোশ দূরে অনন্তপুর নামক গণ্ডগ্রামে। এইস্থান পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী ছিল। বিনোদ বাবুদের অবস্থা ভাল, তাঁহার পিতা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তিনি এক জন শাদা সিধা আমোদপ্রিয় ব্যক্তি, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। তাঁহার অদৃষ্ট ভাল, লীলাবতীতে তাঁহাতে একপ্রাণ বলিলেও হয়; তাঁহারা বড় সুখী। বিনোদলালের বয়ঃক্রম সত্যেনের অপেক্ষা তিন চারি বৎসর অধিক। তাঁহার একটি পুত্র, নাম দেবেন্দ্রনাথ। এইটির বয়স পাঁচ বৎসর। আর কন্যাটির বয়স মাত্র দুই বৎসর। তাহার নাম অনিলা। পুত্রটিকে সচরাচর সকলে দেবা ও কন্যাটিকে অনি, খুকি বা পুঁটি বলিয়া ডাকে।

বিনোদলাল পূজার সময়ে কি কারণে শ্বশুরালয়ে আসিতে পারেন নাই, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাঁহার নিজ মুখেই ইহা কথিত হইয়াছে। এবার বাটী হইতে আসিবার কালে, কএক দিবস মাণিকনগরে থাকিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াই বিনোদবাবু বাহির হইয়াছেন; কারণ অনেক দিনের পর আসিয়া সম্মুখে সম্বন্ধীর শুভ বিবাহের আশীর্ব্বাদটা না দেখিয়া চলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না।

দশমীর পর একাদশী গেল, অদ্য দ্বাদশী, আগত কল্য বুধবার ত্রয়োদশী। বৈকাল বেলা সত্যেনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবে। এই দুই দিনেই বিনোদলাল সত্যেনের চিন্তাক্লিষ্ট, সর্ব্বদা বিমর্ষ-ভাবাপন্ন বদন-মণ্ডল দেখিয়া বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার অন্তর মধ্যে একটা প্রবল বাত্যা বহিতেছে। এই ঝটিকার মূল কিরূপ তাহা জানিবার জন্য বিনোদ বাবুর মনোমধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্য উপস্থিত হইলেও, তিনি সহসা সত্যে-

নকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই-লেন না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা, শরীরটা কিছু খারাপ আছে কি? ক'দিন ধরে কেমন এক রকম হয়ে রয়েছ দেখ্‌ছি?"

এই প্রশ্নে সত্যেনের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিয়াছেন, বিনোদকে অনুরোধ করিবেন, যদি সে এই বিবাহ কোনপ্রকারে বন্ধ করিতে সমর্থ হয়, অন্ততঃ আগত আশীর্ব্বাদটা। এক্ষণে তাঁহার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বিনোদলালকে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন কি গোপন রাখিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—

"দেখ বিনোদ ভাই তোমার একটা উপকার করিতে হইবে। আমার শরীর বিশেষ খারাপ নাই, কিন্তু মন বড়ই খারাপ আছে। তুমি ভিন্ন এ সময়ে আমার উপকার করিবার আর কেহ নাই। এই অগ্রহায়ণ মাসে আমার যাহাতে বিবাহ না হয়, তাহা তোমার করিতে হইবে, আর কোন উপায়ে আশীর্ব্বাদও বন্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে তোমায় আর কিছু বলিব না, কোন কথা জানিতেও চেষ্টা করিও না, পরে সব বলিব।"

বিনোদ বাবু পরিহাসপ্রিয় লোক, তিনি এই কথা শুনিয়াই বলিলেন,—সে কি কথা দাদা, তবে কি গোপনে গোপনে একটা বৌদিদি কেঁদেছ, না বাঁটিলার থাকবে?"

"না বিনোদ, এ পরিহাসের কথা নয়, এ কাজটি তোমায় করিতেই হইবে।"

"আচ্ছা করা যাবে, আপাততঃ কাল, শুভ-আশীর্ব্বাদটা হয়ে যা'ক্‌ ত।"

সত্যেন্ বিনোদলালের সহিত কথোপকথনে বুঝিলেন, তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই হইবার সম্ভাবনা নাই, অমরের ন্যায় তিনিও ইহা অতি লঘুভাবে গ্রহণ করিলেন। সত্যেন্ তাঁহার নিকট কোন কথা ভাঙ্গিলেন না।

অদ্য রাত্রিতে সত্যেন্দ্র অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, কল্য আশীর্ব্বাদ হয় হউক, পরে যাহা হয় হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সতীশের পত্র।

রজনী প্রভাত হইল, অদ্য বুধবার ত্রয়োদশী, পাত্রীপক্ষীয়গণ সত্যেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে যত্ন আপ্যায়িত করিতে হইবে, এই কারণে প্রাতঃকাল হইতেই সকল আয়োজন হইতে লাগিল। অদ্য রায় পরিবারের একটি আনন্দের দিন হইলেও, বাটীর সকলকেই স্বর্গীয় রমাকান্তের স্মৃতি অল্প বিস্তর কাতর করিয়াছে। সত্যেনও আজি পিতার জন্য ম্রিয়মাণ, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র, এই আহ্লাদের দিনে তিনি জীবিত নাই বলিয়া তাঁহার দুঃখ নয়। যে কারণে অপর সাধারণের আনন্দ, আজি সেই কারণেই তিনি নিরানন্দের সাগরে ভাসমান, নিরাশার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পলে পলে তাঁহার মা-

নদ-চক্ষের সমক্ষে নৃত্য করিয়া তাঁহাকে কতই বিভীষিকা দেখাইতেছে। এই আনন্দ কোলাহল, উৎসাহ ও ব্যস্ততার মধ্যে রায় পরিবারের একটি মাত্র মানব, চিন্তাকুলমনে একাকী নির্জ্জন কক্ষে উপবিষ্ট। ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ। এক্ষণে অমরনাথ বা বিনোদ বাবু কেহই নিকটে নাই, সত্যেন্ একলা বসিয়া অতীতের ছবি মুছিয়া আঁধার ভবিষ্যতের কুহেলিকাময় ছবি অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

বেলা দেখিতে দেখিতে প্রায় দশটা বাজিল। একজন দ্বারবান সত্যেনের হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। সত্যেন্ দেখিলেন লেখা অপরিচিত হস্তের, তৎপরে তাহা খুলিয়া এইরূপ পাঠ করিলেন।

"সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

"সত্যেন্দ্র বাবু! আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত, যোড় করে এক ভিক্ষার জন্য আপনার কাছে উপস্থিত। জানি না, ভগবান এ গরীবের প্রতি সদয় হইবেন কি না। এ জগতে অনেকেই ক্রন্দন করে, কিন্তু কয়জন তাহা শুনিতে পান? কয়জন পরহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করিতে পারেন! যাহা এক ব্যক্তির নিকট তুচ্ছ, তাহাই অপরের নিকট মহান্। আপনার ধন, মান, বিদ্যা সকলই আছে, আমার একটি সামান্য ধন আপনি কাড়িয়া লইবেন না, ইহাই আমার সবিনয় ভিক্ষা।"

"কুসুমহাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। শুনিয়াছি শুভ আশীর্ব্বাদ আগামী পরশ্ব হইবে। হিরণ্ময়ী আমার; আপনি এ দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার হৃদয়ের ধনকে গ্রহণ করিতে বিরত থাকিবেন, ইহাই আমার অন্তরের প্রার্থনা।"

"হিরণ্ময়ী সুন্দরী, আপনার অর্থ, সম্ভ্রম, বংশমর্য্যাদা সকলই আছে, আপনার ওরূপ বা উহা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী শত শত যুটিবে। আমি আমার প্রাণের হিরণ্ময়ীকে আমার হৃদয়ের যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, একদিনে নয় অনেক দিনে। আমি তখন জানিতাম না যে, ইহজীবনে তাহাকে কখনও ত্যাগ করিতে হইবে। হিরণ্ময়ীর বয়ঃক্রম যখন তিনচারি বৎসর, তখন হইতেই তাহার সহিত আমার বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। এক্ষণে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে উপযুক্ত পাত্র আপনাকে পাইয়া, হিরণ্ময়ীর পিতা মাতা আপনার করেই আমার হিরণ্কে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমি দরিদ্র, আপনি ধনবান্; আমি একজন সামান্য চাকর, আর আপনি এক পরাক্রান্ত জমিদার বংশের একমাত্র বংশধর; আপনাতে আমাতে প্রভেদ বিস্তর। সকল বিষয়েই যে আপনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বালিকা হিরণ্ময়ী আপনাকে পাইয়া সুখী হইবে কি না সন্দেহ, যদি বুঝিতাম, সে আপনার পত্নী হইয়া সুখী হইবে, তাহা হইলেও না হয়, নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া, মরমের জ্বালায় চিরদিন জ্বলি-

রাও আমার প্রাণের হিরণ সুখে আছে মনে করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাও পারিব না। আমি জানি বালিকা হিরণ্ময়ী তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটুকু অজ্ঞাতসারে আমায় প্রদান করিয়াছে। আর তাহাতেই আমার স্বর্গের সুখলাভ হইয়াছে। ইহার তুলনায় জগতের যাবতীয় সুখকর সামগ্রীই আমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর। মনে হয় এ অমর সুখ অপহরণ করিলে আপনার শুভ হইবে না।"

"আপনার সহিত বিবাহ না হইলে হিরণ্ময়ী লাভ যে আমার ভাগ্যেই ঘটিবে, সে বিষয় আমি নিশ্চিন্ত আছি জানিবেন। আশায় নিরাশ হইলে, মানুষ মরে না, যদি নিরাশ হই, আমিও বোধ হয় মরিব না। মানুষের প্রাণে সব সহে, এ দরিদ্রের প্রাণে কত দূর সহিবে তাহা জানি না। আমার মনে হইতেছে এই অনন্ত পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই অধমের জীবনসূত্র এই বালিকার জীবনের সহিত গ্রথিত আছে। আমার মরণ বাঁচন, আশা উদ্যম, শুভ অশুভ, সকলই বালিকার জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে।

"আপনাকে যথেষ্ট বলা হইয়াছে, এক্ষণে একটি হতভাগ্যের সামান্য জীবন আপনার চরণ তলে নিপতিত রহিল জানিবেন। রাখিতে হয় রাখিবেন, দলিত করিতে হয় করিবেন। আর অধিক কি লিখিব।"

"ভরসা করি আমার অবস্থা বুঝিয়া, আমার এই অনধিকার চর্চ্চার, এই ধৃষ্টতা ব্যঞ্জক প্রস্তাবে যদি দোষ হইয়া থাকে, নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি—

"আপনার কৃপা ভিখারী,

হতভাগ্য সতীশ"—

সত্যেন্দ্রনাথ একবার, দুইবার, বহুবার পত্র পাঠ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'বুঝি অদৃষ্ট আমার বড় মন্দ, বা মন্দ অদৃষ্টের এইবার সূত্রপাত হইল, যে শুভ কার্য্যে অন্তরে বাহিরে এত বাধা, লৌকিকতার ভয়ে তাহা করিতে হইবে। পরের মনে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার অপেক্ষা পাপ নাই, একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাহা আমায় বাধ্য হইয়া করিতে হইবে। হায়! হায়! বুঝি অদৃষ্ট লিপি এইরূপই, নচেৎ যাহার পরিণাম অশুভময়, তাহাই আমার করিতে হইতেছে কেন? ঈশ্বরের অসীম রাজ্যে এ নিয়ম কেন হইল, একের সহিত অপরের জীবন গ্রথিত হইল কেন; আমি মরিব, আমার সহিত মালতী মরিবে, কোথাকার অপরিচিত একটি বালিকা মরিবে, আর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক মরিবে। একটি কাজ না করিলেই, আপনার ও সকলের মনের শান্তি স্থাপিত হয়, অথচ বিশেষ অনিচ্ছা থাকিলেও, নিষ্ঠুর অন্তরে তাহা করিতে হইবে। ভগবন্ তোমার অপার মহিমা বুঝা ভার।

সত্যেন্ এই ভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন; শেষে নিজ অদৃষ্টে যাহা আছে হউক, এই কথা মনে করিয়া অধিক বিচ-

লিত হইলেন না। অমর আসিলেন, পত্রখানি তাঁহার হাতে দিলেন। অমর উহা পাঠ করিয়া কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না; মনে একটু আশঙ্কা করিলেন, মুখে প্রকাশ করিলেন,—ও সব কিছু নয়, কোন শত্রুতে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার কারণ ওরূপ লিখিয়া থাকিবে।"

সত্যেন্‌ও অমরের কথাটি কর্ণে শুনিলেন মাত্র।

যথাসময়ে বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সদলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং যথাকালে ভাবী জামাতা সত্যেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মাণিকনগরে রাত্রিতে অবস্থিতি-পূর্ব্বক, পরদিন প্রাতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মালতীর সংবাদ।

আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের দিন পাকাপাকি হইয়া রহিল। যাহার জন্য সত্যেনের এতদূর ভাবনা ছিল, কিছুতেই তাহা নিবারিত হইল না। তিনি কলিকাতা হইতে আসার পর মালতীর নিকট হইতে তিন খানি পত্র পাইয়াছেন, একখানির মাত্র উত্তর দিয়াছেন, পূজার গোলমালে লিখিতে পারেন নাই। অদ্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা চলিয়া গেলে পর, আহারান্তে একাকী বসিয়া মালতীর পত্র খুলিয়া, অনেকক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে একখানি কিছু দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পরে একবার উহা পাঠ করিয়া ডাকঘরে ফেলিতে পাঠাইয়া দিলেন।

চলুন, পাঠক মহোদয়, আমরাও এই পত্রের সহিত মালতীর নিকট গমন করিয়া একবার তাঁহার সংবাদ লইয়া আসি। মালতী যথাকালে সত্যেনের পত্রখানি পাইলেন। তিনি এই কয় দিনের অদর্শনে মলিনা হইয়াছেন। তাঁহার সরল আননে যেন প্রফুল্লতার কিছু হ্রাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সত্যেন্‌কে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার কোন দুঃখ ছিল না। আপন মনে হাসিতেন, গল্প করিতেন, খুকিকে লইয়া খেলা করিতেন, সুখ দুঃখ আপন জীবনের সহিত সংবদ্ধ ছিল। একজন মানুষের অদর্শনে যে এত জ্বালা, তাহা তিনি কখনও বুঝিতেন না। বৌ দিদি বাপের বাড়ী গেলে, খুকির জন্য, বৌ দিদির জন্য মনটা কেমন করিত, তিনি এই পর্য্যন্ত জানিতেন। যেমন তৈল অগ্নি সংশ্লিষ্ট হইয়াও আধার অভাবে প্রজ্বলিত হয় না, অথবা সূর্য্যের কিরণ কোন পদার্থে পতিত না হইলে, উহা মানব দৃষ্টির গোচরাধীন হয় না; সেইরূপ মালতীর অন্তর্নিহিত প্রেমরাশি উপযুক্ত আধারের অভাবে এত দিন হৃদয় মধ্যে প্রচ্ছন্নাবস্থায় ছিল।

মালতী অদ্যকার পত্র পাঠে যদিও নিঃসন্দেহ বিশ্বাস করিলেন যে, সত্যেনের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার বিবাহের আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার মনে নানা ক্লেশকর চিন্তা উদয় হইতে লাগিল। প্রথম যখন প্রেমের অন্ধ আবেগে মত্ত হইয়া, মন-

প্রাণ সত্যেনের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন সে সকল কথা একবারও মনে আসিতে দেন নাই। এখন সান্ধ্য আকাশে নক্ষত্র প্রকাশের ন্যায় একটি একটি করিয়া তাঁহার হৃদাকাশে সকল কথা উদয় হইতে লাগিল। এখন তাঁহার মনে হয়,—'কেন আমার কপালে এমন ঘটিল, শুষ্ককণ্ঠে থাকা ত আমার অভ্যস্ত ছিল, সে ক্লেশ ত আমি সহিতে শিখিয়াছিলাম। এ বিন্দু পরিমাণ বারিকণা কেন আমি গলাধঃকরণ করিলাম। অমৃত আশা করিয়া যে লতা রোপণ করিলাম, হায়! হায়! তাহাতে কি ফল ফলিল! এই বিষেই কি প্রাণনাশ হইবে? সব যায় যা'ক্, এখন কি করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাই। সত্যেন্ বিবাহ করুন, সুখে সংসার করুন, আমার জন্য তাঁহাকে সমাজের নিকট নতমস্তক হইতে বলি না। তাঁহার সম্ভ্রম ও গৌরবের হানি করিবার অধিকার আমার নাই। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া থাকি কিরূপে?'

মালতী এই মত কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। প্রকৃতই এখন তিনি দিনান্তে একবার সত্যেন্‌কে দেখিবার জন্য, মনে প্রাণে আকুল ও অধীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

আশ্বিনের পর কার্ত্তিক মাসটি জল-প্রবাহের মত চলিয়া গেল। এই এক মাসের মধ্যে সত্যেনের বিবাহের] আয়োজন ভিন্ন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কিছুই নাই। তবে এই টুকু বলা প্রয়োজন যে, বিচ্ছেদানলে মালতীর মন উত্তরোত্তর দহিতে থাকিলেও সত্যেনের ক্রমশঃই জ্বালা প্রশমিত হইতে লাগিল। অমরও এখন অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন অতি নিকট হইয়া আসিল। নহবৎ, রোসনচৌকির অহোরাত্র বাদ্যে মাণিকনগর এক আনন্দ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। নাচ, তামাসা, দান, ভোজ কিছুরই কোন ত্রুটি নাই। মাণিক্‌নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণবর্গকে এরূপ তৈজস, তৈল, সন্দেশ ও বস্ত্রাদি সামাজিক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইল, যাহা তাঁহারা পূর্ব্বে কোন স্থান হইতে কখনও পান নাই বা এরূপ সামাজিক উপহারের কথা কখন কানেও শুনেন নাই। কামানের দিবস বহু সংখ্যক কাঙ্গালি দরিদ্রগণ তৈলপূর্ণ পিত্তলের বাটি ও লুচি মিষ্টান্ন পাইয়া আনন্দিতমনে রায় বাবুদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেল। পল্লীগ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতাগণ দুই দিন ধরিয়া যাত্রা শুনিলেন।

বিবাহের দিন আগত হইল। যথা সময়ে কলিকাতা হইতে ইংরাজি বাজেওয়ালাগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। মালিরা ঝাড় ঠিক করিতে লাগিল, গুপ্তিপাড়ার সানাইদার নবীন দাস ও অপরাপর স্থানীয় বাদ্যকরগণ আসিয়া যুটিল। আর পাইক দরোয়ানগণ নিজ নিজ পাগড়ি, তলোয়ার,

গোঁফ চুল ঠিক করিতে লাগিল। কুসুমহাটীর একক্রোশ থাকিতে রোসনাই হইবে, ইহা পুর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। সুতরাং ঝাড়, বাতি, নিশান, তক্মারামা, আশা শোঁটা, তুবড়ি, রংমশাল, বোমা ইত্যাদি পুর্ব্বেই নির্দ্ধারিত স্থানে প্রেরিত হইল। কেবল বাজনা ও সামান্য নিশান, আশা শোঁটা, বরের সহিত যাইবে বলিয়া রহিল। আহারাদির পরই বর, যাত্রা করিবেন স্থির হইল।

মধ্যাহ্নকাল হইতেই নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবগণের আগমন হইতে লাগিল। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু বান্ধবগণের আহ্বান ও যত্নাদি করিবার ভার, অমর ও বিনোদ বাবুর উপর ন্যস্ত আছে। অমর প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সত্যেনের দুরাগত বন্ধুবর্গের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আজি, রায় মহাশয়দের বাটীতে এতাদৃশ আনন্দ কোলাহলের মধ্যে, যাঁহার বিবাহ, সেই সত্যেন্দ্রনাথ ব্যথিত। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যেনের প্রাণের জ্বালার আধিক্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আজিকার এই শুভদিনে মালতীর জন্য তাঁহার নয়নপ্রান্তে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। তিনি বিধবা বালার নিকট বিশ্বাসহন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন, এই চিন্তায় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে কেমন এক কুধারণা জন্মিয়াছে যে, এ বিবাহে হয়ত তাঁহার মহা অশুভ ঘটিবে। ক্রমে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। অমর, সখাকে সজ্জিত করিবার মানসে, একবার বাটীর ভিতরে গেলেন। তাঁহার নিকট সত্যেন্ মনোভাব প্রকাশ করিলে, অমর তাঁহাকে স্নেহের ভৎসনা করিয়া বলিলেন,—"সত্যেন্ দাদা! তুমি কি ছেলে মানুষ, এ শুভ সময় তুমি অন্যায় ভাবনায় মনকে ক্লেশ দাও কেন?"

যথা সময়ে শচীকান্ত বাবু, বর ও বরযাত্রিদিগকে লইয়া যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া সন্ধ্যার পর, তথা হইতে মহাসমারোহে বর যাত্রা করিলেন। পল্লীগ্রামে রথ দোল দেখিতে যত লোক না যোটে, এই সমারোহ দর্শনার্থ দুর হইতে বহু লোক সমাগমে তাহাপেক্ষা অধিক লোক জমিল। সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বারোয়ারীর পাণ্ডাগণ দেখিয়া শুনিয়া তৎক্ষণাৎ স্থির করিল, কল্য পাঁচ শত টাকা বারোয়ারীতে না লইয়া ছাড়িবে না।

বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার কএক জন বয়স্থ আত্মীয় গললগ্নীকৃত-বস্ত্র হইয়া, যোড় হস্তে বরযাত্রিদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এক জন বরের হস্তধারণ পূর্ব্বক, বংশনির্ম্মিত কএকটা লণ্ঠন শোভিত বৃহৎ আট্‌চালার ভিতর নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইলেন। সত্যেন্ উপবেশন করিলে, তাঁহার ভাবি স্ত্রীর ভ্রাতা ভগিনী সম্পর্কীয় কএকটি অপরূপ রেশমি সাজে সজ্জিত বালক বালিকা মূর্ত্তি, তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া, বরের মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহাদের মধ্যে কেহ অপরের কানের কাছে মুখ লাগাইয়া চুপি চুপি বলিল,—'ওরে,

বরের কানে একটা মাকড়ি রয়েছে দ্যাখ।' কেহ হস্তে জাতি দেখিয়া বলিল,—দিদির বরের হাতে জাতি রয়েছে কেন ভাই?' একজন আস্তে আস্তে বলিল,—'জানিসনে দিদির মুখের সুপুরি কাটবে লো।' আর বরযাত্রী যুবক ও বৃদ্ধগণের কথা কি বলিব। অধিকাংশ যুবকই দণ্ডায়মান হইয়া এদিক ওদিক করিতেছেন, যাঁহারা চির-কুব্জ তাঁহারাও কোন রকমে অতি কষ্টে এই সভায় মস্তক উন্নত করিয়া গম্ভীরভাবে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন। "মশায়,বরকে একজনকে হাওয়া করতে বলুন, গরম বোধ হচ্ছে।" আমরা নিশ্চিত জানি, সত্যেনের তখন আদৌ গ্রীষ্মানুভব হয় নাই।

এই প্রকার কএক দণ্ড অতিবাহিতের পর, লগ্নকাল উপস্থিত হইলে, কন্যাকর্ত্তা সভাস্থ সকলের নিকট কন্যা পাত্রস্থ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বরকে বিবাহ স্থলে লইয়া গেলেন। যথাকালে আত্মীয়, বন্ধু, স্বজনের সমক্ষে যথাবিধি হিরণ্ময়ীর সহিত সত্যেন্দ্রনাথের শুভপরিণয় সমাধা হইয়া গেল। এই বার সদ্যবিবাহিত এই নবীন দম্পতি বাসর ঘরের রমণী-সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির কালে তিনি বেস করিয়া হিরণ্ময়ীর মুখ খানি দেখিলেন। সত্যের অনুরোধে বলা কর্ত্তব্য যে, আজিকার এই শুভ সময়ে, পবিত্র স্থানে ধর্ম্মপত্নীর পার্শ্বে বসিয়া, সত্যেন্ একবার বিধবা মালতীর কথা ভাবিলেন। আশৈশব কল্পিত মনোমত ভার্য্যালাভে তাহার অন্তরে যে সুখস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, মালতীর কথা মানসে জাগরিত হওয়াতে সে স্রোতের পথে কিঞ্চিৎ বাধা পড়িল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ বিবাহ শুভজনক হইবে ত? যাহা হউক, সুখের বিষয়, বাসর ঘরের আনন্দ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া, সকল অসুখকর চিন্তা তিরোহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত সুধাস্রোতে মিশিল।

আমরা এই বাসর ঘরের সম্যক্ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে অসমর্থ। পল্লিগ্রামের প্রাচীনা ও প্রৌঢ়াগণের শাদা সিধা,মোটামুটি পুরাতন ভাবের রহস্যপূর্ণ বাক্যাবলী ও ভাব ভঙ্গির সহিত, শিক্ষিতা নবীনাদের আধুনিক ভাবের হাস্য-কৌতুক ও রঙ্গ রসের একত্র সমাবেশে যে এক নূতন ভাব ফুটিয়া পড়িয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া আমাদের বিড়ম্বনা মাত্র। সত্যেন্ তাঁহার স্বাভাবিক সরলতার সহিত সকলের কথার উত্তর দিতে লাগিলেন;—যথাসম্ভব সকলের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সুপারি কাটিলেন। হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে করিলেন। কিন্তু গান গাইলেন না। অমর ও অপর কএক জন বন্ধু তাঁহার সহিত বাসর ঘরে দেখা করিলেন, ইংরাজি ভাষায় তাঁহাদিগের সহিত কথা হইল। তাঁহারা চলিয়া গেলে, আবার রমণীবৃন্দ সত্যেন্‌কে ঘিরিয়া বসিল। রাত্রি ২॥টা কি ৩টার সময় কক্ষের সকলেই প্রায় একে একে নিদ্রাভূত

হইলে পর, সত্যেন্দ্র নাথ শয়ন করিলেন। হিরণ্ময়ী এখন নিদ্রিতা। সত্যেন্ দীপের আলোকে—সাবধানে—একবার হিরণ্ময়ীকে ভাল করিয়া দেখিলেন,—তৎপর পুনরায় দুঃখিনী মালতীর কথা মনে করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন। কএক দণ্ড পরে, প্রত্যুষে বিবাহ বাটীর গোলমালে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

বরযাত্রিগণ ক্রমে একে একে সকলেই শয্যা ত্যাগ করিলেন। বারোয়ারী, গ্রাম-ভাটি, হরিসভা, পাঠশালা প্রভৃতির পাণ্ডা-দিগকে রায় মহাশয় সন্তুষ্ট করিলেন। তৎ-পরে, যথাকালে 'বরকনে' পুনরায় বাদ্য ও রোসনাইয়ের সহিত কুসুমহাটী হইতে যাত্রা করিলেন।

—*—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নব-বধূর আগমনে।

সত্যেন্দ্র বিবাহ করিয়া বাটী আসিলেন। আজি রায় পরিবারের বড় আনন্দের দিন। নব বধূ দেখিতে পাড়া প্রতিবেশিনী রমণিগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। বধূ দেখিয়া সকলেই রূপের প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, যেমন ছেলে, তেমনি সোনার চাঁদ বৌ হয়েছে। আহা বেঁচে থাক। কেহ বলিল,—'এত দিনে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এলেন।' কেহ বলিলেন—"আজ বড় বাবু বেঁচে থাকলে, কত আহ্লাদ। তাঁর কপালে নাই;—তাই এমন বৌ নিয়ে আমোদ করতে পেলেন না।" ইত্যাদি প্রকার নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। শচীকান্ত বাবুর সংসারে স্ত্রীলোক বা পুরুষের সংখ্যা অধিক না হইলেও, জ্ঞাতি কুটুম্ববর্গের সংখ্যা অল্প নহে। অদ্য সেই সকল আত্মীয় কুটুম্ব কন্যাগণের দ্বারা অন্তঃপুর পরিপূরিত।

বধূ বাটীতে আসার পর, একদল বালিকা তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। সত্যেনের খুড়ী মাতা নিজ হস্তে বধূকে আহার করাইলেন। বৈকালে লীলাবতী ও তাঁহার ভগিনী সম্প-র্কীয়া যুবতীদিগের মধ্যে কেহ কেহ কনেকে চুল বাঁধিয়া দিতে, কেহ বা সাজা-ইয়া দিতে লাগিলেন। শচীকান্ত বাবুর খুড়ী-সম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা বরাবরই তাঁহাদের সংসারে থাকেন। তিনি সত্যেন্‌কে বড় ভালবাসেন। বৃদ্ধার আজ আর আনন্দের সীমা নাই, তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, মধ্যে মধ্যে সত্যেন্‌কে দেখিলে প্রাচীনাসুলভ সম্পর্কোচিত পরিহাস করিতে-ছেন। এক একবার নূতন নাতি-বৌয়ের নিকট যাইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া নানা ভঙ্গি-পূর্ব্বক সেকেলে গোছের ঠাট্টা তামাসার কথা বলিয়া নবীনা ও বালিকাদিগকে হাসাই-তেছেন। কখনও বা বলিতেছেন,—"দেখ ভাই, আমাদিগকে ঘরে দেখে সাত হাত ঘোমটা দিতে হয় না। উনি তোমার ননদ, উনি পিসেস্, ওঁদের কাছে লজ্জা কোরো,—ঘোমটা দিও।"

এই প্রকারে বৈকাল বেলা ক'নেকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হই-তেছে, এমন সময় অমরনাথ তথায় আসিয়া

বলিলেন,—"লীলা! কনে বৌকে একবার বৈঠকখানায় নিয়ে যাব।"

লীলা বলিলেন,—"কেন অমর দাদাকে দেখ্‌বে গো?"

"ওঁকে তুমি জান না, তিনি সত্যেন্‌ দাদার একজন বন্ধু। কুমুদ কোথা, তোমার বৌ দিদির সঙ্গে একবার আস্‌বে?"

"ওমা, এখনই? দাঁড়াও সাজিয়ে গুছিয়ে দি। এই রকম পাঠায়ে দিব বুঝি? তুমি এখন ওবাড়ী যাও; আমি ডাক্‌তে পাঠাব এখন।"

"সাজানের কম্‌টা কি আছে, আর সাজাতে হবে না।"

"না,—অমর দাদা, তা হবে না; ভাল কাপড় পরিয়ে দি, গহনা পরিয়ে দি, তার পর নিয়ে যাবে এখন।"

"তবে শীঘ্র কি গহনা টহনা পরাতে হবে পরিয়ে দাও, আমি এখনি এসে নিয়ে যাব।"

"তুমি যাও আমি এখনি ঠিক্‌ঠাক্‌ করে দিচ্চি।" (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ।

প্রথম প্রস্তাব।

প্রয়োজন।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম প্রয়োজন আত্মাদর লাভ। আত্মাদরের অভাবে লোক নিস্তেজ হয়, নিস্তেজ ব্যক্তি অর্থসাধনে ও অনর্থনিবারণে যথোচিত অধ্যবসায় সম্পন্ন হয় না, অধ্যবসায়হীন ব্যক্তিকে অনেকসময়েই পরাভব লাভ করিতে হয়, পরাভূত ব্যক্তির চিত্তে দৈন্য উপস্থিত হয়, দীন চিত্ত ব্যক্তিগণের প্রতিভার হানি হয়, নিষ্প্রতিভ ব্যক্তির উন্নতির আশা তিরোহিত হইয়া যায়—এইজন্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"নাত্মানমবমন্যেত"।

সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে, এই উন্নতির মূলীভূত আত্মাদরের বিলোপ হওয়ায়, এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনুচিকীর্ষারূপ মহারোগে অভিভূত হইয়া পাতিত্য লাভ করিতেছে। অনুচিকীর্ষা বিষয় বিশেষে ও সময় বিশেষে উপকারক না হয়—এমন নহে। কিন্তু উহাতে আত্মহারা হইলেই পতিত হইতে হয়, এই অনুচিকীর্ষা রোগ যে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ও তদনুবর্ত্তী ব্যক্তিগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিরল—ইহা বোধহয় অনুসন্ধান করিলে অসত্য বলিয়া উপপন্ন হইবে না। আত্মাদরহীন ব্যক্তি অনেকসময় অন্যদীয় দোষের অনুকরণ করিয়াও চিত্তপ্রসাদ লাভ করে। ইহা বহুপ্রৌঢ় ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের গোচর হইয়াছে—আমার বিশ্বাস।

সংস্কৃতাভিজ্ঞব্যক্তি, পূর্ব্বতন দেবচরিত্র

ভূদেবগণ অষ্টাদশ বিদ্যায় ও চতুঃষষ্টি কলায় কিরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তৎ-প্রণীত গ্রন্থ নিবহে তাহা উপলব্ধি করিয়া স্বজাতির প্রতি অনুরক্ত ও পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন এবং তাহাদের বংশধর বলিয়া আত্মাদর যুক্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন পরানুচিকীর্ষা হইতে বিরক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম প্রয়োজন এইযে, সংস্কৃতে অভিজ্ঞ হইলে আত্মহারা হইয়া পরানুচিকীর্ষা দ্বারা পাতিত্য লাভ করিতে হয় না। বস্তুতঃ সংস্কৃত শিক্ষাদ্বারা আমরা কিরূপ ছিলাম এবং এখন বা কিরূপ হইতেছি—ইহা অবধারণ করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি—ইহাই বিজ্ঞতার লক্ষণ। "কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ" এবং ইহাই উন্নতিলাভের প্রকৃতপথ।

প্রত্নতত্ত্ব নিরূপণ সংস্কৃত শিক্ষার দ্বিতীয় প্রয়োজন। প্রথমোক্ত প্রয়োজনটি কেবল হিন্দুজাতির সহিত সম্পৃক্ত। এই দ্বিতীয়টি সর্ব্বজাতি সাধারণ। বেদশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ আর জগতে নাই। কিন্তু বেদাঙ্গবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়া উহা হইতে প্রত্নতত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতে হয়—

"বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি"।

বেদ, আমাকে প্রহার করিবে মনে করিয়া, অল্প-বিদ্য ব্যক্তি হইতে ভীত হয়েন। অতএব প্রত্নতত্ত্ব নিরূপণার্থী ব্যক্তিকে অষ্টাদশ প্রকার সংস্কৃতশাস্ত্রে অধিকারী হইয়া প্রত্নতত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসঙ্গতঃ এই কথা অবক্তব্য নয় যে,—জীবিকোপার্জ্জনের জন্য প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ উপযোগিতা নাই। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে তাদৃশ প্রয়াস বায়সের দশনানুসন্ধানের তুল্য;* তথাপি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অপ-সিদ্ধান্ত দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়া এই প্রাচীন সমাজে বিশৃঙ্খলতা জন্মাইতেছে, তাহা বোধ হয়, কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে—এই স্থানে একটির উদাহরণ দিতেছি। যথা,—"দেশান্তর হইতে আগত দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া শূদ্রগণ দাসত্ব লাভ করিয়াছে।"

খৃষ্টানগণ এই সিদ্ধান্ত প্রচার করায়, এবং দাসত্ব-শব্দ শ্রবণ-মাত্রে খৃষ্টানাধিকৃত নবদ্বীপের অশ্রোতব্য, অবক্তব্য, অপবিত্র অত্যাচার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়ায়, শম-

* যাহারা গৌড়দেশ কোথায়, তাহা না শিখি[illegible] এলাস্‌কার সীমা কণ্ঠস্থ করে, রামায়ণ না পড়িয়া অষ্টম হেনরির সুচরিত্র অভ্যাস করে, মীরজাফর, রাঘব রাও ও মহম্মদী বেগ প্রভৃতির নাম মুখস্থ করে অথচ বিবাহের সময় তিন পুরুষের নাম বিষয়ে অজ্ঞতানিবন্ধন পুরোহিতকে ব্যাকুল করে, তাদৃশ এডুকেটেডদিগের নিকট বায়সদশনানুসন্ধানের কথা বলা আর মলেগ্রহির নিকট "মলমূত্রপুরীষাস্থি নির্গতং হাণ্ডবিস্মৃতং। নারং স্পৃষ্ট্বা তু সস্নেহং সচে লোহ্জলমাবিশেৎ" এই বচন পড়া তুল্য সন্দেহ নাই।

প্রধান ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শূদ্রগণের বিদ্বেষ-ভাব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু বিলাতি বাসনায় বাসিত কোন ব্যক্তিই যে শূদ্র থাকিতে সম্মত নহে, সুতরাং তন্নিবন্ধন গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়া যে সামাজিকগণের বৃথা সময় ও কর্ম্মক্ষয় করিতেছে; তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

৺সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীশ্রীভগবানচন্দ্রের কৃপায় এতদ্বারা কোন প্রকার বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত না হয়, ইহাই দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রের প্রার্থনীয়।

আমি এই দ্বিজাতিগণের বৈদেশিকত্ব এবং শূদ্রগণের দাসীকৃতত্ব সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইতে পারি নাই। কারণ উহার অনুকূলে যে সকল হেতু প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হেত্বাভাসরূপেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং গতানুগতিক ন্যায়ে উহাদিগকে সদ্ধেতুরূপে পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। আমার আশা আছে, আচার্য্যগণের প্রদর্শিত প্র[illegible] পথে সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলন করিলে আমার সহিত পাঠকগণের কোন বিসংবাদ থাকিবে না। কতিপয় খৃষ্টান-গ্রন্থকারমহোদয় তাদৃশ দুর্ব্বল হেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া কেন যে এই সিদ্ধান্ত স্বগ্রন্থে অভ্রান্তবৎ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাহা অনুমিতির বিষয়। সুতরাং উহাতে আমার এবং পাঠকগণের সমান অধিকার; অতএব আমি এখন অনুমানপ্রয়াসে বিরত রহিলাম। আমার বিশ্বাস শূদ্রগণ চিরদিনই আমাদের সমাজের অঙ্গ, আমরা দেশান্তর হইতে আসিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করি নাই।" যযাতি দেবযানীকে বলিতেছেন—

এক-দেহোদ্ভবা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি বরাঙ্গনে।
পৃথগ্ধর্ম্মাঃ পৃথক্শৌচা স্তেষান্তু ব্রাহ্মণো বরঃ॥
মহাভারত আ ৮২ অ।

সংস্কৃত শিক্ষার তৃতীয় প্রয়োজন,—ভাষাবিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ। শব্দের শক্তি কল্পনে, মূল-নিষ্কাসনে, অন্বয়-বোধের জাতি নিরূপণে, বাক্যের শ্রেণী বিভাগ-বিধানে, দোষগুণ অলঙ্কার রীতি ও রসের প্রদর্শনে এবং বলাবল নির্ব্বাচনে সংস্কৃত আচার্য্যগণ নিরতিশয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং বিধ মৌলিক ভাষায় অজ্ঞ থাকিয়া ভাষা বিজ্ঞানে প্রাজ্ঞ হওয়া একান্ত অসম্ভব।

আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন সংস্কৃত শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজন হইলেও চতুর্থ স্থানে নিবেশিত হইল; কারণ, দুঃখের সহিত বলিতেছি, এতদ্দেশীয় লোক এখন আর আধ্যাত্মিক কল্যাণলাভের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ব্যগ্র নহে। "অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ" ইহাই বর্ত্তমান সময়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত। অন্যথা নীতি, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান আত্মা, পরমাত্মা ও মুক্তি বিষয়ে সংস্কৃতশাস্ত্রে যে সকল অমোঘ এবং অমূল্য উপদেশ নিহিত রহিয়াছে, প্রতীচ্য দেশের শীর্ষস্থানীয় এথিন্স—নগরীতেও তাহা প্রাদুর্ভূত হইতে পারে নাই। সুতরাং প্রয়োজনান্তর না থাকিলেও শুদ্ধ ইহারই জন্য, ভারতবর্ষীয়গণ

সংস্কৃত-চর্চায় সর্ব্ব-প্রযত্নে ব্যাপৃত হইত সন্দেহ নাই। যাহারা সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া অন্যদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবেন, আমার বিশ্বাস, তাহারা ডক্টর জন্‌সনের ন্যায় বলিতে বাধ্য হইবেন "What is good is not new, what is new is not good." যাহা ভাল তাহা নূতন নহে, যাহা নূতন তাহা ভাল নহে।

মাতৃভাষার উৎকর্ষসাধন সংস্কৃত শিক্ষার পঞ্চম প্রয়োজন। কোন জাতি মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া, দেশান্তরীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞান চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়া, সমধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রতিকূল পবন এবং জলে নৌকা চালনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির ন্যায় উহাতে বহু পরিশ্রমে অল্প মাত্র ফল প্রসব করে। স্থল বিশেষে তাদৃশ প্রয়াস কেবল বিফল হয় এমন নহে, প্রত্যুত ভূয়িষ্ঠ অনিষ্ট ও উৎপাদন করিয়া থাকে ইহা অদৃষ্টচর নহে। নর্ম্মাণ বিজিত ইংরাজেরাও এক সময় বিজেতৃজাতির ভাষা প্রধানতঃ ব্যবহার করিতেন, দরিদ্র কৃষক শ্রেণীস্থ ইংরেজগণই কেবল মাতৃভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন; এখন তাহারা এই অস্বাভাবিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভাষার আশ্রয়ে অনায়াসে জ্ঞানে ও গুণে অলঙ্কৃত হইতেছেন। অথচ নর্ম্মাণ ফরাশি ভাষা এবং ইংরেজী ভাষা তত বিরুদ্ধ প্রকৃতিকও নহে। পক্ষান্তরে আমাদের মাতৃভাষাও ইংরেজী ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক। এমন অবস্থায় এতদ্দেশীয় দুর্ভিক্ষনিষ্পিষ্ট মহামারীক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিক ভাষার আশ্রয়ে জ্ঞানে ও গুণে অনায়াসে উৎকর্ষ লাভ করিবে ইহা সম্ভবপর নহে।

"গুরুমহাশয়! আপনার বেত্রাঘাতেই অস্থির আছি, এক টাকায় কত কড়া—ইহা চিন্তা করিব কখন?

যাহারা বলেন, সংস্কৃতও বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরেজী অনায়াসে অভ্যাস করা যায়। তাহাদিগকে আত্মবঞ্চক বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত গালি দেওয়া হয় না।

অতএব মাতৃভাষাই আমাদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হওয়া কর্ত্তব্য এবং সংস্কৃত চর্চার দ্বারা উহার বর্ত্তমান অভাব পূরণ করা আবশ্যক। যাহারা ইংরেজি শব্দ দ্বারা এই কার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের এই বিজাতীয় সমাগম প্রয়াস, ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তির কৃত্রিমাঙ্গসংযোজনার ন্যায়, কখনও স্বাভাবিক সৌষ্ঠব লাভ করিতে পারিবে না। কাঁঠাল গাছে আম বান্ধিয়া দিলে, কএক দিন পরে আপনিই পচিয়া পড়ে। অনেক যাবনিক শব্দ এই ভাবে স্খলিত হইতেছে, কেবল সংস্কৃত ভাষার অনধিকৃত বিষয়ে কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ই এখন পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

একজন সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিলাত প্রত্যাগত ব্রাহ্মভাবাপন্ন শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান ব্যক্তি বলেন—বাঙ্গালা ত পৃথক ভাষা, উহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংস্কৃতের প্রয়োজন কি? একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মুখ হইতে

যখন এই প্রকার বাক্য নির্গত হইয়াছে তখন অনেকের এই প্রকার সংস্কার থাকা সম্ভব। অতএব সংক্ষেপে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবশ্যক।

আমাদের দেশে আমেকীট জন্মে, প্রথম অবস্থায় ঐ কীট ও আম একই বস্তু বলিয়া অনুভূত হয়, পরে যখন উহা পূর্ণতালাভ করে, তখন অন্যরূপ ধারণ করে বটে, তথাপি উহা আম্রের উপাদানেই পরিপুষ্ট হইতেছে—ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয়।

সংস্কৃত ভাষার সহিত ভারতবর্ষীয় বহু ব্যবহার্য্য জীবিত ও মৃত ভাষার ঐ প্রকার সম্বন্ধ। সংস্কৃত আম্র স্থানীয়, জীবিত ও ও মৃত ব্যবহার্য্য ভাষা সকল কীট স্থানীয়। প্রাচীন আর্য্য জাতি আদি পুরুষ হইতে সংস্কৃত ভাষালাভ করিয়াছিলেন—

"সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ"।

(কাব্যাদর্শ)

চত্বারি শৃঙ্গাত্রয়োঽস্যপাদাঃ
দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসোঽস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহোদেবো মর্ত্ত্যা আবি বেশহ।

(সর্ব্বদর্শন সংগ্রহধৃত শ্রুতি)

এক বাঙ্ময় মহান্ দেব মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি বৃষ বলিয়া অভিহিত, কারণ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গফলকে বর্ষণ করিয়া থাকেন। এই বৃষের "সুবন্ত,—নাম তিঙন্ত—আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এই চতুর্ব্বিধ—বাক্যাঙ্গ চারি শৃঙ্গ। *

এই জন্য উপসর্গ পৃথক্ বাক্যাবয়বরূপে, উপরি উক্ত মন্ত্রে পরিগণিত হইয়াছে।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—এই তিন কাল ইহার তিন পাদ। কারণ শব্দময় দেবতার কালত্রয়বর্ত্তি কোন বস্তুই অগম্য নহে। ইহার মস্তক দুইটি অর্থাৎ বর্ণাত্মক শব্দ ও স্ফোটাত্মক শব্দ। † প্রথমাদি সপ্ত বিভক্তি

* এখন সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ উপসর্গকে নিয়ত ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্যবহার করেন, লৌকিক ব্যাকরণে "উপসর্গাঃ প্রাক্ প্রাদয়ো ধাতু যোগে" এইপ্রকার সূত্রও থাকে। কিন্তু পূর্ব্বকালে উহা পৃথক্ ভাবে ব্যবহৃত হইত দৃষ্ট হয়—যথা

"উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে, বিশ্বায় সূর্য্যম্"

(ঋগবেদ সূর্য্য সুক্ত)

কেতবঃ রশ্ময়ঃ, জাতবেদসং সর্ব্বজ্ঞং, দেবং দ্যোতমানং সূর্য্যং বিশ্বায় সকলায়, দৃশে দর্শনায়, উ ত্যোঃ উৎবহন্তি ঊর্দ্ধং বহন্তি।

† ক্রমিক বর্ণময় শব্দ শ্রবণের পর, স্ফোটাত্মক শব্দ প্রতিভাত হইয়া অর্থের স্মৃতি জন্মায়, পরে অন্বয় বোধ হয়—ইহা, বোধ হয়, এই বেদমন্ত্রের অভিপ্রেত। এই স্ফোটাত্মক শব্দ স্বীকার করিবার প্রয়োজন এই—মনে করুন আপনি কোন ব্যক্তিকে দূর হইতে আগমন করিতে দেখিতেছেন,

ইহার সাত হাত কারণ শব্দময় দেবতা উহা দ্বারা বাক্যের প্রধানভূত ক্রিয়ার সহিত সমুদায় কারক ও কারক সম্বন্ধীকে ধারণ করিতেছেন। এই বৃষ বক্ষঃ কণ্ঠ মুখ * এই তিন স্থানে বদ্ধ। অন্য কোন স্থানে তাহার আবির্ভাব হয় না। ইহা পুনঃ২ রব করিতেছে।

তখন আপনি তাহার প্রতি পদক্রমে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যদি ঐ ক্রমিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানগুলি ক্রমশঃবিনাশ না পায়—তবে শ্রীমদ্ভাগবদ্-গীতার একাদশ অধ্যায়ে রাজকুমার অর্জুন কর্তৃক দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ঐ ব্যক্তিও আপনার নিকট অনন্ত-বাহূদর-বক্ত্‌নেত্র—রূপে প্রতিভাত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রথম দর্শন স্থান হইতে গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাহার বর্ত্তমানতা অনুভূত হইতে পারে। এই আপত্তি নিবারণের জন্য বলা আবশ্যক যে—উত্তরোত্তর জায়মান জ্ঞানগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্বজাত জ্ঞান সকলকে বিনাশ করে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে "মানুষ" এই অনেক বর্ণময় শব্দ শ্রবণ করিয়া ঐ শব্দের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং উহার অর্থও উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ ঐ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমশঃ ম্ আ, ন্, উ, ষ, অ,—ছয়. বর্ণের প্রত্যক্ষ হয়, কোন সময়েও, প্রোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, সমুদয় বর্ণের প্রত্যক্ষ হয় না, পরিণামে কেবল অকার প্রত্যক্ষের উৎপত্তি ক্ষণে ষকার প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান থাকে। তাহাই যদি মানুষের উপস্থাপক হয়, তবে মহিষশব্দ শ্রবণেও মানুষের উপস্থিতি হইতে পারে। কারণ ঐ শব্দের উচ্চারণ কালেও চরম অকারের প্রত্যক্ষোৎপত্তিক্ষণে "ষ"কার প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা কোন সময়েই বহু বর্ণাত্মক শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষীকৃত বর্ণ সমুদায় হইতে অর্থবোধও হইতে পারে না।

ক্রমশঃ বর্ণগুলির প্রত্যক্ষ হওয়ার পর যুগপৎবর্ণসমুদায়াত্মক শব্দের স্মরণ হয় ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

কারণ স্মৃতি সর্ব্বদাই পূর্ব্ববর্ত্তি সমানাকার জ্ঞান অপেক্ষা করে। "মানুষ" এই সমুদায় শব্দটীর পূর্ব্বে কখনও কোন জ্ঞান হয় নাই, সুতরাং পরেও উহার স্মরণ হইতে পারে না। কেহ কি কখনও ইট, চুণ, সুরকি দেখিয়া অট্টালিকা স্মরণ করিতে পারে?

পদজ্ঞানের এই প্রকার অনুপপত্তি পরিহারের নিমিত্ত, আচার্য্যগণ বলেন—ক্রমিক বর্ণের প্রত্যক্ষ হইলে পর, মিলিত ভাবাপন্ন ক্রমহীন বর্ণ সমুহাত্মক শব্দ প্রতিভাত হয়—উহাকে স্ফোটাত্মক শব্দ বলে, উহা হইতেই অর্থ স্ফুরিত হয়।—যাহারা এই প্রকার গভীরার্থ বেদমন্ত্রকে নিরক্ষর কৃষকের গান বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমি তাহাদের শেমুষীর প্রশংসা করিতে অক্ষম।

*জিহ্বা মূল, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ এবং নাসিকা মুখের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক নির্দ্দেশ করা হয়নাই।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্যজাতি ৺ পরম পিতা হইতে সংস্কৃত ভাষাই লাভ করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষের অপকর্ষ প্রতিপাদনে প্রবণচিত্ত বৈদেশিক মহাত্মারাও এইপর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে মনুষ্য জাতির আদিম ভাষা বৈদিক সংস্কৃত না হইলেও উহার অনুরূপ ছিল।

যাহা হউক ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মৌলিক ভাষা যে সংস্কৃত ইহাতে আপত্তি করিবার কোন প্রকৃত কারণ নাই। কিন্তু স্বাধীন চিন্তায় মন্থরচিত্ত পরানুচিকীর্ষুগণ বলেন,—

ভিদ্যা দুদ্যদুদারদর্দ্দুর দরীদৈর্ঘ্যা দরিদ্রদ্রুম দ্রোহোদ্রেকমহোর্ম্মিমেদুরমদা মন্দাকিনী মন্দতাম্।" (কাব্যপ্রকাশ)

প্রভ্রশ্যত্যুত্তরীয়ত্বিষি তমসি, সমুদ্বীক্ষ্যবীতাবৃতীন্ প্রাক্

জন্তূন্ তন্তূন্ যথা যান্ অতনু বিতনুতে তিগ্মরোচির্মরীচীন্।

তে সান্দ্রীভূয় সদ্যঃ ক্রমবিশদদশাশাদশালী বিশালং

শশ্বৎ সম্পাদয়ন্তোহম্বরমমলমলং মঙ্গলং বো দিশন্তু॥

(সূর্য্যশতক)

এইপ্রকার সন্ধিসমাসগ্রথিত ভাষা কথনও ব্যবহারে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং সংস্কৃত ভাষা আর্য্যজাতির মৌলিক ব্যবহার্য্য ভাষা নহে।

ইহার উত্তর এইযে—

ইতিবিজ্ঞাপিতোরাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিত-লোচনঃ।
ক্ষণমাত্র মৃষিস্তস্থৌ সুপ্তমীনো যথা হ্রদঃ॥

রঘুবংশের এই শ্লোকটির কেহ অনুবাদ করিয়াছেন—"ভবদ্ভূত-ভবিষ্যত্তত্ত্বদর্শী বশিষ্ঠ অবাত-বিক্ষোভিত মীনাহতিরহিত গভীর জলাশয়ের ন্যায় ধ্যান নিশ্চল নেত্রে ক্ষণকাল মাত্র অবস্থান করিয়া ছিলেন"।

এই বাঙ্গালা পাঠ করিয়া কি বলিতে হইবে যে বাঙ্গালা ব্যবহারিক ভাষা নহে?

সর্ব্বদা ব্যবহারে এবং পুস্তকে ভাষার একটু বৈলক্ষণ্য থাকে। কারণ গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ বাক্য শিষ্ট ও অগ্রাম্য করিবার জন্য যত্ন করেন, তাহাতে পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। সংস্কৃত ভাষায় আবার পদগুলি বড়ই সুশ্লিষ্ট হয়—অর্থাৎ অনেকগুলি পদ কুসুমমালার মত মিলিত হইয়া পড়ে। সুতরাং শুনিলে এক পদের ন্যায় বোধ হয় যথা—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়োনাম নগাধিরাজঃ"।
(কুমার সম্ভব)

ইংরেজি ভাষায় এই শ্লেষগুণ বড় বিরল, প্রতি পদেই স্বরহীন ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জন হীন স্বরবর্ণ পাঠ করিতে পাঠকের স্খলিত পদ হইতে হয়। "Not to know me showes thyself unknown" এই সুন্দর বাক্যটিতেও পাঠকের কএকবার স্খলিত পদ হইতে হয়। অতএব সংস্কৃতের ন্যায় সুশ্লিষ্ট ভাষা মনুষ্যের ব্যবহার যোগ্য নহে—এইপ্রকার মনে করা ইংরেজ দিগের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

কিন্তু অনুচিকীর্ষু বাবুরাও যে এইরূপ

মনে করেন—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারণ তাহাদের মাতৃভাষায় ও ইংরেজি ভাষা হইতে অধিকতর শ্লেষগুণ উপলব্ধ হইয়াথাকে যথা—

"সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়"—ভারতচন্দ্র।

"মনে করি মহেশ্বরী চরণ চারু চিন্তাকরি
হরি স্মরণ পূর্ব্বক সুরধুনীর তীরে মরি"
—"কবিচন্দ্র।"

বিলাতি বাসনায় বাসিত বাবুগণ আরও বলেন—সংস্কৃত নাম দ্বারাই বোধ হয় ঐ ভাষা কৃত্রিম, উহা কখনও ব্যবহার্য্য ছিল না। এই সিদ্ধান্ত ও যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহার সংস্কৃত নাম হইবার কারণ এই—যেকালে এই দেব-ভাষা বিকৃত হইয়া রূপান্তরিত হইতে লাগিল —গণ্ড স্থানে গল্ল, ভদ্রস্থানে ভল্ল—এইপ্রকার বিকৃত পদ লোকে ব্যবহার করিতে লাগিল যথা—

"তাম্বূল-ভৃতগল্লোঽয়ং ভল্লং জল্পতি মানুষঃ।"
—সরস্বতী কণ্ঠাভরণ।

এই গল্ল ও ভল্ল শব্দই এখন আবার একটু বিকৃত হইয়া বাঙ্গলায় "গাল" ও "ভাল" এইরূপ লাভ করিয়াছে। এইরূপ বহু ব্যবহারকৃত বিকার উপস্থিত হওয়ায়, উহার নিবারণের জন্য ব্যাকরণ প্রণীত হয়। এই বৈয়াকরণকৃত সংস্কার নিবন্ধন ইহা সংস্কৃত নাম লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু বৈয়াকরণগণের এই সংস্কার প্রদান কালে বাহুল্য ভয়ে লৌকিক সংস্কৃতে প্রাচীন বহু শব্দ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। যথা,—

পূর্ব্বে "গচ্ছতি" অর্থে কাম্বোজবাসী আর্য্যগণ "শবতি" পদ ব্যবহার করিতেন। যথা,—"শবতির্গতিকর্ম্মা কাম্বোজেষু দৃশ্যতে" (যাস্ক নিরুক্ত)। এখন কেবল মৃতদেহ অর্থে ঐধাতুর "শব" এই বিশেষ্য পদটি প্রযুক্ত হয়। বেদে এক ধাতুর উত্তর বিকরণত্রয়ও ব্যবহার হইত। যথা,—ইন্দ্রেন যুজা তরুষেম বৃত্রং" এই শ্রুতিতে "তৃ" ধাতুর পর উপ্, সিপ্, শপ্—এই তিনটি বিকরণ দৃষ্ট হয়। এখন কেবল "তরেম" এই প্রকার শপ্ সংযুক্ত পদই ব্যবহৃত হয়। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও মহাভারতে স্থানে স্থানে বিকরণদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধ করিয়া দেবযানীকে বলিয়াছেন,—

"আদ্রবস্ব বিদ্রবস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাচকি।
অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি।"
মহাভারত আঃ৭৯ অঃ।

এই শ্লোকে দ্রু ধাতুর উত্তর "শ্নু ও শপ্", এই বিকরণ দ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। এই প্রকার অনেক বিকরণ ব্যবহার এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আহবয়াসাস আজুহাব, দেবাসঃ দেবাঃ, কৃধি কুরু, শ্রুধি, শৃণু ভেষজা ভেষজানি, পূর্ব্বেভিঃ পূর্ব্বৈঃ—এইপ্রকার বৈকল্পিকরূপ প্রযুক্ত হইত। এখন উহার একএকটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৈয়াকরণ সংস্কার দ্বারা দেবভাষা রক্ষিত ও লঘুকৃত হইয়াছে, নির্ম্মিত হয় নাই।

ভগবান্ পাতঞ্জলি ও ব্যাকরণের প্রয়োজনাভিধান কালে বলিয়াছেন "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্"। এই প্রকার কতিপয় শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া যদি

সংস্কৃত ভাষাকে কৃত্রিম ও অব্যবহার্য্য বলা হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাকেও কৃত্রিম ও অব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। কারণ উহারও ব্যাকরণও অভিধানে বরিশালের "বড্‌বডায়" বিক্রমপুরের "ঘাটা" যশোহরের "থাগো" ময়মনসিংহের "চুব" মালদহের "হামি" কোটালিপাড়ার "গোন্দো" বা "এদো" প্রভৃতি শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষাই চাতুর্বর্ণময় ভারতবর্ষীয়গণের ভাষা ছিল।—এই বিষয়ে যে ৺ ভগবান্ বাল্মীকিও সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। যথা,—

যখন শ্রীমন্মহাবীর হনুমান্ দেখিলেন—৺শ্রীশ্রীসীতাদেবী অশোককাননে রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক প্রলোভিতা এবং তর্জ্জিতা হইয়া বলিতেছেন,—

চরণেনাপি সব্যেন ন স্পৃশেয়ং নিশাচরম্।
রাবণং, কি পুনরহং কাময়েয়ং নিশাচরম্।
নমানুষী রাক্ষস স্যভার্য্যা ভবতু মর্হতি।
কামংখাদতমাং সর্ব্বান্ করিষ্যামি রোবচঃ।

তখন ঐ মহাবীর বিশস্ত হইয়া জনকতনয়ার সহিত কি ভাষায় আলাপ করিবেন তাহার বিচার করিতে লাগিলেন। যথা,—বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাং। যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাং। রাবণং মন্যমানামাং সীতাভীতা ভবিষ্যতি।

সীতার সহিত আলাপে আমাকে মানুষোচিত সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। যদি দ্বিজজাত্যানুরূপ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করি, তবে তিনি আমাকে রাবণ মনে করিয়া ভীতা হইবেন।

ইহাদ্বারা প্রতীত হয় যে, দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্রাদিরও সংস্কৃতই ভাষা ছিল। তবে দ্বিজগণ "অহমন্নভুঞ্জে" বলিতেন, শূদ্র হয় ত অহমন্ন ভোজনং করোমি এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলার ৪র্থ অঙ্কে মহর্ষি কণ্ব যখন যজ্ঞীয় অগ্নিতে ৺পরম দেবতার স্পষ্ট সত্তা অনুভব করিয়া শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—তখন কালিদাস দ্বিজজাতির অনুরূপ সংস্কৃতের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

অমী বেদিং পরিতঃ কপ্তধিষত্যাঃ
সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণ দর্ভাঃ।
অপঘ্নাতো দুরিতং হব্যগন্ধৈঃ
বৈতানস্ত্বাং বহ্ণয়ঃ পাবয়ন্তু॥

বস্তুতঃ আমাদের পূর্ব্ব পিতৃগণ ও মাতৃগণ সকলেই ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বকবেদ-অধ্যয়ন করিতেন। যথা যম বলিতেছেন—

"পুরাকল্পে হি নারীণাং ব্রতবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা"।
—পরাশর মাধব।

পূর্ব্বকালে নারীদিগের ব্রহ্মচর্য্যব্রত, মেখলাবন্ধন, বেদের অধ্যাপন সুতরাং অধ্যয়ন এবং সাবিত্রীর উপদেশ বিহিত ছিল। বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রক্ষিপ্তবাদ নিবারণের জন্যে ইহার আনুষঙ্গিক প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। যে নারী বেদ অধ্যয়ন করাইতেন

ব্যাকরণ ও অভিধানে তিনি "আচার্য্যা" বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। আচার্য্য পত্নীকে আচার্য্যানী বলে।

২। আশ্বলায়ন শাখীয় ব্রাহ্মণগণ এখনও কহোল গৃৎসমদ প্রভৃতির ন্যায় গার্গী, বাচক্নবী, বড়বা, প্রাচীথেয়ী, সুলভা, মৈত্রেয়ী এই সকল আচার্য্যাদিগের তর্পণ করিয়া থাকেন। ধন্য ইহাদের গুরুভক্তি, ধন্য ইহাদের কৃতজ্ঞতা।

৩। মহাকবি ভবভূতি উত্তররাম চরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী নামে এক ব্রহ্মচারিণীকে উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন—

অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকি পার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥

৪। মহারাজ সুরথ যে দেবীসুক্ত জপ করিয়া ৺শ্রীশ্রীভগবতী জগদম্বার আরাধনা করিয়া ছিলেন। উহা একব্রাহ্মণতনয়ার মুখ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদিগের পূর্ব্বমাতৃগণ ও বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ব্যাপৃত ছিলেন। তখন সংস্কৃতই তাহাদের ভাষা ছিল। আমরা ভগবান্ মনুর শতসাহস্রী দ্বাদশ সাহস্রী ও অষ্ট সাহস্রী সংহিতা প্রাপ্ত হই নাই। কেবল 'সুমতির সংক্ষিপ্ত চতুঃসাহস্রী সংহিতা লাভ' করিয়াছি। এই সংহিতায় কুমারীগণের শিক্ষার উপদেশ আছে বটে, কিন্তু উপনয়নাদির বিধান নাই। কিন্তু সুমতি স্বসংগৃহীত মনুসংহিতায় যে বিবাহ মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিধবা বিবাহের প্রতিকূলে তীব্রমত প্রকাশ করিয়াছেন—

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈরপি।
নতু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥
নো দ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবা-বেদনং পুনঃ।
"মনুসংহিতা"।

ঐ মন্ত্রটি এই—যথা

আর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত
স ইমাং দেবো আর্য্যমা প্রেতঃ

মুঞ্চাতু নামুতঃ স্বাহা ইত্যাদি। এই মন্ত্রে কন্যা বৈবাহিক যজ্ঞের অধিকারিণী রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিধবা কন্যা নয় বলিয়া বৈবাহিক যজ্ঞে অধিকারিণী নহে।

ইহা সকলেরই জ্ঞাত থাকা উচিত যে বৈদিক দীক্ষা ব্যতিরেকে কাহারও যজ্ঞে অধিকার হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কন্যাদিগের বৈদিক দীক্ষা বিনা বরই ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের টীকাকার গর্গনারায়ণ অগত্যা তাহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে সংস্কৃতই যে আমাদের পূর্ব্ব মাতাপিতৃগণের ভাষা ছিল—ইহা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করা যায়। আমাদের বর্ত্তমান হিন্দি বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা এবং পুরাতন প্রাচ্য শৌরসেনী, মাগধী—প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃত হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাতেও বোধহয় কাহারও সন্দেহ করিবার

কারণ নাই। জাতীয় ভাষাই কালে জাতীয় ভাষান্তর প্রসব করে, কৃত্রিমভাষা তাহা করিতে পারে না। সুতরাং সংস্কৃত যে এক-সময় আমাদের মাতৃভাষা ছিল তাহা নিশ্চয়। যথা হিন্দি।—

"জীবিকা, ভয়, লজ্জা, কুশলতা, দেনেকী প্রকৃতি, জাহা য়ে পাচ নাহী, বহোকে লোগোকে সাথ, সংগতি করনী ন চাহিয়ে"

ইহার সংস্কৃত এই—

লোক যাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণং ত্যাগশীলতা।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুর্য্যাত্তত্র সংগতিম্॥

এই হিন্দি যে সংস্কৃত হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে—ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয়। আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও যে সংস্কৃতেরই ঈষৎ বিকারও বিয়োগে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যথা "অধ্যয়নে লোক বিনীত হয়" এই একটি বাঙ্গালা বাক্য। ইহাতে চারিটি পদ। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পদে তিনটি সংস্কৃতপদের বর্ণত্রয় বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রথম পদে 'ন' দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে বিসর্গ। ঐ তিন বর্ণ যোগ করিলেই উহা সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত হয়; যথা অধ্যয়নেন লোকঃ বিনীতঃ। চতুর্থটি ক্রিয়াপদ "হয়"।

ঢেকীসিদ্ধিন্যায়ে যাঁহারা "দেশান্তর হইতে আগত দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক শূদ্রগণ নির্জ্জিত ও দাসীকৃত হইয়াছে।" এই সিদ্ধান্তে আস্থাবান, তাঁহারা হয়ত বলিবেন,—এই 'হয়' পদটি সেই আদিম শূদ্রদিগের ভাষার শব্দ। বাস্তবিক তাহা নহে, সংস্কৃত "ভবতি" এই পদ হইতে ঐ 'হয়' পদটি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এস্থানে আমের কীট সমধিক রূপান্তরিত হইয়াছে বটে, তথাপি বিজ্ঞব্যক্তির নিকট উহা আম্রকীট বলিয়াই প্রতিভাত হয়, যথা—'ভবতি' এই পদের আদি বর্ণ 'ভ'। উহাতে 'ব' এবং 'হ' এই দুই বর্ণ আংশিক সংযোগে সংযুক্ত। উহার বকারাংশ পরিত্যক্ত হওয়ায়, হকারাংশ পরিপুষ্ট হইয়াছে; এবং 'তি' এই অংশের তকার বিলুপ্ত হওয়ায় 'ই' রহিয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় এই প্রকার 'তকার লোপের বহু উদাহরণ দৃষ্ট হয়, যথ—সংস্কৃত "চুম্বিতানি" প্রাকৃত "চুম্বি আইং" মধ্যবর্ত্তী "ব"টি অন্তঃস্থ বর্ণ। উহার উচ্চারণ অনেকাংশে 'ও' কারের অনুরূপ। পূর্ব্ববঙ্গীয় মহিলাগণ এখনও ভর্ত্তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে "দেবর" না বলিয়া "দেওর" বলিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে প্রাকৃত ভাষার "ভ" এই বর্ণের অকার বিলোপ হওয়ায় "হ্ ও ই" এই তিন ধ্বনি মিলিত হইয়া প্রাকৃত ভাষার "হোই" হইয়া ছিল, যথা—"হোই ন হোই বা বিশামো"—ইহার সংস্কৃত "ভবতি ন ভবতি বা বিশ্রামঃ।"

(কাব্যপ্রকাশ ৩য় উল্লাস)।

এই প্রাকৃত ভাষায় 'হোই' এখন বিয়োগ ও বিকার প্রণালীতে বাঙ্গালায় "হয়" হইয়াছে। তাহার প্রণালী এই—সংস্কৃত ভাষায় ওকার সন্ধ্যক্ষরবর্ণ। অর্থাৎ উহাতে অবর্ণ এবং উবর্ণ মিলিত ভাবে অবস্থিত। উহার উবর্ণাংশ পরিত্যাগে 'হো' স্থানে 'হ'

হইয়াছে। এবং 'ই' বর্ণ ও 'য' উভয়ই তালব্য বর্ণ। উহাদের আদিম উচ্চারণে পরস্পর বিশেষ বৈলক্ষণ্য ছিল না এই জন্যই য কারের পূর্ব্বে বৈয়াকরণেরা ইড়াগমের নিষেধ করিয়াছেন। এবং এই জন্যই উহাদের মধ্যে অনেক সময় রূপের বিনিময় দৃষ্ট হয়। যথা—ব্যধ+ক্ত=বিদ্ধ—এই প্রয়োগে "য" স্থানে "ইকার" হইয়াছে। পক্ষান্তরে নদী+অম্বু=নদ্যম্বু—এই পদে 'ই বর্ণ স্থানে 'য' হইয়াছে। তদ্রূপ প্রস্তাবিত ক্রিয়া পদেও 'ইকার' স্থানে 'য' হওয়ায় 'হয়' এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সুতরাং 'হয়' এই পদটিও সংস্কৃতমূলক শব্দ, তাহার সন্দেহ নাই। পরন্তু প্রাকৃত ভাষার যন্ত্রে একবার নিষ্পীড়িত হইয়া বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া, উহা অনায়াসে প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না। অতএব আমাদের সংস্কৃত-প্রসূত মাতৃভাষার পরিপুষ্টিসাধনের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা আবশ্যক। জননীস্তন্য লাভে বঞ্চিত হইয়া তনয়ার স্বাভাবিক সৌষ্ঠব লাভ অসম্ভব।

হিন্দুসমাজের ভগ্ন অঙ্গের সংযোজন সংস্কৃত চর্চ্চার ৬ষ্ঠ প্রয়োজন। সংস্কৃতশাস্ত্রের অনভিজ্ঞতা ও কতিপয় পাদারিগণের পরনিন্দা দক্ষতা নিবন্ধন, অনেক হিন্দুসন্তান প্রাচীন সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" ভাবে কালযাপন করিতেছেন। ইহাতে প্রাচীন হিন্দুসমাজ অত্যন্ত দুঃখিত। যাঁহারা চ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থাও শ্লাঘনীয় নহে। তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা ৺নানক ৺গুরুগোবিন্দ ৺মহাপ্রভু প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের ন্যায় আধ্যাত্মিক বলের কোন লক্ষণ লক্ষিত হয় না যে, তাহারা কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গঠন করিতে পারেন, তবে বৈশেষিক মতে 'অভাব'ই যেমন অন্ধকার পদার্থ, তদ্রূপ সমুদায় শৃঙ্খলার অভাবই যদি সমাজ গঠন হয় সে স্বতন্ত্র কথা।

বিশেষতঃ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু হইতে গদাধর ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গৌরবাবহ মহানুভব পূর্ব্বপুরুষগণের গুণকীর্ত্তন করিতে তাহারা অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন, করিলে "আপনারা যে ভ্রান্ত" উহা উপপন্ন হইয়া পড়ে। ইতিহাসলেখক কি করেন—উমিচাঁদকে "সাইলক্" না বলিলে, স্বীয় প্রিয় ব্যক্তির বঞ্চনাপরাধ যে বড় গুরুতর হয়। ফলতঃ অবস্থা বিপর্য্যয় নিবন্ধন মহামহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি অনাদর করিতে বাধ্য হওয়া—অল্প দুর্ভাগ্য নহে।

এই শ্রেণীস্থ একজন অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম। তাহাতে তিনি অনেক বিদেশীয় বিজাতীয় ব্যক্তির সহিত সাকুল্য স্বীকার পূর্ব্বক স্বগৌরব প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কুশাগ্রীয়মতি কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির নাম করিতে পারিলেন না। ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়। এই সকল পদস্থ ব্যক্তি সংস্কৃত চর্চ্চা নিবন্ধন অপেক্ষাকৃত সংযত হইলে, হিন্দুসমাজের শ্রেণী বিভারূপ অপূর্ব্ব কৌশলে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর

কৃপায়, হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া, এবং উহার সহিত প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন—ইহা কোনপ্রকারেই অসম্ভব নহে। স্বর্গীয় ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি সংস্কৃত-চর্চ্চা নিবন্ধনই অপেক্ষাকৃত সংযত হইয়া পৈতৃক মার্গে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বস্তুতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান বিবর্জ্জিত জ্ঞানাভিমানই হিন্দুসমাজের উপস্থিত উপদ্রবের কারণ। সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট অনুশীলন ব্যতিরেকে ইহা বিদূরিত হইতে পারে না।

গুরু এবং পুরোহিতদিগের উৎকর্ষসাধন সংস্কৃত চর্চ্চার সপ্তম প্রয়োজন। উহাদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হওয়ায় হিন্দুসমাজ বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। ইহা ধর্ম্মবিপ্লবেরও অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। এতদ্দেশীয় লোক যেমন নিরস্ত্র বলিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না, অনাহারে ও কদাহারে দুর্ব্বল বলিয়া প্লীহাবিদারণে ও নানারোগের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তদ্রূপ ঋষি প্রণীত উপদেশবর্ম্মে সংবৃতঙ্গ না হওয়ায় অনেকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়া হিন্দুসমাজকে শোকে আকুল ও দুর্ব্বল করিতেছে।

ঋগ্‌যজুঃ সাম- সংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতিঃ স্মৃতা। এতামুজ্ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

চিকিৎসার উৎকর্ষসাধন সংস্কৃত চর্চ্চার অষ্টম প্রয়োজন। অনুরূপসংস্কৃত শিক্ষা-বিরহে কবিরাজগণ ঋষিপ্রোক্ত বিবিধ চিকিৎসারহস্যে অনভিজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ সম্প্রদায় বিচ্ছেদ ঘটাইতেছেন। পক্ষান্তরে ঔষধ নির্ম্মাণে অসমর্থ ডাক্তারগণ ও বৈদেশিক ঔষধ উপস্থিত না থাকিলেই, যন্ত্র ও পট্টিকাবিহীন মদ্গুর* ন্যায় অচল হইয়া পড়িতেছেন।

ভাষার সারূপ্য-বিধান সংস্কৃত চর্চ্চার নবম প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে নানা শ্রেণীর মধ্যে একটু একটু সংস্কৃত চর্চ্চার আরম্ভ হওয়ায় আমাদের মাতৃভাষা প্রাদেশিক বৈরূপ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া এক-সর্ব্বজন সমাদৃত মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। সংস্কৃত চর্চ্চার যথাযথ অনুষ্ঠান হইলে, পরস্পর বিদূর-দেশবাসী আর্য্যসন্তানগণও, বৈদেশিক ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে, একে অন্যের কথা বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভায় নানা দেশীয় পণ্ডিত উপস্থিত হন। তাঁহারা ত ইংরেজীভাষার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করেন না। তাঁহারা স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় কথা বলিলেও সংস্কৃতমূলক ভাষায় বলেন বলিয়া অনায়াসে একে অন্যের কথা বুঝিতে পারেন। ভারতবর্ষীয় মহাসমিতির সভ্যগণ কিন্তু ইংরেজী ভিন্ন সভার কাজ করিতে অসমর্থ। লোকেও উহাকে বিজাতীয়—ভূষা-ভাষা বেশসম্পন্ন বাবুদিগের বিজাতীয় ব্যাপার মনে করিয়া উহার সহিত সম্যক্ সহানুভূতি

* বিশাল জলযানবিশেষ।

প্রদর্শন করে না। উর্দ্দূভাষা ভারতবর্ষে কিরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, সভ্য মহোদয়গণের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। মহাসমিতিতেও চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকল জাতির প্রতিনিধি প্রবিষ্ট না হইলে গবর্ণমেণ্ট উহার কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

এ দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন ও গৌরব সংরক্ষণ সংস্কৃতানুশীলন সাপেক্ষ মনে করিয়াই মহামতি ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ উহার জন্য প্রভূত অর্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদিগকেও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে উহার উন্নতি সাধনের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের বিদ্যালয় এমন হওয়া আবশ্যক —যাহাতে সংস্কৃত প্রথম ভাষা, ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষারূপে অধ্যাপিত হয়। অন্যান্য সমুদয় বিষয় ছাত্রেরা মাতৃভাষায় শিক্ষা করে। উন্নতি-স্বপ্নে মোদমান-চিত্ত ভ্রাতৃগণকে আমি সবিনয়ে অনুরোধ করি—তাহারা জাগরিত হইয়া দেখুন—দেশের কি অবস্থা। "দিগম্বরত্বেন নিবোদিতং বস্ত্র" দুর্ভিক্ষদ্বারা ধনের, রোগদ্বারা সদাচারের, ধর্ম্মাধিকরণের নিরতিশয় কার্য্য বৃদ্ধিদ্বারা চরিত্রের বিচিত্র উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইতেছে। সুতরাং আমরা যে পথে চলিতেছি উহা প্রকৃত পথ নহে। আমরা প্রার্থনা করিলে, দয়াময় রাজা প্রাগুক্তপথে শিক্ষা প্রদানে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীচন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার।

আচার্য্য বিরজানন্দ।

(৩)

শোরোয় অবস্থিতি।

শোরোর অপর একটি নাম শূকরভূমি। কেহ কেহ ইহাকে বারাহী ভূমিও বলিয়া থাকেন। কেন না ইহা বরাহবতারের লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হেতু শোরো একটি তীর্থ। কিন্তু কত কালের তীর্থ, তাহা বলা যায় না। তবে অনুগঙ্গি ভূমি বলিয়া, ইহা যে অতীব প্রাচীন কাল হইতেই পবিত্র এবং প্রসিদ্ধ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বামী বিরজানন্দ যখন শোরোতে আসিয়া উপনীত হইলেন, গঙ্গার ধারাপ্রবাহ যদিও তখন কিছু দূরে সরিয়া পড়িয়া ছিল, তথাপি উহা যে এক কালে শোরোর অব্যবহিত নিম্ন দিয়াই প্রবাহিত ছিল, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ বিরজানন্দকে, এই নিমিত্তই একটু দূরে যাইয়া গঙ্গার তট আশ্রয় করিতে হইল।

শোরোর গঙ্গাতট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তাদৃশ রমণীয় না হইলেও, উহা কিয়ৎ পরি-

স্থানে নির্জ্জন এবং পবিত্র। এই জন্যই বহু কাল হইতে বহু সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসিগণ শোরোর গড়িয়া ঘাটে আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকেন। বোধ হয় এই জন্যই, বিরজানন্দও গড়িয়া ঘাটে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। *

শোরোতেও বিরজানন্দ পঠন পাঠনা আরম্ভ করিলেন। তিনি বিচারচিন্তনাদির সাহায্যে নিজে যেমন নূতন বিষয় শিখিতে লাগিলেন, অঙ্গদ রাম ও বুদ্ধ সেন প্রভৃতিকেও তেমনই শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। সে সময়,—সে সময় কেন,সে সময়ের পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকরণ-শাস্ত্র বিরজানন্দের বিচারনীয় হইয়াছিল ; ব্যাকরণবিদ্যাই তাঁহার শিক্ষনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই হেতু কি পঠনায়,কি পাঠনায় তিনি কেবল ব্যাকরণের চর্চ্চাই করিতে লাগিলেন। এই স্থলে ইহা উল্লেখ করিয়া রাখা উচিত যে, ব্যাকরণ সম্পর্কে তখনও বিরজানন্দের কোন মতভেদ ঘটে নাই। কৌমুদ্যাদি নবীন ব্যাকরণের প্রতি তখনও তাঁহার কোনরূপ অরুচির উদয় হয় নাই। সুতরাং কোনও প্রকারে কিছু অশ্রদ্ধার পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি অঙ্গদরাম প্রভৃতিতে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই কৌমুদি প্রভৃতি পড়াইতে লাগিলেন। অঙ্গদরাম কেবল বিদ্যার্থীর ভাবেই বিরজানন্দের নিকট উপস্থিত থাকিতেন না; অধিকন্তু তাঁহার চক্ষুহীন অধ্যাপকটি যাহাতে কোনরূপ পীড়ায় পীড়িত না হয়েন, তন্নিমিত্ত

* বিরজানন্দের শোরোবাস সম্পর্কে কিছু ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত চৈনসুখ শর্ম্মা, কাশগঞ্জ যজ্ঞশালা হইতে লেখককে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ এইরূপ—"স্বামী বিরজানন্দ হরিদ্বার হইতে গঙ্গাতটে বিচরণ করিতে করিতে গড়িয়াঘাটে আসিয়া কিছু দিবস অবস্থিতি করেন। তথা হইতে শোরোতে আসিয়া পণ্ডিত অঙ্গদরাম এবং পণ্ডিত বুদ্ধ সেন প্রভৃতিকে কৌমুদী-চন্দ্রিকাদি ব্যাকরণ পড়ান। শোরো হইতে কাশগঞ্জে আসিয়াও কিছু দিন রহেন। অতঃপর কাশগঞ্জের সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী সাহাবর গ্রামে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া মথুরার অভিমুখে চলিয়া যান। এই সকল ঘটনা অবশ্য ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই শুনিয়াছি।" পণ্ডিতজীর এই লোক-শ্রুত কাহিনী কতদূর সত্য বলিতে পারিলাম না। সত্য হইলেও, পণ্ডিতজীর পত্রীয় বিবরণের সহিত দুইটি বিষয়ে আমাদিগের মতভেদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ বিরজানন্দ যে, হরিদ্বার হইতে শোরোয় আসিয়া অবস্থিত করিয়াছিলেন, এ কথা ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করি না। পক্ষান্তরে তিনি হরিদ্বার হইতে বাহির হইয়া কাশ্যাদি স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থানাদির পরেই শোরোতে আসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি শোরো প্রভৃতিতে বাসের পরেই মথুরার অভিমুখে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রথমবার শোরোবাসের পরে নহে, দ্বিতীয় বারের পরে।

তিনি সেবকের ভাবেও কখন কখন অবস্থিতি করিতেন। বলাবাহুল্য যে, এই অন্ধ অধ্যাপকটির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা লইয়া কাশীক্ষেত্রে যেরূপ একবার আন্দোলন উঠিয়াছিল, উপস্থিত সময়ে, শোরোক্ষেত্রেও সেইরূপ একটি আন্দোলনের তরঙ্গ দেখা দিল। অনেকই ইঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিতে লাগিল। ইঁহার অধ্যাপনা শুনিবার নিমিত্ত অনেকেই প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল; ফলতঃ বিরজানন্দের সমাগমে, শোরোর গড়িয়া ঘাট লোকস্মৃতির এবং লোকদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল।

এক দিবস স্নানান্তে গড়িয়া ঘাটের অনতি গভীর গঙ্গাগর্ভে দাঁড়াইয়া বিরজানন্দ কিছু স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন, এমত সময়ে আলোয়ারপতি বিনয়সিংহ তথায় উপস্থিত। বিরজানন্দের সুস্পষ্ট, সুললিত এবং অপূর্ব্ব উচ্চারণভঙ্গীযুক্ত স্তোত্রমালা শুনিতে শুনিতে, এবং তাঁহার তেজোদীপ্ত গম্ভীর মুখশ্রী অবলোকন করিতে করিতে, আলোয়ারপতি আপনাহইতেই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই হেতু বিরজানন্দ যতক্ষণ স্তোত্র আবৃত্তি করিলেন, আলোয়ারপতি ততক্ষণই তদ্গত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্তোত্রাবৃত্তি সমাপ্তির পর বিরজানন্দ যখন স্বীয় আশ্রমে যাইবার উদ্যোগ করিলেন, বিনয়সিংহ তখন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া যথোচিত অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন,—"মহারাজ! কৃপা করিয়া আলোয়ারে চলুন।" তদুত্তরে, পরিচয় জিজ্ঞাসার পর, বিরজানন্দ যখন জানিতে পারিলেন যে, অনুরোধকর্ত্তা স্বয়ং আলোয়ারপতি বিনয়সিংহ, তখন বলিলেন,—"তুমি রাজা, আর আমি ত্যাগী, তোমার সঙ্গে আমি কি নিমিত্ত যাইব?" এই কথা শুনিয়া বিনয়সিংহ চিত্তে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আলোয়ারে লইয়া যাইবার ইচ্ছা একবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। যেহেতু এই তপঃতেজঃসম্পন্ন অন্ধ সন্ন্যাসীটির প্রতি, তদীয় চিত্ত এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি বিরজানন্দের কুটীর-দ্বার পর্য্যন্তও গমন করিয়া পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন। বিরজানন্দ বলিলেন,—"তুমি যদি আমার নিকট অধ্যয়ন কর, তাহা হইলে আলোয়ারে যাইতে প্রস্তুত আছি।" বিনয়সিংহ প্রসন্নচিত্তে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করিয়া পড়িবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এমন কি, এই প্রতিশ্রুতি পালিত না হইলে, তিনি যে তদণ্ডেই আলোয়ার হইতে চলিয়া আসিতে পারিবেন, এ কথাটি পর্য্যন্তও আলোয়ারপতি কর্ত্তৃক স্বীকার করাইয়া লইলেন। বিনয়সিংহ এইরূপ প্রতিশ্রুতিসূত্রে সম্বদ্ধ হইলে, বিরজানন্দ শোরোত্যাগে সংকল্পারূঢ় হইলেন; এবং কএক দিনের মধ্যেই শোরোর পর্ণকুটীর হইতে আলোয়ারের প্রাসাদমালায় আসিয়া পদার্পণ করিলেন।

মহারাজ বিনয়সিংহের অধ্যাপকতা।

পাঠক! উল্লিখিত অন্ধ সন্ন্যাসীটির সহিত আলোয়ারের রাজপ্রাসাদে ঢুকিবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে একটি কথার একটু বিচার করিতে হইবে। সে বিচার্য্য কথাটি এই যে, বিনয়সিংহ কি উদ্দেশ্যে বিরজানন্দকে আলোয়ারে লইয়া আসিলেন? তিনি কি কেবল অধ্যয়নসংকল্পে পরিচালিত হইয়াই বিরজানন্দকে লইয়া আসিলেন?

যাঁহাদিগের ধারণা যে, বিনয়সিংহ কেবল

অধ্যয়নেচ্ছু হইয়াই বিরজানন্দকে আলোয়ারে আনিলেন, তাঁহারা সেই ধারণার কারণ দেখাইতে গিয়া বলিয়া থাকেন, বিনয়সিংহ একজন পণ্ডিতপ্রিয় লোক ছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকটে নানা শ্রেণীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হইত। কখন বা কোন ধূর্ত্ত পণ্ডিত আসিয়াও উপস্থিত হইতেন। ধূর্ত্ত পণ্ডিতগণ আলোয়ার পতির সমীপে নানাবিধ ধূর্ত্ততার জাল বিস্তার করিতেন। কেহ একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিতেন,—"মহারাজ এই দেখুন, এই কবিতায় কথিত হইয়াছে অমুক দিবসে আপনার প্রাণনাশ ঘটিবে।" কেহ একটা শ্লোক শুনাইয়া বুঝাইতেন, —'মহারাজ ! এই দেখুন, ইহাতে উক্ত হইয়াছে অমুক তিথিতে আপনার রাজ্যনাশ ঘটিবে।" এইরূপ নানা শ্লোক বা কবিতায় নানারূপ ভাষায় বিপদের ভয়াবহ চি চিত্রিত করিয়া, এবং সেই সঙ্গে বিপন্নাশক শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির নামও উল্লিখিত করিয়া, তাঁহারা বিনয়সিংহের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বিপুল অর্থ লইয়া যাইতেন। তাঁহাদিগের ধূর্ত্ততার রহস্য পরে যখন বুঝিতে পারিতেন, বিনয়সিংহ তখন বিরক্ত হইতেন কদাচিৎ ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া রহিতেন। এমন কি, কি উপায়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত শ্লোকাদির মর্ম্মগ্রাহী হইতে পারেন, তন্নিমিত্তও কখন কখন চিন্তান্বিত হইয়া উঠিতেন। ফলতঃ সংস্কৃতশিক্ষাবিধায়িনী এই চিন্তা ক্রমে সংকল্পের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই সংকল্প উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান হইয়া উঠিয়া বিনয়সিংহকে সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে কৃতসংকল্প করিয়া তুলিয়াছিল। চিত্তের এবংবিধ অবস্থায় বিনয়সিংহ যখন গঙ্গাস্নানার্থী হইয়া শোরোতে * আসিলেন, এবং শোরোর গঙ্গাতটেই বিরজানন্দের মত ব্যাকরণ-বীরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যখন চিত্তে প্রসন্ন হইলেন, তখন, তিনি যে কেবল অধ্যয়নেচ্ছায় পরিচালিত হইয়াই বিরজানন্দকে আলোয়ারে লইয়া আসিতেন, তদ্বিষয়ে আবার সন্দেহ কি ?

আলোয়ারপতির সংস্কৃত শিক্ষা সম্পর্কে যে কারণের কথা বলা হইল, তাহা কি

---

* মথুরা, বৃন্দাবন অঞ্চলের, বিশেষতঃ রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর ও যশলীর প্রভৃতি স্থানের হিন্দু অধিবাসীদিগের পক্ষে, শোরোর গঙ্গাপ্রবাহই অপরাপর স্থানের তুলনায় অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া, উল্লিখিত স্থানসমূহের কি সাধারণ, কি সম্ভ্রান্ত সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই গঙ্গাস্নানার্থী হইয়া শোরোতে আসিয়া থাকে। এই হেতু আলোয়ারপতির মত কোটা ও বুঁদি প্রভৃতির অধিপতিদিগকেও সময়ে সময়ে শোরোর গঙ্গাতটে দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গাসান্নিধ্য ভিন্নও, শূকরতীর্থ বলিয়াও যে, শোরো পবিত্র এবং প্রসিদ্ধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ফলতঃ শোরোর পবিত্রতা বা পাপহারিতার কথা বহুকাল হইতেই লোক-চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনাদি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া নীলাচলের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন তিনিও শোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া যান। যথা,—"শোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান। গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগে প্রয়াণ।" চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

বাস্তবিকই সত্য? বিনয়সিংহ কি তবে বস্তুতঃই একটা নির্ব্বোধ লোক ছিলেন? বিনয়সিংহ পণ্ডিতমণ্ডলীর পূজক ছিলেন বলিয়া, আমরা তাঁহাকে কোন অংশেই নির্ব্বোধ বা মূঢ় বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে প্রজাপালনে বা অপরাপর রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনে, তিনি যেরূপ দূরদর্শিতার অনুসরণ করিয়া চলিতেন, বিদ্বজ্জনের সহিত বাক্যালাপের সময়ে যেরূপ বাক্‌পটুতার আশ্রয় লইতেন, তাহাতে তিনি যে একজন সুবুদ্ধি বা সাতিশয় বিচারশীল পুরুষ ছিলেন, সে পক্ষে আলোয়ারের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেই একমত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক বিনয়সিংহমহারাজকে যদি একটা মূঢ় লোক বলিয়াই স্বীকার করি, তাহা হইলেই বা তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে উল্লিখিত হেতু প্রদর্শন, বা কেবল সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই বিরজানন্দকে আলোয়ারের আনয়ন, কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? কেন না, সংস্কৃত শিক্ষা যদি বিনয়সিংহের পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল, আর সে জন্য অগ্রে ব্যাকরণ পাঠই যদি সাতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইলে তদীয় সভাতে পণ্ডিত রূপনারায়ণের মত ব্যাকরণ-বিশারদ বিদ্যমান থাকিতে তিনি শোরো হইতে বিরজানন্দকে আনিতে যাইবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ শোরোর সেই গঙ্গাতটে বিরজানন্দকে আলোয়ারে আনিবার অনুরোধ কালে, বিনয়সিংহ অধ্যয়ন সম্পর্কে ত আপনা হইতে কোন কথাই বলিলেন না? অধিকন্তু বিরজানন্দ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, যখন তিনি পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতে গেলেন, তখনও ত তিনি সে সম্বন্ধে কোন ইচ্ছাই ব্যক্ত করিলেন না। পক্ষান্তরে উপর্য্যুপরি অনুরোধ দেখিয়া, বিরজানন্দ যখন আপনা হইতেই অধ্যয়নের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন, তখনই না বিনয়সিংহ তাহাতে সম্মত হইয়া প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করিয়া পড়িবেন বলিলেন। তবে এরূপ স্থলে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, বিনয়সিংহ কেবল অধ্যয়নেচ্ছায় পরিচালিত হইয়াই প্রজ্ঞাচক্ষুকে আলোয়ারে লইয়া আসিলেন?

বিরজানন্দকে আলোয়ারে লইয়া আসার মূলে, বিনয় সিংহের অধ্যয়নেচ্ছাই যে আদৌ ছিল না, এ কথা আমরা বলি না। তবে অধ্যয়নেচ্ছাই যে তাঁহার একমাত্র বা প্রধান ইচ্ছা নহে সে কথা অবশ্যই বলিব। পাঠক! ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বিনয়সিংহ অতীব পণ্ডিতপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু কেবল পণ্ডিতপ্রিয় বলিলেই বিনয়সিংহের কথা ঠিক বলা হয় না। তিনি যেমন পণ্ডিতপ্রিয়, তেমনই বিদ্যোৎসাহী। যেমন বিদ্যোৎসাহী, তেমনই আবার বিদ্বৎসেবীও ছিলেন। বলিতে কি এক্ষণকার কালে বিনয় সিংহের মত বিদ্যোৎসাহী ভূপতি ভারতীয় রাজন্য সমাজে বস্তুতই দুর্লভ। বিদ্বজ্জনের সেবা এবং সমাদরে তিনি যেমন সর্ব্বদাই উদ্যত থাকিতেন, বিদ্যোন্নতিকর অনুষ্ঠানেও তেমনই মুক্তহস্ত হইয়া রহিতেন। হিন্দু হউন, আর মুসলমান হউন, বিদ্বান্ হইলেই তিনি যেমন বিনয়সিংহের সেবার পাত্র হইতেন; সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হউক, আর লক্ষ মুদ্রাই ব্যয়িত হউক, বিদ্যোন্নতিকর ব্যাপারেও তেমনই তিনি উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। আলোয়ারের তদানীন্তন রাজসভা বিনয় সিংহের বিদ্বৎসেবিতার যেমন একটি উজ্জ্বল সাক্ষী, আলোয়ারের অপূর্ব্ব

পুস্তকশালাও তেমনই তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার একটি অবিনশ্বর কীর্ত্তি। * যে রাজসভায়, পণ্ডিত শালগ্রাম ও শিবপ্রসাদ এবং পণ্ডিত রূপনারায়ণ ও লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর মত উজ্জ্বল তারকমালা বিরাজ করিতেছেন, সে রাজসভা যে রাজকীয় বিদ্যোৎসাহিতারই সম্যক পরিচায়ক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ভারতক্ষেত্রে বারাণসীই চিরদিন বিদ্বদ্বতী বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বিনয়সিংহের অসাধারণ বিদ্বৎসেবিতার প্রভাবে আলোয়ার রাজধানীও যে কিছু দিনের জন্য বিদ্বদ্বতী আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল, বোধ হয়, পাঠক বিশেষরূপ অবগত নহেন। ফলতঃ বিনয়সিংহের অভ্যুদয় বা অধিকারে আলোয়ারের প্রাসাদভূমি যে বিদ্বজ্জনের লীলাভূমি বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল, তাহাই কতকটা বুঝা গেল।

এবংবিধ বিনয়সিংহ যখন শোরোর পড়িয়া মাটে উপস্থিত হইয়া একটি সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব বিদ্যাবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে লাগিলেন, যখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃতই একটি অলোকসাধারণ পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন সেই সন্ন্যাসীটিকে আলোয়ারে লইয়া আসিতে উদ্যত হওয়া যে তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক হইবে, তদ্বিষয়ে কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে কি? বিশেষতঃ তিনি যখন বিরজানন্দের সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন, যখন তদ্গতচিত্ত হইয়া বিরজানন্দের কিছু স্তোত্র শুনিলেন, এবং বিরজানন্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরিশেষে যখন বুঝিতে পারিলেন যে সেই অন্ধ মূর্ত্তিটি,—একদিকে ত্যাগ ও তেজস্বিতার এবং অপর দিকে প্রতিভা ও পবিত্রতারই একটি সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, তখন তাঁহাকে আলোয়ারে যাইবার জন্য অনুরোধ করাও যে তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাংশেই সঙ্গত হইবে, তদ্বিষয়েও কোন সংশয় হইতে পারে কি? অধিক কি বিরজানন্দকে আলোয়ারে লইয়া যাইলে আলোয়ারের সভামণ্ডল আরও প্রোজ্জ্বল হইবে, বিরজানন্দ আলোয়ারে থাকিলে আলোয়ারের সারস্বত সম্পদমালা সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে; এক কথায় বিরজানন্দের মত একটি ত্যাগী, একটি তেজস্বী, এবং একটি বিদ্যাবীরকে আলোয়ারে রাখিয়া সেবা সৎকার করিতে পারিলে, তদীয় হৃদয়ের বিদ্বৎসেবিনী বৃত্তিও সম্যক চরি-

* নানাবিধ প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় সংস্কৃত পুস্তকের, বিশেষতঃ বিবিধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সমাবেশ জন্য নেপাল-রাজের পুস্তকশালা, জয়পুর রাজের পুস্তকশালা বা আর্য্যমঠের পুস্তকশালা যেমন প্রসিদ্ধ, মহারাজ বিনয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত আলোয়ারের এই পুস্তশালাও তেমনই প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকশালার পুষ্টিকল্পে, বিনয়সিংহ কি যত্ন কি অর্থ ব্যয় কিছুতেই কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থ ভিন্ন আরবী পার্শি প্রভৃতি ভাষারও মহার্হ গ্রন্থমালা ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। একখানা কোরাণশরিফ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে এবং সুবিখ্যাত কবি সেখ সাদির একখানা গোলেস্তা পৌনে দুই লক্ষ টাকা মূল্যেও ক্রয় করিয়া বিনয়সিংহ এই গ্রন্থশালার গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বম্বের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীমান্ পিটার্সন বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তকশালার যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই পুস্তকশালা সম্পর্কে আরও অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

তার্থতা লাভ করিবে, এই ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়াই যে তিনি বিরজানন্দকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন অথবা এই আশায় উত্তেজিত হইয়াই যে তাঁহাকে আলোয়ারে লইয়া আসিলেন, তৎসম্বন্ধেও কোন সন্দেহ হইবে কি? উপস্থিত ব্যাপারে,—অর্থাৎ বিরজানন্দকে আলোয়ারে লইয়া আসার পশ্চাতে, বিনয়সিংহের উল্লিখিত ইচ্ছাই যে প্রবলা হইয়া উঠিয়াছিল,—বিনয় সিংহের চিত্তে পঠনেচ্ছা বা পঠনাশার ভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহাকে যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্বৎসেবিতার আবেগেই প্রধানতঃ পরিচালিত হইতে হইয়াছিল, ইহা আমাদিগের স্থির বিশ্বাস।

যাহা হউক,—যে ইচ্ছাই প্রবলা থাকুক, যখন পঠনেচ্ছা প্রকাশিত করিয়াই বিরজানন্দকে লইয়া আসিলেন, তখন আলোয়ারে পৌঁছিয়া বিনয়সিংহ তৎসম্পর্কে উদ্যোগী হইবেন বই কি? এই হেতু বিরজানন্দের অবস্থিতির পক্ষে প্রথমেই ব্যবস্থা হইতে লাগিল। স্বল্পকালের পরিচয়েই আলোয়ারপতি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিরজানন্দ সাতিশয় তেজস্বী, এবং তন্নিমিত্ত কতকটা ক্রোধী প্রকৃতির লোক। এই হেতু তাঁহার আলোয়ারবাস, যাহাতে কোন অংশেই অসুবিধাকর না হয়, তৎপক্ষে বন্দোবস্ত করিতে তিনি কিছু মাত্রও ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকট কাটলায় একটি গৃহ নির্দিষ্ট হইল। তাঁহার আহারার্থ সমস্ত সামগ্রীই রাজভাণ্ডার হইতে আসিতে লাগিল, এতদ্ভিন্ন তাঁহার হস্তে প্রতিদিন একটাকা করিয়া পাঠাইবার জন্য কোষাধ্যক্ষের প্রতিও আদেশ প্রদত্ত হইল। ব্রাহ্মণ মিত্রসেন স্বামিজীর পাকাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিদ্যার্থীর ভাবে থাকিলেও, পণ্ডিত প্রেমসুক তাঁহার অভাব বা কোনরূপ অভিযোগ সম্পর্কে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, আর শোরোবাসী হইলেও, পণ্ডিত অঙ্গদরাম মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন। সুতরাং কি আহার, কি অবস্থিতি, কোন বিষয়েই বিরজানন্দের কোনই অভাব রহিল না। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্বচ্ছন্দ হইয়া তিনি যেমন স্বীয় পঠন-পাঠনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তেমনই যথাসময়ে রাজপ্রাসাদে যাইয়া রাজাকেও পড়াইয়া আসিতে লাগিলেন। বিনয়সিংহ ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। লঘুকৌমুদী হইতেই তাঁহার ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ হইল। কিন্তু কিছু দিন লঘুকৌমুদী পাঠের পর বিরজানন্দ, বিনয়সিংহের জন্য শব্দবোধ নামক একখানি ব্যাকরণ সঙ্কলিত করিলেন, এবং শব্দবোধই মহারাজ বিনয়সিংহকে পড়াইতে লাগিলেন। শ্রীদেঃ—

অন্তিম দর্শন
অথবা
অনন্ত যাত্রার বিদায় গ্রহণ।

দুটি বালকে বড় সৌহার্দ্দ। সৌহার্দ্দ জীবনের সকল অবস্থায়ই সুখকর। কিন্তু বালকের সৌহার্দ্দ, যেমন সুখকর, তেমনই মধুর। বালকদিগের মধ্যে যখন প্রকৃত সৌহার্দ্দ ঘটে, তখন বোধ হয় যে, তাহাদিগের প্রাণে প্রাণে যেন কেমন একটি অপূর্ব্ব একতা জন্মে;—যেন একটি প্রাণ, আর একটি প্রাণের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া, একীভূত হইয়া রহে। যে দুটি বালকের কথা কহিতেছি, তাহাদিগের মধ্যে ঠিক্ এমনই এক-প্রাণতার আনন্দময় সৌহার্দ্দ ঘটিয়াছিল।

বালকদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম (Edwin) এডুয়িন, আর একটির নাম (D. D. Home) হোম।* এডুয়িনের বয়স পনর, হোমের বয়স তের। উভয়েই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তীব্রমেধাবী, এবং বয়সের হিসাবে একটু বেশী চিন্তাশীল। দুইজনে একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন, এবং কখনও কখনও নিজ নিজ নিত্যপাঠ্য ধর্ম্মগ্রন্থ—বাইবেল-নামক ধর্ম্মপুস্তক, সঙ্গে লইয়া, বন-ভূমিতে বৃক্ষের তলে, একত্র বসিয়া, তাহা পাঠ করিতেন।

ঘটনার স্থল আমেরিকার অন্তর্গত কনেক্টিকট নামক প্রাদেশিক রাজ্যের রাজধানী—নরউয়িচ্ নগর। এডুয়িনের জন্মভূমি ঐ নরউয়িচ্ নগর। হোম, স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও, সে সময়ে নরউয়িচনগরে অবস্থিত। এই হোমই, অধ্যাত্ম মাধ্যমিকতার অসাধারণ শক্তিতে, কালে ডি ডি হোম নামে, সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

দুই সুহৃৎ বৃক্ষতলে বসিয়া বাইবেল পড়িতেছেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে পরলোক-সম্পর্কে আলাপ করিতেছেন। এডুয়িন বলিলেন যে, তিনি একখানি অভিনব গ্রন্থে পরলোকবাসী আত্মীয় জনের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন বিষয়ে একটি আশ্চর্য্যকাহিনী পাঠ করিয়াছেন। ঐরূপ কাহিনীতে বিশ্বাস করিলে, ইহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হয় যে, মনুষ্য যে মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে দেহত্যাগ করে, সেই মুহূর্ত্তেই, লোকান্তরে, সূক্ষ্মতর দেহে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়; এবং সে ইচ্ছা করিলে, সেই সূক্ষ্মদেহে, পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া, সুহৃজ্জনকে দেখা দিতে পারে।

হোম বলিলেন, "ভাই, সত্য মিথ্যা জানি না। কিন্তু, আমিও এইরূপ দর্শনদানের অনেক কাহিনী শুনিয়াছি। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত প্রেম। তাঁহার এই অনন্ত-লীলাময় বিশ্বরাজ্যে কি না হইতে পারে?

এই একই কথা লইয়া দুইজন বহুক্ষণ আলাপ করিলেন; তার পর, উভয়েই, যেন হৃদয়ের একই ভাবে উত্তেজিত হইয়া, ঐ বয়সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন,—"ভাই, আমি যদি আগে যাই, আর যদি, ইহা অসম্ভব ও ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধ না হয়,

* "Incidents in my Life," by D. D. Home.

তাহারা হইলে, যে দিন প্রস্থান করিব, সেই দিন হইতে পরিগণিত তৃতীয় দিবসে, পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া, তোমায় দর্শন দান করিব। সেই দর্শনদানেই একের নিকট অন্যের বিদায়গ্রহণ হইবে।"

এইরূপ গভীর প্রতিজ্ঞার পর, দুইজনে আবার বাইবেলের আর এক অধ্যায় পাঠ করিলেন; এবং পরিশেষে, যুক্তকরে, সম্মিলিত স্বরে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা যেন কালে সিদ্ধ হয়।

প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনায় যখন উভয়ের হৃদয় পরস্পর অধিকতর জড়িত হইল, তখন তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাদৃশ অল্পবয়স্ক বালকেরাও এমন উচ্চ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে পারে কি? পারে কি, না পারে, এ প্রশ্নের উত্তর অসংখ্য অসামান্য মনঃশক্তিসম্পন্ন বালকের প্রামাণিক জীবনবৃত্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। থিয়োডোর পার্কার ও মন ষ্টুয়ার্ট মিল পাঁচ বৎসর বয়সেই চারি পাঁচটি ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের বাল্যকালীন বিদ্যাবত্তা অশীতিসম্মিহিত বৃদ্ধেরও অনধিগম্য।

প্রতিশ্রুতি বিনিময়ের একমাস পরে হোম তাঁহার অভিভাবিকার সহিত নিয়ুইয়র্কের অন্তর্গত ট্রয়নগরে যাইয়া অবস্থিত হইলেন; এডুয়িন নরউইচ নগরেই রহিলেন। নরউইচ্‌ হইতে ট্রয় তিনশত মাইলের পথ। কিন্তু এই দূরতা সত্ত্বেও দুইটি বালক-সুহৃদের হৃদয় পরস্পরের সন্নিহিত রহিল।

ট্রয়নগরে পঁহুছিবার অল্প কিছুদিন পরে, হোম একদিন সন্ধ্যাকালে, নিকটস্থ প্রতিবেশিদিগের বাড়ীতে খানিককাল অতিবাহিত করিয়া, রাত্রি ৯টা কিংবা ১০টার সময় নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীর সকলেই তখন নিদ্রাগত; হোম, কাহাকেও না ডাকিয়া এবং কাহারও শান্তির ব্যাঘাত না জন্মাইয়া, নিঃশব্দপদসঞ্চারে, আপনার শয়নের ঘরে প্রবেশ করিলেন; এবং সেখানে শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, নিত্যনিয়মিত নৈশ প্রার্থনা পাঠ করিলেন। শয়নের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা অনেকেরই অভ্যাস। হোম বাল্যকাল হইতেই তাদৃশ প্রার্থনার মঙ্গল্য ফল বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

তখন জুন মাস। গ্রীষ্মকাল। ঘরের দুই একটি বাতায়ন উন্মুক্ত। আকাশ নিদাঘ-চন্দ্রমার নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় ঢল-ঢল। আকাশের সে জ্যোৎস্নারাশি, মুক্ত বাতায়নপথে, হোমের শয়ন-গৃহে প্রবাহের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়াছে; এবং গৃহের প্রাচীর, জ্যোৎস্নায় ধবলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। হোম সে প্রাচীর-প্রতিবিম্বিত জ্যোৎস্নারাশি দেখিতেছেন, আর কি যেন ভাবিতেছেন। এমন সময়ে, তিনি সহসা দেখিতে পাইলেন যে, একখানি নিবিড়-কালো মেঘের ছায়া সে জ্যোৎস্নাকে যেন ঢাকিয়া ফেলিল। হোম বড়ই বিস্মিত হইয়া সে কালো ছায়াখানি দেখিতে লাগিলেন, এবং ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ কোথা হইতে ঐ ছায়া পতিত হইল, তাহারই কারণ চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন।

হোম মুহূর্ত্ত পরেই দেখিতে পাইলেন যে, সে কালো ছায়া ভেদ করিয়া উহার অভ্যন্তর হইতে একখানি উজ্জ্বল ও অতি বড় মধুর আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে; এবং সে

আলোকের মধ্যে আলোকময়-মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রিয়বন্ধু এডুয়িনের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার দিকে স্থির নেত্রে তাঁকাইয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তির মুখচ্ছবিতে এমনই অনির্ব্বচনীয় মাধুরী ও মধুমাখা হাসি প্রস্ফুট রহিয়াছে যে, তিনি যত দেখিতেছেন ততই তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা বাড়িতেছে, কিছুতেই চিত্তে ভয় হইতেছে না।

হোম যে এডুয়িনের সহিত নরউইচ নগরে বনভূমিস্থ বৃক্ষের তলে বসিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এ কি নিশ্চয়ই সেই এডুয়িন? এ বিষয়ে হোমের মনে অণুমাত্রও সংশয় হইতেছে না। সেই আকৃতি, সেই মুখচ্ছবি, সকলই সেই। কেবল এই মাত্র প্রভেদ, সেই মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য ছিল, জ্যোতিঃ ছিল না। তিনি এইক্ষণ যে মূর্ত্তি দেখিতেছেন, উহা যেমনই সুন্দর, তেমনই জ্যোতির্ম্ময়। মূর্ত্তি তাঁহার দিকে চাহিয়া, নয়ন বাঁকাইয়া, মৃদু মৃদু হাসিতেছে, আর কি যেন কহিতে চাহিতেছে। কিন্তু মুখে কথা ফুটিতেছে না।

মূর্ত্তিচর এডুয়িন, এই ভাবে, কিছুক্ষণ প্রিয় সুহৃদ্ হোমকে নীরব সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া, দক্ষিণ হস্তখানি ঊর্দ্ধে তুলিলেন; এবং সে দক্ষিণ হস্তে ক্রমে তিন বার তিনটি চক্রের মত আঁকিয়া, ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতে লাগিলেন। প্রথমে তিরোহিত হইল সেই দক্ষিণ হস্ত, তার পর তিরোহিত হইল বাম হস্ত, পরিশেষে সমস্ত শরীর। যখন সকলই ফুরাইল, তখন সে মেঘের ছায়া এবং ছায়ার মধ্যবর্ত্তি আলোক-স্তম্ভ উভয়ই এক সঙ্গে অন্তর্হিত হইল; গৃহ পূর্ব্বের মত চন্দ্রের চিরপরিচিত সুচারু সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ আলোকিতবৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হোমের শরীর কিঞ্চিৎকাল নিস্পন্দবৎ ছিল। তিনি যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন সম্মুখস্থিত ক্ষুদ্র ঘণ্টা লইয়া তাহা জোরে বাজাইলেন। বাড়ীর সকলে সেই ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া তাঁহার ঘরে আসিলেন। হোম তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কহিলেন "আমি এই মাত্র এডুয়িনকে দেখিয়াছি। আজি তিন দিন হইল এডুয়িনের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে।"

বাড়ীর কেহ হাসিলেন, কেহ পরিহাস করিলেন, কেহ বালক হোমকে ধমকাইয়া শাসন করিলেন। কিন্তু দুই তিন দিন পরেই ডাক-যোগে সংবাদ আসিল যে, হোমের বন্ধু এডুয়িন, উৎকট আমাশয় রোগে, অত্যল্প কাল কষ্ট পাইয়া, লোকান্তরিত হইয়াছেন। হোম সময় মিলাইয়া দেখিলেন যে, তিনি যে সময়ে এডুয়িনের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, ঠিক্ তেমনই সময়েই, উল্লিখিতরূপ দর্শনের তিন দিন পূর্ব্বে, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

এইরূপ প্রামাণিক কাহিনীর প্রকৃত অর্থ যখন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তখন কি মনুষ্য মুহূর্ত্তকালও আর শোকমোহে অভিভূত রহিতে পারে? শোক করিবে কাহার জন্য? যাহাকে এইক্ষণ দ্রষ্টব্যে হারাইয়াছ. সে তোমার দৃষ্টিপথের অতীত দিব্যধামে, সুক্ষ্মতর দেহে বিরাজমান হইয়া, শত সুখে সংবর্দ্ধিত হইতেছে; এবং সম্ভবতঃ তোমাকেও সময়ে সময়ে দেখিয়া যাইতেছে। তুমিও যাহাতে অন্তিমে তাদৃশ সদ্গতি লাভ করিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে পার, সেই কার্য্যই তোমার ক্ষণস্থায়ি পার্থিব জীবনের প্রধান কার্য্য।

ডাঃ গ্রিয়ারসন্ ও বঙ্গভাষা।

সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাঃ গ্রিয়ারসন্ (Dr. Grierson, C. S, C. I. E.) কএক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ভাষাসমূহের একটি বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংপ্রতি তিনি তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্যনির্ণয় সমাধা করিয়া Linguistic survey of India নামক বিপুল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ ও মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

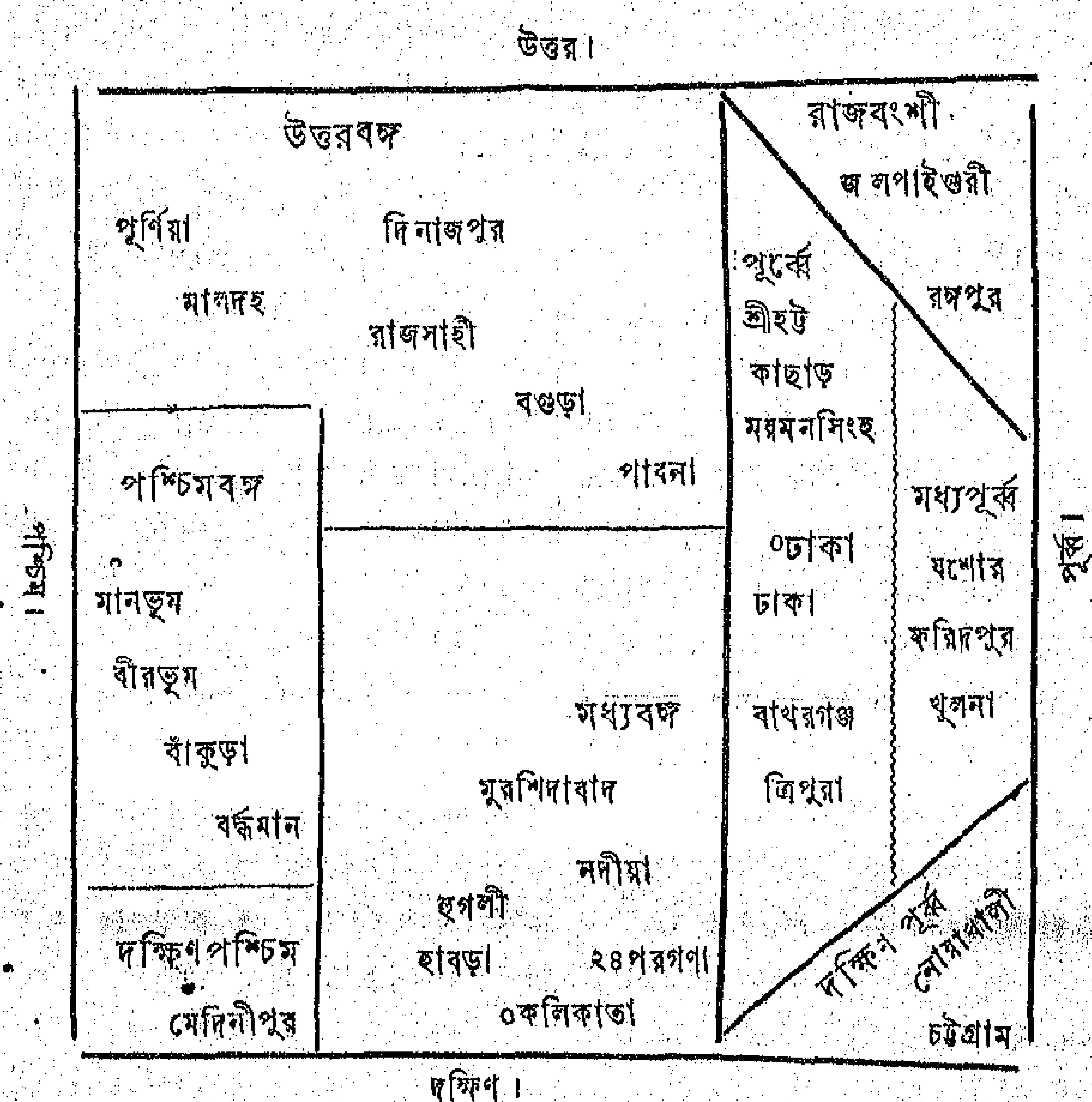
বঙ্গভাষাকে চলিত কথায় "বাঙ্গালা" বলে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে "বঙ্গ" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সে বঙ্গ অর্থে কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ দেশ। তবে "বাঙ্গালা" শব্দের ল-কার কোথা হইতে আসিল? ইংরেজীতেই বা কি প্রকারে বঙ্গশব্দ Bengali তে পরিণত হইল? ডাঃ গ্রিয়ারসন্ সাহেব বলেন, ইংরেজেরা প্রথমে দক্ষিণ ভারতে (Bengal) ও (Bengali) শব্দ শিক্ষা করেন, সেখান হইতেই নাকি বঙ্গবাসীগণকে Bengali বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছেন। টান্জোর জেলায় একটি প্রাচীন মন্দিরে একখণ্ড শিলালিপিতে Vangalam শব্দ পাওয়া যায়। সেই শিলালিপি এখন দশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। সেই Vangalam শব্দ আরবীয় ভূগোল প্রণেতৃগণ ভাঙ্গিয়া Bangala তে পরিণত করেন। আরব্য হইতে সেই 'বাঙ্গালা' শব্দ আবার পারস্য ভাষায় আসিয়া পড়ে। আবুল-ফাজেল তাঁহার গ্রন্থে এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। পারস্য হইতে উহা হিন্দিতে ব্যবহৃত হয় এবং হিন্দি হইতে আবার ইংরেজগণ Bonagl ও Bengali শব্দ গঠন করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালীরাও নাকি সেই ইংরেজী হইতে আমাদিগকে বাঙ্গালী বলিতে শিখিয়াছি। অতএব আমরা বাঙ্গালীরা আমাদিগের জাতীয় নামের জন্য হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী ভাষার নিকট ঋণী। গ্রিয়ারসন্ সাহেবের এই গবেষণায় একটা খট্কা বাধিল। একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গবাসিগণ বাঙ্গালী নামে পরিচিত না হইলে, টান্জোরের সেই শিলালিপিতে (Vangalam) শব্দ কি প্রকারে আসিল? আর আবুল ফাজেলই বা তাঁহার "বাঙ্গালা" শব্দ খাস বঙ্গদেশে বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতে

গ্রহণ না করিয়া, আরব্য পারস্য ভৌগলিকদিগের নিকট যাইবেন কেন? প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যে বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা হিন্দুস্থানী হইতে ধার করা, এ অনুমানই বা কেন করিতে যাই?

ইয়োরোপের প্রাচীন সাহিত্যেও "Bongali" শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু সেখানে ইহার অর্থ বঙ্গভাষা নহে, বঙ্গবাসী। ডাঃ গ্রিয়ারসন্ বলেন ১৫৫২—১৫৬৩খৃষ্টাব্দে (Lisbon) লিশ্‌বন হইতে প্রকাশিত Docados of Jonode Barros গ্রন্থে এই অর্থে Bongala শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ১৭১৪ খৃঃ David Wilkin নামক এক ব্যক্তি John Chamberlayne নামক আর এক ব্যক্তির সাহায্যে যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনা (Lond's Prayer) তথাকথিত Bengalica ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু এই Wilkins যিনিই হউন, তিনি যে একটি গণ্ডমূর্খ ছিলেন তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তিনি একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার বিদ্যার দৌড় বেশ বুঝা যায়। তিনি বলেন "বঙ্গভাষা ক্রমে লোপ পাইতেছে এবং মালয় ভাষা তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, এজন্য আমি এই অনুবাদ মালয় ভাষায় করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে তাহা প্রকাশ করিলাম।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই মহাপণ্ডিতটি বঙ্গদেশের চতুঃসীমার মধ্যেও আদৌ আসেন নাই, মালয়দেশে থাকিয়াই ইনি বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেখানে বঙ্গভাষার প্রচলন না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বঙ্গভাষা লোপ পাইতেছে। তাঁহার এত কষ্ট স্বীকার করিয়া মালয়দেশে আসিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল। ইংলণ্ডে বসিয়াও ত এই সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন।

বাঙ্গলা ভাষায় কত লোকে কথা বলে? গ্রিয়ারসন্ সাহেব বলেন, গত লোক-গণনা অনুসারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৪,২০,৩২,৩২৯ জন লোকে বাঙ্গালায় কথা কহে। ইহার মধ্যে ৪১৬৯৬৩৪৩ জন খাস বঙ্গদেশে বাস করে, ৬০৬৩৮ জন বঙ্গ বিভাগের অন্য প্রদেশে অর্থাৎ বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বাস করে। আর ২৭৫৩৪৮ জন ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে, এবং ব্রহ্মদেশে বাস করে। ইহার মধ্যে আসামে, ব্রহ্মদেশে, উত্তর পশ্চিমে এবং মধ্য ভারতেই বেশী, অন্যান্য প্রদেশে খুব কম। ব্রহ্মদেশে ৬৫০২৯ বাঙ্গালী গিয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে যে আর চাকুরি মিলে না।

গ্রিয়ারসন্ সাহেব প্রচলিত বঙ্গভাষাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, —পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ ভাষার কেন্দ্র স্থান হুগলী, পূর্ব্ববঙ্গ ভাষার কেন্দ্র স্থান ঢাকা। কিন্তু প্রত্যেক ২০ মাইলেই কথিত ভাষায় পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই জন্য এই দুইটি স্থূল বিচারের মধ্যে আবার কতকগুলি প্রাদেশিক বিভাগ আছে। তাহা নিম্নলিখিত চিত্র দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেখান যাইতেছে।



১। মধ্যপ্রদেশীয় ভাষা বা সাধুভাষা।

ইহা হুগলী, হাবড়া, কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুরশিদাবাদ জেলায় প্রচলিত। ইহার লোক সংখ্যা—৮৪৪৩৯৯৬।

২। পশ্চিম প্রদেশীয় ভাষা।

ইহা বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মানভূমে প্রচলিত; লোকসংখ্যা—৩৯৫২৫৩৪।

৩। দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশীয় ভাষা।

ইহা মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত। লোকসংখ্যা—৩৪৬১০২।

৪। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা।

ইহা পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ, পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরে প্রচলিত। জনসংখ্যা—৬১০৮৫৫৩।

৫। রাজবংশীভাষা।

ইহা রঙ্গপুরে ও জলপাইগুরীতে প্রচলিত। জনসংখ্যা—৩৫০৯১৭১।

৬। পূর্ব্বপ্রদেশীয় ভাষা।

(ক) শাখা—পূর্ব্বমধ্যপ্রদেশীয় ভাষা—ইহা যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরে প্রচলিত।

(খ) শাখা—খাস পূর্ব্বপ্রদেশীয় ভাষা ইহা ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিং শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা জেলায় প্রচলিত। মোট জনসংখ্যা—৯৬৮৯৩৯৯।

৭। দক্ষিণ পূর্ব্বদেশীয় ভাষা।

ইহা নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রচলিত। জনসংখ্যা ২৩১০৭৮৪।

জনসংখ্যা হিসাবে ধরিলে, পূর্ব্বদেশীয় ভাষাই বঙ্গদেশের প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহার জনসংখ্যা ৯৬ লক্ষ, তাহার পরেই মধ্যপ্রদেশীয় বা সাধুভাষা—তাহার জনসংখ্যা ৮৪ লক্ষ; তাহার পরে উত্তর দেশীয় ভাষা, জনসংখ্যা ৬১ লক্ষ; পশ্চিম প্রদেশীয় ভাষার জনসংখ্যা ৩৯ লক্ষ। তাহার পর অন্যান্য প্রদেশীয় ভাষা।

এই সকল প্রদেশীয় ভাষার পার্থক্য দেখাইবার জন্য গ্রিয়ারসন্ সাহেব কতকগুলি নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে কএকটি নমুনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

১। মধ্যদেশীয় বা সাধু ভাষা।

(কলিকাতায় প্রচলিত)

"কোন ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠটি তাহার পিতাকে কহিল। পিতঃ বিষয়ের যে অংশ আমার প্রাপ্য তাহা আমাকে দিন। তিনিও তাহাদের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন।"

কলিকাতাবাসী স্ত্রীলোকের ভাষা।

"এক জনের দুইছেলে ছিল। তাহাদের যে ছোট, সে তার বাপকে বল্লে, বাবা। আমার ভাগে যা পড়ে তা আমাকে দাও। বাপ তার বিষয় আশয় তাদের মধ্যে বেঁটে দিলে।"

২। পশ্চিম প্রদেশীয় ভাষা।

(মানভূমের ভাষা)

"একলোকের দুটা বেটা ছিল; তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপকে বল্লেক্ বাপহে, আমাদের দৌলতের যা হিস্সা আমি পাব, তা আমাকে দাও। এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা ক'রে তার হিস্যা তাকে দিলেক।"

৩। দক্ষিণ পশ্চিমদেশীয় ভাষা।

(মেদিনীপুর)

"এক লোককরে দুটা পো হইল। তাঙ্কোকার মাঝু কোচ্যা পো নিজের বাপুকে বল্ল বাফু হে। বিষৈ আশৈর যে বাঁটী মুই পাব সেটা মোকে দ্যা। সে তায়াকার মাঝু বিষৈ বাঁটী ক্যোর্‌যা দিল"

৪। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা।

দিনাজপুর।

"একজন মানুষের দুই ছাওয়াল ছিল্। তারদের মধ্যে ছোট ছাওয়াল আপন বাপুকে কহিল্ বাপ্। সম্পত্তের যে ভাগ হামি পামু, তা হামাক দেন। তাহাতে সে তারদের মধ্যে বিষয় ভাগ করে দিলেন।"

মালদহ।

"য়্যাক যোন্ মানুষের দুটা বেটা আছ্লো। তার ঘোরবিচে ছোট্‌কা আপনার বাপ্‌কে কহ্‌লে বাপধন্ করির যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক্ দে। তাৎ

তাই তার ঘোরকে মাল; মাত্তা মব বাঁট্যা দেলে।"

৫। রাজবংশী ভাষা (জলপাইগুরী)

একঝন্‌কার দুই ঝন্ বেঠা আছিল্। অমহার মধ্যৎ ছোট বেটা বাপক্ কি কেলে বা হামার সম্পত্তির মুই যে ভাগ পাম্ তা তুই মোক্ দে। তাতে উঁয়ায় অমহার মধ্যৎ সম্পত্তি বাঁট করে দিলেক।"

৬। পূর্ব্ব প্রদেশীয় ভাষা।

ঢাকা।

"য়্যাক জনের দুইগা ছাওয়াল আছিল্। তাগো মৈদ্দে ছোডগা তার বাপরে কৈলো বাবা! আমার বাগে যে বিত্তি ব্যাসাদ্ পরে তা আমারে দ্যাও। তাতে তিনি তান্ বিত্তি ব্যাসাদ তাগো মৈদ্দে বাইট্যা দিল্যান্।"

ময়মনসিং।

"একজনের দুই পুৎ আছিল্। তার ছুডু পুতে বাপেরে কইলো বাজি! মাল ব্যাসাতের যে বখরা আমি পাইবাম্ তা আমারে দেউখাইন্। হে তারারে মাল-পাতি বাট কৈরা দিল্।"

ত্রিপুরা।

ঐক বেডার দুই পুৎ আচিল্। তারার মাইজে পুরুলা তার বাপরে কইল্ বাবু ও মালামাল্ যে তান্ আমি পারাম্ হেতান্ আমারে দেও। তাতে তে তারার মাইজে যত্‌তাম্ আছিল হগ্‌গল তান্ বাইট্টা দিল্।"

বাখরগঞ্জ।

"একজন মান্‌ষের দুগ্‌গা পোলা আ-ছিল। তারগো মদ্যে ছোটুগ্‌গা হের বাপ্‌রে কইল বাবা বিত্তের যে বাগ মুই পামু তা মোরে দেও। হেতে হে হেরগো মদ্যে বিত্ত বাগ করিয়া দিল।"

৬। (ক) দক্ষিণ পূর্ব্ব দেশীয় ভাষা।

ফরিদপুর।

"এক জোনের দুডি ছওয়াল ছেলো। তাগো মদ্দি ছোটো জোন বাপরে কইল বাবা! বিষয় আশয়ের যে ভাগ আমি পাবো তা আমারে দাও। তিনিও উহাগো মদ্দি তাঁহার সম্পত্তি বণ্টন কর্যা দেলেন।"

যশোর।

"এক জোনের দুট ছল ছিল। তারগে মোদ্দি ছোট জোন বাপেরে বলে বাবা! জমাজুমির যে ভাগ আমি পাবো তা আমারে দ্যাও। তাতে সে তারগে বিষই ভাগ কোরে দেলে।"

৭। দক্ষিণ পূর্ব্ব দেশীয় ভাষা (চট্টগ্রাম)

"এগুয়া মান্‌ষ্যের দুয়া পোয়া আছিল্। ছোড়ুয়া তার বাপরে কইল বাপজি আঁর হিস্যার সম্পত্তি আঁরে দেয়। তান্ যা আছিল্ তারারে বাগ করি দিল।"

নোয়াখালী।

"একজনের দুই পুৎ আছিল্। ছোড়ু-গায় বাপেরে কৈল বাউ, আঁর বাগের জিনিষ-হাতি যে অয়, আঁরে দেন্। বাপে তাগরে হক্‌কল বাগ করি দিল্।"

এই সকল প্রাদেশিক ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বঙ্গভাষার কেন্দ্রস্থান হুগলী কিম্বা কলিকাতা হইতে যে প্রাদেশিক ভাষা যত দূরে অবস্থিত, ততই তাহা অধিক-

তর জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। বঙ্গদেশের সীমান্ত প্রদেশসমূহে প্রচলিত ভাষা তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ভাষার মিশ্রণে এইরূপ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দেশীয় (মেদিনীপুর) ভাষার মধ্যে এইরূপে উড়িয়া ভাষার অনেক ভাঁজ মিশিয়াছে, পশ্চিম প্রান্তের মানভূম ভাষার সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার ভাষার অনেক মিশ্রণ ঘটিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় (পূর্ণিয়া মালদহ) ভাষার সঙ্গে অনেক হিন্দি কথা মিশিয়াছে। উত্তরপূর্ব্ব (রঙ্গপুর) দেশীয় ভাষার সঙ্গে অনেক আসামী কথা মিশিয়াছে। এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের ভাষার অনেক কথা মিশিয়াছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ প্রণালী দ্বারাও কথিত ভাষার ঘোরতর পার্থক্য ঘটিয়াছে।

এখন কোন্ প্রদেশের ভাষাকে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা বলিব? কোন্ প্রদেশীয় ভাষা সাহিত্য রচনার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত? এই সকল প্রাদেশিক ভাষার সহিত তুলনায় বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের ভাষা কিরূপ? বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের ভাষা এখন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, না পশ্চাৎ দিকে হটিয়া যাইতেছে? ডাঃ গ্রিয়ারসন্ সংক্ষেপে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে নদীয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার জননী বলিয়া একটা জনশ্রুতি আছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হুগলীকেই বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার কেন্দ্রস্থান বলিতে হইবে। তবে এ কথা ঠিক্ যে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্কৃত চর্চ্চার প্রভাবে নদীয়া জেলার কথায় অনেক অধিক পরিমাণে সংস্কৃত কথার প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার বাহুল্যকেই চলিত ভাষার শ্রেষ্ঠতর কারণ বলা যাইতে পারে না। সংস্কৃত বহুলতা বরং বঙ্গভাষার একটা প্রধান দোষ। এ জন্য বাঙ্গালীরা লেখে এক ভাষায় কিন্তু তাহা পড়ে অন্য ভাষায়। * বাঙ্গালীদের লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এরূপ ঘোরতর অনৈক্য পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই। এই দেখ না কেন, বাঙ্গালীরা লেখে "লক্ষ্মী" কিন্তু তাহা পড়ে "লখ্খী"— তাহারা লেখে "বাহ্য," কিন্তু তাহারা পড়ে "বাজ্ঝ"। এরূপ প্রভেদের কারণ বাঙ্গালীদের সংস্কৃতপ্রিয়তা। যদিও কালক্রমে তাহাদের জিহ্বা এরূপ জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা আর সেই সকল গালভরা ও দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না, তবুও বাঙ্গালীরা তাহাদের জিহ্বাকে সেই সকল কঠিন কথা উচ্চারণ করিতে বাধ্য করিতে যায়। এই কারণে আসল বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতেছে না। এ বিষয় মহারাজ অশোক খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, এ দেশের জন সাধারণ অনেকদিন হইল সংস্কৃত শব্দের

---

* "He writes Sanskrit and reads and talks another language"— P. 15.

খাঁটি উচ্চারণ ভুলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাদিগকে সেই মৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া বৃথা মনে করিয়া হুকুম দিলেন "ইহারা যে ভাষা যেরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া কথা বলে, ঠিক্ সেই উচ্চারণ বজায় রাখিয়া সেই ভাষায় বহি লিখিতে হইবে। এইরূপে মাগধ ভাষার উৎপত্তি হইল। কালক্রমে হেমচন্দ্র নামক একজন পণ্ডিত সেই ভাষায় এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করিলেন। সেই মাগধ ভাষা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে এই বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও পূর্ব্বে ছিল ভাল। এই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ "মাণিকচাঁদের গান।" পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাসনামক একজন উৎকৃষ্ট কবির আবির্ভাব হয়, তিনি তখনকার চলিত বাঙ্গলাভাষায় কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করেন। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাশীরাম দাস মহাভারত ও কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি মুকুন্দরাম "চণ্ডী" ও "শ্রীমন্ত সওদাগর" গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহার পরে ১৮শ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্র "বিদ্যাসুন্দর্ রচনা করেন; ইহাঁরও কবি বলিয়া বেস খ্যাতি আছে, তবে কি না ইহাঁর রচনা কৃত্রিম (artificial)

এইরূপে গ্রিয়ারসন্ সাহেব বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অতিক্রতবেগে শেষ করিয়া, এমন একটি কথা বলিয়াছেন যাহা শুনিলে অনেক সাহিত্যসেবীকেই বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হইবে। আমাদের অনেকের বিশ্বাস বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের দিন দিন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে,—এমন কি অতি অল্প কালের মধ্যেই উহা অনেক ভাষা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ গ্রিয়ারসন্ বলেন—"তাহা হবে কেন? আসল বাঙ্গালা ভাষা যাহা ছিল, তাহা ত ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া গিয়াছে—এখন তোমরা যাহাকে বাঙ্গালা বলিয়া আস্ফালন কর, উহা যে সংস্কৃত!" সুতরাং বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যসেবিগণ যথার্থই (literally) ভূতের বেগার খাটিতেছেন।

কিন্তু গ্রিয়ারসনের মতে এই হত্যাকাণ্ডের প্রথম নম্বর আসামী হইতেছেন ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, তাঁহার নবেলগুলিও প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তিনি আসল খাঁটি বাঙ্গালা ফেলিয়া সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে গেলেন কেন? বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগের সমস্ত লেখকই তাঁহাদের অত্যধিক সংস্কৃতপ্রিয়তার জন্য বঙ্গভাষাকে নিতান্ত নারাজ করিয়া ফেলিতেছেন। বঙ্গভাষার একজন যথার্থ হিতৈষীর ন্যায় ডাঃ গ্রিয়ারসন্ অবশেষে বলিতেছেন, কবে একজন প্রকৃত প্রতিভাশালী লেখকের বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অভ্যুদয় হইবে, যিনি শাণিত অস্ত্রধারণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা হইতে সংস্কৃতের ভাগ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছাড়াইয়া বাহির করিবেন এবং খাঁটি বঙ্গভাষাকে এই সকল পণ্ডিতদিগের কবল

হইতে উদ্ধার করিবেন। সেই কল্কী অবতারের উদয় ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর মৌলিক গ্রন্থ উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যসেবিগণের সংস্কৃতপ্রিয়তা কত বেশী তাহা গ্রিয়ারসন্ সাহেব সেকালের ও একালের দুইখানি পুস্তকের ভাষা তুলনা দ্বারা দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে "পুরুষ পরীক্ষা" একখানা এ যুগের আদর্শ সাহিত্য গ্রন্থ (standard work) তাহার প্রথম পৃষ্ঠার গণনা দ্বারা দেখা যায়, উহার মধ্যে শতকরা ৮৮টা সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু চতুর্দ্দিশ শতাব্দীর কবি চণ্ডীদাসের গ্রন্থের এক পৃষ্ঠায় শতকরা মাত্র ৯০টি সংস্কৃত শব্দ, তাহাও অত্যন্ত সহজ এবং উচ্চারণের প্রণালী অনুসারে লিখিত। পরিশেষে ডাঃ গ্রিয়ারসন্ বলেন, বঙ্গসাহিত্যরূপ শিশুকে তাহার অতি বৃদ্ধ মাতামহীর পরিচ্ছেদ পরাইয়া বাহির করিতে সাহিত্যসেবিগণের কিছুমাত্র অধিকার নাই। "By all means let writers of Bengal write in Sanskrit if they like (and if they can); but they have no right to misuse their own vernacular by sending her out into the world masquerading in the clothes of her great grandmother."

গ্রিয়ারসন্ সাহেবের মন্তব্য এখানে শেষ হইল। এখন আমাদের সাহিত্য-শিশু, তাঁহার ও অন্যান্য বিদেশীয়দিগের কেন এত বিভীষিকা উৎপাদন করে, তাহা একবার দেখিতে হইবে। আমি বলি এরূপ বিভীষিকা উৎপাদন কেন না করিবে? একটা নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে যতদূর পরিশ্রম স্বীকার করা আবশ্যক, বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে বসিয়া কয় জন ইংরেজ তাহা করিয়া থাকেন? দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহাদের কিছু না কিছু বিদ্বেষ আছেই, তাহা নানাপ্রকারে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তার পর বঙ্গভাষা পরাধীন জাতির ভাষা। ইংরেজী ভাষার তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং তাহা শিক্ষা করিতে ইংরেজগণ কেন কষ্ট স্বীকার করিবেন? তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ সরকারী কার্য্যের অনুরোধে কিংবা অন্য কোন কারণে দীনা বঙ্গভাষার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিতে অভিলাষী হন, তখন তাঁহারা একটি নূতন রকমের অভিধানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে অভিধান কি?—না তাঁহাদের আর্দ্দালী বা খানসামা। সেই আর্দ্দালী ও খানসামা প্রভুগণ প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর মুসলমান অথবা উড়িয়া। তাহারা যেসকল শব্দের অর্থ বলিতে পারে না, তাহাই সাহেবের চক্ষে বিভীষিকা উৎপাদন করে। কিন্তু তবুও তাঁহারা সেই সকল "চলন্ত" অভিধানের সাহায্যে কোনক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় Higher standard পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাশ করিয়া ফেলেন। আর তাঁহারা বিচারাসনে বসিলে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, সে এজমিটা চিরদিন দখল করিতেছে, তখন সেই

দখল প্রমাণ করিবার জন্য "চিরদিন" সাক্ষীর তলব করিয়া বসেন। যাঁহাদের বিদ্যার দৌড় এতদূর, তাঁহারা যে সাধারণ বাঙ্গালা সাহিত্য-গ্রন্থ পড়িতে বসিয়া চতুর্দ্দিকে সর্ষপ পুষ্প দর্শন করিবেন, এবং সেই মাণিকচাঁদের গানের প্রাচীন সাহিত্য-যুগের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি ?

গ্রিয়ারসন্ একটা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি আর সকল গ্রন্থ ফেলিয়া "পুরুষ-পরীক্ষা"কে আধুনিক বঙ্গভাষার আদর্শ পুস্তক বলিয়া ধরিলেন কেন ? পুরুষ-পরীক্ষা ত সেই পণ্ডিতী বঙ্গভাষার যুগে, খ্রীষ্টীয় ১৮৮০ হইতে ১৮১৮ সন মধ্যে, হরপ্রসাদ রায় ফোর্টউইলিয়াম্ কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য রচনা করিয়াছিলেন। উহা অতি ভয়ঙ্কর বিদ্যাসাগরী ভাষায় রচিত। ভট্টিকাব্য যেরূপ ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, পুরুষপরীক্ষাও সেইরূপ ছাত্রদিগকে শব্দ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। এরূপ ভাষায় আর কখনও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হয় নাই—সুবে মাত্র ঐ একখানা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরী ভাষা তাহার তুলনায় অনেক সরল ও প্রাঞ্জল। তবুও সেই বিদ্যাসাগরী-ভাষার প্রতিক্রিয়া (reaction) স্বরূপ "আলালী ভাষার" সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাও আবার অধিকপরিমাণে গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট বলিয়া পরবর্ত্তী লেখকগণ গ্রহণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে ডাঃ গ্রিয়ারসনের সেই খুনের আসামী, আর আমাদের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রই ঠিক পথ ধরিয়াছিলেন। তবে সত্যের অনুরোধে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার প্রথম সময়ের রচনা—যেমন দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি গ্রন্থে, বিদ্যাসাগরী ভাষারই অত্যন্ত বাড়াবাড়ী দেখা যায়। কোন একজন সমালোচক তাঁহার এই সময়ের ভাষার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিমের দুর্গেশ নন্দিনী যেন অনুস্বর বিসর্গ বিহীন রঘুবংশ।" আর এ কথাও এখানে বলা উচিত যে বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন বঙ্কিমানুকারী লেখক সংস্কৃত শব্দ বাহুল্যে বঙ্কিমকেও হারাইয়া দেন (OutBankims Bankim)। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পরবর্ত্তী রচনায় এই দোষ সংশোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবীচৌধুরাণী ও রাজসিংহ, কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব সহজ সরল স্বচ্ছ মধুর শব্দবিন্যাসের অমৃতময় ভাণ্ডার। তাঁহার এই সকল গ্রন্থের রচনা রীতি (style) দেখিয়া মনে হয় যেন কোন স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী তর তর বেগে প্রবাহিত হইতেছে আর তাহার নির্ম্মল বারিরাশির নিম্নে কত উজ্জ্বল মণি-মুক্তা ঝিকিমিকি করিতেছে। বেশী পরিমাণে সংস্কৃতশব্দ ঘাটাইলেও বঙ্গভাষা আপন সহজ সৌন্দর্য্যে যে স্নিগ্ধ মাধুর্য্য বিতরণ করিতে পারে ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় উত্তম রূপে জানা গিয়াছে।

গ্রিয়ারসনের মতে আধুনিক বঙ্গভাষা তাহার অতি বৃদ্ধ মাতামহীর পরিচ্ছদে

বাহির হইয়া উপহাসাস্পদ হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সহিত পরিচয় নিতান্তই কম। এ কথা বিদ্যাসাগরী আমলের রচনার সম্বন্ধে খাটিত কিন্তু আধুনিক বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আদৌ খাটে না। আধুনিক বঙ্গভাষা যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে, তাহা তাহার নিজের রক্তমাংসের সহিত মিলাইয়া লইয়া assimilate করিয়া ব্যবহার করে। তাহা ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মত উপহাসের বস্তু নহে। আর বঙ্গভাষা তাহার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বেশভূষা ব্যবহার করিবেই বা না কেন? সে বেশভূষায় তাহার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অধিকার রহিয়াছে। সে বেশভূষা তাহাকে যত মানাইবে, জগতের অন্য ভাষাকে তত মানাইবে না। সে বেশভূষা কিছু সাময়িক fashion নহে, যে তাহা একদিন আদরের বস্তু ছিল এখন wordrobeএর গুদামে পচিবে। সেগুলি বহুমূল্য হীরককাঞ্চন, তাহাদের গৌরব, তাহাদের আদর চিরদিনই সমান থাকিবে। সেগুলি অক্ষয়।

এক একটি সংস্কৃত শব্দে এরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রতিফলিত হয়, যে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে গেলে, সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের রচনায় এরূপ অনেক শব্দ আছে। উপযুক্ত ভাববোধক শব্দ সংগ্রহের নিপুণতাও কবির একটি বিশেষ গুণ। আবার ভাবের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার গাম্ভীর্য্যও আবশ্যক। তাহা না হইলে সে ভাব-বর্ণনা হৃদয়কে স্পর্শ করে না। শোকব্যঞ্জক সঙ্গীত ভৈরবী রাগিণীতে গাইলে হৃদয়স্পর্শী হয়; কিন্তু তাহা আবার টপ্পার রাগিনীতে গাইলে গায়ককে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। "কপালকুণ্ডলায়" বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্র বর্ণনা করিতেছেন—

"গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে এ সাগর-গর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায় তত দূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুণ্ডলা ধরিত্রীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জল মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছিল।" ইত্যাদি

এই গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যের পার্শ্বে আর একটি গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যের বর্ণনা শুনুন—

"সেই গম্ভীরনাদি বারিধিতীরে সৈকত ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণী সম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত-আগুল্ফলম্বিত কেশভার;

তদগ্রে দেহরত্ন—যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছিল না,—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাললোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ সেই সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।"

এই গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যের ভাষাও কি গম্ভীর ও সুন্দর! যেন বিজলিমালা বিহ-সিত নবাম্বুদ ধ্বনি! ভাষার গম্ভীর মৃদঙ্গ-নির্ঘোষের অন্তরালে সেই নীলাম্বুধির তরঙ্গ-নির্ঘোষ শুনা যাইতেছে! এইরূপ সৌন্দর্য্য বর্ণনার প্রাণ হইতেছে যথোপযুক্ত শব্দ-নির্ব্বাচন। উহার এক একটি শব্দে বহুযুগ সঞ্চিত সৌন্দর্য্যরাশি জমাট বাঁধিয়া আছে। উহাকে তরল কথোপকথনের ভাষায় অনু-বাদ কর, দেখিবে সেই সৌন্দর্য্যরাশির সহস্রাংশের একাংশও তাহাতে নাই। বঙ্গ-ভাষা এইসকল বহুযুগ সঞ্চিত মণি রত্নের উত্তরাধিকারী হইয়া গ্রিয়ারসন্ সাহেবের কথায় তাহা কেন ছাড়িবে?

গ্রিয়ারসন্ বলেন, এই সংস্কৃতবহুল বঙ্গ-ভাষা সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে না। আমার সন্দেহ হয়, বোধ হয় তাঁহারই পরামর্শে সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট কৃষকপুত্রগণের জন্য গ্রাম্য-ভাষায় পাঠ্য প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব উপ-স্থিত করিয়াছেন। আমি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ও জেলায় কিরূপ প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা গ্রিয়ারসন্ সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। এখন বিবেচনা করুন, এক সাধু-ভাষা (মধ্য বঙ্গের ভাষা) ভিন্ন অন্য যে কোন প্রদেশিক ভাষায় পুস্তক রচনা করিতে গেলে, তাহা কি প্রকারে সুপাঠ্য হইবে! "কপালকুণ্ডলা" হইতে উদ্ধৃত একটি পংক্তি—যেমন "অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল" যদি কোন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা যায় তবে তাহা কিরূপ সুশ্রাব্য সুমধুর হইবে, একবার মনে মনে চিন্তা করুন! ময়মনসিংহ জেলার ভাষায় উহার অনুবাদ করিলে এই-রূপ হইবে যথা—

"নীলা-কালিওয়ালা হমুদ্দুর হেতার ফাড় নিরিখ্ হয় না, হ্যা হাম্নে দেখ্যা তার মন আল্লাদে ভরিয়া উঠল্।"

পাঠ্য পুস্তক সকল কৃষকদিগের বোধগম্য করিয়া রচনা করিতে হইলে, সেই সকল পুস্তকের ভাষা এইরূপই হইবে! তাহার ফলে যে, কেবল উচ্চাঙ্গীয় সাহিত্যের বিনাশ হইবে এরূপ নহে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগকেও চির দিন বিদ্যা বুদ্ধিতে কৃষকই থাকিতে হইবে।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে না পারিলে, তাহাদিগকে উহা বুঝিবার জন্য সুশিক্ষিত করা আবশ্যক। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বুঝিতে হইলে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। এক জন প্রবীণ চিন্তাশীল সুশিক্ষিত ব্যক্তির মনেরভাব, চিন্তার প্রণালী, হৃদয়ের

ধারণা এক জন সাধারণ কৃষক কিছুতেই তলাইয়া বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া সেই প্রথমোক্ত ব্যক্তিটী কি কৃষকের বোধগম্য হইবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া চিরদিন সেই কৃষকের ন্যায় মূর্খ হইয়া থাকিবেন। কখনই না। কোন শিশু যদি একটি চারা গাছকে বলে "হে চারা গাছ তুমি আর বাড়িও না, তুমি বাড়িলে আমি যে হাত বাড়াইয়া তোমার ফল ছিঁড়িতে পারিব না।" তখন সেই চারা গাছটী শিশুকে অবশ্যই বলিবে, "হে শিশু! আমি না বাড়িলে যে, আমার ফল ধরিবে না, তুমি বরং আমার সঙ্গে সঙ্গে বড় হইয়া আমার উপরে চড়িয়া ফল পাড়িতে শিক্ষা কর।" কৃষকদিগকেও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইতে হইলে, সেই গাছের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হইবে; গাছ চির দিন ছোট থাকিলে কৃষকও চির দিন সে ফলের আস্বাদ লাভে বঞ্চিত থাকিবেই, অধিকন্তু সে গাছের ফলও কখন ফলিবে না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য অনুশীলন করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। সাহিত্যকে সাধারণের বোধগম্য হইয়া থাকিবার জন্য যদি চির দিন মাণিকপীরের গান লইয়া থাকিতে হয়, তবে সে সাহিত্য যত শীঘ্র দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় ততই মঙ্গল।

তারপর আরও একটী কথা। মানুষের যেমন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য আছে, সাহিত্যেরও সেইরূপ বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য আছে। সাহিত্য যখন শিশু থাকে তখন তাহার আধ আধ ভাষাতেই ভাব প্রকাশ করা চলে। কিন্তু যতই তাহার বয়স বাড়ে ততই তাহার ভাবসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন সেই বিচিত্রতাময় গভীর ভাব সকল প্রকাশ করিবার জন্য উচ্চাঙ্গের বিচিত্র ভাষার প্রয়োজন হয়। বঙ্গভাষার বাল্যাবস্থায়, ভারতচন্দ্রের যুগে তাহার ভাবপ্রকাশের জন্য যে প্রকার ভাষা যথেষ্ট ছিল, বর্ত্তমান দেশব্যাপী ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চ্চার যুগে নূতন নূতন উচ্চতম ভাবসকল প্রকাশের পক্ষে সে ভাষা আদৌ যথেষ্ট নহে। এখনকার যুগের দর্শনবিজ্ঞান কাব্য সাহিত্যের সমুন্নত ভাব সকল প্রকাশ করিবার জন্য নিয়তই বঙ্গভাষাকে তদুপযুক্ত শব্দ চয়ন করিতে হইতেছে। কিন্তু সর্ব্ব শব্দ-সৌন্দর্য্যের অনন্ত বারিধি এক মাত্র সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন বঙ্গসাহিত্য আর কোথা হইতে সেই শব্দসম্পদরূপ মুক্তারাজি সংগ্রহ করিবে। ইংরেজী ভাষা যে কারণে গ্রীক ও ল্যাটিনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, বঙ্গভাষাকেও সেই কারণে সংস্কৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতের সেই অক্ষয় ভাণ্ডার উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, ইংরেজী ভাষার ন্যায় তাহাকে হ্যাট্ হস্তে গ্রীকল্যাটিনের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই।

আমরা উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা দেখিলাম ডাঃ গ্রিয়ারসন্ সাহেব যে লিখিয়াছেন,—

"Literary Bengali, as now known, is the product of the present con-

tury. Its direct cultivators were Calcutta Pandits, who, however wellmeaning, have ruined the language by their learning."

এ কথার কিছুমাত্র সারবত্তা নাই। তিনি যাহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বনাশ বলিতেছেন, আমরা তাহাকে বলি বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি। তাঁহার মতে হয় ত বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র গ্রন্থরচনা না করিয়া যদি পরাণ দাস ও রহিম সেখ বঙ্গসাহিত্য রচনা করিত, তবে তাহা খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা হইত। কিন্তু তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য বলিতে যে কেবলই "মাণিকপীরের গান" বুঝাইত এ কথা বলা অধিকন্তু।

গ্রিয়ারসন্ সাহেব বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণের যে দোষ ধরিয়াছেন, তাহার কোন মানে নাই। বাঙ্গালা ভাষায় যেমন "লক্ষ্মী" শব্দ লখ্খী বলিয়া উচ্চারিত হয়, সেইরূপ ইংরেজী ভাষায়ও বহুতর শব্দ আছে। ইংরেজী ভাষায় অনেক শব্দে কোন কোন ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না, তাহারা silent থাকে অর্থাৎ নিস্তব্ধ প্রহরীর কাজ করে যেমন receipt, might, fight, heir, hour, knife, would, should, talk, walk, match, watch, through, though ইত্যাদি ইত্যাদি। জর্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষাতেও অনেক শব্দ উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হয় না। সুতরাং এ সম্বন্ধে কেবল বঙ্গভাষাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে চলিবে কেন? বঙ্গভাষার শব্দসমূহের মূল সংস্কৃতানুযায়ী বর্ণবিন্যাসে অনেক সুবিধা আছে। ইহা দ্বারা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ হওয়ার সম্ভব নাই, পরন্তু শব্দের অর্থ সর্ব্বত্র এমন কি ভারতের সর্ব্বপ্রদেশেই সহজে বোধগম্য হইতে পারে। ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাতেও এই কারণে উচ্চারণ অনুসারে শব্দ লিখিবার রীতি নাই—এক পর্য্যায়ে উৎপন্ন শব্দ, পাছে অন্য পর্য্যায়ে কিম্বা অন্য ভাষায় চলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় silent বর্ণদিগকে প্রহরী রাখা হইয়াছে। আজকাল কোন কোন লেখক "বাঙ্গালা" শব্দকে যে উচ্চারণ অনুসারে "বাংলায়" পরিণত করিয়াছেন, ইহা আমি ভাল মনে করি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেমন এখন Bengali শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া গোলে পড়িয়াছেন, ভবিষ্যতে বঙ্গবাসিগণও "বাংলা" লইয়া এইরূপ গোলে পড়িবেন। ঈশ্বর না করুন, পশ্চিমবঙ্গ হইতে যদি পূর্ব্ববঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বিচ্ছেদের একশত বৎসর পরে হয়ত কোন পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই "বাংলা" শব্দের অর্থ খুঁজিতে গিয়া 'ভাঙ্গের (অর্থাৎ সিদ্ধির) "লা" অর্থাৎ নৌকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন এবং সুপ্রসিদ্ধ Weber সাহেব যে যুক্তিবলে মহাদেবকে আফিংখোর চিনাম্যান ঠাওরাইয়াছেন, সেই যুক্তিবলে বাঙ্গালীজাতিকে সিদ্ধিখোর বলিয়া এক উচ্চ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিবেন।

সাধারণ লোকে, এমন কি অনেক সুশিক্ষিত লোকেও, সংস্কৃত শব্দ উত্তমরূপে

উচ্চারণ করিতে পারেন না সত্য। মুখের উচ্চারণস্থান-সকলের জড়তা ইহার একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা সে জড়তা দূর হইতে পারে। প্রাচীনকালের অনেক সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ বৌদ্ধযুগে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধগণ "রাম'কে 'লাম' এবং 'দশরথকে' 'দশলথ' বলিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমার বোধহয় এক স্তন্যপায়ী শিশু ভিন্ন ভারতবর্ষে এরূপ কেহ নাই যে "রাম"কে রাম ও "দশরথ"কে দশরথ বলিয়া উচ্চারণ করিতে না পারে। বৌদ্ধ যুগের পর যে ব্রাহ্মণ্যযুগ পড়িয়াছিল,—যাহাকে ঐতিহাসিকগণ পৌরাণিক যুগ এই আখ্যাপ্রদান করিয়াছেন,—যে যুগে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—সেই যুগে লোকে বিদ্যা-চর্চ্চা দ্বারা 'লামকে' আবার 'রাম' বলিতে শিখিল এবং অভ্যাস দ্বারা তাহাদের জিহ্বার জড়তা দূর হইল। এইরূপ কালক্রমে, সুশিক্ষা প্রভাবে বাঙ্গালীগণও আবার বঙ্গভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের যথাযথ উচ্চারণ যতদূর সম্ভব শিক্ষা করিতে পারিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? আর যথাযথ উচ্চারণ না করিতে পারিলেই বা ক্ষতি কি? ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার পক্ষে যে নিয়ম ঘটে, বঙ্গভাষার পক্ষে তাহা খাটিবে না কেন?

এইরূপ আমরা দেখিলাম, গ্রিয়ারসন্ সাহেব যে যুক্তিবলে আধুনিক বঙ্গভাষাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাহার আদৌ কোন সারবত্তা নাই। বঙ্গসাহিত্য ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বঙ্গসাহিত্যের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয় সত্য, কিন্তু তাহা দুর্ব্বোধ্য নহে, তাহাতে ভাষা কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হয় না, সেই সকল সংস্কৃত শব্দ ইহার রক্ত মাংসের সহিত জড়িত। সেই সকল শব্দ দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। সাধারণ লোকদিগের বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের ভাষা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। ভাষার উচ্চতম ভাব সকল বুঝিবার জন্য তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করা আবশ্যক। তাহাদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য সাহিত্যের ভাষাকে গ্রাম্য ভাষায় পরিবর্ত্তন করিলে, তদ্দ্বারা সাধারণ লোকদিগের ত উন্নতির আশা একবারেই নাই, অধিকন্তু উচ্চ সাহিত্যেরও বিনাশ সুনিশ্চিত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

চারুশীলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেব শিশু।

পদ্মার তীরে ভগ্নকক্ষে রুগ্নশয্যায় শুইয়া কে রমণী ঐ কাতরনয়নে পথপানে তাকাইয়া রহিয়াছেন? সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মা তীর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে প্রায় এই ভগ্নকক্ষের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র এই ভগ্নকক্ষও নদীর গর্ভে যাইবে। রমণী দারিদ্রের চরমসীমায় এইরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া আরও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র শিশু পুত্র তাঁহার জন্য পথ্য ও ঔষধ আহরণে গিয়াছে। তাই তাহার পথ চাহিয়া আছেন। দাতব্য ঔষধালয়ে ঔষধ মিলে, পথ্য মিলে না। ঔষধ লইয়া শিশু ফিরিয়া আসিল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল; বালক অতি কাতর হইয়া বলিল, মা! আজ দোকানে ধার পাইলাম না। তোমাকে কি খাইতে দিব? ডাক্তার তোমাকে সাগু খাইতে বলিয়াছেন। তাই দোকানদারকে বলিলাম,—দোকানদার বলিল আর ধার দিব না। তোমার বাবা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার টাকা কি হইল? তুমি আমাকে এত দিন ঠকাইয়াছ, আর আমি তোমাকে ধার দিব না। মা, বাবা যে টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন সে টাকা কোথায় মা, আর বাবাই বা কোথায় গিয়াছেন মা? এ রমণী নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী। বালক তাঁহার একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র, জীবনের শেষ অবলম্বন।

নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রীর বুকে শেল বিঁধিল, তাঁহার সেই মিরাটস্থিত রাজপ্রাসাদ ও কত সুখের দিনের কথা স্মরণ হইল, সে দিন ফুরাইয়া গিয়াছে! আজ সেই রাজপুত্রের কি দুর্দ্দশা!! তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তিনি ভাবিলেন যদি আমি স্বামীকে সুপথ দেখাইতে পারিতাম, যদি আমি সেই অমরার রাণী হইবার উপযুক্ত হইতাম, তাহা হইলে কি আজ সেই স্বর্গচ্যুত হইয়া এই নরকে পড়িতাম, না সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে নিরয়গামী করিতাম? হায়! সেই স্বর্গের দৃশ্য আজ স্বপ্ন মাত্র। বলিলেন, বাছা তোমার পিতা স্বর্গপুরে গিয়াছেন, যাঁহার ধন তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, তাই আজ এই দুর্দ্দশা। নীলকণ্ঠ বাবু আণ্ডামানে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়াছিলেন, তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কন্যাগণ সকলেই তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তাঁহার বিধবা স্ত্রী কেবল একটিমাত্র শিশু পুত্র লইয়া পদ্মার তীরে এই জনহীন পরিত্যক্ত ভগ্নকুটীরে আশ্রয়

লইয়াছিলেন। লোকালয় তাঁহার ভাল লাগিত না।

রমণী বলিলেন,—বাছা! আমি স্বার্থান্ধ হইয়াছিলাম,তাই তোমার পিতা আমাদিগকে চরণে ঠেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। আমার জীবনে এক ঘোর দায়িত্ব আছে,তোমার পিতা স্বর্গে যাইবার সময় এক দেবদুর্লভ রত্ন আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন ; আমি গেলে সে রত্ন কে রাখিবে,তাই আমি যাইতে পারিতেছি না। আমার জন্য চিন্তা করিও না, আমি আর ঔষধ খাইব না। তুমি নিজে রাঁধিয়া খাও। আমার ত উঠিবার সামর্থ্য নাই যে, তোমাকে রাঁধিয়া দিব। বালকের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু না রাঁধিলে মা কি খাইবেন? সাগু ত নাই,তাই বালক রাঁধিবার জন্য উঠিয়া গেল। হরি! হরি! রাঁধিবে কি? ঘরে একমুষ্টিও চাউল নাই। বালক ঔষধ লইয়া আসিবার সময় ক্ষেত হইতে চাষার নিকট একমুঠি ধানের শীষ চাহিয়া আনিয়াছিল, সেই শীষ হইতে ধান ঝুরিয়া লইয়া উখুলে কুটিল। যে চাউল হইল, তাই রাঁধিয়া মাকে অর্দ্ধেক খাওয়াইয়া অর্দ্ধেক আপনি খাইল।

বালক মনে করিল, পিতা বুঝি মায়ের উপর রাগ করিয়াছেন, তাই আসেন না, তিনি যদি জানিতে পারেন,মায়ের আজ কত কষ্ট হইয়াছে ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আসিবেন। আর যদি কোন কারণে না আসিতে পারেন, তাহা হইলে ভুবনের পিতা যেমন ডাকে টাকা পাঠান সেইরূপ ফেরত ডাকে নিশ্চয়ই টাকা পাঠাইবেন। এই ভাবিয়া সেই দেব শিশু পিতাকে একখানি পত্র লিখিল, অনেক কষ্টে লিখিল। পাঠক!—সে দেব-অক্ষর পড়িতে পারিলেন কি?

"বাবা, মায়ের বড় অসুখ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি একবার এস, তাঁহার ঔষধ পথ্য নাই, তাঁহাকে দেখিলে আর রাগ করিতে পারিবে না।"

অনাথ।

লেখাগুলি বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছে, ভাবিল বাবা যদি পড়িতে না পারেন। ভাবিল কেন সে শীঘ্র শীঘ্র লেখা পড়া শিখে নাই, এবার মায়ের রোগ সারিলে সে অনেক লেখা পড়া শিখিবে। এই ভাবিতে ভাবিতে পত্রখানি মুড়িয়া তাঁহার শিরোনামায় লিখিল।

"পরমপূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়
স্বর্গপুর।"

পিতার নাম মায়ের কাছে শুনে নাই, পিতা বলিয়া লিখিলে যে পত্র তিনি পাইবেন ইহাতে তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, স্বর্গপুর বলিয়া কোন দেশে তাহার পিতা রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাই জননী নিদ্রা গেলে অতি যত্নে পত্রখানি ডাকে দিবার জন্য ডাক বাক্সের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

একদিন দুইপ্রহরের সময় সুশীলা দেখিলেন যে, একটি ক্ষুদ্র শিশু রাজবাড়ীতে যে ডাকবাক্স ছিল, তাহাতে একখানি পত্র

ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। ডাকবাক্স অনেক উঁচুতে রক্ষিত বলিয়া, পারিতেছে না। তিনি একজন পরিচারিকাকে বলিলেন, ঐ যে ক্ষুদ্র বালকটি পত্র ডাকে দিবার চেষ্টা করিতেছে, উঁচু বলিয়া পারিতেছে না, উহাকে ডাকিয়া আন। এইরূপে আহুত হইয়া, অনাথ সুশীলার নিকট আসিয়া প্রথমে কিছু সঙ্কুচিত হইল, কিন্তু সুশীলার দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল,আমার মা অতিশয় পীড়িতা, তাই পিতাকে আসিবার জন্য পত্র দিতে আসিয়াছিলাম। ডাকবাক্স অনেক উঁচুতে বলিয়া দিতে পারি নাই।

সুশীলা কহিলেন, পত্র আমাকে দাও, আমি ডাকে পাঠাইয়া দিতেছি। তাঁহার আদেশ মত অনাথ পত্র খানি অতি সাবধানে তাঁহার হাতে দিল। সুশীলা উপরের শিরোনামা পড়িয়া দেখিলেন—

"পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতা ঠাকুর
মহাশয় স্বর্গপুর"

এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পিতার নাম কি ?" বালক বলিল,—"জানি না, তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, মা বলিয়াছেন তিনি রাগ করিয়া আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি স্বর্গপুরে আছেন, কখনও আমাদের দেখিতে আসেন না। মায়ের বড়ই অসুখ, তাঁহার পথ্যের ও ঔষধের জন্য টাকা আবশ্যক, তাই পিতাকে সংবাদ দিতেছি।"

সুশীলা একমুহূর্ত্তে সকল বুঝিলেন। শিশুর সরল কাতর ভাব দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় মাতৃস্নেহে ভরিয়া গেল। তিনি আদরে তাহাকে কোলে লইলেন, বলিলেন—"পত্র ডাকে দিলে অনেক বিলম্বে যাইবে, আমি লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব। তাহা হইলে শীঘ্র পাইবেন।" এই বলিয়া পত্র লইলেন, অনাথ মহা উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

গৃহে যাইয়া দেখিল, মা ঘুম হইতে জাগিয়াছেন। তাঁহার শয্যা হইতে উঠিবার সামর্থ্য নাই। পুত্রকে দেখিয়া বলিলেন,—"অনাথ, তুমি কোথায় গিয়াছিলে, আজ ঘরে কিছু নাই, তুমি কি উপবাসী থাকিবে!—হা, ভগবন্ ইহাও আমাকে দেখিতে হইবে! নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী, পুত্রের নাম "অনাথ" রাখিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ বাবু যখন জেলে তখন তাহার জন্ম হইয়াছিল। লজ্জায় স্বগ্রাম মিরাট ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পিত্রালয়ে না যাইয়া এই গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সব ফুরাইয়া গিয়াছিল। তাই আজ দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন।

অনাথ বলিল,—"মা,ভাবিও না,ঔষধ খাও। আমি বাবাকে পত্র লিখিয়াছি। তিনি যতই রাগ করুন, তোমার অসুখের কথা শুনিলে নিশ্চয়ই আসিবেন। আমি আসিবার সময় এক কৃষকের নিকট হইতে ধানের শীষ আনিয়াছি, তাই উখুলে চাল করিয়া লইব। আজ কোনরূপে চলিবে, কাল বাবা আসি-

বেন। মা দোকানদারের চেয়ে কৃষক ভাল।"

অনাথ দেখিল,—তাহার কথায় মায়ের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন,—"বাছা অনাথ, আমি মহাপাপিনী। তাই আমার এ শাস্তি। ভগবান তোমাকে কেন এত কষ্ট দিতেছেন, তিনিই জানেন।" অনাথ বলিল,—"মা, আমার ত কোন কষ্ট নাই, তোমার অসুখ, তোমার পথ্যের জন্য সাগু দোকানদার দিল না। তাই আজ আমার দুঃখ হইয়াছিল। বাবাকে তাই পত্র লিখিয়াছি, নতুবা তাঁহাকে লিখিতাম না। তোমার কত কষ্ট হইতেছে, তবুও তিনি কেন এত দিন রাগ করিয়া আছেন।"

অনাথের মা বলিলেন,—"বাছা তাঁহার কোন দোষ নাই, আমি মহাপাপিনী, তাই তিনি চরণে ঠেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তোমাকে তিনি দেখেন নাই। দেখিলে বোধ হয় যাইতেন না। এবার যখন তিনি আসিবেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব।"

"না মা, যাইও না, যদি যাও, আমাকে লইয়া যাইও, আমি একা থাকিব কি করিয়া? তোমাকে কিছু খাইতে দিব, কিছু না খাইলে তোমার গায়ে জোর হইবে কেন"? এই বলিয়া অনাথ সেই ধান উখুলে কুটিতে লাগিল।

এমন সময়ে রবি অনেক লোক জন লইয়া সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল বোধ হয়, তাহার পিতা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।

রবি ছুটিয়া যাইয়া অনাথকে কোলে করিয়া লইলেন, উখুলে ধান কুটিতে দেখিয়া বলিলেন,—"হে ভগবন, এ সোনার পুতুলের এ কি পরীক্ষা!।"

রবি সেই দেবশিশুর কথা সুশীলার নিকট শুনিয়া, তাহাদের অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অনেক যত্নে অনাথ ও তাঁহার জননীকে লইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে তাহাদের দুঃখ দুর হইল। ভগবান স্বর্গে বসিয়া সেই দেবশিশুর আবেদন শুনিলেন। ডাকবাক্সে না পড়িলেও অনাথের পত্র স্বর্গপুরে সেই স্বর্গীয় পিতার নিকট পঁহুছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিন ক্যাম্বেলের শিবির।

কলিন ক্যাম্বেল অতি সমাদরে যোগীন্দ্র ও চারুশীলাকে আপন শিবিরে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের সেই ভীষণ বিপদ কালীন ধৈর্য্য দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা মৃত্যুকে ভয় করেন না?" যোগীন কহিলেন,—"মৃত্যু আমাদের ধর্ম্মে অবস্থান্তর মাত্র, যেমন পুরাতন পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবার সময়, আপনার মনে সুখ ও শান্তি ভিন্ন অন্য ভাবের উদয় হয় না, সেইরূপ আমরাও মৃত্যুকালে অন্য কোন চিন্তা করি না।"

কলিন।—আমরা মনে করি হিন্দুরা অতি ভীরু। যাহারা পুনরুত্থান (Resurrection) বিশ্বাস করে না, তাহারা মৃত্যুকে ভয় না করিয়া থাকিতে পারে, ইহা আমার ধারণা হইত না। তোমাদের দেখিয়া সে ভুল ধারণা আমার আজ গিয়াছে।

যোগীন।—আমরা পুনরুত্থান অবিশ্বাস করি না, পুনরুত্থান যদি পুনর্জ্জন্ম হয়, আমরা তাহা বিশ্বাস করি। মৃত্যুকে আমরা দেহান্তর বলি। অ[illegible] মরিলে যে এখনই আবার পুনর্জ্জন্ম হইবে, তাহা আমরা বলি না। কত শত বৎসর পরে পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহার ঠিক্ নাই। ইহাকেই আপনারা পুনরুত্থান বলেন। যিনি যথার্থ খ্রীষ্টান তিনিই প্রকৃত হিন্দু। খ্রীষ্টান ও হিন্দুর ধর্ম্মে কিছুই পার্থক্য নাই।

কলিন।—তবে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই বিদ্রোহ কেন হইয়াছিল,—কেন তোমরা আমাদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলে ?

যোগীন।—ভগবান আপনাদের রাজা করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা রাজত্ব ভুলিয়া বাণিজ্যে মাতিয়াছিলেন। রাজত্বকেও ব্যবসায় মনে করিয়াছিলেন। তাই আপনাদের ভুল দেখাইবার জন্য, আপনাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইবার জন্য, এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল; আর আমরা মনে করি, ইংরাজ চলিয়া গেলে আমরাই রাজা হইব। ভগবান আমাদেরও দেখাইলেন যে, ইংরাজ না থাকিলে দেশে কি মহামারি উপস্থিত হইবে। এ দেশে এমন একজন লোক নাই যে, রাজা হইবার উপযুক্ত। তাহা না হইলে কি হিন্দু রাজা হইত না ? এই বিশাল ভারত শাসন করিতে পারে, এরূপ লোক ভারতে নাই। এই সিপাহীদের মধ্যে কেহ কি রাজা হইবার উপযুক্ত আছে ? যদি থাকিত, তাহা হইলে, কি শিশু ও রমণীর উপর অত্যাচারে ইহারা প্রবৃত্ত হইতে পারিত ? জগদীশ্বর এ দেশে পর পর হিন্দুকে ও মুসলমানকে রাজা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কি যথার্থ রাজা হইতে পারিয়াছে ? তাই ভগবান্ আপনাদিগকে আনিয়াছেন। তাহা না হইলে, ক্ষুদ্র দ্বীপের মুষ্টিমেয় অধিবাসী হইয়া কি আপনারা এই বিশাল ভারতের অধীশ্বর হইতে পারিতেন ? এই বিদ্রোহের আলোচনা করিলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই বুঝিবে যে, ইংরাজ রাজা না থাকিলে, আর তাহাদের উদ্ধারের উপায় নাই। আপনি মহান্ ও সহৃদয়, আপনি আমাদের চিনিয়াছেন, তাই সন্ন্যাসী হইয়াও আমি আপনার সাহায্য করিতে পারিয়াছিলাম, আর কর্ণেল নীল আমাদিগকে চিনিতে পারেন নাই তাই তিনি আমাদের ফাঁসী দিতে যাইতেছিলেন। আমরা অবিশ্বাসী নই। কেন আমাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইতেছেন ? আমাদের অস্ত্র ছিল, শিক্ষা ছিল, শরীরে বল ছিল, তাই সিপাহী বিদ্রোহের এত সহজে দমন হইয়াছে। তাই দেশের তত ক্ষতি হয় নাই। বিদ্রোহীরা ইচ্ছা থাকিলেও, অনেক স্থলে দেশ লুঠ করিতে পারে নাই। যদি এই জন্য আমাদের অবিশ্বাস করিয়া নিরস্ত্র করিয়া বলহীন করেন, ভবিষ্যতে এইরূপ বিদ্রোহ হইলে দেশ ছার-

থার হইবে। কারণ, তখন দেশের লোক আপনাদের আপনি রক্ষা করিতে পারিবে না। আর যদি কখনও আফগান কি রুষিয়া ভারত আক্রমণ করে, তখন আমরা আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া আপনাদের কোনই সাহায্যে লাগিব না। প্রত্যুত আমাদের রক্ষার জন্য আপনাদের উপায় করিতে হইবে। তাহাতে আপনারা দ্বভাগ হইয়া হীনবল হইয়া পড়িবেন। যদি আপনারা আমাদের রীতিমত যুদ্ধ করিতে শিখান, আর অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত রাখেন,তাহা হইলে আমরা আপনাদের পৃষ্ঠপোষক থাকিলে,কোন জাতিই কখনও আপনাদের পরাস্ত করিতে পারিবে না।

কলিন।—আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। যদি আমরা ভারতবাসীকে যুদ্ধ শিখাই, আর অস্ত্র দি, তাহা হইলে কালই, তাহারা আমাদের তাড়াইয়া দিবে। আমরা ক জন আছি, যদি সমগ্র ভারতবাসী বিদ্রোহী হয়, আর যদি তাহারা যুদ্ধ করিতে শিখে, তাহা হইলে আমরা কোথায় থাকিব? আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা করিলে আমাদের আত্ম বিনাশের পথ পরিস্কার করা হইবে।

যোগীন।—সত্য, যদি ভারতবাসী এক ধর্ম্মাবলম্বী এক জাতি হইত, তাহা হইলে তাহা সম্ভব হইত। আপনারাও দেখিলেন, ভারতে এমন হিন্দু কিংবা মুসলমান কেহ নাই, যে রাজা হইতে পারে। যদি, থাকিত, যদি কেহ হিন্দু কি মুসলমানকে এক করিতে পারিত,তাহা হইলে,আপনারা আজ কোথায় থাকিতেন? তাহা হইলে কি শত শত সন্ন্যাসী, ফকির, হিন্দু, মুসলমান আপনার সাহায্য করিত? না, আজ দিল্লীতে আপনাদের জয়-পতাকা আবার উড়িত? কি হিন্দু কি মুসলমান কেহই চরিত্র বলে এমন বলীয়ান্ নহে যে, স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে পারে। যে রাজা হইবে, সেই অত্যাচারী হইবে,—শত শত সুন্দরী রমণী পরিবৃত হইয়া অন্তঃপুরে ইন্দ্রিয় বিলাসে মগ্ন হইয়া অত্যাচারে দেশ ডুবাইবে। আপনারা যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই চক্ষু ফুটিয়াছে। আমরা রমণীর প্রতি সম্মান দেখাইতে একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাই আমাদের এত অধঃপতন হইয়াছে। আপনারাই আমাদের শিক্ষা দিয়া আমাদের দোষ সংশোধনের উপায় করিয়া দিতেছেন। সেই জন্য ভগবান আপনাদের আনিয়াছেন। সেই জন্য আপনাদের ইচ্ছা না থাকিলেও এই রাজত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, আমাদের মধ্যে রাজা হইবার উপযুক্ত কেহ নাই। রাজা হইবার জন্য ভগবান আপনাদের আনিয়াছেন। আপনারা এখন ভারতের রাজা, রাজার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন।

কলিন।—আপনি যাহা বলিলেন, আমি চিন্তা করিয়া দেখিব। আপনি সিপাহী যুদ্ধের কোনও সংবাদ আমাকে দিতে পারেন?

যোগীন।—সার হিউরোজ আজ ঝান্সিতে রাণী লক্ষ্মীবাইকে আক্রমণ করিতে গিয়াছেন।

কলিন।—আপনি কি করিয়া জানিলেন যে আজ ঝান্‌সি অবরোধ করা হইয়াছে ?

যোগীন।—যেরূপে আপনি দেশ বিদেশের সংবাদ জানিতে পারেন, আমি সন্ন্যাসী হইলেও আমার সেইরূপ উপায় আছে। এই সন্ন্যাসীর দল সামান্য মনে করিবেন না। আজ হইতে আমি আপনাকে সিপাহী যুদ্ধের সকল সংবাদ দিব। লক্ষ্মীবাইকে সহজে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সেখানে কি ভয়ানক যুদ্ধ হইতেছে কাল জানাইতে পারিব। ক্রমশঃ—

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ।

মেহারে সিদ্ধপীঠ।

(১)

পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বান্তবাহিনী শৈলমালার পাদদেশ স্পর্শ করিয়া যে প্রদেশ অবিচ্ছেদে মেঘনার পুলিনে আসিয়া উপস্থিত, যাহার উত্তর প্রান্তে পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া, মেঘনার প্রীতিমধুর সম্মিলনে, চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, অপর এক উপনদীতে যাহার নৈঋ্ত-দেশ পরিবেষ্টিত, বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে এই বিস্তৃত ভূভাগ ত্রিপুরানামে অভিহিত। ঐতিহাসিকদিগের মতে "ত্রিপুর" নামক জনৈক চন্দ্রবংশীয় নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত বলিয়া ইহার নাম ত্রিপুরা। সম্প্রতি স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরার শাসনদণ্ড, যাঁহার হস্তে নিহিত, ইনি এই কথিত প্রথিতনামা নরপতিরই বংশধর। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে তাঁহারই শাসিতরাজ্যের কিয়দংশ লইয়া এই ত্রিপুরা জেলা। ভগবতী ত্রিপুরেশ্বরীর মহাপীঠ অদূরে স্বাধীন ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে। শাক্তদিগের মতে ত্রিপুরেশ্বরী এই ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এ নিমিত্ত "ত্রিপুরা" নামে ইহার অভিধান। ত্রিপুরা কামরূপ খণ্ডের একদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উত্তর প্রান্তে কামাখ্যাদেবীর মহাপীঠ, দক্ষিণে তীর্থরাজ চন্দ্রনাথ, মধ্যে জয়ন্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরীর মহাপীঠ। এই বিস্তৃত কামরূপ খণ্ডে শাক্তসম্প্রদায়েরই বাহুল্য। সুতরাং শাক্তসমাজের এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান ত্রিপুরা দুইটি সবডিভিসনে বিভক্ত;—আসাম বেঙ্গল-রেলওয়ে লাইনের যে সবডিভিসন চাঁদপুরে আসিয়া পহুঁচিয়াছে, ইহারই প্রায় ২১ মাইল দূরে পূর্ব্ব দক্ষিণে "মেহার" পরগণা। কথিত রেলওয়ে লাইনের "ভিংরা" ষ্টেশন এই পরগণারই অন্তর্গত। তথা হইতে ২ মাইল দক্ষিণে আসিলেই মেহারের কালীবাড়ী।

যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত ঐ ষ্টেশন হইতে লোকেল বোর্ডের একটি বিস্তৃত সরক সোজাভাবে দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ ধরিয়াই যাত্রিকেরা অহোরাত্র তথায় যাতায়াত করিয়া থাকে।

আশ্বিন মাসে, এখানে বহু যাত্রিকের সমাগম হয়, এই মাস ব্যাপী মেলাতে এতই জনতার স্রোত বৃদ্ধি হয় যে, পথে লোক ধরে না। অনন্ত লোক-সমুদ্র, ভক্তির আবেগে বিক্ষোভিত হইয়া, অবিরাম আনন্দের কল কল নাদে, মায়ের পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলের হাতেই পূজার নানাবিধ উপচার, সকলের মুখেই মহামায়ার মধুর কালীনাম! প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে মহানিশা পর্য্যন্ত, সকল সময়েই ভক্তদিগের উচ্ছ্বসিত প্রাণের সেই মধুর মা নাম। শরৎকালই সারদার মহোৎসবের কাল। এই সময়ে নানাদেশ হইতে অসংখ্য শিক্ষিত ভদ্রগণ সমবেত হইয়া, মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতেই বিবিধ পূজোপচারে পরিপূর্ণ অসংখ্য বিপণিশ্রেণী সৌন্দর্য্যগরিমায় ভক্তদিগের চিত্ত হরণ করিতে থাকে। তৎকালে অসংখ্য ফুলের সাজি, স্তূপীকৃত বিল্বদল, চন্দনদ্রবে পরিপূরিত অগণিত পাত্র ও নানা উপচারে সজ্জিত সুরম্য নৈবেদ্য রাশিতে ভগবতীর প্রাঙ্গণ এতই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে যে, যাহার কপর্দ্দক মাত্র সম্বল সেও মায়ের পদতলে আসিলে,—কিছু পূজা না দিয়া থাকিতে পারে না;—সকলের প্রাণই যেন ভক্তির সম্মোহন-মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। কোথাও ছাগ মেষ মহিষের আর্ত্তনাদ, কোথাও সুরাগন্ধ ভৈরবকল্প ভক্তগণের উন্মাদনৃত্য, কোথাও বা ভক্তকণ্ঠের অমৃতময় সাধনসঙ্গীত। আবার অন্যত্র পূজক বা পুরোহিতগণ নিরবদ্যবরণা মহামায়ার ধ্যানে অভিনিবিষ্ট। চতুর্দ্দিকেই শঙ্খ ঘণ্টার ঘটা,—চতুর্দ্দিকেই ধূপ ধুনার সুরভি সুবাস; আবার প্রতিমুহূর্ত্তেই সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর মঙ্গল-ধ্বনি। লৌহ শলাকা যেমন চুম্বকের আকর্ষণে আর স্থির থাকিতে পারে না, তাৎকালিক দৃশ্যমান কার্য্যকলাপে আকৃষ্ট হইয়া, মানবের শ্রেণীও তেমনই অস্থির হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ স্থানের এমনই মাহাত্ম্য যে, তথায় উপস্থিতি মাত্র প্রকৃতির সুমধুর দৃশ্য নয়নে পতিত হইয়া হৃদয়ের সুপ্ত ভক্তিকে জাগরিত করিয়া তুলে।

কালী বাড়ীর প্রায় চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য অশ্বত্থ ও বট। পূর্ব্বদিকে পুষ্পোদ্যান, দক্ষিণে স্বচ্ছ স্ফটিকনিভ প্রসর জলাশয়, উত্তরে অপরিসর একটি ক্ষুদ্র অরণ্য, পশ্চিমে বিস্তৃত এক সমতল ক্ষেত্র। কিন্তু তাহাও ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ পাদপে নিরাতপ ও নিস্তব্ধ; সুতরাং উহা সাধকের সাধনার স্থান। অনেক সন্ন্যাসী পুরশ্চরণের অভিপ্রায়ে এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ আনন্দকাননে নীরবে মায়ের সাধনায় নিযুক্ত থাকেন। আহা! কি শান্তির স্থান। চতুর্দ্দিকেই প্রকৃতির অভিরাম শান্তি-

বেশ লক্ষিত হয়। বনের সন্নিহিত স্থলে শিবাবলি প্রদত্ত হইতেছে ; নিঃশঙ্কচিত্তে শৃগাল তাহা গ্রহণ করিতেছে। কোথাও বা কাকবলি প্রদত্ত হইতেছে, তাহাও ক্ষুদ্র বায়সকর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে। অসংখ্য গৃধ্র ও গৃধিনী—শাখায় শাখায় উপবিষ্ট, বলি হইবা মাত্র (চর্ম্মকারেরা চর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর) মাটিতে আসিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে, খাওয়ার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু মায়ের [illegible]তে কোথাও মল ত্যাগ অথবা অন্য কোনরূপ উৎপাত উপস্থিত করিয়া ভক্তপ্রাণে আঘাত করিতে জানে না ; ইহারা যেন শান্তির দূত।

মায়ের শান্তিধামের মহিমায় ইহাদের স্বাভাবিক অশান্ত ভাব একেবারেই বিলুপ্ত। যাহাতে মাতৃভূমির কোনও অংশে কোনরূপ দুর্গন্ধে কলুষিত না হয়, বোধ হয়, তজ্জন্যই এখানে ইহাদের অবস্থান। পূর্ণিমায়, অমাবস্যায় নহে, অনবরতই বলির কার্য্য চলিতেছে। ইহা ছাড়া প্রতি বর্ষে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এখানে আর একটি মেলা হয়। মায়ের সাধনার উৎসব এই মেলার লক্ষ্য। তাহাতে এতই বলি হয় যে, অবিরত রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া দেবীর প্রাঙ্গণে মঞ্জিষ্ঠারাগের সঞ্চার করিয়া দেয়। তদ্দর্শনে মনে হইতে থাকে, মহিষাসুরনাশিনীর অগণন যোগিনীগণের রুধিরপিপাসা যেন চরিতার্থ হইতেছে। ভক্তগণ এইরূপে মহাশক্তির আরাধনা করিয়া, যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মায়ের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিতে থাকে, তখন সেই দৃশ্য বড় মধুর, বড়ই আনন্দোদ্দীপক হয়। এখানে একরূপাসক্ত ব্যক্তিগত কল্পনায় বিরচিত মা জগদম্বার কোনও মূর্ত্তি নাই, তিনিই দিগম্বরী পরমানন্দরূপা মহাশক্তি।

যাঁহাদের হৃদয় ভক্তি বিশ্বাসের অমল কিরণে আলোকিত, তাঁহাদিগের হৃদয়ের শক্তিতে তাঁহারাই জীনমূলে ঘটস্থাপন করিয়া, তাহাতে মহামায়ার মহাশক্তির আবাহন পূর্ব্বক শাস্ত্র প্রদর্শিত এক একটি প্রতিমূর্ত্তি কল্পনায় মায়ের অপূর্ব্বরূপ দর্শন করিতে করিতে পুলকসঞ্চারে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে। অভক্ত ও অসংযত চিত্ত মানবমাত্রই এখানে অন্ধ। সুতরাং তাহারা এই আনন্দের এই দিব্য অমৃতের অংশ গ্রহণ করিতে নিতান্তই অক্ষম। কিন্তু তাহাদিগেরও হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। সিদ্ধ বেদির উপরে আকাশস্পর্শী যে কএকটি অশ্ব তখন পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগের আবরণে সেই সাধনার মূল জীন মূলের কএকটি জীর্ণতরু নয়নপথে পতিত হইয়া সমাগত জড়বুদ্ধি হতাশ মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, এবং তাহাদিগকে পত্ররূপ করসঞ্চালনে আশ্বস্ত করিতেছে। এই অবস্থায় তাহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল মনের আর অধীরতা থাকে না।

ধীরভাবে বেদির সন্নিহিত হইয়া উপবেশন করিলেই মনে কি যেন কি একটি ভাবের সঞ্চার হয়। সেই পবিত্র ভাব হইতেই মনের অসদ্ভাবের অভাব সাধিত হয়। তখন

তাহাদের মন অযাচিত ভক্তিরসে স্নাত হইয়া সেই প্রাণারাধ্যা আদ্যাশক্তির আবাহনে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপ জিজ্ঞাসা,—এই ভূমির এত মহিমা কোথা হইতে আসিল? কোন্ মহাপুরুষ এই ক্ষেত্রে এরূপ ভক্তির বীজ বপন করিলেন? এ ঘোর কলিতে কোন্ স্বর্গের দূত শান্তির অমৃত সেচনে ধরাতলে এই স্বর্গের সৃষ্টি করিলেন? যেখানে সতীর দেহাংশ নিপতিত, পুরাণে ও তন্ত্রে তাহাই মহাপীঠ বলিয়া নির্ণীত। এই মেহার সেই পীঠস্থান নহে, উহা সিদ্ধপীঠ। এখানেই সাধকপ্রবর সর্ব্বানন্দদেব, পূর্ণানন্দের উত্তরসাধকতায় কালীসিদ্ধি করিয়াছিলেন। অনেকেই পুণ্য দাদার গল্প শুনিয়াছেন। গল্প নহে উহা ধ্রুব সত্য।

ক্রমশঃ—

শ্রীঃ—

রাঠোর সর্দ্দার দুর্গাদাস।

মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট স্তম্ভস্বরূপ মহাবীর রাজা যশোবন্তের অকাল মৃত্যুতে মারবার রাজ্য ঘোর অশান্তি তিমিরে আবৃত হইল;—রাজ্যের সর্ব্বত্রই ভীতি ও নৈরাশ্য বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার শিশু পুত্র অজিতসিং, রাঠোর সর্দ্দার দুর্গাদাসের আশ্রয়ে, গিরিগুহায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অচিরে অজিতের বিষয় নৃশংস মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি রাজকুমারকে অপহরণ করিবার মানসে টাইবর খাঁ নামক একজন রণদক্ষ সেনাপতিকে আদেশ করিলেন। টাইবর খাঁ অবিলম্বে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মারবার দেশ আক্রমণ করিলেন। এই ভীষণ সঙ্কটকালে, রাঠোর সর্দ্দারশ্রেষ্ঠ বীর দুর্গাদাস সমস্ত রাঠোর বীরগণকে একত্র পূর্ব্বক সমরসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। অষ্ট সহস্র রাঠোর বীর জীবনের মমতা পরিহার পূর্ব্বক প্রচণ্ড বিক্রমে মোগল সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্র শোণিতস্রোতে প্লাবিত হইয়া গেল। রাঠোর সর্দ্দার দুর্গাদাস ভীষণ শূল হস্তে মোগল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মোগল সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। দুর্গাদাস জয়লাভ করিলেন কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাঠোর বীরের শোণিত বিনিময়ে এ জয় অর্জ্জিত হইয়াছিল।

রাজকুমার অজিত নিষ্ঠুর আরঙ্গজেবের গ্রাস হইতে উদ্ধার হইলেন; বীর দুর্গাদাস তাঁহাকে একটি দুর্গম গিরিপ্রদেশস্থ দেবমন্দিরে রাখিয়া অতি যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

মোগল সৈন্যের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণে

আরঙ্গজেব মহাক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি স্বীয় পুত্র আকবরকে সপ্ততি সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া টাইবর খাঁর সহিত মারবার জয়োদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। রাঠোরবীর দুর্গাদাস পুনরায় মারবারের সমস্ত সর্দ্দারগণকে একত্র করিয়া বিশাল মোগল সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বীরত্বে এবং তেজোময়ী উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, দুর্দ্ধর্ষ রাঠোর বীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু অসংখ্য মোগল সৈন্য সহ কতিপয় সহস্র রাজপুত বীর কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে সক্ষম?—উপায়ান্তর না দেখিয়া, দুর্গাদাস একটি কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক টাইবর খাঁকে সম্রাট তনয় আকবরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং আর্ব্বুদ নামক গিরি প্রদেশে টাইবর খাঁকে কএক সহস্র সৈন্য সহ অবরোধ করিয়া আকবরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আকবর বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া সন্ধির জন্য মনে মনে স্থির করিলেন, কিন্তু অচিরে ঘটনা-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইল;—রত্নসিং নামা জনৈক সর্দ্দার, তাহার সমস্ত সৈন্য সহ আকবরের সহিত যোগদান করিল এবং তাহার বিশ্বাসঘাতকতায় টাইবর খাঁর উদ্ধার সাধন হইল। দুর্গাদাস ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং ভীম-বিক্রমে আকবর ও রত্নসিংহের সমবেত সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার ভীষণ শূল দ্বারা আহত হইয়া কত শত যবন বীর ধরাশায়ী হইল। তিনি যবন সৈন্য মথিত করিয়া রত্নের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং ভীষণ শূলাঘাতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ পূর্ব্বক আকবরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহসা টাইবর খাঁ আকবরের সহিত মিলিত হইলেন; যুদ্ধ ক্রমশঃই গাঢ়তর হইতে লাগিল, যুদ্ধক্ষেত্র হতাহত রাজপুত ও মোগল সৈন্য দ্বারা পূর্ণ হইল। দুর্গাদাস অতুল সাহসে ও অনুপম বীরত্বে রাজপুত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য পরাজিত হইল।

স্বীয় পুত্রের পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে আরঙ্গজেব ক্রোধান্ধ হইয়া স্বয়ং একটি বিশাল সৈন্যদল সমভিব্যাহারে মারবাররাজ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজধানী যোধপুর অধিকৃত হইল;—মারবার রাজ্যের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল। বীরবর দুর্গাদাস রাঠোর রমণীগণের সম্মান রক্ষার্থ মহাব্যগ্র হইলেন; অনন্যোপায় হইয়া তিনি ভীষণ জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। সৌধনিম্নে রাশি রাশি বারুদ স্তূপীকৃত হইল। রাজপুত মহিলাগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পতি ও পুত্রের নিকট হইতে শেষ চুম্বন, শেষ আলিঙ্গন ও শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন!—সহসা শত শত কামান-নাদে অট্টালিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল;—মুহূর্ত্তে রূপ, যৌবন, আশা, ভালবাসা ধূমে পরিণত হইল!!

জয়োৎফুল্ল যবন সৈন্যগণ নগর, গ্রাম লুণ্ঠন করিল। অট্টালিকা দেবমন্দির চূর্ণীকৃত হইল। দেব বিগ্রহাদি যবন পদতলে দলিত হইতে লাগিল!—কত রাজপুত যবন হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিল; কত রাজপুত যবনদিগের ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। পাষাণ-হৃদয় আরঙ্গজেব এ সমস্ত বীভৎস দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সানন্দ হৃদয়ে আজমীরে গমন করিলেন, এবং তাহা অধিকার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন।

আরঙ্গজেবের অনুপস্থিতে দুর্গাদাস পুনরায় রাঠোর সর্দ্দারগণকে একত্র করিলেন;—যেন মন্ত্রবলে তাহাদিগের হৃদয়ে নব বল সঞ্চালিত করিলেন এবং ঝালোর রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক মারবার রাজধানী যোধপুর অধিকার করিতে পুনরুদ্যত হইলেন। এতৎ সংবাদ শ্রবণে আরঙ্গজেব চিতোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোধপুরে প্রত্যাগমন করিলেন; দুর্গাদাস প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সম্রাটের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন না—অগত্যা তিনি আরাবল্লির নিভৃত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন; এবং তথা হইতে সুবিধামত নিক্রান্ত হইয়া যবন সৈন্যগণের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। আরঙ্গজেব চিতোর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, সমস্ত মোগল অনিকীনি তৎপুত্র আকবর ও টাইবর খাঁর অধীনে ন্যস্ত রাখিয়া তথা হইতে দিল্লী প্রস্থান করিলেন।

দিল্লীশ্বর প্রত্যাগমন করিলে, দুর্গাদাস আরাবল্লির নিভৃত নিবাস হইতে বহির্গত হইলেন, এবং ঝালোর ও শিবালোনামক রাজ্যদ্বয় অধিকার পূর্ব্বক উদয়পুরের উত্তর দিকস্থ গদবার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তৎকালীন চিতোরের রাণা রাজসিংহের পুত্র ভীমসিংহের সহিত সম্মিলিত হইয়া আকবরের সৈন্যগণকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিলেন; এবং বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুগণ সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোণিঙ্গ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন এবং ভীমসিংহ অসংখ্য অরি নিপাত পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে চিরনিদ্রিত হইলেন। বীরাগ্রগণ্য দুর্গাদাসের অলৌকিক বীরত্বে ভীত হইয়া আকবর সন্ধি প্রার্থনা করিলেন; অচিরে সন্ধি হইল। চতুর দুর্গাদাসের মন্ত্রণায় আকবর, আরঙ্গজেব হইতে পৃথক্ হইয়া "স্বাধীন সম্রাট্" বলিয়া রাজস্থানে বিঘোষিত হইলেন এবং স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুতগণ তাঁহাকে "সম্রাট্" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অচিরে উক্ত ঘটনা আরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল—তিনি ভীত হইলেন। তিনি কূটবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক আকবর সৈন্যের অধিনায়ক টাইবর খাঁকে গোপনে উৎকোচ প্রদান করিয়া হস্তগত

করিলেন। টাইবর রাজপুত সৈন্যগণকে কহিলেন,—"আকবর স্বীয় পিতার সহিত মিলিত হইতে দিল্লী গমন করিতেছেন," এই বলিয়া উক্ত মর্ম্মে লিখিত আরঙ্গজেবের স্বহস্ত লিখিত একটি লিপি তাহাদিগকে দেখাইলেন। রাজপুতগণ আকবরের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। আকবর বিলাসসুখে মগ্ন ছিলেন। তিনি এই আকস্মিক বিপদ্‌বার্ত্তা অবগত হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন; উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি চিতোরের রাণা ও দুর্গাদাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; দুর্গাদাসও তাঁহাকে এবং পরিবারবর্গকে তাঁহার পিতার ক্রোধানল হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোণিঙ্গদেবের হস্তে রাজকুমার অজিতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান পূর্ব্বক আকবরের সহিত সম্মিলিত হইয়া গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরঙ্গজেব সসৈন্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশ ঝালোরে প্রেরণ করিলেন। দুর্গাদাস কএক সহস্র রাজপুত যোদ্ধা ঝালোরে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসহ আরঙ্গজেবের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন এবং সহসা তাঁহাকে প্রতারণা পূর্ব্বক নর্ম্মদা তীরে আকবরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ঝালোরে প্রেরিত রাজপুত সৈন্যগণ মোগলসৈন্য পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইল। সম্রাট্ হতাশ হইলেন; তিনি ইনায়েৎ খাঁ নামক একজন সেনাপতির অধীনে দশসহস্র সৈন্য স্থাপনপূর্ব্বক যোধপুর অবরোধ করিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং যোধপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গাদাসের অগ্রজ বীর সোণিঙ্গ যোধপুর রক্ষার্থে ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইনায়েৎ খাঁকে পরাজয় করিয়া যোধপুরের অভ্যন্তরে অবরোধ করিলেন, কিন্তু আরঙ্গজেব শীঘ্র তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন এবং প্রচণ্ড বিক্রমে রাঠোর সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল,—উভয় পক্ষেই বহু সৈন্য হতাহত হইল; কিন্তু বীর সোণিঙ্গের অদ্ভুত রণকৌশল দর্শনে আরঙ্গজেব ভীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। সম্রাট্ অজিতসিংহকে সাত হাজারী মনসবদারপদে অভিষেক পূর্ব্বক সোণিঙ্গকে আজমিরের শাসনভার অর্পণ করিলেন এবং নর্ম্মদা তীরে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সোণিঙ্গদেব ইহার পর অধিকদিন জীবিত ছিলেন না; সহসা তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে আরঙ্গজেবের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। দুর্গাদাস তাঁহার সমস্ত যত্ন, সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন;—তিনি নিরাশ-হৃদয়ে তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ধি-বন্ধন ছিন্ন হইল।

দুর্গাদাস অগ্রজের মৃত্যু-বার্ত্তা শ্রবণে নিরতিশয় শোক প্রাপ্ত হইলেন এবং দাক্ষিণাত্য হইতে মারবারে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, একটি বিশাল রাঠোর-বাহিনী সজ্জিত করিলেন

এবং যবন সংহারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাঠোর-বিক্রম-বহ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রথমতঃ পুর ও মণ্ডল নামক দুইটি অতি প্রাচীন নগর অধিকার করিয়া, তৎশাসন কর্ত্তা কাশিমখাঁকে সংহার করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গদবার, ঝালোর, শিবানো ও সুন্দর প্রভৃতি নগর অধিকার পূর্ব্বক আজমির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আজমিরের তৎকালীন শাসন কর্ত্তা সেফি খাঁকে পরাজয় পূর্ব্বক আজমির অধিকার করিলেন এবং যোধপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যোধপুরের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা জাফর খাঁর সহিত জলোর নামক স্থানে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল—জাফর খাঁ পরাজিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত মারবার প্রদেশ যবনদিগের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল। মারবারের তৎকালীন মুসলমান শাসন কর্ত্তা সুজৈত খাঁ সভয়ে দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিলেন, কিন্তু দুর্গাদাস তাঁহাকে পথিমধ্যে ধৃত করিয়া তাঁহার ধন রত্নাদি লুণ্ঠন পূর্ব্বক, তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীয় রমণী গণকে বন্দী করিলেন। এতৎ সংবাদ শ্রবণে আরঙ্গজেব অতিশয় চিন্তিত হইলেন;—বিশেষতঃ তাঁহার পৌত্রী আকবরের দুহিতা দুর্গাদাসের আশ্রয়ে কালযাপন করিতেছে—সুলতানীর মান সম্ভ্রম দুর্গাদাসের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি অনন্যোপায় হইয়া সুলতানীর মুক্তির জন্য মারবার প্রদেশ অজিত সিংহকে প্রদান পূর্ব্বক দুর্গাদাসকে বহু জনপদ ও ধন রত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক, পঞ্চ হাজারী মনসবদার পদে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু, তিনি সম্রাটের এবম্ভূত উপহার গ্রহণ না করিয়া সুলতানীকে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার এইপ্রকার স্বার্থত্যাগে বিস্মিত হইলেন!

সম্বৎ ১৭৫৭ অব্দে অজিত সিং স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। অজিতের জয়নাদ সহস্র সহস্র রাঠোর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়া গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিল—আবার যোধপুর রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। দুর্গাদাসের অলৌকিক স্বার্থত্যাগে মুগ্ধ হইয়া অজিত সিং তাঁহার হস্তে রাজ্য রক্ষার ভার সমর্পণ পূর্ব্বক গুজরাটে অসংখ্য সৈন্য সহগমন করিলেন এবং ভীষণ যুদ্ধের পর তৎশাসন কর্ত্তাকে পরাস্ত করিয়া তাহা অধিকার করিলেন এবং স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। আরঙ্গজেব শঙ্কিত হইলেন এবং তাঁহার দমনার্থ একটি বিরাট সৈন্যদল সংগঠন পূর্ব্বক গুজরাটে প্রেরণ করিলেন। দুর্গাদাস মারবার দেশ হইতে গুজরাটে আহুত হইলেন। অচিরে লুণী নদীতীরে মোগল অনিকীনির সহিত রাজপুত সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ হইল। মোগল সৈন্যগণ পরাজিত হইল;—কিন্তু সে ভীষণ যুদ্ধে বীর-চূড়ামণি দুর্গাদাস বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক, জলন্ত গোলক বক্ষে ধারণ করিয়া স্বদেশের ও মিত্র,প্রভুর জন্য তাঁহার পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিলেন।

শ্রীঃ—

কাব্যপ্রকাশঃ।

কাব্যপ্রকাশ।

(২)

বৃত্তিঃ। অস্য কারণমাহ। *

অনু। কাব্যের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়া এইক্ষণ কাব্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বিবৃতি। পূর্ব্বে কবিত্বের সাহায্যে বাণীর সৃষ্টি, ব্রহ্মার সৃষ্টির ন্যায় উপাদান ও নিয়তির অধীন নহে, এরূপ বলা হইয়াছে;—এখন কাব্যের কারণ নির্দ্দেশ হইতেছে—যে কারণ জানিলে কবি ও সহৃদয় উভয়েরই উপকার হইবে।

শক্তির্নিপুণতা লোক-
　　শাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস
　　ইতিহেতু স্তদুদ্ভবে ॥ ৩।

অনু। শক্তি, লোকশাস্ত্র ও কাব্যাদি আলোচনাজনিত ব্যুৎপত্তি, এবং কাব্যজ্ঞব্যক্তির উপদেশানুসারে কাব্য নির্ম্মাণ ও আস্বাদে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, এই তিনটি মিলিয়া কাব্যের কারণ হয়।

বৃত্তিঃ। শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ,যাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ, প্রসৃতং বা উপহসনীয়ং স্যাৎ। লোকস্য—স্থাবর-জঙ্গমাত্মকলোকবৃত্তস্য, শাস্ত্রাণাং—ছন্দো-ব্যাকরণ-কোষকলাচতুর্বর্গগজ-তুরগখড়্গাদি-লক্ষণগ্রন্থানাং, কাব্যানাঞ্চ—মহাকবিসম্বন্ধিনাং, আদিগ্রহণাৎ ইতিহাসাদীনাঞ্চ বিমর্শনাৎ ব্যুৎপত্তিঃ,—কাব্যং কর্ত্তুং বিচারয়িতুং চ যে জানন্তি তদুপদেশেন করণে যোজনে চ পৌনঃপুন্যেন প্রবৃত্তিঃ, ইতি ত্রয়ঃ সমুদিতা নতু ব্যস্তা তস্য কাব্যস্য উদ্ভবে নির্ম্মাণে সমুল্লাসে চ হেতু র্নতু হেতবঃ।

অনু। (১) কবিত্বের বীজভূত পূর্ব্বজন্মকর্ম্মজনিত সংস্কারবিশেষকে শক্তি বলে, যাহা ছাড়া কাব্য সরে না, সরিলেও (ক) উপহাসাস্পদ হয়। (২) মূল কারিকা-

* কোন কোন পুস্তকের পাঠ অন্যরূপ। যথা,—এবমস্য প্রয়োজনমুক্ত্বা কারণমাহ। "বান্ধব সম্পাদক।"

(ক) যাহা ছাড়া কাব্য বাহির হয় না, তাহা ছাড়া কাব্য কিরূপে বাহির হইয়া উপহাসাস্পদ হইতে পারে?

উত্তর:—"যাহা ছাড়া কাব্য বাহির হয় না, এবং যাহার সামান্য সাহায্যে কাব্য বাহির হইলেও যাহার বিশেষ অভাবে উহ

প্রোক্ত লোক শব্দে স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোক-চরিত, শাস্ত্র শব্দে ছন্দোব্যাকরণ-কোষ-সঙ্গীতাদি কলা, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ, গজ অশ্ব ও খড়্গাদি বিষয়ক শাস্ত্র বুঝিতে হইবে; কেন না কাব্যে এই সকল শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। কারিকায় কথিত কাব্য শব্দে মহাকবিকৃত কাব্য বুঝিতে হইবে; এবং কাব্যাদি শব্দের আদি শব্দে ইতিহাস পুরাণ ধরিতে হইবে। এইগুলির অবেক্ষণজাত নিপুণতা অর্থাৎ আলোচনাজনিত ব্যুৎপত্তি। (৩) যাঁহারা কাব্যরচনা ও বিচার করিতে জানেন, তাঁহাদের উপদেশ মতে কাব্যকরণে ও যোজনে বারংবার চেষ্টা। এই তিনটি, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নহে, কিন্তু মিলিতভাবে, কাব্য নির্ম্মাণ ও আস্বাদনে হেতু হয়; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ তিনটি হেতু হয় এরূপ নহে।

বিবৃতি। শক্তি, লোকবৃত্ত ও কাব্যব্যাকরণাদি শাস্ত্রে বিদ্যা, এবং উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা ও অভ্যাস একত্র মিলিত হইলে কাব্যরূপ ফল প্রসব করে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবিশেষ দ্বারা বাসিত অন্তঃকরণ কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া থাকে। অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনকে অন্তঃকরণ বলে। কবিত্বসংস্কার দ্বারা ইহাদের মধ্যে বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। কবিত্বসংস্কার দ্বারা অহং বুদ্ধি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়; সুতরাং তাহাতে সর্ব্বভূতে প্রীতি ও আত্মভাব জন্মে, এবং সকলের মনের ভাব ও অবস্থা নিজ চিত্তে প্রতিফলিত হয়। ইহাকে চিত্তের সাধারণীকরণ অর্থাৎ Universal sympathy—follow-fooling with all sontiont beings জন্মিলে, পশুপক্ষ্যাদির হর্ষবিষাদও কবি বুঝিতে এবং বর্ণনা করিতে পারেন, এবং তাঁহার কাব্য সহৃদয় মাত্রেই ভালবাসেন। উক্ত সংস্কার দ্বারা বুদ্ধি দীপ্তিশালিনী হয়, চিত্তবৃত্তি ও বস্তুসংকারাদির ঔচিত্য জ্ঞান জন্মে। উহা দ্বারা মনের সংকল্প-বিকল্প বা কল্পনা শক্তি সঞ্জীবন গুণ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গ, নরক ও দৈত্যাদি পাষণ্ডলোকেও কল্পনা করিতে পারে। কিন্তু যাহাতে কল্পিত বস্তু জীবিতবৎ হইয়া হাস্য করিতে থাকে ও ক্রিয়া দ্বারা চমৎকৃতি জন্মায়, তাহা সংস্কার বিশিষ্ট মনেই উৎপন্ন হয়। কল্পনার অতি বিচিত্র সঞ্জীবনী শক্তি মেঘদূত ও কুমারসম্ভবে দ্রষ্টব্য। উক্ত শক্তির অভাবে অজ্ঞগণের কল্পিত স্বর্গ নরকাদি শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে। সংস্কার দ্বারা অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। এই প্রদীপ্ত অনুভব শক্তিকে সারস্বত চক্ষুঃ বলে। ইহারই সাহায্যে অন্যের দুর্লক্ষ্য বস্তু কবির চক্ষে ভাসে। হৃদয়ে কবিত্ব সংস্কার থাকিলে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় উভয়ই কাব্যানুকূল উপকরণ সংগ্রহের সময় অত্যন্ত সতেজ হয়।

কেবল সংস্কারাত্মক শক্তি হইলে হইবে না; কোষ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে বিদ্যা চাই, চরাচরের অবস্থা জানা চাই। ব্যাকরণ না জানিলে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মিলিত শক্তি বুঝা যায় না; কোষ না জানিলে শিষ্ট-প্রয়ো-

উপহসনীয় হয়" ইহাই অর্থ। অর্থাৎ প্রতিভাময়ী শক্তি না জন্মিলে কবি বা সহৃদয় কিছুই হওয়া যায় না।

গতঃ শব্দশক্তি জানা যায় না। অলঙ্কারশাস্ত্র-দ্বারা রস-ভাব-গুণাদি, পুরাণ দ্বারা ঘটনা ও লোকবৃত্তান্ত জানা যায়। সংস্কারবিশিষ্ট হইলেও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ সহৃদয় সমাজে কবিশব্দবাচ্য হইতে পারে না; কেন না তাহার ঔচিত্য বুদ্ধি জন্মে না। যথা—অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ দিব্যচরিত, রাম-কথা দিব্যাদিব্যচরিত ও দুষ্মন্তাদির কাহিনী অদিব্যচরিত। অজ্ঞতাবশতঃ ঐশ্বর্য্য বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিব্যাদিব্য, রাম বা অদিব্য দুষ্মন্তাদিকে মনুষ্যে পরিণত করিলে, সহৃদয়ের অপ্রীতি ও রসভঙ্গ হইবে। এই জন্য বিদ্যার অনাদর করিয়া কবি হওয়া যায় না। কাব্য লিখিতে কত বিদ্যা আবশ্যক, তাহা কালিদাসীয় কাব্য পাঠে বুঝা যায়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, বর্ত্তমান জন্মের বিদ্যা, ভূয়োদর্শন ও অভ্যাস না থাকিলে, কালিদাসাদির অনুকারী কবি হওয়া দূরে থাকুক, কাব্যের রসগ্রহণেও শক্তি জন্মে না।

বৃত্তিঃ। এবং কাব্যস্য কারণমুক্ত্বা স্বরূপমাহ।

অনু। কাব্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কাব্যের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।

বিবৃতি। তটস্থলক্ষণকে সংজ্ঞা (definition) এবং স্বরূপলক্ষণকে অবস্থাপ্রকাশ (description) বলে। নিম্নে কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ বলা হইতেছে।

তদদোষৌ শব্দার্থৌ
সগুণা-বনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।

বৃত্তিঃ। দোষগুণালঙ্কারা বক্ষ্যন্তে, ক্বাপীত্যনেনৈতদাহ যৎ সর্ব্বত্র সালঙ্কারৌ কচিত্তু স্ফুটলঙ্কারবিরহেঽপি ন কাব্যত্বহানিঃ।

অনু। দোষ, গুণ ও অলঙ্কার শেষভাগে ব্যাখ্যা করা হইবে। গুণযুক্ত, দোষরহিত, সর্ব্বদা স্ফুটালঙ্কারযুক্ত, কখনও কখনও অস্ফুটালঙ্কারযুক্ত শব্দার্থকে কাব্য বলে। *

বিবৃতি। যে শব্দার্থে দোষ থাকে না, অথচ স্ফুট বা অস্ফুট অলঙ্কার ও গুণ নিয়তই থাকে, তাহা কাব্য। গুণ রসের ধর্ম্ম; গুণ থাকিলেই রস থাকিবে, অথচ অলঙ্কার ছাড়াও রস প্রকট হয় না। কেন না, শব্দে রস থাকে না, রস থাকে অর্থে। কাজেই বলিতে হইল যে, যেপ্রকার অর্থে রস থাকে, তাহা কাব্য। বাক্যে অর্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়; অতএব সরস বাক্যই কাব্য। গুণালঙ্কার সরসতার অবয়ব বিশেষ। এই শ্লোকে স্বরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে। কাজেই যাহার আশ্রয়ে রস উদিত হয়, সেই গুণালঙ্কার প্রদর্শনপূর্ব্বক

* এই কাব্যলক্ষণটি সম্প্রতি ভালরূপে বুঝাইতে পারা যাইবে না। কারণ, এই বচনটি সমগ্র কাব্যপ্রকাশের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ উল্লাস পর্য্যন্ত শব্দ ও অর্থের রসব্যঞ্জকতাদি বিভিন্ন শক্তি বুঝান হইয়াছে;—সপ্তমে রস-বিঘাতক দোষ, অষ্টমে গুণ, নবম ও দশমে অলঙ্কার বুঝান হইয়াছে। এ গুলি না বুঝিলে "দোষহীন, গুণযুক্ত, সালঙ্কার শব্দ ও অর্থই কাব্য" এই বাক্য বুঝা যায় না। অতএব অপেক্ষা করা আবশ্যক।

কৌশলে "সরস বাক্যই কাব্য" এরূপ বর্ণনা করা হইল।

শব্দার্থের ব্যঞ্জনা শক্তির তারতম্য দ্বারা যখন কাব্যের শ্রেণীভেদ করা হয়, তখন শব্দার্থ দ্বারা কাব্য লক্ষণ করিতে বাধা কি? সরস শব্দার্থই কাব্য, ইহা কালিদাসও প্রকারতঃ বুঝাইয়াছেন। কেন না, তিনি শব্দার্থ জ্ঞানের জন্য (বাগার্থপ্রতিপত্তয়ে) উমা-মহেশ্বরকে বন্দনা করিয়াছেন। লক্ষণান্বিত শব্দ ও অর্থ মিলিত ভাবে কাব্য হয়, স্বতন্ত্র ভাবে নহে। এমন কি, আলঙ্কারিক পণ্ডিত নারায়ণ, শব্দার্থের ব্যঞ্জনা শক্তিকেই রসরূপে ব্যাখ্যা করিয়া একটা সামঞ্জস্য করিয়াছেন। নিম্নে কাব্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়েছে।

বৃত্তিঃ। যথা,—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ।
তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ।
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

অত্র স্ফুটো ন কশ্চিদলঙ্কারো রসস্যচ প্রাধান্যাৎ ন অলঙ্কারতা।

পূর্ব্বে কহিয়াছি, এই কবিতাটি প্রেম-ভক্তির অবতার পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রাণপ্রিয় বস্তু ছিল। তিনি যখনই ইহা আবৃত্তি করিতেন, তখনই ভাবের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে অশ্রুজলে ভাসিতেন। ইহার সে নিগূঢ় অর্থের দিকে এখন কয় জনের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে?

অনু। যিনি আমার কুমারীভাব হরণ করিয়াছিলেন, (১) সেই বরই (২) আমার নিকটে রহিয়াছেন, সেই চৈত্ররজনীই আজ উপস্থিত, প্রস্ফুটিত মালতীগন্ধবাহী সেই প্রৌঢ় কদম্ব বনবাতই আজ প্রবাহিত হইতেছে, আমিও সেই আমিই রহিয়াছি; তথাপি যে স্থানে পূর্ব্বে প্রেম-রস-মহোৎসব অনুভব করিতাম, রেবাতটবর্ত্তী সেই বেতসীতরুতলের জন্য চিত্ত আজ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

এই বাক্যে কোন অলঙ্কার স্ফুট হয় নাই, রস প্রধান হইয়া অবস্থান করিতেছে; কাজেই তাহা রসবদলঙ্কার সংজ্ঞা লাভ করে নাই। তথাপি চমৎকৃতিজনক কাব্য হইয়াছে।

বিবৃতি। এই শ্লোকোক্ত বাক্যটি দোষরহিত, মাধুর্য্যগুণযুক্ত, ইহাতে অস্ফুট ভাবে বিভাবনা, বিশেষোক্তি ও অনুপ্রাস অলঙ্কার আছে; আদিরসও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই

(১) কুমারীভাব হরণ করা—বিবাহ করা।

(২) বর-পতি—ভোগসমর্থ শ্রেষ্ঠপুরুষ বা যিনি কুমারীকালে চিত্তহরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার স্বামী হইয়াছেন। কিন্তু এই অর্থে রস হয়, রসাভাস হয় না, অলঙ্কারতারও আশঙ্কা হয় না, কাজেই ইহাতে বৃত্তির সঙ্গে বিরোধাশঙ্কা ঘটে।

কামিনী পতিসন্নিধানে রেবাতটবর্ত্তী উপনায়কের জন্য উৎকণ্ঠিতা এরূপ অর্থ করিলে বুঝিতে হইবে, আদিরসটি আদিরসের আভাসে পরিণত হইয়াছে, তথাপি স্বপ্রধান বলিয়া রসটি অলঙ্কার হইয়া যায় নাই। কোন আকারের স্ফুট অলঙ্কার নাই, তথাপি ইহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। যে বাক্যে, অলঙ্কার ও গুণ নাই, বুঝিতে হইবে, তাহাতে রসও জন্মে নাই, উহা কাব্যই হয় নাই। অলঙ্কার রস ছাড়িয়াও অবস্থান করে; অলঙ্কারের সহিত রসের সংযোগ সম্বন্ধ; কিন্তু গুণের সহিত সমবায় সম্বন্ধ। গুণ থাকিলে রস কিছু থাকিবেই থাকিবে। কাব্যে গুণ ও অলঙ্কার উভয়ই অভীপ্সিত।

বৃত্তিঃ। তস্তেদান্ ক্রমেণাহ।

এখন ক্রমশঃ কাব্য কতপ্রকার তাহা বলা হইতেছে।

ইদমুত্তমমতিশয়িনি

ব্যঙ্গে বাচ্যাদ্ধ্বনির্বুধৈঃ কথিত।

অনু। বাচ্যার্থ হইতে যে কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থ প্রবলতর, সেই কাব্যকে পণ্ডিতগণ ধ্বনি কাব্য বা উত্তম কাব্য বলেন।

বৃত্তিঃ। ইদমিতি কাব্যম্। বুধৈঃ বৈয়াকরণৈঃ প্রধানভূত স্ফোটরূপ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকস্য শব্দস্য ধ্বনিরিতি ব্যবহারঃ কৃতঃ; ততস্তন্মতানুসারিভিরন্যৈরপি ন্যগ্‌ভাবিতবাচ্যব্যঙ্গব্যঞ্জনক্ষমস্য শব্দার্থযুগলস্য।

অনু। কারিকাপ্রোক্ত ইদম্ শব্দে কাব্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বুধ শব্দে বৈয়াকরণকে বুঝাইয়াছে। ব্যবহার্য্য পলাশাদি শব্দ স্ফোট নামক নিত্য পলাশাদি শব্দের ব্যঞ্জক, ইহা স্থির করিয়া বৈয়াকরণগণ স্ফোটের ব্যঞ্জক ব্যবহার্য্য শব্দকে ধ্বনি নামে ব্যবহার করেন; তাঁহাদের মতাবলম্বী আলঙ্কারিকেরাও বাচ্যার্থতিরস্কারী যে ব্যঙ্গ্যার্থ, তাহার ব্যঞ্জক শব্দকেও ধ্বনি নামে ব্যবহার করেন।

বিবৃতি। বৈয়াকরণগণ একরূপ নিত্য শব্দ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, তনয়, কলস, কলত্র ইত্যাদি সমস্ত শব্দেরই একটা নিত্য মূর্ত্তি আছে। তাহার ধ্বংস নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ হইয়া উচ্চারিত শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই নিত্য শব্দকেই স্ফোট বলা হয়; উচ্চারিত শব্দদ্বারা অর্থ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। শব্দ প্রত্যক্ষ হইলে তাহার অর্থও প্রত্যক্ষ হইতে পারে; কিন্তু যে শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তাহা বর্ণদ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। যথা মানব শব্দে তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে, এবং মানব শব্দ উচ্চারণ করিবার সময়ে এই তিনটি বর্ণ ক্রমানুসারে উচ্চারণ করা হয়; ঠিক এক সঙ্গে একই উদ্যমে উচ্চারণ করা যায় না। তিনটির মধ্যে দ্বিতীয়টি উচ্চারণ করিবার সময় প্রথম বর্ণটি অপ্রত্যক্ষ বা নষ্ট হয়, এবং তৃতীয়টি উচ্চারণ করিবার সময় প্রথম ও দ্বিতীয়টি অপ্রত্যক্ষ বা নষ্ট হয়। কাজেই মানব শব্দের বর্ণত্রয় যুগপৎ উচ্চারিত না হওয়াতে মানব শব্দটি বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। অথচ প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক। এইজন্য তাঁহারা বলেন, মানবশব্দের নিত্য-

স্ফোট মূর্ত্তি আছে; মানব শব্দ উচ্চারণের সময় এক একটি বর্ণ উচ্চারণের সঙ্গে মানবের স্ফোটটি একটু একটু করিয়া বাহির হয়, শেষে অন্ত্যবর্ণ উচ্চারণ করিলেই মানব শব্দের ষোল আনা স্ফোটটা বাহির হইয়া যায় ও তাহাদ্বারাই মানবরূপ অর্থ প্রকাশ পায়। কাজেই উচ্চারিত মানবাদি শব্দ বা বর্ণশ্রেণি মানবাদি স্ফোটের ব্যঞ্জক মাত্র। স্ফোট ব্যঙ্গ্য, পদ তাহার ব্যঞ্জক; এইরূপ ব্যঞ্জকপদ ধ্বনি নামে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক শব্দার্থেরও ধ্বনি নামে ব্যবহার হয়।

বৃত্তিঃ। যথা—

নিঃশেষ-চ্যুতচন্দনং স্তনতটং
নির্ম্মৃষ্টরাগোধরঃ
নেত্রে দূরমঞ্জনে পুলকিতা
তন্বী তবেয়ং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি! দূতি! বান্ধবজনস্যা-
জ্ঞাত পীড়াগমে।
বাপীং স্নাতুমিতোগতাসি
ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকে।

অত্র তদন্তিকমেব রন্তুং গতা ইতি প্রাধান্যেনাধমপদেন ব্যজ্যতে।

অনু। উৎকৃষ্টতম কাব্য বা ধ্বনি কাব্যের একটি দৃষ্টান্ত;—তোমার উরোজতট সম্পূর্ণরূপে চন্দনলেপশূন্য হইয়াছে, অধরের রাগ তিরোহিত হইয়াছে,—নেত্রদ্বয় সম্পূর্ণরূপে অঞ্জন শূন্য হইয়াছে, তোমার শরীর রোমাঞ্চে পূর্ণ রহিয়াছে, বান্ধবজনের অজ্ঞাত দুঃখকারিণি অয়ি দূতি তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছিলে, সেই অধমের নিকট যাও নাই।

এ স্থলে অধম পদের ব্যঞ্জনা দ্বারা বাচ্যার্থ তিরস্কৃত হইয়াছে এবং তুমি তাহার নিকটই মনোজ-শাসনের বশবর্ত্তিনী হইয়া গিয়াছিলে, এরূপ অর্থ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। (অন্য উল্লাসে বিশেষ ব্যাখ্যা আছে)।

অতাদৃশি গুণীভূতব্যঙ্গ্যং
ব্যঙ্গ্যেতু মধ্যমম্।

বৃত্তিঃ। অতাদৃশি বাচ্যাদনতিশায়িনি।

অনু। যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ হইতে উৎকৃষ্ট হয় না, তাহাকে মধ্যম বা গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকাব্য বলে।

বৃত্তিঃ। যথা—

গ্রামতরুণং তরুণ্যা নববঞ্জুল-মঞ্জরী
সনাথকরম্।
পশ্যন্ত্যা ভবতি মুহুর্ম্মলিনা মুখচ্ছায়া।

অত্র বঞ্জুললতাগৃহে দত্তসঙ্কেতা না গতা ইতি ব্যঙ্গ্যং গুণীভূতং তদপেক্ষয়া বাচ্যস্যৈব চমৎকারিত্বাৎ।

অনু। মধ্যম কাব্যের বা গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কাব্যের দৃষ্টান্ত;—

স্বকীয় বন্ধু গ্রাম্যযুবাকে নববঞ্জুলমঞ্জরী করে লইয়া দণ্ডায়মান দেখিয়া তরুণীর মুখকান্তি নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিল।

ইহাতে ধ্বনি হইল যে, তরুণী নিজের তরুণ-বন্ধুর সহিত নববঞ্জুললতাকুঞ্জে দেখা করিবার জন্য সঙ্কেত করিয়াও ভ্রমে দেখা করেন নাই। কিন্তু, এই ব্যঙ্গ্যার্থটি তেমন

চমৎকারজনক নহে; প্রত্যুত শ্লোকের নববঞ্জুলমঞ্জরী ইত্যাদি শব্দার্থই তদপেক্ষা অধিকতর চমৎকারজনক। (বিশেষ ব্যাখ্যা গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের অধ্যায়ে আছে) কাজেই কাব্যটি ধ্বনি না হইয়া মধ্যম বা গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হইয়াছে।

শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রং অব্যঙ্গং ত্ববরং স্মৃতম্। ৫।

বৃত্তিঃ। চিত্রমিতি গুণালঙ্কারযুক্তং অব্যঙ্গমিতি স্ফুটপ্রতীয়মানার্থরহিতম্। অবরং অধমম্।

অনু। যে কাব্যে শব্দ বা অর্থের বৈচিত্র্য আছে, অর্থাৎ যাহা গুণালঙ্কারযুক্ত, কিন্তু যাহাতে প্রতীয়মানার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ অত্যন্ত অস্ফুট, তাহাকে অবর বা অধম কাব্য বলে।

বৃত্তিঃ। যথা,—

স্বচ্ছন্দোচ্ছলদচ্ছকচ্ছকুহর-
　　চ্ছাতেতরাম্বুচ্ছটা-
মূর্চ্ছন্মোহমহর্ষিহর্ষবিহিত-
　　স্নানাহ্নিকাহ্নায় বঃ।
ভিন্দ্যাদুদ্যদুদারদর্দুরদরী
　　দীর্ঘাদরিদ্রদ্রুম-
দ্রোহোদ্রেক-মহোর্ম্মিমেদুরমদা
　　মন্দাকিনী মন্দতাম্॥

অনু। শব্দচিত্র অধম কাব্যের দৃষ্টান্ত,—

অনর্গল ভাবে উচ্ছ্বসিত নির্ম্মল গিরিকচ্ছ বিবর দ্বারা, বলিষ্ঠ বারির কান্তি দ্বারা, অপগত-মোহ মুনিগণের সহর্ষ স্নানাহ্নিক ক্রিয়াম্বিতা প্রবাহবৃদ্ধি বশতঃ জল প্রবেশ দ্বারা, ভঙ্গ বশতঃ প্রকটিত উদার দর্দুর দরীর দৈর্ঘ্য যাহাতে, ঈদৃশী, এবং অদরিদ্র দ্রুমের সঙ্গে দ্রোহের উদ্রেক বশতঃ সঞ্জাত মহাতরঙ্গ দ্বারা যাহার প্রবাহ মদ-মেদুর, ঈদৃশী মন্দাকিনী আপনাদের মন্দতা নষ্ট করুন। *

ইহা শব্দ চিত্র অধম কাব্য।

অর্থ চিত্র অধম কাব্য।

---

* পণ্ডিতবর বসন্ত বাবুর অনুবাদ অতিমাত্র প্রামাণিক হইলেও পণ্ডিত-জন-যোগ্য। উহাকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য আমরা অনুবাদের অপেক্ষাকৃত সরল অনুবাদ এখানে ফুট্‌নোটে পত্রস্থ করিলাম।— বান্ধব সম্পাদক।

মন্দাকিনী গঙ্গা তোমাদিগের মন্দমতি অথবা পাপবুদ্ধি অতিক্রত অপনোদন করুন। মন্দাকিনী কিদৃশী? যাঁহার জলে বিনা বাতাসেও ঢেউ খেলায়,—যাঁহার নির্ম্মল জলরাশি, কূলভূমি অর্থাৎকাছাড়ের কুহরে কিংবা বিবরে, অতি বড় বেগশালিনী ছটায় বিলসিত হয়,—যাঁহার জল-স্পর্শে মোহমুক্ত মহর্ষিরাও হর্ষাতিশয়ে স্নান ও আহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন,—যাঁহার কন্দর-নিচয়ে বড় বড় ভেকেরা প্রকাশমান হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করে;—যাঁহার তরঙ্গমালা, তটদেশশোভি শাখাপল্লবসমন্বিত সুদীর্ঘ তরুনিচয়ের পাতন-কামনায়, স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয়, এবং যিনি ঐরূপ তরঙ্গলীলায় সকল সময়েই মদগর্ব্বে লীলাময়ী, সেই মন্দাকিনী তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

বিনির্গতং মানদমাত্মমন্দিরাৎ
ভবত্যুপশ্রুত্য যদৃচ্ছয়াপি যম্।
সসম্ভ্রমেন্দ্রদ্রুতপাতিতার্গলা
নিমীলিতাক্ষীব ভিয়াঽমরাবতী।

অনু। যে মানপ্রদ রাজাকে নিজ গৃহ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণাদির জন্য নির্গত হইতে দেখিলেও অমরাবতী নগরী সসম্ভ্রমে ইন্দ্র কর্ত্তৃক রুদ্ধকপাটা হইয়া যেন ভয়-বশতঃই কপাটরূপ নেত্র নিমীলন করিয়া থাকে।

এস্থলে বাক্যার্থ নির্দ্দোষ, সগুণ এবং অলঙ্কার ও বাচ্যার্থ অতি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু ব্যঙ্গ্য রাজবিষয়ক অনুরাগ বা ভাব অতি অস্ফুট; অতএব ইহা ব্যঞ্জনার অভাব বশতঃ অধম কাব্য হইয়াছে। (ইয়ুরোপীয় আদর্শে রচিত বাঙ্গালা কাব্য অর্থচিত্র অধম কাব্যের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। দর্পণের মতে অবর কাব্য কাব্যই নহে।

ধ্বনি, গুণীভূত ব্যঙ্গ্য ও অবর কাব্যের আরও দৃষ্টান্ত পরে প্রাপ্ত হইবে। এখন দিগ্‌দর্শন করান হইল মাত্র।

বৃত্তিঃ। ইতি কাব্যপ্রকাশে কাব্যস্য প্রয়োজন-কারণ-স্বরূপ-বিশেষ-নির্ণয়ো নাম প্রথম উল্লাসঃ।

অনু। কাব্য প্রকাশ গ্রন্থে কাব্যের প্রয়োজন-কারণ-স্বরূপ বিশেষ নিরূপণ নামক প্রথম উল্লাস সমাপ্ত হইল।

শ্রীবসন্তকুমার রায়।

বর্ষ-বিদায়।

(১)

একটি বৎসর এই যায় ডুবে যায়,
অনন্ত-অনাদি-গতি সময়ের গায়।
একটির পর একটি বৎসর,—
একটি একটি জীবনের স্তর,—
ক্ষুদ্র বুদ্‌ বুদ্‌ সম পলকে ফুটিয়া,
পলকে কালের কোলে যায় মিশাইয়া।

(২)

অনুপল, পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, প্রহর,
দিবা-রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর,
শতাব্দী, সংবৎ, যুগ, যুগান্তর,—
যুগের সমষ্টি,—দীর্ঘ মন্বন্তর,—
এ সবি ত একি পথে অবিশ্রান্ত ধায়,
কোথা হ'তে আসে, যায়, কে জানে,
কোথায়?

(৩)

কোন্‌ ভগীরথ পথ দেখাইয়া যায়?
গণ্ডুষে গ্রাসিতে পারে সে জহ্নু কোথায়?
পার, পরপার, কোথায় ইহার,
কৈ সে হরজটা, কোথা হরিদ্বার?

মিশেছে এ মহা গঙ্গা কোন্ সিন্ধু জলে,
উদ্ধারিতে কার ভস্ম, কোন্ রসাতলে ?

(৪)

গতিই স্বভাব নাহি স্থিতি এক পল,
সময়-প্রবাহে ভাসে সচল অচল!—
একটানা গতি,—নাহিক বিরতি,—
তিষ্ঠে এক তিল, কাহার শকতি ?
ভেসে যায় চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারাকুল,
শরতের স্রোতে যথা বিজয়ার ফুল।

(৫)

জোয়ারে না ফিরে জল নাহি ডাকে বান,
খেলে না তরঙ্গ এক গর্জ্জে না তুফান ;
ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—তিন
কালের বিভাগ; কিন্তু অর্থহীন।—
বর্ত্তমান মিছা কথা,—পলকে পলকে,
ডুবে শুধু ভবিষ্যৎ অতীতের বুকে।

(৬)

লইয়া সুখের ডালি আসিয়া না আসে,
আগে রহে ভবিষ্যৎ দূরে দূরে হাসে!
দৃষ্টির সীমায় রাখে নামাইয়া
সুখের পশরা, নয়ন ঠারিয়া,
ছদ্ম বর্ত্তমান-বেশে গা ঘেষিয়া যায়,
অতীতের নীলাম্বরে বদন লুকায়।

(৭)

পশ্চাতে অতীত নিত্য উঠিছে ফাঁপিয়া,
তিমির তনুর দৈর্ঘ্য ক্রমে বাড়াইয়া।
বর্ত্তমানরূপী ভবিষ্যে সবার,
দুই হাতে পুরে গ্রাসে আপনার।
ধর ধর করি সবারে গ্রাসিতে চায়,
কেহ ধরা পড়ে, কেহ আগে স'রে যায়।

(৮)

হাসিমাখা, অশ্রু-ধোয়া কত বর্ত্তমান,
কত ভবিষ্যৎ অতীতে লইল স্থান!
তুমিও বরষ, যাও তবে যাও,
অতীতের বুকে আঁধারে লুকাও ;—
যাবে যদি,—রেখে কেন যাও স্মৃতিটিরে ?
পায়ে ধরি, হিয়া সনে নাও ওটি ছিঁড়ে।

(৯)

স্মৃতির সে ছায়া-বাজী কে চাহে দেখিতে ?
চাহি ভুলিবারে, চাহি ঘুমিয়া বাঁচিতে।
স্মৃতি-পটে আঁকা, থাকে সুখ-রাকা,
চাহি না সে সুখ,—তাও জ্বালা মাখা!
স্তরে স্তরে জ্বলে তার শ্মশান-অনল,
উঠে হাহাকার, ধারে বহে অশ্রুজল।

(১০)

তোমা হেন কত বর্ষে দিয়াছি বিদায়,
রেখে যাবে যাও স্মৃতি,—কে সহিতে চায়
পর-ব্রণ-ব্যথা ?—যাও তুমি যাও,
নিবে আয়ুধন ?—নাও তাও নাও।
লভ গে বিশ্রাম,—ফুরা'ল তোমার পথ।
অনন্তের যাত্রী, থামে না আমার রথ।

(১১)

যাও তুমি, যাই আমি, সকলেই যায়,
বিছুটীর মালা,—স্মৃতি সবারি গলায়।
ভবে যত কায়া,—অনন্তের ছায়া,
নহে ভোজবাজী, নহে মিছা মায়া।
বিপাকে বিকৃত হই, পাই রূপান্তর,
এ যাত্রার যাত্রী আমি অজর অমর।

শ্রী——সু

কে তুমি ?

"কে তুমি ?" তা কোন্ জন বলিবে আমায় ?
সুনীল-গগন কোলে,
সুশোভন তারাদলে,
বিরাজে চন্দ্রমা যবে সুধায়েছি তায় ;
দেয় না উত্তর কিছু হে'সে চলে যায়।

সুধায়েছি দিবাকরে ত্রিসন্ধ্যা-সময়ে,
আমি তত্ত্ব অভিলাষী,
তাঁর সুধু রৌদ্র হাসি,
সে হাস্যরহস্যতত্ত্ব ভাসে না হৃদয়ে ;
তাই সুধাইনু পুনঃ কমল-নিলয়ে।

সুমন্দ পবনযোগে সরসী সলিলে,
মৃদুল তর-তরঙ্গ,
বহে কত করি রঙ্গ,
পঙ্কজ-বিকাশ-হাস্য করে কতূহলে ;
"কে তুমি ?" সন্ধান তার কিছু নাহি বলে।

সুধাইনু তব তত্ত্ব গিরি-পারাবারে,
উভয়ে গম্ভীর স্তব্ধ,
না হইল সারা শব্দ,
ফিরিনু নিরাশ-মনে সুধাই কাহারে ;
"কে তুমি ?" উত্তর তার কে দিবে আমারে।

"কে তুমি ?" হে কৃপাময় ! বল কৃপা ক'রে,
বেদান্ত তোমার অন্ত,
না পেয়ে করে সিদ্ধান্ত,
ব্রহ্ম তুমি নিরাকার অনন্ত-সংসারে ;
প্রপঞ্চ বিবর্ত্ত-ছলে ঘোষিছে তোমারে।

"কে তুমি ?" তা কোন্ জন জানে চরাচরে,
সৃষ্টিস্থিতিলয় লীলা,
কেবল তোমার (ই) খেলা,
বিশ্বপ্রভু—তুমি দেব, বিশ্ব তব তরে ;
বুঝাও তোমার তত্ত্ব "কে তুমি ?" আমারে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ সাংখ্যশাস্ত্রী।

সহানুভূতি ও সহমর্ম্মিতা।

আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্, সুকবি-সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, "সহানুভূতি" ও "সহমর্ম্মিতা" এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে ভারতীতে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মুখ্য কথা এই যে, সহানুভূতি শব্দ সকল কারকে প্রয়োগ করা যায় না। সেই সেই স্থলে সহমর্ম্মিতা শব্দ প্রয়োগ করিলে, ভাষার একটু সম্পদ্ বাড়িবে। তিনি তাঁহার কথা সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে,—

"ইংরেজী Sympathyর প্রতিশব্দ সহানুভূতি আমাদের ভাষায় অনেকটা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু, এই শব্দ প্রয়োগে কতকটা অসুবিধা হয়, Sympathiser এর অনুবাদ কি করিবে? সহানুভূতিকারী? বড় বদ শুনায়। সহানুভূতির পরিবর্ত্তে আমরা যদি সহমর্ম্মিতা শব্দ ব্যবহার করি, তাহা হইলে ওই অভাব ঘুচিতে পারে। এই শব্দের প্রসার অপেক্ষাকৃত বেশী। Sympathiser এর অনুবাদে আমরা সহমর্ম্মী বলিতে পারি,—শুনিতে খারাপ শুনায় না। যেমন সহধর্ম্মী, সেইরূপ সহমর্ম্মী, এই শব্দ প্রয়োগে ভাষার মর্ম্মও বজায় থাকে—তাহার বিরোধী হয় না।"

বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মাতৃভাষাভক্ত ও কর্ত্তব্যানুরক্ত সাহিত্যিক। তাঁহার মত সাহিত্যসেবীরা বাঙ্গালা ভাষার শব্দসম্পদ্ এবং শোভা ও সামর্থ্য বিষয়ে মাঝে মাঝে এইরূপ আলোচনা করিলে, আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের নিশ্চয়ই প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সে আলোচনার জন্য একটা চিরপ্রথিত প্রণালী চাই। জ্যোতি বাবু, সহানুভূতি ও সহমর্ম্মিতা শব্দের তুলনা প্রসঙ্গে, যে পথে, যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অভিলষিত-সিদ্ধির সহায়তা হইবে, এমত আমাদের বোধ হয় না।

ইহা সকলেরই জ্ঞাত কথা যে, সহানুভূতি শব্দ বাঙ্গালায় নিতান্ত আধুনিক। সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও সহানুভূতি শব্দের প্রয়োগ আছে, এমন আমরা জানি না। এখন যে অর্থে সহানুভূতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেই অর্থে "সমদুঃখসুখতা" শব্দ ব্যবহৃত হইত। যথা অভিজ্ঞানশকুন্তলে,—

"পৃষ্টা জানন সমদুঃখসুখেন বালা,
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।"

মহামতি মনিয়র উইলিয়ম যখন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার প্রসিদ্ধ অভিধান প্রণয়ণ করেন, তখনও সহানুভূতি শব্দ সৃষ্টি হয় নাই। বস্তুতঃ, বাঙ্গালা প্রকৃতিবাদের পূর্ব্ববর্ত্তি পুরাতন ও নূতন কোন অভিধানেই সহানুভূতি শব্দ গৃহীত থাকা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এ শব্দ নূতন হইলেও, ইহা সিদ্ধ বস্তুর মত বাঙ্গালার হাড়ে মাংসে মিশিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় এইরূপ অল্লাক্ষরগ্রথিত অর্থপ্রকাশক শব্দ, খুব বেশী প্রবিষ্ট হয় নাই।

কিন্তু, জ্যোতি বাবুর বিবেচনায়, এ শব্দ, বহুপ্রচলিত হইয়াও, সকল কারকে প্রযোজ্য নহে। তাঁহার মতে Sympathy অর্থে সহানুভূতি সুখব্যবহার্য্য বটে; কিন্তু Sympathiser অর্থে কি বলা হইবে? এ স্থলে, আমরা বিনয়ের সহিত বলিব যে, পুরাতন সংস্কৃতপদ্ধতির অনুসরণ করিলে, 'সহানুভাবী' অথবা 'সহানুভাবক' এই উভয় শব্দ দ্বারাই ত কার্য্য চলিতে পারে। অনুভাবী ও অনুভাবক এই উভয় শব্দই ব্যাকরণ-সঙ্গত, এবং উভয়ই প্রসিদ্ধ কবিপ্রয়োগে প্রাচীন কাল হইতে সম্মানিত। যথা কালিদাসের রচনায়,—

"অহমপি ইদানীমবগতার্থা, কিং পুনর্যথালিখিতানুভাবী এষঃ।"

জ্যোতি বাবুর প্রস্তাবিত সহমর্ম্মিতা শব্দ শ্রুতিসুখাবহ কি না, তাহা বলিতে পারি না। উহাতে শ্রুতিসুখ-সম্ভাবনা থাকুক আর নাই বা থাকুক, উহা যদি ব্যাকরণ অনুসারে বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে উহা দ্বারা নিশ্চয়ই আমাদের শব্দের সঞ্চয় ও সম্বল একটুকু বাড়িত,—এক Sympathy বুঝাইতে সহানুভূতি ও সহমর্ম্মিতা এ দুইটি শব্দই প্রয়োগ করা যাইত। কিন্তু, সহমর্ম্মী, এই শব্দ ব্যাকরণ অনুসারে সঙ্গত হয় কি? আর উহা দ্বারা অনুভূতির অর্থ কোন দিক্ দিয়াও আসিতে পারে কি? আমরা ব্যাকরণের কথা মোটামুটি যতদূর বুঝি, তাহাতে বোধ হয় যে, সহধর্ম্মী শব্দের অনুকরণে সহমর্ম্মী শব্দের প্রয়োগ করা কোন অংশেও শাস্ত্রসম্মত কিংবা রীতিসঙ্গত নহে। সহধর্ম্মী শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে শাস্ত্র আছে। যথা কাশিকাধৃত পাণিনীয় সূত্রে,—

ধর্ম্ম-শীল-বর্ণান্তাচ্চ। ৫। ২। ১৩২

অর্থাৎ যে সকল সমস্তপদের অন্তে ধর্ম্ম, শীল অথবা বর্ণ শব্দ আছে,তাহাদিগের উত্তর মত্বর্থে ইন্ প্রত্যয় হয়। এই সূত্র অনুসারে আমরা সহধর্ম্মী পাই; এবং সহধর্ম্মী পাই বলিয়াই সহমর্ম্মী পাই না। কেন না, এস্থলে ধর্ম্মপদান্ত শব্দের উত্তরই ইন্ প্রত্যয়ের ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা মর্ম্মপদান্তের জন্য নহে; এবং সুতরাং ই তাহার গতিরোধক।

সহ শব্দের এক অর্থ সমান। সমানার্থক সহ শব্দের সহিত মর্ম্মপদের সমাস করিলে, কর্ত্তা বুঝাইতে সহমর্ম্মা এবং ভাব বুঝাইতে সহমর্ম্মতা হইতে পারে। কিন্তু সহমর্ম্মী কিংবা সহমর্ম্মিতা হইবে কোন্ প্রকারে? আর যদিই বা কোনপ্রকারে হয়, তাহা হইলেও সুদূর-বর্ত্তিনী লক্ষণার সাহায্য বিনা, মর্ম্ম শব্দে মর্ম্মনিহিত সুখদুঃখের অনুভূতি বুঝাইবে কেন? উল্লিখিতরূপ অহেতুকী লক্ষণা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি শাব্দিক-শিরোমণিদিগের একান্ত মতবিরুদ্ধ। যথা, সাহিত্যদর্পণে,—

"হেতুং বিনাপি যস্য কস্যচিৎ সম্বন্ধিনো লক্ষণেঽতিপ্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যত উক্তম্। রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাপীতি।"

শুধু মর্ম্মন্ শব্দ কষ্টে সৃষ্টে মর্ম্মী হইতে পারে। তাহার একপ্রকার বিধান আছে। যথা,—পাণিনির পঞ্চমাধ্যায়ে।

সংজ্ঞায়াং মন্মাভ্যাং। ৫। ২। ১৩৭

কষ্টে সৃষ্টে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই সূত্র দ্বারা সংজ্ঞা শব্দ অথবা নাম সৃষ্টি করাই বৈয়াকরণদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ইহা ক্রমদীশ্বর অতি স্পষ্ট কথায় বুঝাইয়াছেন। যথা, তদীয় তদ্ধিত-পরিশিষ্টে —"মন্মাভ্যাং নাম্নি"। ১৫৮। মন্ ভাগান্ত ও মান্ত শব্দের উত্তর নাম বুঝাইতে ইন্ প্রত্যয় হয়। যথা,—দামিনী। "অনাম্নি তু" অর্থাৎ যে খানে নাম নহে, সেখানে দামবান্ হইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা যেমনই হউক, মর্ম্মন্ শব্দ সমাসের অন্তপদ হইলে, উহার উত্তর, বোধ হয়, কোন পথেই আর ইন্ প্রত্যয় চলে না। কেন না, তাহা হইলে ধর্ম্মান্ত শব্দের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা হইত না।

ইহা দ্বারা আমাদিগের কথার ফলিত অর্থ এই হইতেছে যে, সহমর্মী শব্দ যখন শব্দ শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ নহে, তখন Sympathiser অর্থে সহানুভাবী শব্দ ব্যবহার করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

আমরা যাহা লিখিলাম, তাহাই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইয়াছে, এমন কথা আমরা সাহস-সহকারে বলিতে পারি না। মনে যাহা ভাল বোধ হইয়াছে, তাহাই সরল মনে লিখিয়াছি; এবং জ্যোতি বাবুর দার্শনিকতা ও উদারতা সম্বন্ধে অতি গভীর শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই, এত কথা লিখিতে সাহস পাইয়াছি। তিনি দয়া করিয়া আমাদিগের কথাগুলি পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমরা বাধিত হইব। আমাদিগের যদি ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহা প্রীতির সহিত স্বীকার করিব। বঙ্গভূমি নানাবিধ শস্যসম্পদে, এবং বঙ্গভাষা সর্ব্বপ্রকার সুখশ্রাব্য, সুসঙ্গত, সদর্থসম্ভাব শব্দসম্পদে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া, বাঙ্গালির শক্তি ও গৌরব বর্দ্ধন করুক, ইহাই আমাদিগের নিত্য প্রার্থনা।

সধবার বৈধব্য

অথবা

প্রেমের শ্মশান।

প্রকৃত ঘটনামূলক আখ্যায়িকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমেরিকার অন্তর্গত সিকাগো নগরী ইদানীং অবনীর অমরাবতী স্বরূপা। সিকাগো হইতে, রেলের পথে, প্রায় আড়াই শত মাইল দূরে, একটি অভিনব-প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-নগরে, কএকটি সমৃদ্ধ বিষয়ী, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, নূতন বসতি স্থাপন করিয়াছেন। আমরা পাঠককে, নগরের উপকণ্ঠে, তাঁহাদিগেরই এক জনের রম্যনিকেতন-সন্নিহিত রমণীমোহন কুসুমকাননে, ক্ষণকালের জন্য, বিচরণ করিতে অনুরোধ করিব।

উদ্যানের চারিদিকে বড় বড় স্নিগ্ধ-শ্যামল ছায়াতরু; মধ্যে—স্থানে স্থানে—লতা-বিতান-রচিত মনোহর কুঞ্জমালা। কুঞ্জগুলির ভিত্তি শ্বেত-নীল-পীত-পাটল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণরঞ্জিত মর্ম্মর-প্রস্তরে খচিত; চারি পার্শ্বে নানাপ্রকার কুসুমিত লতার কমনীয় বেষ্টনী; এবং পুরোভাগে জলের ফোয়ারা। ছোট ছোট পাখী, ফোয়ারার কাছে আসিয়া, ফোয়ারার আলবাল হইতে, ঠোঁটে একটু একটু জল তুলিয়া নিতেছে; আবার উড়িয়া

যাইয়া, অদূরে—কোন বৃক্ষের ডালে বসিয়া, অনতিস্ফুট সুখ-শ্রুত স্বরে, পাখীর গীত গাইতেছে।

ঐরূপ একটি নয়নানন্দ কুঞ্জে, বেলা ঠিক্ দুই প্রহরের সময়ে, একখানি মর্ম্মর-প্রস্তরের বিস্তৃত আসনে, একটি যুবক এবং আর একটি যুবতী, একে অন্যের হাতখানি হাতে তুলিয়া লইয়া, উপবিষ্ট রহিয়াছে; এবং একে অন্যের মুখচ্ছবি নিরীক্ষণে, যেন রূপের কেমন এক-প্রকার মোহে—আত্মহারা হইয়া, মৃদু মৃদু হাসিতেছে। দুইয়েরই সে সলজ্জ হাসি যেন এই এক কথা কহিতেছে,—"এ সংসারে এমন মধুমাখা সৌন্দর্য্য আর কোথাও আছে কি ?" কিন্তু যুবতীর হাসিটুকু নৈশদামিনীর অল্পায়ত বিকাশ, অথবা নিদাঘ-শুষ্ক শীর্ণ গোলাপের শোভার মত, বিষাদমলিন।

যুবতীর নাম লরা; বয়স এইক্ষণ আঠার যাইয়া উনিশে প্রবৃত্ত মাত্র। যুবতীর পিতা আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ ধনী;—রেলের রাজা বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি রেল-রোডের বাণিজ্যে বহু সহস্র লোক খাটা-ইয়া, প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছেন; এবং সেই ধনরাশির প্রভাবে, একটি দুর্গম আরণ্য প্রদেশে, রেলের নূতন পথ খুলিবার উদ্দেশে, সম্প্রতি নূতন উৎসাহে কার্য্য করিতেছেন।

যুবতীর মাতা স্পেন-দেশীয়া উচ্চসম্রান্ত ভদ্র-কুল-বালা। তিনি প্রথম বয়সে বড়ই স্বিখ্যাত রূপসী ছিলেন। তাই লরা, মায়ের রূপে অসামান্য রূপবতী হইয়া, আমেরিকার সেই সুদূরবর্ত্তি বনভূমিতে, রূপে ও স্বভাব-সৌরভে, বনকুসুমের মত ফুটিয়াছে; এবং মায়ের কটিপরার্দ্ধবিলম্বি কৃষ্ণমসৃণ ঘন কেশ-রাশি, কজ্জলাক্তবৎ মনোরম চক্ষু, কান্ত-মনোহর ভ্রূচাপ, এবং বাদামি ঢঙের ঢল-ঢল মুখখানি, যেন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া, আমেরিক সুন্দরীদিগকে দূরে ফেলিয়াছে।

যুবার নাম (Horace Travers) হোরেস ট্রাভর্স্। যুবাও যার-পর-নাই প্রিয়দর্শন ও প্রভাব-সমুজ্জ্বল। বয়স সম্ভবতঃ পঁচিশ বৎ-সর। উহার চক্ষের সৌম্য দীপ্তি এবং আকৃ-তির রমণীয় মহিমা দর্শনে উহাকে স্পষ্টই সাধারণ ভদ্রশ্রেণির উপরিস্থ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, ঐ বয়সেই উহার মুখচ্ছবির মাধুরী, হৃদয় ও মনের অতিমাত্র গাম্ভীর্য্য এবং অভি-মানের কঠোরতায় একটুকু আবৃতবৎ।

যুবক ও যুবতীর মধ্যে সে জন-মানুষ-সম্পর্কশূন্য নিভৃত-নিকুঞ্জে যে কথোপকথন হইতেছিল, পাঠক তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করিলে, উভয়েরই অধিকতর পরিচয় পাই-বেন। যুবক বলিল,—"লরা, এক মাস ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখন তবে যাই ?

লরা কহিল,—"কৈ, তোমার প্রতিশ্রুত এক মাস ত এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই। তুমি গত বৎসর প্রতিশ্রুতি দিয়াছ যে, এই সময়ে সে মাসটিই তুমি আমার এখানে থা-কিবে। সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?"

হোরেস। "না লরা, ভুলি নাই। কিন্তু আমি যখন তোমার পিতার সে অশ্রুতপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক অভিমানের কথা স্মরণ করি, তখন তোমাকেও আর মুখ দেখাইতে

আমার ইচ্ছা হয় না।—কেন? তিনি ত তোমার সমক্ষেই স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, যে যুবা নিজের বিষয়-বুদ্ধি-কৌশলে অন্ততঃ পঁচিশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে নাই, এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহের সময় পঁচিশ লক্ষ টাকাও যৌতুক দিতে সমর্থ হইবে না, তাহাকে কন্যা-দান দূরে থাকুক ভদ্রলোক-শ্রেণীতে গণনা করিতেও তিনি সম্মত নহেন। ইহার পর আমি কেমন করিয়া আর তোমাদিগের বাড়ীতে যাতায়াত করিব; এবং তোমাকেই বা আমার বস্তু-জ্ঞানে নির্ভয়ে হৃদয়ে পুষিব?"

লরা। "তুমি আমার পিতার কথা ছাড়িয়া দাও। তিনি বিষয়বাণিজ্যে স্বয়ং ক্রোড়পতি হইয়া অর্থবিত্তশূন্য অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসন্তানকেও ইতর লোক জ্ঞানে অবজ্ঞা করেন। তাঁহার ঐ এক রোগ। বুঝি এ জীবনে ইহার আর প্রতীকার হইবে না। কিন্তু আমার মা তোমাকে কিরূপ ভালবাসেন, তাহা তুমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে কি? অমন অমায়িক ভালবাসা কি এই পৃথিবীর সকল স্থানেই সুলভ? আমার মা যখন, আমার এই হাত খানি তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিয়াছেন যে, "আজি হইতে আমার লরা তোমার হইল, তখন ধর্ম্মের চক্ষে আমি তোমারই, তুমিও আমার। মায়ের এ বাক্য কি তুমি কোন দিনও হৃদয় হইতে পুঁছিয়া ফেলিতে পারিবে?"

হোরেস। "তোমার মা প্রকৃতই স্নেহ-করুণাময়ী দেবতা,—দেবতা হইতেও উন্নত-হৃদয়া। তিনি যেমন বড় মানুষের মেয়ে, তেমন তাঁহার বড় নজর; বড় আকাঙ্ক্ষা। আমি যে তোমায় এত ভক্তি করি, এত ভাল-বাসি, তাহাও কতকটা তোমার ঐ মায়ের দিকে চাহিয়া। তুমি যেমন পাইয়াছ মায়ের অতুল রূপ, তেমনই পাইয়াছ মায়ের অপ্রতিম গুণ-রাশি। তোমার মত সরল-হৃদয়া ও সুকোমল-স্বভাবা রমণীর উপাসনা করিতে পারিলে, পুরুষের ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্র মঙ্গল হয়; পৃথিবীই তাহাকে স্বর্গসুখের পূর্ব্বস্বাদ প্রদান করে। কিন্তু লরা ইহাও তুমি মনে রাখিও যে, পুরুষের যদি পুরুষকার,—পুরুষোচিত প্রতিজ্ঞারূঢ়তা ও মহত্ত্বটুকু না থাকে, তাহা হইলে কোন শিক্ষিতা রমণী কখনও তাহাকে মনুষ্যজ্ঞানে স্পর্শ করিতে পারে না।"

লরা। "প্রিয়তম! আমি অত কথা বুঝি না। তুমি আমাকে তোমার প্রাণের পাথর-চাপা কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া বল? আমার এখন কি গতি হইবে? তুমি অর্থের উপাসনায় অথবা অভিমানের উত্তেজনায়, আমায় ভুলিয়া জীবন ধারণ করিতে পার। পুরুষের চিত্ত ও চরিত্র চিরকালই এইরূপ। কিন্তু, আমি অভাগিনী তোমায় ভুলিয়া, সংসারের কোন সুখেই ত প্রাণে শান্তি পাই না। তোমাকে একদিন প্রাণনাথ বলিয়াছি; পুরোবর্ত্তি অনন্ত কালই তুমি আমার প্রাণনাথ। আমার এ প্রাণ কি আমি আবার ঘরে ফিরাইয়া দিতে পারিব?"

হোরেস। "কেন বল, মনে করিয়া দিলে কেন? আমিও ত তোমার মায়ের কাছে আমার প্রাণের কথা খুলিয়া কহিয়াছি। বলিয়াছি ত যে, ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমিই আমার সহধর্ম্মিণী। আমি যত কাল জীবিত থাকিব, তত কাল, নিদ্রা শয়নে, কিবা জাগরণে, তোমার ঐই অনিন্দ্যসুন্দর এঞ্জেলিক মূর্ত্তিখানি সর্ব্বদাই হৃদয়ে ধ্যান করিব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি, পঁচিশ লক্ষ টাকার কাগজ সংগ্রহ করিয়া, তোমার পিতার হস্তে আনিয়া নিজেদের যৌতুক-স্বরূপ উপহার দিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত, তোমাদিগের প্রাসাদে দূরে থাকুক, তোমাদিগের এ নগরেও আর ফিরিয়া আসিব না।"

নরা। "হা অদৃষ্ট! তবে কি আমার এত আদরের এই দেহপ্রাণের মূল্য পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র? আমার এ চোখ দুটির মূল্য কত হইবে," বলিতে পার? তুমিই না হোরেস, সোহাগে সুন্দরী বলিয়া থাক যে, তোমাদিগের এই আমেরিকায় এমন আর এক যোড়া চোখ না কি কোথাও আর কখনও দেখিতে পাও নাই।"

হোরেস। "সত্যই প্রিয়তমে। আমি আমার এ জীবনে, এ দেশে, কিংবা দেশান্তরে, কোন স্থানেও, এমন সুন্দর, এমন শ্যাম-সুকোমল, এমনই সুধারাশিপূর্ণ টল-টল চক্ষু চক্ষে দেখি নাই। তোমার চক্ষু যেমন সুন্দর; চক্ষের চাহনি, চিত্রিতবৎ বাঁকানো ভুরু দুটি, —তোমার গোলাপি ঠোঁট, গণ্ডস্থলি চূর্ণ-কুন্তল,—ফলতঃ তোমার এই সুঠাম শরীরের সমস্ত অবয়বই, সমুদয়ই অপরূপ সুন্দর। কিন্তু, পাঁচ লক্ষ দূরে থাকুক, পাঁচিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রাও এমন মনোমোহন রূপের মূল্য হয় না। এ রূপের প্রকৃত মূল্য ভক্তি ও প্রীতি,—অগাধ ভক্তি ও অচলা প্রীতি,—অথবা ভক্তের অতল প্রাণের প্রাণভরা ভালবাসা। কিন্তু আমার এই অগাধ ভালবাসার উপযুক্ত মূল্য অবধারণ হইল কৈ?—যদি হয় ত—"

নরা এবার স্বামীর মুখের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিল,—"থাক্ থাক্! ও কথা আর মুখে আনিও না,—আমায় আর লজ্জা কিংবা কষ্ট দিও না।—তোমার এখন কত লক্ষ টাকা সঞ্চয় হইয়াছে, আমায় সত্য বল।"

হোরেস। "কথা ত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না?"

নরা। "তুমি কি পাগল? আমি আমার মায়ের কাছে আর আমার পোষা ময়নাটির কাছে ছাড়া, এই পৃথিবীতে আর কাহারও কাছে তোমার কথা বলি না।"

হোরেস এবার একটুকু হাসিয়া বলিল, "তবে তোমায় সত্য বলিতেছি, শুন। আমার কারবারে এক্ষণ ত্রিশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় হইয়াছে। কিন্তু, এই ত্রিশ লক্ষের সমস্ত আমার নহে। এই ত্রিশ লক্ষের মধ্যে বিশ লক্ষ আমার, আর দশ লক্ষ আমার সরিকের। সেই সরিক মহোদয়ের ন্যায় স্নেহাস্পদ ও যার-পর-নাই বিশ্বস্ত সুহৃৎ। আমি তাঁহাকে আমার সমস্ত অংশ বিক্রয় করিয়া

টাকা তুলিবার জন্য এক আম্‌মোক্তারনামা দিয়া আসিয়াছি। আমি যদি কর্ম্মস্থলে যাইয়া ঐ বিশ লক্ষ মজুত পাই, তাহা হইলে দুই তিন মাসের মধ্যেই আর বাকী পাঁচ লক্ষ অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিব; এবং পঁচিশ লক্ষ টাকার গবর্ণমেণ্ট-কাগজ হাতে লইয়া, আনন্দে বুক ফুলাইয়া, তোমাদিগের বাড়ীতে দেখা দিব।"

লরার মুখেও এবার মুচ্‌কে হাসি ফুটিল। লরা বলিল, "বটে! তুমি বিশ লক্ষ টাকার অধিপতি হইয়াছ! ইহা ত স্বপ্নেও আমি মনে করি নাই। তুমি ক্রোরপতির উপযুক্ত জামাতা, —তোমায় নমস্কার! বিশ লক্ষ যখন তোমার হাতে আছে, তখন আমি দুঃখিনী সামান্য পাঁচ লক্ষের জন্য এইরূপ শূন্য প্রাণে, শূন্য জীবন যাপন করি কেন? আমার মায়ের হাতে বিস্তর টাকা আছে। তুমি একটুকু ইঙ্গিত করিলেই মা তোমার পাঁচ লক্ষ টাকা উপহার দিতে পারেন। আর যদি তুমি, আমার বেয়াদবি মাফ করিয়া, স্ব্ার চক্ষে গ্রহণ কর,—যদি আমাকে সত্য সত্য তোমারই আর এক খানি তনু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমিও আমার এই বড় সাধের দেহ প্রাণ বিক্রয়ের কমিসনস্বরূপ পাঁচ লক্ষ টাকা তোমাকে গোপনে দিতে পারি। এত প্রকার কমিসন উপার্জ্জন কর, এইটিই বা বাকী থাকে কেন?"

লরার কথায় যুবা, হর্ষ, লজ্জা ও প্রেমোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া, মুহূর্ত্ত কাল জড়বৎ রহিল;—তার পর, লরার পদ-প্রান্তে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার ধরণে, জানুপাত করিয়া, ভক্তিপূর্ণকণ্ঠে কহিল,—

"সুন্দরি, তোমার এই পৃথ্বীদুর্ল্লভ রূপরাশিও তোমার হৃদয়নিহিত সুকুমার সৌন্দর্য্যের নিকট নিষ্প্রভ। মানুষের প্রাণ এমন মধুর হইতে পারে, ইহা আমি জানিতাম না। কিন্তু, আমি তোমার এ মহত্ত্ব ও উদারতার অপব্যবহার করিতে পারিব না,—এবং পিশাচের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও ক্ষুদ্রচিত্ত লইয়া তোমার হৃদয়রূপ পবিত্র দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইব না। তুমি আমায় কিরূপ ভালবাস, তাহা বুঝিয়াছি। সম্যক্ বোঝা আবশ্যক ছিল, তাহা এইক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তুমিও প্রাণাধিকে, একটি কথা বুঝিতে পার নাই। যাহার বিশ লক্ষ টাকা সম্বল থাকে, সে অনায়াসেই পাঁচ লক্ষ কিংবা দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে। আমার সাকল্যে সাত আট লক্ষ টাকা লাগিবে। কারণ, এ সোনার লতাকে আমার মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণকুসুমে সুসজ্জিত করিতে হইবে। আমি যে রূপে পারি, তিন মাসের মধ্যেই এই টাকা সংগ্রহ করিব, এবং যেন তোমার পিতা, কন্যাদান উপলক্ষে, তাঁহার সমকক্ষ ধন-সম্রাট্‌দিগের মধ্যে, কোন অংশেও লজ্জা বোধ না করেন, সেই ভাবে এখানে ফিরিয়া আসিব।"

লরা, যুবাকে তাহার পদপ্রান্ত হইতে আদর করিয়া তুলিয়া, কাছে বসাইল; এবং তাহাকে বাহুপাশে কণ্ঠে জড়াইয়া, সলজ্জ-সস্মিত চক্ষে বলিল,—"অত আমিরীর

কাজ নাই। আমিরী করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব খুয়াইও না। যে যুবতী তোমা হেন পুরুষরত্নকে পতিজ্ঞানে প্রাণে গাঁথিয়া লইতে অধিকারিণী হয়, তাহার আবার আভরণের আবশ্যকতা কিংবা অভাব থাকে কি ?"

উল্লিখিতরূপে কথোপকথনের পর, যুবক যুবতী উভয়েই পাঁচটি দিন বড় সুখে কাটাইল। বাড়ীর কর্ত্তা অর্থাৎ লরার পিতা, নয়টার মধ্যেই প্রাতর্ভোজ সমাপন করিয়া, নিকটস্থ নগরে তাঁহার কার্য্যালয়ে চলিয়া যাইতেন,এবং অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্য্যন্ত সেখানেই কার্য্য করিতেন। লরা, এই সময়টি, উদ্যানের কোন না কোন গৃহে, আনন্দবিভোর অবস্থায়, হোরেসের সহিত অতিবাহিত করিত; এবং উপযুক্ত সময়ে গৃহে ফিরিয়া, মায়ের কাছে আসিয়া, সমস্ত কথা কহিত। মা, কন্যাকে মোমের পুতুলের মত অতি বড় কোমল বস্তু মনে করিলেও, চারিত্রাংশে শ্রদ্ধা করিতেন; এবং কন্যার অভিলষিত বরকে বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সম্মানার্হ গুণ-নিচয়ে প্রকৃতই বড় দরের যুবা বলিয়া জানিতেন। সুতরাং লরা যে উদ্যানে অত দীর্ঘ সময় অবস্থিত রহিত, ইহাতে তাঁহার মনে শান্তি ভিন্ন কোনরূপ শঙ্কার ভাব ঘুণাক্ষরেও স্থান পাইত না।

ষষ্ঠ দিবস, গৃহস্বামিনী আপনা হইতেই অপরাহ্ণ চারিটার সময় এক বার উদ্যানে গেলেন। কিন্তু তিনি সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়, যেমন স্নেহে, তেমন দুঃখে গলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার লরা ও হোরেস, উভয়েই একস্থানে বসিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া, প্রার্থনা করিতেছে,—উভয়েরই চক্ষে দর-দর ধারা বহিতেছে। তিনি যখন দেখা দিলেন, তখন কন্যা ও কন্যার আরাধ্য বর তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল; এবং নিজ নিজ চক্ষের জল রুমালে মুছিয়া, আনন্দের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু, গৃহিণী বুদ্ধিমতী; তিনি বুঝিলেন, হোরেস তাঁহার মনের কোন গূঢ় কথা গোপন করিতেছে।

হোরেস, গৃহস্বামিনীর চক্ষে জিজ্ঞাসার ভাব অনুভব করিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল,—"মা, গোপন করিবার কোন কথা নহে। আজ আমি একটা টেলিগ্রাম পাইয়া বড় অস্থির হইয়াছি। টেলিগ্রামে কি লেখা আছে, একবার পড়িয়া দেখুন।"

গৃহস্বামিনী টেলিগ্রাম হাতে লইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, তাহাতে লিখিত রহিয়াছে, "তুমি ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে চলিয়া আসিবে; নহিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

গৃহস্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তুমি এই টেলিগ্রাম পাইয়া এত ভীত হইয়াছ কেন ?"

হোরেস উত্তর করিল,—"মা, ভয়ের প্রধান কারণ এই, যিনি আমার কারবারের সরিক ও সহোদরসদৃশ বিশ্বস্ত সুহৃৎ,—ফলতঃ যাঁহার হাতে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া এখানে আমি নিশ্চিন্ত আছি, তিনি টেলিগ্রাম করেন নাই; টেলিগ্রাম করিয়াছেন—আর কেহ। ইহাতে

উৎসাহ না দিয়া সৎশিক্ষার উপযোগি অধ্যয়নে নিবিষ্ট রাখিবেন।" লরা বিলোল কটাক্ষের সহিত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—"শোন মা।" মা যখন সরিয়া পড়িলেন, তখন হোরেসের দিকে চাহিয়া, কুর্নিশ করিয়া কহিল,—"মাষ্টার সাহেব, আমার সেলাম।"

মে মাসের ৩০শে তারিখ, মঙ্গলবার, হোরেস এই ভাবে গৃহস্বামিনীর নিকট বিদায় লইল। কিন্তু লরার সহিত তাহার পর দিন বুধবারও হোরেসের পুনরায় সাক্ষাৎকার হইল। তবে, সে দিন আর নূতন কিছু কথা নহে। লরা কাঁদিয়া আকুল; হোরেস বালিকার চিত্তসন্তর্পণেই আত্মচিন্তাবিস্মৃত। যেহে কোন রমণী পরের অভিভাবিকা হইয়া হৃদয়ে প্রীতি লাভ করে; কেহ পরের দাসী হইয়া রহিতে ভালবাসে। লরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। লরা স্বভাবতঃ পরাধীনা; সে হোরেসকে পরশপাথর অপেক্ষাও প্রার্থিত-দুর্লভ বস্তু জ্ঞানে পূজা করে। সে হোরেসের স্কন্ধের উপর অর্দ্ধ নির্ভর করিয়া, কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কহিল,—"তুমি রাগ কর, আর যাহাই কর, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে পত্র লিখিব। যদি পত্র লিখিতেও নিষেধ কর, তাহা হইলে শ্বাসরোধে মরিয়া যাইব।"

হোরেস, ভালবাসার শত প্রকার সুমধুর ব্যবহারে, বালিকাকে কতকটা সুস্থির করিয়া বলিল,—

"তুমি পত্র লিখিও, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু আমি আমার আশঙ্কিত উদ্বেগের শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমার একখানি পত্রেরও উত্তর দিব না। যাহা হউক, পত্রসম্পর্কে আমার একটি কথা অবশ্যই রক্ষা করিও। তোমার কোন পত্রই যেন তোমার পিতার চক্ষে না পড়ে, সে বিষয়ে শত সাবধান রহিও। পিতার মনোগত ভাব ভাল হউক, আর বুদ্ধির ভ্রমে মন্দই বা হউক, পিতাই ধর্ম্মতঃ সন্তানের দেহপ্রাণের অধিকারী। স্ত্রীলোকের যত দিন না বিবাহ হয়, তত দিন পর্য্যন্ত, তাহার কাছে, এই পৃথিবীতে, মাতার পর, পিতার সমান জন আর কেহই হইতে পারে না। সাবধান লরা, সাবধান, তুমি কখনও তোমার পিতার বিরাগভাজন হইও না।"

দুর্ভাবনাগ্রস্ত হোরেস, আর একটি কথাও না কহিয়া,—একবার আর ফিরিয়াও না চাহিয়া, অতি দ্রুতপদে উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেল; লরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্যানের সেই শিলাশয্যায় শূন্যহৃদয়ে পড়িয়া রহিয়া, শেষে—ধীরে ধীরে,—যেন আপনার রুগ্ন দেহের বোঝা বহিয়া, ঘরে ফিরিয়া গেল।

হোরেস, বিষয়-বাণিজ্যে ইদানীং আকণ্ঠমগ্ন হইলেও সুশিক্ষিত যুবা,—সৎশিক্ষায় অত্যন্ত অনুরাগী ও ঈশ্বরপরায়ণ উপাসক। সে, লরাকে নব্য আমেরিকার অতি কদর্য্য নাটক নভেল পড়িতে নিষেধ করিয়া, কএকখানি যুবজন-চিত্তহারি সুখ-পাঠ্য গ্রন্থ উপহার দিয়াছিল; আর দিয়াছিল ওয়াসিংটন, লিন্‌কন্ ও ওয়েণ্ডেল ফিলিপস্ প্রভৃতি আমেরিকার সদাশয় কর্ম্মবীর এবং চ্যানিঙ,

তাঁহার উপর একটুকু সংশয় হয় না কি ?

লরার মা বলিলেন,—"বাছা, সংশয় দূষ্য বস্তু। সুহৃজ্জনের উপর সংশয় না হওয়াই ভাল। কিন্তু তোমার আর এখন এখানে একটি দিনও বিলম্ব করা পোষাইতেছে না।"

হোরেস বলিল,—"আমি ইচ্ছা করিয়া এখানে আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিতেছি না। এখান হইতে রেলের গাড়ী দিনে একবার মাত্র যায়; আমি অদ্যকার রাত্রিটি এই স্থানে কোন প্রকারে অবস্থান করিব; কল্য দশটার সময় এই উদ্যানে লরার সহিত সাক্ষাৎমাত্র করিয়া, সাড়ে দশটার ট্রেণে রওনা হইব।"

লরার মা, যুবককে ঠিক্ মায়ের প্রাণে কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটে একটি চুম্বন দিলেন; এবং গুণানুরাগ-জনিত স্নেহ ও নিঃস্বার্থ বাৎসল্যের স্বভাব-মধুর গদগদ স্বরে বলিলেন,—

"বাছা, তোমার মা নাই, আমিই তোমার মা। আমি যখন ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া আমার অবোধ, অমায়িক, প্রাণধন লরাকে তোমায় দান করিয়াছি, তখন আমার এই জিহ্বা সহস্র খণ্ডে কৃত্ত হইলেও বাক্য আমার মিথ্যা হইবে না। তুমি ঐ টেলিগ্রামের লিখিত সর্ব্বনাশের কথায় ভীত হইও না। ঈশ্বর না করুন, যদি—যদিই বা কোন মনুষ্যের দুর্ব্যবহারে তোমার প্রকৃতই সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহা হইলে, আমিই তোমার সকল অভাব পূরণ করিয়া,—তোমায় সমস্ত দিয়া, সংসারে তোমাকে সুস্থির করিব; এবং বিবাহের প্রতিশ্রুত যৌতুকও আমিই তোমায় গোপনে যোগাইব।"

মমতা যখন মানুষের হৃদয়স্বরূপ পবিত্র নিকেতন হইতে প্রীতিস্নেহের অদম্য আবেগে প্রবাহিত হয়, তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই উহার নিকট পরাভূত না হইয়া রহিতে পারে না। হোরেসের অভিমানোচ্ছ্রিত আলাময় হৃদয়ও পরাভব পাইল। তাহার দৃষ্টি সে দেবমূর্ত্তির নিকট আজি আপনা হইতেই অবনত হইল। তাহার চিরদিনের চিত্তপোষক অভিমান,—চিরপুষ্ট আত্মনির্ভরের গর্ব্ব,—তাহার পাষাণ-কঠোর প্রাণ, সমস্তই যেন কেমন এক সুখ-সেব্য তাপে গলিয়া গেল। সে ঐ স্নেহ-বাৎসল্য এবং মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ-রূপিণী, মহিমময়ী রমণী-মূর্ত্তির নিকট, নম্রমুখী লরার সহিত একসঙ্গে জানুপাত করিয়া, যুক্তকরে বলিল,—

"মা, আর বাদপ্রতিবাদ করিব না। আপনি দয়াময়ের নিকট এই প্রার্থনা করুন, আমরা দুজনে যেন আপনার মত মায়ের শ্রদ্ধা ও স্নেহলাভের উপযুক্ত সুসন্তান হই। আমি আমার কর্ম্মস্থলে এবার বড় বেশী ব্যাপৃত রহিব। সুতরাং আপনার কাছে কিংবা লরার কাছেও পত্র লিখিব না। কিন্তু, আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হইলে, ঠিক্ তিন মাস পরে, এমনই সময়ে, এই উদ্যানে, আপনার চরণে আসিয়া প্রণত হইব। আপনি আমার একটি কথা রাখিবেন। লরাকে বড় মানুষের মেয়ের মত শুধুই গানবাদ্য

পার্কার, ও এমার্সন প্রভৃতি আমেরিকার মহামতি ধর্ম্মবীরদিগের ফটোগ্রাফ।

উপহৃত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে একখানি ছিল পৃথিবীর ক্ষণজন্মা রমণী মিসেস্ হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো রচিত (Uncle Tom's Cabin) টম কাকার কুটীর। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানির সহিত অনেক দিন হইতেই লরার বড় প্রণয় ছিল, এবং আজি দিবসের অবশিষ্ট সময়, সে উহা লইয়াই যাপন করিল। এই পুস্তক পাঠ-সময়ে হৃদয়িক নরনারী মাত্রই অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়া থাকেন। লরার দুটি চক্ষু যে ঈদৃক্ করুণরসের কাহিনী প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ অশ্রুপাতে স্ফীত হইল, তাহা তাহার আপনার নিকটও কারণান্তর-সম্ভূত বোধ হইল না। কেবল, লরার মা একবার কাছে আসিয়া বলিলেন,—"বাছা আমার, এরূপ করিতে নাই, তুই আর কিছু পড়্। তোকে এই প্রকার আর্দ্রনয়না উন্মাদিনীর মত দেখিলে কর্ত্তা বড় বিরক্ত হইবেন।"

সূর্য্য অস্ত যাইতে না যাইতেই, প্রাসাদের শতদীপ-সমুজ্জল ভোজ-নিকেতনে বাড়ীর সান্ধ্যভোজ আরব্ধ হইল। সেখানে হারমোনিয়ম বাজিল, পিয়ানো বাজিল,—হি-হিঃশব্দে হাসির হিল্লোল বহিল, এবং অভ্যাগত অতিথিদিগের মুখে গৃহস্বামীর অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য ও বিষয়কার্য্যদক্ষতার অশেষ প্রশংসাবাদ হইল। কিন্তু লরা প্রস্তর-মূর্ত্তির মত একপার্শ্বে বসিয়া সামান্য কিছু আহার্য্য গ্রহণ করিল।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওর কি হইয়াছে।" গৃহিণী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"বেশী কিছু নয়, আজি সমস্তটা অপরাহ্ণ একা বসিয়া হ্যারিয়েট ষ্টোর বই পড়িয়াছে।" কর্ত্তা একটুকু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"যাহার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই সে পড়ুক্; আমি কাহারও অধ্যয়ন-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে ভালবাসি না। কিন্তু হ্যারিয়েট ষ্টো যাহা কিছু লিখিয়াছে, সমস্তই আমার চক্ষুর শূল। যাহারা, দেশ হিতকর দাসত্বপ্রথার গতিরোধ করিয়া, আমেরিকার ব্যবসায়বাণিজ্যের উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মাইয়াছে, আমি তাহাদিগের নামও কর্ণে শুনিতে চাহি না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"এ কথা আর বৃথা তুলিয়া ফল কি?—সে দাসত্বপ্রথাও নাই, সে হ্যারিয়েট ষ্টোও নাই। পরলোকে স্বর্গ আছে কি না, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি না। কেন না, হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিয়াও সে স্বর্গ চক্ষে দেখি নাই। কিন্তু, ইহলোকে যদি যশঃকীর্ত্তি ও পুণ্যপ্রতিভার স্বর্গ থাকে, তাহা হইলে, দয়ার অবতার হ্যারিয়েট ষ্টো, তাহার সপ্তম ধামে, সমুচ্চ সিংহাসনে, স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।"

কর্ত্তা প্রত্যুত্তরে কিছু বলিলেন না। কিন্তু, একবার একটু রুষিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। গৃহিণীর বয়স চল্লিশের সন্নিহিত হইয়া থাকিলেও, তাঁহাকে তখনও ত্রিশ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হইত না; আর তাঁহার সেই রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তির দিকে চা-

হিয়া কেহই তাঁহার কোন কথায় অশ্রদ্ধা দেখাইতে সাহস পাইত না।

ডিনার অথবা সান্ধ্যভোজের পর, লরা আপনার কক্ষে চলিয়া গেল। সেখানে মা যাইয়া অনেকক্ষণ কন্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন, এবং তাহাকে বুকে সাপটিয়া, পাঁচ রকমের প্রিয় কথায় ভুলাইয়া রাখিবার জন্য, স্নেহমমতার সুপরিচিত মেয়েলী ছলনা অবলম্বন করিলেন। রাত্রি ক্রমে এগারটা হইল। গৃহিণী তখন আপনার কক্ষে চলিয়া গেলেন। লরার এক ধাই ছিল; সে আসিয়া লরার পার্শ্বের কোঠায় আপনার ঠাঁই লইল; কিন্তু লরার চক্ষে তখন পর্য্যন্তও নিদ্রা আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিল না।

লরা পুথি ছাড়িয়া পত্রিকা পড়িতেছে, পত্রিকা ছাড়িয়া ছবির আল্‌বাম্ খুলিয়া দেখিতেছে। এই ভাবে তাহার সময় যাইতেছে; কিন্তু সে কি চাহিতেছে, তাহা সে নিজেও যেন অনুভব করিতে পারিতেছে না। যখন ঘড়িতে টুং টাং করিয়া বারটা বাজিল, তখন লরা আপনার শয়নগৃহের বাতায়নদ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিল। কিন্তু দণ্ডায়মান হইয়াই সে যাহা প্রত্যক্ষ করিল, তাহাতে তাহার আত্মায় আর চৈতন্য রহিল না।

লরা দেখিল, তাহার প্রাণের হোরেস সে মুক্তবাতায়ন-পথের বিপরীত দিকে, বুডোর নামক বিলাস-নিকেতনের দ্বারদেশে, অতি বড় বিষণ্ন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে; এবং লরার পিতা, তাহার পশ্চাৎ ভাগে,—অনতিদূরে—অথচ দৃষ্টির অগোচরে,—পীয়ুলার নামক গৃহের এক প্রান্তে, পিস্তল হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়া, ক্রোধজ্বলিত চক্ষে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন।

হোরেসের দক্ষিণ হস্ত তাহার মাথার উপরে,—যেন মাথায় বড়ই আঘাত পাইয়াছে; বাম হস্ত বক্ষঃস্থলে,—যেন তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইতেছে। মুখখানি, উচ্ছলপ্রেম আর অতি গভীর নৈরাশ্যবিষাদের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সেই এক প্রকার। হোরেস ঋষিতাপসের ন্যায় পবিত্র স্বভাব। সে দিনেও কোন দিন লরার শয়নগৃহে উপস্থিত হয় নাই। এমন অবস্থায়, নিশীথ-সময়ে, ঐরূপ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে, সে লরার শয়নস্থানে প্রবেশ করিল কেন? আর পিতাই বা তাহার হত্যার জন্য পিস্তল হস্তে তাহার পিছনে আসিয়া যমের মত দাঁড়াইলেন কি জন্য? তিনি কি হোরেসকে চিনিতে পাইয়াছেন? এই কথাগুলি গুছাইয়া লিখিতে অথবা শৃঙ্খলার সহিত চিন্তা করিতে যত সময় লাগে, মনের স্বাভাবিক ক্রিয়ায়,-বিনা শৃঙ্খলায়, চিন্তা করিতে তত সময় লাগে না। সময় যাহাই লাগুক, লরার মুখে "প্রাণাধিক, পালাও—পালাও, কিংবা পার্শ্বে সরিয়া যাও," এইরূপ কোন একটা কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই পিস্তলে খট্ ক'রিয়া শব্দ হইল; লরা, "মা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)